বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের মনসামঙ্গল

অচিন্ত্য বিশ্বাস

রত্নাবলী

১১এ, ব্রজনাথ মিত্র লেন • কোলকাতা ৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ
বৈশাখ ১৪০৯/এপ্রিল ২০০২

প্রকাশক
সুনীল ভট্টাচার্য
রত্নাবলী
১১এ, ব্রজনাথ মিত্র লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
অচিন্ত্য বিশ্বাস □ কল্যাণ দাশ

কারিগরি নির্দেশক
কল্যাণ দাশ

মুদ্রক
নিউ রেনবো ল্যামিনেশন
৩১এ, পটুয়াটোলা লেন,
কলকাতা ৭০০ ০০৯

কলেজস্ট্রিটে প্রাপ্তিস্থান
পুস্তক বিপণি
২৭, বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯



জে. এন. ঘোষ অ্যান্ড সন্স
৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০ ০৭৩

উৎসর্গ

মহাবিদ্যালয়েব ছাত্র অবস্থায
যাঁর কাছে পেয়েছি সাহিত্যপাঠেব আনন্দ,
বিশ্লেষণেব উৎসাহ আর অনুশীলনেব উদ্যম—
সেই পবমারাধ্য

অধ্যাপক বুদ্ধজীবন চক্রবর্তীকে
ভালোবাসা, শ্রদ্ধা ও বিনম্র প্রণাম জানিয়ে

কথামুখ

দীর্ঘ নিবিড় টানা কাজ করার পর বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের 'মনসামঙ্গল' শেষ করা গেল। মনসামঙ্গল— 'মনসাবিজয়' নয়। আমরা কেন বিপ্রদাসের কাব্যকে মনসামঙ্গল বলতে চাই তার কারণ বিশ্লেষণ করেছি ভূমিকায়। কারণটি নেহাৎ সংখ্যাতাত্ত্বিক নয়। পাঁচবার 'মনসাবিজই' (একবারও 'মনসাবিজয়' নয়) আর সাতবার 'মনসামঙ্গল' ব্যবহার করাটাই মনসামঙ্গল নাম বিবেচনার কারণ নয়। বিজয় শব্দটি প্রয়োগ হয় অন্য দেবতার (বা ধর্মের) অধিকারের মানুষদের স্ব-অধিকারে আনার প্রক্রিয়াকে স্পষ্ট করতে। সুধী অধ্যাপক ড. ওয়াকিল আহমেদ প্রশ্ন তুলেছেন— মধ্যযুগে বিজয়ী ধর্ম কেবলমাত্র ইসলাম, বাংলায় অন্য সব ধর্মই বিজিত! কে বোঝাবে যখন এইসব ধর্ম-সম্পৃক্ত রচনা উপহার দেওয়া হয় তখন ভক্তের দৃষ্টি আজকের বিশ্বদৃষ্টি মেনে লেখা হয় না। সর্বত্রই ভাবনা পৃথিবী স্থির— বাকি দৃশ্যমান প্রকৃতি ঘুরে চলেছে বা ঝুলে আছে। সুতরাং উপরে উপরওয়ালা আর নিচে নরক বা শয়তানের চারণ-ভূমি। এসব রচনায় সবাই মনে মনে বিজয়ী। বস্তুত বিজয় দেবপূজক ধৃতব্রতদের শব্দ আর মঙ্গল সকলের জন্য বরাদ্দ। যারা আছেন, যারা ছিলেন, যারা আসবেন। 'মনসামঙ্গল' কাব্যে হাসান-হোসেনের কাহিনীর উপযোগিতা এখানে—যারা ছিলেন, এখন আর নেই— তাদের উদ্দেশ্যে ইচ্ছাশক্তির পারঙ্গম একটি সত্য। দেখিয়েছি আমরা, সাপের মন্ত্রধারীরা কেমন ধর্ম-নিরপেক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন— হিন্দু বা মুসলমান তাঁরা বাহ্য পরিচয়ে, ভেতরে ভেতরে মনসামঙ্গল ধারার দ্বারা আভূষিত। এসব ক্ষেত্রে কে বিজয়ী কে বিজিত? মধ্যযুগের মানুষ ধর্মসংস্কার বা ধর্ম সংরক্ষার উপায় ও আয়ুধ জানতেন না— তাদের লক্ষ্য ধূলিধূসর গ্রাম-জীবনের বৃক্ষলতা পুষ্পপল্লব প্রাণসত্তা ও যাপিত জীবনের মঙ্গল। এ-ভাবনা আক্রমণাত্মক নয়— সংশ্লেষণী। নদীকে তলোয়ার বা বাঁধ দিয়ে প্রহরা বা 'এ কে-৪৭' দিয়ে তাঁরা ব্যাহত করেন নি। এই মুক্ত ধারাকে বোঝার জন্য মুক্ত সংস্কার ও সাধনা প্রয়োজন। তাই মঙ্গল।

ভেবেছিলাম বাংলার সমস্ত মনসামঙ্গল ধারা নিয়েই আলোচনা করব। তা করলে যে বই হত, বাংলা ভাষা সাহিত্য প্রকাশনার শিল্পে তেমন পুঁজি দেখি না। সর্বত্রই লেখকের intellectual property ছিনতাই করার পালিশ-মুখশ্রী। যা হল, তাতেই 'রত্নাবলী'র সাহস, রুচি ও শুদ্ধতার পরিচয় পেয়েছি। তাদের, বিশেষত সুনীল ভট্টাচার্যকে, ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

১৯৮১-র শরতে বর্ধমানের 'সুবাস্তু'-র ওপরতলায় আচার্য সুকুমার সেন আমাকে আচ্ছা করে বকুনি লাগিয়েছিলেন—একটা জিনিস না জেনে অধ্যাপনা করছি কোন্ সাহসে। আমতা আমতা করে বলেছিলাম, স্যর, আমি তো এখনও ছাত্র। সঙ্গে সঙ্গে আচার্য সেনের সুভাষিত রত্ন ঝরে পড়েছিল : 'ছাত্র, কে ছাত্র নয়? আমিও তো ছাত্র। যতদিন নিজেকে ছাত্র মনে করতে পারবে, ততদিন কিছু হবে। যাও।' আজ এতদিন পর মনে হচ্ছে, অধ্যয়ন অধ্যাপনায় ধৃতব্রত বহুতর কর্মপ্রেরণার সেই উৎস-ধারাটিকে— গোয়াবাগানের সেই বটবৃক্ষকে, আমার পরমগুরু আচার্য সুকুমার সেনকে। যদি তাঁকে এ বই দিতে পারতাম খুশি হতেন বলেই আমার ধারণা। আচার্য সেন এই বই প্রকাশ করেছিলেন এশিয়াটিক সোসাইটি-র মারফৎ। আমাদের দেশে সংঘ তার দায়িত্ব পালন করে না। যদি পালন করত— বিপ্রদাসের বই-এর নতুন সংস্করণ নিশ্চয়

বের হত। পুনর্মুদ্রণ নয় উন্নত সংস্করণ। আচার্যের কথা এখনও প্রাসঙ্গিক মনে হয় আমার। পাঠকদের জন্য তাই লিখি, যদি কোনো ভুলচুক চোখে পড়ে জানাবেন— পরের সংস্করণে বদলে নেবার চেষ্টা করবো।

কিছুদিন আগে অনুজ এক অধ্যাপক বলেছিলেন— আমার লেখা নাকি বদলে গেছে। আগে যা লিখতাম তাতে রহস্য থাকত— অলঙ্কৃত করে লেখার প্রয়াস থাকত, আড়াল থাকত। বদলটা আমার নজরও এড়ায়নি। আসলে একদা তরুণ ছিল অরুণ আলো— মনে হত মাতৃভাষা মগুনকলার দাম দেয়। এখন বুঝি আমাদের মাতৃভাষায় মনন-চর্চার ক্ষেত্র সঙ্কোচনশীল। তাই সহজ-সাধনা ছাড়া গতি কি? আর এক অধ্যাপক— একদা সে আমার ছাত্র হবার জন্য পদার্থবিদ্যার পাঠ অসমাপ্ত রেখে বঙ্গবিদ্যার অপার্থিব সুখ পেতে চেয়েছিল— বলেছিল, আমার বই নাকি ছাত্রদের জন্য নয়, শিক্ষকদের জন্য লেখা! কী করি! সুতরাং গড় অঙ্ক কষা ছাড়া উপায় দেখলাম না।

রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক চিত্তরঞ্জন লাহা আর গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ অধ্যাপক অমলেন্দু চক্রবর্তী আমাকে সঞ্জীবনী পাঠক্রমে (Refresher Course) বলতে ডেকেছিলেন। বর্তমান বইয়ের কিছু প্রমা সেসময় বৃহত্তর বঙ্গ-সংস্কৃতির বিদ্যাযানীদের সামনে বলতে পেরে খুশি হয়েছিলাম। এই বই লিখতে গিয়ে তাদের কথা মনে রেখেছি।

প্রায়ই মনে হয়, আমরা এক বনসাই-পর্বের মানুষ। সবই ছাঁটাই হচ্ছে— বিশ্ববিদ্যালয়ের মহাপঞ্চকদের রীতি অনুযায়ী। আচার্য অদীনপুণ্যেরা নেই। এরকম এক ঘোর হয়ে আসা দিক-চক্রবালে আমার এই চেষ্টা কিন্তু পদোন্নতির পরিকল্পিত প্যাকেজ নয়। এর লক্ষ্য আগামী সময়ের বিদ্যাপথিকরা। কেমন করে এই নির্জনে চলতে পারছি? যার সাহচর্য ছাড়া এই যাত্রা সম্ভব ছিল না— এই কথামুখে তাকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন বাহুল্য বলে মনে করি। তবে পুত্র শ্রীমান অনর্ঘের কথাও বলতে হচ্ছে। সে তার কৌতূহল সীমায়িত করেছে আমাকে অনবরত কাজ করার সুযোগ দেবার জন্যই। তাকে পরামর্শ দেবো মনসায় মঙ্গল হোক তার।

পরিশেষে একটি কথা লিখব। একই নামের এক লেখক বাংলা সাহিত্য বিষয়ে কিছু লিখছেন বলে শুনছি। তাঁর কৃত-কর্মের দায় আমার উপর না বর্তায়, সেই লক্ষ্যে ঠিক করেছি আমার নামের পরে কর্মক্ষেত্রের পরিচয়টি যুক্ত রাখব। পাঠকরা তাহলে পৃথক করতে পারবেন। মুদ্রাযন্ত্রের কর্মীদের আশ্বস্ত করি— আর নতুন নতুন আঠাসাঁটা লেখার আরণ্যক পাণ্ডুলিপি, অন্তত এই বইয়ের জন্য আপনাদের আক্রমণ করবে না। বাঁধাই-কর্মীদের জন্যও থাক শুভেচ্ছা। আগাম শুভকামনা তাদের জন্য যারা এ বই পড়বেন।

অচিন্ত্য বিশ্বাস
প্রফেসর : বাংলা বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
কলকাতা ৩২

২৬ জানুয়ারি ২০০২

সূচীপত্র

▶

মালদহ পান্ডুয়ায় প্রাপ্ত মনসার ব্রোঞ্জ নির্মিত মূর্তি।
আনুমানিক সময় : ১১শ শতাব্দী।
সংগ্রাহক : শ্রী নির্মল ঘটক।
উচ্চতা : ১০.৯ সেমি।
মূর্তিটি 'সুখাসনা' — পদ্মের উপর আসীন,
ডানদিকে সাপ, হাতকে জড়িয়ে ধরে রেখেছে;
ডান হাতে একটি 'বীজরূপক' — পদ্মকুঁড়ি।
বাঁ হাতে ধরা আছে একটি শিশু। দুপাশেই সিজ মনসা।





◀

দক্ষিণ দিনাজপুরের তপনে প্রাপ্ত
মনসার প্রস্তর মূর্তি।
আনুমানিক সময় : ১০ম শতাব্দী।
আকৃতি ৫৩.৩ x ২৭.৩[২] সেমি।
'ললিতাসনে' আসীন।
পদতলে মনসাঘট বিদ্যমান।
দুপাশে দাড়িওয়ালা পুরুষরা
জরৎকারু (ধামাই?)
এবং আস্তিক হতে পারে।



নিশ্চিন্তা, তপন, দক্ষিণ দিনাজপুর থেকে প্রাপ্ত প্রস্তর নির্মিত মনসা মূর্তি। আকার ৩৯.৪ x ১৯^{২} সেমি। 'ললিতাসনে' আসীন, পদ্মে আসীন, পদ্মে ডান পা – ঘট, সিজবৃক্ষ আর নৈবেদ্য রক্ষিত পায়ের দুপাশে। দুপাশে ধামাই - আস্তিক। আনুমানিক সময় ১১শ শতাব্দী।



ঘটমধ্যে মনসামূর্তি – ব্রোঞ্জ নির্মিত। প্রাপ্তিস্থান : দক্ষিণ দিনাজপুর। আকার উচ্চতা : ৮.১ সেমি.। আনুমানিক সময় : ১১শ শতাব্দী।



রাজশাহী বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির সংগ্রহ
প্রস্তর নির্মিত মনসামূর্তি।
প্রাপ্তিস্থান : খিদরাপল্লী, নন্দীগ্রাম, বগুড়া।
আনুমানিক সময় : ১১শ শতাব্দী।
দেবী বদ্ধপদ্মাসীনসা।
হাতে অক্ষ গুটিকা।



দিনাজপুর জেলা থেকে প্রাপ্ত মনসামূর্তি।
আনুমানিক একাদশ শতাব্দী।

সৌজন্য : শ্রীমতী নবনীতা মুখোপাধ্যায়।



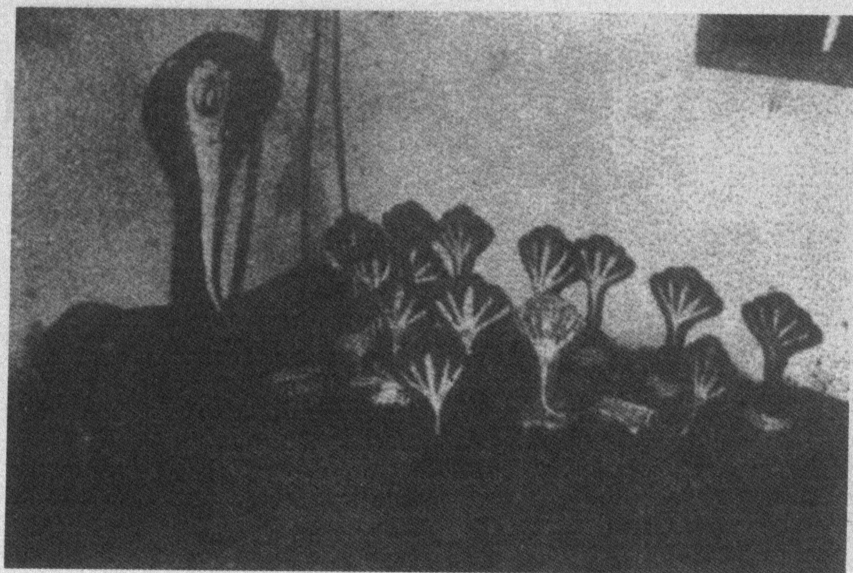
মাদুরাই থেকে ৪০ কিলোমিটার পশ্চিমের লৌকিক দেবস্থল — সর্প মূর্তি উৎসর্গ করা হয়েছে। সন্তান-লাভের আশা, স্ত্রীরোগগ্রস্ত মহিলাদের নিরাময়ের আকাঙ্ক্ষায় এই দেবীর পূজা করা হয়।

ছবি : লেখক





দক্ষিণ কামরূপ জেলার আজাবা কেওট পাড়ার মনসা পূজার অনুষঙ্গে এই রকম বাসুকী মূর্তি তৈরি করা হয়।



আসামের দক্ষিণ কামরূপ জেলার
আজাবা কেওট পাড়ার অষ্টনাগ মূর্তি।

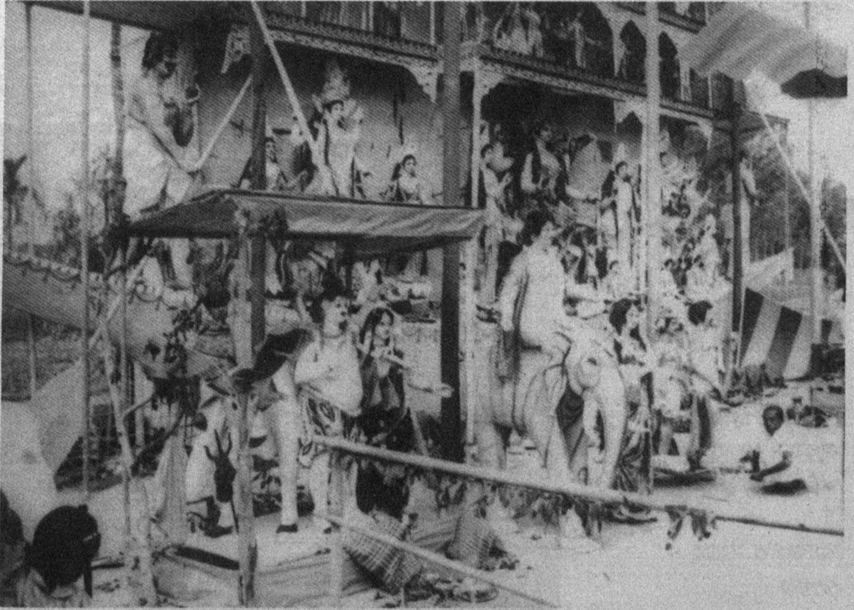


আসামের দক্ষিণ কামরূপ জেলার
গড়ল - ভট্টাপাড়ার মনসামন্দিরের
বিগ্রহ।





ধুবড়ি-র নিকটবর্তী সত্রশালের 'কাণী বিষহরি'-র পট। গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয় লোকসংস্কৃতি গবেষণা বিভাগের সংগ্রহশালায় রক্ষিত।





সুপ্রা কান্দি, করিমগঞ্জ, আসাম - এর মনসা পূজার অনুষ্ঠান নৌকা পূজা।

সৌজন্য ঃ- ড° সুজিৎ চৌধুরী, করিমগঞ্জ, আসাম।



◀

মনসার জড়ানো পট।
ছাদনা তলায়
মনসার উপস্থিতিতে
লখিন্দরের ঢলে পড়া।
বেহুলার প্রার্থনা।

ব্যক্তিগত সংগ্রহ :
লেখক



▶

মনসার জড়ানো পট।
চাঁদ সদাগরের হাতে
কাটারি। কলার মান্দাস
বানানো। বেহুলা ও
একজন সহযোগী
পাশে বসে ও দাঁড়িয়ে।

ব্যক্তিগত সংগ্রহ :
লেখক


ভূমিকা

॥ ১ ॥

পুথি পরিচয়

এ পর্যন্ত প্রাপ্ত বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের মনসামঙ্গলের পুথি সংখ্যা ৪। সবক'টি একই বর্গের। চব্বিশ পরগনা জেলার বারাসতের অদূরবর্তী ছোট জাগুলিয়ার কাছাকাছি অঞ্চল থেকে দুটি পরিবার থেকে এগুলি সংগৃহীত। স্থানটি আনারপুর পরগনার মধ্যবর্তী, দত্তপুকুরের কাছাকাছি। লিপিকর বেশ কয়েকজন, কিন্তু পুথির গায়কবর্গ সিংহ (সিংহ সাপুড়িয়া) পদবীধারী আর মালিকরা বসু। বাংলা পুথিতে সাধারণত পুষ্পিকা থাকে শেষে—বিশ্বভারতী ১৮৯৩ সংখ্যক পুথিটির সূচনাতেই তারিখের বিস্তৃত উল্লেখ রয়েছে :

> 'শ্রীনবীনচন্দ্র চক্রবর্তী সাকিন ছোট জাগুলীয়া জেলা ২৪ পরগনা সব ডিভিসন বারাসত কার্তিকে মাসি তুলা রাশিস্থে ভাস্করে কৃষ্ণপক্ষে দাদশাং তিথৌ শক্তং সোম বারাধিকরকে উনবিংশ দিবসে ত্রয়োদশ শত তিন সালে লিখিত॥ ১৯ কার্তিক ১৩০৩ সালে সোমবারে দ্বাদশী কৃষ্ণপক্ষে।'

নবীনচন্দ্র চক্রবর্তী ছাড়াও এই পুথির লিপিকর আরও একজন, জয়দেব নন্দী। তিনি ছোট জাগুলিয়ার 'মাজের পাড়া' (= মাঝের পাড়া)-র অধিবাসী ছিলেন। তিনি লিপিকাল দিয়েছেন ১০ চৈত্র ১২৩১ (১৮২৫)। অর্থাৎ এই পুথিটি বসু পরিবারের সম্পত্তি ছিল। প্রয়োজন পড়তে প্রথম দিকে কিছু অংশ নবীনচন্দ্র চক্রবর্তী আবার লিখেছেন। বর্ধমান সাহিত্যসভার ৪০৩ নং পুথি (এই পুথিগুলি অধ্যাপক সুকুমার সেনের ব্যক্তিগত সংগ্রহে চলে যাওয়ায় এবং তাঁর পুত্র ড. সুভদ্র কুমার সেনের মারফত বিদেশী একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংরক্ষণ পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় কার্যত গবেষকদের চোখের আড়ালে চলে গেছে—শোনা যাচ্ছে, ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ শেষ হবার পর বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ এর অধিকার পাবেন। কবে শেষ হবে কাজ? জানি না)-টি অসম্পূর্ণ। লিপিকর সুধীরকুমার মুখোপাধ্যায়। মালিক অখিলচন্দ্র বসু। সাকিন ছোট জাগুলিয়া। এশিয়াটিক সোসাইটির পুথি দুটি—G 3529 আর G3530-এর লিপিকর বেশ কয়েকজন : কেশবরাম/রামকেশব সিংহ, কালীপ্রসাদ সিংহ, রামপ্রসাদ সিংহ, গোকুলচন্দ্র সিংহ, রামদেব শর্মন, কৃষ্ণচন্দ্র মিত্র, লোচন নাপিত, গোপীনাথ সিংহ, শ্রীগোপাল সিংহ।

মালিক হলেন :

রামজয় বসু, লক্ষ্মীকান্ত বসু, প্রতাপনারায়ণ বসু এবং দুর্গাগতি রায় (সম্ভবত বসুরায়) শেষোক্তজন আনারপুর পরগনার ইজারাদার ছিলেন।

এশিয়াটিক সোসাইটির জোড়া পুথি আদৌ একজোড়া পুথি নয়—এখানেও বিশ্বভারতীর পুথির মতোই কয়েক প্রজন্মের হস্তাবলেপ আছে। আমাদের মনে হয়েছে দু'-তিন এমনকি চারটি পুথিও এখানে জড়িয়ে মড়িয়ে একাকার করা হয়েছে। পুথি কখনো একা থাকে না— পাশ্চাত্য গবেষকদের এই আপ্তবাক্য এই আলোচনায় সমর্থিত হয়।

পুথিগুলি দামি ছিল। ব্যবহারকারীরা এ পুথির বিভিন্ন পাতায়—সুযোগ পাওয়া মাত্র নাম স্বাক্ষর করেছেন। নতুন পৃষ্ঠা শুরু করার আগে, পৃষ্ঠা শেষ করার আগে লিপিকরদের স্বাক্ষর দেখে মনে হয় বসু পরিবার মনসামঙ্গলের পুথিটি বারবার লিখিয়েছেন। কারণ, অনুমান করে নিতে হবে। ১. ঐ তাদের পারিবারিক পূজা-পার্বণের সঙ্গে যুক্ত ছিল। ২. মনসামঙ্গল গানের দল ছিল সিংহদের। আশুতোষ ভট্টাচার্য একটি মাত্র অঞ্চলের পুথি হওয়ায় এর প্রাচীনত্ব স্বীকার করতে চাননি, তাছাড়া তাঁর মনে হয়েছে বিপ্রদাস পিপিলাইকে গুরুত্বপূর্ণ কবি হিসেবেও স্বীকার

করা যায় না। তাঁর যুক্তি : '....বিপ্রদাসের কাব্য ব্যাপক প্রচারলাভ করিয়াছিল বলিয়া জানিতে পারা যায় না। কারণ, প্রায় একই অঞ্চলে তাঁহার এই দুইখানি অসম্পূর্ণ পুথি ব্যতীত আর কোথাও তাঁহার প্রামাণ্য রচনার সন্ধান পাওয়া যায় নাই। যে অঞ্চলে এই পুথি দুইখানি আবিষ্কৃত হইয়াছে, সেই অঞ্চলে মনসামঙ্গল কাব্যের বিশেষ কোনও প্রচলন ছিল বলিয়া আর কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না।' (*বাঙলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস* : আশুতোষ ভট্টাচার্য ; এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং ; কলকাতা ; পরিবর্তিত অষ্টম সংস্করণ, ১৯৯৮, ৩৪৬ পৃ.)। এই যুক্তিতে মনসামঙ্গলের অন্য অনেক প্রতিষ্ঠিত কবিকেই খারিজ করে দেওয়া যেতেই পারে। তবে মাত্র একটি অঞ্চলে বহুদিন ধরে পুথি অনুলিপি করানোর অর্থ ও তাৎপর্য অনুধাবন করার চেষ্টা করেননি আশুবাবু। জনপ্রিয় পালাগানের দল তাদের ব্যবহৃত পুথি অন্যকে ব্যবহার করতে দেবেন না—এটাই স্বাভাবিক। পুথির মধ্যে লিপিকর ও মালিকের নাম বারবার উল্লেখ করার কারণও এইখানে বুঝতে হবে। দেখাই :

১. ১ম পালার ৩নং গানের মধ্যে : 'স্বক্ষর শ্রী কেশব রাম সিংহ সাকিম দত্তপুর নিবাসী'
২. ১ম পালার ৬নং গানের মধ্যে : 'স্বক্ষর শ্রী কেশব রাম সিংহ সাকীম আমার পু (র) দত্তপুখরিয়া'
৩. ১ম পালার ৯নং গানের মধ্যে : 'শ্রী রামকেশব সিংহ'
৪. ১ম পালার ২২নং গানের মধ্যে : 'স্বাক্ষর শ্রী রামজয় বসোস্য গাঁ চানক'
৫. ১ম পালার ২৩নং গানের ভিতর : 'শ্রীশ্রীশ্রী গোকুলচন্দ্র সিংহ সাপুড়েই আছেন সাক্ষী শ্রীকেশব রাম সিংহ'
৬. ২য় পালার ৫নং গানের মধ্যে : 'লিক্ষ্য শ্রী লক্ষ্মীকান্ত সিংহস্য তেরিখ অগ্রহায়ণ'
৭. ২য় পালার ৭ম গানের মাঝামাঝি : 'স্বক্ষর শ্রীকেশব সিংহ সাং দত্তপুখরিয়া'
৮. ২য় পালার ১৩শ গানের ভিতর : 'স্বক্ষর শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্র মিত্র'
৯. ৩য় পালার ১৬নং গানের মধ্যে : 'স্বক্ষর প্রতাপ নারায়ণ বসো সাকিম [illegible]গুলিয়া'
১০. পঞ্চম পালার ৭নং গানের ভিতর : 'সক্ষর শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্র সিং'
১১. ৬ষ্ঠ পালার ১৭ নং গানের মধ্যে : 'শ্রী গোপিনাথ সিংহ'
১২. ৭ম পালার ৭নং গানের মধ্যে : 'সহক্ষে শ্রী রামদেব শর্মনং'
১৩. ৮ম পালার ৯নং গানের ভিতর : 'শ্রী গোপীনাথ সিংহ'
১৪. ৮ম পালার ১১নং গানের মধ্যে : 'শ্রী গোপীনাথ সিংহ'
১৫. ৯ম পালার ৩নং গানের ভিতর : 'সং শ্রীলোচন নাপিত সদড়'
১৬. ৯ম পালার ৫নং গানের মধ্যে আছে 'সং সিংহস্য'
১৭. ৯ম পালার ৯নং গানের ভিতর : 'এ পুস্তক শ্রী গোপীনাথ সিংহ সাকিম দত্তপুখরিয়া সাংমিদং শ্রীশ্রী গণেশ সরণ'।

পাতার পর পাতায় এই রকম মালিকানা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা থেকেই স্পষ্ট হয় পুথিটি (আসলে কাব্যটি) ছিল গুরুত্বপূর্ণ। এর মূল্য ছিল বলেই—লিপিকর আত্মনাম যোজনা করতে এত ব্যস্ত ছিলেন। মালিক মহোদয়ও তাঁর অধিকার জাহির করতে বেশি সচেষ্ট থেকেছেন ঠিক একারণেই। পাশাপাশি এ পুথি ব্যবহার হয়েছে বেশি—নষ্ট লুপ্ত পাতার বদলে নতুন পাতা লিখিয়ে নিতেও হয়েছে তাই। উক্ত ১৬টি ক্ষেত্রে নামসংযোজন করার প্রক্রিয়াটির মূল রহস্য এইখানে।

নবম পালার শেষে বস্তুবদল অংশে একটি অঙ্ক-চিহ্নহীন পাতা পাওয়া গেছে। (চিত্র পশ্য)। বস্তুবদল যে মনসামঙ্গল পুথির জনপ্রিয় অংশ—তার প্রমাণ অন্যত্রও পাওয়া যায়। বিপ্রদাসের রচনার এই অংশে ইচ্ছামতো গায়েনের প্রক্ষেপ নিশ্চয় ছিল।

কিছু কিছু অন্যরকম সংবাদ আছে পুথির পৃষ্ঠায়। সে সমস্ত খুবই কৌতূহলোদ্দীপক। দুয়েকটি থেকে পুথির কালনির্ণয়ের সূত্র পাওয়া যায়। যেমন—

১. '১লা জৈষ্ঠ ধর্মদাস বসুর শ্রাদ্ধ'— এরকম একটি কথা লেখা আছে ১ম পালার ১২শ গানের মধ্যে। এই ধর্মদাস বসু পুথির মালিকদের পরিবারেব মানুষ।

২. ২য় পালা ৬ষ্ঠ গানের মধ্যে : '২৩ জ্যৈষ্ট ভন্নি ( ) না ২৪ জ্যৈষ্ঠ হইল'। এই ভরণী অর্থাৎ —সপ্তবিংশতি নক্ষত্রগণের দ্বিতীয় নক্ষত্র, যম এর দেবতা। নিশ্চয় তারিখটিতে কোন কৃত্য ছিল। পঞ্জিকা প্রমাণ করা গেলে বৎসরটি নির্দিষ্ট করা যেতে পারে।

৩. ২য় পালার ৫ম গানের মধ্যে আছে : 'লিক্ষ্য শ্রী লক্ষ্মীকান্ত সিংহস্য তেরিখ অগ্রহায়ণ'। পুথি যে টানা লেখা হত না, প্রয়োজন বোধে অংশবিশেষ লেখা হত তার স্পষ্ট প্রমাণ এখানে।

৪. ৫ম পালার ৯ম গানের ১৫৬ সংখ্যক পয়ারের মধ্যে লেখা হয়েছে—'রথ জাত্রা পূর্ব দিবস'। যদি উক্ত 'ভরণী'-র পঞ্জিকা-প্রমাণ তারিখ নির্ণয় করা যায় তাহলে এই দিনটি পরীক্ষা করে কাল চিহ্ন সনাক্ত করাও সম্ভব।

৫. ৫ম পালার ১৩শ গানের মধ্যে আছে আষাড়ি পূর্ণিমা ২৮ আষাঢ় অদ্যই'। সুকুমার সেন জানিয়েছেন, জনৈক তপোনাথ চক্রবর্তীর অনুরোধে কোন নির্মলচন্দ্র লাহিড়ী গণনা করে ১৭৪০ ও ১৭৫৯ খ্রিস্টাব্দের ২৮ আষাঢ় পূর্ণিমা পেয়েছেন। তাহলে বলতে হবে এই পুথিগুলি লিপিকালের একটি প্রাচীনতর সীমা নির্ধারণ করা সম্ভব হয়েছে।

৬. ৭ম পালার পঞ্চম গানের শেষে লেখা হয়েছে : 'সক্ষরমিদং শ্রীরামপ্রসাদ সিংহ সাং দত্তপুখরিয়া কালি কলম ভাল নহে এর ছাঁদ ভাল হয় না।'— লিখতে লিখতে শ্রী রামপ্রসাদ সিংহ নিশ্চয় বিরক্ত হয়েছিলেন।

৭. ৭ম পালার শেষে আছে : 'সাতপালা সমাপ্ত। শ্রী দুর্গাঐ নম শ্রী কৃষ্ণাঐ নম শ্রী হরিঐ নম শ্রী লক্ষ্মীঐ নম শ্রী সরস্বতী নম পরগনে আনপুর ইজাদার শ্রী দুর্গাগতি রায় দেওয়ান শ্রীযুত কালিপ্রসাদ সিংহ শ্রী গুপী নাথ সিংহ (সা)পুড়িয়া ইতি সমাপ্ত সপ্তম পালা।'— অন্যান্য সূত্র মিলিয়ে উক্ত 'আনপুর' স্থলে 'আনারপুর' আর 'ইজাদার' স্থলে 'ইজারাদার' পাঠ নির্ণয় করা যায়। শ্রী দুর্গাপতি রায় ইজারাদার আর তার দেওয়ান কালীপ্রসাদ সিংহ হয়ত মনসা মঙ্গল গানের দলের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

৮. ৮ম পালার ৩য় গানের একত্রে পেয়েছে 'শ্রীগুপীনাথ সিংহ মামিয়া হইয়াছে'। একই পালার ১৬শ গানের মধ্যে পাচ্ছি 'শ্রী গোপীনাথ সিংহ সাপুড়িয়া ঝিয়া মামি'। এই 'মামিয়া' কিংবা 'ঝিয়া মামি'-র অর্থ নির্ণয় করতে পারিনি। সুকুমার সেন লিখেছেন : 'These statements should not be taken seriously. They are of the nature of magic incantations giving protection from the wrath of Manasa or from general evil.' (ভূমিকা : *Manasa-Vijaya,* এশিয়াটিক সোসাসটি ; ii পৃ ?)। শাশুড়ি বা মামীর সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কের ইঙ্গিত যদি থেকে থাকে তাহলে তার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা দরকার। এরকম অশ্লীল শব্দ নিছক কৌতুকচ্ছলে বলা হবে না। সম্ভবত এর গভীর কোন তাৎপর্য রয়েছে। অর্থাৎ এগুলি 'seriously' আলোচনা করাই দরকার।

৯. পাদপূরক হিসেবে প্রায়ই দেবদেবীর নাম লিখেছেন লিপিকররা। ১ম পালার ২য় গানে আছে 'শ্রীশ্রীকৃষ্ণ। ভকতি মুকতি হয় জাহার সঙ্গে'। ৪র্থ পালার ৮ম গানে আছে 'নম নারায়ণী নগ কুলঙ্গিনি চণ্ডি গা মা'। ৫ম পালার ১০ম গানে আছে 'শ্রী শ্রী দুর্গা'। ৬ পালা ১২ গান-এর 'শ্রীশ্রীদুর্গাচরণ', ১৭ গানে 'শ্রীশ্রী দুর্গা', ৮ পালার ১ম গানের একত্র পত্রসূচক হিসাবে 'শ্রীশ্রী দুর্গা', ২য় গানের মধ্যে 'শ্রীশ্রীকৃষ্ণ', ৫ম গানে 'শ্রীকৃষ্ণ শরণং', ৮ম গানে 'শ্রীকৃষ্ণ', ৯ম পালার ১ম গানের একাংশে পত্রসূচক হিসেবে 'শ্রীরাম স্মরণ' লিখেছেন লিপিকররা। পুথির স্বাতন্ত্র্য বোঝার জন্যে এই তথ্যগুলির বিশ্লেষণ জরুরি। পাতা ভাগ করে নিয়ে লিপি করা গান করা প্রভৃতির সূত্রে বিচ্ছিন্ন হওয়া, নষ্ট বা লুপ্ত হওয়া পাতা আবার লিখে দেওয়ার জন্যেই একটি দুটি বিচ্ছিন্ন পাতা নেওয়া হয়েছে। যিনি লিখেছেন, তিনি পত্রসূচক ও পত্রসমাপ্তি-র সূচক জ্ঞাপন করেছেন দেবতাদের নাম করে। সুতরাং পুথি বেশ ব্যবহৃত হত, এসব থেকে তার প্রমাণ স্পষ্ট হচ্ছে। আপাতত যে তথ্য বিচার করা গেল তাতে সিদ্ধান্ত নিতে হয় বিপ্রদাস পিপিলাই-এর পুথিগুলি ১৭৪০ থেকে ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে লিখিত হয়েছে। এই ঘটনাকে তাৎপর্যহীন বললে ভুল হবে। রীতিমতো ধর্ম-সামাজিক ধারাবাহিকতার অন্তর্গত ছিল বিপ্রদাসের 'মনসামঙ্গল'।

॥ ২ ॥

গায়নরীতি

কেমন করে মনসামঙ্গল গাওয়া হত তার কিছু প্রমাণ পাওয়া গেছে কাব্যের ভেতরেই। সপ্তম পালার শেষের দিকে সঙ্ক-ধন্বন্তরী মারা গেছে। তখন কাব্যে আছে :

সঙ্ক ধন্বন্তরী বধ পদ্মার বিজই পদ
কহি দিল মনসামঙ্গলে॥
যে জন তোমার ভক্ত কর্ণে শুনে অবিরত
পূরহ তাহার অভিলাষ। (৭.৪.৫১-৫২)

সপ্তম পালার শেষে ভণিতা দিয়েছেন বিপ্রদাস :

যেই শুনে ভনে গায় পদ্মার মঙ্গল।
ধন পুত্র বৃদ্ধি হয় সর্বত্র কুশল॥ (৭.১৩.১৯৯)

ত্রয়োদশ পালার ১২শ গানে একই রকম কয়েকটি পংক্তি :

মনসার ব্রতকথা শুন সর্বজন॥
যেইজন শুনে ভনে পদ্মার মঙ্গল।
ধনপুত্র পরমাই বাড়য়ে কুশল॥
সদাই ভকতি যেবা গায় বা গাওয়ায়।
মনসা সহায় তারো নাহি সর্পভয়॥ (১৩.১২.২০৭-০৯)

একেবারে শেষে আছে :

যে জন পদ্মার ব্রত গায়ে বা গাওয়ায়।
সর্বক্ষণ বিষহরি তাহার সহায়॥
গায়েন বায়েন শেষে মাগিয়ে লয় বর।
তব পদে ভক্তি যেন রহে নিরন্তর॥

যাহার কল্যাণে গো তোমার ব্রত পাই।
মনোনীত বাঞ্ছা পূর্ণ করিবে সদাই॥
এই ত আসর মধ্যে আছে যত জনা।
আপনি করহ পূর্ণ সবের কামনা॥
এই তো গ্রামের মধ্যে বৈসে যত লোক।
কদাচিত নহে যেন কোন দুঃখশোক॥
হরি বল সর্বজন চল নিজ পুরে।
মনসামঙ্গল গীত সাঙ্গ এত দূরে॥
(১৩.১৩.২৫১-২৫৯)

সহশিল্পী, আসর, নায়ক, গায়েন, শ্রোতৃমণ্ডলী, গ্রাম পরিবেশের সকলের মঙ্গল কামনা করেছেন কবি।

দিনের পালা কোথায় শেষ হবে তার সুস্পষ্ট নির্দেশ রেখেছেন বিপ্রদাস। ৩য় পালার ১৭ গানের শেষে একটি ত্রিপদী উদ্ধার করছি :

শুনিহ রজনিতে বড়ই অদভুতে
সর্পসত্র যজ্ঞ নাশে।
তৃতীয় পালা সাঙ্গ দিবসে নানা রঙ্গ
কহিল দ্বিজ বিপ্রদাসে॥ (৩.১৭.২২৫)

৪র্থ পালা শেষ করে লেখা হয়েছে 'আজি রহিল গীত'। কারণ সহজেই অনুমেয়। অন্যত্রও পাচ্ছি :

এই সভা সমেত মনসা পুরো আশ।
আজি রহিল গীত বলে বিপ্রদাস॥ (১০.২০.৩৪৯)

কিংবা—

বৈকালে গাহিব বিবা শুন সর্বজন।
দ্বিজ বিপ্রদাস বলে মনসা চরণ॥ (১১.১২.১৮৮)

পুথির ভেতর প্রয়োজনবোধে নির্দেশ রক্ষা করেছেন লিপিকর। চতুর্থ পালার অষ্টম গানটি ত্রিপদীতে লেখা। ১৫০ সংখ্যক ত্রিপদীর পর হঠাৎ একটি ধুয়া পাওয়া গেছে :

"নম নারায়ণী নগ কুলঙ্গিনী চণ্ডি গ মা"।

পরের গানের শুরুতেই তিনটি অতিরিক্ত পয়ার :

সংসার বিষম ঘোর নাহিক নিস্তার।
রাধাকানু পদরেণু সবে মাত্র সার॥
চক্ষেতে দেখিয়া নর শমন প্রহার।
অমৃত ছাড়িয়া কর গরল বেভার॥
রাম রাম মহামন্ত্র জপ একমনে।
তরিবে সংসারে যবে লইবে শমনে॥ (৪.৯)

বিশ্বভারতী পুথির অন্যতম লিপিকর জয়দেব নন্দী বাঞ্ছারাম ঘোষের ভণিতায় একটি পূর্ণাঙ্গ পদ লিখেছেন। পদটি সূর্য বন্দনার।

প্রথমে ভাস্কর পদে শ্রীবাম্বরে নতি।
ছায়া-সঙ্গে প্রণমহ অরুণ সারথি॥

[১]প্রবল[১] কুসুম জবা জিনি অঙ্গ আভা।
চতুর্ভুজ সুপ্রসন্ন বিষ্ণুতেজ প্রভা॥
সুকর্ম-দায়েক দেব পাপ-বিমর্পন।
জগৎ পবিত্র হয় পাইলে কিরণ॥
যাবৎ না হয় দেব তব অধিষ্ঠান।
জগতের জন অন্ধ [২]থাকিতে[২] [৩]নয়ন[৩]॥
তিমিরে আবৃত ক্ষিতি জন অবসন্ন।
তোমার উদয়ে দেব জগৎ প্রসন্ন॥
দিনগত যত কর্ম ত্রৈলোক ভিতর।
সুকৃত দুষ্কৃত নহে তব অগোচর॥
তুমি সকলের সাক্ষী তোমারে জানে কে।
পায় দিব্যগতি তুয়া মণ্ডল ভেদে যে॥
যে ভজে তোমর পদ করিয়া অভয়।
তবু সুত হইতে তার নাহিক সংশয়॥
অরুণ সারথি রথ এক চক্রধর।
সপ্ত হয় রথ বয় যায় শূন্যভর॥
অবিরত ফিরে চক্র নাহি অবসান।
অস্তগিরি গেলে ফিরি নাগপুরী যান॥
বিভাবরী গেলে উরি উদয় শিখরে।
এই মত অবিরত মেরুচক্র ফিরে॥
ধ্রুবলোক ধ্রুবসুখে টানে চক্রদড়ি।
আয়েন প্রভেদ হইল দিন যায় বাড়ি॥
রক্তশতদল মধ্যে করি অবস্থিতি।
ছায়া সঙ্গে সঙ্গে রঙ্গে বঞ্চে দিনপতি॥
সুপ্রভাত দিননাথ হও য়েই নরে।
শমন আর শনি তার কি করিতে পারে॥
বাঞ্ছারাম ঘোষ কহে করি বহু স্তব।
[৪]কৃপাবলোকন[৪] কর কমল বান্ধব॥

১. সুকুমারবাবুর প্রস্তাবিত পাঠ 'প্রবাল' ২. 'থাকিলে' (ঐ) ৩. 'নয়ন' (ঐ) ৪. সুকুমারবাবুর পাঠ 'কৃপাবলোকয়' (ভুল পাঠ)

এই পদ উল্লেখ করে জয়দেব নন্দী পুথি লিখতে শুরু করেন। তাঁর মন্তব্য : 'লিখিতে আরম্ভ হইল সন ১২৩১ তারিখ ১০ চৈত্র সঅক্ষর শ্রীযুক্ত জয়দেব নন্দী—সং জাগুলীয়।'

পঞ্চম পালার প্রথম গানের একাংশে 'গদ' কথাটি লেখা। হাসনের হাহাকার বিবৃত করার প্রসঙ্গে এই গানটিতে আবেগাত্মক রচনার ঠিক পূর্বে 'গদ' শব্দটি গায়েনের প্রতি নির্দেশ, অংশটি গদ গদ ভাবে পড়তে বা গাইতে হবে।

নতুন পত্র সূচনার সময় 'শ্রীশ্রী দুর্গা' লিখে পূর্বপত্রের শেষ পংক্তি 'নিশ্চয় জানিহ মৈল ওঝা গুণ মণি' আর একবার লিখে রেখেছেন একজন লিপিকর (৬.১০.১৮৯)। গায়েনের জন্য নির্দেশ এখানেও।

॥ ৩ ॥

বিপ্রদাসের আত্মপরিচয়

বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের আত্মপরিচয় সামান্য। স্পষ্ট করে কবি জানিয়েছেন তিনি মুকুন্দ পণ্ডিতের পুত্র, গ্রাম বাদুড়্যা বটগ্রাম। তাঁর গোত্র বৎস্য, প্রবর পিপিলাই, সামবেদী কুতুব শাখার বংশ তাঁদের। পৈপ্পলাদ-গোষ্ঠীর ব্রাহ্মণরা অথর্ববেদীয়—তাদের সঙ্গে অহিতুণ্ডিক, সর্পবিদ্যক, বিষবিদ্যকদের বহু গোপন সাধন প্রণালীর সম্পর্ক ছিল। (সূত্র : ড. অভিজিৎ ঘোষ; সংস্কৃত বিভাগ ; যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়) মুকুন্দ পণ্ডিতের চার পুত্রের একজন বিপ্রদাস। মনসা তাঁকে মঙ্গলগীত রচনার নির্দেশ দিয়ে স্বপ্ন দেখিয়েছেন :

> শুক্লা দশমী তিথি বৈশাখ মাসে।
> শিয়রে বসিয়া পদ্মা কৈল উপদেশে॥
> পাঁচালি রচিতে পদ্মা করিলা আদেশ।
> সেই সে ভরসা আর না জানি বিশেষ॥ (১.৪.৭৬-৭৭)

আশুতোষ ভট্টাচার্য বাদুড়্যা বটগ্রাম বলে কোনও গ্রাম পাননি। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাট মহকুমায় বাদুড়িয়া এখনও আছে—থানাটিতে ১১৩টি মৌজা (*উত্তর চব্বিশ পরগণার ইতিবৃত্ত* : কমল চৌধুরী, মডেল পাবলিশিং হাউস ; ১৯৮৭ ; ১৭৪ পৃ.)। বাদুড়িয়া এখন একটি পৌরসভা। আশুবাবু অবশ্য 'বাদুড়্যা বটগ্রাম' না পাওয়ায় সন্দেহ করেছেন বিপ্রদাস হয়ত প্রাচীন কোন কবি নন! এ বিচিত্র যুক্তি তাঁর। গঙ্গাসাগর তীর্থ জনপ্রবাদে 'সাগর'-দ্বীপ হয়ে যাওয়া, 'পুরুষোত্তমপুরী' পুরীতে পরিণত হওয়া যদি আশ্চর্যজনক না হয় 'বাদুড়্যা বটগ্রাম' বাদুড়িয়ায় পরিণত হওয়া কি খুব আশ্চর্যের ব্যাপার! বিপ্রদাসকে মনসা স্বপ্নাদেশ দিয়েছেন শুক্লা দশমী তিথিতে— বৈশাখ মাসে। আশুবাবু লিখেছেন : 'শ্রাবণ মাসে নাগ-পঞ্চমী তিথিতে বিজয় গুপ্ত মনসার স্বপ্নাদেশ লাভ করিয়াছিলেন ; অতএব বৈশাখ মাসের শুক্লা দশমীতে মনসার আবির্ভাবের তাৎপর্য সহজে বোধগম্য নহে। সুতরাং মনে হয় ইহার শুদ্ধপাঠ 'জ্যৈষ্ঠ মাসে' হইবে।' (*বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস* ; উক্ত; ৩৪৫ পৃ.)। মন্তব্যটি ঠিক হতে পারে। তবে দশহরার একমাস আগে স্বপ্নাদিষ্ট হলে কাব্য রচনা করতে বসে কবি উৎসবের সময় সে লেখা পড়ে শোনাতে পারেন। এ নিয়ে কল্পনা বিস্তার করে লাভ নেই।

বিশ্বভারতী পুথির অন্যতম লিপিকর নবীন চক্রবর্তী। তিনি ১৩০৩ বঙ্গাব্দে ১৯ কার্তিক তারিখে পুথির কতকাংশ লিখেছিলেন। তাঁর আত্মপরিচয় দেখে সুকুমার সেন মন্তব্য করেছেন তিনি বিপ্রদাসের রচনারীতির দ্বারা প্রাণিত হয়েছেন। 'The copyist Nabin Candra Chakrabarti Minutely initiated the manner of Vípradasa in giving in the Colophon Some Particulars about himself and his family.' (উক্ত ; iii পৃ.)। আমাদের ধারণা, নবীন চক্রবর্তী-র সঙ্গে কবির দূরবর্তী কোন আত্মীয়তা ছিল। যাই হোক, আগে নবীন চক্রবর্তীর আত্মপরিচয় উদ্ধার করি :

> পীতাম্বর-বিপ্রসুত শ্রী নবীন নাম।
> চিরকাল বসতি ছোট-জাগুলে গ্রাম॥
> [1]বাৎস্য[1] গোত্র কাঞ্জিলাল পঞ্চপ্রবর।
> সামবেদ [2]কুথুম[2] শাখা চারি সহোদর॥

১ রাজস্য (সু. সেন-এর ভুল পাঠ), ২ কুতুব (?)

হাবাণ পরাণ কালী কনিষ্ঠ নবীন।
মনসা কৃপায় তার হস্তের লিখন।।

এই লেখার সঙ্গে বিপ্রদাসের আত্মপরিচয়ের মিল যথেষ্ট। বিপ্রদাসও বাৎস্য গোত্রের, সামবেদ, কুতুব শাখার ব্রাহ্মণ। তাঁর প্রবর পিপিলাই। নবীন চক্রবর্তী বিপ্রদাসের অধস্তন জ্ঞাতি-কুটুম্ব হতে পারেন।

॥ ৪ ॥

বিপ্রদাসের কাব্যের পালা বিভাজন

বিপ্রদাসেব গানে প্রচুর অর্বাচীন প্রক্ষেপ আছে—এই পূর্বসিদ্ধান্ত থাকায় আশুবাবু বিচিত্র যুক্তি উত্থাপন করেছেন। তার মধ্যে একটি এখানে বলে নিই। 'কবি তাঁহার গ্রন্থের প্রারম্ভে তাঁহার বর্ণিতব্য বিষয়ের একটি সংক্ষিপ্তসার দিয়াছেন, তাহার শেষে উল্লেখ করিয়াছেন,

সংক্ষেপে পদ্মার ব্রত কহিল মঙ্গলগীত
বিস্তরে কহিব সপ্তনিশি।

ইহাতে মনে হয়, সাতটি পালায় তিনি তাঁর গীত সম্পূর্ণ করিবেন সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। কিন্তু উক্ত বৃহত্তর পুথিখানিতে নয়টি পালা পর্যন্ত রচিত হইয়াছে এবং যেখানে নবম পালা শেষ হইয়াছে, সেখানে পুথিও খণ্ডিত হইয়াছে। ......প্রথমত কোনও মঙ্গলকাব্যই সাত পালায় রচিত হইতে দেখা যায় না। ন্যূনতম আট পালায় চণ্ডীমঙ্গল রচিত হইয়া থাকে ; তথাপি কোনও কোনও অঞ্চলে সাত পালায় মনসামঙ্গল রচিত হইত স্বীকার করিয়া লইলেও কবি গ্রন্থকারকে সাত পালায় কাহিনী রচনা করিবেন, একথা বলা সত্ত্বেও তাঁহারই নামে প্রচলিত পুথিতে নয় পালা পর্যন্ত কাহিনী রচিত হইয়াও কাহিনী অসম্পূর্ণ কেন দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাও বুঝিতে পারা যায় না।' (উক্ত : ৩৪৫ পৃ.)।

এরকম বিচিত্র অর্ধমনস্ক অভিযোগ কল্পনাতীত। বিপ্রদাস যে সংক্ষেপ গ্রন্থসূত্র দিয়েছেন তাতে স্পষ্টই কাব্যের পরিকল্পনা আছে। মনসার জন্ম, দেবতাদের মহাযজ্ঞ, কপিলা-মনোরথ-মহাব্যাঘ্রকথা, ক্ষীরদসমুদ্র, মন্থন, অমৃত ও বিষ উত্থিত হওয়া, মনসার বিষাধিকার, মনসার বিবাহ—পুত্রলাভ, জন্মেজয় যজ্ঞ—আস্তিকের যজ্ঞনাশ, রাখালদের মনসা পূজা, হাসনের পুরী ধ্বংস, জালু মালু প্রসঙ্গ, ধন্বন্তরী বধ, ধনামনা বধ, চাঁদের ছয় পুত্র বধ, ঊষা-অনিরুদ্ধ হরণ, চাঁদের বাণিজ্যযাত্রা, বেহুলা-লখিন্দর বিবাহ, লোহার বাসর, লখিন্দর দংশন—বেহুলার ভাসান, চাঁদের মনসা পূজা, লখাই-বেহুলার স্বর্গযাত্রা (১.৫)। এইপর্যন্ত গ্রন্থ পরিকল্পনা উপস্থিত করে বিপ্রদাস বলেছেন—তিনি 'সপ্তনিশি' বিস্তৃত আকারে কাব্য শোনাবেন। বলা বাহুল্য, বিপ্রদাস এখানে পালার কথা লেখেননি—ঘুণাক্ষরেও বলেননি তাঁর গান সাত পালার। আশুবাবু সেরকম ধরে নিয়েছেন। নয় পালা নয়, বিপ্রদাসের কাব্য তেরো পালার। কিভাবে সে পালা বিন্যস্ত হত দেখাই :

রাত্রি	১	৩	৫	৭	৯	১১	১২ + ১৩
দিন	-	২	৪	৬	৮	১০	অষ্টমঙ্গলা

কিভাবে পালার বিন্যাস করা হত তা উপরের ছক থেকে স্পষ্ট। ১ম দিন রাত্রে একটি মাত্র পালা গাওয়া হত। ২য় দিন থেকে সকালে ও সন্ধ্যায় ৬ষ্ঠ দিন পর্যন্ত গাওয়ার পর, ৭ম দিন রাত্রে দুটি পালা ১২ ও ১৩ একসঙ্গে গাওয়া হত। এইভাবে সাতদিনের তের পালা (অষ্ট-মঙ্গলা ধরলে ১৪) গাওয়ার রীতি ছিল। ১৩শ পালার শেষে 'অষ্ট মঙ্গলা'। সেখানে ইন্দ্রের প্রশ্নের উত্তরে ঊষা-অনিরুদ্ধের অর্থাৎ বেহুলা-লখীন্দরের জবানীতে আর একবার কাহিনীর সূত্র লিখেছেন বিপ্রদাস। কোন অসঙ্গতি নেই। আর এভাবে 'সপ্তনিশি' পার করার বিষয়টি খুবই সহজে প্রমাণিত হচ্ছে। আগে থেকে বিপ্রদাসের রচনায় প্রক্ষেপের কথা ভেবে না নিলে আশুবাবুর এরকম বিভ্রান্তি হত না।

অষ্টমঙ্গলায় আবার কাব্যের বিষয় চুম্বক ধরা পড়ে। নতুন কোন কথা নেই—প্রথম পালার পরিকল্পনা আর একবার সমান্তরালভাবেই উপস্থাপিত করেছেন বিপ্রদাস।

ইন্দ্ররাজ বলে শুন দেবী বিষহরি।
কেমনে তোমার পূজা হইল মর্ত্যপুরী॥ (১৩.১২.২১০)

অষ্টমঙ্গলায় কবি জানাচ্ছেন—মনসার জন্ম (১৩.১৩.২১৫), বিষ খেয়ে শিবের ক্ষীরোদ সমদ্রতীরে ঢলে পড়া (ঐ, ২২০), সিজুয়া শিখরে মনসার অধিষ্ঠান (ঐ, ২২৫), জন্মেজয়ের যজ্ঞপশু (ঐ, ২৩০), রাখালদের মধ্যে পূজা (ঐ, ২৩১), হাসনের পুরীতে এবং ঝালু-মালুর ঘরে পূজা প্রচার (ঐ, ২৩২), চাঁদের মহাজ্ঞান হরণ (ঐ, ২৩৩), সঙ্ক ধন্বন্তরী, ধনা-মনা ও চাঁদের ছয় পুত্রের মৃত্যু (ঐ, ২৩৪), ঊষা-অনিরুদ্ধের মর্ত্যে জন্মগ্রহণ (ঐ, ২৩৫), চাঁদের অনুপম পাটন যাত্রা—তখন সনকার পাঁচমাসের গর্ভ (ঐ, ২৩৬), কালিদহে চাঁদের সপ্ত ডিঙ্গা মধুকরের সলিল সমাধি (ঐ, ২৩৮), বেহুলার সঙ্গে লখিন্দরের বিবাহ, লখিন্দরের সর্পাঘাতে মৃত্যু (ঐ, ২৩৯-৪১), মান্দাসে ভেসে বেহুলার স্বর্গে আসা, নৃত্য গীতে মুগ্ধ করে লখিন্দর সহ সকলকে বাঁচিয়ে ফেরা—চাঁদের মনসা পূজা (ঐ, ২৪৫), লখিন্দর-বেহুলার স্বর্গে ফিরে যাওয়া (ঐ, ৪৭)। কাব্য পরিকল্পনা ও রূপায়ণে কোন অসঙ্গতি নেই। আশুতোষবাবু সপ্তনিশিকে সপ্ত পালা ভেবে 'কাকদন্ত-গবেষণা' করে বিষয়টি অহেতুক জটিল করেছেন।

॥ ৫ ॥

বিপ্রদাসের কাব্য-নাম

ড° সুকুমার সেন বলেছেন, বিপ্রদাসের কাব্য নাম 'মনসা বিজয়'। মনসা বিজয় নয় আমাদের মতে এই কাব্যের নাম মনসামঙ্গল। কাব্যের কোথাও 'মনসা বিজয়' শব্দবন্ধ মেলেনি। 'মনসাবিজই' লেখা হয়েছে পাঁচবার। যথা :

১. রাখালের বাক্য শুনি পদ্মাবতী হাসে। মনসা বিজই বলে দ্বিজ বিপ্রদাসে॥ (৪.১৪.৩১৭)
২. হাসনের রাজ্যে নাগেতে বেষ্টিত। মনসা বিজই বিপ্রদাস বিরচিত॥ (৪.২২.৪৮৫)
৩. দেখিয়া শুনিয়া রাণী আনন্দ প্রকাশে। মনসা বিজই দ্বিজ বিপ্রদাস ভাষে॥ (৫.১১.২৪২)
৪. কাঁদিতে কাঁদিতে রামা হইল নৈরাশ। মনসা বিজই বলে দ্বিজ বিপ্রদাস॥ (৭.১.১৩)
৫. কেহ গড়াগড়ি দিয়া করয়ে হাব্যাষ। মনসা বিজই গীত গায় বিপ্রদাস॥ (১১.৩৯.৫০২)

অন্যপক্ষে কাব্যের বিভিন্ন গানের ভণিতায় আরও কিছু শব্দবন্ধ পাওয়া গেছে। সেগুলি থেকেও কাব্যের নাম প্রস্তাব করা চলে। যেমন :

১. 'মনসা চরিত' : সনকা ক্রন্দনে বেহুলা সুব্যথিত।
দ্বিজ বিপ্রদাস বলে মনসা চরিত॥ (১৩.৪.৩৯)

২. 'পদ্মার মঙ্গল' : সব কথা কহে দেবী ইন্দ্র বিদ্যমান।
পদ্মার মঙ্গল দ্বিজ বিপ্রদাস গান॥ (১৩.১২.২১১)
৩. 'মঙ্গল গীত' : সংক্ষেপে পদ্মার ব্রত কহিল মঙ্গলগীত
বিস্তারে কহিব সপ্ত নিশি (১.৫.৯২)

পাশাপাশি কাব্যকে 'মনসামঙ্গল' বলেছেন বিপ্রদাস, অন্তত সাতবার। যথা—

১. শুনরে ভকত থেকে হৈয়া একমন। মনসামঙ্গল দ্বিজ বিপ্রদাস গান॥ (১.১৫.২৭০)
২. দারুণ হতাশে শঙ্ক ছাড়িল নিঃশ্বাস। মনসামঙ্গল গীত বলে বিপ্রদাস॥ (৬.১৪.২৭১)
৩. বিদ্যা পরীক্ষিয়া যাব রাজ-বিদ্যমান। মনসামঙ্গল দ্বিজ বিপ্রদাস গান॥ (৭.৫.৭২)
৪. মায়ের ক্রন্দন দেখি বেহুলা জিজ্ঞাসে। মনসামঙ্গল রচে দ্বিজ বিপ্রদাসে॥ (১১.১১.১৬৪)
৫. বিকল বেহুলা কান্দে হইয়া নেরাশ। মনসামঙ্গল গান দ্বিজ বিপ্রদাস॥ (১২.৩২.৪০৯)
৬. কান্দিতে কান্দিতে রাণী হইল মূৰ্ছিত। মনসামঙ্গল বিপ্রদাস বিরচিত॥ (১২.৩৪.৪৩৭)
৭. হরি বল সর্বজন চল নিজ পুরে। মনসামঙ্গল গীত সাঙ্গ এত দূরে॥ (১৩.১৩.২৫৯)

পরিসংখ্যা বলছেন মনসামঙ্গলই কবির উদ্দিষ্ট নাম। নতুন কোন অকাট্য যুক্তি না পেলে আমরা মনসাবিজয় না বলে কাব্যটিকে মনসামঙ্গল বলারই পক্ষপাতী।

আর একটি কথা বলে নিতে হচ্ছে। মনসাবিজয় আর মনসামঙ্গল একই কথা—'বিজয়' দেবীর দিক থেকে, 'মঙ্গল' শ্রোতৃমণ্ডলীর দিক থেকে। বিজয় কাহিনীর একটি অংশ—মঙ্গল কাহিনীর আদি লক্ষ্য আর পরিণতির শেষ কাম্য। যে পাঁচবার বিজয় শব্দটি ব্যবহার করেছেন বিপ্রদাস— সেখানে আমরা একের পর এক জনগোষ্ঠীর ওপর মনসার পূজাধিকার লাভের কাহিনী পেয়েছি। রাখালদের মধ্যে, হাসনহাটিতে, জালুমালুর মধ্যে আর সবশেষে চাঁদের পরিবারে। বলা বাহুল্য এই নাটকীয় তাৎপর্যপূর্ণ অংশটিকেই কবি বিজয় নামে অভিহিত করতে চেয়েছেন। গোটা কাব্যের নামে 'মনসাবিজয়' কবির লক্ষ্য ছিল না।

॥ ৬ ॥

বিপ্রদাসের মনসামঙ্গলের রচনাকাল

বিপ্রদাসের কালজ্ঞাপনীটি স্পষ্ট।

সিন্ধু ইন্দু বেদ মহী শক পরিমাণ।
নৃপতি হুসেন সাহা গৌড়ের প্রধান॥ (১.৫.৭৯)

অর্থাৎ সিন্ধু (৭) ইন্দু (১) বেদ (৪) মহী (১) তথা ১৪১৭ শকাব্দ (অঙ্কস্য বামাগতি—সূত্রে) বা ১৪৯৫ খ্রিস্টাব্দে মনসামঙ্গল রচিত হয়। (পশ্য : অচিন্ত্য বিশ্বাস : *বাংলা পুথির নানা কথা*; জিজ্ঞাসা এজেন্সিজ প্রাঃ লিঃ, ১৯৯৬ ; কলকাতা ; ১৫৩ পৃ. :)। এই সময় আলাউদ্দিন হোসেন শাহা রাজত্ব করতেন (তাঁর রাজ্যকাল—৮৯৮-৯২৫ হিজরি বা ১৪৯২-১৫১৯ খ্রি. ; পশ্য: সুখময় মুখোপাধ্যায় : *বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর : স্বাধীন সুলতানদের আমল* ; ভারতী বুক স্টল, কলকাতা ; চতুর্থ সংস্করণ, ১৯৮৮)।

বিপ্রদাসের একটি পয়ারে তাঁর পৃষ্ঠপোষকের নাম পাচ্ছি :

সানন্দে শ্রীমন্ত রায়ে পদ্মা দেহ বর।
দ্বিজ বিপ্রদাস কহে তাহার কিঙ্কর॥ (৫.১৪.৩২২)

এই শ্রীমন্ত রায়ের পরিচয় জানা যায় না। আনারপুর পরগনার ইজারাদার দুর্গাগতি রায় এর অধস্তন পুরুষ হলেও হতে পারেন। এ-ব্যাপারে নিশ্চিত করে কিছু বলা সম্ভব নয়।

বাংলার মনসামঙ্গল কাব্যধারায় বিপ্রদাসের মনসামঙ্গল বেশ গুরুত্বপূর্ণ। পঞ্চদশ শতাব্দীতে রচিত সুসংহত রচনা হিসেবে বিপ্রদাসের কাব্য যথেষ্ট শিল্প গুণমণ্ডিত। কাব্যের বস্তুসার উপস্থাপনা করে এই বিষয়ে মতামত জানানোর চেষ্টা করব। প্রথমে বস্তুসার।

॥ ৭ ॥

বিপ্রদাসের বিভিন্ন পালা : বস্তুসার

প্রথম পালা :

১. গণেশ বন্দনা।

২. নিরঞ্জন, ব্রহ্মা, নারায়ণ, লক্ষ্মী, সরস্বতী, শিব, অষ্টাদশভুজা মহেশ্বরী, কার্তিক, ইন্দ্র, অগ্নি, যম, নৈঋত, বরুণ, কুবের, ঈশান, দিকপাল, নবগ্রহ, নারদাদি ঋষি, জরৎকারু ও আস্তিক, নেতা, পদ্মা, গঙ্গা, মাতা-পিতা-র প্রতি প্রণতি-নতি করে বিপ্রদাস কাব্য রচনা শুরু করলেন।

৩. মনসার রূপ বর্ণনা—বিভিন্ন সাপের নাম, তারা কে কিভাবে মনসাকে প্রসাধিত করছে তার বর্ণনা। বাসুকি তাঁর কাছে শাস্ত্র পড়ে, অন্তত ও তক্ষক নৃত্য করে, সঙ্ক-মহাসঙ্ক জয়ধ্বনি দেয়।

৪. মনসার জন্মকথা— সংক্ষেপে। তারপর অনেক নাম। কোন নাম কিভাবে হল তার বর্ণনা।

৫. কাহিনীর সার চুম্বক বললেন কবি। পরিকল্পনা জানালেন। দেবতাদের মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠানে গঙ্গা রান্না করার জন্য এলেন, শান্তন ঋষির শর্ত ছিল রাতের মধ্যে তাঁর কাছে গঙ্গাদেবী ফেরৎ যাবেন—দেবতারা শর্ত মানতে ব্যর্থ হলেন, গঙ্গাকে শান্তন ফিরিয়ে দিলেন। শিবের গৃহে গঙ্গা থাকছেন, শিব-নিরঞ্জনের দেখা পাবার জন্যে কঠোর তপস্যা করতে থাকলেন। নিরঞ্জন ছল করে গঙ্গাকে দেখা দিলেন—গঙ্গা 'ধবলমুখী' হয়ে গেলেন!

কালিদহে মনসার জন্ম হল। চণ্ডীর সঙ্গে তীব্র বিবাদ হল। মনসা সিজুয়া পর্বতে নেতার সঙ্গে বসবাস করতে থাকলেন। কপিলার গর্ভ— গর্ভমোচন—মনোরথের জন্ম। ব্রহ্মার বীর্যে পরোক্ষে মহাব্যাঘ্রের জন্ম। মনোরথ-মহাব্যাঘ্রের দ্বন্দ্ব। তৃষ্ণার্ত বিজয়ী মনোরথ সমুদ্র শোষণ করায় কপিলার এক কোষ পরিমাণ দুগ্ধ দান—ফলে ক্ষীরোদ সমুদ্র সৃষ্ট হল। যজ্ঞ পাত্র পরিষ্কার করার জন্যে তেঁতুল আনয়নরত পাখির প্রতি দুর্বাসার দৃষ্টিপাত—তেঁতুলের স্পর্শে ক্ষীর সমুদ্র দইতে পরিণত হওয়া। সমুদ্র মন্থন শুরু হল। শেষে অসুররা অমৃত না পাওয়ায় দ্বিতীয়বার মন্থন—বিষপান করে শিবের মৃত্যু। মনসার মন্ত্রে তাঁর পুনর্জন্ম। মনসার বিষাধিকার লাভ— সাপদের বিষ বিতরণ।

মনসার বিবাহ। বিবাহ রাত্রে স্বামী তাঁকে ত্যাগ করলে অলৌকিক উপায়ে পুত্রলাভ। পুত্র আস্তিক জন্মেজয়ের যজ্ঞ পণ্ড করলেন—নাগদের রক্ষা করলেন। মনসার বিজয় অভিযাত্রা। রাখালদের মধ্যে পূজালাভ, হাসনের পুরী ধ্বংস করে সৈয়দের পূজালাভ। ধন্বন্তরী হত্যা। ধনা-মনা বধ। চাঁদের ছয় পুত্রকে খাদ্যে বিষপ্রয়োগ করে হত্যা। বেহুলা-লখিন্দরকে প্রসূত করা। চাঁদের পাটন যাত্রা। বেহুলা-লখিন্দরের বিবাহ। লোহার বাসরে কাল নাগিনীর লখিন্দরকে দংশন করে হত্যা করা। বেহুলার ভাসান যাত্রা। লখিন্দরের পুনর্জীবন লাভ। পুত্রবধূর উপরোধে চাঁদের মনসা পূজা। সংক্ষেপে এই কাহিনী বলে বিপ্রদাসের প্রতিশ্রুতি পরের সপ্তনিশি এ কাহিনী বিস্তারে বলবেন।

৬. আদিতে সমস্ত চরাচর 'কারণ'-জলে ছিল। গোসাঞি ছিলেন পবন-আকার। আদ্যাশক্তিকে সৃষ্টি করে গোসাঞি জগৎ সৃষ্টি করলেন। দৈত্যদের হত্যা করলেন চণ্ডীরূপী দেব নারায়ণ।

দৈত্যসুই যজ্ঞ হবে। গঙ্গাকে রান্নার ভার নিতে হবে। শিব গেলেন শান্তনু ঋষির কাছে। শান্তনু ঋষির শর্ত— দিনে দিনে ফিরতে হবে গঙ্গাকে। রান্নার কাজে রাত কেটে গেল। শান্তনু গঙ্গাকে ঘরে নিলেন না। শিব তাকে নিজপুরে রেখে সারা বছর জপ করতে লাগলেন।

৭. শিবের সাধনার বিস্তৃত বিবরণ।

৮. নিরঞ্জন এলেন শিবের গৃহে। শিবের গৃহে একাকিনী গঙ্গা। নিরঞ্জনকে দেখামাত্র তার মুখ সাদা হয়ে গেল। সেই থেকে গঙ্গা ধবলমুখী।

৯. গঙ্গা নিরঞ্জনকে থাকতে অনুরোধ করলেন। তাকে দেখার জন্যেই শিবের তপস্যা। ধর্মঠাকুর গঙ্গার অনুরোধ মানলেন না। চলে গেলেন। অন্তরীক্ষ থেকে ধর্মের নির্দেশ শোনা গেল— শিব যেন কালিদহে চলে যান।

১০. গঙ্গা কেন ধবলমুখী হয়েছেন, সেকথা জিজ্ঞাসা করলেন শিব। গঙ্গা সব কথা বলতে লাগলেন।

১১. গঙ্গার মুখে সব সংবাদ শুনে, ধর্ম নিরঞ্জনকে তিনি সাক্ষাৎ করেছেন জেনে সব দেবতারা দলবদ্ধ হয়ে গঙ্গাকেই দেখতে এলেন। তারা গঙ্গাকে শ্রদ্ধা জানালেন। মহাদেব তাকে মাথায় ধারণ করলেন। ধর্মের কথা মান্য করে চললেন তিনি কালিদহে।

১২. নিত্য শিব কালিদহে যান। পার্বতী চাইলেন একদিন তার সঙ্গে যাবেন। শিব নিষেধ করলেন। কালিদহ কঠিন ঠাঁই। যাওয়ার দরকার কি।

১৩. পার্বতী অভিমান করলেন। ছদ্মবেশ ধারণ করে তিনি খেয়া-পারাপারকারিণী সাজলেন। ভাঙা একটি নৌকো নিয়ে তৈরি হয়ে বসলেন তিনি। তাঁকে দেখে মহাদেব কামমোহিত হলেন। মিলন প্রার্থনা করলেন তিনি। পার্বতী কপট ছলনার দ্বারা তাঁকে নানাভাবে নিরস্ত করতে থাকলেন। নৌকোয় চেপে শিব পার্বতীর হাত চেপে ধরলেন।

১৪. কামমোহিত মহাদেবকে পার্বতী বলতে লাগলেন অতি হীন জাতির নারী তিনি। অস্পৃশ্যাকে স্পর্শ করলে অখ্যাতি হবে। দেবতার সঙ্গে মানুষের রতিক্রিয়া অসম্ভব—তাতে আবার নৌকোর ওপর। আমার স্বামী জানলে আমার নাক-কান কাটবেন, আমাকে এমন অনুরোধ করলে বরং আমি নদীতে ঝাঁপ দেব।

১৫. শেষে রত্ন অঙ্গুরি প্রার্থনা করলেন পার্বতী। শঙ্করের রত্ন-অঙ্গুরি নিয়ে রতিরঙ্গের পর মহাদেবী শিবকে আত্মপরিচয় দিলেন। অসম্ভব লজ্জা পেলেন শিব। মুষিক রূপ ধারণ করে তিনি পার্বতীর কাঁচুলি ছিন্নভিন্ন করলেন। বৃদ্ধ কুশলীর রূপ ধরে এবার তিনি গেলেন পার্বতীর কাছে। অনন্যতুল্য কাঁচুলি তৈরি করে দিলেন। শর্ত থাকল—তিনি কাঁচুলি তৈরি হয়ে যাবার পর পার্বতীকে যা চাইবেন দিতে হবে। পার্বতী শেষে এই শর্তানুসারে—ছদ্মবেশী শিবকে বাধ্য হয়ে রতিদান করলেন। এইভাবে মহাদেব চণ্ডীর ব্যবহারের শোধ তুললেন।

কালিদহে চক্রবাক, রাজহংসাদির মিলনদৃশ্য দেখে শিব কামমোহিত হলেন।

১৬. কামনায় অধীর শিব পদ্মপত্রে বীর্যপাত করলেন। এক বায়স দম্পতি সেই স্খলিত বীর্য ভক্ষণ করে সর্বাঙ্গের অসহ্য জ্বালায় কাতর হল।

১৭. সেই বায়স দম্পতি শিব-বীর্য উগরে ফেলল—পদ্মপুত্রর নাল বরাবর সেই বীর্য গিয়ে পড়ল বাসুকির মাথায়।

১৮. মনসার জন্ম দিলেন নির্মাণি। ধ্যানযোগে নির্মাণি জেনে নিলেন সবকথা। প্রথমে শরীর নির্মিত হল। তারপর জীবন্যাস করলেন। নাম রাখলেন মনসা। বাসুকির কাছে নির্মাণি মনসাকে

নিয়ে গেলেন। বললেন, আমি নির্মাণ করেছি, সুতরাং এ তোমার ভগিনী। শিবের বীর্যে এর জন্ম, নাম মনসা—নিরঞ্জনের অবতার। বাসুকি জননীর কথা শুনে মনসাকে বিষের জন্মকথা শোনালেন। বিষের অধিকার দিলেন তাকে, উনকোটী নাগের অধিকারিণী হলেন মনসা। মনসাকে বিষাধিকার আর নাগদের উপর শাসনের অধিকার দিয়ে বাসুকি কালিদহে রেখে এলেন।

১৯. সকালে পুষ্পবন লণ্ডভণ্ড দেখে শিব সক্রোধে গরুড়কে ডাকলেন। গরুড় নাগদের হত্যা করতে লাগল। ভীতত্রস্ত নাগরা তাকে স্তুতি করলে গরুড় আত্মপরিচয় দিয়ে বলল নাগ-গরুড় ভাই হলেও কেন পরস্পরের শত্রু। কিভাবে গরুড় নারায়ণের বাহন হয়েছে—সেসব আদ্য কথা বলল সে।

২০. কালিদহে সাপেদের ক্রমাগত ভক্ষণ করছে গরুড়। কালিনাগিনী গিয়ে মনসাকে খবর দিল। মনসা কালিদহে উপস্থিত হলে শিব তাকে কামনার দৃষ্টিতে দেখতে লাগলেন। পূর্ব কথা স্মরণ করিয়ে পিতাকে নিরস্ত করলেন মনসা। শিবের অনুরোধে গরুড় সাপদের উগরে ফেলল—স্থির হল মাসে একটি করে নাগ তার বরাদ্দ হবে।

মনসা পিতার সঙ্গে যেতে চান। শিব রাজি নন। তিনি কুণ্ঠিত। উপরোধ রাখতে পুষ্পের সাজিতে করে নিয়ে গেলেন। আড়ালে সেই সাজিটি রাখলেন শিব। দুর্গা সন্দেহবশে খুলে দেখেন মনসা। তৎক্ষণাৎ গালমন্দ করতে লাগলেন—দিতে থাকলেন উত্তম-মধ্যম। কুশের আঘাতে মনসার একটি চক্ষু চিরদিনের মত নষ্ট হয়ে গেল।

২১. মনসা সৎ-মা পার্বতীর কাছে অনেক অনুনয়-বিনয় করলেন। পার্বতী কিছুমাত্র শান্ত হলেন না।

২২. পিতৃগামিনী বলায় মনসা বিষ দৃষ্টিপাত করতেই চণ্ডী মারা গেলেন। কার্তিক-গণেশ গেলেন শিবকে খবর দিতে। শিব এসে বড়ই কাতর হলেন। মনসা তাঁকে বললেন, এত কাতর হবার দরকার নেই, সৎ-মাকে তিনি বাঁচিয়ে দেবেন। শিবের অনুরোধে মনসা অমৃতলোচনে চাইলেন। পার্বতী বেঁচে উঠলেন। বেঁচে উঠেই আবার দ্বন্দ্ব। শিব বললেন মনসার এখানে আর থাকা চলবে না। মনসা অত্যন্ত বেদনার্ত হলেন।

২৩. শিব মনসাকে নিয়ে এলেন সিজুয়া পর্বতে। সেখানে মনসাকে নিদ্রাতুর অবস্থায় রেখে চলে যাবার উপক্রম করতে শিবের মনে মায়া জন্মাল— চোখের জল পড়ল তার। সেই অশ্রু থেকে জন্ম হল নেতার। শিব নেতাকে মহাজ্ঞান দিলেন। মনসার সঙ্গী হিসেবে রাখলেন তাকে। তাঁর কপালে ঘাম জন্মাল। ধামাইকে সৃষ্টি করলেন শিব—কপালের ঘাম থেকে। ধামাইকে নির্দেশ দিলেন কন্যাদের পাহারা দেবার জন্য।

দ্বিতীয় পালা :

১. বিশ্বকর্মা হনুমানের সাহায্যে মনসার জন্যে পুরী নির্মাণ করলেন। পুরী নির্মিত হলে বিশ্বকর্মা পাবণ্ডীর দেশে বাণ মারলেন। দলে দলে মনসার রাজ্যে এসে বসতি করল।

২. সখীদের নিয়ে মনসা পরম আনন্দে সরোবরে জলকেলি করতে লাগলেন।

৩. গন্ধর্ব কুমারী বীণালতা ব্রহ্মার সামনে দিয়ে যাবার সময় ব্রহ্মার শুক্রপাত হয়। সেই শুক্র থেকে সাতশো ঋষির জন্ম হল। তারা তপোবনে চলে গেলেন। এবার জন্মাল দুই কুমার—সপ্তমুখ তাদের, লেজযুক্ত। তাদের সিজুয়া পর্বতে পাঠালেন ব্রহ্মা। ব্রহ্মা শুক্রপাত স্থলে জল ঢাললেন—দুরন্ত ব্যাঘ্র জন্মাল সেই জল থেকে। ব্রহ্মা তাকে বললেন, কপিলার সন্তানের হাতে পরাজিত হয়ে গন্ধর্ব হয়ে যাবে সে।

দেবতাদের যজ্ঞ শুরু হল। চণ্ডী গেলেন রন্ধন করতে। শয়ন করেছেন চণ্ডী। এমন সময় তাঁর বসনের বাইরের কনিষ্ঠ অঙ্গুলি দেখে ব্রহ্মার চন্দ্র টলল। চণ্ডীর গর্ভে ব্রহ্মার চন্দ্র প্রবেশ করল। দেবী সেকথা জানলেন—ধ্যানযোগে। দেবতাদের যজ্ঞে তিনি রাঁধতে লাগলেন। সেখানে মহামায়ার রূপে সিদ্ধরা মোহগ্রস্ত হলেন। তাকে ছলনা করতে গোর্খনাথ তার গর্ভে প্রবেশ করে দ্বাররুদ্ধ করে দিলেন। দেবী দুর্গা বল্লুকার তীরে গর্ভপাত করলেন। পৃথিবীতে সেই থেকে গর্ভ পাত শুরু হল। ব্রহ্মার বীর্য-সহ সেই পতিত গর্ভের জল কপিলা পান করে তার গর্ভাধান হল। সন্তান হল তার— মনোরথ।

একটি চোরাগাই এসে কপিলাকে দুবরাজ নামক ব্রাহ্মণের কাছে নিয়ে গেল। সেখানে লুকিয়ে শাক খেতে গিয়ে ধরা পড়ল কপিলা। চোরাগাই পালাল। দ্বিজ কপিলাকে ধরে তার হেমঘণ্টা কেড়ে কাঠের ঘণ্টা পরিয়ে দিলেন। কপিলা কাঁদতে থাকল।

৪. সদ্যোজাত সন্তান মনোরথের কথা মনে পড়ল তার। দুষ্টের সঙ্গে থাকার জন্যেই এত লাঞ্ছনা—এইরকম ভাবল কপিলা।

৫. কপিলার চোখের জল মনি-মাণিক্য হয়ে পড়তে থাকল। দুববাজ তা দেখে কপিলার বন্ধন খুলে দিলেন। হেমঘন্টা ফিরিয়ে দিলেন। কপিলা চলল পুত্রের কাছে। পথে এল সেই মহাব্যাঘ্র। সঙ্গে দুই শিশু। ব্যাঘ্র কপিলাকে খেতে চায়। মনোরথকে দুগ্ধ দান করিয়ে ফিরে আসার শর্তে মুক্ত কপিলা বল্লুকার তীরে তৃষ্ণার্ত মনোরথের কাছে গেল। মনোরথ জানতে পারল। দুগ্ধপান না করেই চলল মহাব্যাঘ্রকে নিধন করতে। দু'জনের প্রবল যুদ্ধ হল।

৬. মনোরথ-ব্যাঘ্রের প্রবল যুদ্ধ।

৭. ব্যাঘ্র মারা গেল। গন্ধর্ব হয়ে গেল। শাবক দুটি থেকে জন্ম নিল এখনকার বাঘ।

৮. (মনোরথ সমুদ্র শোষণ করল) জলজন্তুরা মারা যেতে থাকল। শিব ধ্যানযোগে সেকথা জানার পব সিন্ধুতীরে এলেন। নারদ বললেন কপিলাকে আনার কথা। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর কপিলাকে আহ্বান করলেন।

৯. কপিলা এককোষ পরিমাণ দুগ্ধ দান করতে সমুদ্র আগের মত হয়ে গেল।

১০. ব্রহ্মা সমুদ্রতীরে তর্পণের অবসরে তাম্রপাত্র পরিষ্কার করার জন্য টিয়াপাখি সৃজন করে তেঁতুল আনতে পাঠালেন। তেঁতুল আনছে টিয়া— দুর্বাসা তা তার কাছে চাইলেন। টিয়া অস্বীকৃত হলে দুর্বাসা অভিশাপ দিলেন। তেঁতুল-সহ টিয়া পড়ল ক্ষীর সমুদ্রে। ক্ষীরোদ সাগর দই হয়ে গেল।

দুর্বাসা এদিকে কৈলাস ভ্রমণ করতে লাগলেন—বিদ্যাধরীরা তাকে পারিজাত মালা দান করল। মালাটি ইন্দ্রকে দান করলেন দুর্বাসা। ইন্দ্র সেই মালা ঐরাবতের শিরে রাখলেন ; সেখান থেকে দৈবযোগে মালাটি খসে পড়ল মাটিতে। দুর্বাসা মালাটিকে অপমান করার জন্যে অভিশাপ দিলেন—ইন্দ্রপুরী লক্ষ্মীছাড়া হবে।

১১. লক্ষ্মী ইন্দ্রপুরী ত্যাগ করলেন। ফল হল সর্বাতিশয়ী।

১২. লক্ষ্মীর সঙ্গে ধ্যানাদি শস্য, চন্দ্র, অমৃত, ঐরাবত, উচ্চশ্রবা, পারিজাত চলে গেল সমুদ্রে। সমুদ্রমন্থন করতে হবে। মন্দার মন্থন দণ্ড, শিব খোটাগাড়ি, বাসুকি টানাদড়ি হল। নারায়ণ কূর্মরূপে পৃথিবী ধারণ করলেন। বাসুকির মুখের দিকে দৈত্যরা আর লেজের দিকটা ধরল হনুমান।

১৩. মন্থনের পর লক্ষ্মীসহ সমস্ত সম্পদ ফিরে এল। অমৃত নিয়ে উঠলেন ধন্বন্তরী।

১৪. বিষ্ণু অংশে ধন্বন্তরীর জন্ম। মৃত্যু হবে কিভাবে— বললেন সে কথা। জয়নেত সিদ্ধঝুলি যদি মনসা হরণ করেন, উদয়কাল যদি বক্ষে কামড় দেয়, বিষহরি যদি 'মহাভার' দেন, তবে তার মৃত্যু হবে। প্রতিকার—শালি বিশালি গাছ (গন্ধমাদন পর্বত থেকে আনতে হবে) থেকে পুনরায় বাঁচবেন ধন্বন্তরী। অন্যথায় ক্ষীরোদ নদীর ফেনা ঘা মুখে দিলেও বাঁচবেন ধন্বন্তরী। তার মতো ওঝা ভূমণ্ডলে নেই।

১৫. মন্থনজাত অমৃত দৈত্যেরা নিয়ে পালাল। বিষ্ণু নারী রূপ ধারণ করে তাদের ছলনা করে নিয়ে এলেন অমৃত। দেবতারা অমৃত বন্টন করলেন—শিব তা গ্রহণ রাজি হলেন না। তিনি দ্বিতীয়বার মন্থন করতে চান। ব্রহ্মার নিষেধ মানলেন না শিব। বঞ্চিত দৈত্যেরা তার সঙ্গী হবে।

তৃতীয় পালা :

১. দেবতাদের বারংবার সনির্বন্ধ অনুরোধ মানলেন না শিব।

২. মন্থনজাত বিষ পূর্বপ্রতিশ্রুতি অনুযায়ী গ্রহণ করতে হবে শিবকে।— হনুমান বললেন।

৩. শিব বিষপান করলেন। ঢলে পড়লেন। নারদ গেলেন পার্বতীর কাছে। পার্বতী মুক্তকেশে এসে পড়লেন ক্ষীরোদ সাগর তীরে।

৪. পার্বতী খেদ করতে লাগলেন। শেষে অনুমৃতা হবার উদ্যোগ নিলেন।

৫. একই ভাবে খেদ ও অনুমৃতা হবার ইচ্ছা প্রকাশ করতে লাগলেন পার্বতী।

৬. পদ্মা দুর্গার কাছে মনসার দেওয়া অভিজ্ঞান রত্ন এনে দিলে দুর্গার মনে পড়ল সৎ মেয়ের কথা। মনসার কাছে গেলেন নারদ। মনসা ধ্যানযোগে জানলেন সব। তার কুটিরটি যথাসম্ভব জীর্ণ করে দিলেন তিনি। নারদ যেতেই দুঃখ দ্বিগুণিত হল তাঁর।

৭. পিতার দুঃসংবাদে মনসা বেদনার্ত। নারদ তাকে তার প্রতিশ্রুতি স্মরণ করালেন। এভাবে প্রায় বস্ত্রহীন অবস্থায় দেবসভায় মনসা যাবেন কি করে। মনসার অনুরোধ সৎমা চণ্ডী যেন তার জন্য কাপড় নিয়ে এসে দেখা করেন।

৮. চণ্ডী প্রাণে ধরে ভাল কাপড় দিলেন না। মনসা রাজরাজেশ্বরীর মতো সেজে থাকলেন। মনসা সৎমার দেওয়া বস্ত্র লুকিয়ে নিয়ে এলেন দেবসভায়। সৎমার ছোট মনের প্রমাণ নিয়ে দেবতাদের দেখালেন মনসা। মনসাকে দেবতারা তুষ্ট করতে চাইলেন। মনসাকে রুখে এলেন চণ্ডী। বিষদৃষ্টিতে পার্বতীর দিকে তাকে তিনি ঢলে পড়লেন। শিবকে তুলে নিয়ে মনসা মন্ত্র পড়তে লাগলেন।

৯. মনসার মন্ত্রজাত।

১০. বিষ উগরে দিলেন শিব। মনসা সোনার থালায় বিষ রেখে জুখে দিলেন সমস্ত সাপকে। সব শেষে এল ধামাই। তাকে লেজ আছড়ে 'বিষকন্টকী' থেকে সম্ভব মতো বিষ গ্রহণ করতে বললেন মনসা। একটুখানি বিষ রাখলেন নিজের বাঁ চোখে।

শিব তখন পার্বতীকে বাঁচানোর জন্য অনুরোধ করলেন। প্রথমে রাজি না হলেও পরে মনসা সৎমাকে বাঁচিয়ে দিলেন।

কন্যাদের বিয়ে দেবার কথা ভাবলেন শিব। জরৎকারুকে ডেকে পাঠানো হল। জরৎকারু বিয়ে করতে চাইলেন না।

১১. তপোভঙ্গ করার ইচ্ছা তাঁর নেই।

১২. তখন আকাশবাণী হল। জরৎকারুর পিতৃপুরুষরা তাকে বিয়ে করতে বললেন। বিয়ের উদ্যোগ শুরু হল।

১৩. বিবাহের বিস্তৃত বিবরণ।

১৪. ঐ

১৫. চণ্ডী জরৎকারুকে নাগভয় দেখালেন। মনসাকে বললেন নাগবেশ ধারণ করতে। গোপনে বাসরঘরে ব্যাঙ পাঠিয়ে দিলেন চণ্ডী। সাপরা গর্জন করতে শুরু করল। রাত্রে জরৎকারু ভয়ে পালিয়ে গেলেন। সমুদ্রে শঙ্খের গর্ভে লুকিয়ে পড়লেন জরৎকারু।

১৬. মনসা বিলাপ শুরু করলেন।

১৭. কুরলপক্ষের রূপ ধরে মনসা গেলেন সমুদ্রে। কুরলপক্ষ দেখে শঙ্খ জলে ভেসে উঠল। ঋষিকে উদ্ধার করে মনসা সন্তান প্রার্থনা করলেন। জরৎকারু মনসার গর্ভে হাত দিয়ে বললেন— সন্তান হবে তাঁর। আস্তিক সেই সন্তানের নাম।

চতুর্থ পালা :

১. সর্পসত্র যজ্ঞের পূর্বকথা বললেন বিপ্রদাস। পরীক্ষিৎ কেমন করে ব্রহ্মশাপগ্রস্ত হলেন। সাতদিনের মধ্যে সাপের কামড়ে মরবেন পরীক্ষিৎ। রাজার পাত্রমিত্র তখন সঙ্ক ধন্বন্তরীর কথা বললেন। সঙ্ক ধন্বন্তরীর নাম কেন সে কথা সংক্ষেপে বললেন তারা। সঙ্ক ধন্বন্তরীকে এনে প্রাসাদে রেখে নিশ্চিত মনে থাকলেন পরীক্ষিৎ। সপ্তম দিবসে নাগ চলল পরীক্ষিৎকে হত্যা করতে। নাগ আর কেউ নয়— তক্ষক।

২. তক্ষক ধন্বন্তরীর কাছে ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে গেল। ধন্বন্তরীর সঙ্গে শক্তি পরীক্ষার আস্ফালন জানাল তক্ষক।

৩. তক্ষক আর ধন্বন্তরী বিতর্কে অবতীর্ণ হল।

৪. প্রচুর ধনরত্ন দিয়ে শেষ পর্যন্ত ধন্বন্তরীকে নির্দেশ দিল তক্ষক—দু'জনের মিত্রতা হল; ধন্বন্তরী যেন আর না যায়। সপ্তম দিবসে পরীক্ষিৎ মারা গেলেন। সাড়ম্বরে শ্রাদ্ধ হল তার। জন্মেজয়কে পরীক্ষিতের স্থলাভিষিক্ত করা হল।

৫. মৃগয়ায় গেলেন জন্মেজয়। জয় নামক ব্রাহ্মণ বনে সাপ মেরে ফিরছেন—কারণ তার স্ত্রী-পুত্র সর্পাঘাতে মারা গেছে। জন্মেজয় পিতার মৃত্যুর কথা বললেন জয়কে। দু'জনে সর্পসত্র যজ্ঞের পরিকল্পনা করলেন।

৬. সর্পসত্র যজ্ঞে জয় পুরোহিত হলেন।

৭. যজ্ঞের প্রস্তুতি শুরু হল।

৮. সর্পসত্র যজ্ঞের বিবরণ।

৯. সাপেরা বিপন্ন হয়ে মনসার কাছে, মনসা নেতার কাছে গেলেন। নেতার পরামর্শমতো আস্তিক যাত্রা করলেন যজ্ঞস্থলে। জন্মেজয়কে শর্ত দিলেন, শর্ত অনুসারে আস্তিককে হাতের আহুতি দান করলেন জন্মেজয়। তাঁর যজ্ঞ পণ্ড হল। সাপরা রক্ষা পেল।

১০. চাঁদ গন্ধবণিক। রাজার তুল্য তাঁর ব্যবহার। শিবকে তিনি তুষ্ট করে পেয়েছেন জয়নেত আর সিদ্ধঝুলি। পার্বতী তাঁকে বিশেষ পরামর্শ দিয়েছেন, মনসাকে যেন চাঁদ কিছুতেই শ্রদ্ধা না জানান।

১১. পৃথিবীতে কার কাছে পূজা প্রচার হবে—এ প্রশ্নের জবাবে নেতা বললেন চাঁদের পূজা পাওয়া জরুরি। পূজা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় মনসার বিজয়যাত্রা শুরু হল।

১২. লক্ষ লক্ষ রাখাল গোরু চরাচ্ছে। রথারোহণে আকাশপথে এই দৃশ্য দেখে প্রশ্ন করে নেতার কাছে জানলেন মনসা—দন্তবোড় মুনির কথা। তিনি কুশ-মূল পান করতেন। রাখালরা

জানতে চাইলে, দন্তবোড় মুনি মিথ্যা বলেন—তিনি মদ্যপান করছেন। এই মিথ্যাভাষণের জন্যে পাপ হল তাঁর। ক্ষীরোদ সাগর তীরে তপস্যা করতে করতে অন্যদিন অন্তরীক্ষে বসন শুকিয়ে নিতেন। আজ আকাশে বায়ুভরে থাকছে না। দন্তবোড় মুনি প্রথমে ক্ষুব্ধ হয়ে পবনের প্রতি তীব্র ক্ষোভ জানালেন। রাখালদের কাছে মিথ্যাভাষণ করেছেন, সেকথা মনে পড়ল তাঁর। তিনি গেলেন রাখালদের কাছে। তৃষ্ণার কথা বলে কুশ-মূল চাইলেন রাখালদের কাছে নচেৎ প্রাণরক্ষা হবে না। রাখালরা মুনির চাহিদা মেটায়। দন্তবোড তাদের মঙ্গল কামনা করলেন।

১৩. শিশু দেখে অবহেলা না করে প্রথমে রাখালদের পূজা গ্রহণ করুন— নেতার পরামর্শ।

১৪. মনসা শিশু রাখালদের মধ্যে বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর বেশে উপস্থিত হলেন। বললেন দু'দিনের উপবাসী তিনি, পারণা করতে হবে। রাখালরা তাকে ডাইনী বলে সন্দেহ করল। মনসা যদি সাপ দেখাতে পারেন, তারা তাকে পূজা দেবে। মনসা সাপ দেখাতে তারা ভীত-সন্ত্রস্ত হল। ডাইনী বলে ধারণা বদ্ধমূল হল। তারা মনসাকে তাড়াতে গেল, লাঞ্ছনা করল যথেষ্ট। মনসার মায়ায় গাভীরা 'নাবালে' নামতেই আর উঠতে পারল না। রাখালদের প্রধান পুরন্দর ঘোষ বলল অরিষ্ট গাভী, যে মোটেই দুধ দেয় না—তার যদি দুধ হয়, মনসাকে পূজা করবে তারা। গাভীটিকে ধামাই স্থকিত-প্রায় করল। পুরন্দর সহজেই দুধ দোহাল। চুবড়ি দুধে ভরে উঠল। রাখালরা পূজা করতে রাজি। পূজা পদ্ধতি জানানো হল এইবার।—

১৫. পূজা পদ্ধতি।

১৬. পূজা পেয়ে মনসা খুশি। রাখালগাছি নামের গ্রাম পত্তন হল। মনসা অন্তর্ধান হলেন। কাছেই তুরুকদের বসতি। হাসন-হুসন তার প্রধান। শত কৃষাণ চাষ করে। গোরামিনা তাদের প্রধান। গোরামিনার গোলাম চাষ করতে গেল। দেখল রাখালরা মনসা পূজা করছে। জল আনতে সেই পথে যাচ্ছে গোলাম—রাখালরা তাকে যথেষ্ট লাঞ্ছনা করল।

ক্রুদ্ধ গোরামিনা রাখালদের দিকে তেড়ে গেল। ঘট রেখে রাখালরা পালাল। ঘটের সামনে গোরামিনাকে দেখে মনসা বিঘতিয়া সাপকে কাঁচ পোকা করে ঘটে রেখে অন্তরীক্ষে থাকলেন। গোরামিনার গোলাম সিজডাল সরিয়ে ঘটের ভিতর দৃষ্টিপাত করল। অপূর্ব কাঁচপোকা দেখে উৎসাহী হল গোরামিনা। ইজারের ভিতর সযত্নে রাখল সেই কাঁচপোকা, ইচ্ছা—রাজাকে দেখাবে। মনসা বিঘতিয়াকে নির্দেশ দিলেন, একজনকে রেখে বাকি সবাইকে হত্যা করো। চাপ সহ্য করতে না পেরে বিঘতিয়া গোরামিনার পেটে বজ্রকামড় দিল।

১৭. গোরামিনার ৯৯ জন তুরুক কৃষাণ একে একে মারা গেল। তাদের একটা তালিকা তৈরি করলেন বিপ্রদাস। বাঁচল কেবলমাত্র ভাঁড়ু।

১৮. মনসা নিজে ঘট পেতে থাকলেন, হাসনের বিবির বাঁদিরা চলল জল ভরতে। মনসাকে অপমান করল তারা। টগরি বাঁদি ছাড়া মরল সবাই।

১৯. হাসনহাটির মুসলমানদের বাস্তবানুগ বিবরণ।

২০. খবর পেয়ে হাসনের সৈন্যসজ্জা। সৈন্যসামন্তের বিস্তৃত বিবরণ।

২১. হাসন সসৈন্য যাত্রার উদ্যোগ করলে তার স্ত্রী চাঁপাবিবি তাকে নিরস্ত করতে চেষ্টা করলেন। হাসন শুনলেন না। তার প্রতাপ প্রদর্শন চলল খানিকক্ষণ। কিন্তু মনসার কুবুদ্ধিতে দেবীর ঘট ভাঙলেন হাসন, তুলসীপাতা নিয়ে ঘাড়ে ঘষতে থাকলেন। তুলসী হয়ে পড়ল বিছুটি পাতা। জ্বালায় অস্থির হাসন চন্দন ঘষলেন। যন্ত্রণা আরও বাড়ল। চাঁপাফুল হল ভিমরুল। তবুও হাসনের বিরুদ্ধে মনসার ক্ষোভ কমল না।

২২. নাগদল চারপাশ থেকে ঘিরে ধরল হাসনহাটি।

২৩. হাজরা কোঠাগ্রি নামক বীর শাবল ছুঁড়ে মারল তক্ষককে। ব্যর্থ হয়। নাগ তাকে অস্ত্র-সহ গিলে ফেলল। মুসার ধানুকি নামক বীর ধনুঃশর নিয়ে আক্রমণ করতে এল, তাকেও তক্ষক জাঠাজাঠি সহ গিলে ফেলল। এবার মনসা বিঘতিয়াকে নির্দেশ দিলেন। বিঘতিয়া যেন হাসনকে রেখে বাকি সকলকে হত্যা করে।

২৪. বিঘতিয়ার কামড়ে হাসন ছাড়া সকলেই মারা পড়ল।

পঞ্চম পালা :

১. হাসন আর্তনাদ করতে থাকলেন।

২. মনসা দৈবজ্ঞের বেশে বিবিকে ছলনা করে বললেন 'বাড়জানা'-পথে একজন আসছে—তাকে আগুন ছুঁড়ে দিতে হবে। হাসনের চারপাশে সাপ। কেবলমাত্র বাড়জানা পথটি খোলা। ফলে যা হবার তাই হল। হাসনের লাঞ্ছনার আর কিছু বাকি থাকল না।

৩. ইনিয়ে-বিনিয়ে কাঁদতে থাকলেন বিবি।

৪. তুরুকরা মনসাকে গালমন্দ দিতে থাকল। কুপিত হয়ে মনসা বিঘতিয়াকে আবার নির্দেশ দিলেন—দশজন ছাড়া সমস্ত তুরুককে হত্যা করো।

৫. তুরুকদের বিচিত্র ব্যবহার বর্ণনা করলেন বিপ্রদাস। বড়মিঞা মরেছে। তার গোলামের ইচ্ছা তার বিবিকে নিয়ে পালাতে চায়। মুরগিকেও ছাড়েনি বিঘতিয়া। সেই মুরগি কোলে ন'কড়ির খেদ—আজ বা কাল ডিম পাড়ত সেই মুরগি।

৬. হাসনহাটির সব তুড়ুক মারা গেল।

৭. মনসা এবার হাসনকে কৃপা করলেন। হাসন দেবীপূজা করলেন। যারা বেঁচেছিল তারা সবাই মিলে মনসার পূজা করল।

৮. হাসনের রাজপুরী, রাজধানী পুনরায় পত্তন করার বিস্তৃত বিবরণ দিলেন বিপ্রদাস।

৯. মহামহোপাধ্যায় নিযুক্ত করে সাড়ম্বরে পূজা করলেন হাসন। হাসনকে বর দিলেন মনসা। হাসনহাটির সকলে বেঁচে উঠল। সিজুয়া পর্বতে মনসা রথযোগে মহানন্দে ফিরে গেলেন।

১০. একদিন রথযোগে চম্পক নগরীতে ভ্রমণ করতে করতে মনসা দেখলেন চাঁদরাজা গুরুকৃত্য করছেন। জালু-মালু অনুষ্ঠানের জন্যে মাছ ধরছে। চম্পক নগরীতে যাবেন—এমন ব্রাহ্মণীর বেশে মনসা তাদের পার করাতে বললেন। জালু-মালু তাতে রাজি হল না। উপরন্তু রাক্ষসী ডাইনী বলে অপমান করল। প্রহর জুড়ে জল ফেলে নদীতে একটাও মাছ পেল না তারা। তখন তারা মনসার প্রতি শ্রদ্ধাবনত হয়ে তাকে নৌকায় তুলল। এবার প্রচুর মাছ তুলতে পারল তারা। মনসা আবার জাল ফেলতে বললেন—উঠল মনসার স্বর্ণবারি। তারা মনসার পা জড়িয়ে ধরে প্রার্থনা করলেন—নৌকো তাদের সোনায় ভরে উঠুক। নৌকায় স্বর্ণবৃষ্টি হল। জালু-মালুর মা নিছনি দেখলেন তাদের বাড়িতেও স্বর্ণবৃষ্টি হচ্ছে! নিছনি এই আশ্চর্য ঘটনার কথা পুত্রদের বলবেন, এজন্য নদীর ঘাটে আসতে দেখেন নৌকায়ও স্বর্ণবৃষ্টি হচ্ছে। তখন তার স্বর্ণবারি নিয়ে সোনার সিংহাসনে স্থাপন করে সাড়ম্বরে পূজা করল। সনকা এদিকে শনিবার-অমাবস্যা ব্রত করছেন ছয় বধূদের নিয়ে। জালু-মালুর বাড়িতে ধুমধাম শুনে খবর নিতে পাঠালেন দাসী ঝাউয়াকে। ঝাউয়ার কাছে সংবাদ পেয়ে সনকা মনসা পূজা দেখতে এলেন জালু-মালুর গৃহে। নিছনি সনকাদেবীর চরণ বন্দনা করে নিয়ে গেলেন।

১১. সনকা নিছনির কাছ থেকে মনসা পূজার পদ্ধতি জেনে নিলেন। সনকা মনসা পূজার প্রতিশ্রুতি দিলেন। জ্যৈষ্ঠ দশমী, দশহরার পূজা—সিংহাসনে সিজ-সুদ্ধ বারি স্থাপন করে মহিলাদের মঙ্গল গান।

১২. সনকা নিছনির পরামর্শমতো মনসার বারি সাজালেন, পূজারম্ভ করলেন। নেড়া ঝাউয়া দাসী চাঁদকে খবর দিলে তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে হেতালের দণ্ড দিয়ে মনসার বারি ভেঙে ফেললেন। সনকা সকাতরে স্বামীর কাজের সমালোচনা করলেন। নিছনি মনসার বারি নিয়ে এলেন। চাঁদ মহাদাম্ভিক— তার বিচিত্র আস্ফালনে মনসা চিন্তিত হলেন। নেতা পরামর্শ দিলেন, চাঁদের মহাজ্ঞান আছে বলেই তার এত অহঙ্কার। তাঁর প্রিয় সুরম্যবাগান নখরা ধ্বংস করতে হবে। নাগদল কাটারি নিয়ে নাখরার সমস্ত গাছ ধ্বংস করল। চাঁদের লোকজন তাকে খবর দিল। চাঁদ এসে মহাজ্ঞান জপ করে, জয়নের্তের আচ্ছাদন দিয়ে নাখরা জীবন্ত করে তুললেন। মনসাকে ক্রমাগত গালাগাল দিতে থাকলেন চাঁদ। বিমর্ষ হলেন মনসা। নেতা পরামর্শ দিলেন—চাঁদের শালীর রূপ ধরে ছলনা করে মহাজ্ঞান হরণ করতে হবে। মনসা বিমর্ষ বোধ করলেন—ছলনা করতে হবে তাকে! তখন নেতা বললেন কংস বধ করতে কৃষ্ণ গোপ সেজেছেন, সীতা উদ্ধার করতে গিয়ে রামচন্দ্র বানরের মিত্র সেজেছেন—দময়ন্তীর স্বামী নল অশ্বপাতির ঘরে থাকতে বাধ্য হয়েছেন, রাজারাণী দুজনেই বহু দুঃখ সহ্য করেছেন। মনসা নেতার প্রবোধ বাক্য শুনে সুবেশ করতে থাকলেন।

১৩. মনসা প্রচুর সাজসজ্জা প্রসাধন করে পরমা সুন্দরীর বেশে চাঁদকে ছলনা করার উদ্দেশ্যে গিয়ে উপস্থিত হলেন চাঁদের অন্তঃপুরীর নিকটবর্তী রামেশ্বরের ঘাটে।

১৪. ছলনা করে কাঁদতে লাগলেন মনসা। সনকাকে পরিচয় দিলেন—গন্ধবণিকের ঘরের মহেশ দত্তের কন্যা, মাতা মহেশ্বরী, নাম মেনকা। স্বামী তাকে একলা রেখে চলে গেছেন। সনকা তাকে বোন বলে ডেকে নিয়ে গেলেন। চাঁদ তাকে দেখে কামমোহিত হলেন। সনকার কাছে তাঁর আকুল প্রার্থনা— মেনকার রতিসুখ পেতে চান তিনি। দুঃখী মেনকার কাছে এই অযৌক্তিক প্রস্তাব দিতে সনকা প্রথমে রাজি হন না। পরে চাঁদের আগ্রহাতিশয্যে মেনকাকে বললেন সব কথা। মেনকা রাজি। চাঁদের শয়ন মন্দিরে গিয়ে মেনকা তাঁকে মহাজ্ঞান জানাতে বললেন। চাঁদ দ্বিধা করে শেষ পর্যন্ত তাঁর মহাজ্ঞান জানাতে উদ্যত হলেন। মহাজ্ঞান জানালেন, জয়নেত দিলেন। মনসা চাঁদের জটা ছিঁড়ে শূন্যে উড়লেন। চাঁদ হতজ্ঞান হয়ে কাঁদতে লাগলেন। সনকা তাকে বললেন—তিনি আগে থেকেই এরকম বিপদ যে আসন্ন তা জানতেন। মনসা এবার নখরা কেটে পালালেন।

ষষ্ঠ পালা :

১. মনসা সর্পাভরণ করে চাঁদকে স্বপ্নে ভয় দেখাতে লাগলেন। চাঁদ পাত্রমিত্রদের নিস্তার পথ জানাতে বললেন। পাত্ররা শঙ্কর ধন্বন্তরীর কথা বললেন। তাকে ডাকতে বললেন। শঙ্কর বা সঙ্ক ধন্বন্তরীর প্রতাপ ভীষণ। ধবল পর্বতে হিমা নদীর তীরে মহাসঙ্ক ওঝার কাছে শঙ্কর তার প্রতাপের পরিচয় দিয়েছেন। গৌড় আদি সব দেশ বিজয় করে সঙ্কের খ্যাতি শুনে শঙ্কর তাঁকে দ্বন্দ্বে আহ্বান করল। সঙ্ক চর-মুখে তার আগমন শুনে গেছেন হিমা নদীর তীরে। দুই ওঝা শক্তি পরীক্ষায় বসলেন। শর্ত—সঙ্ক হারলে সশিষ্য পাতালবাসী হবেন। তার কন্যা কমলাকে দান করবেন। শঙ্কর হিমা নদী শুকিয়ে দিলেন। সঙ্ক ওঝা নদীতে জল সঞ্চার করতে পারলেন না। শঙ্কর এবার জলপূর্ণ করলেন নদী। তখন সঙ্ক তাঁকে কন্যাদান করে চলে গেলেন নাগপুরী। সঙ্ককে পরাজিত করে সঙ্কর সঙ্ক নাম গ্রহণ করলেন। চম্পক নগরের দূতরা গিয়ে তাকে ডেকে

আনল। চাঁদ তার দুঃস্বপ্নের কথা বললেন। নাখরা বাঁচিয়ে দিতে বললেন। সঙ্ক ধন্বন্তরীর সঙ্গে শত শিষ্য—'ছত্রিশ বানা নাগের ঝাপান'। প্রবল প্রতাপ ও অহঙ্কারে তাকে ভয়াবহ দেখাতে থাকে।

২. সিজুয়া পর্বতে মনসা নেতোর সঙ্গে বিমর্ষ হয়ে কথাবার্তা বলতে থাকলেন। সঙ্ক ধন্বন্তরীর বর্ণনা ও আচার-আচরণের কথা বলতে থাকলেন। পরম দুঃখিনী মনসা।

৩. নেতা পরামর্শ দিলেন—মালিনীর রূপ ধরে বিষ-পুষ্পে মারতে হবে সকলকে। ভেদাভেদ মহাবিষ দিতে হবে ফুলে।

৪. বিচিত্র বেশ ধরে মনসা মালিনী সেজে চললেন। সঙ্ক ওঝার শিষ্যদের ছলনা করবেন তিনি।

৫. মালিনীর উপস্থিতি দেখে সবাই তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করল। পুষ্পের মূল্য জিজ্ঞাসা করল। মনসা ভাবলেন সঙ্কের সঙ্গে বিবাদে পাছে অন্যরা মারা যায়, তাই পণেক মূল্যের ফুল চারপণ দাম হাঁকলেন। সবাই ফুলের দাম অসম্ভব চড়া বলে চলে গেল। মনসা পসার গুটিয়ে নিলেন। চললেন সঙ্ক ওঝার পাড়ায়।

৬. সরোবর তীরে মনসা পসার সাজিয়ে বসলেন। শত শিষ্য, বিচিত্র সুবেশ করে পসারিণীর কাছে এসে তার রূপে মোহিত হল। মনসা খুশি। ফুলের দরদাম করতে থাকল তারা। দর শুনে ক্ষুব্ধ শিষ্যরা তার পসার লুট করে নেবার কথা ভাবল। মনসা তাতে আরও খুশি হলেন।

৭. শত শিষ্য হত্যা করে মনসা পসার তুললেন। এমন সময় ধন্বন্তরী ধনা-মনাকে সঙ্গে নিয়ে নগর ভ্রমণে বের হলেন। মনসা তেমাথায় থাকলেন। ধন্বন্তরীর কাছে তাঁর অভিযোগ ধন্বন্তরীর শিষ্যরা তাঁর পসার লুটে নিয়েছে। লাঞ্ছনা করছে। ধন্বন্তরী তাকে সান্ত্বনা দিলেন, মনসা অন্তরীক্ষে গমন করলেন। ধনা-মনার সঙ্গে ধন্বন্তরী এসে দেখলেন তার বালক শিষ্যদের দেখে বললেন, আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব—কিন্তু সমস্যা শিশুদের মারলেন কেন? শিষ্যর জয়নেত ধনা-মনার সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতেই মৃত শতশিষ্য বেঁচে উঠল। মনসা ত্রস্ত হলেন।

৮. শিষ্যরা বেঁচে ওঠার পর ধন্বন্তরী জিজ্ঞাসা করে জানলেন সব কথা। চাঁদের কাছে গিয়ে বললেন সেই সমস্ত। চাঁদ ক্ষুব্ধ। বললেন, কোথায় কানি মনসা, তাকে ধরে আনতে হবে। চারপাশে সৈন্য সাজাও। মনসাকে অবশ্য ধরা গেল না। তিনি রথে ভর করে শূন্যমার্গে চলে গেছেন। নেতোর কাছে গিয়ে মনসা জানতে চাইলেন ধন্বন্তরী বধের উপায়। নেতার পরামর্শে গোয়ালিনী রূপে কমলা নাম নিয়ে যেতে হবে, সঙ্কের স্ত্রীর সঙ্গে সহেলা পাতাতে হবে। নেতা খুড়ির রূপ ধরে পসার সাজিয়ে সেখানে যাবেন।

৯. অপূর্ব সজ্জা করলেন মনসা— নেতার মাথায় পসার সাজিয়ে রেখে আগে আগে তাঁর যাত্রা।

১০. দধি দুগ্ধ বিক্রি করতে গেলেন মনসা। তাকে দেখে সঙ্কের স্ত্রী কমলা দাম জিজ্ঞাসা করলেন। দধির দাম পঞ্চাশ'কাহন। কমলা হাসলেন। এত দাম হয় নাকি দধির। তোমার দই কিনব না। তুমি কি দই বিক্রি করছ, না—রতির হাব্যাসে ঘুরে ফিরছ? আহির রমণী হয়ে কুলটার মতো ব্যবহার তোমার! দেবীর মায়াবি সম্ভাষণ—একথা বলছ! সঙ্ক-ধন্বন্তরী থাকতে আমার পসার লুটে নেবে কে? সঙ্কের স্ত্রী বললেন, তুমি আমার স্বামীর নামে অহঙ্কার করছ। মনসা বললেন—তোমার স্বামী ধন্বন্তরী! এবার তিনি দুঃখ প্রকাশ করলেন। বললেন, দধি নিয়ে যাও, টাকা দিলে দিতে পার, না দিলেও ক্ষতি নেই। কমলা মনসার নাম জিজ্ঞাসা করলেন—আর

পরিচয়। মনসা ছলনা করে বললেন, তাঁর পিতা মহেশ্বর ঘোষ, মাতা গৌরী, সঙ্গে খুড়ি— তার নাম কমলা। শুনে কমলা 'সই' 'সই' বলে উঠলেন। সহেলা পাতাবেন তিনি।

১১. চাঁদকে বিদায় দিয়ে ঘরে এসে সুন্দরী নারীকে দেখে সঙ্ক অবাক। মনসা তাকে কামবাণে আহত করলেন। পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন সঙ্ক। মনসা বললেন, তাঁর বাড়ি কাঞ্চী গ্রামে, এসেছেন দধি বিক্রি করতে। তার স্ত্রী তাকে সই করেছেন। কথাবার্তায় আরও আসঙ্গ-কামনা হল সঙ্কের।

১২. রন্ধন ভোজন করতে বললেন সঙ্ক। মনসা অরাজি। তার স্বামী অতিখরতর। সঙ্ক বললেন, তোমার কোন ভয় নেই। তোমার স্বামীকে দাসের মতো করে দেব। মনসা তখন ঝড়-বাদল ঘন আবহাওয়া করলেন। কমলা তাকে রাত্রে থেকে যেতে বললেন। সঙ্ক শয্যায় গেলেন। কমলাকে মনসা বললেন তোমার স্বামী বড় ওঝা সন্দেহ নেই। কিন্তু তুমি নিশ্চয় কিছু বিদ্যা জানো। তোমার কাছে আমি সেই বিদ্যা শিখতে চাই। কমলা বললেন, আমি কিছুই জানি না। মনসা অবিশ্বাস করলেন। তারপর তাঁর কথা, তোমার স্বামী কালসর্প নিয়ে ঘোরেন, কিভাবে মারবেন সেকথা জেনে রাখা উচিত। বিপদাকাশে স্ত্রী ছাড়া কেউ থাকে না। সুতরাং তার মর্মকথা জেনে নেওয়া দরকার। কমলা সঙ্কের কাছে গেলেন। মনসা অন্তরীক্ষে নিরাকার হয়ে থাকলেন, কামনায় অস্থির করলেন সঙ্ককে। সঙ্কের দুর্বলতার সুযোগে কমলা তাঁর মৃত্যুর মর্ম জানতে চাইলেন। দৈবের বিধান, সঙ্ক সেকথা বলতে থাকলেন।

১৩. মর্মকথা বললেন সঙ্ক। জয়নেত সিদ্ধঝুলি যদি মনসা হরণ করে, উদয়নাগ যদি বক্ষে কাপড় দেয়, মনসা যদি স্বয়ং 'ভার' দেন— বিষ ঢালেন, তবে সঙ্ক মরবেন। এর প্রতিকার আছে। ধনা-মনা যদি গন্ধমাদন থেকে শালি বিশালি নিয়ে আসে, আর সমুদ্রের ফেনা যদি ঘা-মুখে রাখে—তাহলে সঙ্কের কিছু হবে না। এই ওষুধ না হলে সঙ্কের বাঁচা অসম্ভব।

১৪. স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হবার পর সঙ্ক ঘুমালেন। মনসা আর নেতা গেলেন উদয়কালবে আনতে। তাকে প্ররোচিত করলেন মনসা। সঙ্ককে দেখে উদয়কালের মায়া হল। মনসা তাকে ভয় দেখালেন। লোকধর্ম চন্দ্র সূর্যকে সাক্ষী রেখে অহঙ্কার প্রকাশ করার জন্যে, তার ঈশ্বরীকে তুচ্ছ জ্ঞান বা কটু কাটব্য করার হেতু দেখিয়ে বক্ষে নির্ঘাত কামড় লাগাল উদয়কাল। তার জয়নেত আর সিদ্ধঝুলি নিয়ে পালালেন মনসা। সঙ্ক উঠে দেখলেন জয়নেত-সিদ্ধঝুলি নেই। তার মৃত্যু উপসন্ন হল।

১৫. স্ত্রীর কাছে মর্মকথা বলেই এমন হল— ভাবলেন সঙ্ক। স্ত্রী কমলাকে ডেকে তুললেন তিনি। ধনা-মনাকে গন্ধমাদনে পাঠাতে হবে, সেখানে ওষুধ আছে। ধনা-মনাকে ডাকা হল।

১৬. কমলা স্বামীকে মহাজ্ঞান চিন্তা করতে বললেন।

১৭. ধনা-মনা এলে গরুড়াসনে বসা সঙ্ক বললেন, গন্ধমাদনে শালি-বিশালি ওষুধ আনতে হবে। ওষুধ চিনবে কি করে, সে প্রশ্নের জবাবে সঙ্ক বললেন একটি বিড়াল মেরে নিয়ে যেতে হবে— যে বৃক্ষের স্পর্শে বিড়াল বেঁচে উঠবে সেই গাছ রাতারাতি আনা চাই। প্রভাত হলে ওষুধে কাজ হবে না। ওষধি চিহ্নিত করতে দেরি হল না। পথে ব্রাহ্মণীর বেশ ধরে মনসা কাঁদতে লাগলেন। ধনা-মনাকে ছল করে বললেন, সঙ্ক মারা গেছেন বলে কাঁদছেন। রোজ সঙ্ক তাকে সিধা দিতেন। সঙ্ককে পোড়াতে দেখেছেন ব্রাহ্মণী। ছলনায় বিশ্বাস করে ধনা-মনা ওষুধ ফেলে কাঁদতে কাঁদতে ফিরল। সঙ্ক তাদের তিরস্কার করে পাঠালেন সমুদ্রের ফেনা আনতে। ধনা-মনা সমুদ্রের ফেনা আনতে গেল। ফেরার পথে মনসা ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করে তাদের ছলনা করলেন। আগুন আর ধূম্র দেখালেন মনসা। সেই আগুনকে চিতার আগুন বলে ধনা

মনাদের বিভ্রান্ত করলেন মনসা—ধনা-মনা কাঁদতে কাঁদতে চলল, তবে এবার তারা সমুদ্রের ফেনা ফেলল না। কেমন ওষুধ একবার দেখতে চাইলেন ব্রাহ্মণ—ওষুধ হাতে পাওয়া মাত্র মনসা আকাশে উড়লেন।

১৮. সখেদে সঙ্ক মারা গেলেন। ধনা-মনাকে বললেন তিনি— তার শরীর আট খণ্ড করে পুঁতে দেওয়া হোক— সেই স্থানে আর তাহলে নাগভয় থাকবে না। ধীরে ধীরে বিষক্রিয়ায় সঙ্ক ওঝা মারা গেলেন।

সপ্তম পালা :

১. স্বামীর মৃত্যুতে কমলার গভীর দুঃখ, প্রচুর কাতরোক্তি।

২. চাঁদ সদাগর সদলবলে সঙ্কের সৎকার-উদ্দেশ্যে এলেন। ধনা-মনা গুরুর নির্দেশ বলল। সেইমত কাজ করতে উদ্যোগ নিল। মনসা ব্রাহ্মণবেশে এলেন। এরকম যবন-সদৃশ আচার যেন তারা না করে—ব্রাহ্মণ বললেন। ধনা-মনা বিভ্রান্ত। ব্রাহ্মণ বললেন কনিষ্ঠ অঙ্গুলি কেটে উত্তর দিকে পুঁতে দেহ ভাসিয়ে দেওয়াই বিধেয়। কোন ওঝা তাঁকে বাঁচালেও বাঁচাতে পারেন।

৩. ব্রাহ্মণের পরামর্শ অনুযায়ী, কনিষ্ঠ অঙ্গুলি কেটে, উত্তর দিকে পুঁতে সঙ্ক ধন্বন্তরির শরীর মালাকার ডেকে মাজস বানিয়ে ভাসিয়ে দেওয়া হল। জলে পড়ামাত্র মান্দাস নক্ষত্রগতিতে ছুটে চলল।

৪. উদয়কাল মান্দাসের সঙ্গে ভেসে মনসার কাছে উপস্থিত হলেন। মনসা খুশি। ধন্বন্তরীকে বাঁচালেন তিনি। ধন্বন্তরিকে গাড়র মূর্তি করে রেখে দিলেন। উদয়কাল নাগের কাছে ধন্বন্তরির জয়নেত আর সিদ্ধঝুলি সংগ্রহ করলেন মনসা।

৫. নেতা-পদ্মা খুশিতে বিহ্বল। দু'জন গেলেন চম্পক নগরে। এবার চাঁদকে মনসা দেখাবেন তাঁর শক্তি। উপায় কী? নেতার পরামর্শ— চাঁদের চন্দন বৃক্ষ, যার তলে নিত্য শিব পূজা করেন—দৃষ্টিবিষে তা ধ্বংস করো। সেই গাছ বাঁচাতে পারে এমন কেউ থাকলে তাকেও শেষ করতে হবে। গাছ ভস্মীভূত করার পর চাঁদ সুবর্ণ-চেঙ্গড়ার দ্বারা রাজ্যের লোকজনকে জানালেন, চন্দন গাছ বাঁচাতে পারবে যে তাকে রাজসম্মান দেওয়া হবে। ধনা-মনা—ধন্বন্তরির শিষ্য, তারা স্থির করল যাবে তারা। গুরুর অহঙ্কার আর মনসার মায়া তাদের আচ্ছন্ন করল। তারা আগমের বাণী জানে, জানে আরও বহু জ্ঞান। সুতরাং তারা যাবে বলে স্থির করল।

৬. ধনা ও মনা এক শিষ্য নিয়ে বত্রিশ বানা সাজিয়ে, হাতে বাদখাড়ু পরে, ঝাপানে চড়ে চলল বিদ্যা পরীক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে। যাবার আগে একটি ফলবান বৃক্ষকে বিষভারে ধ্বংস করে আবার বাঁচিয়ে দিল তারা। কাজলা মালিনী তাদের মা—শোনার সঙ্গে সঙ্গে নানা নিষেধ বাক্য বলতে শুরু করলেন।

৭. মালিনীকে প্রবোধ দিয়ে ধনা-মনা গেল চাঁদের কাছে। বাঁচাল তাঁর চন্দনবৃক্ষ। চাঁদের কাছে রাজসম্মান পেল তারা। মনসা আর নেতা হলেন বিষণ্ণ হতমান। তারা উপায় স্থির করার জন্য ভাবলেন—ধনা-মনার মা মালিনীর সঙ্গে সই পাতাতে হবে।

৮. প্রসাধন করে মনসা গোয়ালিনীর বেশ ধরে গেলেন মালিনীর কাছে। মালিনী প্রথমে ক্ষুব্ধ হলেন, পরে যখন জানলেন তার নামও কাজলা—তখন 'সই' বলে সম্ভাষণ করলেন। এয়োতি ডেকে সহেলা পাতাবার উদ্যোগ শুরু হল।

৯. দুই সখী কোলাকুলি করলেন। রান্নার আয়োজন হল। মনসা জিজ্ঞাসা করলেন একা একা কেমন করে কাটে কাজলার। কাজলা বললেন একা নয়—তার দুই পুত্র আছে। এখনই আসবে

তারা। রাজার কাছ থেকে তারা আসবে। আসামাত্র তাদের সাক্ষাৎ পাবে। রান্নাবান্না শুরু হল। মনসা স্নানে গেলেন। বিষতিয়া সাপ ধুলোয় রেখে দিলেন লুকিয়ে। ধনার কড়ে আঙ্গুলে কামড় লাগাল বিষতিয়া। মনা পায়ের আঙ্গুল দিয়ে খুঁজতে লাগল কোথায় সাপ। বিষতিয়া তাকেও কামড় লাগাল। দুই ভাইয়ের মৃত্যু প্রত্যাসন্ন হল।

১০. স্নানান্তে মনসা এসে সখীকে বললেন দুই যুবক সরোবর তীরে মরেছে। মালিনী এসে দেখে তার দুই পুত্র মৃত। হাহাকার করতে থাকলেন মালিনী। মনসা বললেন—তার পিতার কাছে তিনি কিছু জ্ঞান পেয়েছেন, সে জ্ঞানে তোমার পুত্রদের বাঁচানোর চেষ্টা করে দেখি। মালিনীর প্রত্যয় হয় না। মনসা তাকে বললেন, যদি বাঁচাতে পারি—এই দুই যুবক আমাকে দেবে, এই কড়ার করো। মালিনী শোকাভিভূত, তাই স্বীকার করলেন। মনসা তখন 'নিরক্ষর তত্ত্ব' পড়তে শুরু করলেন।

১১. মনসার মন্ত্রপাঠ। বিষের জন্মকথা। ধনা ও মনার শরীর ছাড়ল বিষ। মনসা পুত্রদ্বয়কে নিয়ে বিদায় নেবার উদ্যোগ করলেন।

১২. কাজলা ছোট পুত্রকে ভিক্ষা চাইলেন। মনসা সত্য রক্ষার অনুরোধে তাতে রাজি হলেন না। চাঁদ সদাগর শুনতে পেলেন। মালিনীর গৃহে যাবার উদ্যোগ করলেন তিনি। মনসা ত্রস্ত হয়ে ধনা-মনাকে নিয়ে রথারোহণ করলেন।

১৩. মালিনী কাঁদতে লাগলেন, মনসা তাঁর পুত্রদের বিনা কারণে হরণ করছেন—এই তাঁর খেদ। চাঁদ সদাগর বললেন—তোমার বধূ হল মনসা! বিবাহ রাত্রেই স্বামী তাকে ত্যাগ করেছে। এখন তোমার দুই সুন্দর যুবক পুত্রকে সেজন্যই মনসা সঙ্গে নিয়ে গেছে। শুনে মালিনী চাঁদ সদাগরকে দেব নিন্দক বলে অভিহিত করলেন। এদিকে মনসা ধনা-মনাকে নিয়ে গেলেন, সিজুয়া পর্বতে তাদের রক্ষা করার কাজে নিযুক্ত করলেন।

অষ্টম পালা :

১. এখনও চাঁদ অহঙ্কার করতে ছাড়ছেন না। মনসা নেতার কাছে পরামর্শ পেলেন এবার চাঁদের ছয় পুত্রকে হত্যা করতে হবে। উৎসাহী মনসা সব সাপকে ডাক দিলেন। কেউ যেতে রাজি হল না। মনসা নিজেই চাঁদকে ভয় পান, সাপরা সন্ত্রস্ত—চাঁদ তাদের দেখামাত্র ধ্বংস করবেন। শেষে ধোড়া সাপ বলল ধামাইয়ের রথ পেলে সে ছয়পুত্র বধ করে আসবে। মনসা খুশি হয়ে পারিতোষিক-সহ তাকে রথারোহণে পাঠালেন। ধোড়া আকাশ মার্গে চলার পথে দেখল চাষীরা প্রথম আষাঢ়ের বর্ষণসিক্ত সাধে চাষ করছে। দোহাড়ি পেতে মাছ ধরার ইচ্ছা কোন চাষীর। অনেক ব্যাঙ আর মাছ দেখে লোভে পড়ে ধোড়া তখন রথকে বিদায় দিয়ে জলে নেমে ব্যাঙ আর মাছ খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। জল তাকে দোহাড়ির মধ্যে ভাসিয়ে নিল। কৃষাণেরা দোহাড়ি তুলে দেখে সাপ। সেটিকে মারার ফন্দি করল তারা। যার দোহাড়ি সে কিছু রসিক— দোহাড়ি তার নতুন, ভাঙবে কি করে দেখা যাক। মারা যাবার ভয়ে ধোড়া কেঁদে উঠল।

২. ধোড়া তখন মনসার উদ্দেশ্যে আকুল প্রার্থনা করল। বড় বড় সাপ যে কাজ করতে চায়নি, কেন সে বীরত্ব দেখাতে গেল— এই তার আক্ষেপ।

৩. কোনক্রমে দোহাড়ি থেকে বের হয়ে এক ডুবে দশ বিঘা জমি পার হয়ে পালাল ধোড়া। মনসার কাছে উপস্থিত হতেই মনসা তার উপর প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হয়ে তার বিষ কেড়ে নিলেন, মর্ত্যে নির্বিষ হয়ে থাকতে হবে তাকে। কালিনাগ এসে বিনয়পূর্বক জানাল—তাকে আদেশ করলে মনসার মনোমত কাজ করবে সে। বিষণ্ণ হবার হেতু নেই। সুবুদ্ধি-কুবুদ্ধিকে নিদালি আর ঘুমালি

মন্ত্রধারক করে কালিনাগ চলল মর্ত্যপুরীতে। চাঁদের ঘরের চালের বাতায় লুকিয়ে থাকল। তখন প্রদোষ কাল।

৪. চাঁদের ছয় পুত্র—সর্বানন্দ, পুরন্দর, সুন্দর, বিদ্যানন্দ, নারায়ণ, জনার্দন। তারা যে যার ঘরে স্ত্রীর সঙ্গে আনন্দে পাশা খেলায় মগ্ন কিংবা শৃঙ্গাররত। সেই দৃশ্য দেখে কালিনাগ দয়াপরবশ হয়ে দংশন করতে পারে না।

৫. কালিনাগ ঠিক করল সবাইকে কামড় দেওয়া ঠিক হবে না। রন্ধনশালায় খাবার হাড়ির সরা সরিয়ে বিষ ঢালল কালনাগিনী। বিমর্ষ মনে গুপ্ত বেশে থাকল কাছাকাছি। সকালে ছয় ভাই গুরুর কাছে পড়তে যাবে, এমন সময় কাল নাগিনীর ভয়—এই বিষ অন্ন অন্য কেউ খেয়ে ফেলতে পারে। সুতরাং বিদ্যালয় যাবার পথে চাঁদের ছয় পুত্রকে কুবুদ্ধি দিল সে। ছ'ভাই বলল—খাবার খেয়ে তবে পড়তে যাবো। সনকা বধূদের স্নান করে এসে খাদ্য পরিবেশন করতে বললেন। ছয় বধূ জলকেলি করে ফিরে এল। ছয় ভাইও স্নান করে ফিরল। খাদ্য পরিবেশিত হল। খাবার কালচে কেন? সনকা মিথ্যে করে বললেন—কোন বধূ ভুল করে হাত ধুয়ে জল খাবারের মধ্যে ফেলেছে! এক ভাই বলল, খাবার অন্যকে খাইয়ে দেখতে হবে। বড় ভাই বলল— মায়ের আদেশ পালন করে সবাই খাবার খাও। সকলে তখন খাবার খেল। খাওয়ামাত্র বিষক্রিয়া হল। মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়ল তারা।

৬. বিষক্রিয়ায় ছয় ভাই ছটফট করতে লাগল। তাদের আচরণ উন্মত্তবৎ, দেখে ছয় বউ হাসতে লাগল। সনকা তাদের কাছে এসে হাজির হলেন। তাদের দেখলেন। তারা থর থর করে কাঁপছে, বলছে আর তোমার সঙ্গে দেখা হবে না— পরলোকে চললাম আমরা। সনকা তাদের তেঁতুল গুলে খেতে দিলেন—আগুনের সেঁক দিলেন। তেঁতুলের স্পর্শে বিষ সারা শরীরের ছড়িয়ে পড়ল। তাপে বিষ আরও বেড়ে গেল। ছয় ভাই চেতনা হারাল।

৭. সনকা হাহাকার করতে লাগলেন। একসঙ্গে ছয় পুত্র মারা গেল—বংশে তর্পণ করার জন্য কেউ বাকি থাকল না।

৮. ছয় পুত্র মারা যাবার সংবাদ চাঁদকে দিয়ে এল ঝাউয়া দাসী। সেই দুঃসংবাদ পেয়ে চাঁদ হাহাকার শুরু করলেন। পুত্রদের দেখলেন। তার কথা— আর কেউ নয়, কানি মনসা তাঁর পুত্রদের মৃত্যুর জন্য দায়ি। সনকার অভিযোগ—তোমার দোষেই মনসা ক্ষুব্ধ হয়েছেন ; সর্বনাশও ঘটল সেজন্যে। মনসার পূজা করলেই বিপদ থেকে উদ্ধার পাবে। চাঁদ বললেন, দৈবদোষে এমন ঘটেছে; তাতে আমার কিছু করার নেই। তুমি আমি ভালো থাকলে দুবছর পর পর এক-একটি পুত্র জন্মাবে। তপস্যা করে তাদের দীর্ঘ জীবন কামনা করবো। বার বছরে নিশ্চয় ছয় পুত্র লাভ হবে। এই কথা শুনে সনকা আরও হাহাকার করতে থাকলেন।

চাঁদ বললেন, মান্দাস গড়তে হবে। মনসার উচ্ছিষ্ট মড়া রাখার দরকার নেই। পাত্র মিত্র পুরোহিত সকলেই দাহ কার্যের কথা বললে চাঁদ ক্ষিপ্ত হয়ে বললেন, তোমরা দক্ষিণার লোভে একাজ করতে চাইছ। কানির উচ্ছিষ্ট মড়ার ধোঁয়া ঘুরে বেড়াবে এখানে—এটা আমার ইচ্ছা

৮. প্রাকার ডাকা হল। মান্দাস গড়ার উদ্যোগ নেওয়া হল। ছয় পুত্রকে শোয়ানো হল। ভাসানো
ক্ষুব্ধ হলেন, প। মান্দাস চড়ে কালিনাগ তাদের দেহ মনসার কাছে নিয়ে গেল। মনসা-নেতা এবার
এয়োতি ডেকে স্থির করলেন—উষা-অনিরুদ্ধের প্রাণ হরণ করে বেহুলা-লখিন্দরের জন্ম দিতে
৯. দুই সখী হোতে হবে অনুপম পাটনে। তখন নানাভাবে লাঞ্ছনা করবেন মনসা। শেষে বিবাহ
কেমন করে কাটে।সরঘরে লখিন্দরকে হত্যা করবেন মনসা। বেহুলা স্বামীর মৃতদেহ নিয়ে ভাসতে

ভাসতে আসবেন আমারপুরীতে। ছয় পুত্র ও লখিন্দরকে বাঁচিয়ে ফেরৎ পাঠালে চাঁদ নিশ্চয় মনসার পূজা করবেন।

৯. চাঁদকে মোহগ্রস্ত করার জন্য মনসা শিবের রূপ ধরলেন। চাঁদের কাছে স্বপ্নে দেখা দিলেন তিনি।

১০. শিবরূপী মনসা চাঁদকে স্বপ্নে বললেন— চাঁদ, তুমি এত কষ্ট পাচ্ছ দেখে আমি সমব্যথী হয়েছি। তুমি অনুপম-পাটনে নৌকা সাজিয়ে যাও। আমি সেখানে থাকব। তোমাকে আবার মহাজ্ঞান দেব। তোমার পুত্র আর ওঝা বেঁচে উঠবে। সকালে উঠে চাঁদ আনন্দ প্রকাশ করলেন। প্রাতঃক্রিয়া করে তিনি রাজপাটে বসে ঘোষণা করলেন, তিনি যাবেন অনুপম-পাটনে। নৌকা সাজানোর নির্দেশ দিলেন তিনি। নৃপতি নৌকাযাত্রা করেন, এমন তো দেখা যায় না— তাই চাঁদের পাত্রমিত্ররা সন্দেহ করল। সনকা তাকে বোঝাতে গেলেন। এদিকে মনসা গেলেন ইন্দ্রপুরীতে।

১১. ইন্দ্রপুরীর সভার বর্ণনা। শচীর সঙ্গে বসেছেন ইন্দ্র। গন্ধর্ব, কিন্নর, মুনি, ঋষি, দেবতা, লক্ষ্মী, সরস্বতী আদি সবাই সেখানে। মনসা সেখানে হাজির হলেন।

১২. ইন্দ্রকে মনসা বললেন উষা-অনিরুদ্ধকে তাঁর চাই। মনসার কথায় ইন্দ্র বললেন তাঁর প্রিয় অমাত্য অনিরুদ্ধ ছাড়া অন্য যে-কোন একজনকে নিতে পারেন তিনি। মনসা রাজি নন। উষা-অনিরুদ্ধকে নৃত্যছন্দ পতনের কারণে অভিশাপ দিতে হবে। শেষ পর্যন্ত হল তাই। ইন্দ্র উষা-অনিরুদ্ধকে নিয়ে যেতে বললেন মনসাকে। মর্ত্যে জন্মাক তারা।

১৩. মনসা অনিরুদ্ধের হাত ধরলেন। উষা মনসার পা ধরে কাকুতি মিনতি করতে লাগলেন। বললেন, আমি তো তোমার নিত্য সেবা করি, আমাকে কেন এমন কষ্ট-লাঞ্ছনার মুখে ফেললে? কৃষ্ণপুত্র প্রদ্যুম্ন আমার শ্বশুর। আমরা দেবসভায় নৃতগীত পরিবেশন করে থাকি। আমাকে তুমিই তো সৃষ্টি করেছ! আমার স্বামীর প্রাণ কেন নিয়ে যাচ্ছ তুমি?

১৪. উষা মনসাকে বলতে লাগলেন তার আদ্যকথা। কৃষ্ণা চতুর্দশীর রাত্রে যে পুরুষ তাকে কামনা করবে, রতি কর্ম করবে সেই তার চিরকালের স্বামী। চিত্রলেখা একথা জানলেন। তার সাহায্যে গোপনে অনিরুদ্ধের সঙ্গে তার বিবাহ ও মিলন ঘটল। পিতা বাণরাজ জানলেন সব, তিনি সৈন্যদের পাঠালেন। অনিরুদ্ধের প্রতাপে সব সৈন্য মারা গেল। বাণরাজ স্বয়ং এলেন। অনিরুদ্ধ তাঁর নাগপাশে বন্দি হলেন। একথা কৃষ্ণ (নারায়ণ) জানলেন। তিনি যুদ্ধসাজে উপস্থিত হলেন। ওদিকে বাণরাজাকে রক্ষা করার জন্য শিব নন্দীদের নিয়ে আগুনের গড় রচনা করে দণ্ডায়মান হলেন। মহাযুদ্ধে বাণ পরাজিত। তখন তাঁকে বাঁচাতে এলেন দেবী চণ্ডী। তিনি বস্ত্রহীন হয়ে যুদ্ধ শুরু করলেন। তাঁকে দেখে সৈন্যরা লজ্জায় হেট মুণ্ড হল। বাণরাজা রক্ষা পেলেন। তিনি অনিরুদ্ধের বন্ধন মুক্ত করলেন। আমার সঙ্গে বিবাহ দিলেন। দ্বারকায় পাঠালেন। ইন্দ্রের সভায় নাচ পরিবেশন করে চলছিল ভালই—এখন বিধাতার ছলনায় আমাদের কোথায় যেতে হবে? ইন্দ্র শাপ দিয়েছেন। তুমি আমাকে রক্ষা করো।

১৫. মনসাও উষাকে পূর্বকথা বললেন। তুমি বহু বছর আমাকে সেবা করেছ। সেজন্য তোমাকে বর দিয়েছি—তিন জন্ম পর তোমার মোক্ষ হবে। প্রথম জন্ম উজানি নগরে। পুষ্পরাজ-কন্যা তুমি— তোমার নাম ছিল রত্নু (মালা)। দ্বিতীয় জন্ম বাণ রাজার ঘরে। রতিপুত্র অনিরুদ্ধের সঙ্গে কাটাচ্ছ তুমি—এখানে। রাজভোগে আমাকে বিস্মৃত হয়েছ তুমি। তাই এবার জন্ম নিতে হচ্ছে। তৃতীয় জন্ম হবে—সায়বেনের ঘরে, সুমিত্রার উদরে। তোমার নাম হবে বেহুলা। অনিরুদ্ধ

জন্ম নেবে চাঁদ সদাগরের ঔরসে সনকার গর্ভে। তুমি চাঁদকে লোহার কলাই সিদ্ধ করে খাওয়াবে। লোহার মন্দিরে লখিন্দরকে সাপে কামড়াবে। মান্দাস ভাসিয়ে তুমি দেবস্থানে আসবে। দেশে ফিরবে ছয় ভাসুর আর প্রভূত ধনসম্পদ নিয়ে। তুমি বিলাপ করো না। কামদেব এলেন—পুত্রকে মনসা নিয়ে যাচ্ছেন ; তিনি ব্যথিত।

১৬. পুত্রমুখ দেখে কামদেব মনসাকে ধিক্কার দিলেন, দেবতা হয়ে ঝগড়া-দ্বন্দ্ব করে বেড়ানো ভালো নয়। তুমি তাই কর। দেবতা হয়ে মানুষকে চিনতে তুমি ব্যর্থ। আমার পুত্রকে ফিরিয়ে দাও। আমার পুত্র কারো কোন ক্ষতি করেনি। পুত্র আমার অতি সুন্দর—সদাচারী, তাকে ছেড়ে থাকব কি করে? ওকে নিয়ো না। জননী রতিও পরম দুঃখে অঝোর নয়নে কাঁদতে লাগলেন। বিদ্যাধররাও কাঁদতে থাকল।

১৭. মনসা কামদেবকে বললেন আমাকে রাগ না দেখিয়ে ইন্দ্রকে বলল। ইন্দ্রই তালভঙ্গ দোষে ওকে অভিশাপ দিয়েছেন। ওকে আমার বিশেষ প্রয়োজন বলেই আমাকে দিয়েছেন। আমাকে অকারণে অপমান না করে যাও ইন্দ্রের কাছে। আমার অসাধ্য কিছু নেই, সেকথা মনে রেখো। কামদেব কি আর করেন—চলে গেলেন। অনিরুদ্ধ-ঊষাকে নিয়ে চললেন মনসা। ঊষা সকলের কাছে বিদায় নিলেন। বিদ্যাধররা দুঃখিত চিত্তে তাকে বিদায় দিলেন। ঊষা ইন্দ্রকে বললেন, বহুদিন অকারণে আপনার সেবা করেছি, তিলমাত্র দোষে আমাকে ক্ষমা করলে না! ইন্দ্র তাদের দিকে চক্ষু রাখতে পারলেন না। মনসা হাত ধরে মন্দার পর্বতে এলেন। ঊষা মনসার পা ধরে সাধলেন মর্ত্যে গিয়ে যেন তিনি জাতিস্মর হন। চম্পক নগরে গিয়ে সনকার গর্ভে লখাইকে জন্মালেন মনসা। সনকার পাঁচমাস গর্ভকালে মনসা শিবের রূপধরে চাঁদকে স্বপ্ন দেখালেন। বললেন অনুপম পাটনে যেতে। মহাজ্ঞান আর ছয় পুত্রকে ফিরিয়ে দেবেন—বললেন তাও। চাঁদ পাত্রমিত্রদের বাণিজ্যযাত্রার পরিকল্পনা বললেন—সনকাকে তারা যেন রক্ষা করেন। সনকা চাঁদকে নিরস্ত করতে চাইলেন।

১৮. বাণিজ্যে যাত্রা করতে বারবার নিষেধ করলেন সনকা। নৃপতি বাণিজ্যে যায় না। মনসা ক্ষুব্ধ—পথে বিপদ হতে পারে। মহাজ্ঞান এখন নেই। সুতরাং যাওয়া মোটেই বিবেচনার কাজ হবে না।

১৯. সনকার নির্দেশ অমান্য করলেন চাঁদ। ভয় নেই মহাদেব সহযোগিতা করবেন। সজ্জা শুরু হল। কাণ্ডারদের ডাক দিলেন চাঁদ। দুর্লভ কাণ্ডারি এলেন। পুরান ডিঙ্গা গাঙ্গুড়ি থেকে তোলা হল। গাব ধুনা দিয়ে জলে ভাসানো হল—মালুম-কাঠ লাগানো হল। ঝুনা-নারকেল, খেম, খাসা প্রভৃতি বসন, নিম্বপত্র, সুক্তাপাত, কালজিরে, মেথ, হাড়ু, কুমড়া, জোয়ান ভরে, তেল-ঘি, মাষ, মুগ-কলাই, চাল নিয়ে গণক দিয়ে লগ্ন স্থির করা হল যাত্রার।

২০. যাত্রাকালে সনকা তাঁর গর্ভের কথা বললেন। পত্র রেখে গেলেন চাঁদ। সমস্ত লোকজনকে ডেকে লোকধর্ম অনুসারে 'নিদর্শন পত্র' দিলেন তিনি। লেখা থাকল, পুত্র হলে লক্ষ্মীন্দর আর কন্যা হলে জয়মালা নাম রেখো। পাটনযাত্রা শুরু হল। সহসা হাঁচি জেটি পড়ল। সনকার শিরে হাত। পরদিন প্রভাতে সনকা নৌকাবরণ করবেন।

নবম পালা :

১. নানান দ্রব্য নিয়ে নৌকা বরণ করলেন সনকা। বেদনার্ত তিনি। চাঁদ সদাগরকে মনসা পূজা করতে অনুরোধ করলেন। মাঝিদেরও বললেন, তারা যেন বিপদের সময় সমবেত ভাবে মনসা পূজা করে। সনকার ভয়, আর হয়ত স্বামীকে তিনি দেখতে পাবেন না।

২. বিস্তর ছাগ বলি দিয়ে প্রথমে গন্ধেশ্বরী, তারপর একে একে সর্বজয়া, জগদ্দল, সুমঙ্গল, নবরত্ন, চিত্ররেখা, শশিমুখী—এই সপ্ত ডিঙ্গা বের হল। সনকাকে প্রবোধ দিয়ে চললেন চাঁদ। সর্বজয়ায় দু'লক্ষ টাকার বস্তু, জগদ্দলে বারো বর্ষের চাল, সুমঙ্গল ইত্যাদিকে সাজিয়ে—তীর উজ্জ্বল করে চলল নৌকা। রাজঘাট-রামেশ্বর, ধর্মখাল বয়ে অজয় নদী, তারপর উজানি নগর, শিবা নদী-সাড়াই-কাটোয়া, নদিয়া, ইন্দ্রঘাট পর্যন্ত যাবার পর ইন্দ্রপূজা করা হল। আঁবুয়া, ফুলিয়া পার হয়ে— ফুলিয়াতে নৌকা রেখে রন্ধন ভোজন করা হল। পরদিন নৌকা নিয়ে চললেন চাঁদ সদাগর—ফুলিয়া পার হয়ে হাতিকান্দা, গুপ্তিপাড়া, মির্জাপুর পার হয়ে ত্রিবেণী এলেন তারা।

৩. চাঁদ সপ্তগ্রামে নামলেন। সপ্ত ঋষির স্থান, নানা দেবদেবীর ক্ষেত্র—ত্রিবেণীর তীর্থ। চাঁদ শিবপূজা করলেন। তারপর নগর পরিক্রমায় বের হলেন। ছত্রিশ জাতি সেখানে মহানন্দে বাস করে। সর্বশাস্ত্রময় দ্বিজ, কুলগুরুরা দেবকল্প,-পুরুষরা মদনের তুল্য, নারীরা সাবিত্রী তুল্য, প্রতিগৃহে সুবর্ণের বারা, গজমুক্তার ঝারা— সর্বদেবতার প্রতি ভক্তি তাদের, আনন্দ চারপাশে। যবনরাও বেশ ভক্তিমন্ত।

৪. দুদিন সপ্তগ্রামে থেকে আবার নৌবহর চলল। কুমারহট্ট, হুগলি (ডানদিকে), ভাটপাড়া (বাঁয়ে), বোরো (পশ্চিমে), কাঁকিনাড়া (পূর্বে), মূলাজোড়, গাড়ুলিয়া, পাইকপাড়া (পশ্চিমে), ভদ্রেশ্বর, চাপদানি (ডাইনে), ইচ্ছাপুর (বামে)—ক্রমশ পার হতে থাকল। রাজা উৎসাহিত—নৌকা বহমান। বাঁকিবাজার (বামে), চাপাদানি (ডাইনে), দিগঙ্গ—এল। দিগঙ্গে নিমাইতীর্থে পূজা দেওয়া হল। নিমগাছে সেখানে ফুটে আছে জবা ফুল। চানক বেয়ে যাবার পর বুড়নিয়ার দেশ, সেখান থেকে আকনা, মাহেশ, খড়দহে শ্রীপটে দণ্ডবৎ করে চললেন চাঁদ সদাগর— রিসিড়া (ডাইনে), সুকচর (বামে), পশ্চিমে কোননগর, কোতরং (ডাইনে), কামারহাটি, আড়িয়াদহ পার হয়ে— চিৎপুর। সেখানে সর্বমঙ্গলা পূজা করলেন চাঁদ। এবার পূর্বকূলে কলকাতা পার হয়ে বেতড়। বেতাই চণ্ডীর পূজা করলেন চাঁদ। ধনগু পার হয়ে কালিঘাটে কালি পূজা, চূড়াঘাট পার হয়ে ধমস্থান, সেখান থেকে বারুইপুর যাওয়া হল।

৫. মনসা নেতা-সহ এলেন কালিদহে। বিশ্বকর্মাকে নির্দেশ দিলেন মনসা—কালিদহে পুরী গঠন করতে হবে। হনুমান পাষাণ আনতে লাগলেন। অপূর্ব পাষাণপুরী নির্মিত হল। চূড়ায় স্বর্ণকমল নেত্রপতাকা—হেমঘট স্থাপন করা হল। বিশ্বকর্মা চলে গেলেন। মনসা ডাকলেন সাপদের। তারা দলে দলে নাগ পাটায় আশ্রয় করল। মনসা নাগদলকে 'আরাম্ভে' একত্র থাকতে বললেন। বিষহরির আদেশে চাঁদের সামনে নাগদল রইল—কমল আসনে পদ্মপত্রে আসীন হলেন মনসা। চাঁদের চোখে পড়ল এই নাগদল সমন্বিত মঞ্চ।

৬. পদ্মার মায়ায় এই ঝড়-বাদলের মতো পরিস্থিতি— কর্ণধার বসল। সামনের মনসা মন্দিরে মনসাপূজা করা বিধেয়। চাঁদ মনে মনে ভাবলেন—যাকে নিত্য গালি দিই, তাকে কিভাবে ভজনা করব। হেতালের বাড়ি হাতে নিয়ে ছৈ ঘরে উঠলেন তিনি। একাকী ভুজঙ্গদলকে হত্যা করবেন—এই পণ। শুনে নাগরা ভীত। তাদের ভয় একাকী চাঁদের উপর ক্ষুব্ধ হয়ে পাছে তারা তাকে হত্যা করে ফেলে। নাগরা ইচ্ছা করলে ডিঙ্গা-সহ চাঁদকে গিলে ফেলতে পারত। গেলেনি, কারণ তাদের কুবুদ্ধি। চাঁদের আস্ফালনে তারা ভয় পেয়েছে। মনসা নেতার কাছে পরামর্শ চাইলেন। নেতা তাকে সিজুয়া পর্বতে চলে যেতে বললেন। চাঁদ কালিদহে নামলেন। বেড়া চেপে উঠলেন কূলে। মনসার ঘটে হেতালের বাড়ি মেরে গড়াগড়ি দিয়ে ফেললেন, দেহারা ভাঙ্গলেন, মন্দিরের

ধন লুণ্ঠন করলেন, অহঙ্কার করে কর্ণধারকে বললেন, তাঁর ভয়ে মনসার নাগরা পালিয়েছে। এবার আবার চলল নৌ-বহর। হুলিয়ার গঙ্গের পরে এল ছত্রভোগ। সেখানে সামান্য সময় কাটালেন চাঁদ—তীর্থকার্য করলেন। বদরিকাকুণ্ড থেকে নৌকায় জল ভরে নেওয়া হল। হাথিয়াগড়, শতমুখী পার হয়ে চৌমুখি, তারপর সঙ্কেত মাধব। সেখানে পিতৃতর্পণ সারলেন চাঁদ সদাগর। এবার সমুদ্র। অষ্টপ্রহর চলার পর আকাশে বড় বড় পাখি ছোঁ ঘরের কিছু মাঝি-মাল্লা ধরে নিয়ে গেল। কিরাতের দেশে জীবন্ত মানুষ-খেকোরা বাস করে—তাও পার হলেন চাঁদ। এল অশ্বমুখ, গজমুখ, এক ঠেঙ্গিয়ার দেশ। বিপরীত কাঁকড়ার এলাকা পার হবার পর এল হাদিয়াদহ। সেখানে চারদিকে জল— কোথাও মাটির চিহ্ন দেখা যায় না। এবার জোকাদহ, সর্পদহ, কড়িয়াদহ, শঙ্খদহ এল। চাঁদ কড়ি আর শঙ্খ নেবার ব্যবস্থা করলেন। এবার এল মনসাদহ আর সিংহদহ। সামনে অনুপাম-পাটন। চাঁদ সেখানকার সংবাদ জানতে চাইলেন।

৭. দুর্লভ কাণ্ডার সব কথা বললেন। অনুপাম-পাটনে নৌকা নামানো হল। রাজাকে সম্ভাষণ করতে যাবেন চাঁদ, তিনি প্রস্তুতি নিলেন। ডাক চৌকিরা রাজ সকাশে যাবার নির্দেশ দিল। চাঁদ চতুর্দোলে চড়ে বসলেন। অনুপাম পাটনের সর্বত্র ঐশ্বর্য ও রূপ। নারীরা অপ্সরার মতো রূপবতী, প্রজারাও খুব রূপবান। রাজা চাঁদের পরিচয় জানতে চাইলেন— শেষে 'মিতা', 'মিতা' বলে উঠলেন।

৮. যাত্রাপথের বিবরণ দিলেন চাঁদ। রাজেশ্বর, ধর্মখাল, অজয়-বিজয়, সুরেশ্বরী, উজবনি, শিবা, সাখাই, শুধানপুর, ইন্দ্রেশ্বর, নদিয়া, আঁবুয়া, কুলিয়া, ত্রিবেণী হয়ে নানা গ্রাম পার হয়ে কালিদহ। সেখানে হেতালের বাড়ি নিয়ে মনসার নাগদের নির্জিত করার কথা অহঙ্কার করে বললেন। তারপর আটপ্রহর নৌকা বেয়ে উড়িয়া-বিহগদের ছইয়া-মানুষদের গেলা প্রত্যক্ষ করে নানা দুঃখ পেয়ে সিংহলে এসেছেন চাঁদ।

৯. রাজা খুশি। চাঁদ বিদায় নিয়ে এলেন। রন্ধন ভোজন করে মুখে কর্পূর তাম্বুল দিয়ে দিব্য পালঙ্কে শয়ন করলেন ; পরদিন প্রাতঃক্রিয়া করে দোলায় চেপে চাঁদ গেলেন রাজ সকাশে। সামান্য নগর পরিক্রমা করে নিয়েছেন সেদিনও। রাজাকে নিয়ে বস্তুবদলের জন্যে নৌবহরের কাছে হাজির হলেন সদাগর। চাঁদ বললেন কিভাবে বস্তুবদল হবে।

১০. দক্ষিণাবর্তে শঙ্খ নিয়ে তিনি দেবেন ঝুনা নারকেল, সোনার বদলে হলুদ, পাট ও ভোট-বস্ত্রের পরিবর্তে খোম-ধুতি, সিসার খাপরের বদলে পাড়ু কুমড়া, অশ্ব ও হস্তির পরিবর্তে দেবেন মেষ, জইত্রি-কর্পূর-হিঙ্গের বদলে তিনি দেবেন পিপালি-জোয়ানি, কালজিরা, ভেলা, নিমপাতা, হরীতকী। তেজপাতা নেবেন— দেবেন শুক্তাপাতা। সিংহলের রাজা সবই স্বীকার করলেন।

দশম পালা :

১. এদিকে সনকাকে সাধভক্ষণ করাল তার ছয় বধূ। নানারকম পিঠে রান্না-বান্না করে যতন সহকারে খাওয়াল তারা। দশ মাস দশদিন পরে সনকার প্রসব বেদনা হল। ঝাউয়া দাসী ডেকে আনল ধাত্রীকে।

২. সনকার তীব্র বেদনাবোধ—ছয় পুত্র হারানোর পর আবার এই সন্তানপ্রসবের জ্বালা। এসময় স্বামীও দূরদেশে। এখনকার দুঃখ চরম। ধাত্রী নানা প্রিয় বাক্য বলল। দাওন পাততে বলল সনকাকে।

৩. শুভক্ষণে সনকা পুত্র প্রসব করলেন। মহাপুরুষ লক্ষণ তার। কুমারিকা লতা দিয়ে গড়া সুতিকাঘর, গোমুণ্ড রাখা হল ওপরে। তাঁতি নিবন্ধন করল, বিধিবদ্ধ কাজকর্মের পর সুতিকাকে

পাচন দেওয়া হল। দেবজ্ঞ কোষ্ঠি বিচার করলেন। ছয়দিনে সুতিকা পূজা, আট দিনে আটকলাই (এটি শিশুদের কৃত্য), নয়দিনে নওয়া, ত্রিশ দিনে অশৌচান্ত, একত্রিশ দিনে ষষ্ঠীর পূজা ইত্যাদি করা হল। ছয় মাস বয়স হলে লখিন্দরের অন্নপ্রাশন উৎসব শুরু হল। জ্ঞাতিদের ডেকে খাওয়া দাওয়া শুরু হল। জ্ঞাতিদের ডেকে খাওয়া-দাওয়া হল। শেষে সনকা পুত্র নিয়ে এলেন স্বগৃহে।

৪. বিচিত্র সুন্দর ঘরে লখাই বড় হতে লাগলেন। দু'তিন বছর বয়স হবার পর তাকে শ্রুতিবেধ করানো হল। কর্ণভেদ হবাব পর রত্ন কুণ্ডল পরানো হল লখিন্দরকে। ওদিকে সুমিত্রা-সাহে সদাগর কন্যা কামনায় হরগৌরী পূজা করছেন—মনসা সুমিত্রার গর্ভে কন্যা জন্মালেন। দশমাস দশ দিনে বেহুলার জন্ম হল। তারও কৃত্যাদি হল। পাঁচদিনে পাঁচটা, আটদিনে আটকলাই, একমাসে ষষ্ঠী পূজা, ছয় মাসে অন্নপ্রাশন।

৫. লখিন্দরের যখন পাঁচ-ছয় বছর বয়স, তখন শিশুদের সঙ্গে খেলে বেড়ানো শুরু হল। ধুলোয় ভরে মাটির ভাঁড় নিয়ে খেলা, রাজ-পাত্র খেলা, তেপতিয়া, বাঘচালি, মঙ্গল-পাঠান, শতরঞ্চ, চৌপাড় খেলা চলল কিছুদিন। এবার বিদ্যাধ্যয়ন শুরু হল। তন্ত্রমন্ত্র আর তার সম্ভারণ (বা বাঁচার উপায়) শেখার পর গুরু উচ্চারণ ও মাত্রা শেখালেন। হাতে খড়ি হল, চৌত্রিশ অক্ষর, অষ্টাদশ ফলা, অষ্টধাতু, অষ্টশব্দ পড়ার পর পাঠশালা ছেড়ে 'শাস্ত্রশাল'-এ গেলেন লখিন্দর। সূত্র, ব্যাকরণ, ভটি, রঘু, সাহিত্য, অলঙ্কার, অভিধান, জ্যোতিষ, নাটক, কাব্য, অষ্টাদশ পুরাণ প্রভৃতি চৌষট্টি বিদ্যা শেষ হল লখিন্দরের।

৬. লখিন্দরকে রাজপদে বরণ করা হল। মনসা নেতার কাছে পরামর্শ চাইলেন। বেহুলা-লখিন্দরকে বিবাহের উপায় ভাবলেন তারা। নেতা মনসাকে সনকার রূপ ধরে চাঁদ সদাগরের কাছে স্বপ্নে উপস্থিত হবার পরামর্শ দিলেন। মনসা তাই করলেন।

৭. সনকার করুণমূর্তি নিয়ে চাঁদ সদাগরকে স্বপ্ন দিলেন মনসা। প্রভাতে উঠেই দেশে যাত্রার অনুরোধ করলেন। চাঁদের নিদ্রাভঙ্গ হল।

৮. চাঁদ এবার কাণ্ডারিকে ডেকে ফেরার উদ্যোগ নিতে বললেন। সনকার বিচ্ছেদ অসহ্য ঠেকল তাঁর। পরদিনই ফেরার আয়োজন শুরু হল।

৯. মিতার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চাঁদ দ্রুত নৌবহর প্রস্তুত করলেন। প্রচুর ধনরত্ন লাভ হল। কড়ি-সঙ্কদহ থেকে কড়ি-সঙ্কও নিলেন প্রচুর। সঙ্কেত মাধবে পূজা করলেন। সাগর পার হয়ে এলেন মগরা। চৌমুখা বেয়ে এলেন ছত্রভোগ। সেখানে অম্বুলিঙ্গে পূজা করলেন। তীর্থকাম, স্নান-দান সেরে খনিয়া বেয়ে চললেন। মনসা সময় বুঝে ঝড়-বৃষ্টি-মেঘ আর হনুমানকে সঙ্গে নিয়ে কালিদহে উপস্থিত হলেন।

১০. বিষম ঝড়-বৃষ্টি-দুর্বিপাক আরম্ভ হল। কাণ্ডারি বললেন নোঙর করতে হবে।

১১. চাঁদ তাঁর ইষ্টদেবতা মহেশ্বরকে ভাবছেন। মনসার ক্ষোভ বাড়তে লাগল। হনুমানকে নির্দেশ দিলেন তিনি, সপ্তডিঙ্গা ডুবাতে হবে। হাত সানে কালিদহের সমস্ত জল টেনে আনলেন হনুমান—ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটল। কাণ্ডারি চাঁদকে মনসার শরণ নিতে বললেন। চাঁদ রাজি নন। যদি একান্তই মনসা রুষ্ট হয়ে থাকেন, তবে প্রাণে মারুন। হনুমান এবার লেজের চাপে সপ্ত-ডিঙ্গা রসাতলে পাঠিয়ে দিলেন। ধন-জন-সম্পদের সঙ্গে চাঁদের ডিঙ্গা পাতালে চলে গেল। বরুণের পুরীতে সেই সমস্ত গচ্ছিত রাখা হল। চাঁদ অকূলে ভাসতে থাকলেন। মনসা মায়া করে তৈরি করলে একটি বালিশ, চাঁদ সেটি ধরতে গিয়ে দেখেন মনসার নাম। ছুঁলেন না তিনি বালিশখানা। মনসা ধামাইকে পাঠিয়ে চাঁদের হেতালের বাড়ি কেড়ে নিলেন। চাঁদ ধামাইয়ের

কেশ ছিঁড়ে নিলেন। জলের মধ্যে চাঁদের শক্তি কমে গেল—তিনি তখন ঢোকে ঢোকে জল গিলতে থাকলেন, নেতা মনসাকে বললেন, চাঁদ মারা গেলে বিপত্তি ঘটবে। তাঁকে বাঁচাবার চেষ্টা শুরু হল। মনসার ইঙ্গিতে বায়ু ও ঢেউ চাঁদকে কূলের কাছে নিয়ে এল। চাঁদ কূলে উঠলেন। শিবের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে, মনসাকে নিন্দা করে হামাগুড়ি দিয়ে চললেন চাঁদ। এবার শুরু হল চাঁদের দুর্গতি।

১২. কোনক্রমে উঠে পড়ে নির্বল চাঁদ ভাবলেন আর সনকার সঙ্গে দেখা হবে না। কুকুর-শৃগালের ভোগে যাবেন তিনি। শ্রাদ্ধ-পিণ্ডহীন হয়ে মৃত্যু হবে। নৌকার কাণ্ডারিরা মারা গেছে। সবই মনসার ষড়যন্ত্র। চাঁদের খেদোক্তি শুনে মনসা হেসে উঠলেন।

১৩. গৃহস্থের স্ত্রীর রূপ ধরে মনসা কুম্ভ কাঁখে নিয়ে চাঁদের কাছে গেলেন। তাকে সব কথা জিজ্ঞাসা করলেন। কেন এই দুর্দশা? মনসাকে চাঁদ বললেন—সবই ঘটেছে কানির জন্যে। মনসা বললেন দেবীকে নিন্দা করার জন্যেই তোমার এই দুরবস্থা। শ্মশানের মৃতবাস পরে, ভগ্ন কটি, শ্রীফলের নড়িতে ভর করে অন্নাভাবে নদীতীরে কাদা মেখে চলেছেন চাঁদ। মনসা নাগদের কাষ্ঠরূপ ধারণ করতে বললেন। চাঁদ সেই কাঠ কুড়োলেন। বোঝা মাথায় তুলতে না পেরে কাঁদছেন দেখে ধামাই নররূপ ধরে বোঝাটি চাঁদোর মাথায় তুলে দিলেন। কোনক্রমে কুমোর পাড়ায় গেলেন চাঁদ। চার পণ কড়িতে কাঠ বিক্রি স্থির হল। বোঝা নামাতে গিয়ে কুমোরদের দশ-বারটি হাড়ি ভেঙ্গে ফেললেন চাঁদ। ক্ষুব্ধ কুমোররা চাঁদকে উত্তম-মধ্যম দিল। কুমোরের বাড়ির মেয়েরা ভয় পেয়ে চাঁদকে চারগুণ কড়ি দিল। চাঁদ ভাবলেন ঐ কড়ি দিয়ে বস্ত্র কিনবেন চাঁদ। তাঁতিরা তাকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছনা করল। ক্ষুধাতুর চাঁদ গেলেন নদীতীরে—মনসা তাকে বধূরূপে দেখা দিলেন। চাঁদ আবার মনসার নিন্দা করতে থাকলেন। মনসা তাঁকে ধিক্কার দিয়ে আবার কৌতুক করে বললেন কলাচোপা খেয়ে ক্ষুধা নিবারণ করতে। চাঁদ বড়ই বেদনার্ত।

১৪. বধূরূপী মনসা চাঁদকে বললেন রাম-অবতার অনুরূপ দুঃখ সহ্য করেছেন। তুমিও চোপা কুড়িয়ে খাও—লজ্জা করো না। জ্ঞান সাধতে শিব ঘরে ঘরে ভিক্ষা করে ফেরেন। শ্রীবৎস রাজা কাঠ বিক্রি করে দিন কাটিয়েছেন। নল দময়ন্তী আর পঞ্চপাণ্ডবরাও বনবাসী থেকেছেন। তুমি এত লজ্জা পাচ্ছ কেন—কলার চোপা খেয়ে ক্ষুধা নিবৃত্ত করো।

১৫. গঙ্গার পূর্বতটে কলার চোপা কুড়িয়ে চাঁদ স্নানান্তে শিবকে উৎসর্গ করবেন কলার চোপা। এই ভেবে কলার চোপা একত্র করলেন চাঁদ।

১৬. চাঁদের প্রার্থনায় পাছে মহাদেবও চোপা খান, তাই মনসা এক চোরাগাই পাঠালেন। সে সব চোপা খেয়ে গেল। জল থেকে চাঁদ হাহাকার করতে থাকলেন। কাছে ব্যাধরা ফাঁদ পেতেছিল। চাঁদ সেখানে উচ্চস্বরে কাঁদতে থাকলে পাখি উড়ে গেল। ব্যাধরা চাঁদ সদাগরকে ভালোমত কিল চড় দিল। কি বলতে হবে—চাঁদের প্রশ্নের উত্তরে ব্যাধরা বলেছে—বলো, ঝাঁক-সহ পড়ো। কুবুদ্ধিতে পড়ে চাঁদ সেই কথা বলতে থাকলেন। ডাম্পতি করে ডাকাতরা ফিরছে—চাঁদ উচ্চকণ্ঠে বলতে লাগলেন—ঝাঁক-সহ পড়ো। দস্যুরাও তাকে যথেষ্ট লাঞ্ছনা করল। কি বলব তবে? ডাকাতরা বলে দিল, বলো—'একে ছেড়ে অন্যদের আনো।' স্বভাবতই সকলে চাঁদকে লাঞ্ছনা করতে শুরু করল। কি বলব তবে? সবাই বলে দিল, বলো—এরকম যেন আর না জ্বলে। কুবুদ্ধিযুক্ত চাঁদ বলতে থাকলেন—এরকম করেই সব জ্বলতে থাকুক। নগরে যেতে যেতে চাঁদ বলছেন ঐ কথা। এদিকে নগরে আগুন লেগেছে। চাঁদের কথা শুনে তারা বিরক্ত হয়ে আরও লাঞ্ছনা করল। মনসা এবার ব্রাহ্মণ বেশ ধরে এলেন। তার বাড়িতে চাঁদ কৃষাণ হিসাবে যুক্ত হলেন।

১৭.-দ্বিজের বাড়িতে স্থির হল ত্রিসন্ধ্যা ভোজন, চারটি বস্ত্র মাসে, এক তঙ্কা পারিশ্রমিক। দ্বিজ রাজি। তাকে ভাল করে খাইয়ে—ধান নিড়োতে পাঠালেন, সেই ব্রাহ্মণ। এক পথিক যাচ্ছে পাশ দিয়ে, তার কথা এই ধান বেশ ভাল—বিষহরি ধান! শুনে চাঁদ ক্রোধ যুক্ত হয়ে ভুল করে আগাছা রেখে সব ধান নিড়িয়ে ফেললে। ব্রাহ্মণ এসে উত্তম মধ্যম দিলেন খুব ভালোমতো। গোরু চরাবার কাজ দিলেন ব্রাহ্মণ। চাঁদ রাজি। কিন্তু দিন দুই পরই চাঁদ অবসর পেলেন আর গোরু ছেড়ে হাতে বাড়ি নিয়ে নাচতে আরম্ভ করলেন। গোরু ছাড়া পেয়ে ধান খেয়ে নিল। ব্রাহ্মণ এবার ক্ষুব্ধ হয়ে বস্ত্র কেড়ে নিয়ে তাড়িয়ে দিলেন চাঁদ সদাগরকে। চাঁদ চলেছেন। তাকে লাঞ্ছনা করার জন্য মনসা এবার পঞ্চনাগ পাঠালেন। তারা দরবেশ মূর্তিতে এল চাঁদের কাছে। চাঁদকে তারা এক বৃক্ষতলে পেয়ে চারপাশে ঘিরে ধরল।

১৮. দরবেশ রূপী পঞ্চনাগ চাঁদকে লাঞ্ছনা করতে থাকল। কেউ তাদের খাওয়া খাবার খেতে বলল, কেউ এঁটো জল পান করতে চাইল, এক দরবেশ মতোয়ালা হয়ে চামড়ার বাড়ি মারতে যায়, একজন মাথায় তৈকা তুলে দিতে চায়। ঊর্ধ্বশ্বাসে 'শিব শিব' বলে পালালেন চাঁদ। তারা বলল ভূতের নাম ছেড়ে পয়গম্বরের নাম নাও। চাঁদ গভীর দুঃখ বোধ করেন—দুই চোখ জলে ভিজে যায়। এসময় চাঁদের সামনে থেকে দরবেশদের মায়ারূপী দৃশ্য হারিয়ে গেল। কালিদহে ডুবল মধুকর, চাঁদ উঠে আসেন বারুইপুরে। সেখানে কুমোরের ঘরে কাঠের বোঝার কাণ্ড হল, চৌতলে চাঁদসদাগর চোপা কুড়িয়েছিলেন, সেখানেই ব্যাধরা তাকে লাঞ্ছনা করে। কালীঘাটে দস্যুদের সঙ্গে দেখা হয়। মাহেশে নদীর তীরে পুত্রকে দাহ করছে এক পিতা—চাঁদো দেখেছেন। দিগঙ্গে নগর পোড়ার দৃশ্য দেখেছেন চাঁদ। ত্রিবেণীতে দরবেশদের দেখে পালিয়ে এলেন তিনি— চন্দ্রকেতু রাজ্যে। সেখানে রাজা চাঁদের মিতা। দ্বারীদের মিতার নাম বলতে তারা গিয়ে রাজাকে বললেন। রাজা চন্দ্রকেতু বললেন তাঁর এক মিত্র আছেন, তাঁর আপাদলক্ষণ, মনসাকে নিন্দা করা। বেরিয়ে এসে দেখলেন তাই। তখন চাঁদকে ভালভাবে দিব্যবস্ত্র পরিয়ে নিয়ে এলেন চন্দ্রকেতু। দু'জনে সম্ভাষণ শুরু হল।

১৯. ছয় পুত্রের মৃত্যু থেকে শুরু করে সমস্ত দুঃখের কথা বললেন চাঁদ।

২০. মিতা প্রচুর পানাহারের ব্যবস্থা করলেন। দেবপ্রসাদ ভেবে তা খেলেন চাঁদ। সহসা চেয়ে দেখেন চন্দ্রকেতুর বাড়িতে মনসার বারা। চাঁদ তা দেখে ক্ষুব্ধ—কম্পিত—চঞ্চল। কলার ডাঁটা গলায় দিয়ে সব খাবার উগরে ফেলে তৎক্ষণাৎ দেশে যাবার উদ্যোগ করলেন। চন্দ্রকেতু তাঁকে কোনক্রমে রাতটুকু থেকে যেতে বললেন।

একাদশ পালা :

১. পরদিন চাঁদকে চন্দ্রকেতু চতুর্দোলা, হাতি, ঘোড়া, সেনাসহ এগিয়ে দিলেন। সহসা চাঁদ ভাবলেন নিজের রাজ্যে মিতার বিভূতি নিয়ে যাওয়াটা ঠিক হবে না। সবাইকে ফিরিয়ে দিলেন। নিজে মৃতবাস পরে বেলনড়ি হাতে চললেন। সন্ধ্যা হয়ে এল। রাখালরা গরু নিয়ে ফিরছে, এমন সময় বেনা ঝোপে লুকিয়ে থাকলেন রাজা। তার শরীর দেখে গরুগুলো ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে পালাল। গায়ে খড়ি, পাকা দাড়ি চুল, তাঁকে দেখে গেছো ভূত ভাবল রাখালরা। লখিন্দর জানতে পেলেন। তিনি ঢ্যারা পিটিয়ে দিলেন—গ্রামে ভূতের উপদ্রব হয়েছে। সবাই সাবধানে থাকবে। লজ্জায় রাজা কুণ্ঠিত, লজ্জিত, ব্যথিত—কাঁদতে লাগলেন। ভাবলেন কাজলা মালিনীর ঘরে যাবেন।

২. কাজলার দ্বারে গিয়ে চাঁদ আত্মপরিচয় দিলেন। বলতে লাগলেন তাঁর দুঃখের কথা। কাজলা মালিনী তাতে দ্বিগুণ ভয় পেয়ে গেলেন।

৩. ভীত-সন্ত্রস্ত কাজলা চাঁদের গায়ে ছুঁড়ে দিলেন আগুন। চাঁদ ছুটে রামকলার বাগানে পালালেন। ঝাউয়া দাসী অস্ত্রহাতে কলাগাছের পাতা কাটতে গেল। পাতা হাতে না পেয়ে চাঁদের মাথায় পা রেখে পাতা কাটতে লাগল। চাঁদ মাথা নাড়লেন যন্ত্রণায়। ঝাউয়া দাসী ভূতের ভয় পেয়ে ছুট লাগাল ঘরের দিকে। সমস্ত লোকজন তখন রামকলার বাগান ঘিরে ফেলল। মারমুখী প্রজাদের দেখে চাঁদ ভয় পেলেন। উনি বললেন সনকা তাকে চিনতে পারবেন। সনকাকে তাঁর একান্ত অনুরোধ—সোনার বাঁধান ছয়খানা দাঁত দেখে তাকে সনাক্ত করতে। সনকা দাঁত দেখে চাঁদকে নিঃসন্দেহে সনাক্ত করলেন। ঘরে ডেকে তাঁকে তোলাজলে স্নান করিয়ে—নানাভাবে তুষ্ট করলেন সনকা। লখিন্দর তাঁর পা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলেন। চাঁদ তাঁর পরিচয় জানতে চাইলেন।

৪. পরম আনন্দে চাঁদ তার বিপর্যয়ের কথা বললেন। লোকজনকে ডেকে বললেন লখিন্দরের বিবাহ দেবেন তিনি।

৫. বণিকরা ভীত। বাসর রাত্রে লখিন্দরের মৃত্যু হবে—জানে সবাই। যাদের ঘরে অবিবাহিতা কন্যা আছে তারা ভয়ে পালাতে লাগল। কে আর জেনেশুনে নিজের কন্যাকে অকালে বিধবা করার পথে এগিয়ে দেয়! মনসা সনকার মাসী সেজে এলেন। ঘাটে দেখা দিলেন। সাহে রাজার কন্যার খবর দিলেন। চাঁদ কন্যার সন্ধানে উজানি নগরে চললেন। রাজা গোলাট নগরে উপস্থিত হলেন, আর সেই সময় বেহুলা মুকুতা-সহর (সরোবর)-এ স্নান করতে গেলেন। সখীদের সঙ্গে স্নান করতে লাগলেন বেহুলা।

৬. সরোবরে নানান পাখি, ফুল-এর বর্ণনা। সেখানে বেহুলা সখিদের নিয়ে আনন্দে স্নান করতে লাগলেন।

৭. মনসা এক খঞ্জ-বৃদ্ধা-ব্রাহ্মণীর রূপ ধারণ করে সেখানে উপস্থিত হলেন। স্নানের সময় তার গায় বেহুলার জলের ছিঁটে পড়ে। তাতে বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী ক্ষুব্ধ হলেন।

৮. বৃদ্ধা অভিশাপ দিলেন বিবাহ রাত্রে তার স্বামী মারা যাবে। মুক্তাসাগরে স্নানরতা বেহুলা বললেন ভালই হল, শাপ তো তার পক্ষে আশীর্বাদ স্বরূপ। তার পূর্ব জন্মের কথা স্মরণে আছে। অহঙ্কার করে বলা বেহুলার কথা শুনতে শুনতে মনসা আর বেহুলার মধ্যে দ্বন্দ্ব এমন পর্যায়ে গেল যে তারা দু'জন গঙ্গাকে সাক্ষী রেখে ডুব দিলেন। গঙ্গা বেহুলাকে দিলেন এয়োতির নিদর্শন— সিন্দুর আর শঙ্খ। আবার দুজনে মুক্তাসাগরে এলেন। চাঁদ তাদের লক্ষ করে, কথাবার্তা শুনে বেহুলাকেই মনে মনে পাত্রী হিসেবে মনোনীত করলেন। সঙ্গীদের বললেন লোহার কলাই তৈরি করাতে। কিছু সঙ্গীকে পাঠালেন বেহুলার অনুবর্তী করে। নিজে থাকলেন মুক্তা সহরে।

৯. সোমাই পণ্ডিত গিয়ে সায় বেনেকে সব কথা বললেন। সায় তাঁর ছয় পুত্রকে প্রত্যুদ্গমন করতে পাঠালেন। তাঁরা গিয়ে সসম্মানে চাঁদকে নিয়ে এলেন।

১০. লোহার কলাই সিদ্ধ করতে হবে— চাঁদের অনুরোধ রক্ষা করতে সুমিত্রা দেবী মুশকিলে পড়লেন। বেহুলা রন্ধনশালায় এসে মাকে অসুবিধাজনক পরিস্থিতিতে দেখে কারণ জানতে চাইলেন।

১১. বেহুলা সহজেই লোহার কলাই সিদ্ধ করলেন। চাঁদ আনন্দিত। সাহে তাঁকে মনসা পূজা করার অনুরোধ জানালেন। চাঁদ রাজি নন। সনকা প্রথমে বললেন পুত্রের বিবাহ তিনি দেবেন না। থাকুক অবিবাহিত। চাঁদ সাতালি পর্বতে লোহার বাসরঘর বাঁধবেন বললেন। বিবাহের উদ্যোগ শুরু হল।

দ্বাদশ পালা : (জাগরণ পালা)

১. শিল্পকার এসে লোহার বাসর গড়ল। মনসা তাকে ভয় দেখালেন। শিল্পকার ভয় পেয়ে বাসরে একটি সূক্ষ্ম ছিদ্র রেখে দিল। চাঁদ সদাগর তাকে পারিতোষিক দিলেন—পাট-ভোট বস্ত্র।

২. চাঁদ দিকে দিকে নিমন্ত্রণ দিলেন। লোকজন চলে এল।

৩. উজানি নগরের অধিবাস, গাত্রহরিদ্রা, জল সওয়া ইত্যাদির বিস্তৃত বিবরণ দিলেন বিপ্রদাস।

৪. ঝাউয়াকে দিয়ে সনকা আমন্ত্রণ করলেন আইয়দের। তারা সদলে এল। অধিবাস অনুষ্ঠান হল।

৫. সায়বেনে নান্দীমুখ, বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করলেন। দুয়ারে দিলেন বসুধারা।

৬. সনকা 'পড়া আখ'তে গেলেন। জল সয়ে এলন সাড়ম্বরে।

৭ লখিন্দরকে ক্ষৌরকার সম্ভবমতো প্রসাধন করাল। স্ত্রী-আচার সম্পন্ন হল।

৮. সনকা ছয় বধূদের নিয়ে রান্নাবান্না করলেন।

৯. সনকা পুত্রকে কোলে নিয়ে বলতে লাগলেন—ছয় পুত্র মরে একমাত্র তুমিই আমার একমাত্র নিধি। তাঁকে নির্মঞ্ছন করলেন সনকা।

১০. বিবাহের উদ্দেশ্যে লখিন্দর বের হলেন।

১১. বাজি, পটকা, তুবড়ি, হাউই ছুঁড়ে — আলোর মিছিল নিয়ে, গাহুল, বম্বুল, বানা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র নিয়ে নর্তকদল-সহ লখিন্দরের বরযাত্রী দল চলল। চম্পক নগর পার হয়ে বাঁকের রাজার, কাঞ্চন নগর, চৌহাটা বাজার পার হল। লঙ্ক বাজারে চাঁদ দেবপূজা করলেন। এবার কুলোটা নগরে পুষ্পের পসার দেখা গেল। পাড়ায় হাজির হলেন চাঁদ ; বিনাপাড়ার পর ধাহুলি নগর। সেখানকার লোক প্রথমে ভয় পেল। এক বামন, তার নাম 'খুদিয়া ডিঙ্গর'—পথ রোধ করে দাঁড়াল। বীর সম্মান পেতে চায় সে। ঠেলাঠেলি করে দীপবর্তিকা চুরমার করল। তাকে চাঁদ বললেন—আঠার-বাকড়ার নাম বলতে পারলে বীর সম্মান দেবেন। আঠার বাকড়ার নাম বলতে থাকল খুদিয়া ডিঙ্গর : ১. প্রভু ভগবান, ২. বলভদ্র, ৩. কান (কৃষ্ণ), ৪. রাম, ৫. লক্ষ্মণ, ৬. চন্দ্র, ৭. সূর্য, ৮. হনুমান, ৯. যমরাজ, ১০. যুধিষ্ঠির, ১১. ভীম, ১২. অর্জুন, ১৩. নকুল, ১৪. সহদেব, ১৫. নৃসিংহ, ১৬. বরাহ, ১৭. বামন। চাঁদ বললেন—১৮ জন হল কই? ১৮তম বীর তো খুদিয়া ডিঙ্গর নিজে! চাঁদ হাসতে হাসতে তাকে 'বাকড়া গুয়া' বা বীর সম্মান দিলেন। চাঁদকে ছলনা করার জন্য মনসা এবার ফাঁদ পাতলেন।

১২. সর্পদল গিয়ে মহাদম্ভে প্রলয়ের মতো মনসা এলেন। সবাই পালিয়ে গেল। চাঁদের বাহিনী ছত্রখান। চাঁদ হেতালের বাড়ি ফেলে পালানোর সময় গিয়ে পড়লেন ভিমরুলের ঝাঁকে। ক্ষত-বিক্ষত হল তার শরীর। লখিন্দর কাঁদতে লাগলেন। মনসা ভেবে দেখলেন, এখন চাঁদকে ধ্বংস করলে বেহুলা-লখিন্দরের বিয়ে হবে না। নিজেই নিজের ক্রোধ সামলে নিলেন মনসা—আবার সব বরযাত্রী একত্রিত হল।

১৩. বরযাত্রী এসে পড়ল মুকুতা সহরে। সাহে পুত্রদের অনুব্রজন করতে বললেন। তারা দুয়ারে শতমন ওজনের লোহার ঘন্টা ঝুলিয়ে রাখলেন ; একটা লোহার গণ্ডার স্থাপন করলেন তারা। গণ্ডারটি সামান্য দূরে স্থাপিত হল। শত মানুষ সেটি নড়াতে পারে না। চাঁদ চেষ্টা করলেন, ব্যর্থ হয়ে কথঞ্চিৎ অপমানিত হলেন। তাকে দেখে শিশুরা টিটকারি দিয়ে উঠল। লখিন্দর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে দাপাদাপি করে ঘন্টাটি ধরে ছুঁড়ে ফেললেন। লোহার গণ্ডারটিও টান মেরে ফেলে

দিলেন। পাষাণে পড়ে ঘণ্টাটি ভেঙে গেল। লখিন্দরের অগ্নিমূর্তি দেখে তাঁর শ্যালকরা পালিয়ে গেলেন। সাহে এসে চাঁদ সদাগরকে আলিঙ্গন করলেন। শুভক্ষণে দ্বন্দ্বের প্রয়োজন নেই। বেহুলা 'শ্রী' তুলতে গেলেন। গ্রামের কুম্ভকারের কাছে 'শ্রী' তুলে গ্রাম-পরিক্রমা করলেন বেহুলা। দেবী-বিষহরির কাছে তার প্রার্থনা বিচিত্র কাঁচুলি তৈরি করে দাও। মনসা বিশ্বকর্মাকে বিচিত্র কাঁচুলি নির্মাণ করতে বললেন।

১৪. বিশ্বকর্মা বিচিত্র কাঁচুলি নির্মাণ করলেন। নানান জিনিস অঙ্কন করা হল। মনসা বিবাহ-স্থলে তাঁর সঙ্গে যেতে চাইলেন। বেহুলা বারণ করলেন। মনসা গেলে কর্মপণ্ড হবে।

১৫. এয়োতিরা লখিন্দরের গুণ ও রূপের প্রশংসা করতে থাকল। বেহুলার পূর্বজন্মের সুকৃতির ফলে এরকম রূপগুণ-সম্পন্ন বর পেয়েছে সে। বেহুলা-লখিন্দরের জোড়াও হয়েছে মনের মতো। এক এয়োতি এরকম বর না পাওয়ায় সখেদে ভাবছে—সাগরতীর্থে কামনা করি, শিব-দুর্গাকে পূজো করব— এরকম বর যেন জন্মান্তরে পাই। আর এক এয়োতি তার বাবা মায়ের উদ্দেশে খেদ প্রকাশ করল—শিশুকালে বিয়ে হয়েছে তার, এখন রূপ নষ্ট। একজন সতীত্ব-ধর্মের প্রতি নিষ্ঠাশীল, ভাগ্যের ওপর তার নির্ভরতা। যাদের স্বামী নেই— তারা লখিন্দরের রূপে বিহুল, মনে মনে বেহুলার অনুসরণ করে। বৃদ্ধারা যৌবন কালের জন্য শোক করতে থাকল। যাদের বিয়ে হয়নি, তাদের মনে লখিন্দরের উপস্থিতি কামবাণে আহত হবার উপক্রম করল।

১৬. বেহুলা-লখিন্দরের বর-বধূ বেশে মণ্ডপে অবস্থান করার বর্ণনা দিলেন কবি। বিবাহের উদ্‌যোগ শুরু হল। মনসা কৌতূহলবশে শূন্যপথে এলেন। লখিন্দর ত্রস্ত হলেন—মোহগ্রস্ত।

১৭. চাঁদ কাঁদতে লাগলেন। তাকে দেখে তার সহযাত্রীরাও কান্নাকাটি শুরু করল। বেহুলা পিতাকে বললেন যে যেমন আছে তেমনি থাকুক— আমি মনসা পূজা দিয়ে আসি। মনসা-উদ্যানে তীক্ষ্ণ কাটারি নিয়ে বেহুলা হাজির হলেন।

১৮. মনসার কাছে বেহুলা আর্তনাদ করতে থাকলেন। লখিন্দরকে না বাঁচালে আত্মহত্যা করবেন—এরকম ঘোষণা করতে থাকলেন তিনি।

১৯. মনসা এবার বেহুলাকে দিলেন মন্ত্রপূত পুষ্প জল। তার স্বামী বেহুলা এবার এর স্পর্শে বেঁচে ওঠেন। আর কোন বিঘ্ন হবে না। বেহুলা স্বর্ণবারিতে করে পুষ্পজল নিয়ে স্বামীর গায়ে ছিটিয়ে দিলেন। স্বামীর চেতনা ফিরে এল।

২০. পুত্র বেঁচে উঠেছে—চাঁদ পরম আহ্লাদিত। বেহুলার প্রশংসা আর মনসার নিন্দা করতে লাগলেন। চাঁদের কথা শুনে সাহে সদাগর তাকে মনসার নিন্দা করতে নিষেধ করলেন। চাঁদ বললেন শীঘ্র ছায়নি বা বিবাহানুষ্ঠান হোক।

২১. বিবাহ আরম্ভ হল। বেহুলা-লখিন্দর ছায়নিতে বসলেন।

২২. বিবাহ অনুষ্ঠানের বর্ণনা। শেষে অরুন্ধতী দেখে বাসরঘরে গেলেন তারা।

২৩. সুমিত্রাদেবী জামাতা-ভোজনের ব্যবস্থা করলেন। রান্নাবান্না করে দিব্যশয্যা প্রস্তুত হল। বেহুলা নিলেন সোনার সাঁড়াশি আর ঝাঁপি। বাসরে মনসা পাঠালেন সাপ। দুগ্ধ পানরত সাপকে সাঁড়াশি দিয়ে ধরে ঝাঁপিতে রাখলেন বেহুলা। শেষে চারটি নাগই ফিরে আসছে না দেখে মনসা গেলেন উজানি নগরে। উজানির প্রত্যেক ঘরে মনসা বারি দেখলেন তিনি। সেখানকার অধিবাসীদের শ্রদ্ধা তাঁকে তৃপ্ত করল। একটা উঁচু বাঁধের উপর বিশ্রাম নিয়ে গুপ্তবেশে বাসরে পৌঁছলেন তিনি। বেহুলার উদ্দেশ্যে বাসরে আকাশবাণী করলেন মনসা। চারটে নাগের কি হল? একথা শুনে বেহুলা নাগদের মুক্ত করলেন।

২৪. লখিন্দর উঠে চম্পক নগরে যাত্রার উদ্যোগ নিলেন। বিধিমতো বেহুলা পিতা-মাতা ও ভাইদের কাছে বিদায় নিলেন।

২৫. বেহুলাকে নিয়ে বরযাত্রীরা ফিরল। উজানি, মুকুতাসহর, ফুলোটা নগর পার হয়ে চম্পক নগরী। সনকা পুত্রবধূকে বরণ করলেন। লোহার বাসর ঘরে নিয়ে যাওয়া হল তাদের। বেহুলা সাবধান করলেন আজ রাত্রে সর্পভয় আছে—সুতরাং নিদ্রা যেও না। বেহুলা আর লখিন্দর বাসরে কথাবার্তা বলতে থাকলেন।

২৬. বিধাতার লিখন, খণ্ডানো কঠিন। বাসরঘরে লখিন্দরের ক্ষিদে পেল! বেহুলাকে রান্না করতে বললেন তিনি। কিন্তু এখানে রান্না করা অসম্ভব, লোহার বাসর—কোথায় উনুন, জল, জ্বালানি বা তণ্ডুল। অনুচরীও কেউ নেই। বেহুলার আপত্তিতে কর্ণপাত করলেন না লখিন্দর। তার কথা—মঙ্গল হাড়ি আছে, পুরোন কাপড় ছিঁড়ে নাও, জ্বালানি হবে। সঙ্গে ঘি নিতে পারো। নারকেল জল আছে—নারকেলের মালা দিয়ে তে-মুখ উনুন করো। আর আমি হবো সাহায্যকারী অনুচর। বেহুলা আদেশমতো রান্না করলেন। সন্তোষের সঙ্গে লখিন্দর ভোজন করলেন। পাতে কিছু খাবার রেখে দিলেন তিনি—বেহুলাকে খেতে বললেন। বেহুলা কিন্তু সে খাবার খেলেন না। আজ তার উপবাস। উচ্ছিষ্ট মার্জনা করে লখিন্দরের পাশে বসলেন বেহুলা।

২৭. লখিন্দর বেহুলার রূপের প্রশংসা করতে লাগলেন। তারপর তাকে কামনা করলেন।

২৮. কাল রাত্রির দোহাই দিয়ে, পূর্বজন্মের প্রসঙ্গ তুলে, মোক্ষের লোভ দেখিয়ে বেহুলা স্বামীকে নিরস্ত করলেন। স্বামী সক্ষোভে রতিক্রিয়া না করেই ঘুমোলেন। এদিকে মনসার নাগদল যাতে প্রবেশ করতে না পারে, তাই চাঁদ লোহার বাসরে চারপাশে চার চোঙ্গদার, চার সেনাপতি, অসংখ্য ওঝা রেখে—রাত্রিজাগা পাহারাদার বসিয়ে, নিজে হেতালের লাঠি হাতে পাহারা দিতে থাকলেন। মনসা-নেতা কালনাগিনীকে তুষ্ট করে— নিদালি আর ঘুমালিকে সঙ্গে দিয়ে পাঠালেন চম্পক নগরে। কালনাগিনী সুতার সঞ্চার সম্ভব যে পথে, সেখানে প্রবেশ করে লখিন্দরের শিরোদেশে ফণা তুলে তাঁর মুখ দেখতে দেখতে বেদনাবোধ করতে থাকল। তার কান্না পেল।

২৯. অহঙ্কারী চাঁদ সদাগরকে নিন্দা করে সখেদে কালনাগিনী লখিন্দরকে দংশন করতে দেরি করতে থাকায় মনসা আকাশবাণী করলেন— কালনাগিনীকে ভয় দেখালেন তিনি। তিন লোক সাক্ষী করে লখিন্দরের বাঁ-পায়ের আঙুলে কামড় বসাল কালনাগিনী। ব্যথা পেয়ে সত্রাসে লখিন্দর উঠে পড়লেন। বেহুলা সুবর্ণ কাটারি তুলে ধরলেন। নাগ স্তম্ভ বেয়ে পালাচ্ছে দেখে তার লেজ কেটে নিলেন।

৩০. লখিন্দর বেহুলাকে জাগিয়ে কাঁদতে থাকলেন। তার মৃত্যু প্রত্যাসন্ন হল। বেহুলাও কেঁদে উঠলেন।

৩১. বেহুলার ক্রন্দন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেল। বিষও ছড়িয়ে গেল। লখিন্দর মারা গেলেন।

৩২. লখিন্দর জীবিত নেই। মাটিতে গড়িয়ে পড়ে বেহুলা কাঁদতে লাগলেন। কোনদিন খণ্ডব্রত করেছি নিশ্চয়, খণ্ডকথা শুনেছি, শিবপুজো ঠিকমতো করিনি। এখন লোকে আমাকে বলবে বিয়ের রাত্রে স্বামী মরেছে আমার। হাতে পেয়েও চাঁদকে রাখতে পারলাম না আমি।

৩৩. বেহুলার কান্না শুনে প্রহরীরা সবাই চাঁদ সদাগরের ভয়ে স্থান ত্যাগ করল। বেহুলার অনুরোধমতো চাঁদকে গিয়ে সংবাদ দেবার কেউ নেই। সনকা শুনলেন কান্না, কোন বধূ কাঁদছে! ঝাউয়াবতিকে খবর নিতে পাঠালেন তিনি। ঝাউয়া কিভাবে দেবে এই দুঃসংবাদ— ভাবতে থাকল। তার মনে গভীর দুঃখ—একথা সনকা যদি শোনেন নিশ্চয় আত্মহত্যা করবেন। তবু

কর্তব্যানুরোধে সেই দুঃসংবাদ সনকাকে দিল ঝাউয়া—সনকার কাছ থেকে চাঁদের কাছেও গেল লখিন্দরের মৃত্যুর খবর। চাঁদ ঊর্ধ্বশ্বাসে তীব্র দুঃখ প্রকাশ করতে করতে এলেন বাসরের দিকে—সঙ্গে সনকা।

৩৪. সনকার হাহাকার। আত্মহত্যা করবেন তিনি। তাহলে হয়ত পরলোকে পুত্রের সঙ্গে দেখা হবে।

৩৫. পুত্রের হাহাকার। মনসার অন্যায় আচরণের জন্যে তার নরকবাস হবে।

৩৬. পুত্রের মুখ দেখে চাঁদের বেদনা আরও তীব্র হল। কত দুঃখে যে পুত্র মরেছে! লোহার বাসব গড়া মিথ্যে হয়ে গেল! যাক, যাকে ভয় পেয়ে এত চেষ্টা-চরিত্র করেছি, আর তাকে ভয় করি না—ক্ষতি করার তো কিছু নেই। সনকা ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন—মনসার পূজা করলে কখনই এমন দুর্ঘটনা ঘটত না। চাঁদ তাকে প্রবোধ দিলেন। যার যেমন ভাগ্য—তাকে তেমনি ভোগ করতে হবে। বেহুলা শ্রদ্ধা জানিয়ে বললেন—তোমার মহিমা, চাতুর্য সব বুঝলাম। রাজা হলেও তুমি বুদ্ধিহীনের মতো কথা বলছো। মানুষ দেবতাকে পূজা করছে এর মধ্যে মানুষের আবার অপমান কি। যাই হোক, মনসাকে নিন্দা করে তুমি রাজ্যসুখ ভোগ করতে থাকো। আমাকে স্বামীর জন্যে একটা কাজ করতে দাও। মান্দাস বানিয়ে দাও আমায়। স্বামীর দেহ নিয়ে যাব আমি—মনসার কাছে। মনসা আমার প্রণতি স্বীকার করে যদি স্বামীকে বাঁচিয়ে দেন, তবে ফিরব। যদি তোমার কুবুদ্ধিকে ঘৃণা করে আমার প্রার্থনা না শোনেন সেখানেই থেকে যাব। শ্বশুরমশাই, তুমি লোকধর্ম মেনে আর মনসার নিন্দা করো না। মনসার পদে ভজনা করো। পুনর্বার পুত্রদের ধনজন-সহ সঙ্গে পাবে। মনসার নিন্দা করলে দুঃখশোক যাবে না। চাঁদ দ্রবিত হলেন। মালাকারকে ডেকে মান্দাস গড়ে ভাসানোর ব্যবস্থা হল।

৩৭. সনকার কাছে বেহুলা নিদর্শন রাখলেন। এক কড়া তেলের প্রদীপ স্থাপন আর সিদ্ধ হলুদ আর ধান বপন করে রাখলেন তিনি। দাবি—প্রদীপ জ্বলতে থাকবে ; সিদ্ধ ধানে ফুল ফল হবে। চাঁদ পুত্রবধূকে নিরস্ত করতে চাইলেন। তার বক্তব্য এরকম হয় না কখনও। বেহুলা সাবিত্রীর কথা বললেন। তার স্বামী দেবানন্দ, সখা সতানন্দ দূরদেশে পড়তে গেলেন ; সেদেশের কোটালের চক্রান্তে মারা গেলেন। সত্যবতী তার স্বামীকে বাঁচিয়ে তুললেন। রাজা চন্দ্রকেতুর কাহিনীও স্মরণ করলেন বেহুলা। রাক্ষসী কোন ব্রাহ্মণকে হরণ করে হত্যা করলে—রাজা চন্দ্রকেতুর ওপর ব্রহ্মহত্যার পাপ লাগে। রাজা তখন ব্রাহ্মণকে বাঁচিয়েছিলেন। আমি যদি সতী হই, নিশ্চয় স্বামীকেবাঁচিয়ে ফিরব। চাঁদ তখন লখিন্দরকে সাজিয়ে, স্নান করিয়ে মান্দাস সাজাবার অনুমতি দিলেন।

৩৮. বেহুলা অজ্ঞাত কোন আত্মদোষ ঘোষণা করে ভেসে চললেন। সকলের কাছে বিদায় প্রার্থনা করলেন তিনি।

৩৯. সনকা কাঁদতে থাকলেন। মান্দাস ভেসে চলল। অঞ্চলের লোকজনও দু' কূলে দাঁড়িয়ে বিদায় দিল।

৪০. কাক রূপে মনসা বেহুলাকে দেখা দিলেন—জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায় যাচ্ছ তুমি? বেহুলা পূর্ণ পরিচয় দিলেন। কাকরূপী মনসা বললেন গতকাল ডিম ফুটিয়েছি—ছানাদের খাবার চাই। বেহুলা বললেন, কাক যদি নিরস্ত হয় তাকে বহু রত্নে ভূষিত করবেন।

৪১. কাক বলল, তোমার পিতামাতাকে খবর দিতে চাও যদি—আমাকে নিদর্শন দাও। কাককে রত্ন-অঙ্গুরী দিলেন বেহুলা। সুমিত্রার কাছে সেটি নিয়ে গেল কাক। সুমিত্রা ছয় পুত্রকে

গুঙ্গড়িতে পাঠালেন। গুঙ্গড়িতে গিয়ে তারা মান্দাস দেখতে পেলেন। বেহুলাকে ডাক দিলেন। বেহুলা তাদের সব কথা বললেন।

৪২. দাদাদের সব কথা বিশেষত সঙ্কল্পের কথা বলে ভেসে চললেন বেহুলা। ধনাপুলার বাঁকে এসে পড়ল মান্দাস। ধনা মান্দাস থামাতে বলল।

৪৩. ধনাপুলাকে বিস্তৃত আত্মপরিচয় দিলেন বেহুলা। ছেড়ে দিতে বললেন।

৪৪. ধনাপুলা জলকূলের অধিকারী, তাই বেহুলাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন। এখন তিনি বেহুলাকে ছেড়ে দিলেন। এবার মান্দাস গেল গোদার ঘাটে। জনার্দন তার নাম। দুই পায়ে গোদ। প্রশ্ন করল গোদা। বেহুলা আত্মপরিচয় দিলেন। গোদা বলল—লখিন্দর তার ভাগনে। একাকী অন্য কোথাও না গিয়ে আমার কাছে এসো—তোমাকে পালন করবো। গোদার বঙ্ক থেকে বেহুলা চলে গেলেন—যথারীতি তাকে পূর্বজন্মের কথা বলতে হল। এবার এল জুয়ার বঙ্ক। জুয়া খেলে সেই বাঁকের অধিকারী সে, তার স্ত্রীপুত্রসহ সমস্ত কিছুই হারিয়েছে। তাকে নানা রত্ন দিয়ে বেহুলা ভেসে চললেন। জুয়ারি তবু তাঁকে ছাড়তে রাজি হয়নি। ধনরত্নও চাই, বেহুলাকেও বিয়ে করতে চায় সে। অভিশাপের ভয় দেখালেন বেহুলা। শেষ পর্যন্ত জুয়ারি তাকে ছেড়ে দেয়। এবার বড়সিয়ার বঙ্ক। বড়সি হাতে বসে আছে সেখানে— এক প্রতিবন্ধী। তার পায়ে বড় বড় গোদ। চক্ষু ঢেলার মতো বের হওয়া, হাত নুলো, পিঠে কুঁজ, তোতলানো তার কথা, মুখ বিকৃত, অণ্ডকোষ বড়, মাথায় সর্পাকৃতি ঝুঁটি, পেট বড়, কাঁকাল ছোট, গোঁফ জোড়া ঝাঁটার মতো, ঘোড়ার লেজের মতো দাড়ি। তার প্রস্তাব, আমি মাছ ধরি—তুমি মাছ বিক্রি করে সংসার প্রতিপালন করো। ঘরে তার তেইশটি বউ—বেহুলাকে প্রধান বউ করে দেবে সে! বেহুলা তাকে অভিশাপ দিলেন। মান্দাস থেকে বড়সি ধরে দিলেন টান। গোদযুক্ত প্রতিবন্ধী কামুকের তখন জলে পড়ে নাকানি-চুবানি খেয়ে যথেষ্ট হেনস্থা হল। বেহুলা শেষে তার শরীর ভাল করে দিলেন। এবার এল গিধিনী-শকুনির বঙ্ক। মৃতদেহের গন্ধে ডানা মেলে আসতে থাকে তারা। বেহুলা উপায়ান্তর না দেখে গলায় কাটারি দিয়ে নিজেকে মারতে গেলেন। মনসা রথে ভর করে এলেন। তাকে নির্ভয় করলেন। বেহুলার মান্দাস ভেসে চলল।

৪৫. এবার এল বাঘের বঙ্ক। বিশালাকার বাঘ লেজ ঠেকায় মাথায়। দশনের আঘাতে পাষাণ ভাঙ্গতে পারে। তাকে দেখে বেহুলা ভয় পান। মূর্ছাহত বেহুলাকে বাঁচাতে এগিয়ে আসেন মনসা। লেজ ধরে বাঘকে আকাশপথে ছুঁড়ে দেন— বহু দূরে। বেহুলার মান্দাস ভেসে চলল।

৪৬. এবার এল বুড়নিয়ার বাঁক। বুড়নিয়ারা যোগীবেশে নৌকা লুণ্ঠন করে। বুড়নিয়ারা বেহুলার মান্দাস আটকাল। বেহুলা কাতরভাবে অনুনয় করলেন। শেষে মূর্ছিত হলেন তিনি। মনসার মায়ায় অন্ধ হয়ে গেল বুড়নিয়ারা। বেহুলার জ্ঞান ফিরে এল। এবার মান্দাস পৌঁছল চৌমুখে। চারদিকে জল। কোনপথে যাবেন কিছুতেই স্থির করতে পারলেন না বেহুলা। কাঁদতে থাকলেন উপায়ান্তর না দেখে। মনসা নেতাকে যেতে বললেন। নেতা ধোপানীর বেশে গেলেন। পুত্রকে মেরে, কাপড় কেচে, পুত্রকে বাঁচিয়ে চললেন তিনি ফিরে। বেহুলা তাঁর পাদস্পর্শ করে মনসার উদ্দিশ জানতে চাইলেন। নেতা তাঁকে অনুসরণ করতে বললেন। সেই পথে দেবপুরীতে পৌঁছলেন বেহুলা।

৪৭. সিজুয়া পর্বতে ব্রহ্মা, ভৃগু, পরাশর ধ্যান করেন। কোথাও গান-বাজনা চলছে। বিদ্যাধর-অপ্সরারা গান গাইছেন, নাচছেন। কল্পতরু থাকায় জরা-মৃত্যু-দুঃখ-শোক নেই। দেবতারা অমৃত-ধারার জল খাচ্ছেন, চাঁদ সেখানে নিত্য উজ্জ্বল। পাখিরা কলরবরত, সাপরা বায়ুভুক। পশুরা,

মৃগেরা স্বর্গগঙ্গা জল পান করেই তৃপ্ত। শিখরশৃঙ্গে উমা মহেশ্বরের স্থান। দেবতাদের সামনে বেহুলা নাচ পরিবেশন করলেন। তার রূপে দেবতারা খুশি। মহাদেব কামনায় অধীর।

৪৮. শিব বেহুলাকে অবিরত রতিকর্মের প্রস্তাব দিলেন। বেহুলা মনে বড়ই ব্যথা পেলেন।

৪৯. বেহুলা শিবকে ভর্ৎসনা করলেন। শেষে বললেন, আমি তোমার নাতনি, কারণ তোমার কন্যা মনসার বর দাসী আমি।

৫০. পূর্বজন্মের কথা বললেন বেহুলা। মনসা উষা-অনিরুদ্ধকে পৃথিবীতে জন্মিয়েছেন কিভাবে, কেমন করে বিবাহ রাত্রে তার স্বামী মরেছেন, কেমন করে বহু কষ্ট সহ্য করে স্বর্গে এসেছেন—সেসব কথা বললেন। শিব নারদকে ডেকে মনসাকে দেবসভায় আসতে বললেন। মনসা বললেন, এ ব্যাপারে তিনি কিছুই জানেন না। বেহুলা কালনাগিনীর লেজের নিদর্শন দেখালেন। মনসা এবার তার বারমাস্যা বলতে থাকলেন।

৫১. চাঁদ মানুষ হয়েও তাকে নানাভাবে লাঞ্ছনা-গঞ্জনা দিয়েছেন। বৈশাখে সনকা মনসার পূজা করছিলেন। চাঁদ তার ঘট ভেঙ্গে দিয়েছেন। জ্যৈষ্ঠে মনসার অভিষেক, চাঁদ তাকে মন্দ কথা বলে গেছেন। চাঁদের শালী-রূপে তাঁর মহাজ্ঞান হরণ করেছেন মনসা। তার নাগরা চাঁদের নখরা বাগান ধ্বংস করেছে। তখন তড়িতের মতো সবদিক নিরমল, সঙ্ক-ধন্বন্তরি মনসাকে দুষ্ট কথা বলেছেন। আষাঢ় মাসে গোয়ালিনীর রূপ ধারণ করে সঙ্ক-ধন্বন্তরিকে বধ করেছেন মনসা। শ্রাবণ মাসে মনসা বধ করেছেন মালিনীর দুই পুত্র ধনা ও মনাকে। ভাদ্রমাসে চাঁদ নিন্দা করে গেছেন এক টানা—তার ঘরে নাগরাও যেতে ভয় পায়। এই অবস্থায় তার ছয় পুত্রকে হত্যা করেছেন মনসা। আশ্বিনে চণ্ডীপূজা—সবাই খুশি। মনসা পূজা না পেয়ে পরম ব্যথিত। ইন্দ্রের সভা থেকে সেজন্যেই উষাকে নিয়ে এলেন। কার্তিক মাসে চাঁদ সদাগরের শিয়রে স্বপ্নে আদেশ দিলেন মনসা—তাকে অনুপাম-পাটনে যেতে হবে। কালিদহে নাগদের দিয়ে ভয় দেখাবাব চেষ্টা করলেন। অগ্রহায়ণ মাসে চাঁদ পাটনে গেলেন। তাকে মায়া মোহে বন্দী করে রাখলেন তিনি—বার বছর। এই বার বছরে চাঁদ মনসাকে অপমান করেননি। পৌষ মাসে চাঁদকে দেশে ফেরার জন্যে স্বপ্ন দেখালেন মনসা। কালিদহে সপ্ত মধুকর ডুবিয়ে দি৻েন। নানা দুঃখ দিয়ে চাঁদকে মনসা আনলেন চম্পক নগরে। মাঘ মাসে চাঁদের মাসী রূপে হাজির হয়ে সম্বন্ধ করালেন মনসা—লখিন্দর-বেহুলার বিবাহের সম্বন্ধ। চাঁদ মুকুতা সহরে এলেন, মনসার কৃপায় বেহুলা তাকে লোহার কলাই সিদ্ধ করে পরিবেশন করলেন। প্রথম বসন্ত ঋতুতে ফাল্গুন এল। চাঁদ মনসার নিন্দা ছাড়লেন না। চৈত্র মাসে শিবের পূজা। মনসার নাম করতেই চাঁদ তাকে গালমন্দ করলেন। বৈশাখ মাসে বে᠄লাকে বিবাহ করালেন মনসা। অহঙ্কারী চাঁদ লোহার বাসর গড়লেন। অতি দুঃখেই বেহুলার স্বামী লখিন্দরকে মনসা নাগ পাঠিয়ে দংশন করিয়েছেন। বেহুলা বললেন, শ্বশুরকে বুঝিয়ে তিনি মনসার পূজার ব্যবস্থা করাবেন। স্বামী ও অন্যান্যদের প্রাণ ও ধনাদি ফিরিয়ে দিতে হবে। সঙ্কল্প করলেন বেহুলা—শ্বশুরকে দিয়ে পূজা দেওয়ানোর চেষ্টা করবেন।

৫২. মনসা বললেন, তোমার স্বামীর শরীর আনো। বেহুলা স্বামীর দেহ তুলতেই তার শরীর খণ্ড খণ্ড হয়ে পড়ল। মাংস-চামড়া ছেড়ে অস্থি কটা সার পাত্রে ধুয়ে আনলেন বেহুলা। রঘু বোদালি (রাঘব-বোয়াল) হাঁটুর মালাইচাকি খেয়ে গেছিল। মনসার ডাকে রঘু এল—তার পেট চিরে বের হল মালাই চাকি। এবার মনসা লখাইকে বাঁচানোর জন্য চেষ্টা শুরু করলেন। বিচিত্র উপায়ে মন্ত্র পড়ে পবনপাশে অস্থি বন্দী হল ; গরুড় আসনে নিরক্ষর তন্ত্রে বিষ দূর করার চেষ্টা শুরু হল। বিষের জন্মকথা বলতে লাগলেন মনসা। লখিন্দর বাঁচলেন। মনসা অনুরূপে ছয় ভাসুরকেও বাঁচালেন। এইখানে জাগরণ পালা শেষ হল।

ত্রয়োদশ পালা :

১. একা কিভাবে ফিবব—লখিন্দর জিজ্ঞাসা করলেন। বেহুলার প্রবোধ, তুমি বাজনা বাজাও আমি নাচ করি, দেবতারা সন্তুষ্ট হবেন। ছয় ভাসুরকেও বাঁচাবেন। তাই হল। দেবসভা থেকে বিদায় নিয়ে চললেন তারা। মনসা স্বয়ং মান্দাসে বসলেন। কালিদহে বেহুলা শ্বশুরের সপ্ত-ডিঙ্গা, গাথর-চাকরদের উঠিয়ে দিতে বললেন। তাই হল। চানক এল। বুড়নিয়াদের কথা শুনলেন লখিন্দর। তাদের প্রাণদণ্ড বিধান করলেন। বাগের বাঁকে এসে বাঘ মেরে—বাঁকে স্থাপিত হল 'বাগডেঙ্গা' নগব। গিধিনি-শকুনি হত্যা করে সেই বাঁকে স্থাপিত হল—'শকুনি নগব'। বড়সেয়ালেব বাঁকের পর এল লখাইয়ের মাতুলের বাঁক। তাবপর ধনাপুলার বাঁক। সেখানে 'চৌহাটা' নগর স্থাপিত হল। অদূরে চম্পক নগর।

২. বেহুলা সনকাকে ছলনা করার জন্য চুপড়ি-বিয়নি সহ ডোমনীর বেশে যাবার অনুমতি চাইলেন। লোকনিন্দার ভয় পেলেন লখিন্দর। শেষে চাইলেন—তাই। চুপড়ি-বিযানি সহ বেহুলা সনকার কাছে যাবার জন্য তৈরি হলেন।

৩. চম্পক নগরে অপরূপ ছন্দে বেহুলা ডোমনীর বেশে হাজির। লোকজন মোহিত। ঝাউয়াবতি বেহুলাকে চিনতে পারলো। সনকাকে গিয়ে বলল সব কথা। সনকা এসে চৌতারায় দুয়ার চেপে দাঁড়ালেন। তার পুত্রের কথা মনে পড়ল—স্থির বিশ্বাস এই ডোমনী বেহুলা। জাত খুইয়েছেন।

৪. ডোমনীর প্রতি অনিমেষ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকলেন সনকা— বললেন, তুমি আমার পুত্রবধূ ছাড়া কেউ নও। তোমাকে দেখে পুত্রের কথা মনে পড়ছে আমার। সনকার ক্রন্দনে বেহুলার বেদনা জাগল।

৫. বেহুলা সনকাকে বললেন, ক্ষুধাতুর আমি খাবার খাব। আমি স্নান করে আসি। লখাইকে সব কথা বললেন বেহুলা। লখাই বেদনায় আকুল। বাদ্য কোলাহল করে নৌবহর রামেশ্বর ঘাটে এল। দুর্লভ কাণ্ডারকে মনসার সামনে শপথ করানো হল—চাঁদ মনসার পূজা করলে এই সম্পদ তাঁর, অন্যথায় ফিরে যেতে হবে। পদ্মার নিশান সামনে নিয়ে দুর্লভ কাণ্ডারের দল চলল নৃত্যগীত গেয়ে। চাঁদ সোমাইকে পাঠালেন। সোমাই অবাক। মৃতে প্রাণ ফিরে পেয়েছে!

৬. দুর্লভ কাণ্ডার বেহুলার বলা শর্ত জানানোর পর চাঁদ-সনকা-ছয় বধূসহ রামেশ্বর ঘাটে এলেন। অবাক তারা। বেহুলা শ্বশুর-শাশুড়িকে প্রণাম করলেন। চাঁদ রাজা সাশ্রুনয়নে তাকে স্বাগত সম্ভাষণ জানালেন। সকলেই বেহুলার স্তুতি-বিনতি করতে লাগলেন।

৭. বেহুলার অসম্ভব কর্মকাণ্ডে সকলেই বিস্মিত। তাকে প্রশংসা করতে থাকল সবাই।

৮. বেহুলা শ্বশুরকে নানাভাবে বললেন—মনসা পূজার কথা। না করলে সবাই তাকে ত্যাগ করে মনসার কাছে ফিরে যাবে। সকলের একান্ত অনুরোধ অস্বীকার করতে পারলেন না চাঁদ। তবু বললেন, সবাই না বুঝে বলছে—সোমাই পণ্ডিত বলছে দক্ষিণার লোভে, ছয় পুত্রবধূ বলছে স্বামীদের আকর্ষণে, সনকা পুত্রশোকে আকুল হয়ে বলছে, ঝাউয়া দাসী বলছে সনকার বুদ্ধিতে। গাথর চাকররাও যে যার পরিবারের কথা ভেবে বলছে। বেহুলার সঙ্কল্প যখন, চাঁদ বললেন নিশ্চয় রক্ষা করব। তার আগে ডিঙ্গা যদি মাটির উপর দিয়ে আসে বুঝব মনসার মহিমা। বেহুলা খুশি। মনসা-নেতা পরামর্শ করে নাগদের নির্দেশ দিলেন—তারা মাথায় করে নৌবহর নিয়ে গেল চাঁদ সদাগরের গৃহে। সাড়ম্বরে মনসা পূজা হল।

৯. চাঁদের আকুতি প্রণতি।

১০. বহু ফুল দিয়ে পূজা করতে করতে ফুল শেষ হয়ে গেল। শেষে দাড়ি গোঁফ ছিঁড়ে চাঁদ নাগদের পূজা দিলেন। মনসা বেহুলা-লখিন্দর ছাড়া সবই চাঁদকে ফেরৎ দিলেন—বহুদিন ধরে ভোগ করার অনুমতি দিলেন তিনি।

১১. তিন জন্মের কথা স্মরণ করিয়ে মনসা মোক্ষপদের লক্ষ্য পূরণের প্রতিশ্রুতি দিলেন বেহুলাকে। এবার মোক্ষলাভের সময় এসেছে। তাদের স্বর্গবাস হবে। বেহুলা লখিন্দরকে বোঝালেন। মনসার রথে চেপে আত্মীয়দেব কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ফিরে চললেন তারা। উজানি নগর পার হয়ে যাবার সময় বেহুলার পিত্রালয়ের সকলের কাছে বিদায় নেবার বাসনা হল। তিনি আর লখিন্দর যোগী-যোগিনীর বেশ গ্রহণ করলেন।

১২. সাহের নগরে কৌতুকে ভ্রমণ করতে লাগলেন নবীন যোগী দম্পতি। তাদের কেউ ভিক্ষা গ্রহণ করলেন না কারো কাছে। শৃঙ্গনাদ দিয়ে দাঁড়াতে সুমিত্রা ভিক্ষা নিয়ে এলেন। তাদের দেখে কন্যা ও জামাতার কথা মনে পড়ল। তিনি তাদের বললেন থেকে যেতে। তার কাছে বেহুলা আত্মপরিচয় দিলেন। পিতামাতা ভাইদের কাছে বিদায় নিলেন। তারপর মনসা তাদের নিয়ে এলেন স্বর্গে। তাদের পাপ পরীক্ষা করলেন ইন্দ্র। পাঁচ হাত ক্ষুরধার পথ অক্লেশে পার হতে হল। বড় বড় পাথর কাঁকালে বেঁধে অগাধ সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে হল। মনসাকে স্মরণ রাখার জন্যে তারা জলে ভেসে থাকলেন। মৃত্যুগৃহে রেখে আগুন জ্বালান হল। মনসার কৃপায় তারা অক্ষত থাকলেন। এরপর ইন্দ্র মনসাকে পূজা প্রচারের কাহিনী শোনাতে থাকলেন—পুষ্পবৃষ্টি হল বেহুলা-লখিন্দরের উপর।

১৩. মনসা সব কথা আবার বললেন। অষ্টমঙ্গলা ও পুরশ্চরণ করে কাব্য শেষ হল।

।। ৮ ।।

কাহিনী গ্রন্থনে বিপ্রদাসের কৃতিত্ব

বিপ্রদাসের কাহিনী গ্রন্থন কৌতূহল সৃজনকারী, নির্দোষ ও মৌখিক রীতির অনুগত। এ কাহিনীতে নাট্যগুণ, হাস্য ও করুণরসের সার্থক মিশ্রণ ঘটেছে। মধ্যযুগের একজন কবির পক্ষে এইরকম নাট্যগুণসম্পন্ন রচনা উপহার দেওয়া যথেষ্ট শ্লাঘনীয়। কাহিনীটি কবি জানতেন সম্পূর্ণই—মনে মনে বিন্যস্ত করে উপহার দিয়েছেন। মনসার জন্মকথা— যাকে 'আদ্যের কথা' বলা হত একসময় (এবং এই সূত্রে ধর্মমঙ্গল কাহিনী ও মনসামঙ্গলের কাহিনীর কিছু সমাপতন ঘটেছে)—ও আনুষঙ্গিক, কবির উদ্ভাবনী ক্ষমতার পরিচয়বাহী। বিশেষত শিবের রিপুকার হিসেবে পার্বতীর কাঁচুলি নির্মাণের বিষয়টি বিপ্রদাসের নিজস্ব। শিব-দুর্গার কলহ বা 'ডোম চাঁড়ালি' বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের বিশেষ নির্মাণ। এই ধারায় 'মনসামঙ্গল'-এর কবিরা বিভিন্নভাবে তাদের কাহিনী সাজিয়েছেন। বিজয়গুপ্তের ডোমনী-বেশধারিণী চণ্ডী পারের কড়ি না দেওয়ায় শিবকে কথঞ্চিৎ কটু কাটব্য করেছেন :

পারের কড়ি যদি তুমি নাহি দাও শিব।
ত্রিশূল শিঙ্গা তোমার সব বিত্ত কাড়ি নিব॥
শিঙ্গা কেটে শিব হে আমার গলায় হার দিব।
ত্রিশূল ভাঙ্গিয়া আমি লাঙ্গলের ফাল করিব॥
কটি ধরা নিয়ে যাব হংস বান্ধিবার।
ডম্বুর দিয়া ফেলিবে ছেলেরা আমার॥

কমণ্ডলু নিয়া মম অম্বল ঢালিব।
ঝুলিতে ভরিয়া মম তুষ ঘষী রাখিব।।

[পদ্মাপুরাণ . বিজয় গুপ্ত : প্যারীমোহন দাশগুপ্ত সঙ্কলিত , বসন্তকুমার ভট্টাচার্য সংশোধিত; বাণী নিকেতন, বরিশাল, ১৩৩৫ সংস্করণ ; ১২ পৃষ্ঠা]

এরপর বিজয় গুপ্তের পার্বতী শিবকে ডেকে নিজের ঘরে রান্না করে খাদ্য পরিবেশন করেছেন। তাবপর তাঁর তীব্র শ্লেষাঘাত :

কোন দেব হইয়ারে সে যে বা খায় ভাঙ্গ।
কোন দেব হইয়ারে সে যেবা.মস্তকে ধরে গঙ্গ।।
কোন দেব হইয়ারে সে যেবা ভগ্ন মাখে গায়।
কোন দেব হইয়ারে সে যে বা শ্মশানে বেড়ায়।।

কিংবা—

মদন আনন্দে তোমার বুদ্ধি হইল ক্ষে।
খাইলা ডোমের অন্ন তোরে ছোবে কে।।

কিসেরে বেড়াও পাগল শিব তপস্বীর ছন্দে।
বারে বারে ভাগিয়া যাও এবার পড়িলা কান্দে।।
ভাঙ্গধুতুরা খাইয়া শিব শ্মশান ঘাটে নাচ।
বুড়াকালে ডোমনী পরিবার [১]এার[১] কার্যে আছ।।
কার্যের গতিকে মুই ভুঞ্জিলাম সাচা পাগল শিব।
ডোমনীর সঙ্গে জাতি দিলা তাহা কহিয়া দিব।।

১. প্যারীমোহন 'এ ছাড়' লিখেছেন।

জগজ্জীবন ঘোষাল অনুরূপ পরিস্থিতি সৃজন করেছেন পার্বতীর গোয়ালিনী রূপ ধারণের মারফত। শিব তাঁকে কামনা করায় পার্বতীর বক্তব্য :

গোয়ালিনী বোলে আমরা নীচ জন।
ত্রিদশ ঈশ্বর-বাক্য লঙ্ঘিব কেমন।।

এই মিলনের পর গণেশের জন্ম হয়েছে— শিব পার্বতীকে 'কাতি' উপহার দিয়েছেন :

ফিরিয়া চলিলা দেবী আপনার ঘর।
গণেশ জন্মিলা দেবীর গর্ভের ভিতর।।

(জগজ্জীবন ঘোষালের মনসা মঙ্গল ; দেবখণ্ড ; ড. আশুতোষ দাস সম্পাদিত ; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত ; ১৯৮৪; দেব খণ্ড ; ৭৫ পৃ.)

জগজ্জীবন এরপর দেবীকে কুচুনীর মূর্তিতে মহাদেবের সঙ্গে মিলিত করেছেন। কুচুনীও বলেছেন তাঁর অস্পৃশ্যতার কথা :

কুচুনী বোলেন প্রভু মুঞি নীচ জন।
দেবের দেবতা বাক্য লঙ্ঘিব কেমন।।

কুচুনীবেশী পার্বতী, তাঁর কাছে রত্ন অঙ্গুরী উপহার নিয়েছেন।

কুচুনী বোলে প্রভু শুন ভগবান।
মোকে দেহ হস্তের প্রভু অঙ্গুরি নিশান॥

এই মিলনের ফলে কার্ত্তিকের জন্ম হল।

বিপ্রদাস রত্নঅঙ্গুরির কথা লিখেছেন—ডুমনীবেশী পার্বতীকেই শিব ঐ উপহার দিয়েছেন।

কামে হতচিত হৈয়া ত্রিদশের নাথ।
রতন অঙ্গুরি দিলা ডুমুনীর হাত॥ (১.১৫.১৯৬)

দ্বিজ বংশীদাসের মনসামঙ্গলে ডোমনী বেশেই হরপার্বতীর মিলন বর্ণিত। সে বর্ণনার সঙ্গে বিজয় গুপ্তের বর্ণনার মিল দুর্লক্ষ্য নয়। পার্বতী সাবধান করছেন কামাহত শিবকে :

যদি মোর ডোম আসি লাগ পায় তোর।
তবে সে পাইবা বুড়া প্রতিফল এর॥
তোমারে কাটিয়া আজি ফেলিবেক গাড়ি।
বৃষ গোটা বেচিয়া লইবে খেয়া কড়ি॥

[*শ্রীশ্রীপদ্মাপুরাণ* ; দ্বিজবংশীদাস বিরচিত ; শ্রীঅনাথবন্ধু কাব্য ব্যাকরণতীর্থ কর্তৃক সংগৃহীত ও পরিশোধিত ; বেনীমাধব শীল'স লাইব্রেরি ; কলকাতা ; প্রকাশ কাল দেওয়া নেই। পৃ. ৪২, দ্বিতীয় স্তম্ভ]

বিজয় গুপ্তে পেয়েছি একই অনুষঙ্গ। সেখানে সামান্য হেঁয়ালি-র ঢং প্রয়োগ করেছেন কবি। দেখাই :

ডোম নারী বলে তোর ধরিয়াছে রসে।
তুমি যাবে খেয়ার নায় বলদ থোবা কিসে॥
সমুদ্র উথাল ঢেউ দেখিতে ভয় লাগে।
বলদ এড়ি পার হও বলদ নিবে বাঘে॥

এ হল নিতান্তই বাংলার চেনা একটি হেঁয়ালির ভাঙাচোরা রূপ। নৌ-পারাপারকারী এক পান বিক্রেতা ও একটি ছাগলকে পার করার হেঁয়ালি। একদিকে আছে একটি বাঘ। পান ও ছাগল এক পারে থাকলে পান রক্ষা হবে না। ছাগল ও বাঘ এক পারে থাকলে ছাগলের প্রাণরক্ষা পাবে না। বিজয় গুপ্ত এই হেঁয়ালির জগৎ ভেঙে তাঁর বর্ণনার (Narrative) জগৎটি নির্মাণ করেছেন। শিবকে নিতান্ত লোকায়ত ভঙ্গিতে উত্থাপন করেছেন তিনি। শিবের সমাধান সূত্র:

হাসিয়া বলেন শিব শুন ডোমের ঝী।
নায় না ধরিবে বলদ তোমার হইল কি॥
আমার বলদের গায় তুলা হেন ভার।
নায় না ধরে বলদ দিবেক সাঁতার॥

[বিজয়গুপ্ত : উক্ত ; ১২ পৃ. : দ্বিতীয় স্তম্ভ]

বিপ্রদাসের বর্ণনায় পাচ্ছি, ডোমনীবেশী চণ্ডী শিবকে স্বামীর ভয় দেখাচ্ছেন :

যদি প্রভু দেখে মোর এই ব্যবহার।
কর্ণ নাসা কেশ ছেদ করিব আমার॥ (১.১৪.১৯২)

বিজয় গুপ্ত জানাচ্ছেন সেই 'স্বামী খরতর'। শিব তাকে 'বলদ বেচিয়া' পারিশ্রমিক দেবার কথা বলছেন।

নারায়ণদেব মনসামঙ্গলের গুরুত্বপূর্ণ কবি। তাঁর কাব্যের একটি অংশ 'ডুমনি সংবাদ'। ডুমনি-বেশী পার্বতী বলেছেন :

ত্রিদশের নাথ তোমায় বলে কোন ছারে।
ঘবের স্ত্রী তুমি রাখিতে না পার॥
দেবের দেবরাজ কেনে নাম ধর॥
জন্ম ভিখারি বাউল বচন মাত্র সার।
এক কড়া কড়ি নাহি খেওয়াতে দিবার॥

খেয়ার পারানি দিতে না পারায় পার্বতী বলেছেন :

পার হইবা কেমনে খেওয়ার কড়ি বিনে
ঝুলি কাঁথা থুইয়া যাও বান্ধা॥

ডুমনির কাছে রতি-প্রার্থনা করলে চণ্ডী শিবকে বলেছেন বৃদ্ধ বয়সে এই কর্ম অনুচিত। সে সময়কার বর্ণনা :

ডুমনি বলে দাড়ি গোপ পাকাইলা কেনে।
আপনার বোল তুমি না বুঝ আপনে॥
বানরের মুখে যেন ঝুনা নারিকেল।
কাকের মুখেতে যেন দেখি পাকা বেল॥

(১৩২৩ বঙ্গাব্দের ৩০ আষাঢ় সঙ্কলিত 'সাংকয়েড়া'-র শ্রী কৈলাসচন্দ্র রায় [বসাক] সঙ্কলিত নারায়ণ দেবের মনসামঙ্গল পাণ্ডুলিপি থেকে। পুথিটি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের। এর অনুলিপি করতে দিয়ে পুথিশালার তদানীন্তন অধ্যক্ষ ড. সুনীলকুমার ওঝা আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে বেঁধেছেন।)

বোঝা যাচ্ছে, মনসামঙ্গল কাহিনীর একটি পুরাণ-নিরপেক্ষ লৌকিক রূপ গড়ে উঠেছিল। গয়েনরা প্রয়োজনবোধে কাহিনী বিস্তার করেছেন—আসরের দাবি অনুযায়ী। এই রচনাধারার মধ্যে বিপ্রদাসের লেখায় আছে সংহতি। বিশেষত শিব-দুর্গার কলহ বিবরণ বাংলার দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে প্রচলিত স্বতন্ত্র কাব্যধারা হিসেবে বিকশিত শিবায়নের সঙ্গে মেলে। শিবায়নের অনুরূপ (রিপু কুশলীর মতো) চরিত্র শাঁখারি। শিব যেখানে পার্বতীকে শঙ্খ পরিয়েছেন আর শেষ পর্যন্ত পার্বতী 'প্রাণনাথে জান্যা প্রেম আলিঙ্গন' দিয়েছেন। (পশ্য : নগেন্দ্রনাথ রায় : *শিবায়ন ও ব্রাত্য জনগণের কবি রামেশ্বর* ; শহীদ প্রকাশন ; মেদিনীপুর ; ২০০১ ; ১২৮ পৃ.)। রিপু কুশলী রূপী শিব-পার্বতীর কাঁচুলি তৈরি করে দিয়েছেন—বিপ্রদাস তাঁর বিস্তৃত বিবরণ দেননি—সংক্ষেপে সেরেছেন। (১.১৫.২০৪-২০৯)। বিপ্রদাস বেহুলার কাঁচুলি নির্মাণের বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন অন্যত্র। বিশ্বকর্মা সেখানে মনসার অনুরোধে উক্ত নির্মাণ কর্ম করেছেন। রামেশ্বর ভট্টাচার্য ১৫৯ সংখ্যক গানে এইরকম বর্ণনা দিয়েছেন (নগেন্দ্রনাথ রায় : উক্ত ; ১৯-১৩০ পৃ.)।

লোকায়ত কাহিনীর বিস্তার ও পরিবর্তনের ছবি বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের কাব্যে যথেষ্ট। পুরাণ-সংস্কৃতি আর লোকসংস্কৃতির টানাপোড়েনে রচিত এই কাব্যকথা—মধ্যযুগের বাংলার

সাংস্কৃতিক বিমিশ্রণের (acculturation) আশ্চর্য উদাহরণ। সামান্য কিছু প্রমাণ দাখিল করা যাক।

শিবের জটায় কেন গঙ্গা, এই প্রসঙ্গে বিপ্রদাসের আখ্যান সম্পূর্ণ মৌলিক বোধ হয়। লিখেছেন বিপ্রদাস—শান্তন ঋষির স্ত্রী গঙ্গাকে দেবতারা যজ্ঞে রন্ধনের জন্য নিয়ে যান। দেবতাদের প্রতিনিধি শিবকে শর্ত করান শান্তনু ঋষি :

যদি ভাগীরথী আজি বঞ্চেন তথাই।
তবেত গঙ্গারে আমি নাহি দিব ঠাঞি।। (১.৬.১০৬)

রাত কাটিয়ে ফিরলেন গঙ্গা, তাঁকে শান্তন ঋষি গ্রহণ করলেন না। প্রত্যাখ্যাত গঙ্গা শিবের কাছেই থাকতে বাধ্য হলেন :

কোপে ঋষি গঙ্গারে না লৈলা নিজ ঘরে।
গঙ্গা লৈয়া গেলা নিজ পুর মহেশ্বরে।। (১.৬.১১০)

ধর্মঠাকুর—নিরঞ্জন গোসাইয়ের দর্শনাভিলাষী শিব গেলেন কঠোর তপস্যা করতে। ধর্মঠাকুর স্বয়ং এসে দেখা দিলেন গঙ্গাকে।

ধবল ছত্র করি শিরে দণ্ড কমণ্ডুল করে
উলূকে করিয়া আরোহণ।
ধবল শ্যামলতর শোভে দিব্য কলেবর
হরের আশ্রমে দরশন।। (১.৮.১১৩)

দ্বাদশ বৎসর শিব যাকে ধ্যান করে দর্শন করতে ব্যর্থ, তাঁকে নিতান্ত অপ্রস্তুত গঙ্গা দেখতে পেলেন। তবে দেখার চিহ্ন তার মুখে চিরস্থায়ী হল। 'ধর্মের বদন দেখি গঙ্গা ধবলমুখী'—হয়ে গেলেন। অন্যান্য দেবতারা ধবলমুখী গঙ্গাকে মহৎ বলে স্বীকার করে নিলেন।

দেখিলা গঙ্গার মূর্তি ধবল আকর।
চতুর্মুখে ব্রহ্মা স্তব করেন গঙ্গার।। (১.১১.১৪৪)

ইন্দ্র, দ্বাদশ আদিত্য, নবগ্রহ, নারদাদি ঋষিদের সামনে শিব তাঁকে শিরে ধারণ করলেন।

সম্ভ্রমে পুলক হর ভাবিয়া অন্তরে।
ভক্তি ভাবে গঙ্গারে তুলিয়া লৈল শিরে।। (১.১১.১৪৫)

গঙ্গার এই বিবরণ বিপ্রদাস কোথায় পেলেন? শান্তন ঋষি নিশ্চয় মহাভারতের শান্তনু-র পরিবর্তিত রূপ। শান্তনু নামে এক ঋষির কথা অবশ্য পুরাণে আছে—তাঁর স্ত্রী অমোঘা। (*পৌরাণিক অভিধান* : সুধীরচন্দ্র সরকার সঙ্কলিত ; এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রা. লি, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত চতুর্থ সংস্করণ ; ১৩৮৮ ; ৫০৩ পৃ.)। তবে এই ঋষির সঙ্গে গঙ্গার সম্পর্ক নেই। শান্তনু ঋষির সঙ্গে গঙ্গার সম্পর্ক মহাভারতের উত্তরাধিকার। গঙ্গা শান্তনুকে ত্যাগ করে গেছেন মহাভারতে, কারণ তিনি পুত্রদের ভাসিয়ে দিচ্ছেন কেন— সে প্রশ্ন করেছেন কুরুরাজ। এই কাব্যে সেই প্রশ্ন একটু ভিন্নভাবে হাজির। পুরাণে অবশ্য গঙ্গার কাহিনী যা পাওয়া যায় তাতে সঙ্গতি বিধান করা যায় না। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে গঙ্গাকে বিষ্ণুর স্ত্রী বলা হয়েছে, মহাভারতে শান্তনুর স্ত্রী আর বাংলার জনপ্রিয় মৌখিক-সংস্কৃতিতে (Oral tradition) গঙ্গা ও চণ্ডী শিবের স্ত্রী। শিবের জটায় গঙ্গার বন্ধন করার কাহিনী ভগীরথের গঙ্গাবতরণের অনুষঙ্গে পাওয়া গেছে।

॥ ৯ ॥

বিপ্রদাসের চরিত্র সৃষ্টি

৯.১ দেবী চরিত্রের মানবী সত্তা

বিপ্রদাসের কাব্যে মানবিক রসাবেদন অত্যন্ত বেশি। তিনি যখন লিখছেন তখন মনসা-মঙ্গল কাহিনী বাংলায় স্থির একটি চেহারা ধারণ করেছে। এ কাহিনীর কোন অংশই শ্রোতৃমণ্ডলির কাছে অজ্ঞাত ছিল না। প্রধান ভূমিকা বা চরিত্রগুলি সম্পর্কে তারা স্পষ্ট ধারণা করে নিয়েছেন— মুখ্য ভূমিকাগুলির পরিণতিও তাদের অজানা নয়। এরকম শ্রোতৃমণ্ডলিকে মানবিক ব্যবহারের বিবরণের বৈচিত্র্য যোগানো রীতিমতো কঠিন। বিপ্রদাস কিন্তু সেই কাজটুকু করতে পেবেছেন।

গঙ্গা : দেবদেবীর চরিত্রে তিনি এনেছেন মানবিক গুণ। যখন তারা বিভিন্ন রূপান্তর গ্রহণ করেন, তখন তা হয়েছে মানুষেরই মতো। গঙ্গা কে তিনি শান্তনুমুনির গৃহিণী করেছেন। পশুপতি শিব দেবতার যজ্ঞে রান্না করার জন্যে মুনির কাছে গঙ্গাদেবীকে নিয়ে যাবার জন্য প্রার্থনা করতে মুনি শর্ত দিয়েছেন :

যদি ভাগীরথী আজি বঞ্চেন তথাই।
তবেত গঙ্গারে আমি নাহি দিব ঠাঞি॥ (১. ৬. ১০১)

গঙ্গাকে দিনে দিনে ফেরৎ পাঠানো গেল না। শান্তনু মুনি গঙ্গাকে প্রত্যাখ্যান করলেন। শিবের গৃহে গঙ্গা থাকতে বাধ্য হলেন। মানুষ আর দেবতার শর্ত-শুদ্ধতার ধারণা আর জেদ রক্ষার জন্যে এক শরীকে গৃহছাড়া হতে হল। দেবত্বের ধারণা সাময়িকভাবে ভুলে গেলে এই গঙ্গাকে স্বামী পরিত্যক্তা মধ্যযুগের নারী ছাড়া আর কিছু ভাবা সম্ভব নয়।

গঙ্গা শিবের ঘরের কাজকর্ম করেন, শিব চলে যান ধ্যানে। বার বছর ধরে চলে তার তপস্যা। এসময় গঙ্গার কিভাবে কাটল, কবি সে প্রশ্নের উত্তর দেন নি। বার বছরের শেষে ধর্মঠাকুর সহসা এসে উপস্থিত! শিব ধ্যান করছেন ধর্ম ঠাকুরকে দেখার জন্যে, ধর্মঠাকুর দেখা দিলেন গঙ্গাকে। তিনি এসে উপস্থিত হলেন আত্মীয় স্বজন অতিথির মতো—

ডাকিলা শিবের তরে করিয়া মধুর স্বরে
গঙ্গা আছিলা সেই ঘরে। (১. ৮. ১০৮)

তিনি গঙ্গাকে দেখলেন, গঙ্গা তার কাছে 'পরিহার' প্রার্থনা করলেন! কেন? বিপ্রদাসের ব্যঞ্জনা বোধ করি গঙ্গা অনেকটা যেন সমস্ত পুরুষ দেবতারই কামনার লক্ষ্য। এমন না হলে 'পরিহার' শব্দটির প্রয়োগ হত না।

দেখি নিরঞ্জন কায় গঙ্গা চমকিত হয়
কর জোড়ে কৈলা পরিহার।

ধর্মকে যেটুকু দেখলেন, তাতেই গঙ্গার মুখ সাদা হয়ে গেল। ধর্মঠাকুর কুষ্ঠ নিবারণের শক্তি ধরেন একথা মনে রাখলে এই চরিত্রায়ণ প্রণালীর রহস্য ভেদ করা সম্ভব। বিপ্রদাস হয়ত গঙ্গাকে বহু-দেব-ভোগ্যা নারী হিসেবে অঙ্কিত করতে চান। দেবী নন, গঙ্গা এখানে নিতান্তই মানবীতে পর্যবসিত।

গঙ্গা ধর্ম-নিরঞ্জনকে বসিয়ে রাখার চেষ্টা করলেন। ধর্মঠাকুর রাজি নন। তার কথা— তুমি দেখেছ, তাতেই তার দেখা হয়ে গেছে।

তোমারে দেখিলে হর সেই দেখা মোরে।
শিবে জটা মেলি জেন লয়ে তোমা শিরে॥ (১.৯.১১৮)

শিব প্রথমে গঙ্গার কথা বিশ্বাসই করেন নি। তার প্রশ্ন :

কহগো ধবল মুখি এথা আমা নাহি দেখি
গিয়াছিলা কাহার উদ্যানে।
কেমত দেখিলা তথা কই গো স্বরূপ কথা
ধবল হইলা কি কারণে।। (১. ১০. ১২৭)

শান্তনু মুনির মতোই, শিবও গঙ্গাকে অবিশ্বাস করছেন এখানে। ধর্মের দোহাই, না হলে শিব তাকে নিশ্চয় ভালো চক্ষে দেখতেন না।

খবর শোনার পর দেবতারা সবাই দেবী গঙ্গাকে ঘিরে উৎসব করতে আরম্ভ করলেন। গঙ্গাকে চতুর্মুখে স্তব করলেন ব্রহ্মা, এলেন অন্য দেবতারা, অষ্ট দিকপাল, ইন্দ্র আর শচী। শিব কিন্তু পরম বঞ্চিত— তিনি 'হস্তপদ আছাড়িয়া পড়িলা ধরণি।' দেবতারা এখানে আসরে উপস্থিত ধর্মপ্রাণ সাধারণ মানুষের মতোই—শূন্য মূর্তি অদেখা ঈশ্বরদর্শনের আকুল ইচ্ছা তাদের।

গঙ্গা চরিত্রের তেমন বিকাশ ঘটেনি। ভূমিকাটি ব্রাত্য অবহেলিত নারীর চিত্র স্পষ্ট করে। দেবতা হলেও তিনি নিতান্ত মানবী। মানুষের সংসার থেকে দেবতার সংসারে কায়ক্লেশে দিনাতিপাত তার।

চণ্ডী : চণ্ডীর ভূমিকা মনসামঙ্গলে চমৎকার— বহুমুখী। তার মধ্যে হিংসা, দ্বেষ, প্রতিহিংসা, কৌতুক, বিচিত্রগতি পরিকল্পনা আর প্রেম একাকার হয়ে গেছে। শিবের কালিদহ যাত্রার অর্থ তিনি বুঝতে পারেন নি। বুঝতে চানও নি। ধর্ম বলেছিলেন, কালিদহে শিব যদি যান, তাবে নারীরূপে দেখতে পাবেন।

তবে যদি অতি খেদ করে দেব রায়।
কালিদহে কমল তুলিতে যেন জায়।।
কালিদহে কমল তুলিব মায়াধর।
তবে কন্যা রূপ মায়া দেখিবেন হর।।

বোঝা যায়, স্বামীর চরিত্র-ভ্রষ্ট হবার সম্ভাবনা চণ্ডীকে চঞ্চল করেছে। তার সন্দেহ—

কেমন হরের মতি কেমন বা শুদ্ধমতি
ছলিয়া দেখিব শূলপাণি।। (১. ১২. ১৪১)

দেবী দুর্গার সন্দেহ অমূলক ছিল না। প্রথমত, শিব তাকে বার বার কালিদহে যেতে নিষেধ করেছেন ; দ্বিতীয়ত, শিবের অলক্ষে নৌ-পারাণী ডোম নারী সেজে শিবানী বুঝেছেন তার স্বামীর চরিত্র নিষ্কলঙ্ক নয় ; তৃতীয়ত, মনসাকে দেখে শিবের মনে কামনাই জেগেছে। এইরকম স্বামীকে সন্দেহ করার পর চণ্ডী খুব স্বাভাবিকভাবেই মনসাকে সম্ভাব্য সতীন বলে মনে করেছেন। চণ্ডীর ব্যবহার এখানে মধ্যবয়সী নারীর মনস্তত্ত্বের স্বাভাবিক ন্যায় মেনে উপস্থাপিত।

কুশলী রিপুকার হয়ে অঙ্গবস্ত্র (কাঁচুলি) রিপু করে দেবার যে প্রসঙ্গ এনেছেন বিপ্রদাস, তাতে দেবী চণ্ডীর প্রসাধন-প্রিয়তার ছবি স্পষ্ট হয়। এতো যে-কোন যুগের নারীর-ই সাধারণ স্বভাব।

দুর্গা-মনসার তীব্র প্রাণান্তকর রুচি-বিগর্হিত কোন্দল মনসামঙ্গলে মানবিক ন্যায় মেনেই এসেছে। চণ্ডীর স্পষ্ট অভিযোগ :

বাপের সহিত রতি ভুঞ্জ নিরন্তরে।
লুকাইয়া রাখে আনি পুষ্পের ভিতরে।।

চণ্ডীমঙ্গল ঐতিহ্যে কালকেতুর আনা গো-সাপটি ষোড়শী হয়ে দেখা দেবার পর ফুল্লরাও তাকে ছেড়ে কথা বলেন নি। নারী মাত্রই অসপত্ন অধিকার ও স্বামীর প্রেম কামনা করে। শিবের অনুপস্থিতিতে চরম ঘৃণার কথা শুনে মনসা তাকে নিরস্ত করতে গেছেন কথায়। পারেন নি। চণ্ডী তার চক্ষু কানা করে ছেড়েছেন ('মহাকোপে চণ্ডিকা লইল কুশাবাণ। তাব ঘায়ে মনসার চক্ষু হৈল কাণ।।) মনসা সৎ-মায়ের দিকে বিষ নয়নে তাকাতে তিনি মারা গেছেন। এসময় শিবকে ডেকে মনসা বলেছেন :

না কর সন্তাপ বাপু দিব জিয়াইয়া।

তাই হল। বেঁচে ওঠা মাত্র চণ্ডী আবার মনসার সঙ্গে কোন্দল জুড়েছেন। শেষে দেব সমাজে নিন্দার হাত থেকে বাঁচতেই শিব মনসাকে নির্বাসন দিলেন। এ-কাহিনী দেবতাদের কাহিনী হিসেবেই রচিত, তবে বাস্তবতা এখানে উল্টে উপস্থিত। এ আসলে মানুষের সংসার জীবনের নিতান্ত পরিচিত ছবি।

শিব দ্বিতীয় মন্থন লব্ধ গরল পান করে জ্ঞান হারাবার সংবাদ পাবার সময় চণ্ডীর আচরণ প্রেমময়ী নারীর নিতান্ত মানবিক বৃত্তি ছাড়া কিছু নয়।

ক্ষীর নদী তীরে ত্রিদশ ঈশ্বনে
ঢলিলা গরল খায়্যা।।
শুনি হেন বাণী চিন্তিত ভবাণী
আকাশ ভঙ্গিল মুণ্ডে।
দুই পুত্রে ধরি আর্তনাদ করি
প্রভু বলি ডাকে মুণ্ডে।। [৩. ৩. ৩৭-৩৮]

তার খেদ 'প্রভুবিনে কি মোর জীবনে'। শিবকে 'জগতের নাথ' যে বলেন বলুন, চণ্ডীর কাছে তিনি নিতান্ত ভ্রান্ত বুদ্ধি, আদি অন্ত না ভেবে অপরিণামদর্শী এই মানুষ তিনি। উন্মত্তপ্রায় বাতুল ব্যবহার।

পাগল তোমার মন তেজি রত্ন অভরণ
অস্থি মালা ধরহ দ্বাদশ।

—এরকম যার বেশ ভূষা আচরণ তার পক্ষেই বিষপান করে মারা যাওয়া সম্ভব। মলয়জ কস্তুরি ত্যাগী শিব বিভূতিভূষণ, বসন ত্যাগ করে কৃত্তিবাস, গৃহধর্ম ছেড়ে ভিক্ষাবৃত্তিধারী। সবার শেষে তিনি চিতায় আরোহণ করে প্রাণত্যাগ করতে চেয়েছেন।

মায়ামোহ তেয়াগিব প্রভুর সংহতি জাব
সাজাইয়া দেহ হুতাশন। [৩. ৩. ৪৮]

এই রচনাংশে দেবীত্ব বিন্দুমাত্র নেই। মৃত্যুঞ্জয় শিবের ঘরনি দেবী চণ্ডী এখানে সদ্য বিধবার অনুমৃতা হবার বাসনায় বিমর্ষ এক চেনা পৃথিবীর নারী মাত্র। গঙ্গা মনে করালেন মনসার কথা। মনসা এলেন।

মনসা এখানে সৎ-মা চণ্ডীকে দেবসমাজে হেনস্থা করার সুন্দর একটি কৌশল করেছেন। নারদের মারফৎ বলে পাঠালেন, তাকে যেন বসন পাঠান সৎ-মা। শোকের মধ্যেও চণ্ডী মনভরে ভালো একখানা কাপড় পাঠাতে পারলেন না! তিনি তো সর্বদর্শী আদ্যাশক্তি নন— তিনি দোষে গুণে মেশানো নারী। জননী সত্তা অপেক্ষা তার রমণীসত্তাই প্রবল। সৎ-মেয়েকে মেয়ে বলে

স্বীকার করতে পারেন নি কখনই। যাই হোক, মনসাকে কাপড় দিতে ঘরে যাবার পর চণ্ডীর রমণী-সত্তা কেমন প্রবল হল দেখাই :

শুনি চণ্ডী শীঘ্র গেলা আপনার ঘরে।
ভালো বস্ত্র লৈতে সত্ত কিছু নাহি পুরে॥
হাত পাঁচ কাঁচা খানি কাঁক তলে থুয়্যা।
চলিল সত্বরে দেবী সখীগণ লৈয়া॥ (৩. ৮. ৭৫-৭৬)

দেবতাদের সামনে সর্বাভরণা সুন্দরী রূপে জগৎগৌরী মনসা হাজির হলেন। চণ্ডী যৎপরোনাস্তি বিস্মিতা হলেন। 'যে দিগে চাহেন সব রত্ন বিভূষিতা।' চণ্ডীর পাশে মনসাকে উজ্জ্বল করাই হয়ত এই কাহিনীর লক্ষ্য। তবে মানবিক গুণে চণ্ডী এখানে উজ্জ্বলতর। সুযোগ বুঝে মনসা সব দেবতাদের দেখালেন সেই পাঁচ হাত কাঁচা বস্ত্র।

দেখ দেখ অপরূপ সকল দেবতা।
যত্নে সেই বস্ত্র মোরে দান কৈল সত্তা॥ (৩. ৮. ৯৩)

ঈর্ষায় স্থান কাল পাত্র ভুলে গেলেন চণ্ডী। সৎ ঝি যে তার বৈধব্য দূর করার জন্যে তাদের ডাকেই এসেছেন— ভুলে গেলেন সেকথা। ঈর্ষার কারণ দেবতারা সমবেতভাবে তাকে তুষ্ট করে শিবকে বাঁচানোর অনুরোধ করতে আরম্ভ করেছেন। চণ্ডীর রমণী-সত্তার ক্ষোভ, মনসার গুরুত্ব পাছে বেড়ে যায়— তাই তার ব্যবহার কথঞ্চিৎ মনস্তত্ত্ব সম্মত :

ক্রোধে চণ্ডী উঠিল তেজিয়া লাজভয়।
মারিবারে মনসারে মুষ্টিক উঠায়॥ (৩. ৮. ৯৬)

চণ্ডীর এই ব্যবহার তাকে Vamp জাতীয় চরিত্রে পরিণত করেছে। তবে বিপ্রদাসের রচনা শৈলী এখানে নিষ্পাপ— কৌতুক ও নাট্যরসে সমৃদ্ধ।

নেতা : মনসা, নেতা আর শিব— মনসামঙ্গলের বাকি প্রধান দেবতাদের মধ্যেও মানব ধর্মই অধিক মাত্রায় উপস্থিত। নেতা কিঞ্চিৎ উপেক্ষিত। প্রকৃতপক্ষে নেতাকে ঘিরে স্বতন্ত্র এক নারীদেবতার আদল মনসামঙ্গলে পরিকল্পিত হয়েছে। তার মধ্যে মহাদেবীত্বের লক্ষণও বিচার্য। তবে নেতাকে যেভাবে বিপ্রদাসের কাব্যে হাজির করা হয়েছে তাতে উপেক্ষিতা এক নারীর করুণ জীবনভাষ্যই আভাসিত হয়। জন্ম হবার পর শিব তাকে বলেছেন :

পদ্মার সহিত থাক অনুচরী হৈয়া। (২. ২৩. ৩৭)

তাকে দিলেন মহাজ্ঞান। বুদ্ধিমতী, ধীর, স্থির, পরামর্শ দেওয়ায় অভ্যস্ত নেতাকে সেই থেকে মনসার ছায়ামাত্র মনে হয়। মনসার মতোই তার বিবাহ হয়েছে— নামমাত্র বিবাহ। বিপ্রদাস নেতার সঙ্গে বশিষ্টের বিবাহের কথা অতি সংক্ষেপে সেরেছেন :

জরৎকার মনসায় ছান্দলা বসাইল।
বশিষ্ট মুনিরে আনি নেতা বিভা দিল॥ (৩. ১৫. ১৮৬)

বশিষ্ট মুনি যখন তপস্থানে যাবার উদ্যোগ করলেন তখন নেতাকে সন্তান লাভের বর দিলেন।

বশিষ্ট মুনিবর নেতোরে দিল বর
দুই মুনি গেলা তপস্থানে।
মনসা নেতোবতি হইলা গর্ভবতী
বিদিত লোক পরমাণে॥ (৩. ১৭. ২২২)

মনসার ছায়া নেতা, উক্ত গর্ভের সন্তান সম্পর্কে বিশেষ কিছু লেখেননি বিপ্রদাস। নেতার হাত ধরে মনসার দুঃখ প্রকাশের সময়—

কান্দে দেবী নেতো হাতে ধরি।
ঋষি গেল থুয়্যা একেশ্বরী॥ (৩. ১৬. ২০৬)

এর পর নেতা মনসাকে পরামর্শ দেওয়া আর বিভিন্ন স্থানে রূপান্তর গ্রহণ ছাড়া আর কিছুই করেন নি। মনসা বলেছেন 'এ তিন ভুবন ভরি' সকলেই পূজা পেলেও তার পূজা হয়না ('সবে পূজা নাহিক আমার')— এথেকে মুক্ত হতে প্রথম পূজা কোথায় পাবেন? নেতা খড়ি পেতে সমস্ত পৃথিবী গণনা করলেন।

গণে নেতো এ তিন সংসার। (৪. ১১. ৩৩৪)

গণনার শেষে সিদ্ধান্ত তার— চাঁদ সদাগরের পূজা পাওয়ার চেষ্টা করতে হবে। মনসামঙ্গলের মূল ঘটনার উৎসে নেতার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

নেতার ব্যক্তিত্ব বিপ্রদাসের রচনায় যথেষ্ট প্রস্ফুটিত হয়েছে। নতুন পরিবেশে মনসার মনে যখনই কিছু জিজ্ঞাসা জেগেছে, মনসাকে প্রয়োজনীয় তথ্য যোগান দিয়েছেন নেতা। বিদগ্ধ, মহাজ্ঞানী, নির্লিপ্ত, ধীশক্তিসম্পন্ন নেতার সামান্য উল্লেখ আর পরিমিত বর্ণনা দিয়েছেন বিপ্রদাস। সমস্ত সঙ্কটেই নেতার পরামর্শ পেয়েছেন মনসা। শিশুরা লক্ষ লক্ষ গোরু চরাচ্ছে কেন, এ প্রশ্নের জবাবে দন্তবোড় মুনির গল্প বলেছেন নেতা। তার পরামর্শ :

অবগতি কর হরসুতা।
প্রথমে ধরণী মাঝে করহ পূজার কাজে
রাখালের হও বর দাতা॥ (৪. ১৩. ৩৬৯)

রাখাল, হাসনহাটির মুসলমান নৃপতি সৈয়দ হাসন আর জালু-মালুর কাছে পূজা পাওয়ার পর মনসা দেখলেন তার ঘটবারি লঙ্ঘন করেছেন চাঁদ সদাগর। মনসাকে পরামর্শ দিলেন নেতা চাঁদের নাখরা বাগান ধ্বংস করতে হবে।

চাঁদের প্রয়াস অতি সুরম্য নাখরা প্রতি
নিরবধি দেখে প্রাণসম।
আপনি তথায় গিয়া সঙ্গে নাগ দল লৈয়া
কাট শীঘ্র নাখরা উত্তম॥ (৫. ১২. ২৫৪)

নাখরা বাগান ধ্বংস করার পর মহাজ্ঞান-অধিকারী চাঁদ সেই বাগান পুনরায় আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনলেন ('নিমেষে নাখরা জিয়াইল')। মনসা ত্রস্ত। নেতা তাকে ছদ্মবেশ গ্রহণ করতে বললেন। বিমর্ষ হলেন মনসা— কারণ :

আমি শঙ্করের ঝি বৃথা আর কেনজী
সংসার ভরিয়া অপমান।
নর হৈয়া দম্ভ করে কুবচন বলে মোরে
ঠিক ঠিক আমার পরাণ॥ (৫. ১২. ২৬৭)

নেতা মনসাকে নানাভাবে সান্ত্বনা দিলেন। গোপরূপে শ্রীকৃষ্ণ কংস বধ করার জন্যে জন্মগ্রহণ করেছেন, রাম রাবণ বধের জন্যে বানরের মিত্রতা স্বীকার করেছেন, দময়ন্তীর স্বামী রাজা নলকে ঘোড়ার দেখাশোনা করতে হয়েছে— ঈশ্বর আর রাজাদের যখন এরকম কাজ করতে হয়েছে— উদ্দেশ্য পূরণের জন্যে তখন মনসার দুঃখ পাওয়ার কারণ নেই। নেতার সান্ত্বনা বচনে মনসা খুশি।

নেতার শিষ্য ধন্বন্তরী। তাকে কিভাবে মারবেন— সে সমস্যা সমাধান করতে হচ্ছে মনসাকেই। অন্যান্য মঙ্গল কবির ভাষ্যে নেতা এই পর্যায়ে মনসাকে সাহায্য করেন নি। শঙ্কর-ধন্বন্তরীর তিনি গুরুমা— শিষ্যের মৃত্যু-সূত্র বলে দেওয়া তার অসাধ্য। বিপ্রদাস তা লেখেন নি। লিখলে নেতা চরিত্রের কাঠামোটি বজায় থাকত না। নেতা মনসাকে এখানে স্পষ্টই সাহায্য করেছেন। 'মায়াপতি সুবেশা মালিনী রূপ' ধারণ করে তিনি পুষ্পের পসার নিয়ে, পুষ্পে বিষ সাজিয়ে ধন্বন্তরীর কাছে যেতে বলেছেন। শত শিষ্য বিষ-গন্ধে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেও ধন্বন্তরী নিমেষের মধ্যে তাকে বাঁচিয়ে দেওয়ায় মনসা ব্যথা পেলেন। নেতা তখন তাঁকে পরামর্শ দিলেন :

নেতো বলে পদ্মাবতী শুনহ বচন।
নাকরহ দুঃখ চিন্তা স্থির কর মন॥

এবার গোয়ালিনী রূপ ধরে যেতে হবে। নেতা তার সঙ্গে যাবেন— গোয়ালিনী বেশী মনসার খুড়ি-রূপ ধারণ করে।

খুড়ি রূপ হৈয়া আমি লইব পসারে। (৫. ৮. ১৪৫)

এইখানে নেতাকে সক্রিয়ভাবে মনসার সঙ্গে সহযোগিতা করতে দেখছি। দুজন মিলে শঙ্কর-ধন্বন্তরীকে ছলনা করতে দেরি হয় নি তাদের।

সঙ্ক যত দেখে বস্ত্র দিয়া মুখে
হাসি বলে পদ্মাবতী।
নেতো বাম পাশে লুকাইয়া ভাষে
হই আভিরী যুবতী॥ (৫. ১১. ১৯৬)

নেতা এখানেও মনসার ছায়াসঙ্গিনী। তাঁর চরিত্রের বিশেষ কোন বৈচিত্র্য দেখা যায় নি। সঙ্কের মৃত্যুর পর নেতা মনসা পর্যবেক্ষণে গেলেন। চাঁদ এখনও অহঙ্কৃত কারণ কাজলা মালিনীর দুই পুত্র ধনা আর মনা তার সহায়।

তথায় মনসা নেত করে অনুমান।
রথ আরোহণে আমি চাঁদ সন্বিধান॥
ধনার প্রতাপে রাজার বাড়ে অহঙ্কার।
দেখিয়া বাড়িল ক্রোধ চিন্তিল প্রকার॥ (৭. ৭. ১০০-১০১)

চাঁদ সদাগরকে ধনে পুত্র মারার সময়কার প্রসঙ্গে নেতা-মনসার কথোপকথন সামান্য বিস্তৃত হয়েছে। মনসা নেতার কাছে গিয়ে দুঃখের কথা বলেছেন :

যত মন্দ বলে চাঁদো মনসার প্রতি।
নেতোর সাক্ষাতে গিয়া কহে পদ্মাবতী॥
শুন হেরো বলি নেতো প্রাণের ভগিনী।
এত মন্দ বলে কত সহিব পরানি॥ (৮. ১. ২)

ছয় পুত্র মারা যাবার পরেও চাঁদের দম্ভ কমে নি। মনসা নেতার পরামর্শ মতোই উষা-অনিরুদ্ধের আত্মা নিয়ে এসে বেহুলা-লখিন্দরের জন্মের ব্যবস্থা করেছেন। সমগ্র কাহিনীতে আড়াল থেকে মনসাকে নেতা এইভাবে নিয়ন্ত্রণ করে গেছেন।

চাঁদকে লাঞ্ছনার সময়েও নেতা মনসাকে সামান্য নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেছেন, কারণ চাঁদ মারা গেলে পূজা প্রচার হবে না।

নেতা বলে পদ্মাবতী চাঁদো পাছে মরে।
অবিলম্বে তোলো কূলে যাউক দেশেরে॥ (৯. ১১. ৩১৩)

আবেগে, ঈর্ষায় প্রবল হিংস্রতায় কাণ্ডজ্ঞানহীন দেবীকে স্ববশে আনার ক্ষমতা একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য সাধনের প্রতি দৃষ্টি রাখা চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। নেতা এই বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। উপরন্তু ক্রোধযুক্তা দেবীকে ব্যক্তিত্বপূর্ণ মধুর ব্যবহারে নিয়ন্ত্রণ করার কঠিন পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ— বলাই বাহুল্য।

বেহুলার ভাসান যাত্রার সময় মনসা নেতাকে ডেকে একবার বলেছেন—পথ না পেয়ে বেহুলা কাঁদছেন তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে আসেন। নেতা এসময় যথেষ্ট সক্রিয় :

চলিল ধোবানি বেশে যথায় বেহুলা ভাসে
পুত্র বধি এড়ি ভূমিতলে।
বেহুলার মন ছলে বস্ত্র কাচে কুতূহলে
পুত্র জিয়াইয়া ঘরে চলে॥ (১৩. ৪৬. ৭৯৯)

বেহুলা এই অভাবনীয় ঘটনা দেখে অনুরোধ করে স্বর্গের পথ চিনে নিলেন। নেতা বেহুলাকে নিয়ে গেলেন শিবের দরবারে। সিজুয়া গিরির কাছাকাছি সেই পুরি।

বিপ্রদাস নেতার ভূমিকাটি খুব বৈচিত্র্যজনক করে আঁকেন নি। তবে তার মধ্যে দেবতার মানবায়ন অবশ্যই ঘটেছে। মধ্যযুগের বাংলার মানুষের কাছে দেবতা আর মানুষের মধ্যে দূরত্ব ছিল না— মর্ত্যের গঙ্গা স্বর্গে গেছেন রান্না করতে, স্বর্গের উষা-অনিরুদ্ধ সুমেরু শিখরে দেহরূপ বদল করে সহজেই চলে এসেছেন মর্ত্য পৃথিবীতে। মর্ত্যলোকের শেষ ঘাটে বস্ত্র প্রক্ষালন সেরে শুকিয়ে নিয়ে গেছেন স্বর্গে— স্বর্গের এক মানবী সত্তা— নেতা। এই কাহিনীর অর্থ গভীর কোন তাৎপর্য বহন করে নিশ্চয়। মধ্যযুগে সে তাৎপর্য ও ভেতরের মানে হারিয়ে গেছে— নির্মোক খুলে ফেললে নেতাকে অত্যন্ত মানবিক বলেই গ্রহণ করতে হয়।

মনসা : দেবতা সমাজে ব্রাত্য এই মাতৃহীন নারী জীবনের প্রথম থেকেই গভীর সমস্যায় পড়েছেন। কালিদহে ভ্রমণ করার সময় শিব তাকে কামনার চোখে দেখেছেন—

মনসা দাঁড়াইলা মহাদেবের অগ্রেতে।
দেখিয়া লোভিত হর চাহে কাম চিতে॥
ভয় পাইয়া মনসা কহেন পূর্বকথা।
আমি সে তোমার সুতা তুমি মোর পিতা॥ (১. ২০. ২৭২-৭৩)

এরপর যখন যে ভাবেই নিজেকে মেলে ধরতে চেয়েছেন, তাকে তীব্র বাধার মুখে পড়তে হয়েছে। চরিত্রায়ণের এই ছকটি মানবী-সত্তা আর দেবী-সত্তার আন্তরিক দ্বন্দ্ব ঘুচিয়ে দিয়েছে। মনসার মধ্যে মধ্যযুগের আসরের শ্রোতা আর গায়েনরা, কবি আর সঙ্কলকরা তাদের চেনা পরিবেশের ভাবজগৎটিই দেখতে চেয়েছেন। তারা যখন মনসামঙ্গল গান শুনছেন তখন ইসলাম ধর্মের বিজয় অভিযান চলছে— জাতিভেদে ক্লিষ্ট সমাজের নিম্নবর্গের মানুষ মনসাকে আশ্রয় করে পূজা প্রচারের ইচ্ছাপূরণ (wish fulfilment) ঘটাতে চেয়েছেন। অর্থাৎ মনসার চরিত্রে দুটি চাপ অনুভূত হয়।

১. উচ্চবর্গে গৃহীত দেবতাদের চাপ।
২. নিম্নবর্গের পূজক সমাজের চাপ।

এই দুই চাপে মনসার সক্রিয়তা, তাৎক্ষণিক ক্রোধ, মোহ, গতিশীল অভিব্যক্তি দেখা গেছে— এসব গুণ একান্তই সময়-চুম্বিত ব্যক্তিত্বলক্ষণ বলে মনে হয়।

সৎ-মা চণ্ডীর সঙ্গে দ্বন্দ্ব মনসার একারণ্ডা মানসিক বৃত্তির পরিচয় বহন করছে। যে মুহূর্তে সৎ-মা তাকে পিতার সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত বলে মনে করেছেন সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিক্রিয়া তীব্রভাবে উপস্থিত :

শুনিয়া মনসা কোপে হৈল হুতাশন।
আপনা খাইয়া মোরে বল কুচবন॥
আপন প্রকৃতি যেন দেখসি আমায়।
হেন অসম্ভব কথা প্রস্তাবে কোথায়॥ (১. ১২. ৩০০-০১)

বিষ দৃষ্টিতে তাকালেন তিনি, সঙ্গে সঙ্গে চণ্ডী মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন।

ঢলিয়া পড়িল চণ্ডী উত্তর শিয়র।

চণ্ডী তাকে শিবের সঙ্গে যৌন-সম্পর্কে লিপ্ত বলে সন্দেহ করায় এই শাস্তি। কিন্তু যে পিতার সম্মান রাখার জন্যে তিনি সৎ-মাকে বিষ দৃষ্টিতে মেরে ফেললেন ; সেই শিব মনসাকে বললেন চণ্ডীকে বাঁচিয়ে দিতে। মনসাও তাঁকে সন্তাপ করতে নিষেধ করলেন।— 'না কর সন্তাপ বাপু দিব জিয়াইয়া।' এই ঘটনার সামান্য আগে কার্তিক গণেশের মুখে এক টুকরো সংলাপ মনে করতে পারি :

মন্দিরে আনিলা বাপু কাহার রমণী।
কেমন প্রকারে মোর বধিল জননী॥ (১. ২২. ৩০৬)

মনসা সম্পর্কে কার্তিক গণেশের মনে বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা প্রকাশিত হয়নি। মনসা যে পরিবারের অন্তর্গত হতে চাইছেন, যাদের নিজের লোক ভাবছেন, শ্রদ্ধা করতে চাইছেন, তারা তাঁকে মোটেই ভালোবাসেন নি। এমন কি তাঁর চোখে কুশাবাণ বিঁধিয়ে দিতেও দেরি করেন নি তার সৎ-জননী। তথাপি অনিশ্চয়তার বোধে ভীত সন্ত্রস্ত মনসা আশ্রয়ের উদ্দেশ্যেই যেন শিবের নির্দেশমতো চণ্ডীকে বাঁচিয়ে দিলেন এবং অথচ চোখ কানা করে দেবার পরও মনসা সৎ-মায়ের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করতে চেয়েছেন।

সত-মা হইয়া এত করে অপমান।
কতেক লাঞ্ছনা আর চক্ষু হৈল কাণ॥
এত সব দুঃখপদ্মা বিসরিয়া মনে।
পুনরপি ধরিলেক চণ্ডীর চরণে॥

তা সত্ত্বেও—

চণ্ডিকারে মনসা বিনয় বলে যত।
জ্বরপিত্ত মুখে যেন চিনি লাগে তিতো॥ (১. ২৩. ৩২৪)

মনসার মধ্যে এক বেদনার্ত অনিশ্চয়তার বোধে সন্ত্রস্ত নারীকে দেখতে পেলাম। কিন্তু তার পক্ষে শিবের পরিবারে থাকা সম্ভব হল না। চণ্ডী বললেন :

অরণ্যে নির্বাস উহা দেহ শীঘ্রগতি। (১. ২৩. ৩১৭)

মনসার হাহাকার— তোমার পরিবার ছেড়ে থাকব কোথায়? 'তেজিয়া তোমার ঘর যাব কোথাকারে।' সিজুয়া পর্বতে মনসাকে রেখে এলেন শিব, সঙ্গে নেতা আর ধামাই। এই ভাবে শিবের তিনটি অযোনিজ সন্তানের টিকে থাকার লড়াই শুরু হল। বিশ্বকর্মা আর হনুমানকে ডেকে গড়ে তোলা হল মনসার পুরী। পাশে পাষণ্ডির দেশে বিশ্বকর্মা বাণ মারলেন। সে-সব রাজ্য থেকে প্রজাদের আগমন ঘটল— মনসা সিজুয়া পর্বতে রীতিমতো রাজেন্দ্রাণী হয়ে বসলেন। এই পর্যায়ে মনসার সক্রিয়তার সামান্য পরিচয় পাওয়া যায়।

নিজস্ব পুরীতে মনসা খুব ভালো আছেন— বিপ্রদাসের বর্ণনা থেকে তেমনি ধারণা হতে পারে। বিশেষত এই পংক্তি দুটিতে—

হরিষে ছত্রিশ জাতি বৈসে কুতূহলে॥
নাহি শোক দুঃখ লোক সদা আনন্দিত। (২. ১. ১১-১২)

আসর-মনোরঞ্জনের জন্য মনসা সখীদের সঙ্গে সরোবরে জলকেলি করছেন এরকম বর্ণনা দিয়েছেন বিপ্রদাস। প্রকৃতপক্ষে মনসা নেতা ধামাই তেমন সুখে সিজুয়া পর্বতে বসবাস করেন নি।

মহাদেব যখন মন্থন-লব্ধ বিষ পান করে মৃতবৎ— চণ্ডী অনুমৃতা হবার প্রস্তুতি নিচ্ছেন, গঙ্গার কথায় নারদ তাঁকে আনতে গেছেন। পিতার মৃত্যুসংবাদ শুনে অত্যন্ত বেদনার্ত হয়েছেন মনসা আর নেতা।

নেতোর গলায় ধরি অতিসে করুণা করি
কোলাকুলি পাড়য়ে দুইজনে।
হইয়া হুতাশা মুখী মরমে বড়ই দুখী
বিগলিত অরুণ নয়নে॥ (৩. ৭. ৬৭)

ললাটে কর হেনে কাঁদতে কাঁদতেই তারা স্মরণ করলেন তাদের দুর্ভাগ্যের কথা। মনসা বললেন :

শুনবে নারদ ভাই আমার নিস্তার নাই
দড় মৈল ত্রিভুবনেশ্বরে।
আমরা দ্বিতীয় সুতা থাকিলাম অবস্থিতা
আর না যাইব দেবপুরে॥ (৩. ৭. ৬৭)

পিতার বর্তমানেই সৎ-মা যেখানে থাকতে দেন নি, এখন তো আরও অত্যাচার করবেন। মনসার বেদনার একটি প্রধান কারণ তদানীন্তন সমাজের অবিবাহিতা নারীদের অনিশ্চয়তা। রাজেন্দ্রাণী হলেও নিজে নিজে বিয়ে করা যায় না। 'অবস্থিতা' নারীদের আর যাই হোক, কৈলাসে ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। সেখানে কোন আশাই স্বচ্ছন্দ অবশিষ্ট নেই :

পিতার বর্তমানে সতা রহিতে না দিল তথা
কেমতে জাইব তার লক্ষে।
কে পালিবে আমা সভা কেবা আর দিবে বিভা
কান্দে দেবী ভাবি মন-দুখে॥ (৩ : ৭. ৬৮)

এই অনিশ্চয়তা-বোধ থেকে মনসা ও নেতা উত্তীর্ণ হতে পারেন নি। বিবাহ-উত্তর পর্বেও স্বামী তাঁদের সঙ্গে থাকেন নি। মনে হতে পারে, চণ্ডীর সঙ্গে এই বিশেষ ক্ষেত্রে নেতা-মনসার মিল আছে। চণ্ডীকে একাকী রেখে দিনের পর দিন মহাদেব কালিদহে তপস্যা করতে যান। কিন্তু চণ্ডী আর শিবের পরস্পরের প্রতি প্রেমাকর্ষণ যথেষ্ট। সেই আকর্ষণের কারণেই চণ্ডী ডোম নারীর বেশ ধারণ করে কালিদহের খেয়াঘাটে গিয়েছিলেন। শিব চণ্ডীর কাছে এই প্রেমাকর্ষণের জন্যেই বার বার ফিরে এসেছেন। মনসার ক্ষেত্রে এই ঘটনা ঘটেনি। বিবাহরাত্রেই মনসা দেখেছেন তার স্বামী জরৎকারু কাছে নেই—

নিদ্রাভঙ্গ হৈল দেবী ঋষি নাহি পাশে। (৩. ১৫. ১৯৮)

এখানে মনসার পরিণামদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে না। চণ্ডীর পরামর্শ মেনে তিনি সর্প-সজ্জা করেছিলেন। সৎ-মা চণ্ডীর কৌশলের কাছে মনসা এখানে বিভ্রান্ত। এদিকে সর্প-সজ্জা করে গেছেন মনসা, অন্যদিকে চণ্ডী সেখানে সাপের খাদ্য ব্যাঙ ছুঁড়ে দিয়েছেন।

ভেক দেখি সর্ব নাগ গর্জয়ে সঘন।
উঠিয়া বসিল ঋষি চমকিত মন॥ (৩. ১৫. ১৯৮)

নাগভয়ে চলে গেলেন মুনি। এই কাহিনী পুরাণ-কথার লৌকিক পরিণতি বলে মনে হয়। মিথ-টির উৎসে মনসার স্বতন্ত্রগম্যা স্বরূপ থাকতে পারে। এনিয়ে অন্যত্র আলোচনা করা হচ্ছে। মনসামঙ্গলের কাহিনী যখন গড়ে ওঠে তখন পুরা-কথার উদ্ভব পর্যায় বিস্মৃত হয়েছে। বিপ্রদাস বিস্মৃত উৎস-কথার মাঝখানে জুড়ে দিয়েছেন তাঁর সময়কার বাস্তবতার বোধ—চরিত্রায়ণের মূল সূত্র ঠিক এইখানে। ব্যক্তিগত কবি প্রতিভার স্বাক্ষর অপেক্ষা যুগবাহিত গণমানসের পরিচয় অধিকর লভ্য।

বিপ্রদাস যখন কাব্য লিখছেন তখন 'অবস্থিতা' নারীর বেদনা, স্বামীর সঙ্গ না পাবার দুঃখকে প্রবল বলে উপস্থাপন করা হয়েছে। নারী-প্রধান সামাজিক ব্যবস্থায় বিষয়টি অগৌরবের ছিল না। যাই হোক, দেবী মনসার বেদনাবোধ গভীর ও আন্তরিকভাবে প্রকাশ কবেছেন বিপ্রদাস।

কান্দে দেবী নেতো হাতে ধরি।
ঋষি গেল থুয়্যা একেশ্বরী॥ (৩. ১৬. ২০৭)

তাঁর অনুশোচনা— কেন ঋষিকে পায়ে ধরে সাধলেন না তিনি। দেবসমাজে তার নিন্দা দূর হবার কোন সম্ভাবনা নেই—'দেবপুরে করিল খাঁখার। তাঁর বেদনা জন্ম দিন থেকেই শুরু হয়েছে। সান্ত্বনার কোন উপায় নেই।

জন্মিয়া নহিল কিছু সুখ।
কতেক সহিব মনদুঃখ॥ (৩. ১৬. ২১২)

বস্তুতপক্ষে মনসার উপর দেবসমাজ, তার সৎ-মা যে ব্যবহার করেছেন, তাতে তাঁর চরিত্রে বেশ কিছু নেতিবাচক স্বভাব জন্মেছে বলে মনে হয়। তার প্রতিহিংসা গ্রহণের মানসিকতা, ষড়যন্ত্র করার ভাবনা হয়তো এই দুঃখপূর্ণ জীবন অভিজ্ঞতারই ফল। যে পিতা তাকে আশ্রয় দিলেন না, যে সৎ-মাতা তাকে নানাভাবে লাঞ্ছনা করেছেন— ষড়যন্ত্র করে স্বামীর সঙ্গে সংসার পর্যন্ত করতে দেন নি, সেই পিতা ও মাতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল অভিজাত সমাজকে আঘাত করেই মনসা তার অস্তিত্ব জাহির করেছেন। এখানে মনসা নারী হিসেবেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন— তার মধ্যে প্রতিভাত হয় মধ্যযুগের লাঞ্ছিতা সর্বরিক্তা এক নারীর আত্ম-প্রতিষ্ঠার সংগ্রামী মানসিকতা, প্রত্যয় ও তার বিজয় অভিযান।

মধ্যযুগের সমাজ পরিবেশে মনসা-নেতার মত পিতৃ-মাতৃ পরিচয়হীন, স্বামী পরিত্যক্তা কোন নারী যা যা করতে পারতেন, মনসা আর নেতা দেবী হয়েও ঠিক তাই করেছেন। নিজেরাই নিজেদের পূজা-প্রচার করেছেন তাঁরা, দেখিয়েছেন চমৎকার (miracle) আর ভোজবাজি (magic), হনন প্রক্রিয়া আর মন্ত্রশক্তি (spell), প্রয়োগের বিদ্যা (witch craft)-র মাধ্যমে মৃতব্যক্তিদের পুনর্জাত করার ক্ষমতা প্রদর্শন এবং অন্য মানুষের অনুরূপ বিদ্যাহরণে তাঁর (তাদের বলতে পারতাম— নেতার ভূমিকা ধীরে ধীরে আড়ালে চলে যাওয়ায় বলছি না) সক্ষমতা অপরিসীম। ভক্তিতে না হোক, ভয়েই জনমানসে তাঁর দেবীত্ব স্বীকৃত।

উক্ত কর্মের মধ্যে মনসার মনস্তাত্ত্বিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ইঙ্গিত উল্লেখ করেছি। এখানে আর একটি দ্বন্দ্বের ছক হাজির করা চলে। দেবীত্ব আর মানবীত্ব— মনসার মধ্যে এই দুই সত্তার দ্বন্দ্বঘন পরিস্থিতির পরিচয়ও পাই। নেতার সঙ্গে কথোপকথনের সময় মনসা যখন বলেন :

যতেক অমরাগণ দিকপাল মুণিজন
পৃথিবী সভার অধিকার।
আমি দেব বিষহরি এতিন ভুবন ভরি
সবে পূজা নাহিক আমার॥ (৪. ১১. ৩৩২)

—তখন এই দেবী-সত্তা প্রকাশ পায়। হোক না অবহেলিত, পূজা প্রচলিত না হওয়ায় ক্ষুণ্ন, বিমর্ষ— তবু মনসা দেবী। মানবী নন ; অন্তত এখানে। পাশাপাশি মনসাকে নিজেই নিজের পূজার জন্যে যা করতে হয়েছে তা কোন দেবীর কর্ম নয়। তিনি বৃদ্ধা ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করে রাখালদের পূজা পেতে ধরণীতে অবতীর্ণ হয়েছেন।

ছলিতে রাখালে মায়া পাতিলে বিশেষ।
মায়ায় হইলা বৃদ্ধ ব্রাহ্মণীর বেশ॥

তার রূপ 'অতিবৃদ্ধ', 'দশন গলিত', মুখ দিয়ে কথা বের হয়না— চোখ পাকিয়ে তাকান তিনি। দীর্ঘ শালগাছের মতো দেহ, ধবল কেশ বিনস্ত— 'নারে সম্বরিতে'। 'ক্ষেম ধুতি' পরে নিতান্ত মানবীর মতো (তার দীর্ঘতাকে যদি শিশু রাখালদের দৃষ্টিতে দেখা বলে মনে করি)।

পাশাপাশি, শুধুমাত্র মানবীকে কেউ পূজা করবে না জেনেই মনসা রাখালদের চমৎকৃত করার উদ্দেশ্যে মহাপদ্মা সাপকে লাঠির রূপ দিয়ে— রঙ্গিন এক চুপড়ি কোমরে নিয়ে চললেন তিনি। রাখালরা তাকে রাক্ষসী ঠাউরাল :

'কোথা হইতে আইল বুড়ি রাক্ষসী ডাইনি' (৪. ১৪. ৩৭৯)

বস্তুতপক্ষে, মনসাকে দেব সমাজে রাক্ষসী-ক্রোধী-ডাকিনী স্বভাব অপদেবতা বলে প্রায়ই চিহ্নিত করা হয়েছে। চণ্ডী মনসা সম্পর্কে জরৎকারু মুনিকে বলেছেন :

নাগরূপী কন্যা এই নাগ অবতার।
মনিরত্ন এড়ি পরে নাগ-অলঙ্কার॥ (৩.১৫. ১৯০)

জরৎকারু মনসাকে ত্যাগ করার সময় ভেবেছেন, তাঁর স্ত্রী মনসা ভয়াবহ নাগবিদ্যা জানেন। মনসাকে শয়ন মন্দিরে দেখে তাঁর ভয়ের সীমা পরিসীমা থাকে নি।

মনসা দেখিয়া ঋষি মনে ভয় বাসে।
নিদ্রা নাহি যার মুনি নাগের তরাসে॥ (৩. ১৫. ১৯৬)

পালাবার পথে দ্বারী ধামাইকে দেখে জরৎকারুর কথা— নাগ ভয় তাঁর এত বেশি যে তিনি স্ত্রীকে পরিত্যাগ করছেন। শুধু তাই নয় প্রস্তাব তাঁর— ধামাই না হয় মনসাকে নিয়েই থাকেন।

আজি হৈতে পদ্মাবতী নিশ্চয় তোমার। (৩. ১৫. ২০০)

মনসাকে চাঁদ সদাগর 'ধামনা ভাতারী' বলেছেন। ধামনা ভাতারী অর্থাৎ নপুংসক যার স্বামী। রীতিমতো অনুচ্চার্য গালাগাল। এই গ্রন্থের অন্যত্র এই কদর্য সম্বোধনের সামাজিক তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছি। এখানে লক্ষ করছি চাঁদ সদাগর আর জরৎকারুর চোখে মনসা একই অবস্থানে আছেন; চণ্ডী আর রাখালদের চোখেও তিনি অপদেবতাই। দেবী যখন অন্তরীক্ষে সাময়িকভাবে হারিয়ে গেছেন, রাখালদের ভাবনা :

ভাল হৈল ডাইনি পলাইল ভয় মনে॥ (৪. ১৪. ৩৯৫)

দেবী তাদের কাছে একাদশী ব্রত উদযাপনের জন্য চেয়েছিলেন সামান্য দুধ। তাদের দলপতি পুরন্দর ঘোষ তাকে বললেন অসোচ্য গাভীর কথা। অত্যন্ত অবাধ্য সেই গাভী। 'এক কোষ দুগ্ধ কভু ইছাতে না পাই।' সুতরাং অনুরোধ, এই গরুর দুধ দোয়ানো গেলে মনসাকে পূজা করবেন তারা। মনসা ধামাইয়ের সাহায্যে তাই করলেন। তিনি কাখের চুপড়িতেই দুধ দুইলেন— প্রতিশ্রুতি :.

চুপড়ি দুহিব গাবি না পড়িব ক্ষিতি।
ভয় কিছু নাহি বলে অন্তরে ভকতি॥

আশ্চর্য ঘটনা ঘটল, যথারীতি :

দুইল অসোচ্য দুগ্ধ ঘোষ পুরন্দর।
নিমিখে চুপড়ি ভরি উঠিল সত্বর॥

সেই দুগ্ধ রাখালরা পান করতে বললেন মনসাকে, তিনি আনন্দে 'উর্ধ্বমুখ' হয়ে তা পান করলেন।

মনসার এই নিজের পূজা প্রচারের জন্যে চেষ্টা আসলে তার ডাইনি রাক্ষসী জাদুকরী-সত্তার পরিচয়-চিহ্ন মুছে ফেলে দেবী-সত্তায় উত্তীর্ণ হবার চেষ্টা বলেই মনে হয়।

পূজাস্থলে নিজে উপস্থিত হয়ে পূজা প্রচার— আদিম কোন witch craft-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কৃত্য হতে পারে। একে যদি মধ্যযুগের text-এর সীমায় বেঁধে রাখতে হয় তাহলে মনসার পরিকল্পনার মধ্যে দ্বান্দ্বিকতাটুকু স্পষ্ট হবে। মনসা দেবসমাজ আর মানবসমাজে এক প্রতিহত দেবভাবনা— তাকে প্রতিরোধ করার প্রয়াস সর্বাতিশায়ী। তিনি ভক্তের ভক্তি পান নি— ভীত-সন্ত্রস্ত-ক্ষতিগ্রস্ত-সর্বস্বান্ত মানুষের স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে পেয়েছেন অনিচ্ছার পূজা। একে শ্রদ্ধা বলা যাবে না— বলতে হবে বিনিময় ; চাঁদ সদাগরের বাণিজ্যের বস্তুবদলের মতোই এই পূজার বিনিময়ে তিনি যা পেলেন তাতো তার হারানো ধন ও মানব সম্পদই। মনসাকে এজন্যেই বলেছি, ব্রাত্য দেব-ভাবনা— Concept of goddess from the below.

শ্রদ্ধা না পাওয়া, প্রাপ্য কৃতজ্ঞতাবোধ যুক্ত সম্মান না পাওয়া— মনসার ক্ষেত্রে নিয়তির মতো। বহু মনসামঙ্গলে চাঁদের সঙ্গে বিরোধের দিনগুলিকে বারমাসী দুঃখের ফিরিস্তি দিয়ে উত্থাপন করেছেন কবিরা। বিপ্রদাসও তেমনি অবসর নিয়েছেন। সাধারণ মানুষের মধ্যে মনসার কেমন চরিত্র দাঁড়িয়েছিল, সেটি স্পষ্ট হতে পারে এই বারমাসীটি খেয়াল করলে। মনসার দুঃখ— একজন ব্রাত্য দেবীর দুঃখ কিনা জানি না, এ-দুঃখ এক সাধারণ নারীর বঞ্চনাজাত হাহাকার বলেই মনে হয়। বেহুলাকে ডেকে মনসা বলছেন :

নর হৈয়া মন্দ বলে চাঁদো দুষ্টপাপ।
শুনলো বেহুলা তোরে কহি দুঃখ তাপ॥ (১৩. ৫১. ৮৪৮)

মনসার দুঃখ, নরের পূজা নেবার জন্যে তাকে মিথ্যাচার, কপট, মায়া, হিংসা, ষড়যন্ত্রের সাহায্য নিতে হয়েছে। যেমন :

১. চাঁদের 'মহাজ্ঞান' হরণের জন্যে 'শালিরূপ' ধারণ (১৩. ৫১. ৮৫৩) ;
২. ধন্বন্তরীকে শাসন করার জন্যে 'গোয়ালিনী সহি' হওয়া (১৩. ৫১. ৮৫৫) ;
৩. আশ্বিন মাসে তার দুঃখ অসহনীয় কারণ—

আশ্বিনে চণ্ডিকা-পূজা করে সর্বলোক।
হতো দুঃখী জন আদি আনন্দ কৌতুক॥ (১৩. ৫১. ৮৬০)

৪. চৈত্রমাসেও তার পূজা হয় না, সর্বত্র 'হর-পূজা' চলে। এ দুঃখও কি কম।
(১৩.৫১. ৮৭২)

এই সমস্ত ক্ষেত্রে, বোঝাই যায় মনসাকে বহু বন্ধুর পরিবেশ পার হয়ে প্রতিষ্ঠিত হতে হয়েছে। এই বন্ধুরতা নিছক প্রতীক নয়— চরিত্রায়ণের উদ্দেশ্যে সৃষ্ট বৈচিত্র্যসৃজনও নয়, আড়ালে প্রাচীনতর সত্য থাকতে পারে। তবে মনসাকে ঘিরে দেবীত্ব-মানবীত্বের দ্বন্দ্বটি কবিদের মনেও ছিল বলে মনে হয়। দেবীর মনস্তত্ত্বেও চরিত্রগত এই বৈশিষ্ট্য আমাদের কৌতূহল জাগ্রত করে, সন্দেহ কি।

আর একটি প্রসঙ্গের দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। যে নারী জন্মমাত্র জানলেন তার জননী নেই, তিনি এক যোগীর অযোনিজ মানস-কন্যা, সৎ-জননী প্রথম দর্শনে যার চোখ নষ্ট করে দিলেন, নির্বাসিত হতে হল দেবপুরী থেকে দূরে—অরণ্য-পর্বতময় জনহীন অঞ্চলে, যে নারীকে তার স্বামী বিবাহ রাত্রেই ত্যাগ করে গেছেন তার পক্ষে নিষ্ঠুর প্রতিহিংসাপরায়ণ হওয়া কি একান্তই অসঙ্গত? এইখানে চরিত্র পরিকল্পনার ক্ষেত্রে বিপ্রদাসের মনস্তত্ত্ব সচেতনতা—চরিত্রানুমান ক্ষমতা স্বীকার করতে হয়।

মনসা দেবসভায় প্রথমে তার কৃতকর্ম অস্বীকার করেছেন। বেহুলা নিদর্শন না দেখানো পর্যন্ত চলল অস্বীকৃতির নাটক :

বৈলা পদ্মা কথা লখাইর কথা
আমি কিছু নাহি জানি।
কথো স্তব আরো করসি আমারো
এতেক গঞ্জিলো কেনি॥
বেহুলা বলে কথা না কহ এ কথা
কপট মিছা বচন।
দংশিয়া যাইতে কাটিল পুছেতে
হের লহ নিদর্শন॥ (১৩. ৫০. ৮৪৫-৪৬)

বেহুলার আরও অভিযোগ, তিনি তো মনসার ব্রতদাসী ; মনসাকে অনন্যমনে পূজা করেই এসেছেন, তবু তার প্রতি দেবীর করুণা নেই কেন! তার খেদ—

দুঃখ সিন্ধুজল ভাসিয়া বিকল
তিল দয়া নাহি তোমা।
তোমা ছাড়া গতি অন্য নাহি মতি
কত দুঃখ দেহ আমা॥ (১৩. ৫০. ৮৪৭)

এখানে আসর-মনোহর সাহিত্য আর একটি মানবিক সত্য উন্মোচিত করেছে। একে একে নিষ্ঠুর বঞ্চনা পেয়ে দেবী মনসা এখন হিতাহিত জ্ঞানশূন্য। ভালোমন্দের জ্ঞান তার লুপ্ত না হলে বেহুলার সঙ্গে এই ছলনার দরকার ছিল না। অন্যভাবে বিচার করতে হলে বলতে হয় দেব সমাজে প্রত্যক্ষ প্রতিশ্রুতিটুকু আদায় করাই মনসার আসল উদ্দেশ্য। বেহুলা যখন বললেন 'সসুরা বুঝায়্যা পূজা করাইব তোমা'। তখন মনসা লখিন্দরকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন।

মনসাকে চাঁদ পূজা দিয়েছেন ভক্তি সহকারেই— তবে তার আগে স্বার্থ আর জেদ দুটিই পূর্ণমাত্রায় বজায় রেখেছেন তিনি। তাঁর শর্ত মনসার নাগরা মাটিতে ভরাডুবি হওয়া ধনসম্পদটুকু নৌকা বোঝাই করে নিয়ে আসুন— তবে পূজা। সর্বশেষে—

জয় জয় মনসা কুমারী খিতিসার।
না বুঝিয়া কৈল্যু দোষ ক্ষেমত যেসব রোষ
সেবকের করো প্রতিকার॥ (১৩. ৯. ১৩১)

এই পূজার পব— ফুলে কুলোয় নি।

নাগ পূজিবারে পুষ্প নাহি আটে শেষে।
দাড়ি গোপ ছিঁড়িয়া পূজিলো অবশেষে।। (১৩. ১০. ১৪২)

এই পূজাকে খুব সম্মান জানানোর পূজা বলে মনে না-ই হতে পারে। তবে বিপ্রদাস দেবীর বাঁ হাতে পূজা দেবার কথা লেখেন নি।

মনসা নাগের দেবী। তবে তিনি নাগ-রূপিনী নন। 'মন্ত্রজাত' অংশগুলির আগে পরের পটভূমি বিশ্লেষণ করলে মনে হয় দেবী নন— মনসা এখানে মন্ত্রধারিণী উপাসিকার মতো। তার উপস্থিতি মানুষেরই মতো। দেবী নন— কোন দেবী ভাবনার মানবী প্রতিমূর্তি মনসাকে অনুরূপে উপহার দিতে চান বিপ্রদাস। সাপের খেলা দেখানো, সর্পবিদ্যা, ভোজবাজি ও বিষ-বিদ্যাচর্চার বিষয়টির সঙ্গে যে জনগোষ্ঠীর সম্পর্ক মনসা যেন তাদেরই প্রতিনিধিত্ব করেছেন। ধনা-মনার কাহিনীটুকু প্রকাশ করার সময় বিপ্রদাস মনসার মুখে প্রায় তেমনি একটু সংবাদ উপস্থিত করেছেন। মনসা কাজলা মালিনীকে বলেছেন :

বাপ মোর মহাগুণী বিদিত সংসারে।
তার কিছু কিছু বিদ্যা শিখাইল মোরে।।
বিদ্যার পরীক্ষা আমি কিছু নাহি জানি।
বিদ্যার পরীক্ষা আমি কিছু নাহি জানি।। (৬. ১০. ১৫২-৫৩)

এই সময় মনসাকে দেবী নয়— মানবী বলেই তাকে গণনা করতে হয়।

৯.২ চাঁদ চরিত্রে মহাকাব্যিক উপাদান ও আনুষঙ্গিক :

সাধারণত মনসামঙ্গল সম্পর্কে যারাই আলোচনা করেছেন চাঁদের চরিত্র পরিকল্পনা তাদের বিস্মিত করেছে। টি. ডব্লু. ক্লার্ক তাঁর *Evolution of Hinduism in Medieval Bengali Literature* শীর্ষক রচনায় লিখেছেন চাঁদের মধ্যে বহু উপকরণ একাকার হয়েছে। যে চাঁদ নখরা বাগানের অধিকারী তিনি 'a great gardener', যিনি গন্ধবণিক, যিনি বাণিজ্যজীবী, যিনি রাজা আর যিনি মহাজ্ঞানের অধিকারী যোগী— তারা একটি যুগের একটি প্রবণতার ফল নয়। চাঁদ চরিত্রে তিনি দেখেছেন 'a clash between farming people and semi-momadic tribes who had encroached on cultivated lands'-এর পরিচয় বিদ্যমান। (পশ্য : *Evolution of Hinduism in Medieval Bengali Literature*. T. W. Clark ; Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of London ; 1955) ড. প্রদ্যোৎকুমার মাইতি চাঁদ সদাগরকে উচ্চবর্গের মানুষ বলে ব্যাখ্যা করতে চান : 'Chando, according to all versions, was a leader of the opposition group which opposed the spread of the cult of Manasa among the upper classes. But finally before his surrender, the men folk of some other localities admitted to the power of goddess and started worshiped her'... (Dr. P. K. Maity : *Historical Studies in the Cult of the Goddess Manasa– A Socio-Cultural Study* ; উক্ত ; 108 পৃ .)।

চাঁদ সদাগর চরিত্রটি গড়ে উঠেছে বাংলার বেশ কয়েকটি যুগ-লক্ষণকে স্পর্শ করে। এর সঙ্গে বিভিন্ন গোষ্ঠী-ভাবনার সত্যও মিলে মিশে গেছে। এইরকম প্রবণতা সমাজে চাঁদ চরিত্রকে

ঘিরে মূর্ত হয়েছে বলেই একে মহাকাব্যিক উপাদানে (Epic Element) সমৃদ্ধ বলে মনে হয়। রবীন্দ্রনাথ ১২৮৯ বঙ্গাব্দে 'ভারতী' পত্রিকায় লিখেছিলেন : 'মহাকাব্যের সর্বত্র চরিত্র বিকাশ, চরিত্র মহত্ত্ব দেখিতে পাই!' পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ মনে করেছিলেন 'মহাকাব্যের বিস্তীর্ণ রাজ্যের মধ্যস্থলে' চরিত্র জেগে ওঠে— চরিত্রের মহত্ত্বই মহাকাব্যের প্রাণ। বলে রাখি, হেমচন্দ্রের 'বৃত্র সংহার' আর মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র তুলনায় রবীন্দ্রনাথের এই লেখায় অল্পবয়সী লেখকের আবেগ ও ঝুঁকিপূর্ণ মন্তব্য উপস্থিত। আপাতত সে প্রসঙ্গ অবান্তর। আর একটি রচনায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : ....'দেশের সাধারণ লোকের মধ্যে প্রথমে কতকগুলি ভাব টুকরা টুকরা কাব্য হইয়া চারি দিকে ঝাঁক বাঁধিয়া বেড়ায়। তারপরে একজন কবি সেই টুকরা কাব্যগুলিকে একটা বড়ো কাব্যের সূত্রে এক করিয়া বড়ো পিণ্ড করিয়া তোলেন। .....পুরাতনকে নূতন করিয়া, বিচ্ছিন্নকে এক করিয়া দেখাইলেই সমস্ত দেশ আপনার হৃদয়কে যেন স্পষ্ট ও প্রশস্ত করিয়া দেখিয়া আনন্দলাভ করে।' ('সাহিত্য সৃষ্টি' ; *সাহিত্য* ; বিশ্বভারতী; ১৯৬৯ ; ৯৯-১০০ পৃ.)। চাঁদ সদাগরের কাহিনীতে এই প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন সময় ও স্থানের উপাদান পুঞ্জীভূত হয়ে একটি রস পরিরতি দান করেছে। বিপ্রদাসের মনসামঙ্গলে চাঁদের চরিত্রে অন্তত চারটি মৌলিক উপাদান লক্ষ করি।

১. অহঙ্কার। এই অহঙ্কার চাঁদের পৌরুষ, ধন, জন, রাজ্য, আভিজাত্যের— সবচেয়ে বেশি জ্ঞানের অহঙ্কার চাঁদের চরিত্রে উপস্থিত। জ্ঞান অর্থাৎ মহাজ্ঞান। এই অহঙ্কারের উপাদানটি যোগী-সংস্কৃতির অঙ্গ হওয়া সম্ভব।

২. পুরুষ-প্রধান ভাবাদর্শ (Patriar chal idea)-এর মূর্ত প্রতিনিধি। চাঁদ স্ত্রী সনকার পূজাকে স্বীকার করেন নি ; স্ত্রীদেবী মনসাকে পূজা করতে চান নি কিছুতেই। সমান্তরাল দেবভাবনা তার— শিব।

৩. প্রতিবাদী ব্যক্তিত্ব (Protestant Personality)। চাঁদকে অনেক সহমর্মী সহযোগী মনসা-পূজা কাতর অনুনয় করলেও তিনি মনসা-পূজা করতে চান নি। নিজের ব্যক্তিত্বের আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করার বাসনা তার। নিজের ব্যক্তিত্বকে অমলিন রাখার নিঃসঙ্গ প্রয়াস। এক্ষেত্রে তিনি প্রতিবাদী। স্রোতের বিরুদ্ধে চলার আকাঙ্ক্ষা আর সেই আকাঙ্ক্ষাকে রক্ষা করতে গিয়ে অকথ্য বেদনা সহ্য করার অপরিসীম ক্ষমতা রয়েছে চাঁদের। এই চরিত্র অন্য সব সাধারণ মানুষ থেকে মর্যাদাপূর্ণ স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে।

৪. গাম্ভীর্যের পাথরের আড়ালে স্নেহশীল মূর্তি। বাইরে থেকে দেখে চাঁদের প্রবল ব্যক্তিত্ব নীরন্ধ্র অহঙ্কার, অপরিমেয় আদর্শবোধ আর প্রতিবাদী মানসিকতার প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। কিন্তু পুত্রস্নেহ তার অন্তস্তলের ফল্গুধারার মতো ক্রিয়াশীল রয়েছে। ছয়পুত্রের মৃত্যু, লখিন্দরের সর্পাঘাতে উন্মত্তপ্রায় চাঁদ সদাগরের কথাবার্তা শুনলে এই পিতৃত্বের স্নেহাতুর বৈশিষ্ট্যটি বোঝা যায় না। চাঁদ বলেছেন, ভালই হল— মনসা আমাকে আর কোনরকম ক্ষতিই করতে পারবেন না। কিন্তু, পুত্রবধূ বেহুলার অনুরোধ তিনি অমান্য করতে পারেন নি। পৌরুষের প্রতাপে অদৃষ্টকে জয় করার জন্যে চাঁদ চেয়েছিলেন লোহার বাসর ঘরের প্রতিরোধ গড়তে। তা ব্যর্থ হবার পর ধ্বস্ত চাঁদ সদাগর বেহুলার নির্বন্ধে মনসাপূজা করেছেন। তার মধ্যে এখানে পুত্রবধূর প্রতি স্নেহশীল জনকের প্রতিমূর্তি জেগে ওঠে। সনকার প্রেম, ঝাউয়াবতীর শ্রদ্ধাপূর্ণ মিনতি, পাশের রাজ্যের চাঁদ-মিতা, মধুকরের কাণ্ডারির অনুরোধ— সমস্ত কিছুকেই অস্বীকার করা গেছে, কিন্তু অকাল-বিধবা পুত্রবধূদের নীরব অনুনয় আর বিবাহরাত্রে বিধবা বেহুলার কাতর অনুরোধ তিনি অস্বীকার করতে পারেন নি।

চাঁদ চরিত্রের উক্ত উপাদানগুলি বিভিন্ন যুগে কবি ও গায়েনের সমবেত ভাবনার প্রকাশ হিসেবে গড়ে উঠেছে। ফলে একে একজন কবির রচনা বলে গণ্য করা যাবে না। এই চরিত্রটির মধ্যে দিয়ে ধ্রুপদী গাম্ভীর্যের পাশাপাশি রুচিহীনতার কিছু উপকরণও বিদ্যমান ; রয়েছে কিছু নেতিবাচক উপাদানও। যেমন—

১. চরিত্র শৈথিল্য। মনসা যখন মেনকা নাম নিয়ে চাঁদ সদাগরকে কামমোহিত করেছেন— তখন চাঁদ সদাগর নির্লজ্জ কামুক পুরুষের মতো ব্যবহার করেছেন। পূর্বাপর ব্যক্তিত্বের আদর্শ এখানে সঙ্গতিপূর্ণ থাকে নি।

২. চাঁদের মিথ্যাচার ও প্রতারণার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে সিংহলে বসু বদলের পালায়। চাঁদ সেখানে লোভী, অন্যায়কারী। ব্যবসায়ের ন্যূনতম নীতি তিনি রক্ষা করেন নি। বিনিময় এখানে ছলনায় পর্যবসিত।

৩. চাঁদ মনসার নিন্দা করতে গিয়ে বারংবার রুচির সীমা ছাড়িয়ে গেছেন। দেবী হিসেবে তিনি মনসাকে মানেন নি— এ যদি তার আদর্শ হয়, তাহলে বিপরীত আদর্শকে ন্যূনতম শ্রদ্ধার সঙ্গে অস্বীকার করার কথা ছিল। তা হয় নি। মনসাকে দেবী হিসেবে তো নয়ই, মানবী হিসেবে গ্রহণ করার রুচিও তিনি দেখান নি। মনসার শারীরিক প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে যেভাবে কথা বলেছেন চাঁদ, যেভাবে তার স্বামী-না-থাকার কথা, সঙ্গী নপুংসক ধামাই-এর সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কের কথা— কাজল্যা মালিনীর পুত্রদ্বয় ধনামনা সম্পর্কে বিকৃত ইঙ্গিত করেছেন তাতে চাঁদের চরিত্রের ন্যায় রক্ষিত হয় নি।

বস্তুতপক্ষে মধ্যযুগের সমাজ-পরিবেশ চাঁদ সদাগরের ব্যক্তিত্বকে যেমন গড়েছে, তেমনি তার রুচির বিকারের জন্যেও সেই অনুদার রুচিহীন পরিবেশ বা বাতাবরণকেই দায়ি করতে হবে। চাঁদের চরিত্রের ইতিবাচক আর নেতিবাচক উপকরণগুলির তুলনা করলে বোঝা যায় মধ্যযুগের বাংলাদেশের সমাজ ও সংস্কৃতির মান চাঁদ চরিত্রের উচ্চতাকে রক্ষা করতে পারে নি। যে গৌরব তার হয়ে ওঠার প্রক্রিয়ায় আভাসিত হয়— সেই মহত্ত্ব তাকে রূপায়িত করার মধ্যে দেখা যায় না। বিশেষ করে যখন চাঁদ সদাগরের লাঞ্ছনার অবসর হয়েছে তখন বিপ্রদাসের রচনায় প্রচুর প্রক্ষেপ ঘটেছে বলে অনুমান করি। এ-সমস্ত ক্ষেত্রে চরিত্রটি হাস্যকর (Reducule বা Comic) হয়ে গেছে। তামাসার পাত্র হয়েছেন চাঁদ, আসরে উপস্থিত মানুষেরা সেই হাস্যকর মানুষটিকে দেখে তাদের মনোগত অভিপ্রায়টি পূরিত হওয়ার (wishfulfilment) বিষয়টি লক্ষ করে খুশি হতো—মনে হয়। কবির খেয়াল থাকেনি গাম্ভীর্য-করুণা-বেদনার সারাৎসার যার চরিত্রে, তাকে এমন উৎকট-হাস্যরসের মধ্যে নিমজ্জিত করলে শিল্পকলার যুক্তি রক্ষিত হয়না। মহাকাব্যিক রস পরিণতি ঘটতে পারত যার মধ্যে তাকে বিপ্রদাস দ্বিধাগ্রস্ত বাতুল অকর্মণ্য জেদি ক্রোধী রুচিহীন এক মধ্যযুগীয় কুচক্রী ভূম্যধিকারীর মতো করে ফেলেছেন। চাঁদের লাঞ্ছনার আত্যন্তিক আবেগ ধীরে ধীরে চাঁদের মহত্ত্বকেও খর্ব করেছে— কবি বা প্রক্ষেপকারীদের সেই খেয়াল থাকে নি।

চাঁদ বণিক— বনের মধ্যে কাঠুরিয়াদের সঙ্গে কাঠ সংগ্রহ করেছেন। মনসা অবশ্য ছলনা করে নাগদের কাঠ হয়ে থাকতে বলেছিলেন। চাঁদ জানতেন না, তিনি কাঠের পরিবর্তে নাগদের কুড়োচ্ছেন। ('কাঠ বলি চাঁদো রাজা নাগেরে কুড়ায়।') তারপর সেই কাঠের বোঝা মাথায় তুলতে তার অসম্ভব কষ্ট হচ্ছে তিনি হতভম্ব হয়ে গেছেন। মনসা তার কাছে পাঠালেন ধামাইকে। ধামাই—

'নররূপী গিয়া তখন কাষ্ঠ তুলি দিল।' (১০. ১৩. ৩৪৫)

কুমোর পাড়ায় মাথার বোঝা নামাতে গিয়ে পড়ল 'হাড়ি-পাখই' এর ওপর— সারিবদ্ধ হাড়ি-কুড়ি ভেঙে চুরমার হয়ে গেল।

দশ বিশ হাঁড়ি ভাঙে কুমার কুপিত।
বাড়ি ধরি টানিয়া বেড়ায় চারিভিত॥ (১০. ১৩. ৩৫০)

চাঁদ পরম লাঞ্ছিত হলেন। ভয়ে ভীত কুমোরদের মেয়েরা সামান্য শুশ্রূষা করলেন তাকে। দিলেন চার পণ কড়ি। চাঁদ সেই কড়ি নিয়ে তাঁতীর পল্লীতে গিয়ে কাপড়ের দরদাম করতে থাকলেন ('চারি পোন কড়ি বস্ত্র মুলায় তখন')। তাঁতিরা ক্রুদ্ধ। মনসা তখন কাষ্ঠরূপী নাগদের স্বমূর্তি ধারণ করতে বললেন।

চারিভিতে নাগ দেখি কুমার সভয়।
বাদিয়ার কাষ্ঠ কিনি খাইনু আপনায়॥
বাপে পোয়ে কুমারেরা রড়ারড়ি ধায়।
তাঁতিপাড়া নিকটে চাঁদোর লাগ পায়॥ (১০. ১৩. ৩৫৯-৬০)

এই আত্যন্তিকতা চাঁদের চরিত্রের ন্যায় নষ্ট করেছে বলাই বাহুল্য।

গোপাল হালদার, অরবিন্দ পোদ্দার-এর মতো কিছু কিছু গবেষক চাঁদ চরিত্রে খুঁজে পেয়েছেন, শাসক-শাসিতের দ্বন্দ্ব—মধ্যযুগের সামন্ততন্ত্রের ছক। তাঁদের কথা সামান্য উল্লেখ করা দরকার। গোপাল হালদার লিখেছেন চাঁদের মধ্যে সামাজিক প্রতিবাদ মূর্ত হয়ে আছে (Chandsadagar is an embodiment of social protest)— 'কারণ, তখন সমাজ সামন্তযুগের কঠিন নিগড়ে বাঁধা ছিল। সেই বন্ধনের জ্বালা তারই মধ্যে কখন অতি সংবেদনশীল চিত্তে অসহ্য হয়ে উঠত। তাঁরা সেদিনের শ্রেষ্ঠ মানুষ, অচেতন বিদ্রোহী। তাঁদের সেই গণ বিদ্রোহ তখনকার দিনে স্বাভাবিকভাবেই রূপ গ্রহণ করত ধর্মগত কোন আবরণের আড়ালে, তাতে অনেক সময়ে বাস্তব রাজশক্তি ও সমাজশক্তির কঠোর শাসন এড়িয়ে যাওয়া যেত, অনেক সময়ে শাসক শক্তির অত্যাচার সইতেও হত না।' (গোপাল হালদার : *বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা* ; প্রথম খণ্ড; ৬৩ পৃ.)। এই বিশ্লেষণ নিছক এক মাত্রিক মনে হয়। যে চাঁদ সদাগর নিজেই একজন সামন্তপ্রভু— দাসদাসী (অধিকাংশই ক্রীতদাস) পরিমণ্ডিত, পাত্র মিত্র সহযোগীতে ভর্তি যার অর্থনৈতিক প্রতিপত্তি ও সামাজিক আধিপত্য যথেষ্ট— তাকে গণবিদ্রোহী বলে ভাবা নিতান্তই আরোপিত।

অরবিন্দ পোদ্দারের বিশ্লেষণ তুলনায় বস্তুগ্রাহ্য যুক্তিযুক্ত মনে হয়। 'পদ্মাকে স্বীকার না করা এবং তাঁর পূজায় সম্মত না হওয়ায় চাঁদ সদাগরের জীবনে যে সর্বনাশা দুর্যোগ নেমে এসেছে, পদ্মাকে স্বীকার করে সে দুর্যোগ থেকে পরিত্রাণ লাভের'— বাধ্যতাকে অরবিন্দবাবু সামাজিক-বাস্তবতার প্রেক্ষিতে দেখতে চান। তাঁর বিচারে 'সামাজিক দাবীর সমবেত আবেদনের প্রভাবে চাঁদ সদাগর পদ্মাপূজার সম্মতি দান করেন।' অবশেষে তাঁর মন্তব্য : 'সমাজের সর্বাংশ যে দেবতাকে স্বীকার করে নিয়েছে, সমাজের বিধায়কের পক্ষে তখন সেই শক্তিকে স্বীকার না করার পক্ষে আর কোন যুক্তি বা অর্থ থাকে না।' (অরবিন্দ পোদ্দার : মানবধর্ম ও বাংলা কাব্যে মধ্যযুগ; কলকাতা ; দ্বিতীয় সংস্করণ ; ১২৪ পৃ)। চাঁদ সদাগরকে 'সমাজের বিধায়ক' বলার কোন বাস্তব যুক্তি মনসামঙ্গল কাব্যে নেই। মনসা নেতার কাছে পরামর্শ চেয়েছিলেন:

নাহিত তন অগোচর ক্ষিতিবৈসে যত নর
শুদ্ধমতি আছে কোন জন।
খড়ি পাতি ঝাটবল কোন জন আছে ভাল
আগে পূজা লব কার স্থান॥ (৪. ১১. ৩৩৪)

বিপ্রদাসের এই রচনাংশে মনে হয় চাঁদ সদাগরের কাছে 'আগে পূজা' নেওয়ার আকাঙক্ষা ছিল মনসার ; কারণ তিনি 'শুদ্ধমতি'। বস্তুতপক্ষে এই কারণ ও ঘটনা সামান্য ভিন্ন ভাবে বিবেচ্য। ঘটনার ধারাবাহিকতা অনুসরণ করলে বোঝা যায় মনসা চাঁদ সদাগরের কাছে নয়, প্রথম পূজা পেয়েছেন রাখালদের মধ্যে। নেতা পরামর্শ দিলেন :

অবগতি কর হরসুতা।
প্রথমে ধরণী মাঝে করহ পূজার কাজে
রাখালেরে হও বর দাতা॥ (৪. ১৩. ৩৬৯)

এরপর ক্রমশ মুসলমান, জেলে, নারীদের মধ্যে পূজা প্রচারিত হয়েছে মনসার। সুতরাং 'আগে পূজা লব' অর্থ অন্যরকম। আগে অর্থ সময়বাচী নয় এটি পূজানুষ্ঠান গত। মনসার পূজার অগ্রাধিকার অর্থেই শব্দটির প্রয়োগ ঘটেছে বলে মনে করি। পূজার অগ্রাধিকার— সাধারণভাবে ব্রাহ্মণ্য সমাজের ; হিন্দু ধর্মচারের এই রীতির ব্যত্যয় ঘটে গেছে মনসামঙ্গলে। এদিক থেকে বিবেচনা করলে চাঁদ সদাগর বাংলার ধর্ম-সামাজিক ইতিহাসে কোন কালচিহ্ন ছুঁয়ে থাকতেও পারেন। তাকে সেক্ষেত্রে 'সমাজের বিধায়ক' বলে গণ্য করা যেতেও পারে— যেমন অরবিন্দবাবু করেছেন। কিন্তু চাঁদ সদাগরকে বিপ্রদাস (এবং প্রাপ্ত অন্যান্য কবির ক্ষেত্রেও) ব্রাহ্মণ্য প্রাধান্য অস্বীকারকারী সমাজ-বিধায়ক হিসেবে গণ্য করেন নি। প্রায় সর্বত্রই তিনি ব্রাহ্মণ্য নেতৃত্ব স্বীকার করেছেন ধর্মাচারের ক্ষেত্রে। ত্রিবেণীর গাঙ্গে চাঁদ মধুকর থেকে নেমে তীর্থকার্য করেছেন। সেখানে তিনি দেখেছেন 'ছত্রিশ আশ্রমে' লোকে আনন্দিত। আছে ব্রাহ্মণরা, তারা 'সর্বশাস্ত্রে বিচক্ষণ', দিবাকরের মতো তেজ তাদের ; তাদের মধ্যে আছে 'বিশারদ গুরুধর্মে/কুলগুরু দেবের দোসর।' (৯. ৩. ২৭) এরপর চাঁদ নিমাইতীর্থে, খড়দহের শ্রীপটে, চিতপুরে সর্বমঙ্গলা দেবীকে, বেতড়ে চণ্ডীদেবীর উদ্দেশ্যে পূজা দিয়েছেন, পূজা দিয়েছেন কালিঘাটে। মনসা পূজার সময় চাঁদ সদাগর সম্পর্কে জানিয়েছেন বিপ্রদাস :

নিজ মন পরিতোষে অঙ্গুরি যুগলবাসে
ব্রাহ্মণ বরিল নরপতি।
সম্ভ্রমেত সুবিধানে যজ্ঞ করে ব্রাহ্মণে
পদ্মা-পদে শুনিল আহুতি॥ (১৩.৯.১৩৩)

সুতরাং সমাজের বিধায়ক হলেও পূজার অগ্রাধিকার তিনি পান নি।

চাঁদ সদাগরকে শাসিত জনসাধারণের নেতৃত্বে স্থাপন করে অদ্ভুত একটি আলোচনা চোখে পড়ল। ড. জয়া সেনগুপ্তার *মনসামঙ্গল কাব্যে সামাজিক পটভূমিকা ও নারী* নামক গ্রন্থে সেনগুপ্তা লিখছেন— 'অত্যাচারী শাসক শক্তির প্রতীক দেবী মনসা, নিগৃহীত— নিপীড়িত, শাসিত সমাজের প্রতিভূ মানব চাঁদ সদাগর।' শুধু তাই নয়, তাঁর ব্যাখ্যা : 'তৎকালীন সামাজিক প্রেক্ষাপটে শাসিত সমাজের সামগ্রিক বিজয় বাস্তবে সম্ভবপর নয় বলেই, কবি দেব ও মানুষের এ সংগ্রামে দেবতাকেই বিজয়ী করেছেন। কিন্তু আপাতঃদৃষ্টিতে দেবতার আংশিক বিজয় মনে হলেও গভীরভাবে অনুধাবন করলে দেখা যায় অত্যাচারিত শক্তির প্রতিবাদ তথা প্রতিরোধের সাফল্যও নিতান্ত নগণ্য নয়।' (*মনসামঙ্গল কাব্যে সামাজিক পটভূমিকা ও নারী* : ড. জয়া সেনগুপ্তা ; বড়াল প্রকাশনী ; ঢাকা ; ১৯৯০ ; ১২৭ পৃ.)। একটি নির্দিষ্ট ছকে ফেলে আলোচনা করতে গিয়ে ড. সেনগুপ্ত এখানে উৎকল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন। চাঁদ সদাগরকে মোটেই নিপীড়িত

অত্যাচারিতের প্রতিভূ ভাবা চলে না। তার সামাজিক প্রতিপত্তি, দেবতার বিরুদ্ধে স্পর্ধিত চরিত্র ধর্মটি খেয়াল করলে তাকে লাঞ্ছিত বলতে দ্বিধা হয় না, কিন্তু তাকে অত্যাচারিতের প্রতিভূ কেমন করে বলা সম্ভব? হাসনহাটির মুসলমানদের উপর মনসার নাগরা একই রকম অত্যাচার করেছে; তাবলে কি হাসনহাটির প্রধান সৈয়দ হাসনকে অত্যাচারিতের প্রতিভূ বলে গণ্য করা যায়? আসলে শাসক ও শাসিতের ছক (Hegimony and Dominance-এর পাশে Subaltern-এর মতো)-এর সূত্রে আলোচনা করতে গিয়ে আরোপের ফাঁদে জড়িয়ে পড়েছেন জয়া দেবী। তথাকথিত অত্যাচারীর ছকে ফেলে মনসা সম্পর্কে ড. সেনগুপ্তার বিশ্লেষণ : 'আজন্ম পিতৃমাতৃস্নেহ বঞ্চিতা আত্মীয় স্বজনহীনা, নিরাশ্রয় মনসার জীবনে একের পর এক আঘাত তাকে প্রত্যাঘাতের কামনায় দৃঢ় করেছে। নিজ জীবনে আত্মীয় পরিজনের মমত্বহীনতা তাকেও নির্দয় নিষ্ঠুর প্রতিহিংসাপরায়ণা করে তুলেছে।' (ঐ ; ১৪০ পৃ.)। এখানে মনসার চরিত্রায়ণে মনস্তাত্ত্বিক উপাদানটি যথাযথ উপস্থাপিত হয় ঠিকই, কিন্তু এর কোন সামাজিক তাৎপর্য বিশ্লেষণ করা যায় না।

৯.৩ সনকা চরিত্রের বৈশিষ্ট্য সন্ধান

চাঁদের স্ত্রী সনকা বিষয়ে খুব বেশি কথা বলার নেই। সাধারণভাবে মনসামঙ্গল কাব্যে (এবং অন্যান্য মঙ্গলকাব্যেও) নারীর বেদনা প্রকাশিত হয়েছে। সনকা সেই বেদনা প্রকাশ করার অন্যতম মাধ্যম। সনকার বেদনার প্রধান কারণ পরিবারে তার কোন ক্ষমতা নেই। তার কোন নিয়ন্ত্রণ নেই বটে কিন্তু দায়িত্ব অত্যন্ত বেশি। ক্ষমতার কেন্দ্রে নয় পরিধি ঘেঁষে তার অবস্থান। স্বামী, সন্তান ও পরিবারের মঙ্গল কামনা ছাড়া তার নিজস্ব কোন আকাঙ্ক্ষা নেই— সত্তা নেই— ব্যক্তিত্ব প্রকাশের দাবি, চাহিদা বা প্রয়াস নেই। জালু-মালুর পরিবারের বৈভবের সংবাদ পাবার পর তার তথ্যসন্ধান এই উদ্দেশ্যেই। ঝাউয়া দাসীকে তিনি সংবাদ নিতে বলেছেন। ঝাউয়া সংবাদ এনেছে :

> দেখিল বিচিত্র বারি জালুর মন্দিরে।
> হরিষে মনসা পূজে নানা উপহারে॥ (৫. ১০. ২২৪)

জালু-মালুর জননী নিছনির কাছে এই অবিশ্বাস্য বৈভবের উৎসে যে মনসা-ব্রত তার কার্যকারণ ও উদ্‌যাপন প্রণালী দেখে নিয়েছেন তিনি। সঙ্গে এনেছেন মনসার স্বর্ণময় ঘটবারি। তার মনে সম্পদ-দানে সক্ষম দেবীর প্রতি ভক্তি জেগে উঠেছে সঙ্গে সঙ্গে—এসময় তার উপলব্ধি :

> দেব নহে আপ্তপর ভক্তিবশে নিরন্তর
> বিশেষে আপনি কর দয়া।

স্বর্ণবারি প্রথমে দিতে চান নি নিছনি (মহা দুঃখ মনে গণি/রাজরাণী কি করিতে পারি), পরে মনসা স্বয়ং নির্দেশ দিয়েছেন—

> হরিমেতে দেহ দুই বারি। (৫. ১২. ২৪৫)

তিনি হয় পুত্রবধূ সঙ্গে নিয়ে পূজা করতে লাগলেন। সহজ বিশ্বাসী, পরিবারের সকলের কল্যাণের জন্য তৎপর নারী সনকা— কিন্তু তার এই উৎসাহ চাঁদের ক্রোধে নির্বাপিত হয়েছে। চাঁদ মনসার ঘট ভেঙে ফেললেন। সনকা ভীত সন্ত্রস্ত হলেন। তবে তখনও তার স্বামীর অমঙ্গল যাতে না হয় সে ব্যাপারে আন্তরিক আশঙ্কা দেখা গেল।

সনকার স্নেহার্দ্র চিত্তের আর একটু পরিচয় পাই মেনকা-রূপ-ধারী মনসাকে সামান্য কথায় ভুলে নিজের বোন বলে স্বীকার করে নেওয়ায়। স্বামীর কাছে গিয়েই তিনি বললেন : এই আমার ভগিনী/স্বামী এড়ি পলাইল আইল একাকিনী।। অন্যত্র দেখিয়েছি, সেকালের অল্প বয়সে বিয়ের কারণেই এরকম কাহিনী গড়ে তোলা হয়েছে।

স্ত্রী হিসেবে ন্যূনতম স্বাধীনতা, সম্মান, মর্যাদা পাননি সনকা। তেমন কিছু চাহিদাও ছিল না। স্বামী যখন মেনকার প্রতি কাম মোহিত— সনকা ডেকে বললেন :

দুরন্ত নৃপতি তোমা দেখিল কেমনে। ৫ ১৪. ৩০১)

চাঁদের অসঙ্কোচ কাম-প্রবৃত্তিকে সনকা সমালোচনা করার সাহস দেখাতে পারেন নি। কেবল অসহায় এক বেদনা-করুণ প্রতিক্রিয়া তার—

কর্ণে হস্ত দিয়া রানী করে হাহাকার। (৫. ১৪. ২৯৮)

হাহাকার করা ছাড়া আর কি করার ছিল তার। মনসা মেনকার ছদ্মবেশে যখন চাঁদের মহাজ্ঞান হরণ করে নিলেন—তখন চাঁদ মৃতবৎ হয়ে আর্তনাদ করতে থাকলেন। সনকা আর এক প্রস্থ দুঃখ করলেন। তার ক্ষীণ প্রতিবাদ শোনা গেল :

তখনি জানিনু তোমা সঞ্চরে বিপদ।
আপন কুবুদ্ধি হেতু মজাইলা সম্পত।। (৫. ১৪. ৩২০)

বস্তুতপক্ষে এক ঘোর পুরুষবাদী ব্যবস্থার মাঝখানে শাঁখের করাতের মতো পরিস্থিতি হয়েছে সনকার। স্বামীর যৌন আকাঙ্ক্ষার অন্যায়, নীতিহীন লোভকে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন আবার সেই লালসার ফল হিসেবে শক্তি-হীন মহাজ্ঞান-লুপ্ত স্বামীর জন্যেই তাকে খেদ করতে হয়েছে। বস্তুতপক্ষে অনিশ্চয়তার সর্বাতিশায়ী বোধেই আক্রান্ত এই নারী। সংসারে তার অধিকার নেই—কর্তব্য আছে আর আছে প্রতিটি গ্রন্থি-পরিস্থিতিতে তীব্র বেদনা।

সর্বানন্দ, পুরন্দর, সুন্দর, বিদ্যানন্দ, নারায়ণ আর জনার্দন—ছয়টি সর্বাঙ্গসুন্দর পুত্র নিয়ে ভরা সংসার সনকার। তাদের বিয়ে দিয়ে সুখে থাকার কথা। বধূরাও নেহাৎ অবাধ্য নন। কিন্তু বিষ অন্ন খেয়ে ছেলেরা এক সঙ্গে মারা গেলেন—সনকা তা দেখলেন। তার স্নেহাতিরেককে এজন্যে দায়ি করতে পারি। বিদ্যালয় যাবার পথে দুর্বুদ্ধির বশে ('কুবুদ্ধি লইয়া নাগ চলিল সত্বরে') ফিরে এলেন তারা—মায়ের কাছে এসে খেতে চাইলেন।

মায়ের অগ্রেতে সভে কহে পরিহারে।
অন্ন খায়্যা যাব মোরা পড়িবার তরে।। ৬.৫.

বধূদের ডাক দিয়ে সনকা স্নান সেরে এসে পুত্রদের খাদ্য পরিবেশন করতে বললেন। সোনার থালায় বিষ-যুক্ত অন্ন কালচে লাগল। ছেলেরা খাবেন কি খাবেন না ভাবছেন, সনকা বললেন—বধূদের হাত ধোয়ার জন্যে এই কাণ্ড ঘটেছে ('হস্ত পাখালিল বধূ থালের উপরে')। বিপ্রদাস কুবুদ্ধি-র বশে সনকার এই অজুহাত—এরকম ভেবেছেন। মনসা মর্ত্যে কালনাগিনীকে কুবুদ্ধি আর নিদালি-র শক্তি সঙ্গে দিয়ে পাঠিয়েছেন, এরকম পরিকল্পনা বিপ্রদাসের। আর তাই সনকা এইরকম অজুহাত দিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে মাতৃস্নেহই সনকা চরিত্রের নিহিতার্থ। পুত্ররা খেতে চেয়েছেন।—সুতরাং তার স্নেহ আর্দ্র মন অন্য কিছু ভাবে নি ; খাদ্য পরিবেশনের পর তাঁর হঠাৎ মনে হয়েছে যদি তাঁরা না খান, যদি বধূদের উপর তাদের ক্ষোভ প্রকাশ পায়—সংসারে অশান্তি হয়—তাই এই অজুহাত। বলা বাহুল্য, স্নেহাতিশয্যই এখানে উপস্থিত। সনকা বলেছেন

বলেই তার ছেলেরা খাদ্য গ্রহণ করলেন। খাওয়া মাত্র তাদের মৃত্যু লক্ষণ দেখা দিল—হাহাকার করলেন তাঁরা।

কেহ সকাতর হৈয়া হৃদয় বেদনা পায়্যা
জননী চাপিয়া ধরে কোলে।
কেন গো জননী হেন কহ মোরে সম্বিধান
সর্বাঙ্গে অনল হেন জ্বলে।। ৬.৬.

সনকার স্নেহাতিরেকের জন্যেই বিষ-অন্ন খেয়েছেন তাঁরা, এরকম একটা ক্ষীণ সূত্র এখানে উপস্থিত। সনকার তীব্র বেদনা ও অসংবৃত আচরণ এরপর দেখা গেছে। তিনি মনে করেছেন—'কিব্যা খায়্যা পাতিয়াছে কাপ।' তাই তেঁতুল গোলা খাওয়ালেন পুত্রদের—সেঁক দিলেন। তেঁতুল আর আগুনের স্পর্শ পেয়ে বিষক্রিয়া আরও বেড়ে গেল। তাঁর কৃতকর্মের ফল এভাবেই এমন এক কাহিনী-বয়নকে অবলম্বন করেছে—যাকে পাশ্চাত্য গবেষকরা ট্র্যাজেডি বলে অভিহিত করেন। সনকা চরিত্রে বাংলার মনসামঙ্গল ধারার কবিদের রচনাশৈলীতে তেমনি রীতিরই প্রকাশ দেখে বিস্মিত হতে হয়—শিল্পের গভীর উপলব্ধি ও প্রকাশনার ক্ষেত্রে আদৌ প্রাচ্য পাশ্চাত্যের সমান্তরাল দূরত্ব নেই, এরকম একটি সিদ্ধান্ত উঠে আসে এই ভাবে।

একটি সুস্থ স্বাভাবিক সাংসারিক ঘটনার গতি—বৈপরীত্যের টানে বেদনার তীব্রতায় ডুবে গেল ; একসঙ্গে ছয়টি পুত্রের মৃত্যু ঘটল, যার পেছনে মাতৃ আদেশ স্নেহাকাঙ্ক্ষারও ভূমিকা আছে—একে আরিস্ততল বলতেন Peripety. আমরা স্মরণ করতে পারি তাঁর রচনার এই অংশ :

> 'A Peripety is the change from one state of things within the play to its opposite of the kind described, and that too in the way we are saying, in the probable or necessary sequence of events ...' *On the Art of Poetry* : Aristotle ; অনুবাদ—Ingram Bywater ; Oxford at the Clarendon Press ; প্রথম সংস্করণ ; আমরা দেখছি ১২শ পুনর্মুদ্রণ ; ১৯৭৪ ; পৃ. ৪৬)।

—আমাদের মনে পড়তে পারে আগের রাত্রে এই পুত্ররা স্ত্রীদের সঙ্গে আনন্দে রাত কাটিয়েছেন। খাদ্য পরিবেশনের ঠিক আগে সনকার পুত্রবধূরা আনন্দে স্নান সেরে এসেছেন। সনকার আচরণ ও সক্রিয়তা আর তার ফল হিসেবে উদ্ভূত ঘোর বেদনার হাহাকার :

না জানি পুত্রের শোক জন্মিয়া সংসারে।
কে মোরে ফেলিল বান্ধি এ শোক সাগরে।। (৬. ৭. ১৪৫)

অনেকটাই ট্র্যাজেডি-শিল্পের বঙ্গীয় সংস্করণের মতো মনে হয়।

চাঁদের অন্যায় ও তার ফলে নেমেসিস-কল্প মনসার সঙ্গে বিরোধ, মহাজ্ঞান হারানো, নখরা বাগানের ধ্বংস—এগুলি সনকার অস্তিত্বের বাইরের দিকটি মলিন করেছে। অন্যপক্ষে ভেতরে ভেতরে ভেঙে গেছেন তিনি— পুত্রদের সহসা মৃত্যুর ফলে।

সুতীব্র হাহাকার তার :

নিঠুর পদ্মার নাগ পুত্র মোর দংশে।
তর্পণ করিতে ক্ষিতি না থুইল বংশে।।

স্বামী চাঁদও কি কম নির্মম নির্মোহ? মনসার নিন্দা, মনসার প্রতি অন্যায় আচরণই এই দুর্ঘটনার উৎস, এরকম কথা বলে সনকা স্বামীর কাছে ধিক্কার ছাড়া কিছুই পান নি। চাঁদকে সনকা বলেছেন, তার দোষেই এই বিপত্তি :

মনসার নিন্দা শুনি রাণী বড়ো রোষে।
সর্বনাশ হৈল রাজা তোর দম্ভদোষে॥
হরিল ব্রহ্মজ্ঞান কুবুদ্ধি তোমার।
ধন্বন্তরি ধনা-মনা মৈল ধুন্ধুমার॥ (৮. ৮. ১৫৯-৬০)

দুঃখের দিনে স্বামীর অন্যায় আচরণ সম্পর্কে সনকার সমালোচনাটুকু কিছুমাত্র গায়ে না মেখে চাঁদ সদাগর বলেছেন— দৈবের কথা। তাঁর ব্যাখ্যা দৈবই এই দুর্ঘটনার মূল কার্যকর শক্তি—

দৈবদোষে পুত্র মৈল কি করিতে পারি।

একটু আগেই কিন্তু চাঁদের ব্যাখ্যা ছিল : 'অন নহে মোর পুত্র লৈয়া গেল কানি।' দৈব আর মনসা এখানে একাকার। মনসাই দৈব। চাঁদ সেই দৈবকে জয় করার আদর্শে আত্মদীক্ষিত। কিন্তু তার রুচি সর্বত্র খুব উচ্চ মনে হয় না। এই ব্যাখ্যার পরক্ষণেই তিনি সনকাকে আশ্বস্ত করেছেন এই বলে :

তোমা আমা কুশলে থাকিলে দুইজন।
দুই বৎসরের পরে হবে এক এক নন্দন॥
তপস্যা করিয়া আমি মাগি লব বর।
দ্বাদশ বৎসরে হবে ছয় কুলধর॥ (৮. ৮. ১৬৩-৬৪)

স্ত্রী যে পুত্র-সন্তান জন্মদেবার জৈবিকযন্ত্র মাত্র, তাঁর অন্য কোন সত্তা নেই, সত্তার স্বীকৃতি নেই— সম্মান নেই, চাঁদের উক্তিতে তার স্পষ্ট ঘোষণা। সনকার সন্তান-স্নেহ, মৃত সন্তানদের জন্যে তীব্র বেদনা, উপদেশ-পরামর্শ দানের কিছুমাত্র ভূমিকা চাঁদের কথায় আচরণে ধরা পড়ল না। সনকার ব্যক্তিত্বের স্বাতন্ত্র্যকে তিনি অস্বীকার করেছেন।

পুত্রদের মৃত্যুর কিছুদিন পর মনসার প্ররোচনায় চাঁদ (তিনি শিব রূপে স্বপ্ন দেখিয়ে উত্তেজিত করেছিলেন) চললেন বাণিজ্য করার উদ্দেশ্যে। সনকা তখন সন্তানসম্ভবা :

পঞ্চম মাসের গর্ভ হইল উপসন্ন।
চাঁদো রাজা যুক্তি করে যাইতে পাটন॥ (৮. ১৭. ২৯০)

সনকা চিন্তান্বিত— তিনি স্বামীর কাছে এসে তাকে নিরস্ত করতে চাইলেন। 'নৃপতি পাটন যায়/এমন উচিত নয়/বিধি-বাস হইল ঘটন।'— স্বামীকে নিরস্ত করার জন্যে একটু কড়া কথাও বলেছেন তিনি। তার আশঙ্কা অনেকটা irony-র মতো শোনায়।

ছয় পুত্র ছিল তোর রূপে গুণে বিদ্যাধর
বধিলেন অন্নে বিষ দিয়া।
সকলি মনসা লয় তবু তোর নাহি ভয়
আসিবা সকল মজাইয়া॥ (৮. ১৮. ৩০০)

ঘটনার গতি, কার্যকারণ সূত্র— সবই জানেন সনকা। কিন্তু তাঁর ইচ্ছায় সংসার চলে না। তিনি মনসামঙ্গলে এক গুরুত্বপূর্ণ অবদমিত কণ্ঠস্বর। লোকধর্মানুসারে সনকা স্বামীর কাছে পত্র লিখিয়ে নিয়েছেন। তার অনুরোধ :

লোক ধর্মাচারে পাছে হয় অপমান।
তবে পত্র দেহ রাজা সভা বিদ্যমান॥ (৮. ২০. ৩১৪)

চাঁদ তার অনুরোধ রক্ষা করলেন ('পত্র দিলা চাঁদো রাজা লোকধর্ম ভয়')। যদি এই পত্র লিখিয়ে না রাখতেন তাহলে লখিন্দরের পিতৃত্ব নিয়ে সমাজে সংশয় উপস্থিত হতে পারত। আত্মরক্ষায় উদ্‌গ্রীব এক অবদমিত নারীর সত্তাই এখানে সনকার ব্যবহারে প্রমাণিত হয়েছে।

সনকার গর্ভযন্ত্রণার বিবরণ বিপ্রদাস গুরুত্ব দিয়ে উপস্থিত করেছেন। মনে হয়েছে সনকার—

ছয় পুত্র হারাইনু রূপগুণ নিধি।
আর এত দুঃখ মোরে দেয় কেনি বিধি॥
বুদ্ধি নাহি মোর প্রাণ হইল শেষ।
হেন কালে দৈবে মোর প্রভু দূর দেশ (১০. ২. ৩১-৩২)

সনকার যন্ত্রণার মধ্যে নারী জীবনের বেদনাকেই সর্বাতিশায়ী করা হয়েছে।

লখিন্দরকে ঘিরে সনকা ধীরে ধীরে তার জীবনের নতুন বাস্তবটি মেনে নিচ্ছিলেন। সঙ্গী পরামর্শদাতা বলতে দাসী ঝাউয়াবতী আর পুরোহিত সোসাই। এভাবে বারটা বছর কেটে গেল! অনুপম পাটনে চাঁদ সদাগরের একেবারের জন্যে মনে পড়ল না! মনসা তাকে স্বপ্নে দেখা দিলেন— সনকার রূপ ধারণ করে। তার সকরুণ মূর্তির বর্ণনা দিয়েছেন বিপ্রদাস :

অতি সকরুণ মুখী আঁখি অশ্রুঝরে।
নৃপতি মোহিয়া কহে মায়ার প্রকারে॥
আমি তো সনকা প্রভু অনেক দুঃখিনী।
শোক দুঃখে মৃতাবত বঞ্চি একাকিনী॥ (১০. ৭. ১০৬-১০৭)

মনসার ছলনা না হয়ে এ যদি হত বিপ্রদাসের নিজস্ব স্বপ্ন— তাহলেও ভুল হত না। তবে মধ্যযুগের কবির রচনায় মনসার স্বপ্নদর্শনই অধিকতর স্বাভাবিক হয়েছে। মুকুন্দরাম চক্রবর্তীকে দেবী চণ্ডীর স্বপ্ন প্রদর্শন আর এক গুচ্ছ মঙ্গল-কবির অনুরূপ অভিজ্ঞতার সূত্রে এই স্বাভাবিকতা স্বীকার করতে হবে। এই কাহিনী পরিকল্পনার আর একটু মূল্য রয়েছে। বিপ্রদাস পিপিলাই সনকার অশ্রুমুখী চিত্রটি শ্রোতৃমণ্ডলীর মনে স্থায়ী চিহ্ন হিসেবে রক্ষা করতে চেয়েছেন। 'অভাগিনী সনকা'র প্রতি তিলমাত্র দয়া নেই চাঁদের, একাকী তাঁকে নিক্ষেপ করেছেন দ্বাদশ-বার্ষিক জীবন-যাত্রায় ; তাই অভিযোগ সনকার :

তুমি তো পাষাণ-হিয়া কঠিন দারুণ।

এ কথা সনকা বলেন নি, তার হয়ে মনসা বলেছেন (আরও স্পষ্ট হবে যদি বলি কবি বিপ্রদাসই বলেছেন)— কিন্তু একথা সনকা বলতেই পারতেন। অর্থাৎ কথাগুলি তেমন নয়— যা ঘটনাত্মক সত্য (আরিস্টটল যাকে বলেন— 'the things that has been'), এই কথাগুলি হল সম্ভাবনাত্মক (আরিস্টটলের ভাষায় 'the things that might be'। (পশ্য : *On Art of Poetry*-র নবম পরিচ্ছেদ ; উক্ত সূত্র ; 43 পৃ.)। বিপ্রদাসের চরিত্রায়ণ এখানে বহুমাত্রিক। স্বপ্ন দেখার পর কামনা-মদির চাঁদ সদাগরের বর্ণনা খেয়াল করলে বোঝা যায় দীর্ঘ অবকাশের পর আজ চাঁদের মনে জেগেছে সনকার প্রতি ভালোবাসা। চাঁদ বলছেন 'মোর প্রাণ স্থির নহে/সনকা কেমনে হবে দেখা।' তার মনে হয়েছে 'সোঙরিতে রূপগুণ/ধরিতে না পারি মন'; দেশে তিনি পাখি হয়ে উড়ে যেতে চেয়েছেন। সনকার মধ্যে প্রেম ও কর্তব্য এমন আকস্মিক-সাময়িক-ছেদযুক্ত হয়ে আসে নি। সনকা কখনোই সেই কর্তব্য থেকে সরে যেতে পারেন নি।

নিরতিশয় লাঞ্ছিত হবার পর নানা দেশ ঘুরে ফেরার পর নিজ রাজ্যেই পুত্র লখিন্দরের নির্দেশে প্রজারা যখন চাঁদকে 'ভুল' তথা ভূত বলে সনাক্ত করেছেন ; যখন সনকা ছাড়া আর কেউ তাকে বাঁচাতে পারবেন না— বুঝতে পেরেছেন চাঁদ ; তখন চাঁদের উক্তি রীতিমত মনস্তত্ত্ব সম্মত বোধ হয় :

হেট মুণ্ড করি রাজা ভাবিল তখন।

আর কেহ্ না চিনিব আমি চাঁদো রাজা।
ভুল বলি মোরে বধ করিবেক প্রজা॥
সনকা চিনিব সবে আমি চাঁদো রায়।
ইহা বিনা আর কিছু নাহিক উপায়॥ (১১. ৩. ৩৭-৩৯)

ধ্বস্ত-নষ্ট-সর্বহারা-অবমানিত এক প্রৌঢ় স্বামীর স্ত্রীর প্রতি অনন্য-নির্ভরতা এইভাবে প্রকাশিত। চাঁদ তার সোনায় বাঁধানো দাঁত দেখালেন— চিনতে পারবেন তাকে সনকা। এই তার শেষ আশা। তার উক্তি :

ভুল নহি আমি হই চাঁদো দণ্ডধরি।
সুবর্ণ বাঁধান দন্ত দরশত কর॥ (১১. ৩. ৪১)

সনকা 'বেথিত-হৃদয়ে', 'গুপ্ত বেশে' স্বামীকে গৃহের অন্দরে নিয়ে গেলেন। 'তোলাজলে স্নান' করিয়ে ভোজন করালেন। এজন্যেই বলছিলাম সনকার দায়িত্ব-কর্তব্য ও প্রেমে কোন ছেদ থাকে নি। কাহিনীর এই অন্তর্বয়নে সনকা চরিত্রের এই রূপটি উজ্জ্বল হয়ে দেখা দেয়— সর্বংসহা এক জননী, সর্বরিক্তা কিন্তু অনিঃশেষ এক প্রেম মূর্তি।

সনকার মধ্যে সংশয়-ভীরু, আশঙ্কা-কাতর জননীর আর একটু রূপ লক্ষ করি লখিন্দরের বিবাহ প্রস্তাবের সময়। তিনি বলেছেন :

শুনি সনকা বলে চাঁদোর গোচর।
বিবা রাত্রে পুত্রের নাগের আছে ডর॥
না দিব পুত্রের বিবা থাকুক ঐ মনে। (১২. ১২. ১৮৩-৮৪)

বলাবাহুল্য, অনেক ইচ্ছার মতোই— সনকার এই আকাঙ্ক্ষাও চাঁদ রক্ষা করলেন না। তবে সনকার স্নেহাতিরেক এই কথাটুকর মধ্যেও প্রকাশ পেয়েছে।

বিয়ের আয়োজনে ছয় ছয়টি অল্পবয়সী বিধবা পুত্রবধূকে নিয়ে সনকা অনেক প্রয়োজনীয় কাজ করেছেন। মঙ্গলাচার করেছেন এয়োতিদের ডাকিয়ে, রান্না বান্নার কাজে লাগিয়েছেন বিধবা পুত্রবধূদের। বিদায়লগ্নে পুত্রকে কোলে নিয়ে সনকা যখন বলেন :

আমারো তোমা কহি   দেখিতে আর নাহি
এই ত ভারত-ভুবনে।
তোমারো সবিচ্ছেদে   তিলেক অপ্রমাদে
না জীব ক্ষেণেকে বিহনে॥ (১২. ৯. ৮৫)

—তখন তা কেবল কথার কথা থাকে না। একমাত্র জীবিত পুত্রটির জন্যে তার আশঙ্কা নিছক অমূলকও নয়। একদিকে প্রবল প্রতাপান্বিত একরোখা স্বামীর জেদ অন্যদিকে প্রতিহিংসাপরায়ণ বিধ্বংসী ক্ষমতার অধিকারী মনসার কুটিল অভাবিতপূর্ব কার্যকলাপ— এই দুয়ের টানাপোড়েন, মাঝখানে এক সাধারণ নারী সনকা। তার আশঙ্কা— সবেধন নীলমণি পুত্রটিকেও বলি দিতে না হয়।

স্নেহকেই সনকা চরিত্রের আদি প্রণোদনা ও উপাদান বলে গণ্য করেছি। কালনাগিনীর বিষে শেষতম বিধি লখিন্দরের মৃত্যু সনকার পক্ষে অসহ্য ঠেকেছে। তার হাহাকার :

কে মোরে ফেলিল বাঁধি এ শোক সাগরে।
কতেক পুত্রের শোক সহিব শরীরে॥

তার ভাবনা অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করে মৃত্যুবরণ করবেন তিনি, তাহলে লখিন্দরকে তিনি যমপুরে গিয়েও পেতে পারেন! চাঁদকে এই পর্বে তীব্র ভর্ৎসনা করেছেন তিনি। বিশেষত এমন দুঃখের অবসরেও চাঁদ যখন তাকে বলছেন—

না কান্দ সনকা গো কান্দিলে কিবা হয়।
এতদিনে ঘুচিলো কানিরে নাহি ভয়॥

আর কোন ক্ষতি করার বস্তু নেই যখন তখন বিবাদের প্রয়োজন ফুরিয়েছে— নিতান্ত অবোধের মতো কথা। চাঁদের এই উক্তি মহাপুরুষের হতে পারে কিন্তু সাধারণ মানুষ সনকা তাকে সমর্থন করতে পারেন নি।

কুপিল সনকা রামা চাঁদোর বচনে।
অধোগতি হবে রাজা কুবুদ্ধি কারণে॥
যদি তুমি পূজা করো মনসা-কুমারী।
কেন পুত্র মরিবেক রূপের মুরারি॥ (১২. ৩৬. ৪৫৪-৫৫)

এর উত্তর নেই। চাঁদ সদাগরের আদর্শের ভুবনে তিনি একা। সনকাও তার সঙ্গী হতে পারেন নি।

ঝাউয়াবতী সনকার কাছে এসে যখন বেহুলার ডোমনী বেশ ধরার কথা জানিয়েছেন, তখন সনকার মধ্যে বেদনার ঝঙ্কার আর এক প্রস্থ প্রকাশিত। তাকে তিনি পুত্রবধূ বলে সনাক্ত করেছেন:

হা হা পুত্র বধূ বহি অন্যে নাহি মনে।
চিন্তিতে গণিতে অস্থি বিঁধিলেক ঘুণে॥ (১৩. ৪. ৩২)

হাড়ে ঘুন লাগার মতো কষ্ট তার। আশঙ্কা, বেহুলা অন্য কোন ডোম পুরুষকে গ্রহণ করে নিশ্চয় জাত খুঁইয়েছেন। আর— প্রশ্ন তার :

কোন বাঁকে পুত্র মোর দিলে ভাসাইয়া।

খুব স্বাভাবিক ভাবনা।

পুত্রবধূ বেহুলার সঙ্গে চাঁদকে মনসাপূজা করতে সনকা আর একবার সঙ্কল্প উত্থাপন করলেন। সমবেত সেই নির্বন্ধাতিশয্যে চাঁদ যথেষ্ট দ্রবীভূত হয়েও বললেন—

পুত্র শোকে সনকা বলয়ে অনুরোধে।
নেড়া ঝাউয়া দাসী বলে সনকার বুদ্ধে॥ (১৩. ৮. ৯৫)

ঠিক কথাই বলেছেন চাঁদ। তিনি বুঝতে পেরেছেন নারীদের সঙ্গে সংসার যাত্রার যে স্বপ্ন— তার সত্য স্বরূপ, মাধুর্য সেই নারীদের মনেই যতটা উদ্ভাসিত হয়, ততটা আর কারো মনে জাগে না। সনকা যত সহজে তার মনোগত অভিপ্রায় দাসী ঝাউয়ার সঙ্গে বিনিময় করতে পারেন, যত সহজে তিনি বোঝেন ছয়-বিধবা পুত্রবধূর নীরব বেদনার অকথ্য-কথন, যে সহমর্মিতায় অনুভব করেন বেহুলার প্রতিশ্রুতির মূল্য— ততটা তো চাঁদ সদাগর বোঝেন না। সনকার চরিত্রায়ণে বিপ্রদাস বিরল সামর্থ্যের পরিচয় দিয়েছেন।

৯.৪ বেহুলা : বাংলার কবিভাবনার অপূর্ব পরিচয়

জীবনানন্দ দাশ *রূপসী বাংলা*-র একটি কবিতায় যেভাবে বেহুলাকে বর্ণনা করেছেন— বিপ্রদাসের চরিত্র রচনরীতির সক্ষমতার সূত্রে সেই পংক্তি কটি মনে পড়তে পারে সচেতন পাঠকের।

'বেহুলাও একদিন গাঙুড়ের জলে ভেলা নিয়ে—
কৃষ্ণা দ্বাদশীর জ্যোৎস্না যখন মরিয়া গেছে নদীর চড়ায়—
সেনালি ধানের পাশে অসংখ্য অশ্বত্থবট দেখেছিল, হায়,
শ্যামার নরম গান শুনেছিল,— একদিন অমরায় গিয়ে
ছিন্ন খঞ্জনার মতো যখন সে নেচেছিল ইন্দ্রের সভায়
বাংলার নদী মাঠ ভাঁটফুল ঘুঙুরের মতো তার কেঁদেছিল পায়।'
[*জীবনানন্দ দাশের কাব্যগ্রন্থ* ; বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রা. লি. ; কলকাতা ; প্রথম খণ্ড, তৃতীয় মুদ্রণ— ১৩৭৯ ; ২১৭ পৃ.]

পরবর্তী কবির কালচেতনা বিপ্রদাসে আরোপ করতে চাই না— বেহুলার মধ্যে বাংলার যুগ বাহিত ভাবাদর্শ অবশ্যই সংহত হয়েছে। বেহুলা চরিত্রটিতে বাংলার সুদুর প্রাচীন কালগত প্রবণতার সঙ্গে সমাপতিত হয়েছে বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের যুগের সত্য। ক্ষিতিমোহন সেনের ইঙ্গিত মনে রাখলে কালগত মাত্রার পাশে ভৌগোলিক মাত্রাও কিছু প্রস্তাবিত হয়। দক্ষিণ ভারতের উপকূলের কোন কোন লোকাচার (এ নিয়ে 'ডোমনীকাচ' প্রসঙ্গে উপযুক্ত অবসরে আলোচনা করেছি)-এর সূত্রে এই মাত্রাটি বেহুলার মধ্যে অনুভব করা যায়। বেহুলার সক্রিয়তা, বৈধব্য সংস্কারে কিঞ্চিৎ অনাস্থা আদিম নারী-প্রধান সামাজিক বাতাবরণের কথা স্মরণ করায়। এর সঙ্গে তার সতীত্ব-পরীক্ষার প্রসঙ্গ পুরুষ প্রধান সামাজিক সত্যের দিকে ইঙ্গিত করে। মোট কথা বেহুলার মধ্যে মৌলিক মহাকাব্য (Epic of Growth)-এর চরিত্রায়ণের সূত্র লক্ষ করি। 'গিলগামেশে'র ঈশতার কিংবা মহাভারতের দ্রৌপদীর মতো বেহুলার মধ্যেও বহু যুগের ভাব সত্য (motif) একাকার— বহুযুগ শুধু নয়, বহু পরিধির।

বেহুলার চরিত্রায়ণ-পরিকল্পনায় আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য আমাদের নজরে আসে। পুরাণের একটি কাহিনীর সঙ্গে বেহুলাকে যুক্ত করার চেষ্টা দেখা যাচ্ছে বিপ্রদাসের রচনায়। প্রায় সমস্ত মনসামঙ্গল কাব্যের কবিই এই পুরাকথার সঙ্গে বেহুলার যোগসূত্র রচনা করেছেন। উষা-অনিরুদ্ধ কাহিনী পুরাণে যেমন, বাংলার কোন কবিই তেমন করে উপস্থিত করেন নি। পুরাণেও উষা-অনিরুদ্ধ কাহিনীর বৈচিত্র্য প্রচুর— ভেদ যথেষ্ট। বিপ্রদাসের রচনায় পুরাণ-প্রসঙ্গ উষা-অনিরুদ্ধের রূপান্তর গ্রহণের দৈব সূত্র রচনার কৌশল হিসেবে উপস্থাপিত। মনসা বেহুলা ও লখিন্দরকে ইন্দ্র সভায় তালভঙ্গের অপরাধে সাময়িকভাবে অভিশপ্ত করিয়ে মর্ত্যে নিয়ে আসছেন, এই সময় আত্মার অধিকার নিয়ে যমের সঙ্গে তার প্রাণান্তক দ্বন্দ্ব ঘটছে— যম হেরে ফিরে যাচ্ছেন, এরকম প্রসঙ্গগুলি এখানে বিস্তৃত আলোচনার অবসর নেই। আমরা দেখছি মর্ত্যে আসার পথে উষা-অনিরুদ্ধ মলিন নির্মোকের মতো পরিত্যাগ করছেন তাদের দেহের বহিরাবরণ :

মন্দার পর্বতে দুহে শরীর ছাড়িল।
দুহাকার প্রাণ লইয়া মনসা চলিল॥ (৮. ১৭. ২৮৬)

মনসা তাঁদের আত্মা (এখানে 'দুহাকার প্রাণ') নিয়ে গেলেন। তার সঙ্গে এর আগে বেহুলা বিতর্ক করেছেন। অবশ্য সে বিতর্ক বেহুলার রূপে নয়, উষার এই কথাবার্তা বিস্তৃতভাবে বলছি না, বেহুলা (অথবা উষা) যখন মনসার কাছে প্রতিশ্রুতি চাইলেন :

সত্য করো মোর সঙ্গে শুন বিষহরি।
জাতিস্মর হব আমি গিয়া মর্ত্যপুরী॥
যখন চিন্তিব আমি আসিবা তখনি। (৮. ১৭. ২৮৩-৮৪)

মনসা প্রতিশ্রুত হয়েছেন। বেহুলা চরিত্রে এই আরোপ তার চরিত্রের বহু বিশিষ্ট সংঘর্ষমান প্রয়াসের বাস্তবতা রক্ষার পক্ষে ক্ষতিকর। জাতিস্মরতা আরোপিত হওয়ায় বেহুলার সক্রিয়তাকে

মানবিক লক্ষণ না ভেবে দৈবী মায়া বলে মনে করার সম্ভাবনা তৈরি হতে থাকে। বেহুলা চরিত্রে এই উপাদানটিকে মধ্যযুগের আসর-সাহিত্যের প্রভাব বলে মনে হয়। আসরের শ্রোতৃমণ্ডলীর মনে স্বর্গ ও মর্ত্যের দ্বৈততা সমান্তরলতা লক্ষ করে একধরনের দোলাচলতা সৃষ্টি হতে পারে এরকম একটি সূক্ষ্ম জনমনস্তাত্ত্বিক পরিকল্পনা এর আড়ালে কাজ করে গেছে। বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের এই দোলাচলতা, সম্ভব অসম্ভবের সীমারেখাটিকে ভেঙ্গে দিয়েছে। বেহুলাকে ভাটি গাঙে ভেলা ভাসিয়ে দিয়ে বাংলার নদী-মাঠ-ভাটফুল স্বর্গের প্রতি উদ্যত হতে চেয়েছে। জীবনানন্দের কবিতার পংক্তি কটিতে এই উর্ধ্বায়ন (Sublimation)-এর ইঙ্গিতটি বেহুলার ভাসান-যাত্রায় দেখতে পাচ্ছি। বেহুলার জাতিস্মরতার অহঙ্কার বিপ্রদাসের রচনায় বেশ কয়েকবার লক্ষ করেছি।

মুক্তাসরোবরে সখীদের সঙ্গে নিয়ে জল তোলপাড় করে স্নান করছিলেন বেহুলা। তার 'চরণের জল' ব্রাহ্মণীর ছদ্মবেশে কূলে বসে থাকা মনসার গায়ে লাগে। মনসা তখন অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হলেন। অভিশাপ দিলেন :

শাপ দিনু বিবারাত্রে খাইব ভাতার। (১১. ৮. ১০৩)

বিপ্রদাসের রচনায় এরপর দেখছি বেহুলার দর্পিত উক্তি :

ভালো গালি দিলা অই আশীর্বাদ মোর।
তব শাপে কি হয় সহায় বিষহরি।
তাহার প্রসাদে পূর্ব জাতি না পাসারি॥
বাণসুতা উষা আমি অনিরুদ্ধ পতি।
পূজা প্রচারিতে পদ্মা জন্মাইল খিতি॥ (১১. ৮. ১০৬-১০৮)

এখানে একটি নতুন দোচলবৃত্তির ছাপ পরিকল্পিত হচ্ছে। বেহুলার চোখে মনসা এখানে দেবলোকের সত্তা, শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছে তা নয়। শ্রোতৃমণ্ডলী আগেই জানেন মনসা জরতী ব্রাহ্মণীর বেশে এসেছেন, বেহুলার সামনে কথা বলছেন। ফলে ধরে নিতে হয় শ্রোতৃমণ্ডলীর মনের মধ্যে দ্বৈততা সৃজনের উদ্দেশ্যে এই কাহিনী নির্মাণ করেছে। কিন্তু এর ফলে বেহুলা চরিত্রের মানবিক গুণ গেছে কমে। সেখানে পড়েছে দৈবী সত্তার মোহ-আবরণ।

লখিন্দরের পুনরুজ্জীবনের আগে পরেও বেহুলার মনে তাঁর পৃথিবীতে জন্মলাভের কারণটি মনে পড়েছে। ভাসান যাত্রার সময় কাকের মুখে বার্তা পেয়ে হবুলার কাছে এসেছেন তার ছয় দাদা। তারা তাকে থেকে যেতে বললে বেহুলার ব্যথিত চিত্তের উক্তি :

কি আর কহিব বাণী জন্মে জন্মে অভাগিনী
এত দুঃখ করিল গোসাঞিও।
বিধির লিখন ছিলো সেই মাত্র সার হৈল
ইহা বহি দরশন নাঞিও॥ (১২. ৪২. ৫১৫)

এই গোসাঞিও— ধর্ম ঠাকুর হলে যোগী সংস্কৃতির স্মৃতি চিহ্ন এখানে থাকতে পারে। অন্যপক্ষে ইনি যদি নিছক বিধাতা হন তাহলে 'জন্মে জন্মে অভাগিনী'র রহস্য ভেদ করা দরকার। মনসা-মঙ্গলের ভাবজগৎ বেহুলার বহুজন্মের বেদনার শেষে মুক্তি (মোক্ষপদ-লাভ)-র প্রসঙ্গে কিছু আড়াল হয়ে যাওয়া ভাবসত্যে বিশ্বাসী ছিল। কিছু পরে এ নিয়ে বেহুলা-মনসার কথাবার্তা সামান্য রক্ষিত হয়েছে। চাঁদ সদাগরের কাছে বেহুলা আত্মপরিচয় দিয়েছেন এইভাবে :

তিন জন্ম দম্পত্য পদ্মার সেবা করি।
সতী পতিব্রতা পূর্ব জাতি না পাসরি॥

পূর্বে বাণ সুতা নাম উষা তো আমার।
প্রভু অনিরুদ্ধ কাম দেবের কুমার॥ (১৩. ৮. ৮০-৮১)

'পূর্বজাতি না পাসরি'— অর্থাৎ জাতিস্মরতার শক্তি থাকায় বেহুলার দৈবী মহিমা সহজেই স্বীকৃত হয়েছে। বিপ্রদাসের ভাষায় দেখছি চম্পা নগরীর সবাই স্বীকার করেছেন :

কোথায় সম্ভবে হেন অসম্ভব নরে।
লক্ষ লক্ষ মৃত জীব জিয়াইতে পারে। (১৩. ৭. ৭৬)

আর এজন্যে লিখেছি, বেহুলাকে এসব ক্ষেত্রে কৃত্রিম নীরক্ত মনে হয়।

চাঁদের পূজা প্রদানের পর বেহুলা স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে স্বর্গের পথে চলেছেন। মনসা পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুসাারে তাকে নিয়ে অন্তরীক্ষে তার রথ চালনা করেছেন। লখিন্দরের মনে ছিলনা পূর্বকথা। বেহুলা তাকে বলেছেন :

তবে ত বেহুলা সতী নিভৃতে ডাকিয়া পতি
বুঝাইলা সকল কারণ।
তিন জন্ম সেবা করি তুষ্ট কৈনু বিষহরি
মুক্ষপদ লভিব এখন॥ (১৩. ১১. ১৬৮)

'মুক্ষবর' লাভ করা, 'সদাই অমর সঙ্গে মেলা'-র অধিকার পাওয়ার জন্য বেহুলা-লখিন্দর জগতের মানুষদের কাঁদিয়ে 'তেজি মিছে মোহ মারা' চললেন তারা। আকাশপথে যেতে যেতে 'বাপের অন্তঃপুরী' দেখতে পাবার পর মনসার কাছে প্রার্থনা করলেন বেহুলা।

ক্ষেণেক বিলম্ব করো এই মোর বাপঘর
দেখি যদি দেহ গো মেলানি।
প্রভুর সংহতি যাব পরিচয় নাহি দিব
অবিলম্বে আসিব এখনি॥ (১৩. ১১. ১৭৪)

মনসা দুঃখিত-চিত্তে অনুমতি দিলেন। যোগী-যোগিনীর রূপ ধরে বেহুলা-লখিন্দর গেলেন উজানী নগরে। বিহ্বল সুমিত্রার কাছে আত্মপরিচয় দিলেন—

এই প্রভু লখাই বেহুলা আমি সেই।
তিন জন্ম মুক্ষপদ মনসা সেবই॥

... ...

মুক্ষপদ পাইয়া স্বর্গে যাই পুনর্বার।
বিদায় হইয়া দুহে সভার গোচর॥ (১৩. ১২. ১৮৯ এবং ১৯৪)

মর্ত্য মায়ার মোহে আচ্ছন্ন যারা তাদের বেদনার সঙ্গে কোন পরিচয় বেহুলার ঘটে নি, এই ছকটি মেনে নিলে বেহুলাকে মানুষ বলে মনে হয় না। তিনি যার 'ব্রতদাসী' সেই মনসা আর তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী—দেবী চণ্ডী যেখানে নিরতিশয় মানবী চরিত্রে পরিণত হয়েছেন— সেখানে বেহুলার অতিমানবিক দৈবী রহস্যময় শক্তি আমাদের কতকটা বিভ্রান্ত ও অতৃপ্ত করে।

জাতিস্মরত্ব আর দৈবী সত্তার কথা ভুলে গেলে বেহুলার চরিত্রায়ণটি নাট্য লক্ষণাক্রান্ত মনে হয়। রীতিমতো Protagonist হয়ে ওঠেন তিনি— তার সংগ্রাম তখন মহাভারতের সাবিত্রী-র সঙ্গে তুলনীয় মনে হয়। সাবিত্রী ছাড়া অন্য কোন পুরাণ-নিষ্ণাত চরিত্রের সঙ্গে বেহুলার তুলনা করা চলে কিনা জানি না, সাবিত্রীর সঙ্গে খুব চলে। সাবিত্রী যেমন স্বামীর মৃতদেহ আগলে রেখে যমরাজের সঙ্গে বুদ্ধির পরীক্ষায় বিজয়িনী বেহুলাও তাই। মহাভারতের বনপর্বের

'পতিব্রতা মাহাত্ম্য পর্বাধ্যায়ে' মদ্ররাজ অশ্বপতির কন্যা সাবিত্রীকে লাভ করেন সূর্যাধিষ্ঠাত্রী দেবী সাবিত্রীর বরে। 'তাঁর তেজের জন্য কেউ তাঁর পাণি প্রার্থনা করলেন না।' অশ্বপতি তখন সাবিত্রীকে বলেন— 'কেউ তোমাকে চাচ্ছে না।' তুমি নিজেই নিজের পতি সন্ধান করো। (পশ্য: *মহাভারত* রাজশেখর বসু কৃত সারানুবাদ : এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রা. লি. ; কলকাতা; অষ্টম মুদ্রণ ১৩৮৬ ; ২৫৫ পৃ.)। এই সূত্রে আমাদের মনে পড়েছে বিবাহ রাত্রে লখিন্দর মারা যাবেন এই সংবাদ জানাজানি হয়ে যাওয়ায় পাছে কন্যা প্রার্থী হন তাই চাম্পাই নগরের বণিকদের মধ্যে কন্যাদের পিতারা পলায়ন করেছিল। তারা ভেবেছিল :

বসিয়া বণিক কুল আপনার পুরি।
পুত্র জায়া লইয়া সভে অনুমান করি॥
বিবা রাত্রে লখাই মরিব সর্পাঘাতে।
দেখিয়া দুহিতা রাণ্ডি করিব কেমতে॥ (১১. ৫. ৬৫)

এই ঘটনার সঙ্গে সাবিত্রীর পুরাকথার সম্বন্ধ বিপরীতধর্মী। সাবিত্রীর তেজ রাজপুত্রদের তার কাছ থেকে দূরে সরিয়েছে ; লখিন্দরের তেজহীনতা (বিবারাত্রে মৃত্যুর যোগ) বণিক কন্যার পিতাদের অনুরূপ ব্যবহার করিয়েছে। সত্যবান নামক রাজপুত্রকে বনের মধ্যে বরণ করলেন সাবিত্রী— এখানে তিনি স্বেচ্ছা-বিহারিণী। বেহুলার জননী সুমিত্রা যখন শুনেছিলেন চাঁদের ছোটপুত্রের বিবাহরাত্রে সর্পাঘাতে মৃত্যুর যোগ আছে, তখন তিনি আপত্তি জানিয়েছিলেন।

সুমিত্রা বলেন বিবা না দিব তথাই।
বিবারাত্রে সর্পাঘাতে মরিবে লখাই॥ (১১. ১০. ১৩২)

অকুস্থলে বেহুলা এসে দাঁড়িয়েছেন। তার কথায় তাকেও স্বেচ্ছা-বিহারিণী বলে গণ্য করতে হচ্ছে। শুনিয়া বেহুলা বলে মাথা হেট করি।

বাপ ভাই জননী সভার বরাবরি॥
শুন শুন পিত্য ভ্রাত আমার বচন।
ললাট লিখন কভু না যায় খণ্ডন॥ (১১. ১০. ১৩৭-১৩৮)

যার যেমন ভবিতব্য তাকে তেমনি কাটাতে হবে। সকলে একথা মেনে নিলেন।

সাবিত্রী যখন শাল্বরাজ দ্যুমৎসেনের পুত্র সত্যবানকে বরণ করেন তখন নারদ জানান— 'এক বৎসর পরে তার মৃত্যু হবে।' নির্দিষ্ট দিন গণনা করে সাবিত্রী যমের সঙ্গে কথা বলতে বলতে কথার ফাঁকে তার কাছে বর প্রার্থনা করেন শ্বশুরের অন্ধত্ব যেন দূর হয়, রাজ্য ফিরে পান, আর তার গর্ভে সত্যবানের ঔরসে যেন শতপুত্র হয়। যমরাজ তথাস্তু বলে মুশকিলে পড়লেন, আর সত্যবান মারা গেলেন না। এ কাহিনীটিও মনসামঙ্গলের মত ফলকথা যুক্ত ব্রতকথা। মহাভারতে আছে : 'এই সাবিত্রীর উপাখ্যান যে ভক্তি সহকারে শোনে সে সুখী ও সর্ববিষয়ে সিদ্ধকাম হয়, কখনও দুঃখ পায় না।' (*মহাভারত* : সারানুবাদ, উক্ত; ২৬১পৃ.)। মনসামঙ্গলের শেষেও দেখছি :

যেই জন শুনে ভনে পদ্মার মঙ্গল।
ধনপুত্র পরমাই বাড়য়ে কুশল॥
সদাই ভকতি যে বা গায় বা গাওয়ায়।
মনসা সহায় তারো নাহি সর্পভয়॥ (১৩. ১২. ২০৮, ২০৯)

নায়িকা-প্রধান সাবিত্রী উপাখ্যানের সঙ্গে বেহুলার কাহিনীর মিল বহুমাত্রিক। বেহুলাও দেবতাদের সভায় সুকৌশলে স্বামীর জীবন আর শ্বশুরকুলের যাবতীয় লুপ্ত নষ্ট সম্পদের পুনরুদ্ধার কামনা করেছেন। এই মিল আপতিক নয়। বেহুলা চরিত্রের উৎসে সুপ্রাচীন সমাজের ভাবনা লুকিয়ে আছে— ধর্ম নয় ব্রত হিসেবে এই কাহিনী গড়ে উঠেছে। ব্রত অর্থাৎ আদিম সমাজের magic মনসার ব্রত প্রচারকারিণী বেহুলা।— 'ব্রতদাসী'।

বেহুলা যখন ভাসানে চলেছেন তার আগে তার আচরণ আত্মীয় স্বজনের বিস্ময়ের উদ্রেক করেছে। বেহুলা প্রার্থনা করেছেন তাকে যেন ভাসিয়ে দেওয়া হয় :

মাজষ ভাসায়ে আমা দেও ভাসাইয়া।
মনসা গোচরে যাবো মৃত পতি লইয়া॥ (১৩. ৩৬. ৪৬১)

বেহুলা রেখে গেলেন নিদর্শন—

১. 'কড়াকের তৈল' দিয়ে জ্বালালেন একটি প্রদীপ। তার বক্তব্য: 'যদি মোর এই তৈলে/ছয় মাস দীপ জ্বলে/প্রভু লইয়া আসিম কুশলে।' (১৩. ৩৭. ৪৭৩)
২. সিদ্ধ করা হলুদ আর ধান পুঁতলেন ('আজিলেক') ; তার কথা— 'যদি প্রাণনাথ জিবে/তোরা ফল ফুল হবে/ নিদর্শন লোকপরমাণে।' (১৩. ৩৭. ৪৭৪)
৩. প্রতিজ্ঞা করলেন— 'আমার প্রতিজ্ঞা এই/যদি আমি সতী হই/প্রভু লইয়া আসিব দেশেরে।' (১৩. ৩৭. ৪৮০)

বোঝা যায়, কাহিনীর শেষে কি হবে তা গায়েনরা জানতেন, জানতেন শ্রোতৃ মণ্ডলীও। তবু এ কাহিনী শ্রোতারা শুনেছেন মুখ্যত দুটি কারণে—

(১) ধর্মাচার পালন এর আসল উদ্দেশ্য ছিল। ধর্মাচার শব্দটি ভেবেচিন্তে প্রয়োগ করছি। মনসামঙ্গল গান যাদের সামনে গাওয়া হয়েছে সেই আবহমান বাঙালি তখনও কোন সুনির্দিষ্ট ধর্মদর্শনে বিশ্বাসী ছিলেন না। তাদের ছিল ধর্মাচার। কৃত্য। (২) সঙ্কট ত্রাণ হবে তা জানা থাকলেও কিভাবে হবে তা জানতেন না তারা। নিত্য নতুন আসরে তাৎক্ষণিক সংযোজন বিয়োজন ঘটত। সেইভাবে প্রত্যেক আসরেই মনসা-কথা হয়ে উঠত নতুন নতুন কাহিনী। এ নিয়ে পরে উপযুক্ত অবসরে আলোচনায় আবার আসা যাবে।

বেহুলার সংগ্রাম নিরতিশয় সঙ্কটমুক্তির চেষ্টা, দেবী মনসার প্রতি একমুখী অবিচল ভক্তি আর প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের বহুমাত্রিক পরিচয়ের মধ্যে লাভ করা যায়। জাতিস্মর বলেই কিনা জানি না— নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে বেহুলা অতিমাত্রায় সচেতন। যখন তিনি মুক্তাসরে স্নান করছেন, পায়ের জল অজান্তে গিয়ে লেগেছে ব্রাহ্মণী-রূপী মনসার গায়ে, মনসা তাকে অভিশাপ দিলেন। ব্রাহ্মণীর সঙ্গে জেদ করলেন বেহুলা। দুজনে গঙ্গায় ডুব দিলেন। বেহুলা এয়োতি লক্ষণ যুক্ত উপকরণ পেলেন গঙ্গাদেবীর কাছে। বিপ্রদাসের বর্ণনা :

মনে বুঝি গঙ্গা দেবী বেহুলা ডুবিয়া।
দিলেন সিন্দুর-শঙ্খ ব্রাহ্মণী গঞ্জিয়া॥ (১১. ৮. ১১১)

চাঁদ সদাগর লখিন্দরের পাত্রী সন্ধানে উজানিতে যাবার পথে এই বিতর্ক-দৃশ্য দেখেছেন। তিনি বুঝেছেন এই পাত্রী-ই তার পুত্রবধূ হবার উপযুক্ত। লোক পাঠিয়ে কামার-বাড়ি থেকে লোহার কলাই তৈরি করেছেন চাঁদ। সেই কলাই সেদ্ধ করে দিতে হবে। সমুদ্রের জল খেয়ে এই রকম খাদ্যাভ্যাস হয়েছে। দুষ্পাচ্য বস্তু খাওয়া আর হজম করা চাই—এই কথা আড়াল হয়ে গেছে; লোহার কলাই গড়িয়ে আনতে হয়েছে কামার বাড়ি থেকে। যাইহোক, সুমিত্রা সে কাজ পারেন নি।

হেন অসম্ভব বা সম্ভবে কোন ঠাঞি।
মানবে সিজাইতে পারে লোহার কলাই॥ (১১. ১১. ১৬১)

মানুষে পারে না, কিন্তু বেহুলা পারেন। সাবিত্রীর মতোই— তিনি তেজহীন বিবাহরাত্রে মৃত স্বামীকে বাঁচিয়ে আনার ক্ষমতা রাখেন। তাই লোহার কলাই সেদ্ধ করা তার পক্ষে কি এমন কঠিন কাজ! বেহুলা বললেন :

না কর ক্রন্দন মাতা সুখে থাক তুমি।
এখনি লোহার কলাই সিজাইব আমি॥
মনসার চরণ বন্দী স্থির মন হয়্যা।
খড় বেশ আড়াই হালা আনিল কাটিয়া॥ (১১. ১২. ১৬৮-৬৯)

শুধু কি তাই, অতিশয়ের চূড়ান্ত কথা শুনতে অভ্যস্ত শ্রোতারা লিখিয়ে নিয়েছেন কবিকে দিয়ে— 'কাঁচা হাড়ি সরা কাঁচা পাতিল উনান'-এ 'সাত নান্দী কলাই' সেদ্ধ করেছেন তিনি।

হাতে করি তুলি দেখে গোটা পাচ সাত।
তুলিয়া দেখি যেন হইয়াছে ভাত। (১১. ১২. ১৭২)

চাঁদ সদাগর ফিরে গিয়ে সনকাকে একথা জানিয়ে প্রত্যয়-দৃঢ় কথা বলছেন ('সবকথা কহিল সনকা বরাবরি')— সেই সঙ্গে তার মন্তব্য :

নর হইয়া সিদ্ধ করে লোহার কলাই।
তাহা হইতে তরিবেক কুমার লখাই॥ (১১. ১২. ১৮২)

মধ্যযুগের আসরের স্বপ্ন আকাঙক্ষা রক্ষার সমস্ত দায়িত্ব বেহুলার উপর চাপিয়েছেন কবিরা। এতে বেহুলার বাস্তবতা বিশ্বাসযোগ্যতা যে নষ্ট হচ্ছে তা তাদের মনে থাকে নি। বিপ্রদাস এখানে ব্যতিক্রম নন। বেহুলা এ-কাব্যে বাংলার চেনা বাস্তবের স্বর্গবিহারী উচ্চারণ নন— স্বর্গের স্বপ্ন-মাধুরী মাখা একটুকরো আদর্শ।

বিবাহরাত্রে মনসা রথে আরোহণ করে বেহুলা-লখিন্দরকে দেখতে গেলে তার নাগছত্র দেখে ভয় পেলেন লখিন্দর। অজ্ঞান হয়ে গেলেন তিনি। 'চৌদিগে ভুজঙ্গে/লখাই দেখি তরাস'। আতঙ্কে ঢলে পড়লেন লখিন্দর। বরের অবস্থা দেখে, সকলে ভয়কাতর বেদনাহত (বিবাহরাত্রে সর্পাঘাত হবার কথা সবাই শুনেছিল— সুতরাং তাদের ভয় লখিন্দর মারাই গেছেন)। এ সময় বেহুলা অবিচলিত। জনক সাহেকে বললেন—'এই মনে থাকো সভে মনস্থির হইয়া।' নিজে বের হলেন মনসাপূজার স্থানে। মনসাকে কাতর প্রার্থনা তার—

পতি পত্নী তিন জন্ম পূজি বিষহরি।
তোমার প্রসাদে পূর্বজাতি না পাসরি॥
... ...
নিজ দাসী পেয়ে এত নিদারুণ কেনি।
জীয়াইয়া দেও প্রভু করুক ছায়নি॥
নহে গলে তুলি দিবো রসাল কাটারি।
জীবন তেজিব আমি তোমা বরাবরি॥ (১২. ১৮. ২৪৫, ২৪৭-৪৮)

সত্যি রসান-কাটারি দিয়ে যখন গলায় আঘাত করতে গেলেন ('হইয়া উগ্রমতি/গলায় দিতে কাতি') তখন মনসা 'মন্ত্রপুষ্পজল' দিলেন। সেই পুষ্পজল ছিটিয়ে দেওয়ার পর লখাই-এর জ্ঞান ফিরে এল।

বিবাহ বাসরে একের পর এক নাগ পাঠাতে পারেন মনসা, তাই তার মন্ত্রণা ও সক্রিয়তার বিবরণ দিলেন বিপ্রদাস :

ওথায় মন্ত্রণা করে বেহুলা রূপসী।
স্বর্ণ যন্ত্র লইলেক হড়পি সাঁড়াসি। (১২. ২৩. ২৯১)

নাগ আসার সঙ্গে সঙ্গে বেহুলা তাকে 'ভাই' বলে সম্বোধন করেছেন। তাকে— 'গৌরব করিয়া দুগ্ধ দিল বাটি ভরি।' দুধ খাওয়ার সময়— 'সুবর্ণ সাঁড়াসি', দিয়ে মুণ্ড চেপে ধরে হড়পিতে রেখে দিলেন। এইভাবে চারটি নাগকে বন্দী করলেন বেহুলা :

চারি গোটা নাগ বন্দী করে চারি পরে।

মনসা তখন উজানি নগরে নিজেই গিয়ে হাজির হলেন। বেহুলা চাতুরি করে প্রত্যেক ঘরে মনসার বারি রাখায় ক্ষুব্ধ হতে পারলেন না— বেহুলা নাগদের সকাল হবার পর ছেড়ে দিলেন। বিবারাত্রে সর্পাঘাতে মৃত্যু হল না লখিন্দরের।

লোহার বাসরে লখিন্দর-এর সহসা ক্ষুধা উদ্রিক্ত হল। লখিন্দর বেহুলাকে রন্ধন করতে বললেন ('শুন রামা করহ রন্ধন')। 'লহুঘরে' কেমন করে 'অনুচরী' ছাড়া রান্না করবেন। তাছাড়া :

কোথা পাবো কাষ্ঠজল ' হাঁড়ি চালু আনল
তিহড়ি কাটিতে নাহি স্থান।
নিশি ঘোর অতিকায় উপসন্ন কেহ নয়
কোন মতে করিব রন্ধন॥ (১২. ২৬. ৩৩৭)

লখিন্দরের পরামর্শ— মঙ্গল 'হেমহাঁড়ি'তে চাল আছে, 'পুরাতন বস্ত্র' চিরে 'ঘৃত সমযোগ' করে নারিকেল দিয়ে তিহড়ি করতে হবে। নারিকেলের জল দিয়ে রান্না করলেন বেহুলা। সোনার থালায় অন্ন ঢেলে খেতে দিলেন তিনি। লখিন্দর কিছু খাবার রেখে দিলেন ; ইচ্ছা—

শুন সুবদনি লও এই অন্ন তুমি খাও
বিশেষে আমার যত্ন তোরে। (১২. ২৬. ৩৪২)

বেহুলা সেই খাবার খান নি। বলেছেন— 'আছে কিছু অনুমান/আজি যত্ন না করিয় মোরে।' বেহুলার এই প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব তাকে উজ্জ্বল করেছে।

লোহার বাসর ঘরে লখিন্দর বেহুলার রতি প্রার্থনা করেছেন। কিন্তু 'কালিনিশা' থাকায় বেহুলা লখিন্দরের প্রার্থনা পূরণ করেন নি। তার অনুনয়—

না করিহ যত্ন প্রভু আজি যুক্ত নয় (১২. ২৮. ৩৪৯)

জানালেন তিনি 'জম্মে জম্মে পতি তুমি আমি ত রমণী'। সুতরাং আজকের পর তিনি নিশ্চয় তার প্রার্থনা পূরণ করবেন। মনসাকে সেবা করার জন্যেই তাদের জন্ম। আজকের রাতে অন্যায় আচরণ না করাই বাঞ্ছনীয় ('না কর পাষণ্ড প্রভু বিঘ্ন পাছে হয়')। আত্মসংযত বেহুলা এসব স্থানে শুধু সক্রিয় নন তাঁকে লখিন্দরের চেয়ে অনেক পরিণত মনে হয়।

প্রত্যুৎপন্নমতি, সচেতন, সংযত, ভক্তিমতী বেহুলার ভাসানযাত্রা বাংলার সংস্কৃতি জীবনে গভীর প্রভাব ফেলেছে। এই ভাসান যাত্রাকে মধ্যযুগে নারীর আচরণের আদর্শ রূপে উপস্থাপিত করেছেন কবিরা। সে আদর্শের লক্ষ্য স্বামীকে শ্রদ্ধা করতে শেখা। বস্তুতপক্ষে এই পুরুষপ্রধান ব্যবস্থায় সতীত্বের আদর্শের প্রতীক হয়েছেন বেহুলা। তার ভাসান যাত্রা নিষ্ক্রিয় এক খেয়ালি পুরুষের মৃতদেহ বহন করে ভেসে যাওয়া, কৃত্রিম এক ভয়বহ পরিস্থিতিতে সতীত্বের পরীক্ষা

দেবার সক্ষমতা হয়ে দেখা দিয়েছে। বাংলার নারী সমাজের কাছে বেহুলা শুধু আদর্শ (Idea) নন আদর্শের এক অতি উচ্চ মান (Standard) হয়ে দেখা দিয়েছেন, অজস্র বিপন্নতা পার হতে হতে যাকে দুশ্চর তপস্যায় সিদ্ধকাম হতে হচ্ছে। চরম বিপর্যয়ের মুখে যার স্বামী-সংস্কার এক মুহূর্তের জন্য বিভ্রান্ত হচ্ছে না— এমন এক তীব্র মনস্তাত্ত্বিক সংগ্রাম বেহুলাকে ঘিরে উত্থাপিত হয়েছে, যা আসলে বর্ণনীয় বস্তুকে স্মরণীয় করে— অপ্রাপণীয়কে আদর্শ বলে সঞ্চারিত করতে চেয়েছে।

একের পর এক বাঁক পার হয়েছেন বেহুলা। প্রত্যেক বাঁকেই দেখা মিলেছে দুর্নীতিগ্রস্ত, দুশ্চরিত্র, দুর্বার পুরুষ দল। তারা লোভ দেখিয়েছে ধন জন সম্পদের লোভ, আরাম আয়েসের লোভ— শেষে ভয় দেখিয়েছে। বেহুলা যাকে যেমনভাবে পেরেছেন নিরস্ত করেছেন।

১. ধনা পুলার বাঁকে 'জল কূলে'-র 'সব অধিকারী' ধনাকে প্রবোধ দিলেন বেহুলা আত্ম পরিচয় দিয়ে।

২. 'গোদা বড়স্বর বঙ্কে' জনার্দন নামক ব্যক্তি, যার দুই পায়েই 'স্থূল' বা গোদ, চাঁদের শালা হওয়ায় বেহুলা তাকে মামা শ্বশুর সম্বোধন করলেন। তার কাছ থেকে কোনক্রমে মুক্তি পেলেন।

৩.'জুয়ার বঙ্কে' এই জুয়াড়ি এক ব্যক্তি— 'জুয়া খেলাইতে তার মজিল সকল'। স্ত্রী-পুত্রকে জুয়ায় হেবে গেছে সে। বেহুলার অলঙ্কার দেখে লোভ বাড়ল—ভাবনা তার, এই নারীকে পেলে স্ত্রীর অভাব দূর হবে আর সেই সঙ্গে ঐ অলঙ্কারের অর্থ দিয়ে জুয়া খেলা যাবে। বেহুলা তাকে সামান্য কিছু ধন দিলেন

> কিছু ধন দয়া করি দিল তোর দুঃখে।
> উদ্ধরিয়া স্ত্রী-পুত্র বঞ্চহ গিয়া সুখে।। (১২. ৪৪. ৫৫২)

জুয়ার তাতে সন্তুষ্ট।

৪. 'বড়সিয়ার বঙ্কে'— করপদহীন পাপী এক পাষণ্ড। বড়সি ফেলে মান্দাস টেনে ধরায় বেহুলা তাকে অভিশম্পাত দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, টান মেরে নাবালে ফেলে দিয়েছেন।

> বেহুলার শাপে গোদা নাবালেতে তলে। (১২. ৪৪. ৫৭০)

জলে নাকানি চুবানি খেয়ে বেহুলার স্তব করল সেই 'বড়সিযা'। বেহুলার বরে তার গোদা দূর হয়ে গেল।

প্রকৃতির প্রবাহে প্রবৃত্তির আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করলেন বেহুলা। লোভী দুশ্চরিত্র লম্পট ছাড়াও পথে আছে পশুপাখি। শুরুতেই মনসা কাকের রূপ ধরে এসেছেন। বেহুলা তাকে অঙ্গুরী খুলে দান করেছেন— উজানি নগরে পিত্রালয়ে সংবাদ পাঠাতে বলেছেন। এরপর বেহুলা এলেন সেইখানে যেখানে গিধিনী শকুনি পাখি রয়েছে। ভয়াবহ ভয়ঙ্কর তারা।

> মৃত নর গন্ধ মাত্র দুই পক্ষ পায়।
> পাখে আচ্ছাদিয়া তারা মাজন রহায়।। (১২. ৪৪. ৫৭৭)

তাদের হাত থেকে স্বামীকে কোন ক্রমেই রক্ষা করতে পারলেন না। 'তীক্ষ্ণ রসাল কাটারি' দিয়ে আত্মহননে উদ্যত হলেন তিনি।

> মনসা চিন্তিয়া রামা গলে দিতে কাতি।
> রথ ভরে অন্তরীক্ষে আইলা পদ্মাবতী।। (১২. ৪৪. ৫৮৫)

মনসা শকুনি গিধিনীদের সরিয়ে দিলেন।

এবার এল 'শার্দুলের বঙ্ক'। বাঘের ডাক শুনে বেহুলা লখিন্দরের শব কোলে নিয়ে মূর্ছিত হলেন। বেহুলার ডাক শুনে মনসা 'ব্যাঘ্র মুক্তি' ঘটালেন।

ধরিয়া ব্যাঘ্রের পুচ্ছ ফেলিল আকাশে। (১২. ৪৫. ৫৯৭)

বাঘের বঙ্ক পার হবার পর এল বুড়নিয়াবঙ্ক। মধ্যগঙ্গা 'চাণকের গঙ্গ'। ছদ্মবেশী যোগীরা সেখানে নৌবহর ডুবিয়ে দেয়। এরা আসলে জলদস্যুর দল :

ললাটে উজ্জ্বল ফোঁটা কান্ধ শোভা যোগ পাটা
পদ্মবীজে জপমালা করে।
মিছা মন্ত্রজপ করে গলায় রুদ্রাক্ষ ধরে
নিশি হইল দুষ্টু-বিত্তি করে॥ (১২. ৪৬. ৬০০)

তারা দলবদ্ধ হয়ে বেহুলার উপর অত্যাচার করতে উদ্যত হলেন। বেহুলা প্রার্থনা করলেন মনসার উদ্দেশ্যে। 'মনসার মায়া-ধন্ধ/বুড়নিয়া হইল অঙ্গ'— মনসা এইভাবে বেহুলাকে মুক্ত করলেন।

এবার অনন্ত অসীম সমুদ্র— 'চৌমুখে বেহুলা রয়্যা/কান্দে পথ না পাইয়া'। নেতা ধোপানী তার কাছে এসে পথ চিনিয়ে নিয়ে গেলেন। স্বর্গের সঙ্গে মর্ত্যের আসরের এমন যোগ সূত্র বেহুলার মান্দাস যোগে তৈরি হল। এ-স্বর্গ জলাভূমি-খাল-বিল-নদী ও নয়নমুনির আড়ালে জেগে থাকা থই থই কৃষিক্ষেত্রের সামান্য দক্ষিণে। বেহুলা চরিত্রের সক্রিয়তা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, স্বামীপ্রেমের অপার্থিব আদর্শে, কৃচ্ছ্র সাধনের অতুলনীয় সামর্থ্যে এই স্বর্গ আমাদের প্রিয় মাতৃভূমিতেই রচিত হয়েছে।

ড. মহুয়া মুখোপাধ্যায় গৌড়ীয় নৃত্যের সন্ধান করেছেন জয়দেবের গীতগোবিন্দ প্রভাবিত স্থাপত্য-টেরাকোটা আর প্রাচীন অলঙ্কারশাস্ত্র গ্রন্থের শ্লোক সমুচ্চয়ে। যদি তিনি মনসামঙ্গলের পাঠ গ্রহণ করতেন কিছু সূত্র নিশ্চয় পেতেন। স্বর্গের নর্তকী বেহুলা মান্দাসেই নিয়ে এসেছিলেন রত্ন অলঙ্কার। সেগুলো পরে নিলেন তিনি— পরলেন ঘাঘরা আর নূপুর। মৃদঙ্গ বাজিয়ে নিজেই গান গাইতে গাইতে নাচলেন তিনি।

আপনি মৃদঙ্গ বাহে গীত গাহে রঙ্গে।
সুতল সুচ্ছন্দে নৃত্য করে অঙ্গ ভঙ্গে॥ (১২. ৪৭. ৬৩৬)

তাকে দেখে দেবসমাজ মুগ্ধ—

রূপ-বেশে মোহিত অমর সুর মুনি।

সব থেকে পীড়িত হলেন শিব। তিনি কামমোহিত বিহ্বল হলেন। তার কথা :

দেখিয়া যৌবন তার কাম-সাগরেতে মোর
ডুবি মন হইল বিকল।
পশুপতি তোরে বলে নহে প্রাণ কামানলে
কৃপা করি হও অনুকূল॥ (১২. ৪৮. ৬৪৩)

শিবের নির্লজ্জ কামনাতুর রতিলোভ তার শিষ্য চন্দ্রধর আর শঙ্কর ধন্বন্তরীর মতোই। কামুক পুরুষের লোভ থেকে নিজেকে বাঁচাবার ক্ষমতা বেহুলার যথেষ্ট। এখনও তিনি নিজস্ব কৌশল অবলম্বন করলেন। তার কথা—

ক্ষেম অপরাধ মোরে করো পুটপাণি।
মনসার বরদাসী তোমারো নাতিনী॥ (১২. ৪৯. ৬৫৪)

শিব তুষ্ট হলেন— তিনি এবার বেহুলার স্বামীকে বাঁচিয়ে দেবার জন্য মনসাকে আদেশ দিলেন। বোঝা যায় মর্ত্যের বাসর থেকে শুরু করে স্বর্গের নৃত্য-মঞ্চ কোথাও বেহুলা রতি-লালস পুরুষদের নজর থেকে মুক্ত হন নি— কেউ তার স্বামী, কেউ মামাশ্বশুর, কেউ পথের গুণ্ডাবিশেষ, কেউ দেবাদিদেব। সতী সাধ্বী এক নারীর চারপাশে কামাতুর এই পুরুষ শক্তির মঝখানে বেহুলাকে ক্ষুরধার সত্যের পথে থাকতে হয়েছে। কেউ তার উপর উপগত হতে পারে নি। ভাবলে অবাক লাগে, সতীত্বের এই আদল (model)-টি বাংলার মনসামঙ্গলের কবিরা গড়ে তুললেন কিভাবে! সব নারীর তো বেহুলার মতো দৈবী মায়া, অভিশাপ দেবার ক্ষমতা, সহযোগী দেবীদের সাহায্য জুটবে না। যাই হোক, রূপকথাধর্মী এই কাহিনীতে বেহুলা উত্থাপন করেছেন মডেলটি— বাংলার সাধারণ মানুষ এই অপ্রাপণীয় আদর্শটিকে শ্রদ্ধা না করে পারে নি। বেহুলা মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের পুরাণ-প্রভাবহীন পুরাণ-ধর্ম উপস্থাপনের আশ্চর্য নির্মাণ হয়ে উঠেছে।

স্বামীকে ফিরিয়ে এনে বেহুলা শ্বশুর বাড়িতে স্ববেশে যান নি। একটু তামাসা কৌতুক করতে চেয়েছেন। সেজেছেন তিনি ডোমনী। এই প্রসঙ্গে দক্ষিণ ভারতের অন্ধ্র উপকূলের লোকাচার, মালদহের একটি জনগোষ্ঠীর কৃত্যের কথা স্মরণ করেছি ; উপযুক্ত অবসরে এ নিয়ে আলোচনা করেছি। এখানে আমরা বলতে চাই উক্ত বেশ-ধারণের অন্য কোন তাৎপর্য কিছু আছে কিনা। আমাদের মনে হয়—

১. বেহুলা দেখতে চেয়েছেন তাকে পরিবারের সদস্যরা কি চোখে দেখছেন। ছয় মাস ঘরের বাইরে একাকী কাটিয়ে আসা যুবতী বধূকে কে বিশ্বাস করবে! তাদের কথা কে মনে রাখবে! সুতরাং বেহুলার ডোমনী বেশ ধারণ পূর্বাগত কোন কৃত্য (Ritual) হতেও পারে, কিন্তু এর মনস্তাত্ত্বিক তাৎপর্যও কিছু আছে।

২. লক্ষ টাকা মূল্যের ব্যজনী গড়িয়ে বেহুলা ধনাঢ্য চাঁদ সদাগরের বাড়ির অন্দর মহলে প্রবেশ করার কৌশল করে থাকতে পারেন। ধনী গৃহস্থ ভিন্ন ব্যজনী খরিদ করবে না কেউ। তাছাড়া ব্যজনীটিতে বেহুলা লখিন্দরের জীবন কথাও চিত্রের সাহায্যে বলা আছে।

লখিন্দরের কাছে ডোমনী বেশ গ্রহণের অনুমতি চাইলে তার মনে সন্দেহ জেগেছে— 'লোক মুখে লজ্জা পাছে হয়তো আমার।' উত্তরে বেহুলা বলছেন— রাজাকে ছলনা করে দেখব। এ ছলনার উৎসে কৌতুক থাকতে পারে। দুঃখের দীর্ঘ ভাসান যাত্রার শেষে সামান্য অবসর comic relief যাকে বলে, পেতে চেয়েছেন বেহুলা। বেহুলাকে দেখে ঝাউয়া দাসী অন্দরমহলে সনকাকে বলেছেন, বেহুলার মতো একজন এসেছে। তাকে ডেকে আনার পর যথারীতি সনকার পুত্রশোক দ্বিগুণ হয়েছে। তিনি হাহাকার করছেন, বেহুলা বললেন, তার ক্ষিদে পেয়েছে। ('ক্ষুধায় জ্বলিছে মোর প্রাণ')। শ্বাশুড়ির মন বোঝা হল। এবার চললেন বেহুলা— স্বামীর সঙ্গে। বেহুলার উপস্থিত বুদ্ধি— ঘটনা নিয়ন্ত্রণের স্বাভাবিক দক্ষতা এসবের মধ্যে উপহার দিয়েছেন বিপ্রদাস। তিনি বেহুলা সম্পর্কে যখন লিখেছেন—

> ত্রিভুবনে কেবা পারে বলিতে মহিমা।
> প্রতিজ্ঞা করিলা ধন্য বেহুলা উত্তমা॥ (১৩. ৭. ৭২)

তখন যথার্থ কথাই প্রকাশ পায় তার লেখনী থেকে। তার মন্তব্য— 'তব গুণে ঝুরিয়া মারিব সর্বজন।' বেহুলার মধ্যে দিয়ে মধ্যযুগের বাঙালি নারীর স্বামী সংসার, পতির সুখে দুঃখে সঙ্গে থাকার বাসনা ও অঙ্গীকার গুরুত্বপূর্ণ আদর্শ বলে ধরা পড়েছে। বেহুলা আমাদের মধ্যযুগের সাহিত্যের যুগাতিক্রমী উজ্জ্বল এক রত্ন— তাকে কোন ব্যক্তি কবি সৃষ্টি করেননি, বেহুলা মধ্যযুগের আসর সাহিত্যের স্বাভাবিক নির্মাণ।

॥ ১০ ॥

বিপ্রদাসের কাহিনী গ্রন্থনে পুরাণের নবমূল্যায়ন

আরও বেশ কিছু ক্ষেত্রে বিপ্রদাস পুরাণ-কাহিনী পুনর্গঠনের স্বাধীনতা নিয়েছেন। তেমনি দুয়েকটি প্রসঙ্গ উল্লেখ করছি :

১. নহুষ রাজার যজ্ঞে প্রচুর ঘি খেয়ে ব্রহ্মার অগ্নিমান্দ্য হয়েছিল, বিপ্রদাসের এই বিবরণ পুরাণ-অনুগত নয়।

নহুষ রাজা যজ্ঞ কৈল মুষলধারে ঘৃত দিল
অগ্নি মান্দি হইল ব্রহ্মার। (১.১৯.২৬০)

মহাভারতে অনুরূপ ঘটনা 'শ্বেতকী'-রাজার যজ্ঞের অনুষঙ্গে দেখা গেছে। দ্বাদশ বর্ষব্যাপী ঘৃতপানের ফলে অগ্নিদেবের অগ্নিমান্দ্য হয়। ব্রহ্মা-র পরামর্শে অগ্নিকে খাণ্ডব বন দাহন করে প্রাণীদের মেদ ভক্ষণ করতে বলেছিলেন। বিপ্রদাস এই পুরাণ-প্রসঙ্গের লোকায়ত কাহিনী উত্থাপন করেছেন।

২. দেবতাদের সমুদ্র মন্থনের কাহিনী সম্পূর্ণ নতুন প্রেক্ষিতে লিখেছেন বিপ্রদাস। এ হল 'দুঅজ মথন'। এর লক্ষ্য অমৃত নয়—বিষ। বাংলার লৌকিক জীবনে এ এক অভিনব পরিকল্পনা। কদ্রু-বিনতার কাহিনী, গরুড় ও নাগদের জন্মকথা— গরুড় ও নাগদের স্থায়ী বিরোধ, শেষে মাতা বিনতাকে মুক্ত করার জন্যে গরুড়ের চেষ্টায় অমৃত-কামনায় ক্ষীর সমুদ্র মন্থন। পুরাণের এই কাহিনীতে নানারকম স্তর আছে। বিভিন্ন পুরাণ বিভিন্নভাবে এ কাহিনী উপস্থাপন করেছে। অমৃত সংগ্রহের জন্যে গরুড় নানারকম চেষ্টা করেছে—ইন্দ্রের শক্তি নির্জিত করেছে—বিষ্ণুর বাহন হবার অঙ্গীকার করেছে। সবার শেষে কুশ-স্থানে অমৃতভাণ্ড রেখে সর্পদের স্নান করে আসতে বলা হয়—অমৃতস্থানে কুশে জিহ্বা দিয়ে লেহন করায় সর্পরা দ্বিজিহ হয়ে গেল।—এ কাহিনী মহাভারতের।

এই কাহিনী বিপ্রদাস জানতেন। তিনি লিখেছেন গরুড়ের উক্তি—পূর্বকথা :

অমৃত রাখিয়াছিনু কুশা-ঝাড় তলে।
ভক্ষণের কাজে নাগ আইল হেনকালে॥
কুশায়ে কামড় খাইল হইয়া অস্থির।
সে কারণে জিহ্বা তব হৈল দুই চির॥ (১.২০.২৭৩-৭৪)

গিলগামেশের কাহিনীতে এর বিপরীত ধরনের পরিকল্পনা দেখা যায়। অমরত্বের সূচক লতা বহু কষ্টে সংগ্রহ করে স্নান করে গ্রহণ করার জন্যে নদীতীরে রেখেছিলেন গিলগামেশ। সাপ এসে সেই অমৃতলতা খেয়ে যায়। ফলে মানুষ মরণশীল আর সাপ খোলস বদলায়—তারা মরে না! মধ্যপ্রাচ্যের কাহিনী আর মহাভারত হয়ে বাংলার নিজস্ব পুরাকথা— মনসামঙ্গল— চিন্তাপ্রবাহের মিল ও অমিল দেখতে চাইলে আলোচনাকে বিস্তৃত করতে হবে। এই মুহূর্তে— এই অবকাশে সে চেষ্টা করছি না। শুধু উল্লেখ করে রাখব মধ্যপ্রাচ্যের মৌখিক মহাকাব্য গিলগামেশের সঙ্গে মনসামঙ্গল আর সেই অঞ্চলের বেশ কিছু দেবী-ভাবনার সঙ্গে মনসা-র মিল হয়ত বা শুধুমাত্র আপতিক নয়। খুব প্রাচীন সংস্কৃতির প্রবহমান ধারাবাহিকতা মনসা মঙ্গলে আভাসিত হয়।

সমুদ্র মন্থনের লক্ষ্য— আগেই লিখেছি অমৃত নয় গরল। ড. সুকুমার সেন এ বিষয়ে তিনটি প্রাচীন সাধন পদ্ধতির ধারাবাহিকতা কল্পনা করেছেন। তাঁর ভাষায় এই সাধন পদ্ধতিগুলি

'associated with Manasa and with the magic practices in snake-bite cure' (*Manasa-Vijaya* : উক্ত ; Introduction, xxxvi পৃ.)। একে সুকুমার সেন 'drink cult' হিসেবে ব্যাখ্যা করতে চান—পানীয়গুলি বিশেষ উপায়ে প্রস্তুত করা হত। সাধকরা তা গ্রহণ করে সিদ্ধি অর্জন করতেন। সোম (অমৃত), সুরা আর বিষ। মনসামঙ্গলে সুরার কথা খুব বেশি মেলেনি। সোম আর বিষের কথাই বেশি। বরুণদেবকে সমুদ্রতলে সুরার অধিকার দেওয়া হয়েছে। সমুদ্র মন্থনের পর সুরা পাওয়া গেছে— ধন্বন্তরী বা নাগপূজাকে সুকুমার সেন 'last development of the cult of sura' বলে চিহ্নিত করেছেন ; মন্তব্য করেছেন 'Its association with Varuna still persists in some rites of Dharma worship in West Bengal.' (ঐ ; xxxxv, পৃ.)।

'বরুণ অর্থাৎ আবরণ বা আবৃত করা। আবরণকারী আকাশকে আর্যরা বরুণ নামে পূজা করতেন।'—এই আলোচনার নির্যাস মনে রাখলে মনসা বারবার আকাশপথে ভ্রমণ করছেন, প্রতিপক্ষের বিপক্ষে ঝড়বৃষ্টির প্রয়োগ ঘটাচ্ছেন ইত্যাদি বর্ণনার সম্পর্ক নির্ণয় করা যেতে পারে। কালিদহে মনসার নাগরা আকাশ আবৃত করে রেখেছে। দুর্লভ কাণ্ডার জানিয়েছেন :

এই কালিদহ মনসার অধিকার।
ঝড়বৃষ্টি নহে শুন নাগ অবতার।। (৯. ৬. ৬০)

ঋগ্বেদের দ্বিতীয় মণ্ডলের ৪র্থ সূক্তে বলা হচ্ছে— 'বরুণের মহিমায় নদীসকল প্রবাহিত হয়' ('ঋতং সিন্ধবো বরুণস্য যন্তি')। (রমেশচন্দ্র অনুবাদিত *ঋগ্বেদ সংহিতা* ; হরফ প্রকাশনী; কলকাতা, ১৯৭৬ ; ৩৭১ ও ৩৭০ পৃ.)। কালিদহে চাঁদ সদাগরের নৌবহর জলে ডুবিয়ে দেবার সময় সমস্ত নদীকে ডেকে এনেছেন মনসা।

পদ্মার আদেশ পাইয়া বায়ুমতিমান।
ভুবনের নদনদী সবে দিল টান।।

[দ্বিজ বংশী দাসের *পদ্মাপুরাণ*, উক্ত, ১৪২ পৃ. ; ভণিতা অবশ্য সুকবি নারায়ণদেবের]

এ-বিষয়ে বলা যায়, বরুণ দেবতার ভাব ও শক্তি নানাভাবে টুকরো ও ছিন্ন হয়ে মনসার দেবী-সত্তায় একদিনে সহসা আসেনি। সুরার প্রসঙ্গও তেমনি। সুকুমার সেন-এর উক্তি—বরুণের কালোচিত পরিবর্তিত রূপটি পশ্চিমবঙ্গের ধর্মপূজা প্রকরণে আছে, অনেকাংশে গ্রহণযোগ্য। রূপরামের ধর্মমঙ্গলের ভূমিকায় তিনি বিষয়টি বিস্তৃত করেছেন।—'ঘরভরা (অর্থাৎ পুত্রলাভ) গাজন ইঁহারই (অর্থাৎ বরুণদেবের—অ : বিশ্বাস) প্রীতিকল্পে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ। গাজনে যে ছাগ বলি দেওয়া হয় তাহা বরুণেরই উদ্দেশে। বলিও দেওয়া হইত বৈদিক প্রথামত। বলির পূর্বে পশুবন্ধন স্তম্ভের ও বরুণ পাশের পূজা হয়।

...'অনেক স্থানে গাজনে এখনও ধর্মঠাকুরকে মদ্যে স্নান করানো হইয়া থাকে।' [*রূপরামের ধর্মমঙ্গল* : সুকুমার সেন-এর ভূমিকা ; প্রথম খণ্ড ; সম্পাদনা—পঞ্চানন মণ্ডল; পৃ.]।

সোম ও বিষ— দুটি ভিন্ন ভাবাদর্শ। একে সুকুমার সেন মোটামুটি দুই ধারার সাধনা প্রণালী বলে চিহ্নিত করেছেন। অমৃত— রস রসায়ন সম্ভব। সোমলতা সম্পর্কে ধারণার বিবরণ দিয়েছেন হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় : 'পার্বত্য অঞ্চলে সে লতা পাওয়া যেত। তার পাতা পাথরে নিষ্পেষিত হয়ে যে রস বাহির হত তাকেই সোম বলা হয়। বিভিন্ন সূক্তে সোম কিভাবে উৎপাদিত হত তার বর্ণনা পাওয়া যায়।........তার রঙ ছিল হরিতবর্ণ। তারপর তা যজ্ঞে ব্যবহারের জন্য

কলসের মধ্যে স্থাপিত হত। তাকে দুধের সঙ্গে মেশান হত। অগ্নিতে যেমন ঘৃত আহুতি দেওয়া হত তেমন সোমেরও আহুতি দেওয়া হত। বর্ণনা আছে সোমপান করে ইন্দ্রের শক্তি বর্ধিত হত। তা দেবতাদের প্রিয় পানীয়।'

['ঋগ্বেদ পরিচয়' ; *ঋগ্বেদ সংহিতা* ; প্রথম খণ্ড ; উক্ত; ৫৭ পৃ.]।

সোম হয়ত পরে অমৃত ও সুরায় বিভক্ত হয়েছে। সোমের অমৃত ভারতীয় সাধকদের অমরত্বের আকাঙক্ষা, যৌবনবর্ধক শক্তির আকর্ষণ প্রভৃতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হতে পারে। শেষ পর্যন্ত এর বস্তু ও ভাব পৃথক হয়ে গেছে। দেবাসুরের সমুদ্রমন্থন ও অমৃত উদ্ধার নির্বস্তুক ভাবের কাহিনী-রূপ।

বাংলায় মনসামঙ্গল অমৃতকে প্রধান না করে বিষকে প্রধান করেছে। বিষ দিয়ে বিষ শোধন—মৃত্যুকে অবলম্বন করে মৃত্যুকে জয় করার আকাঙ্ক্ষা ও বিচিত্র রহস্যময় আচার অনুষ্ঠান সুপ্রাচীন। বিষ অমৃতের বিপরীত একটি জাগতিক সংঘটন। একে প্রয়োগ করা হবে দু'ভাবে। শত্রুনাশ করার জন্যে (মনসা হাসনহাটিতে বিঘতিয়াকে দিয়ে সম্পূর্ণ উৎসাদন করেছেন তুরুকদের—চাঁদকেও পুত্রহীন করেছেন কালি-নাগের দ্বারা)। অন্যপক্ষে এর দ্বারা শত্রু নয় আত্মশোধন করা হবে। ধন্বন্তরীর অহঙ্কারে এই চেষ্টা ও ব্যাপার দুর্লক্ষ নয়। বিপ্রদাসের ভাষা :

সঙ্কের প্রতাপ যত নাগ দেখে তৃণাবত
গণ্ডূষ করিয়া পিয়ে বিষ। (৬. ২. ৭৫)

ধন্বন্তরীর অন্য নাম শঙ্কর-ধন্বন্তরী। শিবও মৃত্যুঞ্জয়—মৃত্যুকে বরণ করে, বিষপান করে বিষকে অতিক্রম করে যাবার দুর্জয় ক্ষমতা তাঁর। এখানে বৈদিক সোম-প্রিয় দেবভাবনার বিপরীতে বেদ-বাহ্য শিবের সমান্তরাল উপস্থিতি।

অত্রির কাছে যোগশিক্ষা নিয়েছেন শিব। যোগরাজ তিনি। অসুর বাণ ও রাবণকে সমর্থন করেছেন—নানা সময় শিবের ভূমিকা যজ্ঞবিরোধী অন-আর্য বা প্রাগার্য সংস্কৃতির বুনট (texture)-টি আমাদের সামনে নিয়ে আসে। পুরাণে আছে দেবাসুর অতিলোভে মন্থন করায় অমৃতের পর বিষ উগরে দেয়— ভীত-সন্ত্রস্ত ধরিত্রীকে রক্ষা করেন মহাদেব—বিষপ্রভাবে নীলকণ্ঠ হন। বিপ্রদাস পুরাণের এই কাহিনী দু'ভাগে ভাগ করে নিয়েছেন—তাঁর সংযোজন (বস্তুত ব্যক্তিগত সংযোজন বলে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে কিছু নেই—মনসামঙ্গল কাব্যধারায় এই সংযোজক নানাভাবে দেখা গেছে) বিষের উৎসে বাসুকী নাগের পরিশ্রমকে চিহ্নিত করায় :

বাসুকির শ্বাস বহে যেন মহাঝড়।
মুখে ভাঙ্গে ফেনা নাল অঙ্গে গেল ছড়॥
শ্রমযুক্ত হনুমান আর দৈত্যগণ।
দেবগণ নিরবধি করেন বারণ॥
মহাকোপে হরচক্ষে আনল উঠিল।
সেই অগ্নি ক্ষীরোদে পড়িয়া বিষ হৈল॥ (৩.২.১৬-১৮)

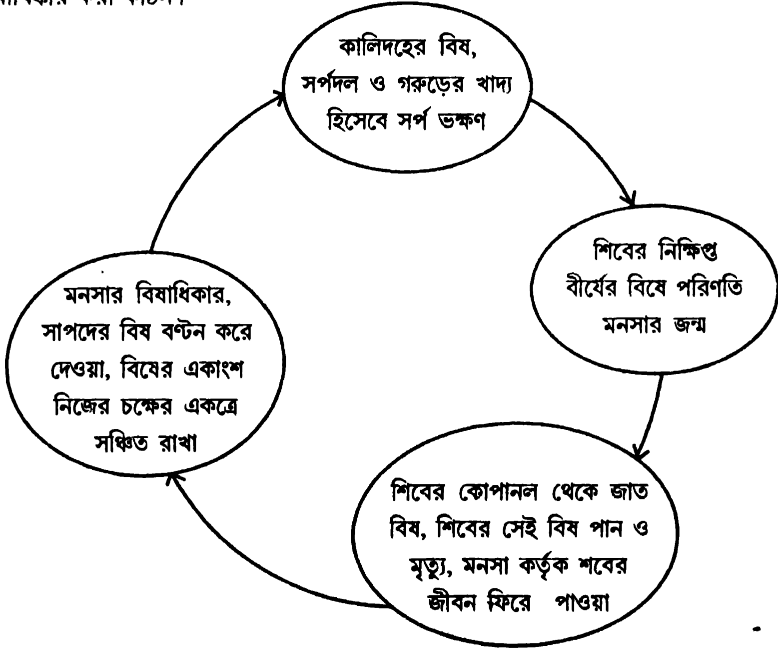
মনে হয় বাসুকির মুখের ফেনা থেকে সমুদ্রের বিষ জন্মেছে—এরকম ভাবনা কবিদের ছিল। সেই অস্পষ্ট ভাবনা মনসামঙ্গলে খুব বেশি নেই, তবে বিষের জন্মকথা বলার অবসরে—মন্ত্রসাধকের ধৃত-মন্ত্রে বারবার এই প্রসঙ্গ ফিরে এসেছে। মনসামঙ্গলে মন্ত্রজাত অংশেও আছে। এই সূত্রের ব্যাখ্যা করবো পরে।

দ্বিতীয়ত, বিষ আসলে হরের কোপানল থেকে জাত। হরই তা গ্রহণ করুন, এরকম পরামর্শ সকলের :

আপন কুবুদ্ধি হেতু সৃজিলা গরল।
লজ্জিয়া ব্রহ্মার বাক্য মাজল্যা সকল॥

সুতরাং : আপনি সংহারো বিষ দেব কৃত্তিবাস।
তুমি না ভক্ষিলে বিষ সৃষ্টি হয় নাশ॥ (৩. ২. ২৮, ৩০)

যাই হোক, বিষের জন্মকথা নিয়ে মনসামঙ্গলের ভাবনা কিছুটা বৃত্তাকার। এই বৃত্তের সূচনাটি আবিষ্কার করা কঠিন।



সূচনা বিন্দু স্থির করা যাচ্ছে না বলেই এ কাহিনীকে আধুনিক অর্থে বৃত্তান্ত বা প্লট (plot) গঠনের প্রক্রিয়ায় ধরা যায় না। এ হল মধ্যযুগীয় আখ্যান বা টেল (tale) জাতীয় রচনা। বিভিন্ন উৎসের বিভিন্ন কাহিনীর মিশ্রণ, আপতন ও সংঘটন এখানে। মনসামঙ্গল কাহিনীতে বিষ বিদ্যকদের ভূমিকাও কিছু আছে, নিজস্ব সৃষ্টিতত্ত্বে বিষের উৎস কথাই প্রধান। কারণ তারা বিষকে সম্বোধন করে বিষক্রিয়া দূর করার চেষ্টা করে থাকে। বিপ্রদাসের মনসামঙ্গলে বিষগ্রস্ত মহাদেবকে বিষক্রিয়া মুক্ত করার প্রয়াস হিসেবে মনসার মন্ত্রশক্তি প্রয়োগ করতে দেখি। সেখানেও বিষকে সম্বোধন করা হচ্ছে, আসলে বিষগ্রস্ত মানুষের দেহকে শুদ্ধ করার বাসনা থেকেই যেন গড়ে উঠেছে এই মন্ত্রোচ্চারণ

অহর্নিশ খসে রস কিছু নাহি টুটে।
কোমল নবনী হেন বজ্র নাহি ফুটে॥

ত্রিপুর দাহনে হর অগ্নি উঠে মুখে।
দানব পুড়িয়া অগ্নি পৃথিবীতে থাকে॥
পৃথুরাজ পৃথিবী দুহিলা যেই কালে।
দুহিয়া নাগেরে বিষ দিলেন পাতালে॥
সেই বিষ বাসুকি দিলেন মোর ঠাঞি।
শুন শুন বিষ তোর জন্মকথা কই॥
হর ছাড়ি উঠ যদি নহিবা বিনাশ।
মর্ম শুনি ত্রাসে বিষ বলে বিপ্রদাস॥ (৩. ৯. ১০৪, ১০৭-১১০)

বিষের মর্মকথা শুনতে বিষ ত্রস্ত, অর্থাৎ নেতিবাচক যা কিছু শক্তি তার সমস্ত দিক জানা গেলেই তাকে বিনাশ করার সুযোগ, কৌশল অর্জন করা যাবে, এরকম এক ধারণা বিপ্রদাসের রচনায় স্পষ্ট। এই ধারণার উৎসে আদিম জনগোষ্ঠীগুলির অনতিবিকশিত প্রকৃতি-পর্যবেক্ষণ, নিয়ন্ত্রণের প্রয়াস লুকিয়ে আছে।

উক্ত মন্ত্রটিতে কাহিনীর তিনটি স্তর লক্ষ করা যায়। ত্রিপুরকে দহন করার জন্যে হরের কোপানল অসুর-হত্যার পর অগ্নিরূপে (বাড়বাগ্নি রূপে) পৃথিবীতে থাকা। পৃথুরাজের পৃথিবী দোহন করা ও নাগদের বিষদান, বিষের পাতালে স্থিতিলাভ। তৃতীয় স্তরে মনসার দেবীত্ব—বাসুকির কাছে বিষের অধিকার লাভ। তিনটি স্তরের শেষ স্তরটি বিপ্রদাসের কাহিনীতে আছে। বাসুকির মুখ থেকে লাল বের হওয়া ছাড়া বিষ-সংশ্রব সেখানে নেই। মনসা বিষলাভ করছে মন্থন থেকে। পৃথুরাজার দোহন নয়—শিবের নেতৃত্বে সমুদ্রমন্থন। শিবের কোপ—ত্রিপুরাসুরকে হত্যার কারণে জাত ক্রোধ নয়—এখানে হরের কোপ দেবাসুর আর মন্থন করতে চাইছেন না। মন্থনের কাহিনী নিশ্চয় পৃথুরাজার দোহনের কাহিনীর পরবর্তী। অমৃতলাভের পর দ্বিতীয় মন্থনের কাহিনীও খুব সম্ভব পুরাণের সমুদ্রমন্থনের কাহিনীর দ্বিতীয় পর্যায়ের সংযোজন। লক্ষ করার বিষয়, মনসামঙ্গল কাব্যের প্রচলিত কাহিনীসূত্রে উক্ত তিনটি স্তর (বিষের জন্ম সম্বন্ধী) প্রায় অনুপস্থিত বা প্রসঙ্গচ্যুত উল্লেখ মাত্র। আর তাই, বলতে হয়—মন্ত্রজাত প্রসঙ্গ মনসামঙ্গ ল কাহিনীর সবচেয়ে প্রাচীন অংশ। এখানে কাহিনী আচরণের অঙ্গ—বিষের মর্মকথা বিষনাশের লক্ষ্যে পরিচালিত। অর্থাৎ পুরাণ প্রসঙ্গগুলি প্রসঙ্গচ্যুত হয়ে স্মৃতি চিহ্নিত হয়ে এসেছে এখানে। স্মৃতিগুলি জন্ম দিয়েছে নতুন নতুন ক্রিয়া আর কৃত্যের। আর এভাবে পুরাণ কথার সঙ্গে লোককথার— বস্তুত লৌকিক স্মৃতির বিমিশ্রণ হবার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। বিপ্রদাসের হয়তো সমস্ত মনসামঙ্গল কাব্যধারায় রচয়িতা ও গায়েনদের চেতনায় এই বিমিশ্রণ— পুরাণের নব মূল্যায়ন ঘটিয়েছে।

॥ ১১ ॥

মনসামঙ্গলের কাহিনীতে মন্ত্রজাতের গুরুত্ব

মনসামঙ্গল কাহিনী গড়ে ওঠার আদি স্তরে মন্ত্রজাতগুলি গড়ে ওঠে। মন্ত্রের উচ্চারণ গুহ্য অস্পষ্ট হলেও তার প্রয়োগ অব্যর্থ, কারণ তার ভাষা নয় ব্যবহার—ভাষা এখানে archaic ও stylized প্রাচীনত্বের আভাস মাখা এই ভাষার সঙ্গে পাঠক পরিচিত হবেন আরও অন্য প্রসঙ্গ গুলিতে— যেখানে মন্ত্র উচ্চারিত হচ্ছে, বিষগ্রস্ত মানুষকে বাঁচিয়ে তুলতে। দেখাই :

১. শিবকে বাঁচানোর জন্য। এ মন্ত্র উদ্ধার করেছি। (৩. ৯.)

২. সঙ্ক ধন্বন্তরীর মৃত্যুর পর তার স্ত্রী কমলা বলেছেন—

খড়্গা ভেদিয়া বিষ গগন-শিখর।
ইঙ্গলা পিঙ্গলা চিত্ত সমুদ্র ভিতর॥
কেনি প্রাণনাথ হেরো আপনা পাসর।
মন পবনেতে জীব পরিচয় কর॥
... ...
অহর্নিশ খসে রস কিছুই না টুটে।
কোমল নবনি হেন বজ্র নাহি ফুটে॥
দশমী দুয়ার প্রভু খসাও কপাট।
আসুক পবন হংস ভ্রমুক সুবাট॥ (৬. ১৬. ২৮১-৮২, ২৮৪-৮৫)

৩. কাজল্যা মালিনীর কাছে শর্ত করিয়ে মনসা তার দুই মৃত পুত্র—ধনা আর মনাকে বাঁচাবার চেষ্টা করছেন— আবার মন্ত্রজাত পড়ছেন তিনি :

ত্রিপুর দহনে হর অগ্নি উঠে চক্ষে।
দানব পুড়িয়া অগ্নি পৃথিবীতে থাকে॥
... ...
হর হর বিষ ধনা-মনা অঙ্গে হর।
বিষহরির আজ্ঞায় ঘায় মুখে মর॥
সমুদ্রে জন্মিল বিষ কপিলার ক্ষীরে।
দেবগণ মেলি তাহা দিল বাসুকিরে॥ (৭. ১১. ১৫৯, ১৬২-৬৩)

এই মন্ত্রে আরও কিছু পুরাণ প্রসঙ্গ। যেমন— ক. বায়ু রক্তের পরশ পেলে প্রাণের জন্ম হয়। সুতরাং ধর্মের আজ্ঞায় বিষ ধ্বংস হোক।

খ. সমুদ্র মন্থনে বিষ জগদীশ পান করেছেন গণ্ডূষ করে। সুতরাং মনসার দাবি :

বাপে ঝিয়ে কহি তোর আদ্যের কাহিনী।
হরের আজ্ঞায় বিষ ঝাট হও পানি॥ (৭.১১.১৬৬)

গ. কদ্রু-বিনতার কাহিনী, গরুড় প্রসঙ্গ।

ঘ. সাগরের মধ্যে কুরল নামক মহাপক্ষী থাকে— 'সেই পাখির নাম শোনার সঙ্গে সঙ্গে 'বিষ হয়ে কম্পমান'। এই সংবাদ আদ্যনাথের। সুতরাং

কুরলের নামে বিষ ঘা মুখে নাই। (৭.১১.১৬৯)

ঙ. কঙ্ক নামক পক্ষি আছে— সমুদ্রে আকাশমার্গে ভ্রমণ করে। তার স্পর্শ পেলেও 'বিষ কাঁপে থরথর'। শুধু কি তাই—

তাহার পরশে ভস্ম হয়ত গরল।
কঙ্কের আজ্ঞায় বিষ যাও রসাতল॥ (৭.১০.১৭০)

এইভাবে কতকগুলি নতুন প্রসঙ্গ যোজনা করলেন বিপ্রদাস। তাঁর পুরাণ-চেতনার কিছু পরিচয় এখানে পাওয়া যাচ্ছে।

॥ ১২ ॥

বিপ্রদাস কথিত বিষ-বিদ্যকদের অবস্থা ও তাৎপর্য

বিষবিদ্যার সঙ্গে যারা যুক্ত ছিলেন—মনসামঙ্গল হয়তো তাদের ভাবসত্য কিছু ধরে রেখেছে। বিষবিদ্যকদের মধ্যে পুরুষ ও নারী প্রধান সামাজিক সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গির কিছু স্ববিরোধ এই কাব্যধারায় স্পষ্ট। মর্গান প্রভৃতি নৃতাত্ত্বিক দেখিয়েছেন নারী-প্রধান (matrilineal) সমাজের ব্যবস্থা পৃথিবীতে আদি—পরে এসেছে পুরুষ-প্রধান (partiarchal) সমাজ। এই বিবর্তনের ধারাটিকে সহজ সিঁড়িভাঙ্গা অঙ্কের মতো করে ভাবা চলে না। পাশ্চাত্য গবেষকরা এ নিয়ে কিছু কথা লিখেছেন। ব্যতিক্রম কিছু থাকলেও মাতৃপ্রাধান্য যে সমাজগুলিতে, সেখানে আদিম লক্ষণ কিছুটা বেশি। একজন বিশিষ্ট নৃতাত্ত্বিক লিখেছেন : 'Numerous matrilineal societies are found in South Asia, which may be a cradle of primitive agriculture in the old world.' (*Anthoropology* : William A Haviland, University Vermount, 1974 ; 381 পৃ.)। আদিম পৃথিবীর কৃষি সভ্যতার ক্ষেত্র হিসেবে দক্ষিণ এশিয়াকে চিহ্নিত করে অত্যন্ত সঠিক সত্য প্রতিষ্ঠা করেছেন গবেষক উইলিয়াম হেভিল্যান্ড। মনসামঙ্গল কাহিনীতে বিষবিদ্যকদের মধ্যে পিতৃ-প্রধান সমাজ-দৃষ্টির পরাজয় (অন্তত সাময়িকভাবে পশ্চাপসারণ) ঘটেছে, এর পেছনে কারণ খুব সম্ভবত—কৃষিনির্ভর সমাজ মনসাদেবীকে কেন্দ্র করে সংহত হচ্ছিল ; আর অন্যদিকে বিষবিদ্যকরা সমাজের ততখানি অভ্যন্তরের ক্ষেত্র দখল করতে পারে নি। বস্তুত, সর্প-বিদ্যকদের পেশাগত বৈশিষ্ট্য, জীবনযাপন প্রণালী, যাযাবর-স্বভাবের বাধ্যতাও তাদের স্থায়ী জীবন পরিধির কেন্দ্রের দিকে আক্ষিপ্ত করে নি— পরিধির দিকে ঠেলে দিয়েছে। কৃষক সমাজের ক্ষেত্রে তেমন ঘটেনি। তারা স্থায়ী জীবন পরিধির মূল ভিত্তি। মনসা-কাল্ট যখন থেকে কৃষক সমাজের উৎপাদন ব্যবস্থার নিকটতর হয়ে— উর্বরতার আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সংযুক্ত ভাব ও আচার অনুষ্ঠানকেপ্রভাবিত করতে থাকল তখন সর্পবিদ্যকদের পুরুষবাদী অংশের প্রভাব খর্ব হতে থাকল— এরকম একটি উপাত্ত (hypothesis) আমাদের। এটি গ্রহণ করলে বাংলার সর্পবিদ্যকদের ধন্বন্তরী-প্রভাবিত অংশ আর মনসা-প্রভাবিত অংশের বিরোধ ও সমন্বয়ের প্রয়াস ও তার ভিত্তিতে কাব্যধারা বিকাশের প্রবণতাটির ব্যাখ্যা প্রদান সম্ভব।

শঙ্কর ধন্বন্তরি যেভাবে সঙ্ক (বা মহাসঙ্ক)-কে পরাজিত করে তার নাম গ্রহণ করেছেন, তাতে মনে হয় সঙ্ক-ধন্বন্তরি দুটি ভিন্ন গোষ্ঠী বা বর্গের সমন্বয় ঘটিয়েছেন। বিপ্রদাসের বর্ণনা :

পরাজয় পাইল সঙ্ক জিনে ধন্বন্তরি।
কন্যা বিভা দিয়া সঙ্ক গেলা নাগপুরি॥
সঙ্ক জিনি সঙ্ক নাম ধরে ধন্বন্তরি।
পরাভব করি সঙ্ক আছে সেই পুরী॥ (৬.১.৪৪-৪৫)

এই পদ্ধতির পাশাপাশি নারীদের পরস্পরে সহেলা-পাতানোর প্রক্রিয়ার বেশ কয়েকটি ঘটনা লক্ষ করি। সমধর্মী পুরুষের মধ্যে মিতা সম্বোধন আর নারীর মধ্যে সহেলা সম্বোধন মনসা-মঙ্গল সংস্কৃতির স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হিসেবে গণ্য হতে পারে। অনুপাম-পাটনে চাঁদকে সিংহলরাজ 'মিতা' বলে সম্বোধন করেছেন। 'মিতা মিতা বলি তারে সম্ভাষিল নৃপবরে' (৯.৭.১০৪)। বহুবিধ লাঞ্ছনার পর চাঁদ সদাগর চন্দ্রকেতু রাজার এলাকায় গিয়ে সে রাজাকে সংবাদ দিতেই—

শুনিয়া ঈষত হাসি বলে দণ্ডধরে।
হেন রূপে মিতা কেন আসিবে এথারে॥

এক বোল আছে মিতার আপদ লক্ষণ।
মনসা কুমারী নিন্দা করে সর্বক্ষণ॥ (১০.১৮.৩৩০-৩১)

পুরুষদের এই সমনামিতাকে মিত্রত্বের সূত্রে দেখানো হলেও, আদিম সমাজে এরকম ক্ষেত্রে মিত্রতা অপেক্ষা শত্রুতার ছবিই বেশি লক্ষিত হয়। ঠিক যেমনটি লক্ষ করি শঙ্কর ধন্বন্তরী আর মহাসঙ্কের সম্পর্কে। মহাভারতে পৌণ্ড্রবাসুদেব অহঙ্কার করে বলেছিলেন: "আমি ভিন্ন আর কে আছে যে আমার নাম গ্রহণ করতে সক্ষম?" (সুধীর চন্দ্র সরকার; উক্ত ; ৩০৭ পৃ. : দ্বিতীয় স্তম্ভ)। 'হরিবংশে'-ও এই কাহিনী বিস্তারিত আকারে উপস্থিত। শেষ পর্যন্ত যাদব বাসুদেব কৃষ্ণ পৌণ্ড্র বাসুদেবকে হত্যা করেছেন। মহাভারতে এরকম ঘটনা আর একটি আছে—জরৎকারু। ঋষি জরৎকারুর পণ ছিল তিনি তাঁকেই বিয়ে করবেন, যিনি তাঁর সমনামীয় হবেন। এর তাৎপর্য ব্যাখ্যান পরে করব। এখানে আমাদের কিছুক্ষণ আগেকার প্রস্তাবটি পরীক্ষিত হতে পারে। সে অবসর সামান্য পরে নিচ্ছি।

রামায়ণে সমনামীয় দু'জন—রাম ও পরশুরাম। সীতা সহ অযোধ্যায় প্রত্যাগমনকালে রামকে পরশুরাম বলেন : 'তুমি হরধনু ভঙ্গ করেছ বটে, কিন্তু আমার নিকট বৈষ্ণবধনু আছে। এই বৈষ্ণব ধনু ভঙ্গ করতে সমর্থ হলে তোমার সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হব।' রাম পরশুরামের অহঙ্কার চূর্ণ করেন। এ ঘটনাও সমনামীয়দের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের ইঙ্গিত বহন করছে। সঙ্ক-ধন্বন্তরীর দ্বন্দ্বের পর সঙ্কের নাম তার কন্যা লাভ করে ধন্বন্তরি আসলে সঙ্কের প্রভাব চিরদিনের মতো নস্যাৎ করেছেন। এখানে আদিম সমাজ ব্যবস্থার আন্তরিক পরিচয় পাওয়া যায় বলে মনে হয়।

সঙ্কের কন্যা কমলাকে শর্তানুযায়ী ধন্বন্তরির বিয়ে দিতে হয়েছে। কমলা কি সঙ্কের একমাত্র উত্তরাধিকারিণী? হিমা নদীর তীরে সঙ্ক ধন্বন্তরিকে নিজস্ব রাজপাটের অধিকার দিয়ে সঙ্ক চলে গেছেন পাতালে। আর :

হিমানদী তীরে সঙ্ক শিষ্যগণ লৈয়া।
নানা রস কুতূহলে আছে হৃষ্ট হৈয়া॥ (৬.১.৪৯)

চম্পকনগরে চাঁদের সুরম্য বাগান পুনরুজ্জীবিত করার পর সঙ্ক ধন্বন্তরির প্রতিষ্ঠা যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে। মনসা সখেদে বলেছেন :

বিষমে ঝাপান ঢাকি শিষ্য একশত।
নর হৈয়া মন্দ বলে প্রাণে সহে কত॥ (৬.৩.৮১)

গোয়ালিনী রূপে মনসা কমলার কাছে গিয়েছেন পসরা নিয়ে। তার দধির দাম খুব চড়া। শুনে কমলা বলেছেন তোমার পসার লুট হয়ে যাবে—মনসা তখন কমলাকে জানাচ্ছেন :

যদবধি ধন্বন্তরি আছয়ে নগরে।
কে মোর পসার এথা লুড়িবারে পারে॥ (৬.১০.১৭৮)

বোঝা যায় ধন্বন্তরির ক্ষমতা যথেষ্ট। তার শিষ্যাধিকার ও ব্যক্তিত্ব খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

যথেষ্ট পরিমাণে সঙ্কের ধ্যান-ধারণা পুরুষ-প্রধান। কমলার মারফৎ মনসা কৌশলে জেনে নিয়েছেন সঙ্কের মৃত্যুর কার্যকারণ। কমলা এই কার্যকারণ বা মর্মকথা জানতে চেয়েছেন রাত্রিতে, কামমোহিত স্বামীর কাছে। মনে করানো দরকার, তার মনে এই কামনা উদ্রিক্ত করেছেন মনসা। মর্মকথা জানানোর সময় সঙ্ক বারবার বলছেন স্ত্রীকে একথা না বললেই ভালো হত।

ধন্বন্তরি বলে তব কুবুদ্ধি সঞ্চার।
এতসব মর্ম কথা কি দায় তোমার॥

রাজস্থানে পুরাণে শুনিল কথা তথা।
কদাচিত না কহিব স্ত্রীরে মর্মকথা।। (৬.১২.২৩৯-৪০)

পরে তার খেদ—কুবুদ্ধিতে পড়ে স্ত্রীর কাছে মর্ম-কথা না বললেই হত।

॥ ১৩ ॥

মনসা ও নেতা-কাল্টের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব

আশুতোষ ভট্টাচার্য মনে করেন, ধন্বন্তরীর মধ্যে দিয়ে নেতা ধোপানীর নিজস্ব একটি কাল্ট (cult) চালু হয়েছিল। মনসার পাশাপাশি এই দেবীভাবনা স্বতন্ত্র ছিল—সমান্তরাল। আশুবাবুর ইঙ্গিত, এই সমান্তরাল দেবীভাবনা সম্ভবত মনসার চেয়েও প্রাচীন ও প্রভাবশালী ছিল। ধন্বন্তরির মৃত্যু— নেতার কাল্টটির স্থায়ী পরাজয় আর নেতার সখিত্ব এই পরাজয়ের অব্যবহিত পরে মনসার অধিকার বৃদ্ধির ইঙ্গিত। অবশ্য আশুতোষবাবু এই বক্তব্য খুব যে প্রমাণ করতে পেরেছেন তা নয়। তবে এক্ষেত্রে তাঁর বক্তব্য যথেষ্ট মৌলিক। আশুতোষ ভট্টাচার্যের যুক্তি-ধারা সামান্য উদ্ধার করছি : ১. 'মনে হয়, মনসা-মঙ্গলের ....কাহিনীর মধ্যে দুইটি স্বতন্ত্র লৌকিক কাহিনীর ধারা আসিয়া একসঙ্গে মিলিয়াছে। একটি কাহিনী শঙ্কর গারুড়ী-নেতার কাহিনী ও অপরটি চাঁদ সদাগর-বেহুলার কাহিনী। প্রথম কাহিনীটি প্রাচীনতর এবং ইহার সঙ্গেই আসিয়া পরবর্তীকালে চাঁদ সদাগর-বেহুলার কাহিনীটি যুক্ত হইয়াছে।' (*বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস* ; উক্ত ; ২৮৬ পৃ.)

২. 'শঙ্কর গারুড়ীর কাহিনীর মধ্যে যে লৌকিক দেব-চরিত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়, তাহার নাম নেতা। শঙ্কর গারুড়ী নেতার শিষ্য এবং তাহারই বরে (মনসার বরে নহে) তাহার দেহ অজর ও অমর।' (ঐ)

৩. 'নেতাকে মনসামঙ্গল কাব্যের সর্বত্র রজক-কুমারী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। তাহার আভিজাত্য বৃদ্ধি করিবার জন্য শেষ পর্যন্ত বলা হইয়াছে, সে স্বর্গের দেবতাদিগের ধোপানী, সর্বত্রই তাহার রজক-সম্পর্ক বর্তমান দেখিতে পাওয়া যায়। মনসামঙ্গল কাহিনীর প্রচারের যুগে এই রজক-কুমারী মনসামঙ্গল কাহিনীর একাংশে স্থানলাভ করিয়া মনসার সহচরী রূপে পরিচিতা হইয়াছে। মনে হয়, কোন রজকের বিষনাশকারী কতকগুলি প্রক্রিয়ায় জ্ঞানলাভ করিয়া কালক্রমে সাধারণ জনগণের মধ্যে দেবীত্বে উন্নীত হইয়া গিয়াছিল। স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, সমাজে তাহার প্রতিষ্ঠা মনসা হইতে প্রাচীনতর ; কারণ তাহা না হইলে মনসা চরিত্রের সর্বব্যাপক প্রতিষ্ঠার ওপর এই কাহিনীতে তাহার কোনভাবেই স্থান পাওয়া সম্ভব ছিল না। চাঁদ সদাগর-বেহুলার কাহিনী প্রবর্তিত হওয়ার পর নেতা মনসার সহচারীর পদ প্রাপ্ত হইয়া মনসা-মঙ্গল কাব্যের সামান্য একট অংশমাত্র অবলম্বন করিয়া টিকিয়া গিয়াছে।' (ঐ ; ২৮৬-৮৭ পৃ.)।

—মত তিনটি মৌলিক এবং একটি সিদ্ধান্তের অভিমুখী। তবে এই মতগুলির মধ্যে সঙ্গতি বিধান করা—একটি ক্ষেত্রে, আমাদের পক্ষে কঠিন। কোন রজক বিষবিদ্যক সম্পর্কে ভাবনায় নিছকই আশুতোষ বাবুর ব্যক্তিগত পরিকল্পনার ছাপ দেখতে পাচ্ছি। একে সাহিত্যিক গবেষণা বলা যাবে না। নেতাকে রজক কুমারী বলার বিষয়গত তাৎপর্য আশুবাবু অনুধাবন করতে পারেননি।

মনসামঙ্গল কাহিনীর নেতা-চরিত্রটি বিষবিদ্যককুলের অন্যতম—নাথ যোগীদের আচরণের ফলাফল হতে পারে। সুকুমার সেন উল্লেখ করেছেন ড. পীতাম্বর দাস বরথওয়াল-এর সম্পাদনায় প্রকাশিত 'গোরখবাণী'তে আছে :

চন্দা গোটা খুঁটি করিলই সুরিজ করিলই পাটি।
অহনিশি ধোবী ধোবই ত্রিবেণী কা ঘাটি॥

(Manasa Vijaya ; introduction ; উক্ত ; vii ; পৃ.)। চন্দ্রকে খুটি করা সূর্যকে পাট করা আর ত্রিবেণী ঘাটে ধোপার কাপড় কাচার ছবিটি—কাউকে অনভিজাত করে অঙ্কনের উদ্দেশ্যে ভাবা হয়নি। এ হচ্ছে নাথদের দেহ সাধনার প্রতীক চরিত্র। 'নেতি ধৌতি' প্রক্রিয়া মোটেই বহিরঙ্গ কোন বিষয় নয়—এই পরিশুদ্ধ করার প্রক্রিয়া দেহকে ঘিরে। চন্দ্র আর সূর্য-ও প্রাকৃতিক বিষয় নয়—শারীরিক ; ত্রিবেণী নাভির নিচে তিনটি প্রধান নাড়ি (ঈড়া-পিঙ্গলা ও সুষুম্না)-র সংযোগ ছিল। ডঃ সুকুমার সেনের ব্যাখ্যান সামান্য উদ্ধার করা যাক : 'it appears that the story of Manasa and of Neto washing clothes at Triveni was familiar to them and they used it as allegorical representation of some yogic processes.' (উক্ত)। সুতরাং নেতা ধোপানীর মধ্যে অন্য এক সাধন প্রণালীর ইঙ্গিতটুকু আশুবাবুর নজরে আসেনি।

মালদহ জেলার কৃষক সমাজে একটি ছড়া চালু আছে :

'আমি ধোপানী
আমার নাম চিন্তামণি'

(আমার উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার এম. এ. পরীক্ষার ছাত্র—শ্রী ছক্কু মণ্ডলের কাছে ছড়াটি শুনেছি)। ধোপানীর সঙ্গে চিন্তামণি—মিলটি মোটেই আপতিক নয়। চিন্তামণি মনসার মূর্তি ও মন্দির আছে জয়দেব-কেন্দুলি, বীরভূমে— অজয় নদের তীরে।

লিখেছি, মনসা সম্ভবত নেতার শিষ্য শঙ্কর-ধন্বন্তরিকে হতমান করেই আত্মপ্রতিষ্ঠা করেছেন। নেতা কিভাবে ধন্বন্তরিকে বিষবিদ্যা (সর্পবিদ্যকদের মতে মহাজ্ঞান— শ্রেষ্ঠতম জ্ঞান, কারণ জীবন মৃত্যুর কার্যকারণ ও নিয়ন্ত্রণের পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান এটি— বলা যেতে পারে সর্বশ্রেষ্ঠ বস্তু ও তত্ত্বজ্ঞান— wisdom) শিখিয়েছেন তার চমৎকার বিবরণ দিয়েছেন বিজয় গুপ্ত। নেতা ঝি-র শিষ্য ধন্বন্তরি শিশুকালে সমুদ্রের ওপারে চার যুগের সার মহাজ্ঞান লাভ করার জন্যে গেছেন। তত্ত্বকথা শেষ করে নেতা 'বিনা অগ্নি পানিতে' হাঁড়ি চাপিয়ে রান্না করেছেন। 'আপনে আপনে চাউল লইল উথাল'। সেই তপ্ত ভাতে মন্ত্রশক্তি প্রয়োগের পর একটি সূক্ষ্মাকার সাপ মিশিয়ে দিয়েছেন তিনি :

কোমল শরীর সাপ অতি অল্প জিউ।
ভাতে মিশি গেল সর্প যেন হইল ঘিউ॥

ভাত নামিয়ে নেতা তাকে পরিবেশন করেছেন— বলেছেন :

সকল ভাত খাইও যেন না রহে এক গোটা।

নেতার আদেশ পালন করে ধন্বন্তরি দেখেন— পাতের নিচে একটা ভাত পড়ে রয়েছে! নেতা ধন্বন্তরীর উপর ক্ষুব্ধ হলেন :

পাতের তলে ভাত থুইয়া ভাণ্ডিলি মো।
[প্যারীমোহন দাশগুপ্ত সঙ্কলিত মনসামঙ্গল : বিজয় গুপ্ত, উক্ত, ৮৪ পৃ.]।

এরপর ঐ এক কণা অন্ন ধন্বন্তরির শিরে স্থাপিত হল। অন্য একটি পাঠে পাওয়া যাচ্ছে সেই ইতিবৃত্ত।

ঢাকনি পাতিলে দিয়া সিজাইলুম।
সেই অন্ন খাইয়া অমর হইলুম॥
ভোজন করিয়া শেষে এক অন্ন পাইল।
সেই অন্ন মুই ব্রহ্মাতালুরে থুইল॥

[বিজয় গুপ্তের *পদ্মাপুরাণ* জয়ন্তকুমার দাসগুপ্ত সম্পাদিত ;
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ; ১৯৬২; ১৭৫ পৃ.]

এখন, এই এক কণা ভাতই শঙ্কর গারুড়ীর মৃত্যুবীজ হল—রন্ধ্রপথ। ভাদ্রমাস অমাবস্যা মঙ্গলবারে স্ত্রীর সঙ্গে এক বিছানায় থাকার সময় ব্রহ্মাতালুতে যদি শিবের তক্ষক দংশন করে—নেতার বক্তব্য :

নিশ্চয় সেই দিন তোমার মরণ।
যত তন্ত্র মন্ত্র তোমার না হবে স্মরণ। (প্যারীমোহন সংস্করণ ; উক্ত ; ৮৫ পৃ.)

মনসামঙ্গলের এই কাহিনী অনেকটাই পুরাণ-প্রভাবিত। পুরাণের সহায়তা বা ছায়া অবলম্বনে লৌকিক কাহিনীর নতুন নতুন রূপায়ণ ঘটেছে মধ্যযুগে। এই অভিনব পুরাণধর্মী কাহিনীকে 'কিস্যা' বলতে চান আমার মেধাবী ছাত্র শ্রীমান বিশ্বজিৎ রায়। তিনি তাঁর সদ্য প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে ('ধর্মমঙ্গলের বিকল্প কিস্যা : শরণাগতের রক্ষা অথবা চাকরি বৃত্তান্ত' ; শারদীয় 'বারোমাস'; ১৪০৮) দেখিয়েছেন ময়ূরভট্টের নামে চালু 'ধর্মমঙ্গলে'র একটি গল্পে মহাভারতের শিবিরাজার কাহিনী কেমন করে মিশে গেছে। এখানেও কর্ণের কাহিনীর স্পষ্ট ছায়া। মধ্যযুগের কাব্যকথা একক কবির রচনা নয়, সেসবের মধ্যে নানা-লোক পরম্পরার অবাধ গতায়াত। তবে মূলকে বাদ দিয়ে শাখা প্রশাখায় ঘুরে ফেরাতে আনন্দ থাকতে পারে— সত্য সন্ধান করার জন্যে মূলকে বুঝে নিতেই হয়। তেমনি ভাবসত্য সন্ধান করতে গিয়ে আমরা লক্ষ করছি মনসামঙ্গলের কাহিনীর নেতা-সঙ্ক ধন্বন্তরীর সম্পর্ক ও তার বিষাদঘন পরিণতিতে বাঙলার আদিম সমাজের সাংগঠনিক সংবাদও কিছু বিদ্যমান।

সঙ্ক-ধন্বন্তরীর মৃত্যু ঘটবে কিভাবে সেই সংবাদ মনসা সহজে জানতে পারেননি। কাহিনীর অন্যত্র নেতা মনসার কাছের মানুষ পরামর্শদাত্রী, বিদগ্ধ, কিন্তু এখানে তার ব্যতিক্রম ঘটেছে। নেতা মনসাকে কিছুতেই শঙ্করকে মারার পথ বাতলাননি। কারণ :

নেতা বলে করিব মনে ভয় করি।
ওঝারে বাধিতে আমি যুক্তি দিতে নারি॥
শঙ্কর হেন শিষ্য মোর নাহি ত্রিভুবনে।
গুরু হইয়া শিষ্যের মৃত্যু কহিব কেমনে॥
... ...
আমার প্রতাপে ওঝা অমর অজয়।
প্রাণের অধিক আমার ওঝা শঙ্কু রায়॥
কোপ কর তাপ কর যেব কর কর্ম।
তবু না কহিব ওঝার যে মর্ম॥

[প্যারীমোহন সংস্করণ, উক্ত ; ৭৬-৭৭ পৃ.]

এইখানে খুব স্পষ্ট— নেতা ও মনসাকে কেন্দ্র করে সর্পবিদ্যক বা 'মহাজ্ঞান'-সন্ধানী নাথ যোগীদের সাধনপদ্ধতির স্বতন্ত্র ধারা ছিল। দুই পরম্পরার সম্পর্ক খুব সম্ভব অমিত্র-সুলভই ছিল। কালক্রম মনসার পরম্পরা প্রবল হয়েছে।

॥ ১৪ ॥

সহেলা-পাতানো : মনসামঙ্গলে নারীপ্রধান সমাজের ইঙ্গিত

মনসাকে নারীকেন্দ্রিক— অনেকটাই যেন matriarchal সমাজের স্মৃতি হিসেবে থেকে যাওয়া বাস্তব বলে মনে হয়। কমলার সঙ্গে মনসার সখি-সম্পর্ক তৈরি করা মনসামঙ্গলের অতি পরিচিত কাহিনীর recurrent motif —এরকম আরও অনেক বার, বহু ক্ষেত্রে ঘটেছে। কমলার সঙ্গে সখি-সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্যে মনসার কৌশল ভুবনমোহিনী রূপ ধারণ। তার রূপ দেখে ধন্বন্তরীর শিষ্যরা ভুলেছে। সঙ্ক ধন্বন্তরীর স্ত্রী কমলা বলেছেন :

না নিব তোমার দধি ভ্রম মায়াবেশে।
দধি ছলে ভ্রম কিবা রতির হাব্যাসে॥
বুঝিনু চরিত্র তোর চললো রূপসী।
দধিছলে মায়াবেশে নগর ভ্রমসি॥ (৬. ১০. ১৭৩-৭৪)

কথার ছলে কমলাকে মোহিত করে মনসা আত্মপরিচয় দিয়েছেন মিথ্যা করে :

মনসা বলেন হাসি মায়ার প্রকার।
মহেশ্বর ঘোষ নাম জনক আমার॥
কমলা আমার নাম গৌরী জননী।
এই ত আমার খুড়ি বৃদ্ধ গোয়ালিনী॥ (৬. ১০. ১৮৪-৮৫)

স্বনাম-শোনার সঙ্গে সঙ্গে কমলার মনসা সম্পর্কে যাবতীয় সন্দেহ আপত্তি দূরে গেল।

নিজ নাম কমলা শুনিয়া কুতূহলে।
সহি সহি বলিয়া মনসা কৈল কোল॥

এয়োতিদের ডাকা হল, নানা দ্রব্য বিশেষত ফুল এসে সকলকে সাক্ষী রেখে—

পরম আনন্দে দুহে করিল সহেলা। (৬. ১০. ১৮৯)

সমনামীদের শত্রুতা এবং বন্ধুত্বের (এবং বন্ধুত্বের ছলে শত্রুতার) চিত্র আমাদের মতে খুব প্রাচীনকালের kinship-এর পরিচয় বহন করছে। উত্তরবঙ্গের কোচবিহার জেলার দিনহাটা থানার নগরভাংনি গ্রামের 'সখীর মেলা'র কথা হয়ত অনেকেই জানেন। 'এই মেলাতে প্রতি বৎসর বারুণী স্নানের দিন ১৫ হইতে ২০ হাজার নরনারী জমায়েত হন, তন্মধ্যে অবশ্য নারীর সংখ্যাই বেশি।' (আনন্দবাজার পত্রিকা ; ২৭ বৈশাখ ১৩৬৭)। একই সংবাদ প্রতিবেদনে জানা যাচ্ছে. 'মেলা স্থানে একটি প্রাচীন শিবমন্দির ও পুকুর আছে। দুই নারী বন্ধু শিবমন্দিরে একত্রে পূজা দিয়া পুকুরে নামিবেন ও হাতে পান, সুপারি ও বাতাসা নিয়া পরস্পরের হাত ধরিয়া একসঙ্গে ডুব দিবেন। স্নানান্তে পান, সুপারি ও মিষ্টি সমান ভাগ করিয়া খাইয়া আজীবন সখীত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হইবেন। ইহা হইতেই এ মেলার নাম হইয়াছে সখীর মেলা।' মেলায় পুরুষরাও সখা সম্পর্ক গড়ে তবে তারা সংখ্যায় নগণ্য। নারীদের সংখ্যাধিক্যের কারণে এই মেলায় পুলিশের যোগান যথেষ্ট থাকে। এই অভিনব মেলাটির মধ্যে আমাদের সমাজের সুপ্রাচীন সাংস্কৃতিক দিকচিহ্ন মেলে। সমাজে পুরুষদের নিয়ন্ত্রণ বেশি থাকা সত্ত্বেও—নারীরা এই প্রক্রিয়ায় পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক রক্ষা করার চেষ্টা করেছে, আজ নিছক বৈচিত্র্যের দ্যোতক মনে হলেও আদিতে

এই সম্পর্কগুলি পুরুষদের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হত বলেই মনে হয়—মনসামঙ্গলের সর্বত্রই এরকম ঘটেছে।

চাঁদ সদাগরের মহাজ্ঞান হরণের সময় মনসা সনকার বোনের রূপ ধারণ করেছেন। আপাত দৃষ্টিতে অসম্ভব—আধুনিক সময়ে একেবারেই অসম্ভব অথচ এই রকম কাহিনী রচনা করেছেন মনসা-মঙ্গলের কবিরা। নিশ্চয় নিছক আনন্দদানের উদ্দেশ্যে একাহিনী ফাঁদা হয়নি। সহসা শোনা গেল চাঁদের বাড়ির লাগোয়া রামেশ্বরের ঘাটে কাঁদছেন এক অপরূপ সুন্দরী। সনকা সংবাদ নিতে গেলেন—জানালেন সেই নারী, তাঁর পরিচয় :

জাতি গন্ধ বণিক মহেশ দত্ত পিতা।
মেনকা আমার নাম মাহেশ্বরি মাতা॥
সনকা চাঁদের রাণী আমার ভগিনী।
পলাইল প্রভু মোরে রাখি একাকিনী॥ (৫. ১৪. ২৮৭-৮৮)

অসম্ভব-অবিশ্বাস্য এই ঘটনা, কারণ বোন-বোনের কাছে রূপ ধারণ কবে তাব ঘরে যাচ্ছেন, আশ্রয় পাচ্ছেন। খুব অল্প বয়সে বিয়ে হলে—বোনে বোনে দেখা-সাক্ষাৎ একেবারেই না ঘটলে এবকম ঘটলেও ঘটতে পারে। যদি ভাবা যায় দৈবীমায়া, তাহলে অবশ্য বলার কিছু নেই।

মনসা সনকার বোন মেনকার রূপ ধারণ করে চাঁদের অন্দরমহলে ঢুকলেন। চাঁদ তাঁকে দেখে কামমোহিত হলেন।

মুনি মনোমোহন মনসা অঙ্গভঙ্গ।
কাতর নৃপতি অতি বাড়িল তরঙ্গ॥
নিবারিতে নারে মন হইল অস্থির।
পাগল হইল রাজা আইল বাহির॥ (৫. ১৪. ২৯৫-৯৬)

চাঁদের প্রস্তাব মেনকাকে ভোগ করবেন তিনি। শোনামাত্র সনকা কানে হাত চাপা দিয়েছেন। 'কর্ণে হস্ত দিয়া রাণী করে হাহাকার।' সনকা এরপর মেনকা-বেশী মনসাকে গিয়ে বললেন

দুরন্ত নৃপতি তোমা দেখিল কেমনে।
মদনে কাতর হয়্যা চাহে আলিঙ্গন।
কেমন বলিব হেন ছার কুবচন॥ (৫.১৪.৩০১-৩০২)

নিতান্ত অসঙ্কোচে চাঁদের এই কুপ্রস্তাব দেওয়া, আর সনকার সেই প্রস্তাব নিয়ে বোনের সঙ্গে কথাবার্তা বলা আমাদের কাছে অত্যন্ত অস্বাভাবিক বোধ হচ্ছে। হতে পারে, সমাজের ব্যবস্থা তখন শিথিল ছিল কিংবা দেবী মনসার কাজ বলে কেউ কোন প্রশ্ন তোলেনি। অথবা এ হয়তো ছিল যোগ সাধনার শৈব বিবাহের মতো কোন প্রক্রিয়া। যন্ত্রে সাময়িকভাবে কাম-পারদর্শিনী নারীকে বসানোর বিষয়টি বর্তমান কাহিনী গড়ে ওঠার সময় সমাজে চালু ছিল, এমনও হতে পারে। এ বিষয়ে একজন গবেষকের উক্তি স্মরণ করছি : 'কুল সাধনে নিজের বা পরের স্ত্রী আবশ্যক।' (সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় : *শক্তিরঙ্গ বঙ্গভূমি* ; আনন্দ প্রকাশনী ; কলকাতা ; ডিসেম্বর ১৯৯১ ; ১৫৩ পৃ.)। আমাদের সুস্পষ্ট অনুমান এরকম প্রক্রিয়ার অবসরেই মনসা চাঁদের মহাজ্ঞান হরণ করতে পেরেছেন। মনসা চাঁদকে রতি-আকাঙক্ষায় পীড়িত ও দুর্বল করে জেনে নিয়েছেন তাঁর মর্ম :

যদি আমা প্রতি রাজা করহ কপট।
না দিব সুরতি-দান নহিব নিকট॥ (৫. ১৪. ৩১২)

শেষ পর্যন্ত জটা, দিদ্ধিমুনি আর জয় পতাকা নিয়ে মনসা চলে গেলেন।

বস্তুত মেনকা ও সনকার অভিমত অনুযায়ী গৃহের অন্দরে থাকার ঘটনাই চাঁদের মহাজ্ঞান হরণের মূল সূত্র। ধন্বন্তরীর ক্ষেত্রেও কাহিনীর কাঠামো একইরকম। কমলার সইকে দেখে ধন্বন্তরি কৌতূহলী হয়েছেন, তার কামনা জেগেছে।

সহির যতেক রূপ ভাবিতে হৃদয়ে।
মদনে পীড়িত হৈল কামে প্রাণ দহে॥ (৬.১২.২০৯)

ধন্বন্তরীর মৃত্যু-মর্ম জেনে নিয়েছেন মনসা—কামনায় অধীর ধন্বন্তরীব বিশেষ দুর্বল মুহূর্তে—তারই স্ত্রীর মাধ্যমে, অর্থাৎ এখানেও পুরুষের প্রাধান্য নিয়ন্ত্রিত হয়েছে নারীদের ব্যক্তিগত সই-পাতানোর মতো একটি নির্দোষ সংস্কারের কৌশলে।

মনসামঙ্গলের অনুরূপ প্লট গঠনের ইঙ্গিত বাংলার দুই প্রান্তে দুটি অনুষ্ঠানের মধ্যে প্রবলভাবে উপস্থিত হতে দেখেছি। দুটি অনুষ্ঠানই মনসাকেন্দ্রিক। বলি—

১. বাঁকুড়ার অযোধ্যা গ্রামে দশহরার দিন অনুষ্ঠিত হয় 'গিন্নিপালন' উৎসব। সে অনুষ্ঠানে গ্রামীণ দেবী মনসার মন্দির থেকে গ্রামীণ বিবাহিত মহিলারা দল বেঁধে সারাদিনের জন্যে দ্বারকেশ্বর নদীর চরে ('চটাই'— নামক দুর্গম স্থানে) গিয়ে অনুষ্ঠান করে। এখানে পুরুষরা প্রবেশ করতে পারে না। অনুষ্ঠানের মূলকথা— মেয়েরা নিজেরা দু'ভাগে ভাগ হয়ে বর ও বউ সাজে। রাম ও সীতা। গান গায়। সম্ভবত জুগুপ্সিত নৃত্য এ অনুষ্ঠানের অঙ্গ। (ড. রবীন্দ্রনাথ সামন্ত : *বাঁকুড়া সংস্কৃতি পরিক্রমা* ; পুস্তক বিপণি ; ১৯৮১, ৭৬-৭৭ পৃ.)। দশহরার দিনের আরও যে অনুষ্ঠানটি বিশেষ স্মরণীয়, তা হল—'সই সয়লা' বা সই পাতানো। ড. সামন্ত লিখেছেন: 'স্বয়ং দেবী সই পাতাতে যান পাশের গ্রামে। গ্রামের নাম বিড়বা। এ সম্বন্ধে কিংবদন্তী আছে। এক তিলির মেয়ে সাধ করেছিল যে মা মনসার সঙ্গে সই পাতালে বেশ হয়। অন্তর্যামিনী মনসা বৃদ্ধা ছদ্মবেশে তার সঙ্গে সই পাতাতে যান। অবশ্য স্বয়ং মনসা যান না, যান 'আসাবাবি'।' (ঐ)।

২. ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তর্গত গোকর্ণ-সাদেকপুর অঞ্চলের লোকজীবনের বাস্তব চিত্র অঙ্কন করেছেন অদ্বৈত মল্লবর্মণ। তাঁর অনন্যসাধারণ উপন্যাস *তিতাস একটি নদীর নাম*-এর একটু 'জালা বিয়া' নামে একটি অনুষ্ঠানের বর্ণনা পেয়েছি। ঠিক যেন গিন্নিপালন অনুষ্ঠান। একটু উল্লেখ করছি উপন্যাস থেকে : 'শ্রাবণ মাস শেষ হইয়াছে, পদ্মাপুরাণও পড়া শেষ হইল। বেহুলা সতী মরা লখিন্দরকে লইয়া পুরীর বাহির হইবার সময় শাশুড়ি ও জাদিগকে কতকগুলি সিদ্ধ ধান দিয়া বলিয়াছিল, আমার স্বামী যেদিন বাঁচিয়া উঠিবে, এই ধানগুলিতে সেদিন চারা বাহির হইবে। চারা তাতে যথাকালেই বাহির হইয়াছিল। এই ইতিহাস পুরাণ রচয়িতার অজানা হইলেও মালোপাড়ার মেয়েদের অজানা নাই। তারা বেহুলার এয়োত্নালির স্মারক চিহ্নরূপে মনসা পূজার দিন এক অভিনব বিবাহের আয়োজন করে। ধানের চারা বা জালা এর প্রধান উপকরণ। তাই এর নাম জালা-বিয়া। এক মেয়ে বরের মত সোজা হইয়া চৌকিতে দাঁড়ায়, আরেক মেয়ে কনের মত সাতবার তাকে প্রদক্ষিণ করে, দীপদানির মত একখানি পাত্রে ধানের চারাগুলি রাখিয়া বরের মুখের কাছে নিয়া প্রতিবার নিছিয়া-পুঁছিয়া লয়। এইভাবে জোড়ায় জোড়ায় নারীদের মধ্যে বিবাহ হইতে থাকে আর একদল নারী গীত গাহিয়া চলে।' (অচিন্ত্য বিশ্বাস : *অদ্বৈত মল্লবর্মণ ও তিতাস একটি নদীর নাম* ; রত্নাবলী ; কলকাতা ; ১৯৯৮ ; উপন্যাস অংশ ; ১০৮ পৃ.)। এ বিষয়ে আমার সামান্য বিশ্লেষণ ঐ গ্রন্থ থেকে উদ্ধার করব— পরে, উপযুক্ত অবসরে। এই দুই অনুষ্ঠানের আড়ালে বাংলার মনসামঙ্গল সংস্কৃতির সঙ্গে নারী সমাজের গুরুত্বপূর্ণ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক লক্ষ করি।

সই-সয়লা পাতানো তথা আনুষ্ঠানিক মিত্রতার প্রক্রিয়া (ceremonial friendship) বাংলার আড়াল হয়ে যাওয়া কোন প্রাচীন রীতি বলে মনে করি।

বিষবিদ্যক সঙ্ক-ধন্বন্তরির মৃত্যু মনসামঙ্গল কাব্যে নেতা-মনসার কাহিনীর আধুনিক ভাষ্যটি তৈরি করার ভূমিকা গড়ে তুলেছে। নেতা-র প্রাধান্য সঙ্ক-ধন্বন্তরির মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে অনেকটাই হারিয়ে গেছে। বিপ্রদাসের কাব্যে অবশ্য নেতা-র প্রসঙ্গ খুব স্পষ্ট করে দেখছি না। তাঁর কাহিনী গ্রন্থনে সঙ্ক-ধন্বন্তরির আদি প্রসঙ্গটি আড়ালে চলে গেছে। সই পাতানোর বিষয়ে অবশ্য বিপ্রদাস কাহিনী-নির্মাণের জনমনোরঞ্জক ঢংটি রক্ষা করেছেন। সঙ্ক-ধন্বন্তরির প্রধান দুই শিষ্য কাজলা মালিনীর দুই যুবক পুত্র ধনা ও মনাকে মারার জন্যেও মনসা একই কৌশল প্রয়োগ করেছেন। কাজলার গৃহে তিনি পসার নিয়ে গেছেন, সঙ্গে দুধ দইয়ের পসার :

নগর ভ্রমিয়া গেলা মালিনীর বাসে।
পসরা ওলায় দেবী কাজলার পাশে॥ (৭. ৮. ১১৪)

পরিচয় দিয়েছেন— তার নাম কাজলা, সুগন্ধ গ্রামে তার বাড়ি, পিতা-মাতা যথাক্রমে মহেশ্বর ঘোষ ও গৌরী। শোনার সঙ্গে সঙ্গে কাজলার ব্যবহার একইরকম, যেমনটি দেখেছি কমলার ক্ষেত্রে।

নিজ নাম শুনিয়া কাজলা কুতূহলে।
সহী সহী বলিয়া মনসা লৈল কোলে॥ (৭. ৮. ১২২)

সই-পাতানো হল রীতিমতো বাদ্য বাজিয়ে—গন্ধ পুষ্প এনে। ধনা-মনা বিঘতিয়া সাপের কামড়ে মারা গেল। মনসা সখীকে বললেন, তাঁর পিতার কাছে তিনি সামান্য বিদ্যা শিখেছিলেন, সেই বিদ্যার পরীক্ষা করে দেখতে পারেন তিনি— তবে শর্ত থাকবে :

পদ্মা বলে আলো সহি সত্য কর তুমি।
তোর দায় নাহি পুত্র লইয়া যাইব আমি॥ (৭.১০.১০৫)

শোকার্ত কাজলা শর্ত স্বীকার করলেন—মনসা দুই পুত্রকে তার সঙ্গে নিয়ে গেলেন। নিযুক্ত করলেন সেবার কাজে ('দুই ভাই রাখিলেন সেবক কবিয়া' — ৭.১৩.১৯৬)। কাজলা সই-যের কাছে আকুল প্রার্থনা করলেন, তবু মনসা একটি পুত্রকেও দিলেন না। এখানেও মিত্রত্ব শত্রুতার নামান্তর হয়ে দেখা দিল।

॥ ১৫ ॥

নেতা কি মহাদেবী

নেতা-র বিশিষ্টতা নিয়ে 'বিভাব' পত্রিকায় সুকুমার সেন একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ লিখেছেন। প্রবন্ধটির নাম 'মহাদেবী নিত্যা'। সেখানে আমাদের ওপরের বিশ্লেষণের পক্ষে সমর্থন-সূচক বেশ কিছু প্রসঙ্গ ও যুক্তি আছে। আমরা সেই রকম দুয়েকটি বাক্য উদ্ধার করছি :

১. '....মনসা-কাহিনীতে নেতা (নেতো) আসলে যে নিত্যা দেবী হতে পারেন তার ইঙ্গিত কাহিনীর মধ্যেই রয়েছে। কাহিনীতে নেতা মর্যাদায় মনসার চেয়ে খাটো বটে কিন্তু ক্ষমতায় সে প্রধান। মনসার চালচলন নেতার উপদেশ অনুসারে। কাহিনীতে নেতার যে চরিত্র তা মূল দেবীর আদল থেকে অনেকটাই ভ্রষ্ট হয়েছে।' ("মহাদেবী নিত্যা" : সুকুমার সেন ; পথিক্ বসু সম্পাদিত— 'বিভাব' প্রবন্ধ সংকলন ; প্যাপিরাস ; কলকাতা, ১৯৯৪ ; ২৮১ পৃ.)।

২. 'যোগীরা নিত্যাকে ভুলে গিয়েছিলেন কিন্তু নামটিকে ছাড়েননি। তাঁরা তাঁদের হঠযোগের কঠিনতম প্রক্রিয়া বস্ত্রখণ্ড দিয়ে অন্ত্র ধৌত করাকে বলতেন "নেতি ধৌতি" অর্থাৎ নিত্যার সংস্কারকর্ম। নামটির পিছনের ছবি হারিয়ে যাওয়ায় তাঁর যে নতুন অর্থ জুড়ে দিয়েছিলেন তার ফলে নেতি-ধৌতির মানে হল— নেতের (অর্থাৎ সরু কাপড়ের) দ্বারা ধোওয়া। ওরা নাকি বিশ বাইশ হাত লম্বা বস্ত্রখণ্ড অন্ত্রের মধ্যে ঢুকিয়ে নিয়ে দেহ যন্ত্রকে পরিষ্কার করেন।' (ঐ : ২৮২ পৃ.)।

৩. 'মনসাকে নেতাই বাধ্য করেছিল বেহুলার উপর প্রসন্ন হতে। নেতার রজকিনী হওয়া অনেকটা "নেত"—কাপড়ের সূত্র ধরেই।' (ঐ)

৪. 'প্রত্ন ইতিহাসের নিত্যাদেবীর ঐতিহ্য বহন করে এনেছে যোগী সম্প্রদায়। এঁরা বরাবরই যাযাবর। আমাদের ঐতিহ্যে যখন থেকে ধরা পড়লেন তখন থেকেই এঁরা শিবের সঙ্গী অথবা অনুচর।' (ঐ : ২৮৭ পৃ.)।

৫. 'এই দুজন (গোরক্ষনাথ ও তাঁর গুরু মৎস্যেন্দ্রনাথ— অ. বিশ্বাস) হলেন নারী-সঙ্গ -পরাংমুখ যোগী সম্প্রদায়ের মূল। বলতে পারি মহাদেবী নিত্যার আসল বিদ্রোহী সেবক। তাই এঁদের ঐতিহ্যেই নিত্যা-বাশুলী-মনসার কাহিনী বা allegory যাই বলুন তা পাচ্ছি। .....নিত্যার উপাসিকা উপাসিক দুইই ছিল। উপাসিকা 'যোগিনী'রা প্রধান হয়ে এবং যাকে ভদ্র ভাষায় বলে fertility cult তাকে অর্থাৎ জীব-জীবনের একটি মুখ্য আনন্দকে বড় করলেন এবং মাতৃ ও মাতৃকাতন্ত্রের পথে চললেন। উপাসক 'যোগী'-রা ক্ষণিক ইন্দ্রিয়ানন্দকে তুচ্ছ করে— তাই ঘৃণা করে, ত্যাগ করে—উর্ধ্বরেতা হয়ে অখণ্ড জীবনের সাধনায় নিরত হলেন। প্রথম সম্প্রদায় চাইলেন ইন্দ্রিয়ানন্দকে দীর্ঘস্থায়ী করতে, দ্বিতীয় সম্প্রদায় খুঁজলেন অজর-অমর হবার পন্থা। যোগী সম্প্রদায়ের উপাস্যা— আসল কথায় ঠিক উপাস্যা নন, সাধন-গুরু, সাধন-উপাসিকা— হলেন মহাদেবী নিত্যা। তাঁর প্রধান সহচরী, অর্থাৎ দেবীর স্বরূপে প্রধান উপাসিকা হলেন মনসা-বাশুলী।' (ঐ : ২৮৮ পৃ.)।

বলা বাহুল্য, এই বিশ্লেষণধৃত যুক্তিগুলি নিত্যা বা নেতার মহাদেবীত্ব (Great Mother Goddess)-এর সূচক। তাছাড়া একই দেবী-ভাবনা কিভাবে পৃথক হয়ে পুরুষ-প্রধান ও নারী পুরুষের 'সহজ'-সাধনায় পর্যবসিত হল সেই বিচারে আমাদের বিশ্লেষণকে সুকুমার সেনেব যুক্তিগুলি সহায়তা করছে।

সান্ড্রা বিলিংটন আর মিরাণ্ডা গ্রিন সম্পাদিত *The Concept of the Goddess* গ্রন্থে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের মহাদেবীদের নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। কেলটিক দেবী সিরোনা (Sirona) যাকে ভাবা হয়েছে 'The divine partner of the Celtic healing Apollo' ('The Concept of the Goddess' ; Routledge ; London ; ১৯৯৬ ; 29 পৃ.), সুলীস (Sulis)—যিনি নিরাময়-বিদ্যা জানেন ('goddess of the craft of medicine'— ঐ ; 33 পৃ.) কিংবা মিশরীয় দেবী হাথর (Hathor) যিনি গোসম্পদ রক্ষা করতেন ('appears as a cow-goddess protecting the Pharaoh'— উক্ত ; 91 পৃ.)। উত্তর আমেরিকা, জাপান, মধ্যপ্রাচ্য, পূর্ব-আফ্রিকা ও উত্তর-ইউরোপের বিস্তৃত অঞ্চলে যে ধরনের দেবী-র সন্ধান মিলেছে— তাদের আচার আচরণ থেকে উনবিংশ শতাব্দীর গবেষকরা Great Mother Goddess-এর ধারণা দিয়েছেন। মিরাণ্ডা গ্রিন লিখছেন, উনিশ শতকীয় পণ্ডিতদের মহাদেবীর ধারণা মূর্তিতত্ত্ব, পরাতত্ত্ব, লোকসংস্কৃতিবিদ্যার সমাহারে গড়ে তোলা হলেও এর পেছনে এক রহস্যময় কালচেতনা বিদ্যমান— যা বস্তুত সমসাময়িক রীতি বা প্রথাকে সুদূর অতীত যুগের কার্যকারণের

ফল বলে ধরে নেওয়ার প্রবণতার নির্যাস। সামান্য উদ্ধার করছি : 'What often happens in current Goddess-Theories is a conflation of material evidence and metaphorce concept : thus the contrust of a modern divine female principle is based upon evidence for Goddess cults in the past.' (ঐ; ভূমিকা ; 2 পৃ.)। নেতা-দেবীর গোরূপ ধারণ, বিষ-নিরাময় বিদ্যার আদি ইঙ্গিতগুলি বিশ্লেষণ করলে নিশ্চিতভাবেই বলতে হবে নেতা (বা 'নিত্যা')-র আড়ালে মহাদেবীত্ব-ভাবনা বিমূর্ত হয়ে আছে।

॥ ১৬ ॥

মহাজ্ঞান-যোগ ও তন্ত্র সাধনার বিমিশ্র ধারণা

বিষবিদ্যা, বিষ গ্রহণ ও বিষ শোধনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সূত্র— যোগের মৌলিক বিষয়। এই বিষকে শারীরিক মৃত্যুবীজ বলে ধবতে হবে। সুতরাং শরীরের মৃত্যুবীজকে অস্বীকার করার সাধনা—মৃত্যুকে জীবনে ফিরিয়ে দেবার প্রয়াস যাদের, তাদের শক্তি—'মহাজ্ঞান'। শরীরের অন্ধিসন্ধি জানা— নিয়ন্ত্রণ করতে শেখার চেয়ে মহাজ্ঞান আর কি? মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের এক বড় অংশ মহাজ্ঞান জানা, মহাজ্ঞান রক্ষা, হারিয়ে ফেলা আর ফিরে পাবার কাহিনী। মীননাথ মহাজ্ঞান রক্ষা করতে ব্যর্থ বলেই তাকে কদলী রাজ্যে শাস্তি পেতে হয় ; গোপীচন্দ্র যতক্ষণ হাড়িফার কাছে মহাজ্ঞান পান না ততক্ষণ তার ওপর প্রবল কষ্টের পরীক্ষা চলতে থাকে। 'গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাসে' হীরা নটী আর ধর্মমঙ্গল ধারায় গোলহাট পালায় সুরিক্ষার সাহায্য ছাড়া মহাজ্ঞান লাভ হয় না। লাউসেনকে বাঁধার উত্তর যোগান অবশ্য কর্পূর ধবল। লাউ- এর সাধনায় প্রয়োজন পড়ে সামুলা নামক উপাসিকার সাহায্য। বস্তুত পক্ষে মনসামঙ্গলের উৎসটি বোঝার জন্যে এই মহাজ্ঞান-প্রসঙ্গ একটি গুরুত্বপূর্ণ সূত্র হিসেবে কাজ করে। মহাজ্ঞান যার অধিগত, তাঁর ক্ষয় নেই। চাঁদ সদাগরের মহাজ্ঞান নাথ ঐতিহ্যের মতোই স্বয়ং মহাদেবের দান। চাঁদের সাধের বাগান ধ্বংস করেছেন মনসা। জানার সঙ্গে সঙ্গে নখরা-বাগানে এসে হাজির হয়েছেন—

'মহাজ্ঞান জপে মনে জয় নেত আচ্ছাদনে
নিমিষে নাখরা জিয়াইল।' (৫. ২. ২৬৫)

এই মহাজ্ঞান যতক্ষণ চাঁদের অধিকারে থাকবে, ততক্ষণ তাঁর কোন ক্ষতি করা অসম্ভব। সুতরাং নেতার পরামর্শ :

নেতো বলে পদ্মাবাল্পি হইয়া চাঁদোর শালী
ছলিয়া আনহ মহাজ্ঞান। (৫. ১২. ২৬৬)

মহাজ্ঞানের দুটি চিহ্ন— ১. জয়নেত ; ২. সিদ্ধঝুলি। জয়নেত, অর্থাৎ জয়পতাকা ; সিদ্ধঝুলি অর্থাৎ— জটা এবং অক্ষগুটিকা (বীজমন্ত্র পড়ার)। জটা মাথায় পরে অক্ষগুটিকার ঝুলি হাতে রেখে সাধনা করে মহাজ্ঞান লাভ করতে হয়। বহু সাধনার ধন মহাজ্ঞান হারিয়ে চাঁদ সদাগর 'মৃতবৎ হইয়া কান্দে ডাকে আর্তনাদ।'

মহাজ্ঞান আছে সঙ্ক ধন্বন্তরীরও। শতশিষ্যকে বিষ পুষ্প দিয়ে হত্যা করে যাবার পর মনসাকে নিন্দা করে ধন্বন্তরী মহাজ্ঞান প্রয়োগ করলেন :

**শিরে জয় নেত ছিল তুরিতে বাড়ায়্যা দিল
ধনা মনা ধরে দুইপাশ। (৬.৭.১২৯)**

শত শিষ্য বেঁচে উঠল। কমলার সখী সেজে তাকে কথঞ্চিৎ উত্তেজিত করে মর্ম জেনে নিলেন মনসা। তৎক্ষণাৎ মনসা উদয়কাল নাগকে নিয়োগ করলেন। (বিজয় গুপ্তের রচনায় আছে শিবের তক্ষকের কথা।) উদয়কাল সঙ্কের বক্ষে নির্ঘাৎ কামড় বসাবার পর মনসা মহাজ্ঞান (জয়নেত সিদ্ধিঝুলি) হরণ করলেন। বোঝাই যাচ্ছে, মনসামঙ্গল আর নাথ সাহিত্যের ক্ষেত্রে লৌকিক বিশ্বাস মোটামুটি এই রকম—মহাজ্ঞান যতক্ষণ সিদ্ধপুরুষের আয়ত্ত ততক্ষণ তাকে কেউ ক্ষতি করতে পারবে না। বিষবিদ্যা আর শরীরবিদ্যা— যোগ ও তন্ত্র এই দুই সাধনার ধারা এইভাবে মনসামঙ্গল ধারায় একাকার হয়েছে।

॥ ১৭ ॥

মনসা সম্পর্কিত মিথ বা পুরাকথা

মনসার জন্মকথা মনসামঙ্গল-কাহিনীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পুরাকথা। এই পুরাকথা (myth)-টিও বাংলার নিজস্ব। *ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে* আছে ভিন্ন ধরনের কাহিনী। সর্পভীত মানুষকে রক্ষার জন্যে কশ্যপ মন্ত্র সৃষ্টি করলেন—মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মনসাকে সৃষ্টি করলেন। মনসা কুমারী অবস্থায় শিবের কাছে স্তব, পূজা, মন্ত্র ইত্যাদি শিখে নিলেন। (সুধীরচন্দ্র সরকার সঙ্কলিত *পৌরাণিক অভিধান* ; উক্ত ; ৪০৯ পৃ.)। জরৎকারু সম্পর্কে মহাভারতের আদিপর্বে আছে তিনি বাসুকির ভগিনী। সমনামীয় স্বামী তার—জরৎকারু।

মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মনসা—এ অর্বাচীনকালের কল্পনাপ্রসূত—তখন তন্ত্র ও যোগাচার সাধারণ্যে প্রসিদ্ধ হয়েছে। যন্ত্রে দেবীর কল্পনা ও ভক্তের মনের মধ্যে দেবীর অনুভব—এ সমস্ত পুরাকথার যুগের সৃষ্টি নয়।

বাংলার মনসামঙ্গল ধারায় সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে মনসা শিবের স্খলিত বীর্যের পরিণতি। এ কাহিনী সমস্ত মনসামঙ্গলেই পাওয়া যায়। নারায়ণদেবের কাব্যের একত্র কাহিনীটিকে সামান্য বৈচিত্র্য দেওয়া হয়েছে। চণ্ডীদেবী নিজে কালিদহে বেলগাছ হয়ে উপস্থিত হন :

> কালীদহের তীরে রহিল বিল্ববৃক্ষ হয়ে।

তার বীর্যস্খলন হবার পর পদ্মপত্রে রাখলেন তিনি। সেই বীর্য ভক্ষণ করল 'ক্ষমা' নামক পক্ষিনী। অসহ্য বোধ হল তার। ঐ পদ্মপত্রেই উগরে দিল সে— শিবের অক্ষয় বীর্য।—

> সহস্র শালে নামিলেক পাতাল ভুবন।

বাসুকি কূর্মের পরামর্শে নির্মাণিকে ডেকে কন্যার জন্ম দিতে বললেন। তাঁর রূপ হবে এইরকম:

> চারিখান হস্ত দিবা তিন নয়ন।
> শিবের লক্ষণ করি করহ নির্মাণ॥
> এত শুনি নির্মাণি হুঙ্কার মারিল।
> ততক্ষণে পদ্মাবতী নির্মাণ হইল॥

হুঙ্কার থেকে জন্মদান—নাথ যোগীদের সংস্কৃতির কথা স্মরণ করায়। 'গোরক্ষবিজয়ে' আছে 'আদি অনাদি প্রভু' বিষ্ণুর জন্ম দিয়েছেন হুঙ্কারে :

> হুঙ্কারে জন্মিল ব্রহ্মা বিষ্ণু হই [ল মুখে]

[পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত *গোর্খ বিজয়*— বিশ্বভারতী ১৩৫৬ ; ১ পৃ.— বন্ধনীভুক্ত অংশ 'সম্ভাবিত পাঠ' ; আমাদের প্রস্তাব 'হই ল মুখে' নয় 'হর পঞ্চমুখে' পাঠ হবে।]

পূর্ববঙ্গের অধুনা আবিষ্কৃত নতুন (?) কবি রামবিনোদের মনসামঙ্গলে মনসার জন্মকথা সামান্য ভিন্নরকম, অনেকটাই ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ অনুসারী।

—শিবের বীর্য এক হংস গ্রহণ করে ; উগ্র বীর্য উদরস্থ করতে না পেরে মরে—শিব তাকে বাঁচিয়ে দেন। পাখিটি শিবের বীর্য উগরে ফেলে। 'শিব সেই বীর্য মৃণালের মধ্যে রেখে দিলে তা সপ্তম পাতালে গিয়ে উপস্থিত হল।' [ড. মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া : *শ্রী রায় বিনোদ : কবি ও কাব্য* ; (ড. মুহম্মদ শাহজাহান ভুল করে রাম বিনোদকে রায় বিনোদ পড়েছেন।) বাংলা একাডেমী, ঢাকা ; ১৯৯১ ; ৭২ পৃ.]। কশ্যপ সেই বীর্য থেকে বেদ মন্ত্রধ্বনির সাহায্যে মনসার জন্ম দিলেন :

চন্দ্র সম্মুখে থুইয়া কশ্যপ মহামুনি।
সঙ্কল্প করিয়া কৈল চারি বেদধ্বনি॥
সেহি চন্দ্রে হৈল মাংস পিণ্ডের আকার।
দেখিয়া সকল মুনি আনন্দ অপার॥
উচ্চস্বরে করে মুনি চারি বেদধ্বনি।
চারিহস্ত ত্রিলোচন হৈল কন্যা খানি॥
শুভক্ষণে শুভলগ্নে জন্মিলা ব্রাহ্মণী।

পূর্ববঙ্গের উত্তরাংশে—নারায়ণদেবের কাব্যের প্রভাব সীমার মধ্যেই রামবিনোদ কাব্য লিখেছেন। তবে তাঁর পুরাণ সচেতনতা যথেষ্ট ছিল। নির্মাণির হুঙ্কারকে তিনি কশ্যপের উচ্চস্বরে বেদধ্বনিতে পরিণত করেছেন।

বিজয় গুপ্তের রচনায় হংস নেই—আছে পক্ষিনী। সে শিবের বীর্য পান করেছিল।

যক্ষণে পিলেক জল ফুটিলেক বুদ্ধিবল
অগ্নি জ্বলে সকল শরীরে।
অনল সমান মনে উগারিল ততক্ষণে
আরবার পদ্মবনে এড়ে॥

(জয়ন্তকুমার দাশগুপ্ত সংস্করণ ; উক্ত, ১৮ পৃ.)। বিজয় গুপ্তের রচনায় পাচ্ছি—মনসা নিজেই নিজেকে যেন সৃষ্টি করেছেন—তিনি স্বয়ম্ভূ-কল্প।

সুরঙ্গে হইয়া বন্দী পাইয়া মৃণাল সন্দি
মহারস পাতালে নামিল।
প্রবেশিল পাতালপুরী জন্মিল নাগিনী নারী
দেবকন্যা সোন্দর দেখিল॥ (ঐ ; ১৯ পৃ. :)

এমনও মনে হয়, মনসা জন্মানোর সঙ্গে সঙ্গেই ষোড়শী নারীতে পরিণত হয়েছেন :

মহাদেবের কন্যা হইল দেবের হরিষ।
তখনে হইল কন্যা ষোড়শ বরিষ॥ (ঐ)

ধারণা হয় এইখানে মনসার মধ্যে রাক্ষস-অনুষঙ্গ আছে। পার্বতীর বরের কথা পেয়েছি রামায়ণে—রাক্ষসীদের গর্ভ হবার সঙ্গে সঙ্গে প্রসব আর প্রসবের সঙ্গে সঙ্গে তারা জননীর বয়স পাবে। রামায়ণে উত্তরকাণ্ডের এই মোটিফটি হয়ত মনসার সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছে। এ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ পরে উপযুক্ত অবসরে নেব।

শিবের বীর্যে মনসার জন্ম হলে মনসা তার কন্যা। কোন কোন মনসামঙ্গল কাব্যে মনসাকে নিরঞ্জনের অবতার—প্রতিনিধি ভাবা হয়েছে। রাঢ় বাংলার বহু স্থানেই ধর্ম ও মনসার মধ্যে সম্পর্ক আছে। বহু স্থানেই মনসা ধর্মের 'কামিন্যা'। ১৩২১ বঙ্গাব্দের বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পঞ্চম মাসিক অধিবেশনে পঠিত 'ধর্মপূজা বিধি' প্রবন্ধে ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন—ধর্মঠাকুরের বাহন উলূকের পূজার পর একসময় কামিন্যারা পূজা পান। অন্যতম কামিন্যা বিষহরী। বিপ্রদাসের রচনায় ধর্মঠাকুর সহসা এসে হাজির হলেন গঙ্গার কাছে—গঙ্গা ধবলমুখী হয়ে গেলেন। অথচ শিব তখন বল্মুকায় ধর্মেরই ধ্যান করছেন! 'শূন্য পুরাণে' এ রহস্যের কোন ভেদ হয় কিনা দেখি। সেখানেও আগমের পরিচয়ে দেখছি গঙ্গার সঙ্গে ধর্মের সম্পর্কের রহস্যময়তা। বিপ্রদাসের কাহিনীটি যে খুব আধুনিক নয়—রামাই পণ্ডিতের এই রচনাংশ দেখলে বোঝা যাবে :

> ধবল খাট ধবল পাট ধবল সিংহাসন।
> হংশ (Sic) রথে বিজয় ঠাকুর নিরঞ্জন॥
> মহাদেব মহাদেব বোল্যা ডাকেন করতার।
> গঙ্গা বলে কেবা ডাকে কোন জন বলরে ওঁঙ্কার॥
> তপস্থলে আছেন রাউ বোল্মুকার তিরে (Sic)।
> আমি ত কেযোরি (কিশোরী?) হোএগ্রা আছি হরের মন্দিরে॥
> উঠিএগ্রা ডাগুল্য গঙ্গা তেজিয়া আসন।
> গোবাক্য জালার পথে দেখিলা নিরঞ্জন॥
> অর্দ্ধ অঙ্গ হৈল গঙ্গা ধবল আকার।
> ঘুচাএগ্রা দিলেন গঙ্গা কুঞ্জের দোয়ার॥
> [*শূন্যপুরাণ* : রামাই পণ্ডিত ; ভক্তিমাধব চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত। ফার্মা কে এল এম প্রা. লি.। কলকাতা- ১৯৭৭। ২০১ পৃ. 'কিশোরী' অর্থাৎ অবিবাহিত, এই অর্থনির্ণয় আমরা করতে চাই।]

গবাক্ষ জানলা (ভক্তিমাধবের পাঠ 'গোবাক্য জালা') দিয়ে দেখামাত্র গঙ্গার অর্ধাঙ্গ ধবল আকার হওয়ার চেয়ে মুখ ধবল হলে বাস্তব হত।

জগজ্জীবন ঘোষালের মনসামঙ্গলে উক্ত জন্মকথা নেই, মনসা সেখানে কেতকা—আদিদেবী। ধর্ম-গোঁসাই তার জন্ম দিয়েছেন। প্রথমে মনসা ছিলেন নপুংসক—('নপুংসক হৈএগ্রা হৈল জন্ম')। ধর্মঠাকুর তাকে জন্ম দিয়েছেন মনোকষ্টজনিত নিঃশ্বাস থেকে—

> না দেখি পুত্রের মুখ ধর্ম হৈলা মন দুঃখ
> তেজিলাত দীর্ঘ নিঃশ্বাসে।
> নিঃশ্বাসত নিঃসরিল মনসার জন্ম হৈল
> বসিলা উঠিয়া বাম পাশে॥
> [জগজ্জীবন ঘোষাল : মনসামঙ্গল : দেব খণ্ড ; সম্পাদক ড° আশুতোষ দাস; কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ; ১৯৮৪, দ্বিতীয় সংস্করণ— ৭-৮ পৃ.)।

ধর্মরাজের মনোকষ্টের কারণ তার তিন পুত্র— ব্রহ্মা, বিষ্ণু আর মহেশ্বরকে সাগরতীরে সন্ন্যাসযোগে থাকতে হয়েছে :

> তিন ঘাটে তিনজন তপস্যাতে দিল মন
> বসিলা আবেশ করি।

কপালেত দিল ফোঁটা গলায়েত যোগ পাটা
তুলসী তিন কুশ ধরি॥

ধর্মরাজ নপুসংক মনসার বিচিত্র রূপ দেখলেন। তার অঙ্গের স্ত্রীলক্ষণ তৈরি করলেন তিনি :

নখেত দিল রেখ হইল পরতেক
সেই পথে শ্রবি রক্ত-ছল।

ফলে মনসার জন্ম হল। তিনি কন্যাকে বিবাহ করতে চাইলেন। মনসা তাঁকে নিরস্ত করলেন, কারণ 'করিবে সে লোকে উপহাস'। মনসাকে ঘরে থাকতে বলে ('যাকহ্ এই ঠাঁই') তিন পুত্রকে নিয়ে এলেন—তিন পুত্রকে বললেন এই মনসাকে বিবাহ করতে চান তিনি।

তার রূপ দেখি মোর স্থির নাই মন।
বিভা করাইয়া দেহ পুত্র তিনজন॥

পিতার বাক্যে তারা বিবাহের ব্যবস্থা করলেন :

সোবর্ণের ঘট আনি স্থাপিলা তুরিত।
বসিলেন মনসা গোসাঞি বাম ভিত॥ (জগজ্জীবন : উক্ত : ৯ পৃ.)

মনসার সঙ্গে মিলিত হতে পারলেন না—ভীত-বিহ্বল মনসাকে দেখে শরীরের অষ্টাঙ্গুল প্রমাণ অংশের অর্ধাংশ দুরে ফেললেন—'মনসা সন্তোষ হইল তাতে।' (ঐ : ১০ পৃ.)। এরপর রমণ-কালে ধর্মরাজের :

স্খলন হইল রেত বদন হইল শ্বেত
নয়ান হইয়া গেল ঘোর।

সুরতির শ্রমে মনসা নিদ্রাচ্ছন্ন হলেন, ধর্মরাজ লজ্জা পেলেন (গোসাঞি মরমে লজ্জা পায়)। এবার ধর্মরাজ মারা গেলেন—'সড়াপচা' শরীর নিয়ে ভেসে গেলেন তিন পুত্রের কাছে। ব্রহ্মা তাকে চিনলেন না— বিষ্ণুও জলের হিল্লোলে তাকে ভাসিয়ে দিলেন। ব্যোমকেশ তাঁকে চিনে মড়া কোলে করে চললেন পাহাড়ে—ক্রন্দনে আকুল হলেন। গোসাই তাঁকে দুঃখ করতে বারণ করলেন—এই উপায়ে তিনি মরণ-সৃজন করেছেন। তিনি তখন শিবের উদরে বাস করার অনুমতি চাইলেন:

মুখ মেল সত্বরে উদরে দেহ বাস।

মহেশ্বর বিভ্রান্ত। 'বাপু ইহা নাকি হয়।' ধর্ম তাকে বললেন— এতে কোন সন্দেহই নেই—

তুমি আমি অর্ধঅঙ্গ হইব শূলপাণি।
মনসা কামিনী হবে তোমার ঘরণী॥

কি আর করা :

বাপের আদেশে মুখ মেলিল শঙ্কর।
প্রবেশ করিল ধর্ম অন্তর ভিতর॥ (১৩ পৃ.)

মনসা তখন করুণা প্রকাশ করতে থাকলেন—

কুন অপরাধে মোর ছাড়্যা গেল পতি। [জগজ্জীবন ; উক্ত ; ১৪ পৃ.]

মনসা অনুমৃতা হয়ে আত্মবিসর্জন দিলেন। সতী হলেন, কিন্তু মরলেন না—মনসার পুনর্জন্ম হল:

আনলে পুড়িয়া মরে মনসা কামিনী।
আনলের মধ্যে হইল শিশু কন্যাখানি॥ (১৬ পৃ.)

তিনভাই 'লোহার মঞ্জুসি'-তে ভাসিয়ে দিলেন সেই সদ্যোজাত কন্যাকে। সেই কন্যাকে সাগরে তপস্যারত হেমন্ত ঋষি পেলেন—কন্যা পেয়ে খুশি তিনি। মেনকাকে বললেন এই 'সোনার কমল' কন্যাকে পালন করতে হবে—'নগর-ভ্রমিয়া আস্য গর্ভ দেখাইয়া।' পেটে ধামা বেঁধে গর্ভলক্ষণ দেখিয়ে মেনকা নগর ভ্রমর করে এলেন। শেষে এই কন্যা হলেন হৈমবতী গৌরী।

এই বিস্তৃত কাহিনীর বহু অংশের তাৎপর্য (meaning) হারিয়ে গেছে। বাংলায় প্রচলিত মনসা-কাহিনীকে জগজ্জীবন ধরেছেন উল্টো করে। ফলে আমাদের প্রচলিত মনসার জন্মকথা সম্পর্কিত সৃষ্টি-বিবরণের সঙ্গে এ কাহিনীর সঙ্গতি সাধন করা কঠিন। তবে এই কাহিনীর মধ্যে থেকে মনসা-র পূজাচারের কিছু সুপ্রাচীন প্রত্ন ইতিহাসের উপাদান এখানে পাওয়া যেতে পারে। সেগুলি একে একে লিখছি :

১. মনসা-র সঙ্গে নপুংসকদের সম্পর্ক কিছু থাকতে পারে। জগজ্জীবনের লেখায় তিনি প্রথমে নপুসংক— ধর্মঠাকুর তার যোনিচিহ্ন নখর আঘাতে গড়েছেন। তার পরের ঘটনা থেকে মনে হয় ধর্মঠাকুর মনসার সঙ্গে মিলিত হবার সময় শরীরের অঙ্গচ্ছেদ (অষ্টাঙ্গুল প্রমাণ/ফেলাইল অর্ধখান/মনসা সন্তোষ হইল তাতে) করেছেন। এই বিষয়টি মধ্যপ্রাচ্যের নপুংসক-পৌরোহিত্যের (eunach-priestship) ইঙ্গিত বহন করে। এ বিষয়ে আমার মত দাঁড়িয়েছে শ্রদ্ধেয় গবেষক ড° সুজিৎ চৌধুরীর একটি প্রবন্ধ পড়ে। বস্তুতপক্ষে নপুংসক পুরোহিতদের সঙ্গে মনসা পূজার গভীর সম্পর্ক আছে। সে বিষয়ে আমাদের তথ্যবিচার উপযুক্ত অবসরে উত্থাপন করব।

২. মনসাকে ঘিরে বাংলার লৌকিক স্তরের যেসব কাহিনী গড়ে উঠেছে তাতে স্ববিরোধ আছে। কখনও মনসাকে আদিদেবী ভাবা হচ্ছে—কখনও আদিদেবের স্ত্রী (ভগিনী → কন্যা → স্ত্রী) ভাবা হচ্ছে। পরক্ষণেই শিবের কন্যা ভাবা হচ্ছে, কখনো আবার স্ত্রীও ভাবা হচ্ছে। এই স্ববিরোধের মূল আদিম সমাজের kinship-এর বিভিন্ন আন্তঃসম্পর্ক— টানাপোড়েন আর দ্বন্দ্ব সংঘাতের মধ্যে পাওয়া যায়। এ নিয়ে আলোচনা করেছেন সিগমুন্ড ফ্রয়েড ও মেলানস্কির মতো পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা। তাঁদের ভাবনার কিছু পরিচয় পরে দিচ্ছি।

৩. মাতৃস্থানীয়াকে কামনা বা মাতৃস্থানীয়া চরিত্রের পুত্রস্থানীয়কে কামনা—ভ্রাতা-ভগিনী সম্পর্কে বিবাহ—মাতা-কন্যার মধ্যে যৌন ঈর্ষা প্রভৃতির মূলেও পরিবার সংগঠনের আদি স্তরের কিছু সত্য থাকতে পারে। বস্তুত মনসামঙ্গলকে myth হিসাবে ব্যাখ্যার পেছনে এই কারণটি নিশ্চিতভাবে বিচার করা দরকার।

৪. দেবী মনসা অযোনিসম্ভবা, স্বতন্ত্র-গম্যা, বিপরীত-লিঙ্গের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভয়-ভীতির সম্পর্ক— প্রভৃতির বিচিত্র ঘটনার বিবরণ আছে মনসামঙ্গলে। এই বিবরণগুলির মধ্যেও myth-টি বিশ্লেষণের কোন সূত্র থাকতে পারে। এ-বিষয়ে বাংলা ভাষায় আলোচনা খুব বেশি দেখিনি। তবে এ নিয়ে আমার কিছু ছিন্ন লেখাপত্র আছে। ধীরে ধীরে এ বিষয়ে আমার একটি মত দাঁড়িয়েছে। এ নিয়ে সামান্য আলোচনা করে নিতে হবে।

৫. দেবী মনসা ও তার ব্রতদাসী বেহুলার কাহিনী— শেষ পর্যন্ত জন্ম-বিবাহ-মৃত্যু-পুনর্জীবনের কাহিনী—এই মৃত্যুও পুনর্জীবনের কাহিনী কৃষি-সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিতির সূত্রে বিবেচিত হওয়া উচিত। এ বিষয়ে আদিম দুয়েকটি রচনা পড়েছি—Sir James George Frazer -এর গবেষণা ও অনুসন্ধানের সঙ্গে পরিচিত হলে এই কাহিনীর Pattern-টি সনাক্ত করা যায়। একে বলতে হয় শস্য-কর্ষণের আকাঙ্ক্ষা—ফলনের প্রক্রিয়ায় initiation বা প্ররোচনার প্রতীকি অনুষ্ঠান (Symbolic-rites)। এই ব্যাপারে আমাদের বক্তব্য একটু পরে

বিশ্লেষণ করা যাবে। বেহুলা-লখিন্দর প্রসঙ্গে আসার সময়। দেবী মনসার মধ্যে মৃত্যুর জগতের অধিকার ও পাতালপুরীর বিভিন্ন শক্তি, black magic, witch craft প্রভৃতির সূত্রেও ব্যাখ্যা করা যায় কিনা প্রথমে দেখতে হবে সেই সম্ভাবনার কথা। তখন মনসামঙ্গলের myth বিশ্লেষণ পূর্ণাঙ্গ হতে পারবে।

W. L. Smith তাঁর *One-Eyed Goddess* নামক গ্রন্থে মনসার কাহিনী বিশ্লেষণ করেছেন। তবে তিনি মনসার উক্ত সমস্যাগুলি ঠিকমতো বুঝেছেন বলে মনে হয় না। তাঁর বর্ণনা : ....'When myth makers sought to associate newer deities with the cults of older ones by establishing familial ties, the newcomers were usually not presented as direct issue but as born in extracorporeal manner. The best known examples of this are the two sons of Siva and Parvati. Kartikeya and Ganesa, about whose miraculous births a number of myths have been recorded.' (*One Eyed Goddess* : Upasala, Sweden, 1980, 51 পৃ.)—নিছকই সহজ এই আলোচনা। এই আলোচনায় myth-maker-দের মধ্যে কে আগে কোন দেবতার সঙ্গে কার সম্পর্ক রচনা করতে চাইছেন, তার উদ্দিশ পাওয়া যায় না। অবশ্য পশ্চিমা গবেষকরা, তাঁদের তথ্য বিচার করার ক্ষেত্রে যতই চমৎকারিত্বের পরিচয় দিন—তাঁদের রচনা শেষ পর্যন্ত কোন মৌলিক বিশ্লেষণের অভিমুখী না হওয়ারই কথা। আমাদের দেশজ পুরাকথা বোঝার জন্যে আমরা নিজেরাই বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োগ করবো না কেন?

এডওয়ার্ড সি. ডিমোক বরং মনসামঙ্গলের তাৎপর্য বিচারের সূত্রটি যথাযথভাবে ধরতে পেরেছেন বলে মনে হয়। তিনি লিখছেন—'Variation comes with the attempt to separate layer from layer of elements of myth.' (*Manasa—Goddess of Snakes*; E. C. Dimock, The University of Chicago, Committee of South east Asian Studies, Reprint Series no. 13, History of Religions, Winter 1961, 307 পৃ.)। আমরাও মনসামঙ্গল কাহিনীর কিছু স্তরের পরিকল্পনা করতে পারি। আদিস্তরে মনসা আর নেতা ভিন্ন উৎস থেকে আগত দেবী হতে পারেন ; পরে তারা একাকার হয়েছেন। মনসার উৎসে দুটি প্রবল সম্ভাবনা আভাসিত হয়।

১. যোগ ও তন্ত্রের 'হুঙ্কার'—নাদ—বায়ু সাধনার ইঙ্গিত।

২. আদিদেব আদি দেবীর পরিকল্পনা।

প্রথমটি বাংলার নিজস্ব ক্ষেত্র। দ্বিতীয়টি আন্তর্জাতিক। এবং বলা নিষ্প্রয়োজন এই দ্বিতীয় স্তরটিই আদি।

সাড্রা বিলিংটন ও মিরান্ডা গ্রিন সম্পাদিত *The Concept of the Goddess* গ্রন্থে খ্রিস্টধর্মের প্রভাব বৃদ্ধির আগে সমস্ত ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যের আদি দেবী (মহাদেবী তথা Great Mother Goddess)-দের বিষয়ে আলোচনা আছে। দেখানো হয়েছে এই সব দেবী প্রায়ই নারী-প্রধান সমাজ ব্যবস্থার প্রতীক-পরিচয় বহন করছে। জুলিয়েট উডের প্রবন্ধে দেখছি : 'history and mythology reflect the1996 conflict between patriarchal and matriarchal cultures coincides with an important stream in modern Goddess-studies.' (*The Concept of the Goddess* ; উক্ত 10 পৃ:)। আদি রূপটি আড়াল হয়ে গেলেও প্রায়ই এইসব দেবী-ভাবনা নতুন সমাজ-প্রক্রিয়ার সঙ্গে মিলিয়ে নিতে নিতে অগ্রসর হয়েছেন। জুলিয়েট

উড একে বলেছেন—'revitalization.' তাঁর মতে এমনি করে নতুন নতুন বিষয়কে আয়ত্ত করার মধ্য দিয়েই এইসব দেবতার ব্রতধর্ম সমাজক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়েছে। 'An actual Goddess-religion in the past is the basis for revitalization in the future.' (ঐ ; 22 পৃ :)। কখনো তারা মৃত্যুর নিয়ন্ত্রক ('death massenger') কখনো তারা জলধারার অধিকর্ত্রী ('water-gardian'), কখনো তারা মৃত রাজপুরুষের সঙ্গী ('mystical spouse') তাদের দ্রুত রূপান্তরিত হবার ক্ষমতা বিখ্যাত—তারা 'apears in a number of guises' (Potricia Lysaght-এর লেখা *Aspects of the Earth Goddess in the Traditions of the Banshee in Ireland* ; উক্ত ; 161 পৃ.)।

॥ ১৮ ॥

বিবর্তনের প্রেক্ষিত : মনসা-পুরাকথা (myth)

মনসাদেবীর myth প্রসঙ্গে আলোচনা করে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের Ph. D. উপাধি অর্জন করেছেন— ড. প্রদ্যোতকুমার মাইতি। তাঁর গ্রন্থ ইতিহাসের দৃষ্টিকোণে রচিত—*Historical Studies in the Cult of the Goddess Manasa (A Socio-Cultural Study)*। সেই সুলিখিত সুবিন্যস্ত গ্রন্থে ড. মাইতি দেবীর স্বরূপ নির্ণয় করেছেন, কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করে :

১. উর্বরতাদাত্রী দেবী (Fertility Goddess)
২. রোগ নিরাময়কারিণী দেবী (Cures of diseases)
৩. বৃষ্টিদাত্রী (Rain-giver)
৪. ধনদাত্রী (Wealth-giver)
৫. অভিভাবিকাদেবী (Tutelary Goddess)
৬. গ্রাম দেবী (Village Goddess)
৭. পরিবারের রক্ষয়িত্রী দেবী (Worshipped for the general welfare of the family)
৮. শিশু রক্ষয়িত্রী দেবী (as the protector of children)

উক্তগ্রন্থে তিনি দেবীর এই আট রকম বৈশিষ্ট্য দেখাতে গিয়ে কখনো কখনো ক্ষেত্রসমীক্ষার সাহায্য নিয়েছেন। মনে হয় ড. মাইতির সন্ধান এই ক্ষেত্রে অন্তত গুরুত্বপূর্ণ—তিনি সিদ্ধান্তে এসেছেন বস্তুগত উপাদান ব্যবহার করে। (সূত্র : *Historical Studies in the cult of the Goddess Manasa* ; পুঁথি পুস্তক, কলকাতা, ১৯৬৬, পৃ. 269-277 পৃ.)।

১৮.১ প্রথম স্তর : নারী পৌরোহিত্য

আমরা যে সূত্রে মনসার জন্মকথা খুঁজে তুলনা করে তার অর্থ ও তাৎপর্য ভেদ করতে চাই তার প্রথম বর্গ— নারী পৌরোহিত্য ও পরবর্তীকালে revitalization-এর ফল হিসেবে পুরুষ পৌরোহিত্য ; স্বভাবতই মধ্যপর্বে নপুংসক পৌরোহিত্য সম্পর্কে অভিমত পেশ করতে হচ্ছে। মনসার পূজা পদ্ধতি মনসা নিজেই জানাচ্ছেন, এমন বর্ণনা অনেক। কয়েকটি বিবরণ স্মরণ করি।

১. রাখালদের মধ্যে :

নেতো বাম পাশে   আইলা হরিষে
ডাকিয়া রাখালে বলে॥

সদয় হৃদয় বলে মনসায়
শুন সব শিশুগণ।
হইয়া একমতি করিয়া প্রণতি
পূজহ মনসা-চরণ॥ (৩. ১৫. ৩১৮-১৯)

২. হাসন রাজার কাছে :

হাসিয়া বলেন পদ্মা শুনরে হাসন।
আমি যেই মতে বলি করহ পূজন॥ (৫.৭.৭৯)

৩. জালুমালুরা সর্বাঙ্গ লুটিয়ে ভক্তি ও স্তুতি করার পর :

হাসিয়া বলেন আমি মনসা কুমারী।
অধিষ্ঠান হৈলু তোরে সুবর্ণের বারি॥
বর মাগ দুই ভাই আমার গোচর।
ঘরে লৈয়া বারি পূজা করহ সত্বর॥ (৫.১০. ২১১-১২)

দেবী আর দেবীর পুরোহিত এখানে একাকার। ড° সুজিৎ চৌধুরী এরকম ঘটনার বিবরণ কিছু দিয়েছেন। এরা হলেন 'দেবীর মানবী প্রতিভূ অথবা প্রধানা পূজারিণী' (ড. সুজিৎ চৌধুরী : *প্রাচীন ভারতে মাতৃ-প্রাধান্য : কিংবদন্তীর পুনর্বিচার* ; গ্রন্থভুক্ত 'সাবিত্রী-সত্যবান : কিংবদন্তীর পুনর্বিচার' শীর্ষক প্রবন্ধ ; প্যাপিরাস ; প্রথম সংস্করণ ; মে ১৯৯০ ; ২৯ পৃ.)। বিশিষ্ট গবেষক ক্ষেত্রসমীক্ষক ড. মানিকলাল সিংহ বাঁকুড়া ও তার পাশাপাশি অঞ্চলের যেসব দেবীর নাম 'সিনি'-যুক্ত তেমন দেবীদের উৎস হিসেবে তাদের পূজারিনী তথা 'দেয়াসিনী'দের সম্পর্কিত করে বিশ্লেষণ করার পক্ষপাতী। (পশ্য : 'ষষ্ঠী ও সিনি' : মাণিকলাল সিংহ ; সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ; ১৩৬০)। মেদিনীপুরের ঘাঘরাসিনি-র মেলায় প্রচুর জনসমাগমের কথা প্রসিদ্ধ।

প্রাথমিকভাবে এরা বাংলার প্রান্তবর্তী আদিবাসী সমাজের দেবী হলেও বাঁকুড়ার ছাতনা, ওন্দা, পাঁচাল, মেদিনীপুরের বেলপাহাড়ীর নিকটবর্তী তারাফেনী নদীর তীরবর্তী ঘাঘরা গ্রাম, গড়বেতা এবং হুগলী জেলার করাপাটের দেবীরা ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতির অন্তর্গত হয়ে গেছেন। (সূত্র: *বাংলার লৌকিক দেবতা* : গোপেন্দ্র কৃষ্ণ বসু ; 'দে'জ পাবলিশিং , কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৯৪ ; ১৬৫-৬৬ পৃ.)। আমাদের ধারণা ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির বাতাবরণে কোন কোন সিনি-দেবতার নামে এসেছে পুরাণ-কৃষ্টির আভাস। দুয়ারবাসিনী (বেগুনকোদর, পুরুলিয়া), পলাশবাসিনী (ফুল্লাইপুর, বীরভূম), বিন্ধ্যবাসিনী (শবল আড়া, মেদিনীপুর) প্রভৃতি হয়ত আদিতে সিনি-দেবীই ছিলেন। (সূত্র : ড. মিহির চৌধুরী কামিল্যা : *রাঢ়ের গ্রাম দেবতা* ; বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় ; বর্ধমান ; ১৯৮৯ ; ১৩৭ পৃ. :)। বস্তুত এই দেবীদের সঙ্গে তাদের পূজারিনীদের সম্পর্কের নিবিড়তা যত স্পষ্ট— মনসার ক্ষেত্রে ততটা স্পষ্ট নয়। একটু ভাবলেই মনসার পূজা প্রচারের ক্ষেত্রে বিধবা বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর বেশে স্বয়ং উপস্থিতির ক্ষেত্রে নারী পৌরোহিত্যের ভূমিকাটি অনুধাবন করা যায়। মনসা সম্পর্কিত পুরাকথার এই হল বিবর্তনের প্রথম স্তর।

পাশাপাশি শত্রুতামূলক আচরণের সময় মনসার উপস্থিতিতেও নারী-পুরোহিত তথা witch craft-এর স্মৃতি পাওয়া যেতে পারে। আমার একটি প্রবন্ধে এ নিয়ে কিছু কথা লিখেছি—'নারী পৌরোহিত্যের বাস্তব ভিত্তি কিন্তু নারী-প্রধান সমাজে।' এবং 'বৃদ্ধা বেশে দেবীরা পূজা পাবার জন্য প্রায় যাযাবর হয়েছেন, বললেও অত্যুক্তি হয় না।' ('নারী পৌরোহিত্য : বাংলার সমাজ

ইতিহাসের একটি প্রাক সূত্রের সন্ধান'—অচিন্ত্য বিশ্বাস ; ভাগীরথী ; মানকর ; বর্ধমান ; ১৯৮৮ খ্রি.)। অভিচারমূলক প্রক্রিয়াও পাওয়া যায় প্রচুর—যেগুলি থেকে মনসার ধ্বংসাত্মক গুণটি স্পষ্ট হয়। কতকগুলি উদাহরণ দেব।

১. চণ্ডীর প্রতি বিষ দৃষ্টিতে তাকানোর পরে :

বিষ দৃষ্টে বিষ বর্ষে চণ্ডীর উপর।
ঢলিয়া পড়িল চণ্ডী উত্তর শিয়র॥ (১.১২.৩০৯)

২. পরেও অনুরূপ অবকাশে :

ক্রোধে বিষ-দৃষ্টে চাহে দেবী বিষহরি।
ঢলিয়া পড়িলা তথা দেবী মাহেশ্বরী॥ (৩.৮.৯৭)

৩. হাসন হাটির তুরুকদের আক্রমণ করার সময় :

মনসা বলেন ডাকি শুন বিঘতিয়া।
বধহ তুড়ুক সব জনেক রাখিয়া॥ (৪.১৬.৩৬৪)

৪. চাঁদের নখরা-বাগানটি ধ্বংস করার সময়ও মনসার ভূমিকা প্রত্যক্ষ :

রথ ভরে বিষহরি প্রবেশে চাঁদোর পুরী
দাঁড়াইয়া নাখরা নিকটে।
আজ্ঞা দিল নাগদলে সভে ধায় কুতূহলে
অজস্র ধরি রম্য বন কাটে॥ (৬ ১২.৩৫৫)

৫. সঙ্ক ধন্বন্তরীকে হত্যা করতে গিয়ে দংশন করতে দ্বিধা করতে থাকায় মনসা উদয়কাল নাগকে ভয় দেখিয়েছেন :

শুনিয়া সভয় নাগ হৈল ক্রোধমুখি। (৬.১৪.২৬৬)

৬ চাঁদের মধুকর ডিঙ্গা কালিদহে ডুবিয়ে দেবার সময় মনসা হনুমানকে ডেকে বলেছেন:

মনসা বলেন শুন পবন কুমার।
অখন বাধব চাঁদো শুনহ উত্তর॥
এথা আমা পূজে যদি চাঁদো নৃপবরে।
সকল বুহিত্রদিয়া পাঠাবো দেশেরে॥ (১০.১১: ১৬০-৬১)

মনসার এই উপস্থিতি আরও স্পষ্ট হয়েছে লখিন্দর-বেহুলার বিবাহ ও বেহুলার ভাসান যাত্রার সময়। বৃদ্ধা বেশে বেহুলার সঙ্গে মুকতা-সরোবরে সাক্ষাৎ-দ্বন্দ্ব, বিবাহ মঞ্চে মনসার উপস্থিতি, ভাসান যাত্রায় বারবার বেহুলাকে সহায়তা করা—প্রভৃতি প্রায় সর্বত্র মনসার উপস্থিতি নারী-পৌরোহিত্যের ইঙ্গিতবাহী। নেতিবাচক শক্তি প্রয়োগের এই প্রবণতা মনসার দেবী সত্তাটি সনাক্ত করতে সাহায্য করে।

জগজ্জীবন ঘোষালের মনসামঙ্গলের সূত্রে আমরা দেখিয়েছি— দেবী মনসার জন্ম ও বিবাহের ক্ষেত্রে একটি সমস্যা গড়ে ওঠে। ফ্রয়েড একে বলেছেন—অজাচার। আদিম সমাজগুলিতে পরিবার সংগঠন ও যৌন সম্পর্কের বিভিন্ন বিধিনিষেধগুলি গড়ে উঠেছে ঠিক এইখান থেকে। ফ্রয়েড লিখেছেন : 'পিতৃদেবের স্থানে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার জন্যে পুত্রের চেষ্টা উত্তরোত্তর পরিস্ফুট হতে দেখা যায়। কৃষিকার্য প্রবর্তনের সঙ্গে পিতৃশাসনাধীন পরিবারে পুত্রের কদর বেড়েছে। সে তার অজাচার লিবিডোকে নতুনভাবে প্রকাশ করতে সাহসী হয়েছে ; মাতৃভূমিতে কৃষিকাজ করার মাধ্যমে যা, প্রতীক ভোগসুখ সে তা অর্জন করেছে। এইভাবে Attis,

Adonis, Tammuz এবং অন্যান্য দেবরূপের সৃষ্টি হয়েছে ; এছাড়া উদ্ভিদেরা পেয়েছে প্রাণ এবং সেই সঙ্গে তরুণ দেবত্ব। এরা সকলেই মাতৃবৎ দেবীদের প্রশ্রয় উপভোগ করেছে এবং পিতাকে উপেক্ষা করে মাতার সঙ্গে অজাচারিতা করেছে। কিন্তু এইসব সৃষ্টির মাধ্যমেও যেসব অপরাধবোধ দূর হয়নি তা অতিকথার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। এইসব অতিকথার মধ্যে মাতৃরূপী দেবীদের তরুণ প্রেমিকরা অকাল মৃত্যু বরণ করেছে এবং উপস্থচ্ছেদন করে কিংবা পশুর আকৃতিধারী পিতৃরূপ দেবতার ক্রোধের দ্বারা শাসিত হয়েছে। Aphrodite-র পবিত্র পশু শূকর হত্যা করেছে Adonis-কে, Cybele-এর প্রেমাস্পদ Attis-এর মৃত্যু হয়েছে উপস্থচ্ছেদনের ফলে।' (*টোটেম ও টাবু* : সিগমুণ্ড ফ্রয়েড ; অনুবাদ— ধনপতি বাগ ; সুবর্ণরেখা; কলকাতা ; ১৯৯৩ ; ১৩০ পৃ.)। আমাদের মনে পড়ছে জগজ্জীবনের বর্ণনা, যেখানে মনসার সঙ্গে মিলিত হবার সময় ধর্মঠাকুর (যিনি একাধারে তার পিতা ও স্বামী—যে কারণে তাঁর অজাচার মনসার পছন্দ হয় নি) অষ্ট অঙ্গুল পরিমিত লিঙ্গচ্ছেদ করেছেন—উপস্থছেদন নয়, এই লিঙ্গচ্ছেদন আমাদের কাছে—আত্মশাসন বলে মনে হয়। দেবী মনসার মহাদেবীত্ব এভাবেও প্রমাণ করা যায় বোধ করি। তিনি এমন এক দেবী যার পুরুষ সঙ্গী প্রয়োজন নেই, যাকে কামনা করলে পুরুষের ক্ষতি অনিবার্য আর যার সঙ্গী নারী বা নপুংসক। এসবের অতিরিক্ত তথ্য এই যে, মনসা বাংলার সমস্ত মনসামঙ্গল কথাতেই পুরুষ সঙ্গী নিরপেক্ষভাবেই সন্তান জন্ম দেবার ক্ষমতা রাখেন। সন্তানের জন্ম দেবার পরও পুরাণ কথায় অনেক সময় নায়িকারা সর্বজনসমক্ষে কুমারী বলে গণ্য হয়েছেন— দেশে বিদেশে তেমন বহু কাহিনী লক্ষ করি। সত্যবতী (ব্যাস দেবকে জন্ম দেবার পর), কুন্তী (কর্ণের জন্ম হবার পর), মেনকা (শকুন্তলাকে প্রসব করার পর) এবং মেরী (যীশুকে জন্ম দানের পর) কুমারী থেকে গেছেন। এসবের পেছনে অজাচার, অবৈধ প্রণয় সম্ভাবনার কিছু ইঙ্গিত থাকার কথা পুরাণ-বিদরা স্বীকার করবেন। প্রকৃতপক্ষে আদিম নারী পৌরোহিত্য সম্পর্কিত ভাবনার সূত্র এসব কাহিনী নির্মাণের সঙ্গে বিবেচ্য বোধ হয়। মনসার ক্ষেত্রেও তার স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। তার সঙ্গে জরুৎকারুর মিলন হয় নি— বিবাহ রাত্রে জরুৎকারু মরেছেন, মনসা তাকে বাঁচাবার পর লোকানুরোধে আস্তীক (বা অষ্টনাগ)-এর গর্ভসঞ্চারের কথা জরৎকারুর মুখে বসানো হয়েছে। তার নপুংসক সঙ্গী ধামাই— চাঁদের কুবাক্যে তাই তিনি 'ধামনা ভাতরী'। কবিরা তাকে 'মনসা কুমারী' বলেছেন— এর রহস্য ভেদও হতে পারে এইভাবে।

অর্থাৎ তিনি হয়ে উঠেছেন চিরকুমারী ও জননীসত্তা— ধরিত্রী দেবীর শস্যোৎপাদন শক্তির সঙ্গে তাকে পরে মিলিয়ে নেওয়া হয়েছে।

আফ্রোদিতে-র প্রেমিক তরুণ এডোনিস—বন্য শূকর কর্তৃক নিহত হয়। পরে প্রসারপাইন তাকে ছ'মাস ভোগ করার শর্তে বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন। এই myth-টির সঙ্গে মনসামঙ্গল কাহিনীর মিল খুব স্পষ্ট। ছ'মাস ভোগ শস্যের আবর্তন চক্র ছাড়া কিছু নয়। প্রসারপাইন হলেন কৃষিকর্মের দেবী সিরিজের কন্যা। বস্তুতপক্ষে এ্যাডোনিস প্রসারপাইনের মিলন শরৎকালীন শস্য উৎপাদনের পূর্বশর্ত। বেহুলা-লখিন্দরের 'ছয় মাসিয়া পথ' পার হয়ে বিপুল সম্পদভার নিয়ে ফেরার কাহিনী—এই রকমই একটি অতিকথা ছাড়া কি? এ বিষয়ে আমাদের আবার ফিরে আসতে হবে—বেহুলা-লখিন্দর-চাঁদ সদাগর কাহিনীর বিশ্লেষণের সময়।

সমাজে পিতা-পুত্রের আদিম দ্বন্দ্বের বেশ কতকগুলি চিত্র ও তার ফলে পুত্রের মনে অপরাধবোধ, মাতৃগমনের (অজাচারের) আকাঙ্ক্ষা বেশ কিছু প্রত্ন-পুরাণের (myth) জন্ম

দিয়েছে। বাংলায় এমন একটি দ্বন্দ্বের কথাচিত্র মনসামঙ্গলে পাওয়া গেল। গোঁসাই-এর স্ত্রী মনসা তার পুত্র শিবকে বিবাহ করছেন—গোঁসাই তার শরীরের একাংশ শিবের মুখ দিয়ে তার উদরে প্রবেশ করাচ্ছেন, এই অতিকথা— উক্ত বৈশিষ্ট্যের দ্যোতক বলে মনে করি। বাংলার প্রচলিত মনসা কথায় দেখি মনসার রূপে মুগ্ধ হয়েছেন শিব :

মনসা দাঁড়াইলা মহাদেবের অগ্রেতে।
দেখিয়া লোভিত হর চাহে কাম চিত্তে॥
ভয় পাইলা মনসা কহেন পূর্বকথা।
আমি সে তোমার পূজা তুমি মোর পিতা॥ (১০.২০ ২৭৭ ৭৮)

এত কথার পরও মনসাকে নারী রূপেই দেখেছেন শিব। করণ্ডীর ভেতর লুকিয়ে রক্ষা করার অন্য কি কারণ থাকতে পারে? চণ্ডীর তীব্র অভিযোগও মনে পড়তে পারে :

বাপের সহিত রতি ভুঞ্জ নিরন্তরে।
লুকাইয়া রাখে আজি পুষ্পের ভিতরে॥ (১.২২.৩০৪)

১৮.২ দ্বিতীয় স্তর : নপুংসক পৌরোহিত্য

ধর্মঠাকুরের মুষ্কোচ্ছেদকে উপস্থচ্ছেদ বলে মনে করি না কেন সেকথা লিখব। ফ্রয়েড লিখেছেন আধুনিক সমাজে উপস্থচ্ছেদ বা সুন্নত প্রথা সুপ্রাচীন সমাজের পিতাপুত্র দ্বন্দ্বের ও অজাচার সংক্রান্ত অপরাধবোধের প্রতীকি শুদ্ধীকরণ প্রণালী। আমি এ বিষয়ে সামান্য সন্ধান বিশ্লেষণ করে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম—'সখীভাবের সাধনা : একটি সম্ভাব্য উৎস সন্ধান'। আমার সন্ধানে বেশ কিছু দেশী বিদেশী প্রসঙ্গ আছে—পবিত্রতা, পরিশুদ্ধি, পাপ-নিয়ন্ত্রণ ও পুরোহিত হবার পূর্বশর্ত হিসাবে মুষ্কোচ্ছেদ করার বেশ কিছু ঘটনা রয়েছে।

১. সিবিলির পুরোহিতরা নপুসংক হবার জন্যে মুষ্কোচ্ছেদ অনুষ্ঠান করতেন। 'Castration as an adjunct of excusive religious zeal is a very old phenomenon indeeding dating back to the culf of cybele.' (Man, Myth and Magic *The Illustrated Encyclopedia of Mythology, Religion and the Unkhnown*, Cavendish Marshall– সম্পাদিত , নিউইয়র্ক ; দশম খণ্ড 2593 পৃ.)।

২. বাইবেলে বলা হয়েছে নপুংসকরা নাকি স্বর্গবাস কবার যোগ্যতর উত্তরাধিকারী—'And there are eunuchs who had themselves 'eunuchs for the shake of the kingdom of heaven.' একটা সময় গোটা ইউরোপে নপুংসকরা ধর্মযাজক হিসেবে জীবন-অতিবাহিত করতেন। অনেকে স্বয়ং লিঙ্গচ্ছেদও করতেন। Council of Nicaca —এই কৃত্রিমভাবে নপুংসক হবার রীতি একটি আইন প্রণয়নের মাধ্যমে ৩২৫ খ্রি নিষিদ্ধ করেছিল। তবে তার পূর্বে এই রীতিটি দীর্ঘদিন ধরে চলছিল বলে মনে হয়। পঞ্চম শতাব্দীর শেষদিকে (৪৮৯ খ্রি.) একজন ধর্মযাজকের বিরুদ্ধে অন্যায় যৌনাচার সম্পর্কে অভিযোগ ওঠে। তখন ঐ যাজক নিজেকে নিষ্পাপ প্রমাণ করার জন্য অদ্ভুত উপায় গ্রহণ করেন। তিনি 'Proved his innocence of charges of formication brought against him at a church conference by visually demonstrating to his accusess his inability to perform the sexual act because he was a eunuch.' (Man, Myth and Magic.... ; উক্ত; সপ্তম খণ্ড ; 1915 পৃ.)।

৩. ভূমধ্য সাগরের তীর বরাবর Astrate নামক সুপ্রাচীন এক দেবীর মন্দিরের বিবরণ শোনাই— 'Her temples were served by sacred prostitutes and eunuchs.' (Man, Myth and Magic..... ; উক্ত ; সপ্তম খণ্ড ; 1915 পৃ.)।

৪. রাশিয়ার উত্তরদিকে 'Skoptsy' নামে এক বিশেষ ধরনের খ্রিস্টধর্মাবলম্বী দলের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে— অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই দলের গুরু কেন্দ্রতি সেলিভাশেভ মাত্র ছাব্বিশ বৎসর বয়সে মুষ্কচ্ছেদ করেন। 'He said that to attain total purity and finally remove any possibility of sin, he must make himself perfect example to his followers.' (Man, Myth and Magic..... ; উক্ত ; দ্বাদশ খণ্ড ; ২৫৯৪ খ্রি.)।

ড. সুজিৎ চৌধুরী তাঁর 'বৃহন্নলা : উৎস এবং পটভূমি' প্রবন্ধে আরও কিছু অনুরূপ উদাহরণ দিয়েছেন। তাঁর বর্ণনা থেকে অনুরূপ কিছু দেবী ও পুরোহিত সম্পর্কে উল্লেখ করি।

৫. পশ্চিম এশিয়া ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের একাধিক দেবীর পুরোহিত ছিলেন নপুংসক। ফ্রিজিয়ার দেবী সিবিলিকে রোমানরা নিজেদের দেবী হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছিল ২০৪ খ্রিস্টপূর্বাব্দে। এই পর্যায়ে সিবিলির পুরোহিতরা ছিলেন নপুংসক। (*প্রাচীন ভারতে মাতৃপ্রাধান্য: কিংবদন্তীর পুনর্বিচার* : উক্ত ; ৬৪ পৃ.)।

৬. 'গ্রীক আর্টেমিস এবং সিরিয়ার আসটার্টে (সৈথার) একইভাবে নপুংসকদের দ্বারা পূজিত হতেন। এই সমস্ত পুরোহিতরা অবশ্য....... জন্মসূত্রে নপুংসক ছিল না, পূজারী সম্প্রদায়ে অনুপ্রবিষ্ট হওয়ার আগে এদের অঙ্গচ্ছেদ করা হতো।' (ঐ ; ৬৫ পৃ.)।

৭ 'রেড ইন্ডিয়ানদের কোনো কোনো দেবীরও নপুংসক পুরোহিত ছিল, এদের অঙ্গচ্ছেদ হতো নিতান্ত শৈশবে।' (ঐ)।

উক্ত প্রবন্ধে ড. চৌধুরী অসমের এক লোকদেবীর পুরোহিতদের সংবাদ দিয়েছেন— দেবীর নাম ডরাই ; পুরোহিতদের 'গুর্মা' নামে অভিহিত করা হয়— এরা জন্মসূত্রে নপুংসক। ডরাই শ্রীহট্ট কাছাড় অঞ্চলের মৎস্যজীবীদের মধ্যে পূজা পান। এই দেবী প্রচণ্ডভাবে জনপ্রিয় তথাকথিত নিম্নবর্ণের মধ্যে, যদিও বিশেষ ক্ষেত্রে উচ্চবর্ণের লোকেরাও এ পূজায় অংশ নেন। দেবীর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, নপুংসক ব্যতীত অন্য কেউ তার পূজায় পৌরোহিত্যের অধিকারী নন। এই নপুংসক পুরোহিতকে স্থানীয় ভাষায় বলা হয় 'গুরমা'।

'মুখ্যত সন্তান-কামনায় ডরাই পূজার অনুষ্ঠান হয়। চতুর্ভুজ দেবী রক্তবর্ণা এবং সম্পূর্ণ নগ্নিকা। দেবীর একহাতে পদ্ম, এক হাতে শঙ্খ, এক হাতে সাপ এবং চতুর্থ হাতে তার লজ্জা নিবারণ করছে। একটি কচ্ছপ, তার ওপর একটি কলসী, সেই কলসী থেকে দেবী উত্থিত। দেবী পূজায় কোনো নির্দিষ্ট তিথি নেই, তবে যে কোনও মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিই বিধেয়।.....

'রাত্রিব্যাপী গুরমার নৃত্য এ পূজার আবিশ্যিক অঙ্গ। গুরমা তার নাচ-গানের দল নিয়ে আসে। তার পরনে নারীর পোশাক, অঙ্গে নর্তকীর সজ্জা, হাতে থাকে চামর। তার সঙ্গীরা সবাই স্বাভাবিক পুরুষ। নাচ শুরু হয় ছন্দোবদ্ধভাবে মৃদঙ্গ ও করতালের সংযোগে, কিন্তু রাত গভীর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাজনার ছন্দ বদলে যায়, নাচও উত্তাল হতে থাকে। একেবারে শেষ পর্যায়ে উন্মত্ত অশ্লীল অঙ্গভঙ্গির মধ্যে নাচ শেষ হয়।' (ঐ : উক্ত ; ৬২ পৃ.)।

নপুসংক পৌরোহিত্যের এই আধুনিক বিবরণটি দেবার পর ড. চৌধুরী জানাচ্ছেন—এই ডরাই দেবী ছাড়াও মনসামঙ্গল গানের ক্ষেত্রে 'গুর্মা' (সুজিৎবাবুর বানান—'গুরমা')-দের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর ভাষা : 'মনসাপূজার সময় রাত্রিব্যাপী যে মনসামঙ্গল গানের অনুষ্ঠান

হয়, সেখানেও তাদের সেই নর্তকীর বেশ, সেই চামরের ব্যবহার— তবে অশ্লীলতার মাত্রা এখানে অনেক কম থাকে, সঙ্গীত এবং নৃত্যাংশও অনেকখানি শিল্পসম্মত। এই সূত্রে গুরমারা আবার সর্পাঘাতের চিকিৎসক, তাই মনসামঙ্গল অনুষ্ঠানে তাদের অভিধা হয় 'ওঝা'। এই সঙ্গীতানুষ্ঠানের স্থানীয় নাম ওঝাগান অথবা পদ্মাপুরাণ গান। মনসাপূজার পৌরোহিত্য অবশ্য গুরমাদের ভূমিকা নেই, কিন্তু ওঝাগানে তাদেব অগ্রাধিকার স্বীকৃত।' (ঐ · উক্ত ; ৬৬ পৃ.)। ডরাই আর মনসাদেবীর সম্পর্ক কিছু থাকতে পারে। মনসাপূজার অন্যতম পূজক সম্প্রদায় মৎস্যজীবীরা। ডরাই-এর পূজা করে মৎস্যজীবীরাই। ড. চৌধুরীব বিশ্লেষণ · 'মৎস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যেই জলদেবী হিসেবে তাকে পূজা করা হতো। তার উর্বরতাশক্তি প্রথমে জলেই কার্যকব বলে ভাবা হতো, পরে অন্যান্য সম্প্রদায়-কর্তৃক গৃহীত হওযাব ফলে তার ক্ষমতার পবিধিও বিস্তৃত হয় এবং সাধারণভাবে উর্বরতা-শক্তির দেবীতে তিনি উন্নীত হন।' (ঐ : উক্ত ; ৬৩-৬৪ পৃ.)

মনসার ক্ষেত্রে একই রকম বিষয় লক্ষ করা যায়। চাঁদ সদাগরের পিতৃ-শ্রাদ্ধ (বাৎসরিক অনুষ্ঠান—'গুরুকৃত্য') উপলক্ষে মাছ ধরতে গিয়েছিল জালু ও মালু। মনসাকে গঞ্জনা করায তারা এক প্রহর জাল ফেলেও মাছ পায়নি একটাও :

প্রহরেক জাল এড়ে মৎস্য নাহি পায়। (৫.১০.১৯৯)

এরপর মনসার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করার পর ঘটল চমৎকাব .

চরণে প্রণতি করি জাল ফেলে জলে।
তুলিতে না পারে এত মৎস্য পড়ে জালে॥ (৫.১০.২০৭)

সুন্দরবন অঞ্চলের 'খাল কুমারী' নামের যে দেবী তার কথা লিখেছেন ড. গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু-ইনি মৎস্যদেবীদের দ্বারা পূজিতা হন। (*বাংলার লৌকিক দেবতা* ড. গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু, দে'জ পাবলিশিং , কলকাতা , ১৯৭৮ ; ২৩ পৃ.)। ডরাইয়েব সঙ্গে খাল কুমারীর কোন সম্পর্ক আছে কিনা জানি না। ডরাই-এর সঙ্গে মনসার সম্পর্ক নির্ণীত হচ্ছে এব পুরোহিত কিংবা গান-নাচ পরিচালক গুর্মাদের মারফৎ। তাছাড়া ডরাইয়ের পূজাতিথিও মনসার মতো- -পঞ্চমী. *বঙ্গীয় লোকসঙ্গীত রত্নাকর*-এর ২য় খণ্ডে আশুতোষ ভট্টাচার্য 'ডরাই বিষহরির গান' নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন : 'তাঁহার নাম ডরাই বিষহরী হইলেও বিষহরী বা মনসার সঙ্গে তাহাব প্রকৃত কোন সম্পর্ক নাই ; তিনি প্রকৃতপক্ষে ভয়ডরের দেবতা। 'ডরাই বিষহরি' র মানসিক পূজা উপলক্ষে হিজরার গান হয়। হিজরার গানই ইহার মূল বিষয়।' (*বঙ্গীয় লোকসঙ্গীত রত্নাকর*, আশুতোষ ভট্টাচার্য ; দ্বিতীয় খণ্ড ; এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রা. লি , কলকাতা; ১৯৭৭ , ৮৪৭ পৃ.)। আশুবাবু এই গানের তাৎপর্য বুঝতে পারেননি—বলাই বাহুল্য। আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি 'ডরাই-বিষহরি' নাম থেকেও প্রমাণিত হচ্ছে, ডরাই দেবীর সঙ্গে মনসার নিবিড় সম্পর্ক আছে।

'শ্রীহট্ট-কাছাড় অঞ্চলে গুরমা বা নপুংসক পুরোহিতরা উত্তর বা পশ্চিম ভারতের হিজড়েদের মতো যূথবদ্ধ জীবন-যাপন করে না। পরিবার সম্পৃক্ত তাদের একক জীবনযাত্রা অনেকখানিই স্বাভাবিক।' একথা লিখেছেন সুজিৎবাবু (*প্রাচীন ভারতে মাতৃ-প্রাধান্য কিংবদন্তীর পুনর্বিচার* : উক্ত ; ৬৪ পৃ.)। তিনি একটি বিষয় খেয়াল করেননি। উত্তর-পশ্চিম ভারতে নপুংসকদের প্রধানের নাম 'গুর্মা'। ড. ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক সঙ্কলিত তথ্যের সূত্রে এই সংবাদটি জানা আছে : 'দলের নেতা', 'গুরুমার মৃত্যুর পর যে পরবর্তী নেতা হবে তার হাতে গুরুমার যাবতীয় টাকাকড়ি

জিনিসপত্র তুলে দেওয়া হবে।' (*অপরাধ জগতের ভাষা* ; নবভারত পাবলিশার্স; কলকাতা; আশ্বিন ১৩৭৮ ; ৩১ পৃ.)। সুতরাং একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে, উত্তর-পশ্চিম ভারতের নপুংসক কৃষ্টির কোন টুকরো ছিন্ন মূলচ্যুত রূপ (বিপরীতও হতে পারে) শ্রীহট্ট-কাছাড়ের গুর্মারা বহন করছে। আর একটি কথা, স্বাভাবিক নপুংসক ছাড়াও হিজড়াদের মধ্যে মুষ্কছেদনের রীতি লক্ষ্য করা যায়। আবার ভক্তিবাবুর সংগৃহীত তথ্য উদ্ধার করছি : 'এমন হিজড়াও রয়েছে যারা লিঙ্গচ্ছেদন করিয়েছে। লিঙ্গচ্ছেদেন হিজড়া সমাজে একটি উৎসব বিশেষ। ছেদন কার্য সচরাচর দলপতি করে থাকে। ছেদক হাত পেতে ধরে, হাতে একমুঠে টাকাকড়ি দিতে হবে,— সেই সঙ্গে একশো টাকা মজুরী। লিঙ্গ অপসারণের পর রুগীকে চব্বিশ ঘণ্টা জাগিয়ে রাখা হয়। আড্ডায় তখন গান বাজনা হৈ-চৈ হতে থাকে।' (ঐ ; উক্ত ; ৩০ পৃ :)।

কাতুল্লুসের কবিতার বিবরণ অনুসরণ করে স্যার জেমস জর্জ ফ্রেজার হিয়েরাপোলিসের একটি মুষ্কচ্ছেদ অনুষ্ঠানের বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। এই দুই বিবরণের মিল আশ্চর্যজনকভাবে একই উৎসের ইঙ্গিত বহন করছে বলে মনে করি। লিখছেন ফ্রেজার :

> 'While the flutes played, the drums beat, and the eunuch priests slashed themselves with knives, the religious excitement gradually spread like a wave among the crowd of on lookers, and many a one did that which he little thought to do when he came as a holiday spectator to the festival. For man after man, his veiws throbbing with the music, his eyes fascinated by the sight of the streaming blood, flung his garments from him, leaped forth with a shout, and seezing one of the swords which stood ready for the purpose, castrated himself on the spot. Then he ran through the city, holding the bloody pieces in his hand, till he threw them into one of the houses which he passed in his mad carrer. The household thus honoured had to furnish him with a suit of female attire and female ornaments, which he wore for the rest of his life.' (*The Golden Bough--A Study in Magic and Religion* : Sir James George Frazer ; Abridged Edition, Macmillan & Co. Ltd. লন্ডন ; 1954 খ্রি.; 350 পৃ:)।

নপুংসক পৌরোহিত্যের আরও কিছু প্রমাণ ফ্রেজারের বিবরণ থেকে পাওয়া যায়। এর কারণও বিশ্লেষণ করেছেন ফ্রেজার। তাঁর বক্তব্য :

> ....'Asiatic goddesses of fertility were served in like manner by eunuch priests. These feminine deties required to receive from their male ministers, who personated the divine lovers, the means of discharging their beneficent functions. They had themselves to be impreguated by the life giving energy before they could transmit it to the world. Goddesses thus ministered to by eunuch priests...... (*The Golden Bough* : উক্ত ; 349 পৃ:)।

১৮.৩ তৃতীয় স্তর : নারীবেশী পুরুষ পূজক

গুর্মাদের মনসামঙ্গল গানের দলে অন্যান্য সঙ্গীরা পুরুষ। নারী বেশ ধারণ করে তারা গান গায়— নাচে। এ থেকে মনে হয়, নারীদের দ্বারাই এই নৃত্যগীত মুখ্যত পরিচালিত হত। অসমের 'দেওধনী নৃত্য' নাম দিয়ে বিশেষ এক ধরনের নাচের সংবাদ পাওয়া গেছে। কামাখ্যা মন্দিরে মনসা পূজার দিন সারা রাত ধরে 'দেওধনী'রা নাচে। এরা নারী বেশধারী পুরুষ। ড. সুজিৎ চৌধুরী লিখেছেন : 'সুকন্নানি ওঝাপালি অনুষ্ঠানভিত্তিক নৃত্য। সাধারণত মনসা পূজার সময়েই

এর আয়োজন হয়।......জনজাতীয় বোড়োদের মধ্যে ওঝাপালি নেই, কিন্তু দেওধনী নাচ রয়েছে। বোড়োদের সর্পদেবী মাটির পূজায় দেওধনী নাচ আবশ্যিক। সেখানে দেওধনী স্বাধীন ও স্বতন্ত্র মর্যাদা পায়। নাচও হয় অনেক বেশি উন্মাদনাপূর্ণ।' (*প্রাচীন ভারতে মাতৃপ্রাধান্য : কিংবদন্তীর পুনর্বিচার* ; উক্ত ; ৫৯-৬০ পৃ.)।

আসামের লোকাচারে দেওধনী বা নারী বেশধারী পুরুষ পূজকদের ভূমিকা আরও বহু পূজা পার্বণে লক্ষিত হয়। ড. নবীন চন্দ্র শর্মা-র সংবাদ 'শুভাচেনী' ব্রতের সঙ্গে দেওধনী বা দেওধাদের ভূমিকা প্রসঙ্গে। সেই ব্রতের সময় 'জল তোলাৰ প্ৰসঙ্গত ওজাপালি, ঢুলীয়া, কালিয়া, দেওধনী বা দেওধা আদিয়ে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ কৰে।' (সূত্র : ড. নবীনচন্দ্র শর্মা সম্পাদিত : নারায়ণদের বিৰচিত পদ্মা পুৰাণ [ভাটীয়ালী খণ্ড] ; বাণী প্রকাশ ; গুৱাহাটী ; অধিসমীক্ষা-অংশ ; ১৯৯৩ খ্রি. ; ৩৩১ পৃ.)। কামাখ্যা মন্দিরে মনসাপূজার উৎসব বলতে দেওধনী উৎসবকে বোঝানো হয়। এই উৎসবে পশ্চিমবঙ্গ ও উড়িষ্যা থেকে বহুযাত্রী কামরূপ কামাখ্যা মন্দিরে উপস্থিত হয়। (ঐ ; ৩৩৯ পৃ.)।

আসামের কোন কোন জনজাতির মধ্যে নারীরাই দেওধা বা দেওধনী হয়ে থাকে। দক্ষিণ গোয়ালপাড়ার মনসাপূজার গান সংগ্রহ করে প্রাণেশ্বর রাভা একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন—*মায়ারন্তী বিষহৰী*। সেখানে বলা হচ্ছে উক্ত অঞ্চলে : 'দেওধনী নচা ছোৱালী গবাকী সাধাৰণতে শুদ্ধ চিত্তে সকলো কামনা বাসনাৰ উর্দ্ধত চিৰকুমাৰী ব্ৰত ধাৰণ কৰিব লাগে, নহলে তাইৰ শৰীৰত দেৱতাই নলন্ডে আৰু পূজাৰ উদ্দেশ্য সফল নহয় বুঝি বিশ্বাস।' (*মায়াবন্তী বিষহরী* ; বিষহরী প্রকাশন ; কাচাদল, দরংগিরি, গোৱালপোৰা ; ১৯৮৭ ; ৬ পৃ)। ধীরে ধীরে নারী পৌরোহিত্যের বিধি উক্ত অঞ্চলে অচলিত হয়ে পড়ছে, *মায়াবন্তী বিষহরী*-র ভূমিকা থেকে তাও জানা গেল। 'দেওধা বা দেওধনী সম্পৰ্কীয় আগব অন্ধ বিশ্বাস এতিয়া ভালেখিনি হ্রাস পাইছে। লগতে এই বৃত্তিৰ প্রতি আগ্রহ নাইকিয়া হোৱাত আৰু সমাজৰ পৰা স্বীকৃতি নোপোৱাত এই অঞ্চলত দেধানী বা দেওধনী নচা প্রথা লোপ পোৱাৰ উপক্রম হৈছে।'

প্রথম দিকে মনসা পূজায় নারী পৌরোহিত্য এইভাবে নানা খানে লুপ্ত হয়েছে। উত্তরবঙ্গের সাইটোল বিষহরীর গানেও গীদাল-দের দল এখন আর তেমন জনপ্রিয় নয়। নতুন পূজারিনী গীদাল পাওয়া যাচ্ছে না— এরকম একটি সংবাদ পেয়েছিলাম। বলে রাখি, 'সাইটোল বিষহরী' মনসা-কেন্দ্রিক পূজা-ব্রতেরই একটি লৌকিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সংরূপ (genre)। কামাখ্যার নারীবেশী পুরুষ দেওধনীরা এই আমি লোকাচারের পরবর্তী স্তরের ইঙ্গিতবাহী।

নারীবেশ ধারণ করা পুরুষদের দেবপূজায় অংশগ্রহণ করার সংবাদ আরও পেয়েছি। উড়িয্যার বিশিষ্ট ভক্ত— জগন্নাথ দাস 'নারীবেশ ধারণ করে প্রতাপ রুদ্রের রাণীদের দীক্ষাদান করেন, এবং নারী বেশ ধারণ করেই প্রতাপ রুদ্রের অন্তঃপুরে ভাগবত পাঠ করেন।' (অচিন্ত্য বিশ্বাস: 'সখীভাবের সাধনা : একটি সম্ভাব্য উৎস সন্ধান' ; উক্ত)। জগন্নাথ দাসের শিষ্যরা 'অতিবড়ী-সম্প্রদায়' গড়ে তুলেছিলেন। অতিবড়ী-দের দায়িত্ব জগন্নাথ মন্দিরে গুণ্ডিচা মার্জন। একাজ তারা নারীবেশ ধারণ করে থাকেন।

প্রেমবিলাস-এর চতুর্বিংশ বিলাসে অদ্বৈত আচার্যের স্ত্রী সীতাদেবীর শিষ্য 'জাঙ্গলী' ও 'নন্দিনী'র কথা আছে :

সীতাদেবীর দুই দাসী—জাঙ্গলী নন্দিনী।
কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষা সীতা দিলেন আপনি॥

জাঙ্গলী ও নন্দিনী—নারী নন, পুরুষ। নারী বেশ ধারণ করে নারীভাব অবলম্বন করেছিলেন। একবার গৌড়ের বাদশাহ জঙ্গল অঞ্চলে তাকে দেখেন রূপলাবণ্যে মোহিত করে তাঁকে বলাৎকারে উদ্যত হয়ে বিস্মিত হয়ে দেখেন তিনি পুরুষ। স্বভাবতই প্রশ্ন করেন। শেষে জঙ্গলী দাসী তাকে জানালেন স্বরূপ :

নারী জনে নারী দেখে পুরুষে পুরুষ।
কিন্তু কোন কালে আমি না হই পুরুষ।।

লোকনাথের 'সীতা গুণ কদম্ব' অনুসারে তিনি নারী ছিলেন না। 'শান্তিপুরের কাছে হরিপুর গ্রামের যজ্ঞেশ্বর চক্রবর্তী সীতাদেবীর কাছে দীক্ষা গ্রহণের পর থেকেই জাঙ্গলী প্রিয়া নাম গ্রহণ করেন।' ('সখী ভাবের সাধনা'......উক্ত)।

ড. বিমানবিহারী মজুমদারের লেখায় প্রায় একইরকম সংবাদ পেয়েছি জগন্নাথ দাস সম্পর্কে : 'প্রতাপরুদ্রের অন্তঃপুরে জগন্নাথ দাস স্ত্রীবেশ গ্রহণ করিয়া পরীক্ষা করিতে আসিলে তিনি স্ত্রীরূপ প্রকট করেন।' (*শ্রীশ্রী চৈতন্য চরিতের উপাদান* ; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ; দ্বিতীয় সংস্করণ ; ৫০৩ পৃ.)। বিমানবাবু এই সংবাদ পেয়েছেন পুরীর ঝাঝাপিঠা মঠের মহন্তের কাছে।

নরোত্তম দাস কামনা করেছিলেন :

হরি হরি আর কি এমন দশা হব।
ছাড়িয়া পুরুষ দেহ প্রকৃতি হইব।।

রসিকানন্দ ছিলেন বাংলা ও উড়িষ্যার শ্রদ্ধেয় বৈষ্ণব। মেদিনীপুরের গোপীবল্লভপুরে রাস উৎসব পরিচালনা করার সময় আটজন বালককে গোপী সজ্জায় সাজিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে এরা নারীবেশ ধারণ করে থাকতেন। এদের মধ্যে নারায়ণ, রঘুনাথ, গোপীবল্লভ এবং গৌরগোপাল ছিলেন প্রধান। ১৯৩২ সালে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় গোপাল হালদারকে এক চিঠিতে এক বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা লিখেছেন :

'রাত্রে ছিল রাধারমণ আশ্রমে (ললিতাদেবীর সমাজবাড়িতে) শারদ রাসোৎসব। ললিতাদেবীর পরিচয় জানেন চরণদাস বাবাজীর শিষ্য, সখীভাবে সাধনা করেন, স্ত্রীলোক সাজিয়া থাকেন (বজ্রগোপী)........ ললিতাদেবী শ্বেত বা শুক্ল অভিসারিকার বেশে কীর্তন করিতে করিতে বাঈজীদের মত 'ভাও বাতলানো', ভাবে অঙ্গভঙ্গি করিয়া নাচিতেছেন, তাহার পরণে সাদা মখমলের ঘাগড়া শাড়ি, ওড়না, তাহাতে সাদা জড়ির পাড়, হাতে গহনা, নাকে বেসর, নথ ও নাকছাবি, প্রৌঢ় বয়সের gross চেহারার পুরুষ, চোখে কাজল, মুখে সকালে কামানো সত্ত্বেও দাড়ির রেশ, আর গায়ে তিনি শিশি দুই অতি উগ্রগন্ধের এসেন্স ঢালিয়াছেন। ....সঙ্গে আটজন বৈষ্ণব বাবাজী সাদা কাপড়ে মেয়ে সাজিয়া এক একটি সখীর মূর্তি ধরিয়া উদ্দণ্ড নাচিতেছেন। ......যাহোক ব্যাপারটি দেখিয়া মনে বেশ একটা আঘাত লাগিল, একটা জুগুপ্সার ভাব আসিল, সাবেক কালের শিক্ষিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা কেন বৈষ্ণব জনসাধারণকে প্রশ্রয় দিতেন না, তাহার একটুখানি ইঙ্গিত পাওয়া গেল। আথেন্সের জেউস বা হিলিয়াস বা আথেনে দেবতার কোনো অহেল্লনীয় দেবতার নারীবেশী ছিন্নমুষ্ক পূজকদের উদ্দণ্ড বাদ্য ও নৃত্যদর্শনে কিরূপ জুগুপ্সার ভাব উদয় হইত, তাহার একটি আভাস বারবার মনের মধ্যে যেন আসিতে লাগিল।' ('পরিচয়'— সুনীতিকুমার স্মরণ সংখ্যা। আগস্ট-সেপ্টেম্বর—১৯৭। ৮-৯ পৃ.)।

মনসা পূজার গায়ক সম্প্রদায়ের একদল নপুংসক— সেকথা লিখেছি। একদল পুরুষ, নারী বেশ ধারণ করে থাকে। এ নিয়ে দীনেন্দ্রকুমার রায় সামান্য সংবাদ দিয়েছেন। নদীয়ার গ্রামাঞ্চলে

মনসামঙ্গল গানের বর্ণনার অবকাশে তিনি লিখেছেন : 'তিন চারিটি অল্প বয়স্ক চাষার ছেলে পায়ে নূপুর আঁটিয়া নাচিতে লাগিল। তাহারা কখনও গ্রীবা বক্র করিয়া ও কটিদেশে হাত রাখিয়া, কখনও পরচুলার উপর স্থাপিত সোলার ফুল স্পর্শ করিয়া, কখনও দুই হাতে নানা ভঙ্গিতে অঞ্চল দুলাইয়া, একবার ধীরে একবার চঞ্চল পদক্ষেপে ঘুরিয়া-ফিরিয়া নাচিতেছে।' (*পল্লীচিত্র*: আনন্দ প্রকাশনী ; কলকাতা- ১৩৩৮ ; ১২১ পৃ.)।

পুরুষ কর্তৃক নারীবেশ ধারণের বিষয়টিকে Transvestism নামে অভিহিত করেছেন পণ্ডিতেরা। রেভারেন্ড হেনরী হোয়াইটহেড লিখেছেন :

> 'The fact, too, that agriculture among primitive races was the business of women rather than men, as it is among savages races as the present day, probably led to the village goddesses being at first worshipped by the women rather than men. One trace of this is still found in the custom of the Mata pujari, who is a man, dressing up as a woman when he sits in the cart'.......(*The Village Gods of South India* ; Asian Educational Services, New Delhi ; 1988 ; 150 পৃ.)।

আদিতে নারী পুরোহিত, মধ্যস্তরে নপুংসক পুরোহিত এবং শেষে নারীবেশ ধারী পুরোহিত— এইভাবে ভাবলে মনসামঙ্গল কাব্যের ধারাবাহিকতাটি স্পষ্ট হতে পারে। উত্তরবঙ্গে সাইটোর বিষহরির গান নারীদের দ্বারা পরিচালিত হয়। সাইটোর কি ষষ্ঠী? হতে পারে। উত্তরবঙ্গের ব্যাপক অঞ্চলে, রাজবংশী সমাজের মধ্যে গীদালরা দলবেঁধে সাইটোর বিষহরির গান গেয়ে ফেরেন। একটি ব্রত-সঙ্গীতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ব্রতিনী (মাড়োয়ানি) কেমন করে সাইটোর ব্রতের উপকরণ সংগ্রহ করছেন।

ধূপ ধুনার বাস না পায়া ষাইটোর মাও মোর
কত নিদ্রা যাও।
উঠ উঠ ষাইটোর মাও মোর
চেতন কর গাও॥
কুন ঘাটে ভাসাইম তোক
সক করি ক মোক।
উত্তরে ভাসানুং হয়
কাউয়া পাখি গাও ধোয়।
দক্ষিণে ভাসানুং হয়
শগুন চিলা গাও ধোয়।
পূবে মোক ভাসালু হয়
ধরম ঠাকুর গাও ধোয়।
যখন যাইব মাও দেশে যায়
পূজার জিনিষ মাড়োয়ানী পায়।...........ইত্যাদি।

আবার পূজারিণীদের আকাঙক্ষা থেকেও বোঝা যায় এ একান্ত মহিলাদেরই পূজা।

ষাইটোর মা মোর জলে যায়
কানের সোনা পড়শী চায়
এখনও না দিম না এখনও না দিম
যাবার বেলা মাড়োয়ানীক দিয়া যাইম।

ষাইটোর মা মোর জলে যায়
পরাণের শাড়ী পড়সী চায়
এখনও না দিম মা এখনও না দিম
যাবার বেলা মাড়োয়ানীক দিয়া যাইম।

ষাইটোরের নামে অলঙ্কার-পোশাক-পরিচ্ছদ পাবার আকাঙক্ষা এর ব্রতধারিণীদের মধ্যে বিদ্যমান।

পশ্চিমবঙ্গের বেশ কিছু অঞ্চলে মনসামঙ্গল গানের দল পরিচালিত হয়। এসব দল পুরুষদেরই। এ নিয়ে সংবাদ প্রদান করেছেন ড. মিহির চৌধুরী কামিল্যা। তাঁর তথ্য :

হুগলীর ধুলেপুর (আরামবাগ)—নবকুমার ভট্টাচার্য (৪৭) মেদিনীপুর পানিহাটি গুই আড়া— দুর্গাপ্রসাদ মণ্ডল (৫১) ছাড়াও বাঁকুড়ার সানবাঁধা, থুমপাথর গ্রামে মনসামঙ্গল গায়ক দল আছে। (*আঞ্চলিক দেবতা : লোকসংস্কৃতি* : বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় ; ১৯৯২ ; ১৯৩-৯৪ পৃ : ও পাদটীকা ১)। ড. কামিল্যার একটি চমৎকার সংযোজন—'প্রায় ধর্মমন্দিরেই মনসা আছেন। বাঁকুড়ার মটগোদা, ময়নাপুর, বেলিয়াতোড়, মেজিয়া, মেট্যালী, হুগলীর গোঘাট, পশ্চিম অমরপুর (গোঘাট থানা) ; বর্ধমানের চিঁচুড়িয়া, ইছাবাচা, দাদপুর ; বীরভূমের ঈশ্বরপুর, লাউজোড়, পায়ের, জামথাসি, ঘুরিষা, তাঁতিপাড়া (বাজনগর থানা), কালিপুর, কুলেড়া, নুড়াই প্রভৃতি অসংখ্য গ্রামে ধর্মঠাকুরের সঙ্গে মনসার পুজো করা হয়। এগুলির অনেক স্থানেই ধর্মপুজোয় মনসার গান হয়। এমনকি বীরভূমের হাসনাবাদ গ্রামে (সিউড়ি থানা) মুচিদের মনসার নাম 'তুলো রায়'। তুলো রায় পুরুষবাচক নাম। ধর্মঠাকুরের একটি নাম। সে নামটি স্ত্রীদেবী মনসাব উপর বর্তেছে। অর্থাৎ ধর্মের সঙ্গে মনসাব আত্মিক সম্পর্ক জনগণের মধ্যে কিরূপ প্রচারিত হয়েছিল এ থেকেই তা অনুমান করা যায়।' [ঐ ; উক্ত , ১৯৫ পৃ.]।

আমরা এবিষয়ে আলোচনা করেছি। বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের রচনায় ছিল :

মহেশের চন্দ্রে জন্ম হইল ইহার।
নাম মনসা নিরঞ্জন অবতার॥ (১.১৮,২৪৭)

॥ ১৯ ॥

মনসা পুরাকথায় পবিত্র গাভী প্রসঙ্গ

মনসার পুরাকথায় শিব ও মনসাব জন্ম মৃত্যু-সম্পর্কিত বিভিন্ন রহস্যময় আচার-আচরণ লক্ষ করি। পাশাপাশি এ-রচনায় পাচ্ছি ব্রহ্মার ভূমিকা। গন্ধর্বকুমারী বীণালত'কে দেখে বীর্যপাত হয় ব্রহ্মার। সেই বীর্য থেকে জন্ম নেয় সাতশো বালখিল্য ঋষি .

. অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ জন্মে ঋষি সাতশত। (২. ৩. ৩৪)

তারও পর 'দুই কুমার' (এদের পরিচয় স্পষ্ট করে লেখেননি বিপ্রদাস)-এর জন্ম দিলেন ব্রহ্মা।

দেব কায় সপ্ত মুখ পুচ্ছ পদভাগে। (২.৩.৩৬)

ব্রহ্মা তাদের মনসার নিকট পাঠিয়ে দেন—তারা 'সিজুয়া পর্বতে থাকে দেবীর অগ্রতে'। এই টুকরো পুরাকথাটির কোনও পরিণতি দেখিনি। এবার ব্রহ্মা 'শুক্রপাত স্থানে' কমণ্ডলু থেকে জল ঢেলে দিয়েছেন। তা. থেকে—

জন্মিল দুরন্ত ব্যাঘ্র দেখি ভয়ঙ্কর।
বিকট দশন গোপ করে ফরফর। (২.৩.৩৯-৪০)

দুটি দুরন্ত ব্যাঘ্রকে ব্রহ্মা জানালেন তারা কপিলা নন্দনের কাছে পরাজিত হয়ে গন্ধর্ব হয়ে স্বর্গে বসবাস করবে। ব্রহ্মার এই ভবিষ্যৎবাণী শুনে তারা ক্ষীরোদ সমুদ্রের নিকটে চলে গেলেন।

দেবতাদের যজ্ঞানুষ্ঠানে হাজির ছিলেন দেবী চণ্ডী— রান্না করার জন্যে। তাঁকে দেখে ব্রহ্মার কামনা জেগে উঠল। নিদ্রারত চণ্ডীর কনিষ্ঠ অঙ্গুলিমাত্র দেখে

রূপ নিরক্ষিতে ব্রহ্মার চন্দ্রটলে।
প্রবেশ চণ্ডীর গর্ভে হৈল হেন কালে॥ (২.৩.৪৭)

এর পরই মহামায়া যজ্ঞস্থলে রন্ধন করে সিদ্ধাদের মনমোহন করার বাসনা করলেন। সিদ্ধাদের মোহিত করার পরিবর্তে গোর্খনাথই তাঁকে ছলনা করলেন।

তাঁরে ছলিবারে গোর্খ প্রবেশি উদরে।
দ্বার রুদ্ধ কৈল দেবী প্রসবিতে নারে॥ (২.৩.৫০)

মনসামঙ্গলের এই অংশ বিপ্রদাসের রচনায় প্রক্ষিপ্ত কিনা এখনই বলতে পারছি না। গোরক্ষবিজয়ের কাহিনী অনুসরণ করলে এই পংক্তি দুটির অর্থ ও তাৎপর্য বোঝার অবসর মিলতে পারে। সিদ্ধাদের ছলনা করা শেষ, কিন্তু গোরক্ষনাথকে ছলনা করতে গেলেন দুর্গা :

পন্থেতে শুতিলাদেবী বিবস্ত্র হইয়া।
উর্ধ্বমুখী দুই জানু প্রকাশ করিয়া॥

তাঁকে দেখে গোরক্ষনাথ বিল্বপত্র দিয়ে তার 'যোনির দ্বার' ঢেকে দিলেন। দেবী তখন মক্ষিকার রূপ ধরে গোরক্ষের শরীরে প্রবেশ করলেন। গোরক্ষ ক্ষুব্ধ :

মনে মনে চিন্তে গোর্খ বড় দুঃখ পাইল॥
ধ্যানেতে জানিল গোর্খ দেবীর এই কর্ম।
তাহারা উদরে হেন জানিলেক মর্ম॥
তালি দিয়া বৈসে নাথ দশমী দুয়ারে।
প্রকাশ না পাইয়া দেবী ছটপট করে॥

[ড. পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত : *গোর্খবিজয়* ; উক্ত ১৮-১৯ পৃ.]।

মার্গপথে তাকে বের করে দিলেন গোরক্ষনাথ—আর দেবী তখন 'কাকালে পাইয়া ব্যথা তথাতে রহিল।'

দেখা যাচ্ছে, গোরক্ষনাথের সঙ্গে দেবীর দ্বন্দ্বের কাহিনী নানাভাবে মনসামঙ্গল কথাতেও ঢুকে পড়েছিল। তবে দেবী নয় এখানে দেবীকেই ছলনা করছেন গোরক্ষ। তাকে প্রসব করতে না পেরে দেবী দুর্গা অনুরোধ করেননি, কাতর হয়েছেন :

দেবীরে কাতর দেখি দিলেন এড়িয়া।
গর্ভপাত কৈল গিয়া বল্লুকার জলে গিয়া॥ (২. ৩. ৫৭)

গোরক্ষনাথের গর্ভে মক্ষিকা রূপে প্রবেশ করে—গোরক্ষনাথের শরীরের দ্বার রুদ্ধ করা অপেক্ষা গোরক্ষনাথের দুর্গা-র গর্ভে প্রবেশ করা বাস্তব। তবে গোরক্ষ দেবী দুর্গার দ্বার রুদ্ধ করে দেওয়া খুবই অবিশ্বাস্য কল্পনা। মোটকথা নাথ সাহিত্য ও মনসামঙ্গল কাব্যধারার যোগসূত্র নিরূপণে এই কাহিনীটুকু নির্ণায়ক (indicator) হতে পারে।

ব্রহ্মার কথা বলছিলাম। ব্রহ্মার বীর্য দুর্গাকে নিষিক্ত করে থাকলে গোরক্ষনাথের গর্ভে প্রবেশ করার প্রসঙ্গ অবান্তর, অপ্রয়োজনীয়, অনর্থক বোধহয়। হয়ত এই কয়েকটি পংক্তি মনসামঙ্গলে প্রক্ষিপ্ত করা হয়েছে। যারাই করুন তারা মনসামঙ্গল ও নাথধর্মীদের মৌখিক পরম্পরার সঙ্গে

পরিচিত ছিলেন বলে মনে করি। ব্রহ্মার নিষিক্ত ভ্রূণটি ধারণ না করে গর্ভপাত করলেন দুর্গা— বম্নুকা নদীতে।

সেই হৈতে গর্ভপাত হয়ত সংসারে। (২.৩.৫৭)

তৃষ্ণার্ত কপিলা এই স্খলিত গর্ভ জলের সঙ্গে খেলে তার শরীরে মহাবীর মনোরথ নামক বৃষের জন্ম হল। মনোরথ ও ব্যাঘ্রের মধ্যে ঘটনাচক্রে প্রবল দ্বন্দ্বের কাহিনী লিখলেন বিপ্রদাস। এ কাহিনীর তাৎপর্য আমাদের মতে এরকম :

১. ব্রহ্মাকে শিবের পাশাপাশি সৃজন ক্ষমতাসম্পন্ন করে দেখানো।

২. একই আদিদেবের সন্তানদের মধ্যে অধিকার রক্ষার দ্বন্দ্ব।

৩. বন কেটে বসত তৈরি—আদিম আরণ্যক-সমাজ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পশুচারক-সমাজ গড়ে তোলার স্তরগুলির মধ্যে দ্বন্দ্ব ও তার পরিণতি। এর মধ্যে শেষোক্ত প্রসঙ্গটি বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। 'The Concept of Goddess'-এ কপিলার মতো স্বর্গীয় গাভীর কিছু কাহিনী আছে, ফ্রেজারও মহাবৃষের কাহিনী ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেছেন। দুয়েকটি উদাহরণ উদ্ধার করছি :

১. হিলদা এলিস ডাভিডসন লিখেছেন : 'Links between milk and the goddess of back to very early times. In Ancient Egypt Hathor appears as a cow-goddess protecting the Pharaoh, and when depicted in human form as a sky–goddess, she wears on her head a sundisk flanked by cow's horns.' ('Milk and the Northern Goddess' : *The Concept of Goddess*)

২. ফ্রেজার দেখিয়েছেন দিওনিসাস-এর বিষয়ে প্রচুর বৃষ-সম্বন্ধী ধারণা ও বিশ্বাস আছে। 'he (দিওনিসাস) was often conceived and represented in animal shape, especially in the form, or at least with the horns, of a bull. Thus he is spoken as "cow-born", "bull", "bull shaped", "bull-faced", "bull-browed", "bull horned", "horn bearing", "two horned", "horned". সাইনিথা-র লোকজন শীতকালে দিওনিসাসের উৎসব অনুষ্ঠানে গান গাইত— 'Come hither, Dionysus, to thy holy temple by the sea ; come with the Gracesto thy temple. rushing birth thy bull's foot, O goodly bull, O goodly bull!' (ফ্রেজার : *The Goledn Bough* ; উক্ত; 390 পৃ.)।

৩. গিলগামেশ মহাকাব্যে স্বর্গীয় ষাঁড় হত্যার কথা আছে। মহামারীর দেবতা 'নেরগাল'-এর শক্তি 'the Bull of Heaven', গিলগামেশ ও তার সঙ্গীরা এই ষাঁড়টিকে হত্যা করেছেন।— 'The heroes, however, slay the Bull of Heaven, offering its heart to Gilgamesh's patron Shamash, and with a truly heroic, if ungallant, gesture, through the hind-leg in Ishtar's face like a giant boomerang.' (*Near Eastern Mythology* ; John Gray, The Standard Literature Co. (P) Lt, 1982 ; 44-45 পৃ:)

তিনটি উদাহরণ থেকে মোটামুটি স্পষ্ট— স্বর্গীয় ষণ্ড বিষয়ক পুরাকথার দু'তিনটি কাঠামো তৈরি হয়েছে। ১. তা অশুভ শক্তির প্রতীক। ২. তা শুভ শক্তির পুনরাবির্ভাবের, সেই সূত্রে উর্বরতা শক্তির প্রতীক। আর ৩. পশুচারক সমাজের স্বাভাবিক ধ্যান-ধারণার উৎস ও পরিণতি।

কপিলা ও মনোরথের কাহিনী—মহা ব্যাঘ্রের সঙ্গে মনোরথের প্রলয়ঙ্কর যুদ্ধ এই আলোচনা-ধারার সঙ্গে কোথায় কিভাবে যুক্ত, তা দেখানে যাক। কপিলা এমন এক দেবী, যার উৎস ভারতীয় সংস্কৃতির এক বিশেষ পর্বে। এদেশে অন্তত তিনটি দেব-ভাবনা গড়ে উঠেছে দুগ্ধ-সম্পদের রক্ষক দেবতা হিসেবে। কৃষ্ণ, শিব আর কপিলা। কৃষ্ণ গোবর্ধন গিরি ধারণ করে পশু সম্পদ রক্ষা করছেন, শিবের সঙ্গে ষাঁড়ের সম্পর্ক অভিন্নপ্রায় (দিওনিসাসের মতোই) আর কপিলা। গোসম্পদ রক্ষা ও স্বর্গকে পবিত্র গরু ভাবার বিষয়টি মিশরীয় পুরাকথায় আছে। কপিলাকে মনে হয় তারই ছায়া। মনোরথ ক্ষীরদ সমুদ্র শুষে নিলে দেবতারা সমবেতভাবে কপিলার কাছে প্রার্থনা করতে থাকলেন। এক কোষ পরিমাণ দুই চাই! কপিলা দুধ দিলেন— ক্ষীরদ সমুদ্র ভরে গেল। এ-কাহিনী থেকে মনে হয় ভারতের রাখালিয়া (pastoral)-কৃষ্টি myth -টিকেগভীরভাবে প্রভাবিত করেছে।

॥ ২০ ॥

মনসামঙ্গল পুরাকথায় পশুচারক সমাজের ভূমিকা

জে. ওয়েস্টউড নামক গবেষক ১৯৮৫ সালে ইংল্যান্ডের একটি প্রাচীন লোককথা পেয়েছিলেন। সে কাহিনী বিচিত্র : 'In a time of famine, a pure white cow appeared on a hill every morning and evening, and anyone, might come to milk her so long, as only one vessel was brought by each comer ; this was always filled, whatever size.' (J. Westwood : *Albion : A Guide to Legendary Britain*; লন্ডন; ১৯৮৫ খ্রি. ; 259 পৃ.) ১৮৭৯ সালে ক্ষোদিত এই দৈব-শক্তিসম্পন্ন গরুর একটি মূর্তি মিডলটন-ইন-চিরবারির গির্জায় রক্ষিত আছে। ল্যাঙ্কাশায়ারের প্রেস্টনে এই গরুর কাহিনী সামান্য ভিন্ন—বলা হয়েছে গরুটির হাড় দিয়ে তৈরি হয়েছে 'Cow Hill'. বলাবাহুল্য প্রত্ন মানুষের পশুচারণ সূচনার সময়কার বিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণা এসব কাহিনী, কিংবদন্তীতে লুকিয়ে রয়েছে।

পশুচারণের কাজে পুরুষ ও নারীর ভূমিকা প্রায় সমান সমান। পশুচারক পুরুষ আর পশুপালন ও দুগ্ধ, দুগ্ধজাত দ্রব্য রক্ষণাবেক্ষণকারিণী নারী। এই ভাবসত্য কৃষ্ণকথায় চমৎকারভাবে ধরা পড়েছে। সুতরাং অনুমান করতে হয় পশুচারক সমাজের কাহিনীতে পুরুষ ও নারী উভয় দেবতারই প্রাধান্য। মনসামঙ্গল কাহিনীতে মনোরথের বীরত্বে মহাব্যাঘ্রের পরাজয় আরণ্যক জীবনের পরিমণ্ডল বদলে পশুচারকদের প্রাধান্যের ইঙ্গিত বলে মনে করি। তবে এর সবটাই প্রত্ন ইতিহাসের অঙ্গ নয়। দুবরাজ ব্রাহ্মণের গল্প— নিতান্তই আধুনিক সমাজের বিষয়। ব্যাঘ্রের ডম্বুর-রা গিয়ে বসতি স্থাপন করল অরণ্যপ্রদেশে—

গন্ধর্ব হইয়া বাঘ গেল ইন্দ্রপুরে।
যুদ্ধ জিনি মনোরথ গেল নিজঘরে॥
থাকিল বাঘের যুদ্ধ ঘুষিতে সংসার।

এবং—

দুই গোট ছা তার পলায় তুরিতে।
সেই বাঘ সঞ্চার হইল অবনীতে॥ (২.৭.১৩৬-৩৭ এবং ১৩৫)

এসবই মধ্যযুগের কবির কল্পনা। তবে কাহিনীটির উৎসে দুগ্ধ-সম্বন্ধী জনসমাজের চিন্তার ছাপ স্পষ্টভাবেই পড়েছে। কেমন করে, সেটা দেখাবার আগে বাংলার শৈব সংস্কৃতির সঙ্গে রাখালিয়া (pastoral) কৃষ্টির সম্পর্ক কিভাবে পড়েছে একটু দেখা যাক।

বিনয় ঘোষ রাঢ় বাংলায় এক ধরনের লোককথার সন্ধান পেয়েছেন। স্থানীয় শিবমন্দির গুলিতে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠার আগে রাখালরা দেখত একটু সুলক্ষণযুক্ত গাভীর দুধ কম হয়। কারণ সন্ধান করতে গিয়ে তাবা লক্ষ করে গাভীটি বনে একটি নির্দিষ্ট স্থানে যায় আর তার বাঁট থেকে অঝোর ধারায় দুধ বের হয়ে মাটিতে পড়ে। বলা বাহুল্য এই দুধ পড়ছিল অদৃশ্য কোন শিব লিঙ্গে। তারপর স্থানীয় শিবের প্রতিষ্ঠা। বর্ধমান জেলার জনপ্রিয় শিবপূজার ক্ষেত্র জামালপুর গ্রামের 'বুড়োরাজ' সম্পর্কে এই রকম একটি কিংবদন্তী আছে। যদু ঘোষ নামক গোপের শ্যামলী গাই-এর দুধ ফিনকি দিয়ে ফোয়ারার মতো ঝরে পড়া আর আধুনিক পুরোহিত বংশের আদি পুরুষ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কর্তৃক অনাদিলিঙ্গ আবিষ্কার করার কাহিনী। (পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি; বিনয় ঘোষ ; প্রথম খণ্ড ; প্রকাশ ভবন ; কলকাতা ; দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৭৬ ; ১৪৩ পৃ.)। বিনয় ঘোষের মন্তব্য— 'বোঝা যায়, একসময় রাঢ়ের কোনো প্রতিভাবান ব্রাহ্মণঠাকুর পরিপাটি করে' তথাকথিত অনুচ্চ সমাজের জনপ্রিয় গ্রাম দেবতাদেব হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত করার উদ্দেশ্যে' এই কাহিনী তৈরি করেছিলেন। (সূত্র : ঐ)। বস্তুত এই কাহিনী কেবল রাঢ়ে নয়— সারা দেশেই ছড়ানো। নাথযোগীদের সঙ্গে গো-চিকিৎসার সম্পর্ক নির্ণয় করার মতো কিছু সংবাদ দিয়েছেন শ্রীভবনাথ সরকার। যেমন—

১. 'পূর্ববঙ্গে গোরুর বাচ্চা হলে তাদের মঙ্গল কামনায় গোরক্ষনাথের উদ্দেশ্যে সিন্নি দেওয়া হয়। এর নাম গোরক্ষমেলা।' (*নাথধর্ম : সমাজ ও সংস্কৃতি ; ভবনাথ সরকার*; ভবনাথ সরকাব রিসার্চ ফান্ডের পক্ষে হরিদাস সরকার কর্তৃক প্রকাশিত ; নবব্যারাকপুর, উত্তর ২৪ পরগনা ; দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৯২ ; ১০৪ পৃ.)।

২. মেদিনীপুর জেলায় যোগীদের নিমন্ত্রণ করা হয় নতুন গোয়াল তৈরির সময়, গোয়ালের গরুদেব মড়ক হলেও অনেক সময় 'যোগীসেবা' করা হয়। সাধারণত রবিবার এই অনুষ্ঠান করা হয়। গৃহস্থ খাদ্যবস্তু দান করলে যোগী গোয়ালে উনুন গড়ে রান্না করেন— 'লোকচক্ষুর অন্তরালে তা শিবের নামে নিবেদন করে ভোজন করেন।' ভুক্তাবশেষ গোয়ালের মধ্যেই রেখে দেন তা;। তারপর উনুনে ঐ ভুক্তাবশিষ্ট রেখে মাটি চাপা দিয়ে— 'যোগী নবার ডমরু বাজিয়ে পিছনের দিকে না তাকিয়ে' ফিরে যান। (ঐ ; ১০৪ পৃ.)।

৩. উত্তরবঙ্গে (জলপাইগুড়ি) এবং ময়মনসিংহ অঞ্চলে গোরক্ষনাথের পূজাও হয় অনাবৃষ্টি দূর করা ও গোসম্পদের রক্ষার উদ্দেশ্যে। (ঐ ; ১১৪-১৫ পৃ.:)। মেদিনীপুরের শালবনী অঞ্চলে বহুদিন অনাবৃষ্টি থাকলে নাথযোগীদের ডাকা হয়। তারা শিবলিঙ্গকে বাইরে এনে— বংশদণ্ডের আঘাত করেন। 'ভগবানপুর থানার ইতিবৃত্ত' নামক রচনায় প্রবোধচন্দ্র বসু-র সাক্ষ্য উদ্ধার করে ভবনাথবাবু এই সংবাদ দিয়েছেন।

শিবের বাহন ষণ্ড—তিনিই গোসম্পদের প্রজনন সংক্রান্ত দেবতা। তার ভক্ত গোরক্ষনাথ। নাথ যোগীদের সঙ্গে শৈব সংস্কৃতির যোগ প্রসিদ্ধ—এখানে দেখালাম গো-সম্পদ রক্ষার বিষয়ে নাথ যোগীদের সঙ্গে সাধারণ মানুষের ধ্যান-ধারণার সংবাদ।

মনসামঙ্গল কাব্যে এইখানেই কপিলা-মনোরথ কাহিনীর প্রাসঙ্গিকতা। মনসাকেও গো-রক্ষা কারিণী ভাবা হচ্ছে। রাখালদের পালায় তার স্পষ্ট প্রমাণ পাচ্ছি। কিছুটা পরোক্ষ প্রমাণ পাচ্ছি ক্ষীর-সমুদ্র মন্থনের নিজস্ব পুরাকথার উপাদান বিশ্লেষণ করলে। মনসা বার বার গোপনারীর রূপ ধারণ করে প্রতিপক্ষকে ছলনা করেছেন— গো-সংস্কৃতি, পশুচারক সংস্কৃতির সঙ্গে এই ভাবেও মনসামঙ্গলের সম্পর্ক নির্ণয় করা যায়। এ নিয়ে সামান্য কিছু উদাহরণ আনা যাক।

পুরন্দর ঘোষ বৃদ্ধার ছদ্মবেশে আসা মনসাকে তার গোচারণদলের সব থেকে দুষ্ট গাভীটিকে দোহন করতে বলেছেন ; মনসা তখন ধামাইকে ডেকে পাঠিয়ে সেই আসোচ্য-গাভীটিকে স্থির থাকতে বাধ্য করেছেন ; আনা হয়েছে তাব বাছুরটি :

ধামাই পাঠাইয়া দেবী বাছুর আনায়।
নাগে দৃঢ় ছান্দিয়া ধরিল চারি পায়॥ (৫.১৪.৩০৯)

এসময় পুরন্দরকে মনসা দোহন করতে বলেন।

দুইল অসোচ্য দুগ্ধ ঘোষ পুরন্দর।
নিমিখে চুপড়ি ভরি উঠিল সত্বর॥

দেবী সেই দুধ ঊর্ধ্বমুখ হয়ে পান করলেন। চুপড়ি ফেরৎ দিলেন—অন্য রাখালরা সেই দুধ পান করল।

গো-সম্পদ রক্ষার ক্ষেত্রে সাপের কাছ থেকে নানা রকম অসুবিধা হতে পারে। গোরুর দুধ খেয়ে যাওয়া নাগ সম্পর্কে কিছু কিছু লোক-প্রচলিত কাহিনী শুনতে পাওয়া যায়। মনসাদেবীর নাগাধিকার জনমানসে প্রচলিত হলে গোপসমাজ কর্তৃক তার পূজা খুবই স্বাভাবিক ঘটনা হিসেবে গণ্য হতে থাকে। পাশাপাশি জলেব উপর মনসার অধিকারও জনমনে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। সেজন্যেও রাখালরা মনসাকে শ্রদ্ধা করেছে বলে মনে হয়। বৃদ্ধা বিধবার বেশ ধবে মনসা নিজের পূজা প্রচলনের চেষ্টা করার সময় প্রথম দিকে রাখালরা তাকে মানতে চায় নি। তখন তার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গে রাখালরা দেখেছে :

পদ্মার মায়ায় তথা নাবাল হইল।
জল পিতে সর্ব গরু নাবালে পড়িল॥ (৫.১৪.২৯৬)

গরুগুলো নড়তে পারছে না ('নড়িতে চড়িতে নারে')— রাখালরা বিপত্তি থেকে মুক্ত হবার কামনা করল।

গরু বিমোচন করি দেহ শীঘ্র গতি। (৫.১৪.৩০১)

মনসার কৃপাদৃষ্টি পড়ামাত্র—

আজ্ঞামাত্রে সর্ব গরু হৈল বিমোচন। (৫.১৪.৩০৩)

মনসা নিজেও গোপিনী সেজে শত্রু দমন করার জন্য বের হয়েছেন। আত্মপরিচয় দিয়েছেন—তার পিতা মহেশ্বর ঘোষ, মাতা গৌরী, বা ঐ রকম। নাটকীয় এই সমস্ত অংশ—শ্রোতাদের মনোগ্রাহী হয়েছে নিশ্চয়। তবে এই আত্মপরিচয়ের মধ্য দিয়ে গোপসমাজের সঙ্গে মনসার সম্পর্ক নিশ্চয় প্রকাশ পায়। সঙ্ক-ধন্বন্তরির পাড়ায় গিয়ে মনসা পসার সাজিয়ে নেতাকে সঙ্গে নিয়ে গেছেন :

দধি দুগ্ধ কে লইবে ডাকে উচ্চ করি। (৬.১০.১৬৫)

তার দধির দাম অত্যন্ত বেশি ('পঞ্চাশ কাহন কড়ি')—শুনে সঙ্কের স্ত্রী কমলা তার চরিত্র সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।

এমত দধির মূল্য কভু নাহি শুনি।
মা লিব তোমার দধি ভ্রম মায়া বেশে।
দধি ছলে ভ্রম কিবা রতির হাব্যাশে॥ (৬.১০.১৭২-৭৩)

মনসা তাকে মধুর বচনে প্রবিত্ত করে, স্বামীর প্রশংসা করেছেন। কমলা তার পরিচয় জানতে চেয়েছেন। মনসা পরিচয় দিয়েছেন :

মনসা বলেন হাসি মায়ার প্রকার।
মহেশ্বর ঘোষ নাম জনক আমার॥
কমলা আমার নাম গৌরী জননী।
এই ত আমার খুড়ি বৃদ্ধ গোয়ালিনী॥ (৬.১০.১৮৪-৮৫)

কমলার সঙ্গে মনসার কথোপকথনের সূত্রে গোপ-সমাজের কিছু অন্তর্বাস্তব মেলে। মনসাকে বাত্রে থেকে যেতে বলেছেন তার রূপমুগ্ধ সঙ্ক ধন্বন্তরি।

আজি এথা বঞ্চি সানন্দে যাইয় কালি। (৬ ১২.২০০)

মনসা জানিযেছেন তিনি রাত্রে না ফিরলে 'অতি খরতর স্বামী' তাঁকে শাস্তি দেবেন। সঙ্ক ওঝা তাকে নির্ভয়ে থাকতে বলেছেন, কারণ সঙ্ক তাকে দিতে পারেন এমন বশীকরণ-সম্ভব বস্তু, যাতে—

দাস-মত তব স্বামী করাইয়া দিব। (৬.১২.২০৩)

কাজলা মালিনীকে ছলনা করার জন্যও মনসার বেশ একইরকম।

ঘৃত ঘোল দুগ্ধ দধি রচিয়া পসার।
চলিলা শঙ্কর-সুতা মায়া অবতার॥ (৭.৮.১১২)

কাজলার সঙ্গে পরিচয় দেবার সময় বলেছেন মনসা—গ্রাম তাঁর সুগন্ধ, মাতা গৌরী, পিতা মহেশ্বর ঘোষ ; নাম কাজলা। শুনে কাজলা তাকে সই বলে গ্রহণ করলেন। ধনা-মনাকে বিষতিয়া দংশন করার পব মনসা বললেন :

বাপ মোর মহাগুণী বিদিত সংসাবে।
তাব কিছু কিছু বিদ্যা শিখাইল মোরে॥ (৭.১০.১৫২)

বিদ্যা পরীক্ষা করার অনুমতি নিলেন তিনি।

সমুদ্র মন্থনের পরিস্থিতি রচনা করার সময় বিপ্রদাস দুধের সমুদ্রে এক টুকরো তেঁতুল পড়ে যাবার ঘটনা আর দই হয়ে যাওয়া সমুদ্র মন্থনের সময়কার সরঞ্জামের যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতে গোপ-কৃষ্টির পরিচয় কিছু অবশ্যই পাওয়া যায়। দুর্বাসার অভিশাপে টিয়ার মুখের তেঁতুল 'আশ্চম্বিতে ক্ষীরোদে পড়িল'। আর :

তেতুলিতে দুগ্ধেতে হইল এক ঠাঞি।
তত্তক্ষণে মিলনে সকল হৈল দই॥ (২.১০.১৬৪)

মন্থনের উপকরণ সংগৃহীত হল— ক্ষীর নদী হল 'দধিভাণ্ড' ; ঘোটাগড়ি হলেন 'পশুপতি' স্বয়ং ; মন্দার 'মন্থন দণ্ড', বাসুকি 'টানা দড়ি'। ঘোটাগড়ি অর্থাৎ গৌরিপট্ট সহ শিবলিঙ্গে-র ওপর রেখে মন্থন দণ্ড ঘোরানো হল। বিষ্ণু কূর্মরূপে পৃথিবী ধারণ করলেন। বস্তুত এই মন্থন বাংলার গোপগৃহের পর্ণছায়া সংগঠিত হচ্ছে বলেই মনে হয়।

কপিলা-মনোরথ কাহিনীর পাশাপাশি মন্থনের কাহিনী— পুরাণের বিশ্বজনীন কল্পনা (Cosmogony) আর লোকায়ন অর্থাৎ লৌকিক উপাদানের প্রয়োগ ঘটিয়েছেন বিপ্রদাস। মনসামঙ্গল কাব্য এইভাবে revitalization-এর মারফৎ অগ্রসর হয়েছে। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে মনসাদেবীকে ঘিরে বিচিত্র আচার-অনুষ্ঠানের সংবাদ পাই। একটি মেলার সংবাদ দিই, 'দইয়ের মেলা'। মুর্শিদাবাদ জেলার ডোমকল থানার ভগীরথপুর গ্রামে জামাইষষ্ঠীর দিন প্রথম সন্তানসম্ভবা মহিলারা দই বিক্রি করতে বসেন। বিক্রেত্রী মহিলারা দাম নির্ধারণ করেন। *পশ্চিমবঙ্গের পজাপার্বণ ও মেলা* : দ্বিতীয় খণ্ড : ১০০-১০১ পৃ: সম্পাদক : অশোক মিত্র;

ভারত সরকারের জনগণনা দপ্তর)। বিপ্রদাসের মনসামঙ্গলে দধির দাম নির্ধারণ করেছেন মনসা স্বয়ং। সেকথা মনে পড়ছে। দেবী মনসার পূজা তিথি—পঞ্চমী, 'দইয়ের মেলা' অনুষ্ঠিত হয় ষষ্ঠীর দিনে।

॥ ২১ ॥

মনসামঙ্গলের পুরাকথায় 'আদ্যেরকথা' বা সৃষ্টির বিবরণ

ব্রহ্মার সৃজন ক্ষমতার পরিচয় ও তজ্জনিত দ্বন্দ্ব-সংঘাত মনসামঙ্গলের 'আদ্যের কথা' হিসেবে বিপ্রদাস যোজনা করে থাকবেন। এ কাহিনীর অন্য মূল নিশ্চয় কোথাও ছিল। শিবের সৃজন ক্ষমতার পরিচয় বাংলার প্রাচীন সাহিত্যের সর্বত্র। মনসামঙ্গলের 'আদ্যের কথার' বড় অংশই শিবের অযোনিজ সন্তান সন্ততিদের ঘিরে গড়ে উঠেছে। মনসামঙ্গল ছাড়াও বিভিন্ন লোক ঐতিহ্যে অনুরূপ কিছু সংবাদ পাওয়া যায়। শিবকে বাংলার মনসামঙ্গল ধারায় বিভিন্ন চরিত্রের উৎস কথা এইরকম :

১. শিবের স্খলিত বীর্য থেকে জন্মলাভ করেছেন মনসা
২. „ অশ্রু „ „ „ নেতা
৩. „ ঘর্ম „ „ „ ধামাই

শরীরের যেসব উপকরণ অনিঃশেষ বলে ভেবেছেন মনসামঙ্গলের পুরাকথার আদি সঙ্কলকরা, সেগুলি থেকে প্রাণসঞ্চার করেছেন— গড়ে উঠেছে এক একজন দেবতা। এরকম সৃজন ক্ষমতার আরও পরিচয় পাওয়া যায় বাংলার বিভিন্ন লৌকিক দেবতাদের ক্ষেত্রে। শিব পুত্র গণেশের মুণ্ড থেকে জন্ম নিয়েছেন দক্ষিণ রায় :

আশ্চম্বিতে উচাটিল গণেশের মাথা।
দক্ষিণে পড়িয়া সেই হইল দেবতা॥

(গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু : বাংলার লৌকিক দেবতা ; উক্ত ; ১৯৪ পৃ.)।

একইভাবে কার্তিকের হাতে মারা যাওয়া তারকাসুরে পুনর্জীবন দান করেন শিব :

মহামন্ত্র মহাদেব কৈল উচ্চারণ।
দেব অংশে হইল জন্ম নাম পঞ্চানন॥
যোগ বলে জনম হইল পঞ্চানন্দ রায়।
নিজমূর্তি নিজরূপে দেব সমুখে দাঁড়ায়॥
সমুখে দেখিয়া শিশু কন দেবগণ।
সংসার বিজয়ী নাম হইল পঞ্চানন॥
হেন কালে ব্রহ্মাদেব কহে মহেশ্বরে।
ব্যাধিরাজ তারদেহ এইত কুমারে॥ (দ্বিজ দুর্গারাম : "পঞ্চানন মঙ্গল")

মৃত অসুরকে বীজমন্ত্র শুনিয়ে বাঁচিয়ে ব্যাধির অধিকার দান— শিবের সৃজন ক্ষমতার সার্থক পরিচয়। সৃজন ক্ষমতার পরিচয় পঞ্চাননেরও কম নেই। রেভারেন্ড লালবিহারী দে জানিয়েছেন: ...'he is pleased sometimes to make barren women profile' (*Bengal Peasant Life*, নবম পরিচ্ছেদ ; ১৮৭২)। গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু লিখেছেন : 'যে সকল নারীর গর্ভস্থ সন্তান নষ্ট হয়ে যায় বা যার সন্তান প্রসব হবার অল্পদিনের মধ্যে মারা যায়, তারা পঞ্চানন্দের শরণাপন্ন হয়। ...যাদের সন্তানরা শৈশবে মারা যায়, তারা বার বৎসর পর্যন্ত পঞ্চানন্দের শরণাধীন থাকে

এবং প্রথম পূজার কালে এই দেবতার রক্ষাকবচ হিসেবে শিশুর পায়ে একটি ডাডুকা বা মন্ত্রপূত লৌহবলয় পরিয়ে দেয়। ঐ ডাডুকাটি সন্তানের পায়ে তার বার বৎসর পর্যন্ত লাগানো থাকে এবং তার ক্ষৌরকর্ম হয় না। পঞ্চানন্দের কৃপাধীন উক্তরূপ সন্তানকে 'বাবাঠাকুরের বা পঞ্চানন্দের দোরধরা' ছেলে বলা হয়। সন্তানটি বার বৎসর অতিক্রম করলে তার অভিভাবকরা তাকে পঞ্চানন্দের থানে গিয়ে তার ডাডুকা খুলে দেয় ও এই সময় ঐ সন্তানের প্রথম ক্ষৌরকর্ম বা চুল কাটা হয়।' (*বাংলাব লৌকিক দেবতা*, উক্ত ; ৫২ পৃ.)।

পঞ্চানন্দকে নাথরা নিরঞ্জনের রূপ বলে গণ্য করেন।

দক্ষযজ্ঞ নাশের সময় শিব স্বীয় জটা ছিঁড়ে মাটিতে ফেলতেই জন্ম নিয়েছেন বীরভদ্র। উক্ত বিভিন্ন জন্মকথার নির্যাস এই তালিকা :

১. শিব পুত্র গণেশ-মুণ্ড + [ ] : দক্ষিণ রায়।

২. কার্তিক কর্তৃক হত তারকাসুর + [শিবের মহামন্ত্র] : পঞ্চানন্দ

৩. শিবের জটা + [হুঙ্কার] : বীরভদ্র।

বাংলার নাথধর্মীরা আত্মপরিচয় সন্ধানে যে-সব কাহিনী ভেবেছেন তাতে প্রচুর আযোনিজ-আবির্ভাবের সংবাদ পাওয়া গেছে। 'চন্দ্রাদিত্য পরমাগম' শীর্ষক গ্রন্থের বিবরণ-অনুসরণ করলে নাথধর্মীদের জন্মকথা এই রকম :

কামাতুরাং সূর্যবতীং দদর্শাহং বনস্থিতাং।
যত্র তিষ্ঠতি সা কন্যা তত্র যাতো মুহুর্মুহুঃ॥
মৃণালে স্থাপিতং বীর্যমেকদা নর্মদাতটে।
দিনমেকং রাজকন্যা গতা চ নর্মদা তটে॥
সমূলং বৃন্তসহিতং বুভুজে সা চ কন্যকা।
অতস্তু মম বীর্যাত্তু যোগনাথোহভবৎ পুনঃ॥

সত্যযুগের সূর্যবংশজাত সুধন্ব-কন্যা সূর্যবতী শিবকে কামনা করলে, পিতার পরামর্শে তিনি বনে বাস করতে থাকেন। শ্রীফল দিয়ে শিবপূজা করতেন তিনি। সন্তুষ্ট হয়ে নর্মদা তটে পদ্ম মৃণালে বীর্য স্থাপন করেন শিব—বলেন সেখান থেকে যোগনাথের জন্ম হবে। সূর্যবতী সেই বীর্যযুক্ত পদ্মমৃণাল গ্রহণ করে যোগনাথের জন্ম দিলেন। সূর্যবতী বিস্মিত হয়ে শিবকে জিজ্ঞাসা করলেন কুমারী অবস্থায় তার পুত্র জন্মাল কিভাবে?

কন্যা প্রোবাচ হে দেব ত্রিপুরাসুর ঘাতক।
অহং কুমারিকা নারী বিবাহো ন কৃতো ময়া॥
ন জানেহহং পুনঃ কস্য বীর্যাৎ কোহস্তি মমোদরে।
দেব দেব! মহাদেব! গতিশ্চ ন কৃতো ময়া॥

যোগনাথের জন্মরহস্য জানালেন শিব। তাকে যোগশিক্ষা দিলেন। কশ্যপ-কন্যা সুরতি-র গর্ভে যোগনাথ জন্ম দিলেন ১৬ জন পুত্র। তাদের ছয়জন গৃহী— আদি নাথ, মীন নাথ, সত্য নাথ, সচেতন নাথ, কপিল নাথ এবং নানক নাথ। দশজন যোগী— গিরি নাথ, পুরী নাথ, ভারতী নাথ, শৈল নাথ, নাগ নাথ, সরস্বতী নাথ, রামানন্দ নাথ, শ্যামানন্দী নাথ, সুকুমার নাথ, অচ্যুত নাথ। ('রাজগুরু যোগিবংশ' : শ্রীসুরেশচন্দ্র নাথ মজুমদার ; মিলনপল্লী ; শেওড়াপল্লী ; হুগলী; ১৯৯১ খ্রি. ২০-২১ পৃ.)।

অন্য আরেকটি কাহিনীতে আছে গন্ধর্বরাজ কন্যার প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হয়ে শিব গোরক্ষনাথের সঙ্গে তার বিবাহের ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু মিলন লগ্ন উপস্থিত হলে গোরক্ষনাথ অদ্ভুত কাণ্ড করলেন :

ছয় মাসের শিশু হৈল মন্দির ভিতব॥
দুগ্ধ খাইবারে চাহে কান্দে ওয়া ওয়া।
তা দেখিয়া রাজকন্যা হৈল আচাভুয়া॥

রাজকন্যা আশ্চর্য— 'ভাল স্বামী পাইনু দুগ্ধ খাইবারে চাহে'। গোরক্ষনাথ আত্মপরিচয় জানালেন:

স্ত্রী পুরুষ নহি আহ্মি নাহি বীর্যবল।
শুকনা যে কাষ্ঠ মোর শরীর সকল॥
গন্ধহীন পুষ্প আমি মন্দারের ফুল।
শরীরেত রস নাই কাঠা সমতুল॥

গোরক্ষনাথ স্ত্রীর অনুবন্ধে দিয়ে গেলেন তার অন্তর্বাস ; সেটি ধুয়ে জল পান করলে পুত্রলাভ হবে :

গোর্খের বচন কন্যা শিরেতে বান্ধিয়া।
কর্পটি পাখালি পানি খাইলেক গিয়া॥
গোর্খের কর্পটি ধুই খাইলেক পানি।
সেইখনে গর্ভবতী হইল কন্যাখানি॥

বলাবাহুল্য এইসব জন্মদানের বিষয়টি শৈব সংস্কৃতির সৃজনশীল দেবভাবনার বিভিন্ন টুকরো চিত্র। একে বলতে হয় নরনারীর স্বাভাবিক সম্পর্কহীন সৃজনশীলতার পুরাকথা। বাংলার মধ্যযুগের কাব্যধারায় এই ধরনের জন্মকথার উৎসে সাধারণত শিবকে দেখা যায়। শিব যেন জন্ম ও মৃত্যুর নিয়ন্ত্রক শক্তি, তার জন্মদানের ক্ষমতা সীমাহীন—বীর্য অক্ষয়।

॥ ২২ ॥

মনসামঙ্গল ও উর্বরতা সম্পর্কিত লোকাচার (Fertility Cult)

শিবলিঙ্গ ও যোনি পট্ট সম্পর্কে আলোচনা স্থলে একজন গবেষক লিখেছেন—'Primarily the Linga was the symbol of the act of cultivation while the Yoni represented Mother Earth.' (*Ancient Indian Rituals—and Their Social Contents*; Narendra Nath Bhattacharya ; Manohar Book Service, Delhi ; 1975 ; 100 পৃ.)। বস্তুত শিবকে ঘিরে বাংলার জনমানসে উর্বরতা সম্পর্কিত ধ্যান-ধারণার বিচিত্র আদি কল্প টুকরো-ছিন্ন হয়ে আছে। মনসামঙ্গলে তার স্পষ্ট কিছু ছবি আছে। শিব বিষপান করার পর মারা গেছেন মথন পালায়। তবে ঘটনাটিকে মৃত্যু না বলে যোগ ধ্যান বলেছেন বিপ্রদাস :

ভাবি জগদীশ গণ্ডুষিল বিষ
সব গেল অভ্যন্তর।
বিয়োগে আসন হরিল কেতন
অঙ্গ কাঁপে থর থর॥

ভাবি ঈশপতি যোগাসনে তথি
তত্ত্বজ্ঞান ভাবে মনে।
করি যুগ সন্ধি মন বায়ু বন্দি
ঢলি পড়ে ত্রিলোচনে॥ (৩.৩.৩৪-৩৫)

এ সমস্ত যোগীদের ভাবজগতের প্রতীক-ধর্মী পরিচয় বহন করছে। শিবের মৃত্যু নয় যোগ-সমাধি ঘটেছে বিষক্রিয়ায়। পরে মনসার মন্ত্রজাত শুনে শিবের যোগ-ধ্যান ভাঙল।

পদ্মার আজ্ঞায় বিষ উঠে হর-মুখে।
সুবর্ণের থাল পদ্মা পাতিল সম্মুখে॥
কিছু বিষ শঙ্করের থাকিল গলায়।
নীলকণ্ঠ হইলা গোসাঞি মৃত্যুঞ্জয়॥ (৩.১০.১১১-১২)

ফ্রেজার একে বলেছেন resurrection of god. তাঁর বিবেচনায় বেশ কিছু প্রত্ন-সংস্কৃতির দেবতাদের মৃত্যু ও পুনর্জাগরণ ঘটেছে— বিভিন্ন সময়, বিভিন্ন পটভূমিতে কিন্তু একটি সুনির্দিষ্ট আদি-ভাবনার ধারাবাহিকতায়। মিশরীয় শস্যদেবী আইসিস, ফ্রিজীয় মাতৃদেবী সিবিলিকে 'Corn Mother' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন তিনি। শুধু কি তাই —'The union of Cybele and Attis, like that of Aphrodite and Adonis, or Ishtar and Tammuj, was marked by sex festivals. The union of Demeter and Zeus was also limited by men and women in the sex festivals at Eleusis in order to make the fields wave with yellow corns.

Of the influential gods, worshipped in different countries in Western Asia and Egypt with a variety of rituals including sacred prostitution, special mention should be made of Adonis (Tammuj), Attis and Osiris. They were the sons (sometimes also conceived as brothers) and lovers respectively of the goddess Aphrodite (Ishtar), Cybele and Isis. According to the existing myths, these gods would die every year, causing the goddessess to mourn, and would then be brought back to life once again. .... The said gods likewise were the personifications of corns, the sons and mortal consorts of the goddess, and the theme of their annual death and revival symbolised the annual facts of plant-life in relation to the field.' (*Ancient Indian Rituals* : উক্ত ; 102 পৃ.)। যে সব যুগ্ম দেবদেবীর কথা ভেবেছেন ফ্রেজার— বাংলার মনসামঙ্গল myth -এ তাদের সংশ্লেষ ও বিশ্লেষ ঘটেছে, কিভাবে, জগজ্জীবন ঘোষালের আদ্যকথা বিচারের সূত্রে তা এর আগে সামান্য লিখেছি। বাকি আরও কিছু প্রসঙ্গ রয়েছে। আদ্যের কথা বলে যা কবিরা উপস্থাপন করেছেন— সেখানে আদিম সমাজ ভাবনা, পরিবার সংগঠন, কৌম-সমাজের বিচিত্র ভাবসত্য যেমন আছে, তেমনি আছে যুগপরিবর্তনের অভ্রান্ত ইশারা। যুগ পরিবর্তনের চালিকাশক্তি উৎপাদন ব্যবস্থার নতুন নতুন রূপ পরিগ্রহণ। এসব ক্ষেত্রে পুরাকথার আড়ালে মানব সমাজের নতুন নতুন ছকে প্রবেশের সংবাদও উল্টো হয়ে উপস্থিত। তেমন কিছু উপাদানের মধ্যেই পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা উর্বরতা সম্পর্কিত লোকাচার খুঁজে পেয়েছেন। সেই প্রসঙ্গে আমাদের বিশ্লেষণটি সন্নিবেশ করা দরকার। শিবের সর্বাঙ্গীণ কামুকতা ও দুর্গার সঙ্গে তার নানা রূপে

বিহারের কাহিনী নিশ্চয় প্রমাণ করে এই দেব-দেবীর মধ্যে কৃষিকর্মের সম্পর্ক বিদ্যমান। তবে বাংলায় এই দেব-দেবীর পেছনের সমাজ-সাংস্কৃতির (Socio-Cultural) ভাবনা বিমিশ্র হয়ে আছে। শিব তার মাতৃস্থানীয়া কেতকাকে পিতার পরামর্শে বিবাহ করছেন ; গোঁসাই-এর মৃত্যু ঘটার পর মনসা অনুমৃতা হচ্ছেন আর তার শরীর থেকে জন্ম নিচ্ছে এক শিশুকন্যা। এই শিশুকন্যা হেমন্ত ঋষি ও মেনকার দ্বারা পালিতা হচ্ছেন— নাম হচ্ছে গৌরী! এই হল জগজ্জীবন ঘোষালের 'আদ্যের কথা'র রহস্যময় পুরাকথার একাংশ। সুতরাং এ কাহিনীগুলির মারফৎ সহজেই হর-পার্বতীর আদিদেব-আদিদেবী লক্ষণ প্রমাণিত হয়।

আদিদেব— সূর্য, আদিদেবী— পৃথিবী। এই দুই দেবতার সম্পর্কেই সৃষ্টি। বৃষ্টির মাধ্যমে নিষিক্ত হচ্ছেন দেবী, জন্ম দিচ্ছেন ফসল। এই আদি কল্পের সঙ্গে শিবদুর্গার পুরাকথা অনেকখানি মেলে— সবচেয়ে বেশি মেলে মনসার কাহিনী। শিব-দুর্গার পাশাপাশি মনসামঙ্গল কাহিনীতে পাচ্ছি আর এক দম্পতিকে— যাদের বলা চলে শস্যপ্রাণ দেবতা। এরা হলেন বেহুলা ও লখিন্দর। এ নিয়ে আমরা কিছু কিছু সন্ধান ইতিপূর্বে প্রবন্ধাকারে প্রকাশ করেছি। —'Corn god' আর Corn goddess-এর বিবাহ অনুষ্ঠান দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার ধান্য উৎপাদক শ্রেণীর কৃত্য হিসেবে লক্ষ করছেন স্যর জেমস জর্জ ফ্রেজার। তাঁর ভাষায় .....'the corn-spirit in the double form of bride and bridegroom had its parallel in a ceremony observed at the rice harvest in Java.' শুধু যবদ্বীপ নয়, ব্রহ্মদেশেও আছে অনুরূপ রীতি। উত্তর বর্মায় জিস (Szis) -দের মধ্যে চালু আছে ধানের পিতামাতার প্রতীককে শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের বৎসরান্তিক অনুষ্ঠান।' ('মঙ্গল কাব্যের গঠন ও বিন্যাসে সমাজ বিবর্তন সূত্র : কিছু প্রস্তাব ও বিশ্লেষণ' ; অচিন্ত্য বিশ্বাস; 'প্রবন্ধ সঞ্চয়ন' শীর্ষক গ্রন্থভুক্ত ; সম্পাদনা : ড. সত্যবতী গিরি এবং ড. সমরেশ মজুমদার ; রত্নাবলী ; কলকাতা ; মার্চ ১৯৯৭; ৭৭৪ পৃ.)। ফ্রেজার প্রদত্ত আরও কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি :

১. যবদ্বীপে ধানের শিস-কে বলা হয় পাডি-পেঙ্গানটেন। পাডি হল শস্যপ্রাণ কনে আর পেঙ্গানটেন হচ্ছে বর। (*The Golden Bough* ; উক্ত ; 418 পৃ :)।

২. বালি ও লোমবোক দ্বীপপুঞ্জের চাষি ধানকাটার আগে নিজের হাতে কেটে আনে দু-গোছা ধান, দুটিই একশো আটটা ধানগাছের শিস যুক্ত ('each composed of one hundred and eight stalks with their leaves attached to them') বলা হয়— এ দুটো স্বামী-স্ত্রী। চাষি এ দুটোকে গোলার কাছে রাখবেন— কোন অবস্থাতেই এ দুটো ধান-গোছা থেকে কিছু খাবে না। যদি কেউ লোভে পড়ে খায়, তাহলে তার খুব নিন্দা হয় ('branded as pigs and dogs', উক্ত ; 418 পৃ.)।

৩. ব্রহ্ম দেশের 'কারেন'-দের মধ্যে ধানের 'কেলা' বা আত্মার কথা প্রচলিত। তারা প্রার্থনা করে 'Orice-Kelah, come to the rice.' (ঐ, 415 পৃ.)।

৪. সুমাত্রার মিনংকাবাউয়ের-দের ধারণা ফসলের শক্তি—'সানিং সারি'। সানিং সারি-কে তারা বলে 'ইনডোইয়া পাডি' (that is literally, "Mother of Rice" (উক্ত, 416 পৃ.)।

বিভিন্ন অঞ্চলে, উপযুক্ত সন্ধান করলে শস্য উৎপাদনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জনসাধারণের মধ্যে এরকম প্রাকৃতিক শক্তির অভ্যন্তরীণ উৎসকে উত্তেজিত করার আকাঙ্ক্ষা জাগার আরও প্রমাণ পাওয়া যাবে। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলের কিছু পূজা-পার্বণ অনুষ্ঠানের বিবরণ পরীক্ষা করে দেখাচ্ছি। বোঝা অসম্ভব নয়, বাংলার কৃষিক্ষেত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানুষ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কৃষকদের চেয়ে মোটেই ভিন্ন রকম নয়।

১. কোচবিহারের শীতলকুচি গ্রামের (শীতলকুচি থানা) কাচারির দীঘি বা খাড়াহাত দীঘি সম্পর্কে একটি কিংবদন্তী শুনিয়েছিল ছাত্র শ্রীসন্তোষকুমার রায়। স্থানীয় এক দেবী সম্পর্কে প্রচলিত কাহিনী হল, দেবী সেই দীঘির কিনারে এক শাঁখারির কাছে শাঁখা পরে টাকা নিতে বলেন পুরোহিতের কাছে। পুরোহিতের কোন মেয়ে নেই। দেখতে এসে শাঁখারি আর পুরোহিত বিস্মিত হয়ে দেখেন— দীঘির মধ্য থেকে উঠে আছে একজোড়া শঙ্খ পরা হাত। এই থেকে পুকুরের নাম 'খাড়া হাত দীঘি'। (ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ ; স্থান উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় ; তথ্য সূত্র : শ্রীসন্তোষকুমার রায় ; ২১. ২. ১৯৮৮)।

২. দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় কুশমণ্ডি থানার আমলাহার গ্রামে নবান্ন উপলক্ষে মনসা পূজা হয়। দেবীর নাম মনসাবুড়ি। মূর্তি অষ্টনাগ খচিত শিলা। সেবায়েত হলেন হাড়ি বা ভুঁইমালী সমাজের মানুষ। এই গ্রামের পুকুরের কাছে গেলে বাসন পাওয়া যায় বলে কিংবদন্তীর কথা জানা যায়। (*পশ্চিমবঙ্গের মেলা ও পূজা-পার্বণ* ; উক্ত ; প্রথম খণ্ড ; নতুন দিল্লি ; ১৯৫৮; ১২৬ পৃ.)

৩. মুর্শিদাবাদ জেলার বরঞা থানার ঝিকরহাটি গ্রামের মনসা পূজা নানা কারণে বিশিষ্ট। ভাদ্রমাসেব অমাবস্যায় পূজা শুরু, শেষ হয় সপ্তমীর দিন। তৃতীযাব দিন নাকি মনসার জন্ম; দেবাংশী সেদিন পুজো দিতে দিতে অচৈতন্য হয়ে যান। মন্দিরেব দেয়াল— দবজা কাদামাটি দিয়ে রুদ্ধ করা হয়। পঞ্চমীর দিন আপনা থেকে দরজা খুলে যায়। তখন মনসার 'জিয়ান গান' গাওয়া হয়। দেবাংশী তখনও অচৈতন্য থাকেন। বলি দেওয়া হয। এই অনুষ্ঠান নানা কারণে তাৎপর্যপূর্ণ—এ নিয়ে সামান্য ব্যাখ্যা পরে, উপযুক্ত অবসবে করছি। [*পশ্চিমবঙ্গেব মেলা ও পূজা-পার্বণ*] ; উক্ত ; ২৮৭ পৃ .)।

৪. মুর্শিদাবাদ জেলার জলঙ্গী থানার কুমারপুর গ্রামে শিব গাজন হয় মাঘী শ্রীপঞ্চমীতে। গ্রামের একটি বটতলায় ভক্তরা মিলিত হয়ে বসেন। একজনের উপর শিবেব ভর হয়। তার কাছে গ্রামবাসীরা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জেনে নেয়। সপ্তমীর দিন একজন 'কৃষক শিব' হন— চাষবাসের অভিনয় করা হয়। ধানবোনা, নিড়ান, কাটা সমস্তই অভিনয় করে দেখানো হয়। (*পশ্চিমবঙ্গের মেলা ও পূজা-পার্বণ* ; ঐ ; ৯৪ পৃ.)।

৫. পুরুলিয়া জেলার বিভিন্ন গ্রামে শ্রাবণ মাসের শনি-মঙ্গলবারে 'খইচেরা' বলে এক অনুষ্ঠান হয়। কৃষকরা এদিন চাষ বন্ধ রাখেন। সিজ মনসার গাছ তুলসীতলায় রেখে মনসা পুজো করেন গৃহকর্তা। আমলকি পাতা, বেলপাতা, করবী ফুল প্রভৃতি সাধারণ কিছু উপকরণ ব্যবহার করেন তারা। কেতকাদাসের মনসামঙ্গল পড়া হয়। (ড. বরুণকুমার চক্রবর্তী : *লোকসংস্কৃতি নানা প্রসঙ্গ*' গ্রন্থভুক্ত "বাংলাদেশের কয়েকটি আঞ্চলিক লোক উৎসব"-প্রবন্ধ। বুক ট্রাস্ট ; কলকাতা; ১৩৮৭ বঙ্গাব্দ ; ৮৪-৮৫ পৃ.)

৬. মেদিনীপুর জেলার গ্রামাঞ্চলে জ্যৈষ্ঠমাসের প্রথম তেরদিন আর পুরুলিয়া জেলার গ্রামে জ্যৈষ্ঠমাসের তের তারিখেই শুধু 'রোহিণ' বা 'রহিণ' উৎসব পালিত হয়। একটা থালায় থাকে জ্বলন্ত টিকে— পুরোহিত ('ধুপর') সেই আগুন এক নিঃশ্বাসে শুষে নেন কিংবা নিরিখে দেন।

পুরুলিয়ায় রহিণ-পুজোর দিন বিকেলে গৃহস্বামী 'কাচা কাপড় পরে নিজের নিজের চাষের জমি থেকে ঝুড়ি করে মাটি নিয়ে আসেন।' মাটি কাপড় দিয়ে ঢেকে আনতে হবে। সেই মাটি দেবস্থানে, তুলসীতলায় ফেলে রাখতে হয়। সব ঘরে, চালের তলে সামান্য করে ছিটিয়ে দিতে হবে। পুজোর রাত্রে দুধ চিঁড়ে আর 'রহিণ' ফল খেতে হয়। সাধারণ মানব বিশ্বাস করে—

(১) ঐ মাটি সাপের ওষুধ ; (২) ঐ দিন সমস্ত সাপ গর্ত থেকে বের হয়ে আসে ; (৩) এদিন বৃষ্টি হলে সাপের বিষ থাকে না। ১৩ জ্যৈষ্ঠ থেকে এইসব অঞ্চলে মনসামঙ্গল পড়া শুরু হয়। (ড. বরুণ কুমার চক্রবর্তী : উক্ত ; ৮৩-৮৪ পৃ :)

৭. মালদহ-মুর্শিদাবাদের চাঁই-মণ্ডল সমাজে বিবাহ সম্পর্কে একটি অনুষ্ঠান আছে—'ডুমনী কাচ'। ছেলেদের বোন, বৌদি ইত্যাদি চাল-পয়সা সংগ্রহ করে কয়েকদিন আগে। বরযাত্রী ফেরার আগে তারা গীত করে মাতিয়ে রাখে। একজন ঘাগরা পরে সেজে বেশি মাত্রায় নাচ করে। (সূত্র : জয়রাম মণ্ডল, ২২. ৩. ১৯৮৮ তারিখে সংগৃহীত তথ্য। স্থান— উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়)।

৮. মালদহ জেলার মালদহ থানার বুলবুলচণ্ডী গ্রামের আড়াই মাইল দূরে বুড়িতলা। বৈশাখ সংক্রান্তিতে চণ্ডী বা কালী পুজো হয়। মেলা বসে। মেলার নাম 'বুড়িতলার মেলা'। ১০০ থেকে ১৫০টি পাঁঠা বলি হয়। 'বুড়িতলা দেবীর পূজা না হওয়া পর্যন্ত এই গ্রাম ও আশপাশের গ্রামের চাষীরা ক্ষেতের জমি হইতে ধান কাটেন না।' (*পশ্চিমবঙ্গের মেলা ও পূজা পার্বণ* : উক্ত ; ১ম খণ্ড ; ২২ পৃ.)

৯. জলপাইগুড়ি জেলার জলপাইগুড়ি থানার পাতাকাটা গ্রামে গ্রামরক্ষী হিসেবে আষাঢ় মাসে বিষহরির পূজা দেওয়া হয়। (*পশ্চিমবঙ্গের মেলা ও পূজা পার্বণ*। উক্ত ; ১ম খণ্ড)

১০. জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জ থানার সুখানী গ্রামে 'হাট ঘুরনী' নামক একটি অনুষ্ঠান প্রচলিত। অজন্মা, অনাবৃষ্টি, মড়ক হলে স্ত্রী-পুরুষেরা কাছের হাটে যায়। সাতবার হাট প্রদক্ষিণ করে— দুধ ও চাল ছিটোবার অনুষ্ঠান করেন। উলু-হরিনাম-পতাকা নিশান সহ পরিক্রমা করা হয়। অনুষ্ঠানের আগে—'এই উৎসব উপলক্ষে গ্রামের স্ত্রীলোক ও পুরুষেরা হাট হইতে ফিরিয়া গ্রামের কাছে কোন খোলা জায়গায় সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় চন্দ্রকে প্রণাম জানাইয়া স্ব স্ব গৃহে পূজা করিলে সুবৃষ্টি ও ভাল ফসল পাওয়া যায়।' (*পশ্চিমবঙ্গের মেলা ও পূজা-পার্বণ* ; উক্ত; ১ম খণ্ড ; ২১৬ পৃ.)।

১১. উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে অনাবৃষ্টির সময় গ্রামের মেয়েরা কোন রাত্রিতে ('অমাবস্যা বা কৃষ্ণপক্ষের রাত্রিই প্রশস্ত') একত্রিত হয়ে চাষের জমিতে হুদুম-দ্যাও-এর পূজানুষ্ঠান করে। 'অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী প্রতিটি মেয়েই সম্পূর্ণ বিবস্ত্রা' হয়ে 'মুক্তকেশে পূজানুষ্ঠান আরম্ভ' করে। ব্রতিনীদের মধ্যে একমাত্র পুত্রসন্তানের জননী একটি ছোট কলাগাছ তুলে আনে— অন্যরা আনে একটি বড় কলাগাছ। দুটিই মাঠের মধ্যে পুঁতে ছোট কলাগাছটার চারপাশে সমবেত নৃত্য গীত করে। (শ্রীফণীগোপাল পাল প্রদত্ত অপ্রকাশিত গবেষণাপত্র—'উত্তর বাংলার লোক সাহিত্য'; নির্দেশক ছিলেন— তরণীকান্ত ভট্টাচার্য ও হরিপদ চক্রবর্তী ; উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়; ২১৮ পৃ.)।

কোন কোন গ্রামে ঐ পুত্রসন্তানের জননীর স্থানে এক কুমারী মেয়েকে ছোট কলাগাছ আনতে হয়। এক্ষেত্রে কলাগাছটিকে আলিঙ্গন করতে হয়। কোনও কোনও গ্রামে বিবস্ত্রা নারীরা কৃষিকর্মের অভিনয় করে। এসময় বাড়িতে পুরুষরা থাকে না। (ঐ ; ২২৮-২৯ পৃ.)।

ফণীবাবু জানাচ্ছেন, কোচবিহার মহারাজার বাড়িতে সরলা ও কমলা নামক দুই মহিলার নেত্রীত্বে হুদুম দেও-এর ব্রত-অনুষ্ঠান হত। (ঐ ; ২৪৩ পৃ.)।

১২. *বাঁকুড়া জেলার জয়পুর গ্রামের জগৎগৌরী দেবীর মন্দিরের সামনে আলো নিয়ে* পারাপার করা নিষিদ্ধ। 'no one dares to pass by the side of the tample with a

lamp.' (*Historical Studies in the Cult of the Goddess Manasa* ; ড. প্রদ্যোৎ কুমার মাইতি ; উক্ত ; 246 পৃ:)

১৩. ভাদ্র মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিটিকে বলে 'বগা পঞ্চমী' কিংবা 'বাক পঞ্চমী'। বীরভূম জেলার বহু মনসা-থানে মনসা পূজা করা হয়। কোনো কোনো মন্দিরে তিন চারদিন আগে থেকে মন্দিরে দেয়াসী প্রবেশ করেন, একমাত্র প্রবেশপথটি বন্ধ করা হয় ('the door was practically sealed with mud') লোকেরা মনসামঙ্গল গান করে— ভিতরে নাকি সাপরা এ গান শোনে ('They said that sarpents enjoying the favour of the goddess') আর মন্দিরের দরজা খুলে দেয়। মন্দিরের ভিতর থেকে দেয়াসীর অচৈতন্য দেহটিকে বের করা হয়। (আশুতোষ ভট্টাচার্য প্রদত্ত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে ড. মাইতির উক্ত গ্রন্থ ; 249 পৃ .)।

১৪. হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া মহকুমার হীরাপুর গ্রামে মনসাদেবীর সাপ্তাহিক পূজা প্রতি রবিবারে প্রচুর হাঁস উৎসর্গ করা হয়। (ঐ ; 254 পৃ.)

১৫. হাওড়া জেলায় আছে গোপদের দ্বারা পূজিতা 'রাখাল মনসা'। 'The Cowherd boys go round begging and collect money for the offerings.' (ঐ ; 254 পৃ.)

১৬. নদীয়া জেলার একটি অদ্ভুত পূজাচারের খবর দিচ্ছেন ড. মাইতি। মনসা পূজার চার-পাঁচদিন আগে মেয়েরা স্নানান্তে ছোট পাত্রে শস্য বপন করে ; পরে এ থেকে সামান্য কিছু অঙ্কুর নিয়ে চাষের জমিতে চাষ করে তারা। গোটা ব্যাপারটা পুরুষদের দৃষ্টি সীমার বাইরে রাখতে চায় তারা। ('The sown area is then covered by a screen.') কয়েকদিন পর এই গাছগুলিকে নিয়ে সাত-ভাগে ভাগ করে মনসাব থানে আনা হয়। এসময় মনসার মূর্তিটিও ঢেকে রাখা হয় ('placed inside the house under a screen')। আর তখন উচ্চস্বরে মনসামঙ্গল গান করা হয়।

১৭. নদীয়া জেলার হিজুলি-র কৃষ্ণপুর গ্রামে 'জালা-বিয়া'-র অনুষ্ঠান হয়। এই অনুষ্ঠান বিচিত্র ; ত্রিপুরার 'জালা-বিয়ার' অনুরূপ। গ্রামের দুই অবিবাহিত কিশোরীকে নিয়ে প্রতিটি বাড়িতে ছদ্মবিবাহ অনুষ্ঠান করা হয়। 'Both the girls—one playing the role of a bride and other groom— carrying the plates containing the seeling change the garlands of Sapla flowers with each other as the mark of their marriage.' (ঐ; 259 পৃ.)।

১৮. সাবেক পূর্ববঙ্গের বরিশাল (বাখরগঞ্জ) জেলার "রয়ানী" অনুষ্ঠান বিখ্যাত। সাধারণত বিবাহের পূর্বে বর বা কন্যাপক্ষ মূর্তি গড়িয়ে মনসা পূজার অনুষ্ঠান করতেন। এ অনুষ্ঠানে রাত্রি ব্যাপী মনসামঙ্গল গান করা হত। সাধারণভাবে প্রত্যেক গৃহে সিজ-মনসার ডাল রাখা হত— নিত্যপূজা হত।

১৯. ঢাকা জেলার সুবর্ণ বণিকদের মধ্যে মনসা পূজার বর্ণনা মিলছে রিসলের বিবরণ থেকে। সিজ মনসার ডাল প্রতিষ্ঠা করা হত নাগপঞ্চমীর দিন ; পরের প্রত্যেক পঞ্চমীতে পূজা আর বিজয়া দশমীর দিন বিসর্জন দেওয়া হত— 'On the great day of the feast, the Vijaya Dasami, the plant is plucked up and thrown into the river.' (H. H. Risley : *The Tribes and Castes of Bengal*, কলকাতা, ১৮৯১ ; ২য় খণ্ড ; 264 পৃ.)। বিক্রমপুর পরগণার কুলীন ব্রাহ্মণরা এই দেবী পূজাতে অংশ নিতেন সবচেয়ে নিষ্ঠার সঙ্গে। বিক্রমপুর পরগণায় 'মনসাবাড়ি' ছিল খুবই জনপ্রিয়। নৌকা-বাইচ ছিল এই পূজার অন্যতম অঙ্গ।

২০. ফরিদপুর জেলার একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বিষয় জানা আছে— সাদা পাঁঠা খুব ভালোভাবে রক্ষা করা হত— 'as they are believed to be the sacrificial victims most favoured by the goddess.' (*Histrical Studies in the Cult of the Goddess Manasa* ; উক্ত; 281 পৃ.)

২১. যশোর জেলার ঝিনাইদহ মহকুমার দিনগদাহাট গ্রামে মনসা পূজার দিন সাপুড়িয়ারা মিলিত হত। অনুষ্ঠিত হত তাদের প্রতিযোগিতা—ওঝাদের মন্ত্রশক্তি পরীক্ষার জন্য হাজার হাজার দর্শকের সমাগম হত।

২২. ময়মনসিংহ জেলার বিভিন্ন জায়গায় হিন্দু-মুসলমানরা একসঙ্গে মনসা পূজার দিন নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতায় অংশ নিতেন।

২৩. চট্টগ্রাম জেলার সুচক্রদণ্ডী গ্রামে জনপ্রিয় মনসা পূজার স্থান ছিল— দেবীর নাম 'জলকুমারী'। পাঁচটি দেবীমূর্তি এখানে ছিল— দেবীদের অন্যতম ছিলেন মনসা। জলকুমারী বসন্ত রোগ নিবারণকারিণী হিসেবে পূজিতা হতেন।

উক্ত তেইশটি ক্ষেত্রের বিবরণ থেকে মোটামুটি বিশ্লেষণ করেই বলা যায় বাংলায় মনসা পূজা ও তৎসংক্রান্ত অনুষ্ঠানের সঙ্গে ধরিত্রী দেবীর সঙ্গে সূর্য দেবতার পুণ্য বিবাহ ('Sacred Marriage')-এর সম্পর্ক আছে। পুণ্য বিবাহ বিষয়ে ফ্রেজার জানিয়েছেন : 'the custom of marrying gods either to images or to human beings was widespread among the nations of antiquity. The ideas on which such custom is based are too crude to allow us to doubt that the civilised Babylonians, Egyptians, and Greeks inherited it from their barbarous forefathers. This presumption is strengthened them we find rites of a similar kind in vague among the lower races.' (*The Golden Bough* : উক্ত ; 143 পৃ.)। কোনো কোনো জন গোষ্ঠী বা জাতি সভ্যতার উচ্চ স্তরের স্মার কোনও কোনও জাতি নিম্নতর স্তরের— ফ্রেজারের এই মন্তব্য মানা না গেলেও একথা অবশ্যই মাননীয় যে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের নানান আদিম জনগোষ্ঠীগুলির মাতৃকা পূজা আর কৃষিকর্মের বিকাশের ইতিহাস বিজড়িত হয়ে আছে। এই আপতন মোটেই কাহিনী যারা বলছেন তাদের কল্পনা ফসল মাত্র নয়—'It would probably be a mistake to dismiss all these tales as pure inventions of story tellers. (*The Golden Bough*; উক্ত ; 146 পৃ.)

চড়কের অনুষ্ঠানকে নিছক আনন্দানুষ্ঠান, বর্ষা বিদায় বলে গণ্য না করে এই অনুষ্ঠানকে শিব-দুর্গার বিবাহের যাত্রা বলে সনাক্ত করা যেতে পারে। আমাদের প্রদত্ত উদাহরণের প্রথমটির তুলনীয় উদাহরণ বাংলার প্রায় সর্বত্র— কল্যাণেশ্বরী, সর্বমঙ্গলা, বর্গভীমা, রাজবল্লভী, কালীঘাটের কালী— প্রায় সমস্ত দেবীর শাঁখা পরার কাহিনী আঞ্চলিকভাবে প্রসিদ্ধ। এ সবই কোন মতেই 'pure intentions of story tellers' নয়। পৃথিবীকে নারী ভেবে তার মধ্যে আদিমাতৃকাদেবীকে ভেবে নেওয়া আর তার সন্তান ধারণ করার উপযুক্ত হবার পরিকল্পনাটি কখনোই আকস্মিক সমাপতন নয়। ধরিত্রী দেবীর গর্ভে সূর্য দেবতার বীর্য নিষিক্ত হবার ঘটনাই এখানে স্পষ্ট হচ্ছে। মঙ্গলকাব্যগুলিতে বিবাহের বিস্তৃত বিবরণ দানের মুখ্য কারণ এখানে নিহিত আছে। বিপ্রদাসের মনসামঙ্গলে এরকম অবসর পাওয়া মাত্রই কবির স্ফূর্তি বিশেষভাবে লক্ষ করা গেছে। তার সঙ্গে সন্তান জন্মানোর বিষয়টিতে অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রাচীন

মানুষের ধনসম্পদ— শস্য সম্পদ আর জনসম্পদ বৃদ্ধির আকাঙক্ষা চিরন্তন— এসব কাহিনীতে পাচ্ছি প্রাকৃতিক ও মানবিক আবেগ, আকাঙক্ষা, সংঘটন ও সমান্তরালতার অপূর্ব মিশ্রণ। একাদশ উদাহরণটি নানাভাবে উল্লেখযোগ্য। উত্তরবঙ্গের হুদুম দেও ব্রতের মতোই 'জলমাঙ্গনি', 'মেঘারাজার গান' প্রভৃতি বিচিত্র কৃত্য অনুষ্ঠিত হয় বাংলার নানা স্থলে। এইসব ব্রত বা পূজার মন্ত্রের মধ্যে স্পষ্টই নারী ও ধরিত্রীর সীমারেখা ঘুচিয়ে ফেলা হয়েছে দেখতে পাই। একটি মন্ত্রে বলা হচ্ছে আকাশ থেকে দেবতার জল পড়ুক আমার যোনিতে। এ মন্ত্রের মূল কথা বৃষ্টি পড়ুক— একে rain charm নিশ্চয় বলা যাবে— সেই সঙ্গে বলতে হবে এ হল উর্বরতার আকাঙ্ক্ষা।

আমাদের প্রদত্ত উদাহরণগুলির বেশ কয়েকটিতে আছে কৃষিক্ষেত্রের উর্বরতা সম্পর্কিত আকাঙ্ক্ষা ও কৃষিক্ষেত্রকে উত্তেজিত করার বাসনা। মুর্শিদাবাদের ঝিকরহাটি এবং বীরভূম জেলার বাকপঞ্চমী অনুষ্ঠানের মিল যথেষ্ট। এই রকম আচার-অনুষ্ঠানের পেছনে কোনো কোনো কাহিনীর আভাস থাকতে পারে। মানিকলাল সিংহ বাঁকুড়া জেলায় এরকম একটি কাহিনী শুনিয়েছেন— এক বণিক বলদের পিঠে বোঝা দিয়ে আসার পথে এক দীঘিতে দেবীকে দেখতে পায়। দেবী-র সঙ্গে তার সাক্ষাৎ ঘটে আকস্মিকভাবে। দীঘি থেকে বের হয়ে আসে একটি শিকল— বণিককে বেঁধে নিয়ে নিয়ে যায় সেই শৃঙ্খল। জলতল আলো করে সিংহাসনের উপরে বসে ছিলেন দেবী মনসা। তাকে দেখার পর, অনির্বচনীয় সেই শক্তির স্বরূপ অনুভব করার পর কথা বলার শক্তি হারিয়ে যায় তার। বাড়ির লোকজনের অনুরোধে শেষ পর্যন্ত ঘটনাটি বলার সঙ্গে সঙ্গে তার মৃত্যু ঘটে। এই রকমই একটি কাহিনী পেলাম মালদহ জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর থানার গোহিলা গ্রামে। গ্রামে একসময় প্রবল বাঘের উপদ্রব ছিল, মহানন্দার জল ছিল গভীর। নদীপথের যাত্রীরা সেখানে সঙ্কট মোচনের উদ্দেশ্যে পাঁঠা মানত করত। এক জেলে একদিন জাল ফেলে জলে ডুব দেয়; আর ওঠে না। বেশ কিছুক্ষণ পরে দু'চারজন তাকে টেনে তোলে। তবে জেলে একেবারে বোবা হয়ে যায়। ছ মাস পরে বলে সে জলের তলে আশ্চর্য জ্যোতির্ময়ী নারী মূর্তিতে দেবী গোহিলা চণ্ডী তাকে দেখা দিয়েছিলেন। বস্তু· দেবী দর্শনের পরই তার মুখে কথা সরেনি!

বৌদ্ধতন্ত্রে দেবীর মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে ধ্যান মূর্তি অনুভূত হবার পর ভক্তের অনুরূপ অবস্থা হয়! এখানে হয়তোবা তেমনি কোন অনির্বচনীয় অভিজ্ঞতার কথা বলা হয়েছে। মুর্শিদাবাদের ঝিকরহাটি কিংবা বীরভূমের বাক পঞ্চমীর অনুষ্ঠানের একটি বিষয় (হরিশ্চন্দ্র পুর-মালদহের গোহিলা গ্রামেও) হল সাময়িকভাবে আড়াল হয়ে থাকা, ধ্যানস্থ থাকা (হয়তোবা দেবতার সঙ্গে একীভূত হওয়া)। এই বিষয়টি প্রায় অভিন্নরকমভাবে দেখেছি ছত্তিশগড়ের একটি লোক উৎসবে। অনুষ্ঠানটির নাম 'যোগী বৈঠনা'। প্রায় পাঁচ ফুট খাড়া গর্ত করে 'ওপরে তক্তা দিয়ে গর্ত বন্ধ করা হয়।' ওপরে বসানো হয় দেবী দন্তেশ্বরীর প্রতিনিধি স্বরূপ একটি এগার/বারো বছরের মাহার কন্যাকে। আশ্বিন মাসের কৃষ্ণা অমাবস্যার দিন এই কৃত্য শুরু হয়। আমাদের বাংলায় এই তিথিটি মহালয়া বলে পরিচিত। ছত্তিশগড়ে একে বলে 'কাছিনগাদী'। যোগী মাটির নিচের গর্তে পূর্বমুখ হয়ে বসে—'The Yogi sits there facing east'. নদিন পর— সন্ধিপূজার ক্ষণে ঐ হালোয়া যোগী মাটি ফুঁড়ে বের হন। এই চমৎকার লোকোৎসবের বিবরণ পেয়েছি শ্রীকানাই কুণ্ডু রচিত *ছত্তিশগড়ের লোকজীবন ও সংস্কৃতি* নামক গ্রন্থে (মনীষা, কলকাতা ; ১৯৮৬ ; ১২১-২২ পৃ :) ইংরেজি বাক্যটি ছিন্দওয়াড়া থেকে বের হওয়া 'Bulletin of the Tribal Research Institute'-এর। অনুষ্ঠানটির সঙ্গে ঝিকরহাটি গ্রামের দেয়াসীর মনসামন্দিরে আটক থাকার রীতি মিলিয়ে দেখা নিশ্চয় সম্ভব।

ক্ষীরগ্রামের প্রসিদ্ধ দেবী 'যোগাদ্যার বন্দনা' হিসেবে কৃত্তিবাসের নামে চালু। বর্ধমানের এই দেবীকে কৃত্তিবাস বলেছেন মহীরাবণ পূজিতা উগ্রতারা দেবী। তাকে পাতাল থেকে উদ্ধার করে ক্ষীরগ্রামে প্রতিষ্ঠা করেছেন হনুমান স্বয়ং। তার দুই কাঁধে থাকেন রাম ও লক্ষ্মণ, মাথায় উগ্রতারা। যে অনুর্বর ক্ষেত্রে শস্য হবে না— যেখানে ধরিত্রীর সৃজনশক্তি আটকে আছে হনুমান সেই মৃত্তিকাকে তুলে ফেলে উর্বর করার (সঞ্জীবনী দানের মাধ্যমে) চেষ্টা করছেন, এভাবে ভাবলে হালোয়া-যোগী, হনুমান, ঝিকরহাটি ও বাক পঞ্চমীর দেবীর পূজকদের সাধনপ্রণালী-র একটা ব্যাখ্যা মেলে। বাক্ অর্থাৎ মন্ত্র—মহাজ্ঞান। এ হল আমাদের দেশের আদিম সংস্কৃতির উপর যোগী-তান্ত্রিকদের আরোপ।

হনুমান রামায়ণের পৃষ্ঠা ছেড়ে বাংলার সংস্কৃতিতে বিচিত্র ভূমিকা নিয়েছেন। মনসামঙ্গলে হনুমান মনসার আজ্ঞাদাসের মতো। ধর্মমঙ্গলে লাউসেনকে হনুমানের সহায়তা বিখ্যাত। ধর্ম-মঙ্গলের কথা থাক, মনসামঙ্গলে হনুমানের ভূমিকা প্রধানত এই :

১. সমুদ্র মন্থনে বিশেষ দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। ব্রহ্মা যখন নির্দেশ দিয়েছেন :

মন্দার মন্থন দণ্ড বাসুকি টানা দড়ি।
হনুমান বাসুকির ধরিব লেঙ্গুড়ি॥ (২.১২.২১৮)

হনুমান মন্দার পর্বতটি নখের দাগ বসিয়ে উপড়ে নিয়ে এসেছেন। দ্বিতীয়বারের মন্থনের সময় হনুমান শিবের অনুরোধ স্বীকারে অক্ষমতা প্রদর্শন করেছেন। শুধু তাই নয়।

শ্রমযুক্ত হনুমান আর দৈত্যগণ।
দেবগণ নিরবধি করয়ে বারণ॥ (৩. ২. ১৭)

শিব ক্ষুব্ধ হলেন। বিষ উঠে এল। বাসুকি পাতাল ভুবনে পালালেন। হনুমান মন্দার পর্বতকে যথাস্থানে রেখে এলেন। তারপর শিবকে গরল ভক্ষণ করার শর্ত পালন করতে বললেন তিনি:

বিশেষ বুঝায়া শিবে পবন নন্দনে॥ (৩. ২. ২৪)

২. হনুমানের দ্বিতীয় কাজ চাঁদ সদাগরকে ভয় দেখাবার জন্যে কালিদহে দেহারা নির্মাণ:

মনসার আজ্ঞা পায়্যা মণ্ডবে লাগিল গিয়া
পাষাণ যোগান হনুমান॥ (৯. ৫. ৫১)

৩. চাঁদ সদাগর যখন বুহিত্র নিয়ে ফিরছেন, তখন কালিদহে তার ভরাডুবি ঘটালেন হনুমান।

পদ্মার ইঙ্গিতে বীর কোপে অবিশাল।
চাঁদোরে ভাসাইয়া ডিঙ্গা লইল পাতাল॥ (১০. ১১. ১৬৫)

হনুমানের এই পাতাল-সন্নিধি কার্যকলাপ আমার কাছে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ মনে হয়। আর ঐ ছত্তিশগড়ের যোগীর সঙ্গে হনুমানের সম্পর্ক কিছুটা স্পষ্ট হয় যদি আমরা নাথযোগীদের পরম্পরায় হনুমানকে খেয়াল করি। সেখানেও হনুমান ডারাইপুরের মাডুলি গঠনে হাড়িসিদ্ধাইকে পাথর ও অন্যান্য উপকরণ যোগান দিয়েছেন। একাজে অবশ্য মূল কাজটি পরিচালনা করেছেন বিশ্বকর্মা।

মনসামঙ্গলের কাহিনীর তাৎপর্য বিচার করার সূত্রে আমরা বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের সংশ্লিষ্ট কৃত্যের কিছু পরিচয় লিপিবদ্ধ করেছি। সেই সূত্রগুলিতে আবার ফিরে আসি। চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, অষ্টম, নবম, দশম, ষোড়শ, সপ্তদশ উদাহরণগুলি কৃষিক্ষেত্র-কৃষিকর্ম আর মনসাদেবীর সম্পর্কটি সুস্পষ্ট করে। কোনটিতে দেবী পূজিত হচ্ছেন নবান্ন উৎসবে, কোনটিতে কৃষির অনুকরণ করছেন বিবস্ত্র নারীরা— কোনটিতে কৃষিক্ষেত্রের মৃত্তিকা বয়ে আনা হচ্ছে, কোনটিতে নারীরা

অঙ্কুরোদগমের অনুষ্ঠান করছেন আর কোনটিতে অঙ্কুরিত শস্যকে কনে সাজিয়ে আর একটি নারীর সঙ্গে বিবাহ দেওয়া হচ্ছে। সমস্ত মিলিয়ে নিশ্চয় বাংলার কৃষক সমাজের কল্পবিশ্বটি মনসামঙ্গল ও তৎসংক্রান্ত কৃত্যাদিতে পাওয়া যাচ্ছে।

বিপ্রদাসের রচনায় নেই, তবে বেশ কিছু মনসামঙ্গলের কবিই একটি ঘটনা লিখেছেন— বচাই নামক চাষির সঙ্গে মনসার সম্পর্কের কথা। শিব কিশোরী রূপসী কন্যা মনসাকে তাঁর ফুলের সাজি বা করণ্ডীতে করে তার ভক্ত হালুয়া চাষি বচাইয়ের কাছে রেখে এলেন। বচাই অবিবাহিত তরুণ। ভাবল শিব তার জন্যেই পাত্রী পছন্দ করে এনেছেন। বচাই বিবাহের প্রস্তাব দেওয়া মাত্র মনসা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। বিজয় গুপ্ত লিখেছেন :

নাচিতে লাগিল বচাই হাতে তালি দিয়া।
মহাদেব জানে আমি করি নাই বিয়া॥
পরমা সুন্দরী কন্যা দিয়াছেন আনিয়া।
বিবাহ করিব আমি সজ্জা কর গিয়া॥
পদ্মা বলে হরি হরি অদৃষ্টের ফল।
বাপে আনি থুইল বচাই হইল বর॥

ক্রুদ্ধ মনসা তখন তাঁর স্বরূপ বদলালেন :

অমৃত নয়ন দেবী রাখিল চাপিয়া।
বিষ চক্ষে তাহারে দেখিল নিরখিয়া॥
তখনি ঢলিয়া পড়ে বচাই হাসিয়া।

(প্যারীমোহন দাশগুপ্ত-সংস্করণ ; ১৪-১৫ পৃ.)

বচাইয়ের মা এলেন, মহাদেব অনুরোধ করলেন, পদ্মার চরণে পুষ্পজল দিলেন বচাইয়ের মা। আর তখন

যে বিষ নয়নে দেবী এড়িল ঝাঁপিয়া।
অমৃত নয়নে তারে চাহে নিরখিয়া॥
ততক্ষণে জীয়ে উঠে বচাই হাসিয়া।
নাচিতে লাগিল তারা হাতে তালি দিয়া॥ (ঐ ; ১৫ পৃ.)

কৃষকদের প্রতিনিধি বচাইয়ের সঙ্গে দেবীর সম্পর্ক গড়ে উঠল এই প্রথম। এ জন্যেই লিখছিলাম, মনসামঙ্গল কাব্যের সঙ্গে বাংলার কৃষি-সংস্কৃতির সম্পর্ক গড়ে ওঠার যথেষ্ট প্রমাণ পেয়েছি।

বিপ্রদাসের রচনার একটি অংশ বেশ মনোরম— চিত্তরঞ্জনকারী। চাঁদ সদাগরের লাঞ্ছনা। বলাবাহুল্য, এখানে প্রক্ষেপ করানোর অবকাশ ছিল প্রচুর, গায়েনরা তা ব্যবহারও করেছেন। সেখানে একটি টুকরো ঘটনা আছে। চাঁদ সদাগর এক ব্রাহ্মণের গৃহে কৃষি শ্রমিক হিসেবে কাজ করছেন। নিযুক্ত হবার পর চাঁদ দিয়েছেন শর্ত :

আমি ত কৃষাণ বড় ক্ষেত্র কর্মে অতি দড়
থাকিবো তোমার গৃহবাসে।
ত্রিসন্ধ্যা ভোজন করি চারিখানি বস্ত্র পরি
এক তঙ্কা লই এক মাসে॥ (১০. ১৭. ৩০০)

বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের অকৃত্রিম রচনা হলে এখানে যতদূর সম্ভব বিপ্রদাসের দাবি মতো মাস মাইনে আরও কম হত। যাই হোক, ঐ ব্রাহ্মণ গৃহস্থের বাড়িতে কাজ করার সময় 'কাচি টোকা'

হাতে নিয়ে 'বুহিতা বাকুড়ি' সামলে আগাছা নিড়োতে গেছেন চাঁদ। মনসার মায়ায় ধানগাছের ফলন দেখে এক পথিক পাশ দিয়ে যেতে যেতে বলেছে :

ভাল ধান্যকড়া বিষহরি।

ধানের নাম বিষহরি! শোনার সঙ্গে সঙ্গে ক্রোধান্ধ চাঁদ কৃষিকর্মে অর্মাজনীয় ভুল করেছেন :

মনসার নাম শুনি কোপে জ্বলে নৃপমুনি
এথা কানি মোর বিদ্যমান।
বিবর্ণ বদন হইয়া দুই আঁখি পাকালিয়া
তৃণ এড়ি কাটে সব ধান॥ (১০. ১৭. ৩০৩)

ব্রাহ্মণ গৃহস্থ তখন 'ধান্যের দুর্গতি দেখে' যথেষ্ট লাঞ্ছনা করেছেন তাকে। বস্তুতপক্ষে, বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের কাহিনী নির্মাণের উদ্দেশ্য এখানে একটি সত্য উপহার দিতে চায়। মনসার নিন্দা করে, তাঁর অসহযোগিতার মধ্যে থেকে— সঠিকভাবে কৃষিকর্ম করা যায় না।

চাঁদের ছোট পুত্রবধূ— বেহুলা, তার কৃষি-সংক্রান্ত প্রকৃতপক্ষে উর্বরতা শক্তির পরিচয় যথেষ্ট। মুকুতা সরোবরে (বিপ্রদাসের লেখায় কখনো কখনো মুকুতা সহর) বৃদ্ধাবেশী মনসার সঙ্গে বিতর্ক করতে করতে বেহুলা স্পষ্ট জানালেন :

'চাঁদেরে সিজায়্যা দিব লোহার কলাই।' (১১. ৮. ১০৮)

চাঁদ সেকথা শুনেছেন। সেবককে ডেকে তিনি লোহার কলাই গড়িয়ে এনেছেন ('তুরিতে গড়ায়্যা আনে লোহার কলাই')। উজানী নগরে পাত্রী দেখতে গিয়ে চাঁদ সায়বেনেকে লোহার কলাই সিদ্ধ করে দেবার অনুরোধ করলে বেহুলার জননী সুমিত্রা অসম্ভব কর্মটি করতে পারলেন না। তিনি রান্নাঘরে বসে আছেন— তার ভাবনা :

হেন অসম্ভব বা সম্ভবে কোন ঠাঞি।
মানবে সিজাইতে পারে লোহার কলাই॥
... ...
রন্ধন তেজিয়া কান্দে দুঃখের আনলে। (১১. ১১. ১৬১, ১৬৩)

বেহুলা মায়ের কাছ থেকে দায়িত্ব নিলেন :

কাঁচা হাড়ি সরা কাঁচা পাতিল উনান।
সাত নান্দী কলাই সিজায় ততক্ষণ॥
মনসা চিন্তিয়া মাত্র তথি দেই জ্বাল।
ফেনা বান্দী বান্দী শীঘ্র ধরিল উথাল॥ (১১. ১২. ১৭০-৭১)

হাতে তুলে দেখলেন— 'যেন হইয়াছে ভাত।' চাঁদ খুশি হলেন— লোহার কলাই সিদ্ধ হয়েছে— দেখাতে হবে সনকাকে :

সুখে খায়্যা সম্বরিল লোহার কলাই।
কি হইল দেখাইতে সনকার ঠাঞি॥ (১১. ১২. ১৭৬)

লোহার কলাই সিদ্ধ করার ব্যাপারটি যে প্রতীক, তা বোঝা যায়। বেহুলার ভাসান যাত্রার সময় বিষয়টির তাৎপর্য বোঝার একটি সূত্র পাচ্ছি। সকলকে ডেকে বেহুলা দিলেন কিছু সিদ্ধ করা ধান।

সিজান হরিদ্র ধান আনিলেক বিদ্যমান
আজ্ঞিলেক সভা বিদ্যামানে।
যদি প্রাণনাথ জিবে তোরা ফল ফুল হবে
নিদর্শন লোক পরমাণে॥ (১২. ৩৭. ৪৭৪)

বেহুলার মধ্য দিয়ে সৃজনশীলতা ও উর্বরতা (Fertility-Cult-এর) শক্তির পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে এইভাবে। ফিরে আসার পর— ডোমনারীর বেশ ধরে সনকাকে ছলনা করতে গেছেন বেহুলা, তখন তিনি আর একবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন এইসব নিদর্শনের কথা। দ্বিজ বংশীদাসের রচনা থেকে উল্লেখ করবো :

কাজল কুট বাসরে শুনাই (= সোনাই) হৈল আগুসার।
আপনি খুলিয়া আছে মাঞ্জসের দ্বাব॥
আর কিছু বুঝিলেক সত্যেব প্রমাণ।
নালিতা ক্ষেত্রে ফলে উষনা আমন ধান॥

[দ্বিজবংশী দাস : *শ্রীশ্রীপদ্মাপুরাণ* ; উক্ত ; ২৫১ পৃ.]।

কাজল কুটবাসরে আপনা থেকেই 'মাঞ্জসের দ্বার' খুলে যাওয়ার বিষয়টি থেকে ঝিকরহাটির মনসাপূজার কৃত্য বা বাক পঞ্চমীর অনুষ্ঠানের তাৎপর্য বুঝতে নিশ্চয় সাহায্য করে।

কৃষি সংস্কৃতির দুটি দিক— (১) প্রকৃতির শক্তি ; (২) শস্যের শক্তি। প্রথমটি আকাশ-সূর্য-মৃত্তিকা-বায়ু-জল প্রভৃতির নিয়ন্ত্রক ; শস্যের শক্তি প্রথম শক্তির সাহায্যপুষ্ট। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ, আদিম ধরনের বিজ্ঞান-চেতনা ইত্যাদি বহুবিচিত্র প্রসঙ্গ মিলে আছে। পণ্ডিতরা দেখেছেন আদিম মানুষ প্রকৃতিকে ভয় ভক্তির মাধ্যমে এক ধরনের দৈবশক্তিতে বিশ্বাস করেছেন। তাদের প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ যেমন বিজ্ঞান-চেতনার নিকটবর্তী হয়েছে তেমনি তেমনি তাদের দেব-ভাবনাও বদলেছে। আদি দেবতাদের বিশ্ব সৃষ্টির রহস্য যেমন সর্বপ্রাণবাদ (animism)-কে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে, পরবর্তী সময়ের দেব-ভাবনা তেমন থাকেনি। ইতিমধ্যে শিকার-নির্ভর আরণ্যক সমাজ বদলে গেছে— পশুচারণ ও কৃষিকর্ম নির্ভর স্থায়ী জীবন যাপনের দিকে অগ্রসর হয়েছে মানুষ। স্বভাবতই তাদের দেব ভাবনায় এসেছে পরিবর্তন। বৃক্ষপূজা (Tree worship), পশু-রূপী দৈবশক্তিতে আস্থা (Zoo-morphism) আর নরাকৃতি দেবতা (anthrop morphism) -এর বিকাশ ঘটেছে। প্রথম দুটি স্তরে Totemism-এর জন্ম হয়েছে। Totemism-এর সঙ্গে সঙ্গে সমাজ স্থিতিশীলতার দিকে অগ্রসর হয়েছে— কমেছে অজাচার বা অনুরূপ স্বেচ্ছাচার ; সমাজ-গোত্র পরিবারের বিকাশ ঘটেছে।

॥ ২৩ ॥
মনসামঙ্গল কাব্যধারা ও ওসিরিস জাতীয় দেবতা

বাংলার মনসামঙ্গল কাব্যধারায় দেবতাদের যে গুচ্ছ (cluster of gods) দেখা যায় তাদের মধ্যে উপরে উক্ত বিভিন্ন সময়ের দেবভাবনার সম্পর্ক কিছু কিছু আছে। শিব-মনসার মধ্যে প্রাকৃতিক শক্তি ও সৃজনশীলতার পরিচয় পাওয়া গেছে, তার বিশ্লেষণ পূর্ববর্তী উপচ্ছেদগুলিতে সবিস্তারে উত্থাপন করেছি। পাশাপাশি কৃষক শ্রেণীর আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হিসাবে একজোড়া দেব-দেবী-কল্প চরিত্র গড়ে উঠেছে। বেহুলা-লখিন্দর-এর মধ্যে দিয়ে শস্য-প্রাণ দেবতারা গড়ে উঠেছেন। ফ্রেজার এই ধরনের দেবতাকে 'ওসিরিস জাতীয় দেবতা' বলে মনে করেছেন। এদের তিনি 'Dying god' নামে অভিহিত করেছেন। মিশরে প্রাচীনকালে অত্যন্ত জনপ্রিয় ওসিরিস-এর কাহিনীর বিভিন্ন স্তর খেয়াল করেছেন বিশেষজ্ঞরা। প্রথমে ওসিরিস ছিলেন 'a god of the dead', শেষে ওসিরিস হয়ে দাঁড়ালেন কৃষির দেবতা : 'now Osiris became the tutelary deity of the fertile land of the Nile Valley, the god of floods and

vegetation.' ("Egyptian Mythology" ; Veronica Ions ; The Standard Literature Co. (P) Ltd. 1968 ; 127 পৃ: এবং 129 পৃ.)। ফ্রেজার লিখেছেন— '....the myth and ritual of Osiris may suffice to prove that in one of his aspects the god was a personification of the corn, which may be said to die and come to life again every year.' ('The Golden Bough'...... ; উল্লেখিত ; 377 পৃ.)। বেহুলা-লখিন্দরের গল্প অনেকটাই এইরকম একটা ছক ধরে অগ্রসর হয়েছে। শস্য বপন করার পর শস্য-প্রাণ দেবতার মৃত্যু আর ছ'মাস পরে ফসল-সহ ফিরে আসার কাহিনী ওসিরিসকে ঘিরে গড়ে উঠেছিল।— 'The festival appears to have been essentially a festival of sowing, which properly fell at the time husbandman actually committed the seed to the earth. On that occasion an effigy of the corn-god, moulded of earth and corn, was buried with funeral rites with the new crops.' ('The Golden Bough'... ; উল্লেখিত)।

লখিন্দরের বিবাহ-বাসরে সহসা ক্ষিদে পায়। বেহুলাকে লোহার বাসরের মধ্যেই রান্না করে খাবার পরিবেশন করতে বললেন লখিন্দর।

বিধাতার লিখিত কেবা করে খণ্ডিত
বিভুক্ষিত রাজার নন্দন।
বেহুলা ধরিয়া করে বলে বালা লখিন্দরে
শুন রামা করহ রন্ধন॥ (১৩. ২৬. ৩৩৫)

বেহুলার পক্ষে এ কাজ করা সম্ভব নয়— কোন 'অনুচরী' নেই, কাষ্ঠ নেই, জল নেই, 'হাঁড়ি-চালু-আজন' নেই— 'তিহড়ি কাটিতে নাহি স্থান'। বেহুলাকে অনুরোধ করলেন লখিন্দর : মঙ্গলিয়া হেম হাঁড়িতে নারিকেলকে 'তিহড়ি' করে 'পুরাতন বস্ত্র চিরি', 'ঘৃত সমযোগ করি', উনুন জ্বেলে রান্না করতে হবে। নারিকেল জল দিয়ে অন্ন রান্না করতে হবে। নিরুপায় বেহুলা তাই করলেন। লখিন্দর 'সন্তোষে ভোজন' করে কিছু অন্ন রেখে দিলেন— বাসনা বেহুলা খাবেন। তার অনুরোধ :

শুন সুবদনি লও এই অন্ন তুমি খাও
বিশেষে আমার যত্ন তোরে। (১৩. ২৬. ৩৪২)

বেহুলা কিছুতেই এ অনুরোধ মান্য করলেন না। তার স্পষ্ট কথা : 'আছে কিছু অনুমান/আজি যত্ন না করিয় মোরে'।

বিবাহবাসরে মঙ্গল-হাড়ির অন্ন রন্ধন ও খাওয়ার মধ্যে এক ধরনের প্রতীকি ব্যবহার আছে। বাংলার মনসামঙ্গলের কবিরা সবাই এ বিষয়ে অমঙ্গলের আশঙ্কা শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছেন। বিজয় গুপ্তের রচনায় আছে :

লাখাইর বচনে বেহুলা লজ্জিত হইল মন।
কি দিয়া রাঁধিবে বেহুলা ভাবে মনে মন॥
কোথা পাব চাউল কাষ্ঠ কোথা পাব হাঁড়ী।
এত রাত্রে যাব আমি কোন বাণিয়ার বাড়ী॥
চাউলে পাখালে বেহুলা ঘটের দিয়া পানী।
নেতের আঁচল দিয়া জ্বলিল আগুনি॥

তিনদিকে দিল বেহুলা তিন নারিকেল।
চাউল প্রমাণে বেহুলার হাঁড়ীতে দিল জল॥
দৈবের নির্বন্ধ যাহা খণ্ডে কার বাপে।
বেহুলা রন্ধন করে লখাইর নিদ্রা চাপে॥

(প্যারীমোহন দাশগুপ্ত সংস্করণ ; উক্ত ; ১৯৬ পৃ.)

উড়িষ্যার কবি দ্বারিকা দাস লিখেছেন প্রায় একই ভাষায়। তবে তিনি জনমানসের সংস্কার বা আশঙ্কাটি আরও বিস্তৃতভাবে উত্থাপন করেছেন। লখিন্দর নিদ্রা থেকে উঠে, তৃতীয় প্রহর রাত্রিতে বেহুলাকে ক্ষিদে পাওয়ার কথা বলেছেন :

শুনগো সায়ের সুতা আমার বচন।
লাগিল দারুণ ক্ষুধা নাইক চেতন॥
মস্তক ফিরায় কর্ণে নাই শুনি আর।
অন্ন দিয়া শরীর রাখহ পুনর্বার॥

বেহুলা দুশ্চিন্তিতা। তার ভাবনা :

লোহার বাসরে তুমি কোথা খাবে ভাত॥
বিভাদিনে পূর্বা পর আছে দেবাসুরে।
অন্ন কেহ খায় নাই প্রভু বাস ঘরে॥
('উড়িষ্যার সাধক কবি দ্বারিকা দাসের "মনসামঙ্গল" ;
সম্পাদনা : বিষ্ণুপদ পাণ্ডা ; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ; ১৯৭৯ ; ৬৪ পৃ.)

আর তো মোটে ছয় দণ্ড, তারপর রাত্রি শেষ হবে— তখন অন্ন খাওয়া যাবে। তাছাড়া 'বিভারাত্রে অন্ন খেলে দুঃখদশা হয়।' (দ্বারিকা দাস : 'মনসামঙ্গল' ; উক্ত ; ৬৪ পৃ.)। লখিন্দর বললেন— 'ছয় দণ্ড ছয় যুগ হইল আমার।' সুতরাং তার পরামর্শ :

দেখ নারিকেল আছে লোহার বাসরে।
মঙ্গল হাণ্ডিতে তণ্ডুল আছে ঘরে॥ (ঐ ; ৬৫ পৃ.)

কি আর করেন, বেহুলা তখন নারিকেলের তিন 'ঝিঙ্ক' বসিয়ে রান্না করলেন— নারিকেল জল দিয়ে রান্না হল ; পরিধানের বস্ত্র চিরে অনল জ্বালানো হল। খাবার কিছু রয়ে গেল— লখিন্দর বেহুলাকে তা খেতে সনির্বন্ধ অনুরোধ করতে লাগলেন—

মোর দিব্য আছে রামা অন্ন খাও বলি। (ঐ)

বেহুলা জানেন— 'স্বামীর আগ্যা' লঙঘন করলে 'দুইলোকে দুঃখ' থাকে। আবার 'বিভারাত্রে অন্ন খেলে দুঃখদশা' অনিবার্য। সুতরাং উভয় সঙ্কটে পড়লেন তিনি। খাবার খেতে যাবেন এমন সময়—

হইল আকাশ বাণী শুন গো বেহুলা।
না খাইঅ অন্ন তুমি ভুলিয়া অবলা॥ (ঐ ; ৬৬ পৃ.)

বক্তী মনসা স্বয়ং। জানালেন— স্বামী তার মরবেন। আর

নারিবে বাঁচাতে কৈলে উচিষ্ট ভক্ষণ। (ঐ ; ৬৬ পৃ.)

দ্বারিকা দাসের মনে নিশ্চয় এই তীব্র অমঙ্গলজনক ঘটনার বিষয়টি জেগে ছিল। সৃজনের উৎস লগ্নে— নরনারীর বিবাহ (এবং বিবাহের মতোই শস্য বপন ও ধরিত্রীর প্রসূতি হবার প্রক্রিয়া) রাত্রে ভোগ নয় সংযম প্রয়োজন। বিপ্রদাসও সেই কথা জানতেন, তিনি নাটকীয় ভঙ্গিতে তার

কথা বা আখ্যান তৈরি করেছেন। দ্বারিকা দাসের মনে— তাঁর শ্রোতৃমণ্ডলী এই আখ্যানের তাৎপর্য বুঝবেন কি না সন্দেহ ছিল ; তাই তিনি ঐ আকাশবাণীর প্রসঙ্গ এনেছেন। কৃত্য ও ব্রতাচারের উৎস লগ্নের সঙ্গে মঙ্গলকাব্য রচনার সময়ের মধ্যে প্রচুর স্মৃতি-বিস্মৃতির চিহ্ন ও ছিন্ন সূত্র থাকার কথা। মনসার আকাশবাণী দ্বারিকা দাসের মনের গড়নটিও আমাদের মনে করিয়ে দিচ্ছে। বাংলার কোন মনসামঙ্গল কবি এরকম লেখেন নি। কারণ কাহিনীর গঠনগত তাৎপর্যের সঙ্গে এর সঙ্গতি নেই। বাংলা মনসা মঙ্গলে যে যুক্তিটুকু আড়ালে রয়েছে তা হল— শস্য-ও প্রাণ-এর উৎস ও উর্বরতার নিয়ন্ত্রক দৈব শক্তিকে অশ্রদ্ধা ও চঞ্চল করার জন্যই (চাঁদ মনসার উপর ক্রুদ্ধ; লখিন্দরও বিবাহ রাত্রে মঙ্গল হাঁড়ির অন্ন রন্ধন করেছেন) লখিন্দরের মৃত্যু ঘটল। এথেকে বোঝা যাচ্ছে, কাহিনীটি আসলে বাংলার গাঙ্গেয় অঞ্চলেই প্রথম তৈরি হয়েছে পরে তা উৎকলে গেছে।

শ্রী রামবিনোদের কাব্যেও একই প্রসঙ্গে রয়েছে। 'বাসরে লখাইয়ের ক্ষুধা পেল। কারণ, শ্বশুরালয়ে লজ্জাবশত লখাই বেশী পরিমাণ আহার করেনি। লখাই বিপুলাকে রান্না করে তখনই কিছু খাওয়াতে বলল। ......বিপুলা রান্নার উপায় চিন্তা করল। শেষে কাপড় ছিঁড়ে তাতে ঘি ঢেলে আগুন জ্বালা হল। তিল নারিকেল দিয়ে 'তিয়ড়ি' প্রস্তুত করা হল। সোনার বাটায় জল ভরে তাতে আতপ তণ্ডুল দিয়ে অন্নব্যঞ্জন বাঁধা হল।' (ড. মুহম্মদ শাহজাহান মিঞা : 'শ্রী রায় বিনোদ : কবি ও কাব্য' ; উক্ত ; ১০২-১০৩ পৃ. ; মনে হতে পারে, তিন নারিকেলের তিহড়ির স্থলে শাহজাহান তিল নারিকেল দিয়ে তিহড়ির কথা লিখেছেন। এখানে খুব সম্ভব পড়তে ভুল করেছেন শাহজাহান। আগেই লিখেছি শ্রী রামবিনোদের স্থলে তিনি ভুল করে শ্রী রায়বিনোদ লিখেছেন। বোঝা যাচ্ছে, শাহজাহান পাঠ নির্ণয়ের ব্যাপারে খুব সচেতনতার পরিচয় রাখেননি। একটু কষ্ট কল্পনার সাহায্য নিলে রাম বিনোদের ভাষ্য ও ড. শাহজাহান মিঞার পাঠের সঙ্গতি বিধান করা যায়। তিন সাজিয়ে তার ওপর নারিকেল স্থাপন করে ঝিক তৈরি করতে পারেন বেহুলা! তিলও মাঙ্গলিক। সুতরাং হতেও পারে রামবিনোদ তিলই লিখেছিলেন। তবে একটি বিষয় মনে রাখতে হচ্ছে রামবিনোদের লেখাতে একটু আগেই সোনার বাটায় জল রাখার কথা পাচ্ছি। এই জল নারিকেল থেকে নেওয়া হলে (যা হবার সম্ভাবনা খুব বেশি— বহু মঙ্গ লকাব্যেই সে কথা সমর্থিত) নারিকেলের মালাকে ঝিক বানাবার জন্য তিল সাজানোর প্রয়োজন নেই।

চৈতন্যদাসের চার পালায় সমাপ্ত 'মনসামঙ্গলে'র পাঠে দেখছি বেহুলাকে বাসরঘরে লখিন্দর বললেন 'রন্ধন করহ অন্ন প্রাণের ললনা'। বেহুলা বললেন :

> বন্দী আছি মোরা দোঁহে ঘরে ভিতর॥
> কোথা পাব চাউল কোথা কাষ্ঠ হাঁড়ি।
> কিবা দিয়া প্রাণনাথ পাতিব ডেউড়ি॥
> [*মনসামঙ্গল : চৈতন্য দাস বিরচিত* ; তারাচাঁদ দাস এন্ড সন্স প্রকাশিত ; প্রকাশ কাল দেওয়া নেই। ৪৭ পৃ.]

নারিকেল দিয়ে 'চুলী' পেতে নারিকেল জলে ভাত চাপিয়ে দিয়ে, বসন ফিরে আগুন জ্বালালেন।

> 'বিষহরি স্মরি ধনি করয়ে রন্ধন।' (ঐ)

লখিন্দর বেহুলাকেও খেতে বললেন। বেহুলা রাজি নন।

না বল খাইতে মোরে ওহে গুণমণি।
আজি মম বিভা হৈল ওহে প্রাণেশ্বর।
খাইতে নিষেধ আছে শুন অতঃপর॥ (ঐ ; ৪৮ পৃ.)।

চৈতন্যদাসের রচনার পরিচয় এর আগে কোথাও দেখেছি বলে মনে হয় না। ইনি অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি হবেন। কবি বৈষ্ণব ছিলেন। দু'-একটি ভণিতায় পাচ্ছি :

চৈতন্যদাস দিয়া কৃষ্ণ পদে মন।
লিখিল মনসা লীলা অন্তিম মোচন॥ (ঐ ; ৪ পৃ.)

বা

চৈতন্য দাস কবি কৃষ্ণ পদে মন।
মনসামঙ্গল গায় পুলকিত মন॥ (ঐ ; ৭ পৃ.)

চৈতন্যদাস নামটিও কবির সময় বুঝতে সাহায্য করে। এ রচনায় লখিন্দর স্থলে নখিন্দর ছাপা হয়েছে। (মুদ্রাকর শ্রীসাগরচন্দ্র সামন্ত)। ল এর ন-এর কাছাকাছি রূপ অষ্টাদশ শতাব্দীর পুথিতেই ব্যাপকভাবে পাওয়া গেছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার হেতু দেখিনা। উৎসাহী পাঠক আমার লেখা *বাংলা পুথির নানাকথা* শীর্ষক বইটি দেখতে পারেন। (সূত্র নির্দেশ আগে করেছি)। চৈতন্য দাসের ভাষ্য উল্লেখ করলাম— এর আগে এই কবির পরিচয় কোন সাহিত্য-ঐতিহাসিক উত্থাপন করেন নি বলে।

যশোহর জেলার মল্লিকপুরের কবি শ্রী কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিবরণে এই কাহিনীর অংশটি সম্পূর্ণভাবেই চৈতন্যদাসের মতো। কেবল ভণিতা নেই। দ্বিজ কালী কিংবা চৈতন্য-দাস কে উত্তমর্ণ বলতে পারলাম না। তবে কালীপ্রসন্নের রচনার অন্যত্র মৌলিকত্ব কিছু আছে। এ নিয়ে প্রাসঙ্গিক আলোচনা অন্যত্র করা যাবে। আপাতত একথা বললেই হবে কালীপ্রসন্নের রচনাতেও পাচ্ছি বেহুলা রন্ধন করেছেন, অনিচ্ছা সত্ত্বেও। স্বামীর নির্দেশ মেনে ভুক্তাবশিষ্ট খাচ্ছেন না। (পশ্য। শ্রীনন্দলাল শীল সম্পাদিত "মনসামঙ্গল" ; যশোহর মল্লিকপুর নিবাসী বন্দ্যঘটীয় শ্রীকালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন প্রণীত ; প্রকাশক বেণীমাধব শীল'স লাইব্রেরী ; কলকাতা; ১৩৯৮ বঙ্গাব্দ ; ৫১ পৃ.)।

শ্রীক্ষমানন্দ দাস-এর নামে চালু মনসার ভাসানেও আছে একই রকম বর্ণনা। লখিন্দরের ক্ষিদে পেল ('ক্ষুধায় আকুল প্রাণ লাগে ভোঁচকানি') বেহুলা জানালেন সমস্যার কথা :

লোহার বাসরে বন্দী কোথা পাব ভাত॥
মঙ্গলিয়া চাল ছিল মঙ্গলিয়া হাঁড়ি।
তিন নারিকেল দিয়া সাজান তিওড়ি॥
নারিকেল জল দিয়া দিলেন ভাতানি।
বাসরে রন্ধন করে বেহুলা নাচনী॥
নেতের অঞ্চল চিরি জ্বলিল আগুন।
হেথায় দেবীর ক্রোধ বাড়িল দ্বিগুণ॥

'মনসার ভাসান' : শ্রীকেতকানন্দ দাস সাহায্যে শ্রীক্ষমানন্দ দাস কর্তৃক বিরচিত ; অক্ষয় লাইব্রেরি ; প্রকাশ কাল দেওয়া নেই ; ৩৬ পৃ.]

দ্বারিকা দাসে দেখলাম রান্না করা খাবার স্বামীর ভুক্তাবশিষ্ট খেতে যাওয়ায় সময় মনসা আকাশ বাণী করেছেন আর এখানে আগুন জ্বালার সময় দেবীর দ্বিগুণ ক্রোধ বেড়েছে।

নারায়ণদেবের রচনায় রন্ধনের কথা নেই। বেহুলা স্বামীর অনুরোধে পরিবেশন করেছেন ফলাহার।

> এক মুষ্টি চাউল নাহি লোহারবাসর॥
> কাষ্ট খড়ি নাহি প্রভু নাহি গঙ্গাজল।
> কি দিয়া করিব রন্ধন লোহার বাসর ঘর॥
> চাউল সজ্জ নাহি আর নাহি খড়ি।
> এ মেঘ আধার রাত্রে যাব কার বাড়ি॥
> কলসীতে জল নাহি যমুনা বহু দূর।
> কোন ছলে বাহির হইব দুয়ারে শ্বশুর॥
> ইরিনী ধানের চিড়া আছে মর্তমান কলা।
> কলার করিতে লখাই বলিল বিপুলা॥

যাই হোক, শ্বশুরবাড়িতে 'পঞ্চগ্রাসী' করে বাসররাত্রে খাদ্যগ্রহণ উত্তর-পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের কবিদের কারো ভাষ্যেই কোন ভাবে লোক সমর্থন পায়নি। মনসামঙ্গলের কবিরা এই কাহিনী গড়ে তুলেছেন তেমন একটি অবকাশ সৃজনের জন্যেই।

আসামে প্রচলিত নারায়ণদেবের মনসামঙ্গলে এই প্রসঙ্গ নেই। গোয়ালপাড়া অঞ্চল থেকে প্রচলিত মনসামঙ্গল গান সংগ্রহ করে চমৎকার গবেষণা করেছেন প্রাণেশ্বর রাভা। তাঁর সংগ্রহে প্রসঙ্গটি সবিস্তারে উপস্থিত। বেহুলাকে লখিন্দর বলছেন, পিত্রালয়ের খাবার ভাল করে খাননি তিনি, বেহুলার হাতের রান্না খাবার বাসনা হয়েছে তাই—

> থালতে খালুং ভাত ঘৃতে খালুং ভাত।
> তোর হাতে খাবা কন্যা বর হাবিলাস॥

(*মায়াবন্তী বিষহরি* ; উক্ত ; ৩৬৮নং গান)

কিন্তু কোথায় হাড়ী, কোথায় বেড়ী— কোথায় জল? লখিন্দর সমাধান সূত্র দিয়েছেন—

> ডুলিতে আছে চাউল ঘটেতে আছে জল।
> ঘির প্রদীপ জ্বলি আছে মেরর ভিতর॥

(ঐ)

লখিন্দর সেই খাবার খেলেন। গোয়ালপাড়ার কবিরা বেহুলাকে দিয়ে বহু বিচিত্র রান্না করিয়েছেন। শিবকে স্মরণ করে ('শিব সুঙরিয়া') তিনি রান্না করেছেন কাঁচকলা, বালী মাছ দিয়ে শুক্ত, কবুতরের মাংস (ঘিয়ে ভাজা), পাভোয়া মাছ, মুসুরির ডাল ('মচুরীরে ডাল'), মাগুর মাছ, শূল পক্ক বগরী ('বগরীর শুলা'), চিংড়ি মাছ (ঘনকরে), টেংনা মাছ (ঝাল দিয়ে)— প্রভৃতি। এত রান্নার উপকরণ বেহুলা পেলেন কোথা থেকে? গোয়ালপাড়া কবিরা এর সদুত্তর দেন নি। বাংলার কোন কোন কবিও এরকম বিচিত্র অবকাশে বিস্তৃত রন্ধন কার্যের বিবরণ দিয়েছেন।

জগজ্জীবন ঘোষালের 'মনসামঙ্গল'-এ উপরের বর্ণিত বাংলা মনসা কাব্য ধারায় এই প্রবণতা ধরা পড়ে। বেহুলাকে বাসরে রান্না করতে বলছেন লখাই। 'বান্ধ অন্ন ব্যঞ্জন সন্তোষ করি খাই।' একইভাবে বেহুলা বলেছেন তাঁর সমস্যার কথা :

> বোলী বোলে এত রাত্রে কতি পাব সাজ।
> কেমতে রন্ধন করি মেড় ঘর মাঝ॥

লখিন্দর বললেন, সমস্যা সমাধানের কথা :

বালা বোলে নারিকেল তিহড়ি করিয়া।
অন্ন বান্ধ সুন্দরী মঙ্গল চাউল দিএগ।।

[জগজীবন ঘোষাল : মনসামঙ্গল ; উক্ত ; ২১৬ পৃ.]

অবশ্য এখানে সামান্য পরিবর্তন ঘটাচ্ছেন জগজ্জীবন। অন্নপূর্ণা স্বয়ং বেহুলার সমস্যা সমাধান করেছেন :

অন্নপূর্ণা রূপে পার্বতী দিল বর।
নানা দ্রব্য হইল বালীর মেড়ের ভিতর।।

(ঐ ; ২১৬ পৃ.)

নিতান্ত অবিশ্বাস্য এই প্রক্ষেপ। বেহুলা অভয়া-চণ্ডীর ভক্ত—এরকম কথা অন্যত্র পাইনি। বিবাহ বাসরে অত ব্যঞ্জন রান্না করা অস্বাভাবিকও বটে। গোয়ালপাড়ার 'মায়াবন্তী বিষহরি' ধারার সঙ্গে জগজ্জীবন ঘোষালের রচনার মিল খুঁজে পাচ্ছি। জগজ্জীবন কাহিনীতে আরও কিছু বৈচিত্র্য এনেছেন। ঘুমন্ত স্বামীকে রন্ধনের পর কিছুতেই জাগাতে পারলেন না বেহুলা। তখন তার খেদ:

অন্ন যদি না খাহ তাম্বুল ধর খাঅ।

এবং শেষে বাধ্য হয়ে বেহুলা করলেন কি—

অন্ন ব্যঞ্জনে বালী পাতিল ভরি রাখে।

[জগজ্জীবন ঘোষাল : মনসামঙ্গল ; উক্ত ; ১৮ পৃ.]।

এই তপ্ত ব্যঞ্জনে তপ্ত ভাত পরে ভাসান থেকে ফিরে বেহুলা প্রদর্শন করে নিজস্ব সতীত্ব জাহির করবেন, এরকম পরিকল্পনা জগজ্জীবনের ছিল বলে মনে হয়। ভাসান-যাত্রার শেষে, ফিরে এসে বেহুলা নিদর্শন দেখিয়েছেন :

বালীর বচনে বালা চলিল সত্বরে।
প্রবেশ করিল গিএগ মেড়ের ভিতবে।।
অন্ন ব্যঞ্জনে আছে নাই হয় বাসি।
দেখিএগ সুন্দরী বালী মনে মনে হাসি।।
বেননীয়ে বোলে আমি নহি সতী হীন।
মোর সতী পণা প্রভু এইসব চিহ্ন।।

(জগজ্জীবন ঘোষাল ; মনসা মঙ্গল ; উক্ত ; ৩৫৭ পৃ :)

সুতরাং মনসামঙ্গলের কাহিনীতে বাসর রাত্রে মঙ্গল হাড়িতে মঙ্গল চাউলের ভাত রান্না একটি সুপরিচিত অভিপ্রায় (motif)। এর আড়ালে মানুষের সৃজনশীলতা, ভোগ, লালসা ও কামনা-বাসনার সঙ্গে প্রকৃতির সমান্তরালতা বিজড়িত রয়েছে।

ওসিরিসের পুরাকথার সঙ্গে বিবাহরাত্রে লখিন্দরের মৃত্যু— সেইরাত্রে অরন্ধনের ইঙ্গিত, কামুকতা ও লোভকে একাকার করে দেখা আর ছমাস পরে বেঁচে ফিরে আসার মিল যথেষ্ট। এখানে বেহুলা আর লখিন্দর শস্যপ্রাণ দেবতা-দম্পতী হয়ে উপস্থিত। বাংলার মনসামঙ্গল কাব্যধারায় তার বহুবিচিত্র রূপায়ণ দেখানো সম্ভব। আমরা সামান্য কিছু উদাহরণ দিলাম।

দক্ষিণ ২৪ পরগণার জনপ্রিয় লোকাচার 'রান্নাপূজা' রাঢ়ের জনপ্রিয় লোকাচার অরন্ধন বা শীতল এইরকম একটি অভিপ্রায়কেই নির্দেশ করে। 'শীতল' শব্দটি রাঢ় বাংলার। আগের রাত্রে রান্না করে পরের দিন খাওয়ার রীতি। স্থানীয়ভাবে দেবদেবীর ভোগ হিসেবেও ঠাণ্ডা খাদ্য উৎসর্গ

করার নাম 'শীতল-ভোগ'। বাংলার সর্বত্র 'কালরাত্রি' পালনের রীতি বিদ্যমান। বিবাহের পরদিন বাসরঘরে স্বামী স্ত্রী সম্বোধন নিষেধ। এই নিষেধাজ্ঞা বা taboo -র কারণ সন্ধান করা দরকার। তার আগে আবার কিছু উদাহরণ সংগ্রহ করছি।

১. লখিন্দর কামনায় অধীর হয়ে বেহুলাকে কামনা করলে বেহুলা তাকে নিবৃত করেছেন কোনক্রমে। শ্রীরাম বিনোদের রচনা :

তুমি প্রভু বিদগ্ধ নাগর কেশর।
নবীন বালিকা আমি খিন কলেবর॥

শেষে বেহুলার কথা :

তপ্ত দুগ্ধ পান কৈলে কিবা স্বাদ তার।
অল্পে অল্পে আশা তবে পুরিবে তোমার॥

(ড. মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া সম্পাদিত;
শ্রী রামবিনোদের মনসামঙ্গল ; উক্ত ১০৩ পৃ.)।

২. জগজ্জীবন ঘোষালের বেহুলাও শ্রী রামবিনোদের মতোই স্বামীকে বাকছলে নিরস্ত করেছেন। তার কথা :

বিভারাত্রে সুরতি না কর মন্দ কাজ।
ত্রিভুবনে কলঙ্ক পাইবে মহালাজ॥

শুধু কি তাই। কাঁচা বেল, কাঁচা ডালিম্ব খাওয়া উচিত নয়— 'খাইতে লাগে কস'। 'কলিকা কমলে' মধু মেলে না—সুতরাং ভ্রমর বসা অনুচিত। 'কাঁচা দুগ্ধ' খাওয়া তো 'পানির সমান' (এখানে রামবিনোদের উপমা জগজ্জীবনে পাল্টে গেছে), কাঁচা হাড়ি 'শুখাএগ্রা পোড়াএগ্রা' নিতে হয়, 'কাঁচাখেড়'-এ চাল হয় না, 'তরলা বাঁশের ধনু' বানানো অসম্ভব। বেহুলার কথার নির্যাস:

নারী আর নারিকেল আর গুয়া তাল।
কাঁচায় উত্তম নহে পাকিলে হয় ভাল॥

[জগজ্জীবন ঘোষাল : মনসামঙ্গল ; উক্ত ; ২১৩ পৃ.]

বেহুলা তাকে আরও জানিয়েছেন—

তেজ প্রভু নাগর সুরতি-অভিলাষ।
আজি শুভে শুভে স্বামী বঞ্চি সুখবাস॥ (ঐ)।

এই অবসরে বেহুলার কথন ভঙ্গিতে একটি উপমা আমাদের কাছে বেশ তাৎপর্যপূর্ণ বোধহয়:

প্রথমে রোপিলে গাছ নিত্য দিয়ে জল।
যতন করিলে গাছে খাই তার ফল॥ (ঐ ; ২১২ পৃ.)

৩. একই পরিস্থিতিতে *মায়াবন্তী বিষহরি*-তে বেহুলা প্রায় একই ভাষায় লখিন্দরকে নিরস্ত করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর কথা এই আকাঙ্ক্ষা অনুচিত ('ভাল না হয় ভাল না হয় প্রভু তোর মতি') কারণ বিবাহরাত্রে স্ত্রীসঙ্গ নিষিদ্ধ ('বিয়ার রাত্তি হরিলে ওই যাবি অধোগতি')— যে গরুর দাঁত বের হয় নি তাকে দিয়ে চাষকর্ম করা অনুচিত, তাতে হাল-লাঙ্গলের ক্ষতি অনিবার্য। এই গানগুলি যে জগজ্জীবন সহ বাংলার মনসামঙ্গল কাব্যধারারই অন্তর্গত তার প্রমাণ *মায়াবন্তী বিষহরি* ভাষ্যে। বেহুলা বলছেন :

কমলা কলকে ভাদুলী চুহি যায়।
দিনকে দিন সেই কল মণিয়া পরি যায়॥

কাঁচায় খনে কল জিভাত ধরে কষ।
পাকাই খালে কল বর লাগে রস॥

একইভাবে মিষ্টান্ন গরম গরম পরিবেশন অনুচিত ('দিনেক দিনে খালে মিঠাই সিও লাগে তিতা'), দৈ যেমন সাজি রেখে খেতে হয় নারী সম্ভোগও তেমনি সংযমের সঙ্গে ভোগ করা বিধেয়।

৪. বিজয় গুপ্তের রচনায় পাচ্ছি লখিন্দর ঘুম থেকে উঠে বেহুলার রান্না করা সমস্ত খাবারই খেয়ে নিয়েছেন :

সকল অন্ন খাইল লখাই হাড়ীতে নাহি ভাত।
ভৃঙ্গারের জলে লখাই পাখালিল হাত॥

(প্যারীমোহন সংস্করণ ; উক্ত ; ১৯৬ পৃ.)

খাবার পর রতিপ্রার্থী লখিন্দরকে বেহুলা নিরস্ত করেছেন। এই ভাষা রামবিনোদ-এর রচনায় প্রায় একই ভাবে পেয়েছি। বিজয় গুপ্তের রচনার কিছু অংশ নিশ্চয় রামবিনোদে প্রক্ষিপ্ত হয়েছিল।

লখাই বলে শুন প্রিয়া সাহের কুমারী।
আলিঙ্গন দেও মোরে বাণিয়া সুন্দরী॥
বেহুলা বলেন প্রভু এই দুরাচার।
বিয়ার রাত্রিতে নাহি এমত ব্যবহার॥
... ...
অখণ্ড-কলিকা প্রভু নাহি গন্ধবাস।
বিকসিত কমলে প্রভু ভ্রমরে করে আশ॥
দিন দুই থাক প্রভু চিত্ত সংযমিয়া।
পরশ্ব ভুঞ্জিও রতি সর্ব চিত্ত দিয়া॥
তপ্ত তপ্ত দুগ্ধ প্রভু খাওন না যায়।
জুড়াইয়া খাইলে প্রভু অধিক স্বাদ পায়॥ (ঐ ; উক্ত ; ১৯৬ পৃ.)

৫. বিচিত্র উপায়ে রান্না করা খাদ্য সামান্য খাবার পর লখিন্দর বিপ্রদাসের রচনায় বেহুলার শরীর প্রার্থনা করেছেন।

হানিল কামের বাণ দেহ সুধা করি পান
অন্তরেতে হইনু বিকল॥ (১২. ২৭. ৩৪৫)

বেহুলা তাকে নিবৃত্ত করতে চেয়েছেন।

পুট চাটু বেহুলা নিগদে সবিনয়।
না করিহ যত্ন প্রভু আজি যুক্ত নয়॥
আছে ত িশেষ কিছু কালিনিশা খিনি।
জন্মে জন্মে পতি তুমি আমি ত রমণী॥ (১২. ২৮. ৩৫০)

উদ্ধৃত পাঠটির ভেদ আছে সুকুমার সেনের সম্পাদিত *মনসা বিজয়*-এ। তৃতীয় পংক্তির বদলে আছে— 'আছে ত বিশেষ কিছু কালিনি সাখিনি।' (*Manasa-Vijay* ; এশিয়াটিক সোসাইটি প্রকাশিত ; উক্ত ; ২০০ পৃ.)। পাঠটি ভুল। সঙ্কীর্ণ কাল-রজনী (ক্ষীণ কালিনিশা)-র ইঙ্গিতটি সুকুমার সেন ধরতে পারেননি। যাই হোক, এরপরও লখিন্দর জোর করতে থাকলেন। বেহুলা

পূর্বজন্মের কথা— মোক্ষলাভের আকাঙক্ষা চরিতার্থ করতে চাওয়া— প্রভৃতি বিভিন্ন অজুহাত দিলেন, বললেন :

না কর পাষণ্ড প্রভু বিঘ্ন পাছে হয়॥ (১২. ২৮. ৩৫৬)

লখিন্দর বেহুলার মতো জাতিস্মর নন, তিনি সংক্ষুব্ধ হলেন।

বেহুলারে ক্রোধ করে রাজার নন্দন।
রতিরে নৈরাশ করি করিল শয়ন॥ (১২.২৮.৩৫৭)

বোঝা যায়, বিবাহের পরদিন রাত্রে (বিবাহ রাত্রেও)— বাসর জাগরণ (লখিন্দর ঘুমিয়েছেন বারবার) এবং রতি-নিষিদ্ধ করার কোনও সুনির্দিষ্ট তাৎপর্য ছিল। মনসামঙ্গল কাহিনী সেই তাৎপর্য থেকে কোনো কারণে চ্যুত হয়েছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে খাওয়া-দাওয়া, মঙ্গল-উপকরণ দিয়ে (যা আসলে দেবতাকে উৎসর্গ করা) রান্না করা প্রভৃতি ইঙ্গিত ও সেই ইঙ্গিতকে দেহ-সম্ভোগের সঙ্গে মিলিয়ে-মিশিয়ে ফেলার, নতুন নতুন আখ্যান নির্মাণের প্রক্রিয়া। তাৎপর্যটি ছিল এই— বিবাহ রাত্রিতে সংযম রক্ষা করতে হবে ; অসংযত হলে বিপদ আছে। যেমন যেমন যে তাৎপর্য হারিয়েছে— কবিরা নিজেদের মতো কাহিনী নির্মাণ করেছেন। এই বিচ্যুতিগুলি পুনর্গঠন করার কিছু চেষ্টা করা দরকার। মনসামঙ্গল কাহিনীতে তার কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে।

॥ ২৪ ॥

মহাদেবী মনসা ও সৃজনশীলতার পুরাকথা

মনসা কামরূপিণী দেবী। সৃজনশীলতার শক্তি যে দেবীর উপর আরোপিত তাঁর এমনি হবার কথা। জগজ্জীবনের মনসামঙ্গলে এই দেবীকে বরণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন তার সৃষ্টিকর্তা— আদিদেব ধর্ম নিরঞ্জন। বিপ্রদাস তাকে নিরঞ্জনের অবতার ভেবেছেন— শিব তার দিকে কামনার দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন একবার :

মনসা দাঁড়াইলা মহাদেবের অগ্রেতে।
দেখিতে শোভিত হর চাহে কাম চিত্তে॥ (১. ২০. ২৭৭)

পার্বতী সন্দেহ করেছিলেন মনসা তার পিতা মহাদেবের কামতৃপ্তি করেন

বাপের সহিত রতি ভুঞ্জ নিরন্তরে। (১. ২২. ৩০৪)

স্বামীর সঙ্গেও মনসার দেহ সম্পর্ক খুব স্বাভাবিক মনে হয় না। নাগ-আভরণযুক্ত মনসাকে দেখে জরৎকারু তাকে ত্যাগ করে সমুদ্রে শঙ্খের মধ্যে লুকিয়ে ছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে মনসা বিবাহ বাসর থেকে বের হয়ে এক বিরাট পাখির শরীর ধারণ করলেন— 'কুরলপক্ষ'। ডাক দিলেন :

শুনিয়া পক্ষ ডাক ভাসিয়া উঠে শাঁখ
ছুইয়া তুলিলেন তীরে।

শঙ্খকে বললেন : তোমার অভ্যন্তরে তপস্বী জরৎকারে
উগারি ঝাট দেহ মোরে॥ (৩. ১৭. ২১৭)

শঙ্খ সভয়ে ('অতিসে' 'ভয় বাসি') জরৎকারুকে উগরে দিলেন। মনসার সঙ্গে যৌন সম্পর্ক না হলেও জরৎকারুই নাকি তাকে সন্তান জন্মের বর দিয়ে গেলেন। বিপ্রদাসের বর্ণনা :

শুনিয়া মুনিবর পদ্মা গর্ভে কর
বুলায় সুসন্তান-উৎপত্তি। (৩. ১৭. ২২১)

বিজয় গুপ্তের বিবরণ আরও কিছু চমৎকারিত্বের উপাদান যুক্ত। বিবাহ রাত্রে জরৎকারু মনসাকে ফুল তুলে আনতে বললে, মনসা আপত্তি করলেন :

আজু মাত্র হইয়াছে বিয়া নহে পোহায় রাতি।
পুষ্প তুলিতে যাব বড়ই অখ্যাতি॥
... ...
কোপ করহ তাপ করহ যেবা মনে লয়।
কোন কালে হেন কর্ম আসা হইতে নয়॥

এ নিয়ে ঝগড়া বেধে গেল ; 'কুশকাটা বামনা'-কে ভয় পেলেন না, মনসা তার নির্দেশ মানলেন না— দুকথা শুনিয়ে দিলেন। শেষ পর্যন্ত

বিষ নয়নে পদ্মাবতী মুনিরে নেহালে।
পদ্মার কোপে মরে মুনি কাল বিষের ঝালে॥

(প্যারীমোহন সংস্করণ ; উক্ত ; ২৮ পৃ.)

পার্বতী গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—

তুমি সুখে বসিছ জামাই কেন মরা।

মনসা কোন জবাব দিলেন না। শিব এলেন, তার প্রশ্নের উত্তর দেবার পর অনিচ্ছাসত্ত্বেও দেবী স্বামীকে বাঁচিয়ে দিলেন।

মূল মন্ত্র জপিল মুনির শ্রবণে।
চৈতন্য পাইল মুনি দেখিল সর্বজনে॥

জরৎকারু স্ত্রীকে ত্যাগ করলেন, কারণ—

পদ্মা হেন স্ত্রীতে মুনির নাহি কাম।

মনসার ক্ষোভ কোন পুত্র-কন্যা না থাকলে দুঃখ যাবে না তার। শিবও জরৎকারুকে অনুরোধ করলেন। সকলে মুনির কাছে এলেন, বললেন— একই কথা।

চারিদিকে হুড়াহুড়ি পদ্মা চমৎকার।
পুত্রবর পুত্রবর বলে অষ্ট বার॥

জরৎকারু স্ত্রীকে সম্বোধন করে বললেন :

আজু হইতে তোমার গর্ভে রহিবেক ঋতু॥
অষ্টজন পুত্র হবে তোমার সম্পূর্ণ সময়।
বর দিয়া মুনি বলে শুনহ নিশ্চয়॥
... ...
নাগজাতি জন্মিবেক সহোদর অষ্টভাই।
তাহা হইতে হবে তোমার অনেক বড়াই॥

(বিজয় গুপ্ত : মনসামঙ্গল ; ৩০ পৃ.)

খুব সম্ভব, দুটি ভিন্ন উৎস থেকে বিজয় গুপ্ত মনসার পুত্রলাভের কাহিনী পেয়েছিলেন। দ্বিতীয় কাহিনীটি বাংলায় বেশি প্রচলিত। জরৎকারু মনসার গর্ভে স্পর্শ করলেন—

বর দিয়া জরৎকারু স্থির হইয়া রহে।
পদ্মার পেটে হাত দিয়া পুনর্বার কহে॥
আস্তিক মহামুনি পদ্মার নন্দন।
আশীর্বাদ করিয়া গেল তপোধন॥ (ঐ ; ঐ ; ৩০ পৃ.)

মনসার স্বেচ্ছা-বিহার, বিবাহ রাত্রে স্বামীর মৃত্যু, স্বতন্ত্র-গম্যা স্বরূপ এবং স্বামী সম্পর্ক-নিরপেক্ষ সন্তান জন্মানোর ক্ষমতা— এইসব খুব সম্ভব তাঁর মহাদেবীত্বের লক্ষণ। স্বামীকে কুরল-পক্ষ রূপে শঙ্খের দেহ থেকে উদ্ধার খুব প্রাচীন কোনো পুরাকথার ছিন্ন টুকরো হতে পারে।

প্রাচীন মিশরে বেন্নু নামক পাখির কথা আমরা স্মরণ করতে পারি। আদি দেবতার প্রতীক বেন্নু— 'Ra-Atum was symbolised by the Bennu bird or phoenix, which alighted at dawn on the Benben'—বেনবেনের প্রস্তর খণ্ড (obelisk) থেকে বের হওয়া প্রথম সূর্যালোককে ভাবা হত বেন্নু পাখি। হেলিওপলিটান সৃজনকথা (Heliopolitan Cosmogony)-য় এই পাখির কথা পাই। (*Egyptian Mythology* : Veronica Ions ; উক্ত; 25 পৃ.)।

মনসার জন্ম প্রায় নিজস্ব অনির্বচনীয় শক্তির ওপর নির্ভর করে— তিনি স্বয়ম্ভূকল্প। এ নিয়ে আগে আলোচনা করেছি। এখানে পুনরুক্তি করছি না। জন্মদান করার ক্ষমতাও একান্ত নিজস্ব। এজন্যেই কি পুরুষের বিবাহ-পরবর্তী সময় তাকে স্বীকার করে নেওয়ার বাধ্যতা? দেবীকে তুষ্ট না করে কেউই স্বাভাবিক দাম্পত্য জীবনলাভ করতে পারবেন না—এরকম মনে করার কারণ আছে, দেবীকে কামনা করলেই মৃত্যু (জরৎকারু আর বচাই-এর ক্ষেত্রে স্পষ্ট প্রমাণ পাই, সঙ্ক-ধন্বন্তরীর মারফৎ পাই পরোক্ষ প্রমাণ) ঘটছে— মনসামঙ্গল এইরকম মৃত্যুর ক্রমোন্মোচনের আখ্যানে পরিণত হয়। দেবী মনসা সঙ্ক ধন্বন্তরীর কাছে গেছেন তাঁর স্ত্রী কমলার সখী হয়ে। গোয়ালিনী বেশে। ধন্বন্তরি তাকে দেখে বলেছেন সেই রাতে তাদের বাড়ি থেকে যেতে। কামস্বরূপা দেবীকে দেখেই ধন্বন্তরীর মনে অস্থিরতা স্পষ্ট হয়। ছল করে স্বামীর ক্রোধের কথা বলতে মনসাকে ধন্বন্তরী বশীকরণ-বস্তু দেবার কথা বললেন:

সঙ্ক বলে কোন কার্যে এত ভয় ভাব।
দাস-মত তব স্বামী করাইয়া দিব॥ (৬. ১২. ২০২)

এই কাহিনীতে খুবই আশ্চর্য একটি ঘটনা দেখতে পেয়েছি। ঘটনাটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা দরকার। কমলা মনসাকে প্রস্তাব দিলেন :

সহেয়োর হাব্যাস যদি বাড়ে তব মনে।
রঙ্গে নিশি বঞ্চিহ আমার স্বামী সনে॥ (৬. ১২. ২০৫)

এইরকম ঘটনা অবশ্য ঘটেনি। তবে সঙ্ক-ধন্বন্তরী রাত্রিতে শয়ন করার সময় মনসাকেই কামনা করেছেন :

সাহির যতেক রূপ ভাবিতে হৃদয়ে।
মদনে পীড়িত হইল কামে প্রাণ দহে॥ (৬. ১২. ২০৯)

সেই রাত্রে কাম-মোহিত সঙ্ক-ধন্বন্তরী তার স্ত্রীকে সম্ভোগ করার সময় তার মৃত্যুর মর্মকথা বলেছেন, আর সে সময় মনসা অলক্ষে হাজির রয়েছেন— 'সঙ্কেরে কুবুদ্ধি পদ্মা দিল ততক্ষণে।'

বিজয় গুপ্ত একই পরিস্থিতিতে মনসার উপস্থিতির কথা জানিয়েছেন— সঙ্কের শয়ন কক্ষে 'শ্বেতমাছি হইয়া রহিল বিষহরি।' (বিজয় গুপ্ত : *পদ্মাপুরাণ* ; উক্ত ; 78 পৃ.)। অন্য কবিরাও একই motif রেখেছেন তাঁদের আখ্যানে। কামনা ও মৃত্যুর সমাপতন খুবই পরিচিত অভিপ্রায়— মনসামঙ্গলে আরও আছে।

চাঁদ সদাগরের মহাজ্ঞান হরণের সময় চাঁদের শালী মেনকার বেশে হাজির মনসাকে দেখে কামুকতা প্রদর্শন করেছেন চাঁদ। মেনকাও সেই সাধ পূরণ করতে চেয়েছেন। চাঁদ নির্লজ্জভাবে স্ত্রী সনকাকে বলেছেন—

তব ভগিনী দেখি অঙ্গ দহে কামানলে॥

এবং—

তারে বুঝাইয়া প্রাণ রাখহ আমার। (৫. ১৪. ২৯৭ ও ২৯৮)

প্রস্তাব দিতে নিতান্ত কুণ্ঠা বোধ করেছেন সনকা। মনসা সে প্রস্তাবে রাজি হলেন। ('তুষিব নৃপতি তব পিরিতি কারণে।') মনসা চাঁদের কাছে রতি সুখদানের শর্ত হিসেবে চাইলেন মহাজ্ঞান। শেষপর্যন্ত মর্মকথা বলামাত্র মনসা চাঁদের সিদ্ধজটা, জয়নেত ও অক্ষগুটিকার ঝুলি নিয়ে পালালেন।

কুবুদ্ধিয় নৃপতি আচল দিল হাতে।
শীঘ্র জটা ছিঁড়ি পদ্মা ভর কৈল রথে॥ (৫. ১৪. ৩১৭)

সঙ্ক-ধন্বন্তরী আর চাঁদকে নির্জিত করার কৌশল একই। মনসা এখানে রীতিমতো বহুগামিনী-বারাঙ্গনার মতো ব্যবহার করছেন। তাকে দেখে কমলা যে বলেছেন—

'দধি-ছলে ভ্রম কিবা রতির হাব্যাসে।' (৬. ১৩. ১৭৩)

সে আশঙ্কা মিথ্যা ছিল না।

গিলগামেশ নামক মৌখিক মহাকাব্যে আছে 'Ishtar is respresented as gathering round her unchaste girls and harlots, and as a goddess of prostitution.' (*Epic of Gilgamesh* ; N. K. Sanders : Pelican, 83 পৃ. পাদটীকা দ্রষ্টব্য। ইশতার স্বেচ্ছায় গিলগামেশের প্রেমপ্রার্থী হয়েছেন :

Come, Gilgmesh, be thou my lover.
Do but grant me of thy fruit.
Thou shalt be my husband, and I will be thy wife.

... .

The yeild of hills and plants thy shall bring before the tribute
Thy goats shall cast triplets, thy sheep twins,
Thy he-ass in lading shall supass thy mule.
Thy charriot horses shall be famed for racing,
Thine ox under yoke shall not have a rival.

[*Near Eastern Mythology* : John Gray ; The Standard Literature Co. (P) Ltd. 44 পৃ :]

বলা বাহুল্য, স্বেচ্ছাগামিনী মনসার সঙ্গে এই ব্যবহারের মিল আছে। শস্য-প্রাণী-গৃহপালিত পশু-গবাদি সম্পদ সমস্ত কিছুরই উর্বরতা-শক্তির কার্যকারণ নিয়ন্ত্রিত হয়েছে ঈশতারের মারফৎ। ফ্রেজার লিখেছেন : ......'a great Mother-Goddess, the personification of all the reproductive forces of nature, was worshipped under different names but with a substantial similarity of myth and ritual by many peoples of Western Asia; that associated with her was a lover, or rather a series of lovers, divine yet mortal, with whom she mated year by year, their commerce being deemed essential to the propagation of animals and plants, each in their several kid,

and, as it were, multiplied on earth by the real, though temporary, union of the human sexes at the sanctuary of the goddess for the sake of there by ensuring the fruitfulness of the grand and the increase of man and beast.' (Sir, J. G. Frazer-এর প্রবন্ধ 'Adonis Attis Osiris' থেকে ; প্রবন্ধটি ১৯০৭-এ প্রকাশিত হয় ; আমরা উদ্ধার করলাম N. K. Bhattacharya-র *Ancient Indian Rituals and their Social Contents* গ্রন্থের 101 পৃ. থেকে)। শুধু পশ্চিম এশিয়া নয়— মনসার সাক্ষ্যে আমরা বলতেই পারি, পূর্ব ভারতে (দক্ষিণ এশিয়াতে)-ও অনুরূপ দেবতার পরিচয় পাওয়া যায়।

উক্ত মহাদেবীদের সঙ্গে বারাঙ্গনাদের সম্পর্ক দেখেছেন কেউ কেউ। এর পেছনে কারণ নিশ্চয় কিছু আছে। নারী-প্রধান সমাজের ধর্মভাবনা থেকে উঠে আসা দেবীরা (এবং তাদের নারী পুরোহিতরা) অবাধ যৌন স্বাধীনতা ভোগ করতেন। পরবর্তী সময় তাদের সামাজিক প্রতিষ্ঠা সঙ্কুচিত হয়ে আসে। তখন দেবী-র প্রতিনিধিদের বারাঙ্গনা হিসাবে গণ্য করা হয়ে থাকতে পারে। দুর্গাপূজাতে মূর্তি গড়ানোর জন্যে বেশ্যালয়ের মৃত্তিকার প্রয়োজন পড়ার পেছনে নিশ্চয় এরকম কোনও অনুষঙ্গই কাজ করে গেছে। চণ্ডীমঙ্গলে দেবী চণ্ডীকে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী 'ডাকিনী দেবতা' বলেছেন। চণ্ডী কর্তৃক আশ্রিতা সুরিক্ষা ধর্মমঙ্গল কাব্যে ছয় কুড়ি নাগরের অধিকারিণী— দেবতার সমান দর্পকারিণী পতিতার কথাও মনে পড়তে পারে। মনসা আর দুর্গা এই ক্ষেত্রে একই সামাজিক সূত্রের ধারাবাহিকতা বহন করছেন। উত্তর দিনাজপুরের কর্ণজোড়া-য় মনসার মূর্তি পূজা হয়— তার দুপাশে লক্ষ্মী সরস্বতী ও কার্তিক গণেশ। মনসা-দুর্গা সেখানে একাকার— ঠিক যেমন জগজ্জীবন ঘোষালের আদ্যকথার কেতকা দুর্গার মধ্যে কোন ভেদ নেই।

মনসাকে নববিবাহিত পুরুষ (কামনার দৃষ্টিতে দেখা পুরুষ) অতিক্রম করতে পারেনি। কাব্যাখ্যানের সঙ্গে আচরণ তথা নিষেধাজ্ঞার ক্ষেত্রে মিল দেখা যাচ্ছে। জরৎকারু, বচাই, সঙ্ক-ধন্বন্তরী মনসাকে কামনা করে মৃত্যুর অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গেছেন। লখিন্দরও বিবাহসভায় মনসার উপস্থিতি দেখামাত্র মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছেন।

শূন্যে বিষহরী রথে ভর করি
বিবাহ দেখে হরষিতে॥
বিভা দৃষ্টি রঙ্গে চৌদিগে ভুজঙ্গে
লখাই দেখি তরাস। (১২. ১৬. ৪১৯-২০)

শুধু কি তাই, তার 'মোহে সর্ব-অঙ্গে' আর আতঙ্কে লখিন্দর ঢলে পড়লেন। বিবাহ রাত্রে এই বিপত্তি, সকলেই চিন্তিত— চাঁদ সদাগর কেঁদে উঠলেন। বেহুলা সকলকে প্রবোধ দিলেন। বললেন সায় বেনেকে :

এই মনে থাকো সভে মন-স্থির হইয়া।
যাবত না আসি আমি মনসা পূজিয়া॥ (১২. ১৭. ২৩৫)

এই কাহিনী প্রায় সবাই বলেছেন। মনসামঙ্গল কাব্যের অন্যতম পরিচিত অংশ এটি। দেখাই :

১. বিজয় গুপ্তের রচনায় দেখছি মনসা নেতাকে বলছেন—

রথ সাজাও নেতা বিহা চাইতে যাই।

[পদ্মাপুরাণ, বিজয় গুপ্ত ;
জয়ন্তকুমার দাশগুপ্ত সম্পাদিত ; উক্ত ; ৩৮৮ পৃ.]

বিবাহকালে লখিন্দরের মাথার ছত্র পড়ে গেল। আহিরাজ মনসার নির্দেশে ছত্র ধরল ; তাঁ দেখে:

সর্প সর্প বলিয়া লখাই হইল মো। (ঐ ; ৩৯৫ পৃ :)

মোহগ্রস্ত স্বামীকে রেখে চললেন বেহুলা চললেন মনসার পুরী—

শোকে বেয়াকুলি বেউলা চলে তরাতরি।
ত্বরিত গমনে গেলা মনসার পুরী॥ (ঐ ; ৩৯৮ পৃ.)

মনসা কারো সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন না, তিনি নাগরক্ষীকে জানিয়ে দিয়েছেন— 'মাথা ব্যথা হইল মোর গাও না বাসি ভাল।' নেতা বেহুলাকে পরামর্শ দিয়ে শেষ পর্যন্ত লখিন্দরকে বাঁচিয়ে তুললেন। সকলে বিস্মিত হলেন— 'মৈলে মড়া জিয়ে আরবার।' (ঐ ; ৪০৮ পৃ.)

প্যারীমোহন দাশগুপ্তের সংস্করণে কাহিনীটিতে এত বেশি প্রক্ষেপ বা বিস্তার নেই। ছত্র ভেঙ্গে পড়ার পর মাথার উপরে লখাই দেখলেন সাপের ফণা। তার পর—

কপাটি লাগিল দন্তে লড়বড় করে গলা।
অচেতন হইয়া পড়ে লক্ষ্মীন্দর বালা॥
ভূমিতে পড়িল লখাই মুখে উঠে ফেণা।
হাহাকার করিয়া এবে উঠিল সর্বজনা॥ (উক্ত ; ১৮৮ পৃ.)

মনসার কাছে গেলেন বেহুলা— কঠিন কৃচ্ছ্র সাধন করলেন :

নরসিংহ কাটারী দিয়া দুই স্তন কাটে। (উক্ত ; ১৯১ পৃ.)

'ঝাড়ি ভরিয়া' 'অমৃতকুণ্ডের জল' নিয়ে এলেন তিনি। তা ছিটিয়ে দেবার পর : 'উলটিয়া লক্ষ্মীন্দর গা দিল মোড়া।' (উক্ত : ১৯৩ পৃ.)

২. কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, বিবাহ অনুষ্ঠানে মনসা এসে নিজেই হাজির হলেন:

হেন কালে মায়াময়ী পাতিয়া ছলনা।
সম্মোহন বাণে হরে বরের চেতনা॥
অকস্মাৎ পড়ে ঢলে বেহুলার কোলে।
কি হৈল কি হৈল বলি কাঁদিছে সংলে॥
লখিন্দর অচেতন করি দরশন।
জানিল বেহুলা সতী মনসা-ছলন॥
করযোড় করি পাড়ে সতি ভক্তি ভরে।
মনসার স্তব সতী করে সকাতরে॥
স্তবে প্রীতি হয়ে দেবী দিব্য নেত্রে চায়।
লখাই চেতনা পুনঃ অবিলম্বে পায়॥ (উক্ত ; ৪৮ পৃ.)

৩. ক্ষমানন্দ দাসের রচনায় দেখছি মনসা লখিন্দরকে মোহবাণ হানলেন। তার বাণের আঘাতে লখিন্দরের মৃত্যু হল। বেহুলা সঙ্গে সঙ্গে শত এয়োতি সঙ্গে নিয়ে 'জাত' পাতলেন। সমস্ত দেবতার সঙ্গে মনসাকে বিনীত প্রার্থনা করলেন তিনি। আর—

বেহুলার বিনয়েতে দেবী পরিতোষ।
সম্বরিয়া মোহবাণ ক্ষমা কৈল দোষ॥

[*মনসার ভাসান* ; উক্ত ; ৩১-৩২ পৃ.]

চাঁদ সদাগর জানলেন বেহুলা 'মনসার ব্রতদাসী'— আর তার 'উড়িয়া পরাণ'; তার তিল মাত্র অপেক্ষা করার ইচ্ছা নেই। একমাত্র লক্ষ্য কখন :

'পুত্রবধূ শোয়াইব লোহার বাসরে। (ঐ; ৩২ পৃ.:)

৪. নারায়ণদেবের লেখায় দেখছি 'অষ্ট কোটি নাগ' নিয়ে বিবাহ বাসরে লখিন্দরের মাথায় ছত্রি হিসাবে রাখলেন মনসা। সর্প গর্জন শুনে লখিন্দর উপরের দিকে দৃষ্টি ফেলতেই ভয় পেলেন:

নাগের গর্জনে লখাই চায় মাথা তুলি।
সর্প সর্প বলি লখাই পড়িলেন ঢলি॥
লখিন্দর ঢলিল পদ্মা হরষিত হৈয়া।
পূজা ঘরে গুপ্ত স্থানে রহে লুকাইয়া॥

[দ্বিজ বংশীদাস : *শ্রীপদ্মাপুরাণ* ; উক্ত ; দ্বিজবংশীর রচনা হিসেবে গোটা গ্রন্থ মুদ্রিত হলেও এই অংশের ভনিতা নারায়ণদেবের— 'সুকবি নারায়ণ দেবের সুরস পাঁচালী/পয়ার প্রবন্ধে বলি এক নাচাড়ি।।'— ১৮২ পৃ. ; উপরের পয়ার দুটির জন্য পশ্য— ১৮১ পৃ.]। মনসা 'পূজাঘরে গুপ্তস্থানে' লুকিয়ে থাকলেন, বেহুলা চললেন স্বামীর প্রাণ ফিরিয়ে আনতে। দ্বারী ধামনা বেহুলাকে কিছুতেই প্রবেশ করতে দেবেন না। ধামনা বললেন :

অকারণে এলে কেন পদ্মা নাহি ঘরে।

বেহুলা ক্ষুব্ধ হলেন— তার কথা :

স্বামীর মরণে মোর লাগিয়াছে তাপ।
ভস্মন করিব তোরে দিয়া আছি শাপ॥

ধামনা ভীত হলেন। বললেন, মনসা নিজেই নাকি বেহুলার ভয়ে পালিয়েছেন ('তোর ডরে পালায়েছে জয় বিষহরি।')! বেহুলাকে দেখে মনসা অবশ্য পালাননি—'পদ্মার কপটে ঘর ঘোর অন্ধকার।' বেহুলা উপায়ান্তর না দেখে শুরু করলেন অদ্ভুত সাধনা। 'পানপাত' দিয়ে তিনি তাঁর স্তনদ্বয় ছিন্ন করলেন। তার আর্তনাদ—

জীবনের নাহি আশা কৃপা কর মনসা
না রাখিব আপনা খাঁকার।
পুরুষ বধ হৈল তথা স্ত্রী বধ হবে হেথা
গলে তুলি দিয়া গো কাটার॥

[দ্বিজ বংশীদাস : উক্ত ; যদিও এটি নারায়ণদেবেরই রচনা। শেষ ত্রিপদীর পর্বে আছে 'গলে তুমি দিয়া গো কাটার'— অর্থহীন ; আমাদের প্রস্তাবিত পাঠ 'গলে তুলি' ; ১৮২ পৃ.]। মনসা লখিন্দরের প্রাণ ফেরাবার জন্যে দিলেন মন্ত্রপূত জল— তাঁর আশীর্বচন : 'বাঁচিবেক লখিন্দর/হৃদয়ে লাগিবে কাটা স্তন।'

গোয়ালপাড়ার লোক ঐতিহ্যে অনুরূপ অবকাশে বেহুলা গেছেন ঝালো-মলোর ঘরে। সেখানেও 'ঢামনা' প্রহরী হিসেবে বেহুলাকে বাধা দিয়েছেন। বেহুলা তাকে হাতের খাড়ার আঘাতে নির্জিত করে ঝালো-মলোর 'মাড়ো'-তে প্রবেশ করেছেন—

খাড়ার কুরতে ঢামনার কাঙ্কাল ভাঙ্গায়।

(মায়াবন্তী বিষহরী ; উক্ত ; ৩৫৮ পৃ.)

মনসাপূজার সময় সেখানে বেহুলা চূড়ান্ত আত্মনিগ্রহ করেছেন—

কেশটারি কাটি আর চামর ঢুলায়।
মুণ্ডগোট কাটি আর ঘহনি বহায়॥
চক্ষুজঙ্গি কাটি আর প্রদীপ লাগায়।
কাণ দুখান কাটি আর করতাল বাজায়॥

নাক গোট কাটি আর বাঁশীও বাজায়।
জিভাধর কাটি আর পথিলী বহায়॥
দুই তন কাটি আর পুরণঘট বহায়।
দশ আঙুলি কাটি আর পুলতা লাগায়॥
পেটগোট কাটি আর সেবেঙ্গা বাজায়।
কমর গোট কাটি আর ডুমারু বাজায়॥ (ঐ ; উক্ত ; ৩৫৯-৬০ পৃ :)

ধর্মপূজক লাউসেন যখন নবখণ্ড সাধনা করছেন, তখন ঠিক এইরকম অবস্থার বিবরণ দিয়েছেন কবিরা। রূপরামের ধর্মমঙ্গলে আছে ; শামুলা তাকে পূজাপদ্ধতি জানিয়েছেন :

সামুলা বলেন বাপু বাকি আছে পূজা।
তবে দেখা দিব আসি সেই ধর্মরাজা॥
আপনা কাটিয়া যদি দেহ তার পায়।
পিতামহ সহিত আসিব ধর্মরায়॥

[রূপরাম চক্রবর্তীর 'ধর্মমঙ্গল' ; সম্পাদক : অক্ষয়কুমার কয়াল ; ভারবি ; কলকাতা ; পুনর্মুদ্রণ (দ্বিতীয় সংস্করণ) ; ১৯৯২ ; ৩৫১ পৃ :]

নিজেই নিজেকে খণ্ডবিখণ্ড করে সাধনা করেছেন লাউসেন। আসলে শরীরের নটি গ্রন্থিতে অস্ত্রাঘাত করে— এ প্রসঙ্গে আমার একটি প্রবন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেছি ; প্রবন্ধটির নাম: 'মঙ্গল কাব্যের গঠন ও বিন্যাসে সমাজ বিবর্তন সূত্র—কিছু প্রস্তাব ও বিশ্লেষণ' (সূত্র : 'প্রবন্ধ সঙ্কলন' ; উক্ত)। ধর্মপূজায় পদ্ম কোথায় পাবেন, এই সমস্যার সমাধানে সামুলার বক্তব্য রীতি মতো নারী-পুরোহিতের—

তোমার মস্তক বটে কমলের ফুল।
তোমার চরণ দুটি কমলের মূল॥
যোগতনু কলেবর কমলের লতা।
দুই হাতে বটে তোর কমলের পাতা॥ (ঐ ; ৩৫১ পৃ.)

বস্তুত 'মায়াবন্তী বিষহরি' বাংলার সংস্কৃতিক ধারাবাহিকতার বাইরের বস্তু বলে মনে হয় না। সামুলা ধর্মমঙ্গলে স্তন কর্তন করে পূজা করছেন ('সামুলা আমিনি মরে কাট্যা দুই স্তন')।

সামগ্রিকভাবে এই আখ্যানের অভিপ্রায়— বিবাহসভায় মনসার প্রাধান্য কিছুতেই অস্বীকার করা যাবে না। মনসা হলেন বিবাহের অধিষ্ঠাত্রী দেবী (Guardian deity) ; তাকে অস্বীকার করেই চাঁদ সদাগরের বিপদ। নরনারীর যৌন সঙ্গমের সময় তার উপস্থিতি অপ্রতিরোধ্য। তিনি বা তার প্রতিনিধি তাঁর অভিভাবকত্ব স্বীকার না করলেই বিবাহ অনুষ্ঠান বা নরনারীর মিলন মুহূর্তে হাজির হবেন। ধ্বংস করবেন সেই বিদ্রোহী চরিত্রকে। কখনও মিলনে বাধা দিয়ে মেরে ফেলবেন— যেমন লখিন্দরের ক্ষেত্রে; কখনও আবার মিলন উদ্রিক্ত করে মৃত্যুপথ জেনে নেবেন— যেমন ঘটেছে সঙ্ক-ধন্বন্তরীর ক্ষেত্রে ; কখনও আবার স্বয়ং মিলনের অবকাশ সৃষ্টি করে ছলনা করবেন— যেমন ঘটেছে চাঁদ সদাগরের মহাজ্ঞান হরণের সময়। বাংলার সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে মনসা কৃষিসম্পদ উৎপাদনের শক্তি হিসাবে যেমন, বিবাহ ব্যাপারের মূল চালিকাশক্তি হিসাবেও তেমনি গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছেন— এরকম বললে অভিপ্রায়টির যুক্তি-সঙ্গত ব্যাখ্যান সম্ভব হয়।

উত্তরবঙ্গে বিবাহ-পূর্ব কৃত্য সাইটোর বিষহরির ব্রত। গীতালদের ডেকে অনুষ্ঠান করানো কর্তব্য। 'সোলা দিয়ে সাইটোর মায়ের মূর্তি' গড়া হয়। [সূত্র : *উত্তরবঙ্গে রাজবংশী সমাজের দেবদেবী ও পূজা-পার্বণ*— ড. গিরিজাশঙ্কর রায় ; উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে পি.-এইচ. ডি উপাধির জন্যে প্রদত্ত গবেষণাপত্র ; ৬৩ পৃ.]। এই দেবীর সঙ্গে মনসার মিল আছে। বিষহরির মতোই তার জন্ম প্রকৃতির ভেতর—

'বাপ মোর ইন্দের আজা মাও বসুমতী
ই খ্যালা খ্যালাইতে বেলা পড়িতে ভাটি
আদিয়া যেইচং মুই দোলা বাড়ি দিয়া রে
সোলার গচে হয়া আইস্চং জনম রে।'

ভ্যালেবাই বা নীলাবতী আর আয়ধন সাধুর বিবাহ, সন্তান লাভ এই ব্রতের মূল কথা।

বরিশাল জেলার বিবাহপূর্ব কৃত্য 'রয়ানী'। মনসার মূর্তি গড়িয়ে পূজা আর পেশাদার শিল্পীদের দিয়ে মনসামঙ্গল গানের অনুষ্ঠান— রয়ানী। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য জানাচ্ছেন : 'বরিশাল অঞ্চলে মনসামঙ্গলের কাহিনী অবলম্বন করিয়া যে রয়ানী বলিয়া পরিচিত লোক-সঙ্গীত গীত হয়, তাহাতে লখীন্দরের সর্পদংশ হইতে আরম্ভ করিয়া তাহার পুনর্জীবন লাভ পর্যন্ত বৃত্তান্ত শোনা প্রত্যেক শ্রোতার পক্ষে অবশ্য শ্রোতব্য.........।' (*বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস*; উক্ত ; ৬০ পৃ.)। বস্তুত রয়ানী হল বিবাহ অনুষ্ঠানের পূর্বে— বিবাহের অভিভাবিকা দেবীকে সন্তুষ্ট করার অনুষ্ঠান।

ড° চারুচন্দ্র সান্যাল তাঁর বিখ্যাত গবেষণাগ্রন্থ *The Rejbansis of North Bengal (A Study of a Hindu Social Group*-এ লিখেছেন, রাজবংশী-সমাজে মনসার প্রভাব গুরুতর। বিবাহ-ক্ষেত্রে অভিভাবকত্বের প্রশ্নে তার আধিপত্য প্রবল। 'In all ceremonies related to marriage, Sradh, Pregnency and child birth, worship is offered to Bisohori Thakurani in the outer yard of the house with curd, flattened rice and ripe plantain as offering. There are two types of Bisohori. One is *Kani-Bisohori* which is more commonly worshjpped. The other is *Gitali Bısoharı*. She is worshipped during a marriage Ceremony. The image consists of *Beulami* (Behula), Bala (Lac-chindar), *Goda, Godani* (washerwoman), Shiva, fish, snakas etc. The story of *Bisohori* is depicted on a sheet of cork. It is called Mer. (*The Rajbansis of North Bengal....* ; Charu Chandra Sanyal ; The Asiatic Society ; কলকাতা ; ১৯৬৫ ; 136 পৃ.]।

বীরভূমে গাছবেড়া অনুষ্ঠানের বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য। তাঁর বিবরণ থেকে একটি ধারণা হয়, এই অনুষ্ঠান কেবলমাত্র গন্ধবণিকদের মধ্যে চালু। তাঁর বক্তব্য : 'বিষ্ণু পাল বীরভূম জেলার কবি, একমাত্র তাঁহার মনসামঙ্গলেই এই গাছবেড়া অনুষ্ঠানের বিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া যায়—অন্যত্র তাহা নাই। বীরভূমের সুবর্ণবণিক সম্প্রদায় আজও ইহা পালন করেন এবং এই অনুষ্ঠানে তাঁহারা বিষ্ণু পালের মনসামঙ্গল গান করিয়া থাকেন।' (*বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস* ; উক্ত ; ৩১০-৩১১ পৃ.)। আশুবাবুর এইমত সুকুমার সেনের মন্তব্যের প্রতিধ্বনির মতো মনে হয়। বিষ্ণু পালের কাব্য কথা আলোচনার পর ড. সেন জানাচ্ছেন : 'The poem closes with a brief reference to Manasa worship as a ritual marriage ceremony.' (*Manasa-Vijaya* : উক্ত ; introduction ; xiii পৃ :)। আমাদের

ধারণা, গাছবেড়া অনুষ্ঠানটি কেবলমাত্র বীরভূমের নয়— শুধু সুবর্ণ বণিক সমাজেরও নয়। কামিনীকুমার রায়ের তথ্য : 'কোন কোন সম্প্রদায় মধ্যে বিবাহের পূর্বে কোনও গাছকে সাতপাক সুতায় বেষ্টন করিয়া উহাকে বন্দ বা কন্যার সাতবার প্রদক্ষিণ করার প্রথা আছে। অনেক সময় সম্প্রদায় নির্বিশেষেও দোজবর তেজবরকে বিবাহের প্রাক্কালে কোনও গাছের (প্রায়ই কলাগাছ) সঙ্গে মালাবদল ইত্যাদি (মুদ্রিত ই :) বিবাহের অভিনয় করিতে দেখা যায়। বারবার স্ত্রী বিয়োগের দোষ স্খালনের উদ্দেশ্যেই নাকি এইরূপ করা হয়। রাঢ়ে কোন কোন গ্রামের ধর্মপূজায় ধর্মঠাকুর ও তাঁহার কামিন্যা মনসাদেবীকে লইয়াও 'গাছ মঙ্গলা' তথা কোন গাছকে সুতায় জড়াইয়া সাতবার প্রদক্ষিণ করা হয়।' (*লৌকিক শব্দকোষ* ; কামিনীকুমার রায় ; প্রথম খণ্ড ; ১৯৭১; অষ্টম অধ্যায় ; ২৪৫ পৃ.)।

বস্তুতপক্ষে, বরিশালের রয়ানী আর বীরভূমের গাছবেড়া একই অভিপ্রায়ের ভাবসত্য উপস্থাপিত করছে। দুটি অনুষ্ঠানেই বিবাহ ব্যাপারে মনসার কর্তৃত্ব স্বীকার করে নেওয়া হচ্ছে। বাংলার কোথাও কোথাও এই কর্তৃত্ব স্পষ্ট হয়ে রয়েছে— কোথাও লৌকিক স্তরে রয়ে গেছে— তাৎপর্য-বিচ্ছিন্ন, নিতান্ত অস্পষ্টভাবে। মনসামঙ্গল কাব্যধারার প্রধান আখ্যানে মনসার সর্বাতিশায়ী কর্তৃত্ব— বিশেষত নরনারীর যৌন-জীবনে, প্রমাণিত। বাঙলার সর্বত্র—প্রায় সর্বশ্রেণীর বাঙালির মধ্যে বিবাহের পরদিন স্বামী-স্ত্রীর সম্ভাষণ নিষিদ্ধ করার রীতি আছে ; 'কালরাত্রি' পালনের এই বিধিকে নিশ্চয় মনসামঙ্গল আখ্যানের সূত্রে বিবরণ করতে হবে।

পূর্ববঙ্গে কোন কোন অঞ্চলে বিয়ের আগের দিন শ্যামাপূজা করা হয়— পরের দিন বিয়ে; বিয়ের নিমন্ত্রণপত্রে শ্যামাপূজার কথাই বলা হয়, বিয়ে যেন সেই কৃত্যেরই অঙ্গ। (কামিনীকুমার রায় ; উক্ত ; ২৬০ পৃ.)। 'উত্তরবঙ্গে রাজবংশী এবং রাঢ় অঞ্চলে নবশাখ সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহের পূর্বে বিষহরী তথা মনসাদেবীর পূজার প্রথা আছে।' (ঐ ; ঐ)। এ নিয়ে আলোচনা করেছেন ড° চারুচন্দ্র সান্যাল। তাঁর তথ্য একটু অগেই লিখেছি।

মোট কথা, বাংলার সর্বত্র বিবাহ অনুষ্ঠানের সঙ্গে মনসা পূজার সম্পর্ক নিবিড়। শ্যামা পূজার বিষয়টি খুব সম্ভবত একই অভিপ্রায়ের বিশ্লিষ্ট রূপ। মনসা স্বামী জরৎকারুর মৃতদেহ আগলে রেখে রাত কাটিয়েছেন— তাঁকে দেখে চণ্ডী চমৎকৃত, অবাক হয়েছেন, সামান্য বর্ণনা উদ্ধার করছি মনসামঙ্গলের কবির কাছ থেকে :

জামাই মূর্ছিত দেখি মূর্ছিত নারীগণ।
এক ভিতে হাতপড়ে আর ভিতে স্বন্ধ।
মড়া জামাই দেখিয়া সভের লাগে ধন্দ॥
... ...
চণ্ডী বোলে মনসা বার্তা কহ সারা।
তুমি সুখে বসিছ জামাই কেন মরা॥

(বিজয় গুপ্ত : মনসামঙ্গল ; জয়ন্তকুমার দাশগুপ্ত ; উক্ত ; বিচ্ছেদ পালা ; ৮৫ পৃ :)

বিষয়টি নিয়ে মনসামঙ্গল ধারায় তেমন বিস্তার নেই। চণ্ডীদেবীর সঙ্গে উর্বরতা, পশুচারক সমাজে অধিকার, শিকার-নির্ভর সমাজের উপর প্রশ্নহীন প্রতিপত্তি— প্রভৃতি বহু বিষয়ের যোগ দেখা যায় চণ্ডীমঙ্গল ধারায়। আপাতত দেখা গেল এ সমস্ত ক্ষেত্রেই মনসার অধিকার প্রতিপত্তি যথেষ্ট। এই দুই দেবী-ভাবনার সমান্তরাল অবস্থান আর প্রতিদ্বন্দ্বিতাও লক্ষ করার মতো। মনসার চোখ নষ্ট করে দেওয়া, তাকে নানা ক্ষেত্রে হেনস্তা করা— প্রভৃতি কাহিনীর উৎসে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার স্পষ্ট ছাপ ছবি পাওয়া যায়।

॥ ২৫ ॥

বেহুলা ডোমনী বেশ ধারণ : তাৎপর্য সন্ধান

ডুমনী কাচ অনুষ্ঠানটিও বিবাহের সঙ্গে যুক্ত। বরের বোন, বৌদিরা গীত করে বাড়ি মাতিয়ে রাখার অনুষ্ঠানটিকে মালদহে কেন ডুমনী কাচ বলা হয় তার স্পষ্ট কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। কাচ শব্দার্থ অভিনয়ে সজ্জা। সুতরাং ডুমনী কাচ— ডুমনীর বেশ ধারণ। আঞ্চলিকভাবে যারা লোকসংস্কৃতির এই বিশেষ মাধ্যম (genre)-টি নিয়ে আলোচনা করেছেন— কিংবা যেসব 'লোকসংস্কৃতি বিশেষজ্ঞ' এইসব তথ্যের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করেছেন, তারা 'ডোমনী কাচে'র উৎস নিয়ে— মনসামঙ্গল কাব্যধারার সঙ্গে তুলনা করেছেন বলে জানি না। সামান্য যুক্তি-সঙ্গত বিবেচনাশক্তির প্রয়োগ করলেই বোঝা যায় মনসামঙ্গল ধারার সঙ্গে 'ডোমনী কাচ'-এর সম্পর্ক বিদ্যমান। মনসামঙ্গলে ডুমনীর বেশ ধরেছেন বেহুলা। ভাসান-যাত্রার শেষে অনেক মনসামঙ্গল কাহিনীতেই দেখতে পাচ্ছি স্বামীর কাছে অনুমতি চাইছেন বেহুলা— ডোমনী বেশে যাবেন তিনি, শ্বাশুড়ি সম্বোধন করতে।

প্রসন্ন রূপেতে যদি দেহ ত মেলানি।
ছলিব ডুমুনি-রূপে তোমার জননী॥ (১৩.২.১৫)

লখিন্দর অবশ্য 'লোকমুখে লজ্জা'-র ভয় পাচ্ছিলেন ; তবু স্ত্রীর আগ্রহাতিশয্যে তিনি বেহুলাকে গড়িয়ে দিলেন 'চুপড়ি বিয়নি'। তা নিয়ে বেহুলা চাঁদ সদাগরের অন্তঃপুরে গেলেন।

অন্য কবিরাও বিষয়টিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে রচনা করেছেন। গায়েনরা এ নিয়ে নানারকম মনোহর গল্প যোগ করে দিয়েছেন। নারায়ণদেব লিখেছেন :

বলে বেহুলা লখাই গোচর।
লইয়া পুষ্পের ঝারি ডোমনীর বেশ ধরি
যাব আমি চম্পক নগর॥

সেখানে গিয়ে গোপনে তিনি জেনে আসবেন ছয় জায়ের মনোভাব ('বাড়ি জায় ছয়জন/বুঝিবার লক্ষণ')। বিউনি বানানো হল 'বেত' দিয়ে। নিতান্ত নিরলঙ্কার মলিন বেশ ধারণ করলেন বেহুলা :

ডিঙ্গা হতে নামি তীরে দেব অলঙ্কার ছাড়ে
ধরিলেক ডোমনীর বেশ।
মলিন বসন পরি চলিলেক সুন্দরী
শন পাটে বান্ধিলেক কেশ॥

দ্বারিক দাসের লেখায় বেহুলার ডোমনী-বেশ-বাস প্রায় একইরকম :

পুরুনা বসন অঙ্গের ভূষণ
আভরণ তেজি দূরে॥
হস্তে করি ধনী লক্ষের বিচনী
চাঁপা নগ্র মুখে যায়।
বিচনীর শোভা কহি পারে কেবা
বিজুরি কটকে তায়॥

[*দ্বারিক দাসের মনসামঙ্গল* ; উক্ত ; ১৫৪ পৃ.]

বিজয় গুপ্ত দেখিয়েছেন চম্পক নগরে এসে দ্রুত ডোম কন্যার বেশ ধারণ করেছেন :

আভরণ হইল কন্যা ডোম নারী বেশ।
চম্পক পুরীতে বেউলা করিলা প্রবেশ॥
লোকমুখে বার্তা পাইয়া সোনকা সে রাণী।
দাসী পাঠাইয়া তবে আনে ডোমনী॥

(জয়ন্তকুমার দাশগুপ্ত সম্পাদিত বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণ ; উক্ত ; ৫২৩ পৃ.)

চম্পক নগরের সকলের ধারণা হল বেহুলা ডোমের কাছে জাত বিকিয়েছেন। দেখলেন তারা—'শঙ্খ সিন্দূর' না পরেই বেহুলার 'পাটের শাড়ি' পরে এসেছেন এই ডোমনী। তাকে তখন মানকচুর পাতায় পান্তাভাত বেড়ে দেওয়া হল। তার খাবার সময় কাঁধে হেতাল-বাড়ি নিয়ে সেখানে চাঁদ সদাগর এলেন ; বেহুলা তার সামনে থেকে পালিয়ে গেলেন। সামান্য কৌতুকের উদ্দেশ্যেই যেন বিজয় গুপ্তের রচনায় এই আখ্যানটি আনা হয়েছে।

ক্ষমানন্দ দাস বেহুলার বিজনী নির্মাণ করানোর কাজটি করিয়েছেন বিশ্বকর্মাকে দিয়ে :

এক রতি পতি ব্যজনী সংহতি
মিলিত বসন্ত সঙ্গে।
ব্যজনীর বায় তাপ দূরে যায়
শীতল লাগিছে অঙ্গে॥
বলিছে বিশাই বেহুলা লখাই
শুন তোরা একভাবে।
লক্ষের ব্যজনী গড়ে দিনু আমি
ইহাতে সকলি পাবে॥

[*মনসার ভাসান* ; উক্ত ; ৬৭ পৃ.]

এইসব প্রসঙ্গ-কথায় বাংলার অস্পৃশ্যবর্গের ডোম জাতির আত্মপ্রকাশ ঘটে থাকতে পারে। বিজনী নিয়ে বেহুলা চাঁদ সদাগরের অন্তঃপুরবাসীদের চমৎকৃত করেছেন। ছয়জন বিধবা বধূকে গিয়ে বলেছেন বেহুলা :

লক্ষের হইলে কম না দিব ব্যজনী।
ছয় জায়ে এই কথা কহিল নাচনী॥ [ঐ ; ৬৮ পৃ.]

তারা সনকাকে বললেন। সনকা বিজনী কিনতে গেলেন— বেহুলাকে পরিচয় দিতে বললেন। বেহুলা আত্মপরিচয় দিলেন মিথ্যা করে :

চাঁদ ডোম শ্বশুর লখাই মোর পতি।
অতিহীন কুলে জন্ম মোরা ডোম জাতি॥
ধুচনি চুপড়ি বুনি আর বুনি কুলা।
সেচনী ব্যজনী বুনি আর বুনি ডালা॥

এই আত্মপরিচয় শুনে সনকার পুত্র আর পুত্রবধূর কথা মনে পড়ল। তার স্থির বিশ্বাস—'শাপে বুঝি বেহুলা লখাই হৈল ডোম।' তিনি লক্ষের ব্যজনী দেখতে চাইলেন। সেখানে সমস্ত কথাই—লিখিত (অর্থাৎ অঙ্কিত) আছে।

বেহুলা লখাই লিখিত তথাই
বিচিত্র ব্যজনী পাতে।

পুত্র ছয়জন মঙ্গল কথন
চৌদ্দডিঙ্গা তার সাথে॥

দেখে সনকার খুবই শোকবোধ হল। আমাদের ধারণা, ক্ষমানন্দ এখানে কোন প্রাচীন হারিয়ে যাওয়া লোকাচারের পরিচয় দিয়েছেন। শ্রীহট্ট অঞ্চলে যেমন মনসা পূজার অন্যতম আচার নৌকো পূজন, আর সে নৌকায় বহু বিচিত্র দেবদেবীর মূর্তি রচিত— এখানেও তেমনি কোন আনুষ্ঠানিকতা (function)-এর জন্যে বিশেষভাবে গড়া হয়েছে 'লক্ষের বিজনী'। অধ্যাপক মিহির চৌধুরী কামিল্যা লিখেছেন : 'প্রায় প্রতিটি লোকদেবতাকে ঘিরেই নানারকমের লোকশিল্প গড়ে উঠেছে। ...আছে মাটির মনসাচালি, মনসাবারি সাপ, মনসা-বিশালক্ষী-পঞ্চানন্দ প্রভৃতির প্রতিমা।' (*আঞ্চলিক দেবতা— লোক সংস্কৃতি* ; বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় ; ১৯৯২ ; উনিশ পৃ.) । উত্তর ও পূর্ববঙ্গে সোলার চালি, বাংলার সর্বত্র বারা বা মনসাঘট প্রভৃতি শিল্পের মতো এই লক্ষের বিজনীও হয়ত কোথাও আছে বা ছিল।

সনকার নির্বন্ধাতিশয্যে বেহুলা পরিচয় দিলেন— বললেন কাতর না হতে লোহার-বাসরের দ্বার ঘুচাতে দেখা গেল—

সিজান ধানের গাছ লোহার বাসরে।
কড়ার তৈলেতে দীপ আছে আলো করে॥

কাহিনী (Narration), আচার (ritual) আর অনুষ্ঠান (function) এখানে একাকার হয়ে গেল। সনকা পরম উল্লসিত।

কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন বেহুলা 'পথিমধ্যে ডোমনী বেশ করিল ধারণ'। লক্ষ টাকার বিজনী দেখানোর পর একইভাবে সনকার শোক আর বেহুলার নির্দেশে লোহার বাসর ঘর খোলার পর :

দেখেন জ্বলিছে দীপ পূর্বের প্রকারে।
সিদ্ধধানে হইয়াছে অঙ্কুর জনম।
ভিত্তিতে ময়ূর নাহি করেছে গমন॥ [মনসামঙ্গল : দ্বিজকালী ; উক্ত ; ১০১ পৃ.]

ভাসান যাত্রার সময় বেহুলা লোহার বাসরে কড়াকের তেলে জ্বালিয়েছিলেন প্রদীপ ; সিদ্ধধান বপন করে গিয়েছিলেন—ভিত্তিতে এঁকেছিলেন কাঠকয়লার ময়ূর— সেই ময়ূর পেখম মেলে উড়ে গেছে।

রামবিনোদের কাহিনী-নির্মাণে ক্ষমানন্দ দাসের আখ্যান পরিকল্পনার ছাপ এই ডোমনী প্রসঙ্গে প্রায় একরকম। বেহুলা লখিন্দরের কাছে অনুমতি চাইলেন ডোমনী বেশ ধারণের জন্যে :

ডিঙ্গা লৈয়া এহিখানে থাক তুমি খানি॥
ডোমনীর বেশ ধরি পুরে যাইব আমি।
বুঝিব কেমন দয়া কেবাল করে মোরে। বিচনী বুনাইয়া মোরে দেও প্রাণেশ্বরে॥
[শ্রীরায় বিনোদ (?) : কবি ও কাব্য ; উল্লেখিত ; ১০৯ পৃ.]

বেহুলার বিজনীতে আঁকা রয়েছে— 'পদ্মা, চান্দো ও তার সাতপুত্র, শঙ্খ ওঝা এবং বিপুলার ছবি।' সনকা এসব দেখে কেঁদে উঠলেন :

বিচনী লইয়া করে কান্দে সোনা উশ্চস্বরে
কহ কহ সাহের কুমারী।

ভাসাইয়া লক্ষ্মীন্দর গেলা কোন্ ডোম ঘর
পুনঃ কেনে চম্পক নগরী॥

চাঁদ কিন্তু ক্ষুব্ধ হলেন। তাঁর জিজ্ঞাসা—

কথায় এড়িলা মোর পুত্র লক্ষ্মীন্দর।
আসিছ ডোমনী হৈয়া চম্পক নগর॥
বণিক কুলেতে জন্মি হৈলা দুরাচারী।
হেমতাল লৈয়া যায় মারিবারে বাড়ি॥

'বিপদ বুঝে বিপুলা পালিয়ে লক্ষ্মীন্দরের কাছে চলে গেল'। [উক্ত ; ১০৯-১০ পৃ.]।

আমরা বলছিলাম, বিবাহ ব্যাপারে মনসার অভিভাবকত্বের কথা। ডোমনীবেশী বেহুলার সঙ্গে মালদহের লোকনৃত্য ও নাট্য— ডোমনী কাচের সম্পর্ক নিশ্চয় আছে। চাঁই-মণ্ডল জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিবাহের কৃত্য হিসেবেই ডোমনী-কাচের ব্যবহার হয়। আর এই জনগোষ্ঠীর মধ্যেই প্রধানত ডোমনী-কাচ প্রচলিত। ক্ষিতিমোহন সেন 'প্রবাসী' পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন, 'বাংলায় মনসাপূজা' (আষাঢ়, ১৩২৯)। এই প্রবন্ধে তিনি জানিয়েছেন, অন্ধ্রপ্রদেশের কোন কোন জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিবাহ-সংক্রান্ত একটি আচার আছে। নবদম্পতিকে বিয়ের পর সমুদ্রে ভেলায় করে কিছু দূর যাত্রা করতে হয়— ফেরার সময় তারা ডোম-ডোমনীর বেশ ধারণ করে ফেরে। রীতিটির সঙ্গে বেহুলার ভাসান যাত্রা আর ছদ্মবেশ ধারণ করে ফেরার মিলটুকু অস্বীকার করা যায় না।

ঠিক কোনসূত্র কিভাবে মনসার পূজাচার, মনসামঙ্গল কাহিনী ও আনুষঙ্গিক লৌকিক কার্যকলাপের মধ্যে ডোম সমাজের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠল তা নির্ণয় করা কঠিন। ডোমনী বেশ ধারিণী বেহুলার কৃত্যটি দীর্ঘদিন সমাজে স্বীকৃত ছিল বলেই কবিরা তা নিয়ে কাহিনী বিস্তার করেছেন। আসর-সমর্থন না পেলে এরকম ঘটা অসম্ভব হত। আসামে প্রচলিত নারায়ণদেবের রচনায় আছে :

ডিঙ্গা হস্তে নামে তরে ডোমর পসার ধরে
ধরিলেক ডুমনির বেস।
মলিন বসন পরি কর্ণে পিতলর কুরি
বালায়া পাটে বান্ধিলেক কেস॥

['নারায়ণ দেব বিরচিত পদ্মাপুরাণ'— ভাটীয়ালী খণ্ড :
ড. নবীনচন্দ্র শর্মা সম্পাদিত ; উক্ত; ১৬২ পৃ .]।

পাশাপাশি *মায়াবন্তী বিষহরী*-তেও প্রসঙ্গটি পাওয়া যাচ্ছে ; অংশটির নাম 'ডুমুনী মায়া'। নৃত্যগীতময়, বাকোবাক্যমূলক সে খুব আসর-জমাটি রচনা।

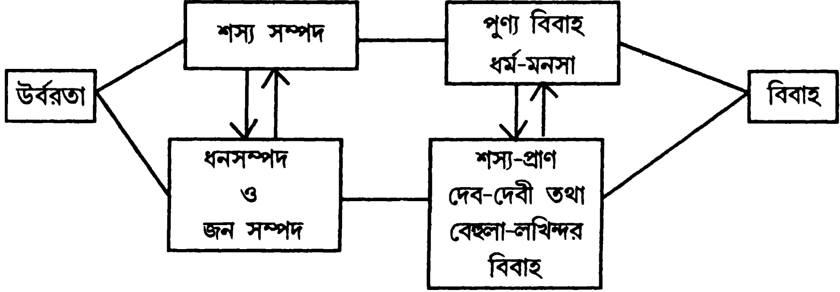
সিখান নগর ছারি ডুমুনী কত দূরক যায়।
চাম্পালীয়া গাভুর পাই ধেমালি খেলায়॥
কাকো যাচে গুয়া ডুমুনী কাকো যাচে ফুল।
ডোমর জাতি নহলে তোক দেং জাতিকুল॥
হাটে কেন নিন্দা ডুমুনী বাজারে কেন নিন্দা।
সোনা রূপা থাকিতে পিতলর কেনে পিন্ধা॥

[*মায়াবন্তী বিষহরী* ; উক্ত ; ৫৬৫ পৃ.]

॥ ২৬ ॥

উবর্রতাশক্তি— বিবাহ ব্যাপারের অভিভাবিকা মনসা-র প্রধান পুরাকথার স্বরূপ

আপাতত নিশ্চয় প্রমাণিত, বিবাহের অভিভাবক-স্বরূপিণী মনসাকে পূজা দেওয়ার কাহিনীই মনসামঙ্গলের প্রধান আখ্যানটি গড়ে তুলেছে। পুরাকথাটি বিশ্লেষণে দুটি ভিন্ন অভিপ্রায়ের সমাপতন দেখতে পাচ্ছি :



বাংলার জনমানসে এই ভাবনাগুলি বিমিশ্রিত হয়ে একাকার ও কখনও বিশ্লিষ্ট হয়ে উপস্থাপিত হবার প্রক্রিয়া আমরা নিশ্চয় এই বিশিষ্ট পুরাকথাটিতে খুঁজে পাই। বিবাহ রাত্রে মৃত্যু ও পুনর্জীবনের কাহিনী শস্যপ্রাণ দেবতার বপন ও ফলন সংক্রান্ত প্রাকৃতিক-সংঘটনের সমান্তরালেই গড়ে উঠেছে। দুটি ভিন্ন অভিপ্রায়ের সমাপতন কেন কিভাবে ঘটল তা সম্পূর্ণ বিশ্লেষণ কবার মতো তথ্য আমাদের হাতে নেই। তবে বিবাহ, নরনারীর যৌনসম্পর্কে মনসার অধিকার প্রশ্নহীন। সন্তান জন্মদান ও শিশু রক্ষয়িত্রী হিসেবে তার ক্ষমতার কথা লোক সমাজে দীর্ঘদিন ধরে সমর্থিত হয়েছে। এহল জনসম্পদের মাত্রা। বেহুলা-লখিন্দরের গল্পে এই মাত্রাটি প্রমাণিত। অন্যপক্ষে একই কাহিনীতে ভরাডুবি হয়ে যাওয়া সম্পদ ফিরে আসার পেছনে, নাগদল নিজেরা সেই সম্পদ চাঁদের উঠানে বয়ে দিয়ে আসার কথায় ধনসম্পদ (চাঁদের পক্ষে) আর শস্যসম্পদ (সাধারণ মানুষের পক্ষে) একাকার হয়েছে।

॥ ২৭ ॥

মনসা মঙ্গলে সর্প-কথা (Serpent lore)

বিবাহ প্রসঙ্গে আর একটি রীতির সংবাদ পেয়েছি। সেটি উত্থাপন করলে সম্পূর্ণ নতুন একটি প্রসঙ্গের সূচনা করতে হয়। কেরলের কোন কোন গৃহস্থের অঙ্গনে 'সর্প-কোয়া' নামক স্থানে মঙ্গলসূত্র প্রদানের অনুষ্ঠান করা বিধেয়। সর্প-কোয়ার ভেতরে থাকে পরিবারের রক্ষাকর্তা সাপ— বস্তুত এই সাপটিকে চোখে দেখা যায় না ; তবে পরিবারের সকলেই একে শ্রদ্ধা করে। এই দেবতা রুষ্ট হলে বংশের প্রথম সন্তানের ক্ষতি হয় বলে প্রচলিত ধারণা। সংবাদটি দিয়েছেন— আমাদের পারিবারিক বান্ধবী ড. উষা মেনন। কেরলের লোকসংস্কৃতি আলোচনার সূত্রে কাভালাম নারায়ণ পানিক্কার লিখেছেন 'সর্পকোয়া'-র কথা : 'Sometimes the consent of the serpents will be required when a household desires to move away a serpent deity from its ancestral home in the households grove. (*Folklore of Kerala* ; Kavalam Narayana Panikkar ; National Book Trust ; First Edition

1991, First Reprint 1999 ; New Delhi ; 53 পৃ.)। নাম্বুদ্রি পরিবারে সর্পকোয়া 'পাম্পম্মেক্কাভু' নামে পরিচিত— কখনও কখনও এই জায়গার নাম দেওয়া হয় 'মান্নারস্‌সালা' অর্থাৎ শীতল অঞ্চল। কেরল প্রদেশে প্রবল লোকবিশ্বাস এই—মহাভারতের খাণ্ডব দাহনের পর 'মান্নারস্‌সালা'-তে কিছু সাপ আশ্রয় নিয়েছিল।

মনসামঙ্গলে সর্প প্রসঙ্গ অপরিহার্যভাবে যুক্ত। দ্বিতীয় মন্থনের ঘটনার সঙ্গে নাগ ও সর্প একাকার। মনসামঙ্গলের নাগ ও সর্প-কৃষ্টির সমাপতন কিভাবে ঘটেছে তার বিস্তৃত বিশ্লেষণ দরকার। নাগ বলতে জনগোষ্ঠী, খুব সম্ভব যাদের কুল-প্রতীক (totem) সাপ। আর সাপ নিছকই বিষধর প্রাণী। এই দুই সত্তা দ্বিতীয় মন্থন ও আদ্যের কথায় একাকার হয়ে গেছে। শিবের 'জ্যোতির্ময় দীপ্ত' অক্ষয় বীর্য থেকে পাতালে নির্মাণি 'শিবের নন্দিনী' মনসাকে জন্ম দিলেন—

প্রথমে মৃণাল সহ বপুর সৃজনে।।
হৃদয় জঠর স্থান নির্মাণ করিল।
উরুযুগ কণ্ঠ চারু পয়োধর হৈল।।
... ...
দুই বাহু করতল অঙ্গুলি সুভাতি।
পদযুগ সুবলিত হৈল পদ্মাবতী।।
জীবন্যাস করিয়া মনসা থুইল নাম।
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন দেখি অনুপাম।। [১. ১৮. ২৩৭-৩৮, ২৪১-৪২]

এই জন্মদান মানবিক— এর সঙ্গে সর্পের সম্পর্ক নেই। অবশ্য বাংলার যোগীসিদ্ধদের কিছু কিছু ধ্যান-ধারণার প্রক্ষেপও এখানে থেকে যাওয়া বিচিত্র নয়। লখিন্দরকে বাঁচিয়ে তোলার সময় মনসার প্রয়াসে নাথ-সিদ্ধাইদের ভাবজগৎ স্পষ্ট হয় ; তার সঙ্গে নির্মাণির নির্মাণ প্রণালীর মিল দুর্লক্ষ নয়। মনসা সেখানে—

শির পদ আদি অঙ্গ করিল জোড়ন।
লখাই জীয়াইতে পদ্মা স্থির কৈল মন।।
বলিসেক খড়্গা ভেদি পবনের সন্ধি।
পবনের পাশে অস্থি চিত্ত কৈল বন্দী।।
... ...
জপিল পূরাক মুনি মহামন্ত্র-সারে।
অস্থির উপরে মাংস চর্মেতে সঞ্চারে।। [১২. ৫২. ৭০৫-০৬, ৭২২]

শেষের দিকের 'পূরাক' নিঃসন্দেহে যোগসাধনার 'পূরক'-এর অপভ্রষ্ট রূপ।

অন্যত্রও নাগদের সঙ্গে জনগোষ্ঠীগত ব্যবহারের মিল লক্ষ করি। কদ্রু-বিনতার কাহিনীতে নাগ-টোটেম এবং পক্ষী-টোটেমের দ্বন্দ্ব স্পষ্ট হয়। সর্পসত্র যজ্ঞের কাহিনীতেও তার স্পষ্ট রূপ লক্ষ করি। কালিদহে গরুড়ের আগমন, সর্প ধ্বংস করা— প্রতিদিন একটি করে নাগ ভক্ষ্য হিসাবে প্রাপ্তির অঙ্গীকার, মনসামঙ্গল কবিদের নিজস্ব রচনা ; একে ঠিক পুরাণের লোকায়ন 'নিষ্পুরাণীকরণ' (demythification) বলা যাবে না। 'লোকায়ন' অর্থাৎ লোকজীবনে পুরাণ প্রসঙ্গের নতুন রূপ ধারণের প্রক্রিয়া হিসেবে গণ্য। অন্যদিকে দ্বিতীয় মন্থনের পর বিষক্রিয়ায় শিবের ঢলে পড়া, মনসার মন্ত্রজাত— বিষাধিকার, বিষ বণ্টন— প্রভৃতি নাগ-কৃষ্টি ও সর্পকৃষ্টির সমাপতন ঘটিয়েছে। আদিতে পূর্বপুরুষের সঙ্গে নাগদের সম্পর্ক, পরে নাগ ও সর্পের বিশ্লিষ্ট

হয়ে যাওয়া আর শেষ পর্যায়ে নাগ-সর্পের বিমিশ্রণ, বাংলার মনসামঙ্গলে এই তিনটি স্তরের পুরাকথাই লাভ করা যায়।

চাঁদ সদাগরের নখরা-উদ্যান ধ্বংস করার একটি পর্যায়ের বর্ণনা :

রথ ভরে বিষহরি প্রবেশে চাঁদোর পুরী
দাঁড়াইয়া নাখরা নিকটে।
আজ্ঞা দিল নাগদলে সভে ধায় কুতূহলে
অস্ত্র ধরি রম্য বন কাটে॥ (৫. ১২. ২৫৫)

চাঁদের বাগানের রক্ষকরা গিয়ে খবর দিলে চাঁদ এসে বাগান পুনরায় আগের অবস্থায় নিয়ে গেলেন। এখানে নাগরা মনুষ্যরূপী। অন্যত্রও দেখা গেছে তাই। পঞ্চনাগ চাঁদকে লাঞ্ছনা করার সময়—

পঞ্চ নাগ মায়াবেশে অভিনব দরবেশে
চাঁদোরে রহায় তরুতলে। (৯. ১৭. ৩০৯)

এদের সর্পরূপী বলে গ্রহণ করা সম্ভব নয়।

অন্যদিকে মনসার আভরণ সাপ— বারবার নানারকম বিবরণ তার ; একাংশ থেকে উদ্ধার করছি। উপমার জগৎ থেকে সেই সব সাপের নাম থেকে একটি ছক রচনা করা সম্ভব।

সাপ	অলঙ্কার/প্রসাধন	অতিরিক্ত মন্তব্য
চিরনিয়া	কুরুলিলা কেশ	
নাইনাড়া	করবী	
উদয়কাল	খোপার পদ্মফুল	
চিত্র	আলকাবলির শোভা	'যেন নীল মেঘে উদয় তারাগণ'
সিন্দুরিয়া নাগ	সীমন্তে সিন্দুর	
ধুসরিয়া নাগ	শুকুন্তলা	পরচুল (?)
সর্ব	সিতিপাটি	'নীল মেঘ তটে যেন বিজুলি দিপতি'
কালচিতি নাগ	ভুরুযুগ	'কালিনীর হস্তী যেন স্বর্ণগিরি মাঝে'
কালনাগিনী	নয়নে কজ্জল	'কবুলয় দলে যেন খঞ্জন যুগল'
কনক চিতি	নাসিকা উজ্জ্বল	নাকছাবি
সুরঙ্গ সিন্দুর নাগ	অধরের কান্তি	
ধবলিয়া চিতি	দশনের পাতি	
শ্বেত কর্ণ নাগ	কেয়াপতি	গলায় অলঙ্কার 'পীত গিরি বেড়ি যেন বহে ভাগীরথী'
মণিনাগ	কণ্ঠভূষণ	
হালিয়া নাগ	হার	সুমেরু শিখরে যেন বিজুলি-ঝঙ্কার
বাজ সর্প	বলয়, তাড়	
সঙ্কনিয়া চিতি	শঙ্খ	
আড়িয়াল বঙ্ক	বাহুটি	
বিঘতিয়া বোড়া	অঙ্গুরি	
গন্ধচিতি	কুঙ্কুম/কস্তুরি	

সাপ	অলঙ্কার/প্রসাধন	অতিরিক্ত মন্তব্য
ময়লজ নাগ	চন্দন	'তাহার বিমলগন্ধ দশদিগে ধায়'
মঙ্গলিয়া বোড়া	হৃদয় কাচুলি	
ধনিয়া হুলি	নেতের আঁচল	
উলুবোড়া	কাছিয়া চরণ	
বেত আছাড়	কটি ধটি	
লাউ ড়ুগি	গাথিয়া বসন	
নাগ	চরণে নূপুর	(নাগের নাম অ-দত্ত)
কালি নাগিনী	শিরে দণ্ড	

মনসা সাপের দেবী হবার পর এই রচনার দরকার পড়েছে। সর্পাভরণা দেবী— ভয়াবহ, তাকে হয়ত তান্ত্রিকরাই প্রথমে ভেবেছেন। তন্ত্রের দৃষ্টিতে শরীরের মধ্যে কুলকুণ্ডলিনী নাগের অবস্থানের কথা ভাবা হয়।

সাপ সংক্রান্ত বিভিন্ন ভাবনা ও সংস্কার বাংলায় আছে তার সঙ্গে দেবী মনসার সম্পর্ক কতটা, ভাবা দরকার। ড. বরুণকুমার চক্রবর্তী বেশ কিছু লোকসংস্কার সংগ্রহ করে একটি পুস্তক লিখেছেন। সেখানে পাচ্ছি সাপ সংক্রান্ত কিছু সংস্কার। যথা :

[ড. বরুণকুমার চক্রবর্তী : "লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার" ; পুস্তক বিপণি ; কলকাতা ; ১৩৮৭ বঙ্গাব্দ ; ৫০ পৃ.]

১. বাস্তু সাপ মার তো নেই। [৫০ পৃ.]
২. মেয়েদের বাঁদিকে এবং পুরুষদের ডান দিকে সাপ দেখা ভাল। [ঐ ; ৭২ পৃ.]
৩. সর্প-সর্পিণীর মৈথুন দর্শন সৌভাগ্যের সূচক। [ঐ ; ঐ]
৪. সাপের স্বপ্ন দেখলে বংশ বৃদ্ধি হয়। [ঐ ; ঐ]
৫. তক্ষক সাপ ডাকা অশুভ। [ঐ ; ঐ]
৬. স্বপ্নে সর্প দংশনে বিবাহিতা রমণী সন্তানবতী হয়। [ঐ ; ৭৬ পৃ.]
৭. গো-সাপ দেখলে ব্যর্থতার সম্মুখীন হতে হয়। [ঐ ; ঐ]
৮. সাপ, বানর এবং কচ্ছপ গর্ভবতী রমণীর দেখা নিষেধ। [ঐ ; ৮২ পৃ.]
৯. গর্ভাবস্থায় সাপ দেখতে নেই, তাহলে ভাবী সন্তানও জিভ বার করা হয়। [ঐ ; ৮২ পৃ.]
১০. গর্ভবতী রমণীর সাপের গর্ত ডিঙ্গান নিষেধ। এতে ভাবী সন্তান নষ্ট হয়ে যেতে পারে। [ঐ ; ঐ]
১১. যাত্রার সময় যদি ডানদিকে সাপ দেখা যায়, বাঁদিকে দেখা যায় শেয়াল অথবা গয়লাকে দই বিক্রী করত দেখা যায়, তাহলে তা শুভ। [ঐ ; ১০০ পৃ.]।
১২. 'নেই' বললে নাকি সাপের বিষ থাকে না।' [ঐ ; ১১০ পৃ.]

এই লোক বিশ্বাসগুলির মধ্যে শেষেরটি নিছক ইচ্ছাপূরণের জাদুক্রিয়া বলে মনে হয়। কিন্তু বাকি এগারটির মধ্যে দুটি সাপ-সম্পর্কিত নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় বহন করছে— তক্ষক ও গো-সাপ ডাকা ও দেখা অশুভ। (৫ ও ৭ নং)

বস্তুতপক্ষে তক্ষক ও গো-সাপ সাধারণ অর্থে সাপ নয়। গো-সাপ দেখা অশুভ এটি চণ্ডীমঙ্গলের কালকেতুর অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করার ফল হতে পারে। বাকি নটি লোকবিশ্বাস

কোন না কোনভাবে সর্প-টোটেমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এগার নং লোকবিশ্বাসটি আরও দুটি ভিন্ন অনুষঙ্গে উত্থাপন করা হয়েছে। যাত্রার শুভাশুভ সম্পর্কে আরও বেশ কিছু অনুষঙ্গ বাংলার জনমনে বিদ্যমান। সাপকে শুভ ভাবা— সর্প টোটেমের প্রসঙ্গ চ্যুতির ফল হতে পারে।

আট, নয় ও দশ নম্বর লোকবিশ্বাস তিনটি বাহ্যত নেতিবাচক হলেও এর আড়ালে পূর্ব পুরুষের সঙ্গে সাপের নিবিড় সম্পর্কের লোক-মনস্তত্ত্ব জড়িত থাকতে পারে। বানর ও কচ্ছপও টোটেম হিসেবে বেশ জনপ্রিয়। সেজন্যে এইরকম ভাবা হয়ে থাকতে পারে। সাপের গর্ত নিঃসন্দেহে বংশধারাকে নিয়ন্ত্রণকারী বলেই তা অতিক্রম করার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছে।

বাকি সব কয়টি অনুষঙ্গই সাপকে বংশের ধারাবাহিকতার সঙ্গে যুক্ত করে ভাবার ফল বলে মনে করি। সর্পমৈথুন-দৃশ্য শুধু নয়— মিথুনরত সাপের উপর এক টুকরো কাপড় ছুঁড়ে দিলে, সেই কাপড় নানা কারণে জাদু শক্তিসম্পন্ন বলে গণ্য করা হয়। বংশ বৃদ্ধির সঙ্গে সাপের স্বপ্নকে যুক্ত করা রীতিমতো টোটেম কৃষ্টির বলে মনে হয়।

পৃথিবীর নানা দেশে নানা জাতির মনেই সর্প-টোটেমের ধারণা রয়েছে। এরা মনে করে তাদের বংশের আদি-নারীর সঙ্গে যৌন সম্পর্ক হয়েছিল একটি সাপের। এই ছকটি খুবই পরিচিত এবং সর্বজনীন (universal) কিছু উদাহরণ নিচ্ছি।

১. অস্ট্রেলিয়াতে এক ধরনের সাপকে রামধনু-সাপ (Rainbow Snake) বলা হয় ; সেই সাপ বনের শিকার-নিয়ন্ত্রণকারী— এরকম লোকবিশ্বাস তীব্র—'they are regards as guardians of hunting grounds they inhabits' [*Oceanic and Australian Mythology*] ; Library of the world Myths and Legends : Roslyn Poignant; Newnes Books ; Standard Literature প্রকাশিত ; মূল প্রকাশক— The Hamlyn Publishing Group Ltd., Middlesex, Rushden, England ; 1985 ; 89 পৃ.)

এই রামধনু-সাপটিকে সন্তানসম্ভবা নারীর পক্ষে বিপজ্জনক ভাবা হয়—'They are particularly dangerous to child-bearing women and can cause miscarriages, still births, illness and death.' এজন্য ঋতুমতী রমণীর ঋতুকালে সাপ নিয়ে অনুষ্ঠিত হয় 'most effective magic.' উপরন্তু এই রামধনু-সাপকে বিভিন্ন রকম প্রাকৃতিক দুর্বিপাকের কারণ হিসেবেও অশুভ-বার্তাবাহী বা কার্যকারণ শক্তি রূপে কল্পনা করা হয়। 'They cause winds, landslides, earth-quakes and flood.' [উক্ত ; 89 পৃ.]

২. নিউ আয়ারল্যান্ড দ্বীপের মেডিনা জেলাতে সর্প-টোটেম জনগোষ্ঠী মনে করে ভূমিকম্পের দেবতা 'Marruni' তাদের আদিপুরুষ। স্বভাবতই Marruni আর সাপ সেখানে একাকার।

৩. বোংগাইন ভিলে (Bangain villa) দ্বীপের দক্ষিণে ছোট ছোট দুটি দ্বীপে বাস করে 'মোন-আলু' (Mon-alu) জনগোষ্ঠীর মানুষ। এরা পাপুয়ান জনগোষ্ঠীর মানুষ— ভাষা অস্ট্রেলীয়। বুনোসি (Bunosi) নামে এক সাপের গল্প সেখানে প্রচলিত। মানুষের পেটে তার জন্ম। তার লেজখানা বিশাল— সমস্ত বাড়ি ছেয়ে যায়। কাফিসি (Kafisi) ছিল বুনোসির বোন ; সে তার ভাইকে অতি যত্নে সেবা করত। বুনোসিকে তার পিতামাতা তাড়িয়ে দেয়— কাফিসি তার সঙ্গে গিয়েছিল চলে। বুনোসি নানাভাবে বোনকে পরিচর্যা করেছিল : 'Bunosi made fire for her and coughed up plants and pigs.' (উক্ত ; ঐ ; 89 পৃ.)।

আরও দক্ষিণে— সান ক্রিস্তোবাল (San Cristobal) আর ফ্লোরিডা (Florida)-তেও একই কাহিনী প্রচলিত আছে। কাফিসির নাম সেখানে সামান্য বদলেছে। সানক্রিস্তোবালে কাউহাউসিবাওরে (Kauhausibware) আর ফ্লোরিডায় নামটি হয়েছে কোয়েবাসি (Koevasi)। ফ্লোরিডার সমস্ত মানুষই নাকি 'কোয়েবাসি'র সন্তান— 'The later (কোয়েবাসি) is described as a creator from whom all the people of the Island are descended.' (ঐ ; 89 পৃ.)। 'কোয়েবাসি' ঐ অঞ্চলের ভাষার আদি রূপটি গড়েছেন— এনে দিয়েছেন আরও অনেক কিছু।

৪. এফ. ই. ফক্স (F. E Fox) দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপমালার উলওয়া, সান ক্রিস্টোবাল, ওয়াডাল কানাল এবং ফ্লোরিডায় একটি লোকগল্প সংগ্রহ করেছেন। ওয়ালুটাহাঙ্গা (Walutahanga) একটি সাপিনী। তার জন্ম হয় সাধারণ কোন নারীর গর্ভে। ওয়ালুটাহাঙ্গার মা তার বাবার কাছে সাপিনী-সন্তানের কথা গোপন রাখল। কিছুদিন পর তার আর একটি সন্তান হল। তখন তার মনে পড়ল ওয়ালুটাহাঙ্গার কথা। জঙ্গলে সাপিনী-সন্তানকে খুঁজতে গেল সে। ওয়ালুটাহাঙ্গার বাবার সন্দেহ হল। সে স্ত্রীর পিছু পিছু চলল। স্ত্রীর পিছন পিছন বনে প্রবেশ করে শুনতে পেল গান :

রো রুরু রো, ইয়া রুরো, কেঁদো না
আমার তো কোন পা নেই দাঁড়াবার মতো
আমার তো কোন হাত নেই যে তোমার জড়িয়ে ধরব
রো রুরু রো, ইয়ারুরো, কেঁদো না

বাবা ভয় পেয়ে সাপিনী-সন্তান ওয়ালুটাহাঙ্গাকে আট টুকরো করে কেটে ফেলল। এর পর অদ্ভুত বিপর্যয় ঘটল : 'After eight days rain she was joined together again and began her journeying. She became malevolent and started to pursue and eat people.' (উক্ত ; ঐ ; 91 পৃ.)। সকলে মিলে আবার ওয়ালুটাহাঙ্গাকে ধরে আট ভাগে কেটে রেঁধে খেয়ে ফেলল। খেলোনা শুধু একটি স্ত্রীলোক আর তার শিশুপুত্র। ওয়ালুটাহাঙ্গার হাড় ফেলা হল সমুদ্রে— সমুদ্রে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার তার হাড়গুলো জড়ো হল— সমুদ্রের ঢেউ আছড়ে পড়ল গ্রামে। ভেঙ্গেচুরে ধ্বংস হয়ে গেল সব কিছু। বাঁচল শুধু ওয়ালুটাহাঙ্গার মা তার ভাই। এবার ওয়ালুটুহাঙ্গা তাদের শেখাল অনেক কিছু— 'the snake made yams, taro and coconuts and caused a clear stream to flow.' [ঐ]।

৫. অস্ট্রেলিয়ার উইক মুনকান (wik munkan) অঞ্চলে Taipan নামের একটি বৃহৎ সাপের গল্প প্রচলিত আছে। ইউ. ম্যাককোনেল এই কাহিনী সংগ্রহ করেন। তাইপানের পুত্র নীল জিভ দোমুখো সাপ (lizard)-এর বৌকে নিয়ে পালায় ; দোমুখো সাপটি ধাওয়া করে তাইপানের ছেলেকে হত্যা করে। দো-মুখো সাপ তাইপানের পুত্রের হৃদ্‌পিণ্ড তার পিতাকেই খেতে বলে। তাইপান এর পর মানুষের রক্ত সংবহনের প্রত্যেকটি দিক নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে : 'Taipan made a gift of the blood to man and as a consequence he controls the physiological processes of men ; the circulation of the blood and women's menstrual flow.' [উক্ত ; 132 পৃ.]।

তাইপান এরপর মানুষের স্বস্তিদানকারী, আরোগ্যের দেবতা আর পুরোহিতে পরিণত হল। নরনারীর যৌন সম্পর্কও তার নিয়ন্ত্রণে এরকম ভাবা হয়। 'His anger was roused

particularly by the breaking of the rules which govern relationships between the sexes.' [উক্ত ; 132 পৃ.]।

৬. অস্ট্রেলিয়ার আর্নহেমল্যান্ড অঞ্চলে 'জুলুংগুল' নামের এক দেবতার কথা জানা যাচ্ছে। গ্রামবাসী তাকে রোজ একজন করে মানুষ আহার্য হিসাবে উৎসর্গ করত। এক তরুণকে গিলে আবার তাকে উগরে দেয় জুলুংগুল। এই ঘটনা ঐ এলাকায় সাধারণ মানুষের চোখে মানুষের শৈশব পার হয়ে যৌবনে পদার্পণের প্রতীকে পরিণত হয়। 'a symbolic rebirth that marks their transition from childhood to manhood.' [উক্ত ; 133 পৃ.]।

৭. আফ্রিকার আবোনি-র রাজা ঘেজো-র প্রাসাদে নিজে নিজের লেজ খাচ্ছে—এরকম সাপের মূর্তি খোদাই করা আছে। একে ভাবা হয় আবহমান জীবনপ্রবাহের প্রতীক। এই ধরনের মূর্তিকলা আফ্রিকায় প্রচুর। Geoffrey Parrinder-এর ভাষায় : 'A snake with its tail in its mouth, apparently swallowing itself yet with no beginning or end, like a circle and sphere, is symbolic of eaternity.' (Geoffrey Parrinder : *African Mythology*; The Standard Literature Co. P. Ltd. ; 1982 ; 24 পৃ.)। সাপের সঙ্গে অমরত্বের প্রসঙ্গ নানাভাবে আফ্রিকার পুরাকথায় পাওয়া যাচ্ছে। সিয়েরা লিওনে-র কোনও উপজাতির মধ্যে প্রচলিত পুরাকথায় পাচ্ছি ঈশ্বর আদি মানব আদি মানবী আর তাদের শিশুসন্তান-কে অমরত্বের বর প্রদান করেছিলেন। বলেছিলেন বুড়ো হলেই তাদের দেবেন তরুণ করে। নতুন চামড়া পাঠিয়েছিলেন তিনি, একটা কুকুরের মারফৎ। কুকুর নতুন চামড়ার বোঝা নিয়ে চলল মানুষের কাছে— পথে বেশ কিছু পশু আহার করছিল। ভাতের সঙ্গে কুমড়োর তরকারি। কুকুর সেই খাবারের ভাগ পেয়ে মহানন্দে তার বোঝার কথা বলে ফেলল। ...'the snake overheard this he slipped out quietly, stale the bundle and shared out the skins with other snakes.' (ঐ ; উক্ত ; 56 পৃ.)। এরপর মানুষ মৃত্যুর সঙ্গে পরিচিত হতে থাকে। অন্যপক্ষে, দৈব খোলস বদলে নিয়ে সাপ চিরদিনের জন্য অমর থাকে। ঈশ্বর সাপকে তখন মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিলেন— মানুষও সাপ দেখামাত্র তাদের মারতে থাকে।

৮. নাইজার নদীর উচ্চপ্রবাহ অঞ্চলে সোনঘায় (Songhay) নামের যে গোষ্ঠী বাস করে তাদের বিশ্বাস সাপ জলের বহু কিছুই নিয়ন্ত্রণ করে। একটিহ্রদে কোন এক সর্পরূপী অপদেবতার অধিষ্ঠান ছিল। 'One day when the snake was talking the air it saw a woman and wanted to marry her.' (ঐ ; উক্ত ; 82 পৃ.)। ঐ মেয়ের বাবা মা পণ হিসেবে ঐ হ্রদের অধিকার পেতে চায়। একথা স্বীকার করে সাপ চলে গেল ঐ নব বিবাহিতা স্ত্রীকে নিয়ে। কখনও কখনও সে ফিরে আসে— 'From time to time the snake returned to his house at the bottom of the lake, from where he controlled the fish, crocodiles and hippopotami.' (ঐ ; উক্ত ; 82 পৃ.)। সোনঘায়-দের মধ্যে প্রচলিত কিংবদন্তী অনুসারে একজন মোড়ল গোছের মানুষ মাছ ধরতে গিয়ে রাত্রিবেলায় জলের ভিতর একটি ছোট্ট ভেড়া দেখে চমকে ওঠেন। মন্ত্র পড়তে পড়তে গিয়ে হাজির হন ভেড়াটির কাছাকাছি— দেখেন একটি ছোট্ট শিশুতে পরিণত হয়েছে ঐ ভেড়া। ভীত সন্ত্রস্ত ঐ গাঁওবুড়ো চিৎকার করতে থাকেন, দেখেন এক বিরাট সাপে পরিণত হয়েছে ঐ শিশু। গ্রামবাসী এসে দেখে লোকটি মারা গেছেন। কোন মানুষই এরপর ঐ হ্রদে আর যেতে সাহস করেনি। (ঐ ; 82 পৃ.)।

৯. লুইয়া (Luyia) জনজাতির কিংবদন্তী বা পুরাকথা অনুযায়ী প্রথমে তারা কেউ মারা যেত না— মৃত্যুর চারদিন পর বেঁচে উঠত। পরে সেই শক্তি হারিয়ে যায়— এক গিরগিটির অভিশাপে। মাইনা (Maina), যাকে তারা তাদের আদি পুরুষ ভাবে, একদিন বিকেলের খাবার খাচ্ছিলেন এমন সময় গিরগিটিটি এসে একটু খাদ্য পেতে চাইল। সাধারণত লুইয়ারা খুব অতিথিবৎসল— 'By the law of hospitality Maina should have given at once'; মাইনা সেই নিয়ম অনুসারে অতিথি-সৎকার করলেন না। ক্ষুব্ধ গিরগিটি অভিশাপ দিল, এর ফলে আর কখনই লুইয়ারা অমর থাকব না 'Maina and all his people would die.' (ঐ; উক্ত ; 57 পৃ.)। একইভাবে সাপের কাছে খাবার চাইল গিরগিটি, 'the snake at once shared his food with him'. (ঐ ; উক্ত ; 57 পৃ.)। গিরগিটির বরে তাই সাপ চিরকাল বেঁচে থাকে— খোলস বদলায়।

১০. অবৈধ যৌন-সম্পর্ক, তজ্জনিত অপরাধ প্রভৃতি মিলিয়ে একটি আদি কথা প্রচলিত আছে আফ্রিকার ডোগোন (Dogon) উপজাতির মধ্যে। ধরিত্রীদেবীর বস্ত্রহরণ করে তাকে ধর্ষণ করে তার অন্যতম সন্তান শৃগাল। সেই বস্ত্র তখন লাল হয়ে যায় ('the skirt was reddened with blood') আর শৃগাল তখন বস্ত্রটি শুকোতে দেয় একটি উইটিবিতে। এক মহিলা ঐ কাপড় চুরি করে। তার ক্ষমতা আশ্চর্য উপায়ে বাড়তে থাকে— শেষ পর্যন্ত সেই রাজ্যের শাসনকর্ত্রী হয়ে পড়ে সেই মহিলা। পুরুষরা রহস্যটি বুঝতে পেরে সেই কাপড় তার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে পরতেই, তারাই রাজা হয়ে পড়ে। মেয়েরা আর ঐ বস্ত্র পরতে পারবে না— জারি হয় ফরমান। এক বৃদ্ধ এই পাপের ফলে মারা গেল, নুম্মো (Nummo)-তে পরিণত হল সে; 'he did not go up to heaven at once, but continued living on earth in the shape of a great snake.' (ঐ ; উক্ত ; 61 পৃ.)। একদল যুবক বাকল দিয়ে তৈরি ঐ রকম বস্ত্র পরে গ্রামে আসার পথে সেই সাপ তাদের নিষেধ করে বাকলের পোশাক পরতে। এসময় তার কথাবার্তা 'mortal language'-এ হয়ে গেছে— এটা অতিজগতের ভাষা (spirit language) নয়— 'নুম্মো'-বেশী বৃদ্ধের তাই আর অমরত্ব লাভ হল না। মৃত্যু এল মানুষের। মারা গেল সেই বড় সাপ। যুবকরা এসে দাঁড়াল, সঙ্গে গ্রামের লোকজন। সবাই মিলে সাপটিকে পুঁতে ফেলল একটা গর্তে। সেই সাপটিকে মুড়ে দিল তারা ঐ বিশেষ ধরনের বাকল দিয়ে। ঐ বৃদ্ধের আত্মা তখন আবার এক শিশুর শরীরে ভ্রূণাকারে প্রবেশ করল—জন্ম নেবার পর দেখা গেল তার শরীর হয়েছে সেই সাপটির মতো। —'he was red like the fibre skirt and spotted like the snake' (ঐ ; উক্ত ; 62 পৃ.)। বয়স বাড়ার পর এই রূপ অবশ্য বদলে যায়। তখন শিশুটিকে ঐ আদি সর্পের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয়। এই আচরণ তথা কৃত্য ধীরে ধীরে গোটা জনগোষ্ঠীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। সাপের মতো কাঠের টুকরো থেকে 'নুম্মো'-র মতো আকৃতি প্রস্তুত করে উৎসর্গ করার নিয়ম চালু হয়।

১১. ফন (Fon) জনজাতির কাছে সাপ হল জলাশয়ের অধিকারী, গতিশীলতার প্রতীক— নদীর স্রোতের শক্তি ; সাগরের ঢেউ। সাপই হল ঈশ্বরের বাহন। এই অবসরে বলে নিতে চাই তাদের ধারণা সৃষ্টির আদিপর্বে এই মহাসর্প স্রষ্টাকে বহন করতে করতে যেখানে যেখানে থেমেছে— সেখানেই গড়ে উঠেছে পাহাড়। 'When the snake carried the creator through the world, mountains appeared whereever they stopped.' (*African Mythology* ; উক্ত ; 25 পৃ.)। পাহাড়ের মণিময় খনিগুলি নাকি সেই আদি সর্পের মল। আর

পৃথিবী হল কুণ্ডলীকৃত সাপ। সাপের এই কুণ্ডলীকৃত অবস্থার সামান্য পরিবর্তন ঘটলেই ভূমিকম্প হয়— 'Every so often the snake shifts his position a little and there is an earth quake.' [ঐ; উক্ত ; 27 পৃ.]।

১২. স্যর জেমস জর্জ ফ্রেজার জানিয়েছেন দক্ষিণ আমেরিকার ক্যারোলিনার আদিম অধিবাসী রেড ইন্ডিয়ানরা সাপ মারে না— সাপের সামনে থেকে সরে যায় তারা ; তাদের ধারণা—'If they were to kill a serpent the reptiles kindred would destroy some of their breathen, friends, or relations in return.' (*The Golden Bough* : A Study in Magic and Religion ; Sir James George Frazer ; Macmillan & Co. Ltd. London ; 1954 ; 519-20 পৃ.)। সেমিনোল (Seminole)-রা ভাবে সাপ (বিশেষ করে বিষধর 'র‍্যাটল')-কে মারলে, সেটির আত্মা (Soul of the dead rattle Snake) কোনও না কোনভাবে প্রতিশোধ গ্রহণ করবে। সোরোকি (Cherokee) গোষ্ঠীর লোকরা সাপ মারে না; কোন কারণে সাপ মেরে ফেললে প্রায়শ্চিত্ত করে সমবেতভাবে— ক্ষমা চায়। 'If these precautions are neglected, the kins folk of the dead snake will send one of their number as an avenger of blood, who will teach down the murderer and sting him to dead.' [ঐ ; 520 পৃ.]।

১৩. দক্ষিণ-পূর্ব বলিভিয়ার সিরিগুয়ানো (Shiriguanos)-দের মধ্যে একটি অদ্ভুত রীতির কথা ফ্রেজার লিখেছেন। মেয়েদের প্রথম রজোদর্শনের সময় বাড়ির চালে এক মাসের মতো লুকিয়ে রাখা হয়। দ্বিতীয় মাসে সেই টং-ঘরটি সামান্য নামানো হয়— তখনও মেয়েটি থাকে সবার দৃষ্টির আড়ালে। তৃতীয় মাসে এক ধরনের জাদুক্রিয়া করা হয়। '...in the third month old women, armed with sticks, entered the hut and ran about striking everything they met, saying they were hunting the snake that had wounded the girl.' (ঐ ; 601 পৃ.)। সাপ এখানে অদৃশ্য প্রায়— ভয়াবহ, হয়ত বা প্রজনন প্রক্রিয়ার সঙ্গে এই ভাবনার সম্পর্কও সামান্য কিছু আছে।

১৪. বৃটিশ শাসনাধীন নিউগিনি-র পশ্চিম অঞ্চলের একটি জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত আছে কেউ কোন সাপ মারলে, সেই সাপের সমস্তটাকে পুড়িয়ে ছাই না করে ছাড়া চলবে না। এই ছাইয়ের অংশ জাদুক্রিয়ার উদ্দেশ্যে পায়ে মাখিয়ে নেয় সেই হত্যাকারী ; উদ্দেশ্য— 'no snake will bite him for some days afterwards'. [ঐ ; 31-32 পৃ.]।

১৫. পশ্চিম আফ্রিকার 'ফের্নাণ্ডো পো' দ্বীপপুঞ্জের ইসাপ্পো-জনগোষ্ঠী ('negroes of Issappo') এক ধরনের বিষধর সাপকে (cobra-capella) তাদের অভিভাবক দেবতা (guardian deity) হিসেবে দেখে। তাদের জীবনের ভালোমন্দ, সুখ ও দুঃখ, রোগ-বালাই, জন্ম-মৃত্যু—সব কিছুরই কার্যকারণ হিসেবে এই সাপকেই নিয়ন্ত্রক হিসাবে শ্রদ্ধা জানায়। গ্রামের মাঝখানে উঁচু একটি গাছের ডালে ঝুলিয়ে রাখা হয় সাপের খোলস— লেজটা থাকে নিচের দিকে।—'The skin of one of these reptiles is hung tail downwards from a branch of the hightest tree in the public square, and placing of it on the tree is an annual ceremony. As soon as the ceremony is over, all children born within the past year are carried out and their hands made to touch the tail of the serpent's skin.' (ঐ ; উক্ত ; 501-502 পৃ.)। এই অনুষ্ঠানের সময় একটি সাপ

হত্যা করা হয়। ফ্রেজার এই পদ্ধতিটিকে বলেছেন— 'annual killing of a sacred animal'. (ঐ; উক্ত ; 501 পৃ.)। তাঁর ব্যাখ্যা— 'The latter custom is clearly a way of placing the infants under the protection of the tribal god.' [ঐ ; উক্ত ; 502 পৃ.]।

১৬. সেনেগাম্বিয়া (Senegambia)-র জনগোষ্ঠীগুলির ধারণা একটি বড় ময়াল সাপ নাকি শিশু জন্মের আটদিনের মধ্যেই তাকে দেখতে আসে। সাইলি (Psylli) গোষ্ঠীর আত্মপরিচয়— তারা সাপের বংশধর। নবজাতককে সাপদর্শন করানোর রীতি তাদের মধ্যে চালু। বিশ্বাস— 'the snakes would not harm true-born children of the clan.' [ঐ ; উক্ত ; 502 পৃ.]।

১৭. বৃটিশ অধিকৃত পূর্ব-আফ্রিকার আকিকুয়ু (Akikuyu) গোষ্ঠীর মধ্যে সাপ-দেবতার পূজা প্রচলিত। তারা নদী আর সাপকে একাকার করে দেখে ; দীর্ঘদিন পর পর (at intervals of serveral years) তারা সর্প-দেবতার সঙ্গে তরুণীদের বিবাহ দেয়— 'For this purpose huts are built by order of the medicine-men, who there consummate the sacred marriage with the credulous female devotees.' (ঐ ; উক্ত ; 145 পৃ.)। ঐ কুটির মেয়েরা নিজেরাই গড়ে— না হলে পুরোহিতরা তাদের শাস্তি দেয়। ফ্রেজার ব্যাখ্যা করেছেন— এই ধরনের অনুষ্ঠানের আদি রূপটি নিশ্চয় আরও ভয়ঙ্কর ছিল—'we may suppose that they reflect of a real custom of sacrificing girls or women to the wines of water spirits, who are very often conceived as great serpents'.... [ঐ ; উক্ত ; 146 পৃ.]।

সাপ সম্পর্কে সারা পৃথিবীর (বিশেষত ক্রান্তীয় অঞ্চলের) জনগোষ্ঠীগুলির প্রজনন, শিকার, পশুপালন, কৃষি ইত্যাদি বহু বিচিত্র বিষয় বিমিশ্রিত ও সমাপতিত হয়েছে। এর সঙ্গে যদি আমরা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তের সর্প-সংস্কৃতির তুলনা করি— বুঝতে পারব আমাদের দেশেও সর্প-ভাবনা মোটামুটি একই রকম। সেরকম কয়েকটি প্রসঙ্গ বিভিন্ন সূত্র থেকে সংগ্রহ করে উপস্থাপন করছি।

১. মণিপুরীদের মধ্যে সাপকে পূর্বপুরুষ ভাবার সংবাদ দিয়েছেন ড. বিরিঞ্চি কুমার বরুয়া। এই পূর্বপুরুষদের বলা হয় 'পাখংবা' তাদের মধ্যে জনপ্রিয় লোকবিশ্বাস 'মানুষ মারা গেলে, সাপ হয়েই তারা আবার ফিরে আসে।— 'সাপ রূপে জন্ম লৈ ঘুরি আহে।' (*অসমর লোক-সংস্কৃতি* ; ড. বিরিঞ্চি কুমার বরুয়া; *লয়ার্ছ বুক স্টল* ; গুয়াহাটি ; দ্বিতীয় সংস্করণ; ১৯৬৭; ৪১ পৃ.)। পরিবারের মঙ্গল সাধনের জন্যেই তারা ফিরে ফিরে আসে। মণিপুরীদের মধ্যে মেইতেইদের মধ্যে একটি গোষ্ঠীর মধ্যে পাখংবা-র সর্পরূপ পরিগ্রহ করার জনবিশ্বাসের কথা পাচ্ছি T. C. Hodson-এর রচনায়। পাখংবা তাদের পূর্বপুরুষ দেবতা (ancestral spirits) । সর্পরূপী পাখংবা-র পূজা মেইতেইদের মধ্যে প্রচলিত। তারা পাথরে তৈরি 'নাংসা' (nangsha) নামক প্রতীক-কে মঙ্গলের ইঙ্গিত বলে মনে করে। [পশ্য : T. C. Hodson: 'The Meithis' ; দিল্লী ; ১৯৭৫]।

২. লেংহোই (বা 'লং মাইদেং') নামের একটি নারী ('ছোরলী')-র গল্প প্রচলিত আছে 'মণিপুরী' আর 'থাডউ-কুকী'-দের মধ্যে। লেংহোই একটি বড় সাপের প্রেমে পড়েছিল। অন্যদের কাছে সে সাপ— লেংহোই কিন্তু তাকে দেখত ঠিক যেন ('ধুনীয়া ডেকার রূপত') সুন্দর এক যুবক। সাপের ঔরসে লেংহোই-এর একটি সন্তান জন্মায়। ছেলেটি বড় হয়ে মায়ের কাছে পিতৃ

পরিচয় পেতে চায় ; মা তার লজ্জা পায়। এর পর পিতার সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হল। বাবা তাকে 'আহুটুইচান' উৎসব করে নতুন গ্রাম পত্তন করে। আর এই ছেলেটিই মণিপুরীদের আদি পুরুষ; সেখান থেকেই 'মণিপুরী সকলর উৎপত্তি'। [ঐ ; ৪২ পৃ.]।

৩. খাসিয়ারা সাপ-পুজো করে। তাদের সর্প-দেবতার নাম 'ইউথ্লোন'। ইউথ্লোনের পুজোয় নরবলি দেওয়া হয়। ইউথ্লোন সম্পর্কে একটি কাহিনী উল্লেখ করেছেন ড. বরুয়া।

লণ্ডিয়াং কোংখেন গ্রামে দেবতার পবিত্র স্থান। ওপরে 'বংঝিরটেহ' গুহা। সেখানে থাকে থ্লোন নামে বিরাট সাপ। কোংখেন বাজারে যাবার পথে মানুষদের ধরে ধরে খায়। এক এক দলে যত মানুষ থাকে তার অর্ধেক মানুষকে গিলে খায় থ্লোন। বিজোড় সংখ্যক মানুষ হলে খায় না— বিশেষত একজন হলে থ্লোন খায় না।

থ্লোন-কে ভাবা হয় শ্রী বা সৌন্দর্যের অধিষ্ঠাতা। [ঐ ; ৪২-৪৩ পৃ.]

৪. রাভাদের মধ্যে গুহাবাসী সর্পদেবতার পুজো প্রচলিত। ১৯৬০ সালে রাভাদের এরকম পুজোর বিবরণ দিয়েছেন ড. বরুয়া। 'আরু বছরি এটা ল'রা নাইবা এজনী ছোবালী বলি দি তাক তুষ্ট করিছিল।' (ঐ ; উক্ত ; ৪৩ পৃ.)। গোয়ালপাড়া অঞ্চলের রাভারা মনসা পূজা উপলক্ষে 'মারৈগান' করে। 'দেউরী' হয় রাভারা— 'দেওধনী'-ও হয়। দু'রকম মনসা পুজো তাদের— 'ফুল মারাই' আর 'গোটা মারাই'। ফুল মারাই একদিনের, গোটা মারাই তিনদিন ধরে অনুষ্ঠিত হয়। মনসা-বেহুলা-লখিন্দরের মূর্তি গড়িয়ে রীতিমতো বাঙালি সমাজের মতোই পুজো করা হয়। [পশ্য : *রাভা জনজাতি* ; শ্রীরাজেন রাভা ; সাহিত্যসভা ; গৌহাটি; ১৯৪৭; ১০১ পৃ.]।

৫. চেমা নাগাদের মধ্যে সংস্কার আছে— গর্ভাবস্থায় কোন নারী সাপ মারলে, সাপের জিভের মতো জিভওয়ালা সন্তান হবে। যদি কেউ সাপ মেরে ফেলে, তার মুখটাকে ভালো ভাবে থেঁতলাতে হবে। না হলে সাপ নাকি আবার বেঁচে উঠবে। আঙ্গামী নাগারাও সাপ মারে না। [ঐ ; উক্ত ; ৪৫ পৃ.] লোঠা নাগারা মনে করে সর্প-মিথুন দেখা বিপজ্জনক। এর ফলে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। তারা সাপ মারতে চায় না। [ঐ ; ৪৬ পৃ.] আঙ্গামীরা মৃত সাপের মুণ্ড সম্মোহনী ওষুধে ব্যবহার করে। [ঐ ; ৪৬ পৃ.]

৬. লুসাইদের মধ্যে সাপ সম্পর্কে ভয়ের ধারণা বেশি। তারা মনে করে সর্পমিথুন দেখা ভয়ঙ্কর। মৃত্যুও হতে পারে। অন্ততপক্ষে হাঁপানি ('টান রোগ') তো হবেই। সাপ দেখা ভয়ঙ্কর— সাপের দেবতা 'চখুবা'-কে পুজো না দিলে বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া অসম্ভব। সাপ সম্পর্কে লুসাই ও কুকীদের মধ্যে একটি উপকথা প্রচলিত। 'ছোবাং ছিলি' নামে এক মেয়ে—জুম ক্ষেতে বসে থাকত একটি সাপ কোলে নিয়ে। তাকে দেখে তার বোনরা রটিয়ে দিয়েছিল এই মেয়েটি সাপের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক লিপ্ত হয়—'সাপ এটার লগত ধৈমালি করে।' [ঐ ; ৪৭ পৃ.]। গল্পের গতি দেখে মনে হয় ছোবাং ছিলি পরে সৌভাগ্যবতী হয়েছিল। যদিও বরুয়া সে সম্পর্কে কিছু লেখেন নি।

৭. সাপ থেকে সম্মোহনী দ্রব্য প্রস্তুত করে 'রেংমা' জনজাতি। এই ওষুধ নাকি সর্প-মিথুনের মুণ্ড। [ঐ ; ৪৬ পৃ.]।

৮. ভেরিয়ার এলুইন মিনিয়াং-দের মধ্যে প্রচলিত একটি পুরাকথা শুনিয়েছেন।

'A Minyong story describes how snakes and all kinds of poisonous insects were born from the womb of a girl who had illicit relations with a snake' (Verrier Elwin : *Myths of the North-East Frontier of India*, NEFA,

Shillong, 1958, প্রথম সং ; আমরা দেখলাম 1968-এর পুনর্মুদ্রিত সংস্করণ ; 335 পৃ.)। বলাবাহুল্য এ গল্প লুসাই ও কুকীদের কাহিনীরই মতো।

৯. আসামের নাগপূজা, সর্প-কৃষ্টি সম্পর্কে কিছু কথা লিখেছেন ড. বরুয়া। অনেক পুকুরে নাগস্তম্ভ (অসমিয়া ভাষায় 'নাগবোলা') প্রতিষ্ঠা করা হয়। ড. বরুয়া জানিয়েছেন 'ঘোর ফেঁটী' নামের সাপের প্রতি আসামের বৈষ্ণবরা খুব সমীহ-সূচক ব্যবহার করে। কারণ 'মহাপুরুষ শ্রীশঙ্করদেবক ফেঁটী সাপে ফেঁট তুলি ছা দি আছিল' ; সেই কারণে বৈষ্ণব সকলর মতে ফেঁটী সাপ মরাটো নিষিদ্ধ।' (ড. বিরিঞ্চি কুমার বরুয়া : উক্ত ; ঐ ; ৪৫ পৃ.)। প্রসঙ্গত শঙ্করদেবের 'আদি দশমে'র বর্ণনা স্মরণীয়।

বরিষে কণিকা মেখে উপরও গাজে।
ফণায়ে ধরিলা ছত্র আসি সর্পরাজে।।

মহাপুরুষিয়া বৈষ্ণবদের মধ্যে 'নাগলীলা' নামক উৎসব প্রচলিত থাকার সংবাদ দিয়েছেন ড. নবীন চন্দ্র শর্মা। (পশ্য : *নারায়ণদেবের বিরচিত পদ্মাপুরাণ*— ভাটীয়ালী খণ্ড ; উক্ত ; ২৪৯ পৃ.)। মনে হয়, ফণাধর সাপ সম্পর্কে পবিত্রতার ধারণার উৎসে ভাগবত কথা বিজড়িত আছে। সর্পমিথুন দেখা অসমবাসীর পক্ষে মঙ্গলজনক। প্রেম ও যুদ্ধের ক্ষেত্রে সর্পমিথুন দর্শন সৌভাগ্যসূচক। (ড. বরুয়া ; ঐ; ৪৫ পৃ.)। আসামে সাপের স্বপ্ন দেখা বিপজ্জনক— বন্ধু বিচ্ছেদ হবার সম্ভাবনা বা পূর্বাভাস থাকে। (ঐ ; ৪৬ পৃ .)। চম্পাবতী-সাধুকথা জাতীয় একটি রূপকথার সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে— এতে সাপরূপী নায়কের সঙ্গে চম্পাবতীর প্রেম ও বিবাহ সম্পর্কিত বিষয় সন্নিবেশিত হয়েছে। (উক্ত ; ৪৬-৪৭ পৃ.)

১০. দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে রেভারেন্ড হোয়াইটহেড দেখেছেন সাপকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, খোলা জায়গায় কিংবা দেবস্থানে অন্য কোনও উদ্দেশ্যে পুজো দেওয়া হয়েছে। বেলারি শহরে আছে 'দুর্গাম্মা' নামের বিখ্যাত ও জনপ্রিয় দেবতা। পূজারি গোপসমাজভুক্ত। রেভারেন্ড হোয়াইটহেডকে তিনি বলেছেন— 'about forty years ago, a large snake lived in the ruined wall behind the shrine, and used to come out and eat eggs and milk placed for it before the shrine.' (*The Village Gods of South India*: Henry Whitehead ; Asian Educational Service ; New Delhi ; 1988 ; প্রথম সংস্করণ ১৯২১ ; Second Edition, revised & enlarged ; 75 পৃ.)

১১. কর্নাটক অঞ্চলে 'মানে মঞ্চি'-র পূজা দেখেছেন হোয়াইটহেড। সারা বছর মন্দিরটা খোলা-ই হয়না ('Which remains closed all the year') —বার্ষিক পূজার সময় খোলা হয়। মন্দিরের ভিতর একটি পিঁপড়ের গর্তের মতো সামান্য উঁচু জায়গা আছে। এটি হল মানে মঞ্চাম্মার থান— 'the abode of an unknown serpent, to which the name of Mane Manchamma is given.' (ঐ ; উক্ত ; 42 পৃ :)। জে. পি. ভোগেল মন্ত্রপুত নাগমূর্তি প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে সন্তানহীনা রমণীর সন্তানলাভের আকাঙক্ষার কথা লিখেছেন। (G. P. Vogel : Indian Serpent Lore, দিল্লি ; ১৯৭২ ; ২২০ পৃ.) মাদুরাই-এর নিকটবর্তী এক পাহাড়ে দেখেছি স্থানীয় একটি ঝর্ণায় স্নান করে পাথরের ফণা তোলা মূর্তি উৎসর্গ করতে। সঙ্গী গবেষক রামবাবু (মাদুরাই কামরাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকসংস্কৃতি বিভাগের বিশিষ্ট অধ্যাপিকা শ্রীমতী সরস্বতী বেণুগোপালের কাছে গবেষণারত) বললেন যে-সব মহিলাদের ঋতুস্রাব অনিয়মিত তাদের অনেকেই পাথরের সাপ-মূর্তি উৎসর্গ করে। (চিত্রপশ্য)

১২. সমগ্র উত্তর ভারতে গুগাপীর নামক এক সর্পবিষ নিবারণকারী দেবতার সংবাদ মিলছে। ইনি অবশ্য পুরুষ দেবতা। নাগপঞ্চমীতে এলাহাবাদের বাসুকী মন্দিরে নাগদেবতার পূজা জনপ্রিয়। চণ্ডীগড়, হরিদ্বার, কাশ্মীর ও বারানসীতে মনসাপূজার কিছু প্রাচীন ক্ষেত্রের সন্ধান পাওয়া যায়।

১৩. মহাকোশল অঞ্চলে সাধারণ 'কোল' জনজাতির মানুষ সাপকে খুবই মান্য করে। নাগপঞ্চমীর দিন এক কৃষক চাষ করছিল ('while ploughing on this day') সেই চাষি মেরে ফেলে কিছু সাপকে ('killed a nest of young snakes.) যথারীতি সর্পমাতা ক্ষুব্ধ হয়ে তাদের বাড়ির সকলকে হত্যা করে— 'The mother snake in revenge, in the night bit the men and all his family, except a married daughter living in another village. Having killed all but this daughter, the mother snake set out for that village to kill her also. But the girl, knowing of the festival, had put out a dish of appetising food, which the snake tasted, and which gratified her so much that she not only refrained from killing the girl, but gave her a healing lotion to sprinkle on the bodies of the parents and other children, whereby they were all restored to life. (*The Kols of Central India* ; Walter G. Griffiths; The Royal Asiatic Society of Bengal, কলকাতা ; 1946 ; 171 পৃ.)।

সুতরাং সাপ-সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক পটভূমি স্পষ্ট হয়ে আসার পর বলা যায় এইরকম রীতি, বিশ্বাস, সংস্কার ও লোকাচার— সর্বভূমিক (Universal)। বাংলার মনসা-মঙ্গল কাব্যের আখ্যানটি এই সর্পকৃষ্টির প্রেক্ষাপটে বিবেচনা করা দরকার।

বিপ্রদাসের রচনায় ঘন ঘন সাপের তালিকা পাওয়া গেছে। এইসব তালিকা থেকে সাপদের সঙ্গে তদানীন্তন বঙ্গদেশীয় জনসাধারণের গভীর পরিচিতির প্রমাণ সহজেই পেতে পারি। তৃতীয় পালার দশম গানে দেখছি বিভিন্ন সাপ এসে মনসার কাছে বিষ গ্রহণ করছে— স্বয়ং দেবী 'বিষবন্টকী' স্থান থেকে মেপে জুখে সকলকে বিষ দিচ্ছেন। এরা তাদের শক্তির তারতম্য অনুসারে বিষ পাচ্ছে ; যথা— অনন্তরাজ, বাসুকি, তক্ষক, পদ্ম, শঙ্খ, কদম্ব, কুহুক, চঞ্চুবক, কুলির, কর্কট, ধনঞ্জয়, মহাবলী, হালাই, কালাই, গন্ধকালী, জয়কালী, বেত আছাড়, অজগর, আড়িয়াল বঙ্ক, ষোল চিতি বোড়া, ধামাই আর অষ্টবোড়া। মেপে জুখে দেবার পর রয়ে গেল 'এক শতপল বিষ'। মনসা তার অর্ধভাগ নিজের এক চক্ষে রাখলেন।

সর্বশেষ লৈল কালি কাঁপে থর থর।
তার স্থান দিলা পদ্মা মলয়া শিখর।। (৩. ১০. ১৩৩)

এবার এল ধামাই।

অবশেষে নাহি. পদ্মা বলিল বিধান।।
বিষ কন্টকের স্থানে লোটাও লেঙ্গুড়ি।
দংশিয়া মারিহ তারে লেঙ্গুড়ের বাড়ি।। (৩. ১০. ১৩৪-১৩৫)

সাপ সম্পর্কে, তাদের বিষক্রিয়া সম্পর্কে ধারণা না থাকলে এই লেখা তৈরি হয় না।

চাঁদ সদাগরের ছয় পুত্রকে হত্যা করার জন্যে মনসা আবার সাপদের ডেকে পাঠিয়েছেন। তারা দলে দলে এসেছে। এবার তাদের দল অনন্তনাগ, বাসুকি, তক্ষক, শঙ্খ, পদ্ম, কদম্ব, কুমুদ, অন্ধক, ধনঞ্জয়, কর্কট, কুলীর, হালাই, কালাই, গন্ধকালি, জয়কালি, বেত আছাড়, আড়িয়াল বঙ্কা, আড়াইরাজ, ষোল চিতি, ধামাই, অষ্টবোড়া, গোখুরা, উদয় কাল, ধোড়া। এর মধ্যে ধোড়া এবং আরও দুয়েকটি সাপের নাম নতুন।

॥ ২৮ ॥

বিপ্রদাসের কাহিনী ও জাতক

ধোড়া সম্পর্কে একটি বিচিত্র কাহিনী উত্থাপন করেছেন বিপ্রদাস। এ কাহিনীটি বিপ্রদাসের কাহিনী নির্মাণের কৌশলটিকে স্পষ্ট করেছে। পাশাপাশি এটিকে বিপ্রদাসের প্রতিভা আর ভারতের চিরায়ত আখ্যানগুলির ধারাবাহিকতাব সমাপতন বলে মনে হয়। এখানে বিষয়টি বিশ্লেষণ করে নেওয়া যাক।

চাঁদের ছয় পুত্রকে হত্যা করবে কে? প্রথমে কেউ রাজি হয়নি। পরে ধোড়া ঘলেছে ধামাইয়ের রথটি পেলে সে এ কাজ করে আসবে।

ধামাইর রথখান দেহ তো আমায়।
তবে অতি শীঘ্র গতি যাইব তথায়॥ (৮. ১. ২৪)

ধামাইয়ের রথ দেওয়া হল— আকাশপথে ধোড়া চলেছে। তখন আষাঢ় মাস— নতুন বর্ষা। জলে স্থলে বর্ষার ঘনঘটা— মানুষ দোহাড়ি পেতে আল বেঁধে ধরছে মাছ। ডাকছে ব্যাঙ :

ভেক ডাক শুনি ধোড়া প্রাণ স্থির নহে।
রথে বসি ধোড়া নাগ নেহালিয়া চাহে॥ (৮. ১. ২৯)

লোভে পড়ে কুবুদ্ধির বশে রথকে বিদায় দিয়ে ধোড়া লাফ দিয়েছে জলে। সুপ্রচুর মৎস্য আর ভেক খেয়ে উদর পূরণ করে ধোড়া কাজের কথা ভুলে গেল। বেলা দু'প্রহর হতেই দোহাড়ি তুলতে গিয়ে চাষি দেখল ভেতরে সাপ!

নিদ্রাভঙ্গ হইল নাগ উঠে ফোফাইয়া।
হাথে হইতে দোহাড়ি ফেলিল ভয় পায়্যা॥ (৮. ১. ৩৫)

সমস্ত কৃষক মিলে দোহাড়ির বাঁধন খুলে হাতে লাঠি নিয়ে দাঁড়াল। সাপ বিপদে পড়ে মনে মনে আর্তনাদ করতে লাগল। বেলা তিন প্রহর হবার পর একটি নাটকীয় ঘটনা ঘটল।

উর্ধ্বমুখ হইয়া সব বেলি পানে চায়।
দোহাড়ি হইতে ধোড়া বাহিরে পলায়॥ (৮. ৩ ৫৩)

মনসা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হলেন। শেষে

কাড়িয়া লইল তার যত ছিল বিষ। (৮. ৩. ৬২)

একটি জাতকে এই কাহিনীর আশ্চর্য সমান্তরাল-ভাষ্য পাওয়া গেছে। 'হরিত মাত জাতক'। ঈশানচন্দ্র ঘোষ অনূদিত ভাষ্য থেকে গল্পটি বলে নিই :

> 'পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব নীল মণ্ডুক-যোনিতে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন। তখন লোকে মাছ ধরিবার জন্য নদী, বিল প্রভৃতিতে 'ঘোনা' পাতিয়া রাখিত। একদা একখানা ঘোনায় অনেক মাছ ঢুকিয়াছিল। একটা ঢোঁড়া সাপ মাছ খাইতে খাইতে সেই ঘোনার ভিতর গেল। তখন অনেকগুলা মাছ একসঙ্গে মিলিয়া তাহাকে কামড়াইতে আরম্ভ করিল; ইহাতে তাহার সর্বশরীর রক্তাক্ত হইল। সাপ প্রাণরক্ষার উপায় না দেখিয়া মরণভয়ে ঘোনার মুখ দিয়া বাহিরে গেল এবং বেদনায় অভিভূত হইয়া জলের ধারে পড়িয়া রহিল। নীলমণ্ডুকরূপী বোধিসত্ত্ব লাফ দিয়া সেই ঘোনার মুখের উপর গিয়া পড়িলেন। অন্য কাহারও নিকট নিজের দুঃখের কথা বলিতে না পারিয়া সাপ সেই ভেককেই বলিল, "বন্ধু নীলমণ্ডুক, তোমার বিবেচনায় এই মাছগুলার কাজ ভাল হইয়াছে কি?" ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "আমার বিবেচনায় মাছগুলা বেশ করিয়াছে। যদি বল, 'কেন?' তাহার কারণ এই— তুমি যখন নিজের কোঠে পাইলে মাছ খাও, তখন মাছগুলিই

বা আপনাদের কোঠে পাইয়া তোমাকে খাইবে না কেন? নিজের কোঠে, নিজের অধিকারে, নিজের বিচরণ-ক্ষেত্রে কেহই দুর্বল নহে।"......

বোধিসত্ত্ব এই রূপে নিজের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। এদিকে সাপটা নিতান্ত দুর্বল হইয়াছে দেখিয়া মাছগুলা শত্রুর শেষ রাখিতে নাই ইহা স্থির করিয়া, ঘোনার মুখ দিয়া বাহির হইল এবং তাহার প্রাণনাশ করিয়া চলিয়া গেল।" [ঈশানচন্দ্র ঘোষ অনূদিত : 'জাতক' ; দ্বিতীয় খণ্ড; পুনর্মুদ্রণ-ফাল্গুন ; ১৩৮০ বঙ্গাব্দ ; করুণা প্রকাশনী ; কলকাতা ; ১৪৮-৪৯ পৃ.]।

এই জাতকটির নাম 'হরিত মাত জাতক' না হয়ে 'হরিত মণ্ডূক' জাতক হলে ভালো হত— সামান্য অর্থভেদ করা সম্ভব হত।— এই পাঠান্তরের কথা ঈশানচন্দ্র নিজেই জানিয়েছেন। (উক্ত; ১৪৮ পৃ. পাদটীকা)। ঈশান চন্দ্রের দ্বিতীয় বক্তব্য— জাতকটিতে যে কাহিনী উপস্থাপিত তাতে যুক্তির শৃঙ্খলারক্ষা করা হয়নি। ঘোনা থেকে বের হওয়া অসম্ভব— সাপের পক্ষেও সত্য, মাছগুলির পক্ষেও সত্য ; সুতরাং 'ঘোনার মুখ দিয়া বাহির হইল' ঠিক যুক্তিযুক্ত বোধ হচ্ছে না। [উক্ত ; ১৪৯ পৃ. ; পাদটীকা]

বিপ্রদাস পিপিলাই কোন সূত্রে জাতকের কাহিনীটির একটি ভাষ্য উপহার দিয়েছেন। মনসা-মঙ্গলের কাহিনীর ধারাবাহিকতার মধ্যে আখ্যানটি সুন্দরভাবে মিশিয়ে দিয়েছেন তিনি। একটু পরেই চাঁদের ছয় পুত্র বিষক্রিয়ায় মারা যাবে ; সেই বিষণ্ণ পরিণতির পূর্বে নিছক কৌতুকস্থলেই কাহিনীটি যুক্ত করেছেন তিনি। হাস্যরসের লঘুতার পর করুণরসের তীব্রতা উত্থাপন করা বিপ্রদাসের কাহিনী নির্মাণের কৌশল ; অত্যন্ত মুন্সিয়ানার সঙ্গে কবি তা প্রয়োগ করেছেন। প্রয়োগের দিকটির আলোচনা আখ্যান কাব্য হিসেবে বিপ্রদাসের 'মনসামঙ্গলে'র সার্থকতা বিচার অন্যত্র করা যেতে পারে। এখানে দেখালাম জাতকের সঙ্গে আখ্যানের একাংশের মিল। আমাদের দৃঢ় অনুমান, বিপ্রদাস পিপিলাই ধোড়া (= ঢোঁড়া) সাপের এই কাহিনীটি পেয়েছেন লোকায়ত উপাদান থেকে— জাতকের উৎসও তাই। ধোড়া সাপ নির্বিষ, তার কারণ বোঝাবার জন্যে দুটি কাহিনীতেই বিশেষ প্রযত্নে লক্ষ করি। নীলমণ্ডূকরূপী বোধিসত্ত্ব ও তার উপদেশ কাহিনীতে আরোপিত—মনসামঙ্গলে বরং কাহিনীটির ন্যায় রক্ষিত।

।। ২৯ ।।

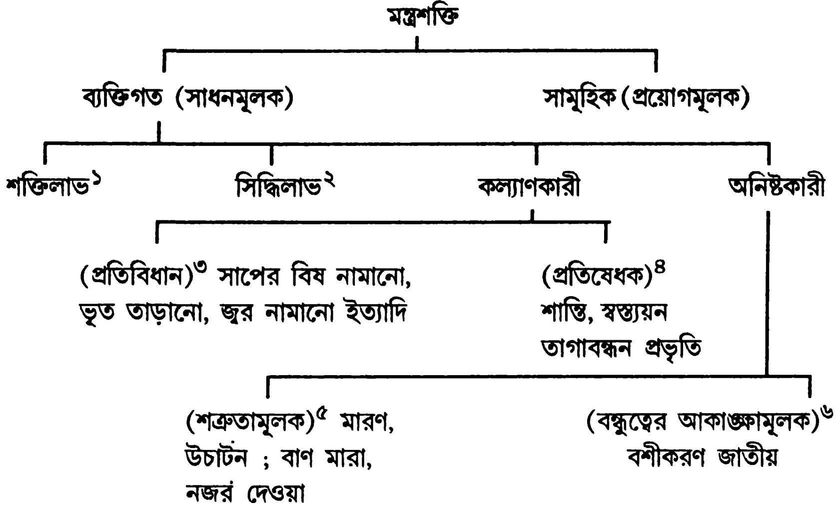
বিপ্রদাসের কাব্যে সর্প-কৃষ্টির নিরিখে বিষবিদ্যা

বিপ্রদাসের রচনায় সর্পবিষের প্রতিক্রিয়ার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। কখনও আছে বিষবিদ্যার গূঢ়তর সংবাদ। বিষদগ্ধ পুত্রদের পাগলপ্রায় ব্যবহার দেখে সনকা ভেবেছেন তারা হয়ত নেশাভাঙ করেছে :

বদন্তি সনকা জায়া না বুঝি পুত্রের মায়া
কিবা খায়্যা পাতিয়াছে কাপ।
চিন্তিয়া সনকা ভয় তেতুলি গুলিয়া দেয়
আনল জ্বালিয়া দেয় তাপ॥
তেতুলি-অগ্নিস্পর্শে সর্বাঙ্গ জ্বলিল বিষে
ছয় ভাই হরিল চেতন। (৮. ৬. ১৩৮-৩৯)

বিষবিদ্যার কথা আগে বলেছি। বিষবিদ্যার দুটি দিক— ১. মন্ত্রশক্তি ; ২. ওষধি প্রয়োগ। মন্ত্রশক্তি প্রয়োগের আবার দুটি দিক— ১. বিষের জন্মকথা বলে তাকে নিরস্ত করার চেষ্টা। আর ২. বিষ যাকে ভয় পায়, নাগ যাদের ভয় পায়— সেরকম কিছু শক্তিকে স্মরণ করে অভিচার।

এ বিষয়ে আমার একটি প্রবন্ধে (অচিন্ত্য বিশ্বাস 'মন্ত্রে মন্দ্রিত বাংলার কথাচিত্র' "লোকশ্রুতি"-১৬ ; লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র ; পশ্চিমবঙ্গ সরকার ; জুন ২০০০) বাংলার মন্ত্র-কে নিচের ছকে বিভক্ত করেছি :



[ঐ ; উক্ত ; ৬৮ পৃ .]।

মনসামঙ্গলে প্রধানত ৩ নং পদ্ধতিতে মন্ত্রের প্রয়োগ লক্ষ করেছি। সাপের বিষ নামানোর (সাধারণভাবে বিষ নামানো) জন্যে মন্ত্রধারকরা বিষের উৎস বা জন্ম কথা বলে নেন। অর্থাৎ বিষ-সম্পর্কিত জ্ঞান (তারা একে বলেন 'মহাজ্ঞান') তাদের অধিগত, একথা বারবার অদৃশ্য বিষ-শক্তিকে মনে করিয়ে দেন তারা। জয়নেত জাতীয় এক ধরনের সূক্ষ্ম বস্ত্র যা বুলিয়ে দিলে রোগীর বা বিষদগ্ধ প্রাণীর জীবনী-শক্তি ফিরে আসে। যেমন :

১. চাঁদের নখরা-বাগানটি বিষক্রিয়ায় ধ্বংস হবার পর, চাঁদের কৃত্য—

মহাজ্ঞান জপে মনে জয়নেত আচ্ছাদনে
নিমিষে নখরা জিয়াইল। (৫. ১২. ১৬৫)

২. শত শিষ্য মরে গেলে শঙ্কর ধন্বন্তরীর কৃত্য :

শিরে জয়নেত ছিল তুরিতে বাড়ায়্যা দিল
ধনা-মনা ধরে দুই পাশ।
শতেক কুমার জীল মনসা তরাস পাইল
(সুকবি রচিল বিপ্রদাস।।) (৬. ৭. ১২৯)

জয়নেত অর্থাৎ জয়পতাকা। বিষ বিদ্যকদের আত্মশ্লাঘা ও বিজয় ঘোষণার প্রতীক। হিউয়েন সাং ভারত ভ্রমণের সময় কামরূপ অঞ্চলে দেখেছেন হাতির পিঠে চেপে ডঙ্কা বাজিয়ে চলেছেন বিশেষ গোষ্ঠীর যোগী, সঙ্গে শিষ্যবর্গ। বিরোধী মতের পক্ষপাতী কোন যোগী-র দল ইচ্ছা করলে ডঙ্কায় হাত দিয়ে নিজের মত প্রকাশ অর্থাৎ বিতর্কে আহ্বান করতে পারেন। এরকম ঘটনা অষ্টাদশ শতাব্দীতেও দেখা গেছে— বিশেষত বৈষ্ণবধর্মীদের মধ্যে। রাধা স্বকীয়া না পরকীয়া— এ নিয়ে বিতর্ক হয়েছে প্রচুর। শেষে পরাজিত মতাবলম্বীরা সাক্ষী-সাবুদ রেখে 'জয়পত্র' লিখে

দিতেন। শঙ্কর ধন্বন্তরী 'সঙ্ক' নামক সর্পবিদ্যাকে অনুরূপে নির্জিত করেছেন। তার সঙ্গে শর্ত ছিল :

প্রতিষ্ঠা করিল দুহে করিতে বিবাদ।
যেই হারে রসাতলে যাব অবিবাদ॥
ধন্বন্তরি প্রতিসঙ্ক কহে বিদ্যমান।
যদি হার শিষ্য সঙ্গে পাতালে পয়ান॥ (৬. ১. ২৮-২৯)

শুধু তাই নয়, অতিরিক্ত শর্ত ছিল সঙ্ক হারলে তার কন্যা কমলাকে সম্প্রদান করবেন তিনি। ধন্বন্তরী পাবেন সঙ্কের নাম ব্যবহারের (হয়ত তার Clan-গত যাবতীয় ক্ষমতা প্রয়োগের) অধিকার। শেষ পর্যন্ত :

পরাজয় পাইল সঙ্ক জিনে ধন্বন্তরি।
পরাভব করি সঙ্ক আছে সেই পুরী॥ (৬. ১. ৪৫)

উক্ত জয়নেত অবশ্য সমুদ্রমন্থনের অব্যবহিত পরে ধন্বন্তরির সঙ্গেই ছিল। বিপ্রদাসের বর্ণনায় পেয়েছি :

জতনে অমৃত লৈয়া ব্রহ্মা তার তরে দিয়া
সিদ্ধি ঝুলি দিল জয়নেত।
বিষ্ণু অংশে অবতরি নাম হৈল ধন্বন্তরি
মথনে জন্মিল আশ্চম্বিত॥ (২. ১৪. ২৩৬)

বাংলার সর্পবিদ্যকদের ঝাপান-অনুষ্ঠানের বিবরণ থেকে ধন্বন্তরীর ব্যবহারের মিল খুঁজে পাই। একজন ক্ষেত্র-সমীক্ষক ঝাপানের বর্ণনা দিয়েছেন এইভাবে :

'রাঢ় অঞ্চলের বহু স্থানে প্রতি বৎসর শ্রাবণ-সংক্রান্তি দিনটিতে সর্প বিদ্যা বিশারদদের প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক সাপ খেলানো বা সাপের খেলা দেখানোর জন্য 'ঝাপানপর্ব' অনুষ্ঠিত হয়।

'প্রত্যেক অঞ্চলের এক-একটি নির্দিষ্ট স্থানে গুণীদল নিজ নিজ সাপের ঝাঁপি লইয়া নিজ নিজ বিদ্যার পরীক্ষা দেওয়ার জন্য সমবেত হন। গুণীরা চতুর্দোলায় বসিয়া সাপের খেলা দেখান বলিয়া এই পর্ব ঝাঁপান বলিয়া অভিহিত। বাঘ-ঝাঁপান ইহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য। চতুর্দোলার উপর রক্ষিত মাটির বাঘের পিঠে চড়িয়া গুণীরা সাপখেলা দেখান।

'আপন আপন দলের সংগৃহীত সর্পগুলির নানাবিধ খেলা দেখাইয়া প্রতিটি গুণীদল আপনাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিতে চান।' [*রাঢ়ের মন্ত্রযান* : মানিকলাল সিংহ, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া ; ১৩৮৫ বঙ্গাব্দ ; ৯২-৯৩ পৃ.]

মল্লরাজাদের পৃষ্ঠপোষণায় ঝাপান অনুষ্ঠিত হয়। তার চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন ড. সামন্ত তাঁর *বাঁকুড়া সংস্কৃতি পরিক্রমা* নামক গ্রন্থে। বিষ্ণুপুর শাখারি বাজার কালীমোড়ের চণ্ডীচরণ নন্দীর কাছ থেকে কিছু তথ্য সংগ্রহ করে ড. সামন্ত উপহার দিয়েছেন। বাঁকুড়ার রামপুর-তাঁতিপাড়ায় 'শ্রাবণ সংক্রান্তির পরের দিন' ঝাপান হত— এখন হয় না। (পশ্য : উক্ত গ্রন্থ; পুস্তক বিপণি ; ১৯৮১ খ্রি. ৫০ পৃ.)। ড. সোমনাথ চক্রবর্তী-র দেওয়া তথ্যের সঙ্গে উক্ত তথ্যের সামান্য কিছু পার্থক্য আছে। ড. চক্রবর্তীর বিবরণ অনেক প্রত্যক্ষ : 'ঝাঁপানের অন্য নাম 'মাখাল' পরব। আজকাল পরবের জাঁকজমক অনেকখানি কমে এলেও ভাদ্র সংক্রান্তির দিন শাঁখারী বাজারের পথ ধরে গড়, পরিখা, বিশাল রাজফটক পেরিয়ে ঝাঁপান পরবের শোভাযাত্রা

এসে থামে মৃন্ময়ী মন্দিরের লাগোয়া একালের রাজবাড়ির দরজায়। বাঁকুড়ার বহুগ্রামের সাপুড়ে ওস্তাদেরা এদিনটার জন্য সারা বছর ধরে তিথি গোনে। মোষের গাড়ি কিংবা চতুর্দোলা সাজিয়ে তার ওপর অসংখ্য সাপের ঝাঁপি নিয়ে বসে সর্পবিদ্যার ওস্তাদরা। গাড়ি কিংবা চতুর্দোলাতে বাঘ সিংহের প্রমাণ আকারের মাটির মূর্তি রাখা থাকে। শোভাযাত্রা রাজবাড়ির দরজায় থামলে তখন সাপের খেলা শুরু। সঙ্গে চলে মন্ত্রতন্ত্র, বাণমারা আর মন্ত্রশক্তি কাটানোর উতোর চাপান।......ঠিক সন্ধ্যার সময় রাজবাড়ির উঠোনে সাপ খেলানো ওস্তাদরা নিয়মমতো এসে জড়ো হয়। হাতে থাকে বাছাই-করা জাত সাপের ঝাঁপি। রাজবাড়ির একালের প্রধান পুরুষকে আঁশেপাশের সব গ্রামের বড় ওস্তাদরা এদিন ঘটা করে সাপ দেখায়। রাজদর্শনের জন্য বাছাই বিষধর সাপের ফণায় দেওয়া থাকে সিঁদুরের ছাপ, মনসার প্রতীক হিসাবে পুজো পায় একখণ্ড শিলা। প্রতিবছর ঝাঁপান পরবে রাজামশায়ের সর্পদর্শন আর মনসাপূজোর শেষে ওস্তাদদের দেওয়া হয় প্রসাদী পান্তাভাতের থালা আর কিছু নগদ খুচরো পয়সা। রাজবংশের উত্তরাধিকারীর হাত থেকে পাওয়া টাকা বা সিকিটা সাপখেলানো ওস্তাদদের কাছে বহুমূল্য শিরোপার মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কার।' [*মল্লভূমি* ; সোমনাথ চক্রবর্তী; বুকল্যান্ড প্রাইভেট লিমিটেড; কলকাতা ; ১৯৯৭; ২৭ পৃ.]।

সর্পবিদ্যকদের বিদ্যা পরীক্ষা, প্রদর্শন ও প্রদানের দিন ঝাপান অনুষ্ঠান করা হয়। রাঢ়বঙ্গের বাইরেও বহু অঞ্চলে এরকম বিশেষ বিশেষ দিন নির্ধারিত আছে। মনসা পূজা ও অনুরূপ কোন দেবীর পূজা অনুষ্ঠানের সময় সর্পবিদ্যকরা সমবেত হয়— প্রদর্শন করে তাদের চমৎকার। নদীয়া জেলার চাকদহের নিকটবর্তী বেলে বিষ্ণুপুর-শালকী গ্রামে শ্রাবণ সংক্রান্তিতে অনুষ্ঠিত হয় খেদাইতলার মেলা। খেদাই-দেবী রাখালদের দ্বারা পূজিতা। সর্পদেবী। তার ক্ষেত্র একটি বড় মরা-গাছ। একদা এটি কোন বকুল গাছ ছিল। এই পূজা উপলক্ষে প্রচুর সর্পবিদ্যক আসে বিদ্যা জাহির করতে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের স্নাতকোত্তর শ্রেণীর 'লোকসাহিত্য ও মৌখিক রীতি' বিশেষ পত্রের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে খেদাইতলার 'সাপের মেলা'য় যাওয়ার সূত্রে। সাক্ষাৎ হয়েছিল কয়েকজন সাপুড়িয়ার সঙ্গে— তারা নানা অঞ্চল থেকে আসেন। এদের মধ্যে কেউ কেউ ধর্মে না-হিন্দু না-মুসলমান। বিষয়টি সমাজতাত্ত্বিকদের নিশ্চয় আকর্ষণ করবে। আমাদের ধারণা মনসামঙ্গল সাহিত্যধারার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর একাংশ মুসলমান হয়ে গেছেন। কারণ খুব স্পষ্ট করে বলা সম্ভব নয়, হয়তো উচ্চবর্গের অত্যাচার, হয়ত্রে উচ্চবর্ণের প্রতি ঘৃণা। মনসাপূজার সঙ্গে যুক্ত জনসাধারণের এইরকম প্রবণতার প্রমাণ হাসান-হোসেন-পালার মধ্যে সামান্য আছে। এ নিয়ে আলোচনা পরে উপযুক্ত অবসরে করব। যাই হোক, একজন ক্ষেত্র-সমীক্ষক বর্ণনা দিচ্ছেন: 'মনসাপূজোর দিন আশপাশের গ্রামের লোক ভেঙে পড়ত এই শালকীতে। অনেকখানি জায়গা নিয়ে পুজোর নৈবেদ্য সাজানো হোত। পুরোহিত মন্ত্র পড়তেন আর সাপ এসে নৈবেদ্য খেয়ে যেতো। যতক্ষণ পুজো হোত, গাছের ডালে নানান রকমের সাপ ঝুলতো। পূজা শেষে সাপে মুখ দেওয়া প্রসাদ খাবার জন্য কাড়াকাড়ি পড়ে যেতো। মা মনসা স্বয়ং এসে নাকি নৈবেদ্য প্রসাদ কোরে দিয়ে যেতেন। এই প্রসাদ খেয়ে কারও কোনদিন কোন ক্ষতি হয়নি।' [*মেলায় মেলায় আমার দেশ* : ভবেশ দত্ত ; ভোলানাথ প্রকাশনী ; কলকাতা; ১৯৮৪ ; ২৯ পৃ.]।

বাংলার সর্পবিদ্যকরা অনেকেই মুসলমান। 'মন্ত্রে মন্ত্রিত বাংলার কথাচিত্র' প্রবন্ধে আমি অনুরূপ কিছু মন্ত্রের উল্লেখ করেছি, মন্ত্র যাদের কাছ থেকে মিলেছে তারা মুসলমান। যেমন—

১. জনাব মোহাম্মদ সাইদুর সংগৃহীত, মোহম্মদ ইসমাইল সরকার-প্রদত্ত (গ্রাম-বিদ্যানগর, ডাকঘর-করিমগঞ্জ, জেলা- মোমেনশাহী) মন্ত্র : 'শঙ্কর ডঙ্কুর/ভাই মন চলিতে পুর/আঞ্চলে বিষ চলে যায়'। [উক্ত ; ৮২ পৃ.]।

২. ঐ ; 'শঙ্কুর ডঙুরে ভাই/কোন কোন সাঁপে কামড়াইছে তরে/কউ আমার চাঁই'। (উক্ত; ৮১ পৃ.)

৩. ঐ ; 'সুবাসিত গঙ্গার জল/বাম হাতে তার ঝাড়ি/......।' [উক্ত ; ৮২ পৃ.]

৪. জনাব এস. এম. সামীয়ুল ইসলাম সংগৃহীত মেহাম্মদ দছিম উদ্দীনের কাছ থেকে পাওয়া একটি মন্ত্রে নেতা ধোপানীর কথা পাওয়া গেছে। মন্ত্রধারক দছিমউদ্দিন রংপুর জেলার বেলকা গ্রাম (ডাকঘর)-এর বাসিন্দা। মন্ত্রটির একাংশ :

ওপারে নিতাই ধোপানী কাপোড় কাচে।
পদ্মার পাতত বিষ ভাসে॥
আমি গুরু (১) শিষ।
আঞ্চলে বাদিলাম ফালনার শরীলের কালকুটি নাগের বিষ॥

(১ এখানে 'তুমি' বা ঐ রকম কোন শব্দ থাকতে পারত)।

[উক্ত ; ৮৩ পৃ.]

৫. জনাব মোহাম্মদ সাইদুর সংগ্রহ করেছেন বিন্ন গাঁও কিশোরগঞ্জের মোহাম্মদ ইসমাইল সরকার (গ্রাম বিদ্যানগর, ডাকঘর করিমগঞ্জ)-এর কাছ থেকে অনুরূপ একটি মন্ত্র :

ধোবার ঝি কাপড় কাচে।
বিষের শার পানিতে ভাসে॥
বিছমিল্লাহের রাহমানের রাহিম।
ফালনার মস্তকের কালকুটি বিষ
আমার আঁচলের মধ্যে আয়
আঁচল ছাড়িয়া যদি উপরে বারছ
পদ্মা দেবীর মাথা খাছ॥ [উক্ত ; ৮৪ পৃ.]।

৬. রাজশাহী জেলার কৃষ্ণগোবিন্দপুর গ্রামের (রামচন্দ্রপুরহাট ডাকঘর) জনাব কাজেমউদ্দীন, ঐ গ্রামেরই খবিরুদ্দিন মোল্লার কাছ থেকে এই মন্ত্র সংগ্রহ করেছেন :

ল্যাত্যান ধোব্যান্ কাপড় খাচে
পদ্ম পাতে বিষ ভাঁসে।
ধোব্যান তুই গুরু, আমি তোর শিশো
অঞ্চলে বান্ধিয়া নিলাম
[১]হরির[১] অঙ্গের যত কালকুট সাপের বিষো॥

(১. হরির— অর্থাৎ উদ্দিষ্ট ব্যক্তির)

[উক্ত ; ৮৪-৮৫ পৃ.]

৭. জনাব আবদুস সাত্তার চৌধুরী (গ্রাম : দক্ষিণ হুলাইন, ডাকঘর : এয়াকুব দণ্ডী) হাফেজ আহম্মদ (গ্রাম ও ডাকঘর বুড়িশ্চর, জেলা চট্টগ্রাম) থেকে সংগ্রহ করেছেন একটি মন্ত্র— সেটি অবশ্য জ্বর ছাড়ানোর মন্ত্র। (ঐ ; ৯০ পৃ.)। মোট কথা, সারা বাংলাতেই মন্ত্রধারকদের একটি বড় অংশ মুসলমান। এদের সঙ্গে মনসা-মঙ্গল সংস্কৃতির সম্পর্ক খুব নিবিড়।

ড. সোমনাথ চক্রবর্তী সর্পবিদ্যকদের কিছু কৃষ্টিকথার পরিচয় দিয়েছেন। বিষ্ণুপুরের কেওটপাড়ার শ্যামাপদ ধীবরের কাজ 'সাপ খেলানো আর মন্ত্রতন্ত্রের বিদ্যাশিক্ষা'। 'পল্লীর মনসা মন্দিরের দেখাশোনার ভার এরই হাতে।' (*মল্লভূমি* ; ২৭ পৃ.)। তিনি আরও জানিয়েছেন—'নলডাঙ্গা সংক্রান্তিতে চাষীরা ধানের ক্ষেতে নল বাঁধে। ঠিক তখনই সাপের ঝাঁপি নিয়ে গুনিন বা ওস্তাদরা মাঠে যায়। প্রতিবছর নিয়মিত এই তিথিতে সাপ ছেড়ে দিতে হয়। ধরা সাপের ওপর ওস্তাদদের টান থাকে। তাই সাপের ঝাঁপি খুলে ধরা সাপ ছেড়ে দেবার আগে গুনিন ঘরের বৌ-মেয়েরা সাপের ফণায় আর সারা শরীরে আলতা-সিঁদুরের ছাপছোপ দেয়। নানা রঙও লাগায়, যাতে চিহ্নটুকু দেখে পরের বছর যদিবা বোঝা যায় কার পোষা সাপ এটা। সাপ ধরার মরসুম শুরু হয় বৈশাখের শেষাশেষি। ...পুরনো সাপের সন্ধান পাওয়া বড় কঠিন, তাই ওস্তাদেরা সবাই বিশ্বাস করে এরকম কিছু ঘটলে তার ভাগ্য ফিরে যাবে রাতারাতি।' [উক্ত; ২৮-২৯ পৃ.]

আফ্রিকার কোন কোন এলাকায় সাপকে পবিত্র ভাবা হয় ; তবে কোথাও সাপ খেলানো পেশার মানুষ আছে কিনা জানি না। ভারতের কয়েকটি জাতিগোষ্ঠী সাপ খেলানোকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছে। উত্তর ভারতে সাপ খেলা দেখায় যারা তাদের জাতি (caste) নাম 'বাঙ্গালী'। জীবনে একবার অন্তত কামরূপে যাবে তারা। ড° আশুতোষ ভট্টাচার্য লিখেছেন : ...'এক কালে বাঙ্গালী সাপুড়েরা সারা ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়া জীবিকা অর্জন করিত; এখনও বহু স্থানেই তাহাদেরই বংশধরগণ তাহাদের জাত-ব্যবসায় পালন করিয়া যাইতেছে। উত্তরপ্রদেশে এক শ্রেণীর সাপুড়িয়া আছে, তাহারা এখনও 'বাঙ্গালী' বলিয়া পরিচিত ; কিন্তু তাহাদের মাতৃভাষা এখন হিন্দী।' [*বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস* ; উক্ত ; ২৭০ পৃ.]।

আইন-ই-আকবরী-তে সর্পবিদ্যা-কুশল বাঙালিদের কথা বলা হয়েছে। উত্তর ভারতের নাগ-বিদ্যা শিক্ষা করা 'অহিতুণ্ডিক'-দের বিচরণ ক্ষেত্র বহু পূর্ববর্তী। জাতকে তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। 'বিষবান্তজাতকে' বিষবিদ্যার সামান্য পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। স্বয়ং বোধিসত্ত্ব 'বিষবৈদ্য' বংশে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। এক ব্যক্তিকে সাপে কামড়ায়— বোধিসত্ত্ব সেই সাপটিকে মন্ত্রশক্তির সাহায্যে ডেকে আনিয়ে তার দ্বারাই বিষ শুষে নেওয়ানোর চেষ্টা করেন ; সাপ রাজি হয় না। বোধিসত্ত্ব তাকে মরণের ভয় দেখান ; সাপ তাতেও রাজি নয়। 'পুড়িয়া সরিতে হয় সেও ভাল, তথাপি পরিত্যক্ত বিষ পুনর্বার গ্রহণ করিব না।' (*জাতক* ; উক্ত ; প্রথম খণ্ড; ১৪২ পৃ :)। বোধিসত্ত্ব তখন 'ঔষধ ও মন্ত্রবলেই বিষ বাহির করিলেন।' [ঐ ; ১৪৩ পৃ.]। এরকম প্রসঙ্গ থেকে বোঝা যায় সর্পবিদ্যা ভারতে বহু প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে।

দক্ষিণ ভারতে সর্পবিদ্যার প্রচলন আছে। তার সঙ্গে বাংলার সর্পবিদ্যার সম্পর্ক কতখানি তা নির্ণয় করা অসম্ভব। তবে সর্প-সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য অনুসরণ করার ক্ষেত্রে সামান্য কিছু তথ্য সংগ্রহ করা যেতে পারে।

১. ড. অম্বালিকে হিরিয়াম্মা তাঁর *Studies in Karnataka Folklore* গ্রন্থের একাংশে লিখেছেন সাপের কামড়ে কেউ বিষদগ্ধ হলে মন্ত্রধারকের কাছে যে খবর নিয়ে যায়— 'a man who brings the news of the snake bite to him and he strikes three blows with his left hand on the messenger. This person should declare that the poison

is all gone, at which statement all the poison is supposed to get transferred to the left hand of the mantra practitioner, who eventually gets rid of it with magical powers'. (Studies in Karnataka Folklore ; Prasaranga, Karnatak University, ধারওয়াড় ; ডিসেম্বর ১৯৯৯ ; 85 পৃ.)।

২. কেরলেও আছে অনুরূপ কিছু লোকবিশ্বাস। 'The Physician never goes to the patient to examine him. Before the patient is brought to the physician's house, the messanger rushes to the physician to make the arrangements for the treatment. By the intelligence and the *sastrik* know-how, the 'Visha Vaidya' (physician) can foretell whether the victim is already dead or will survive.' (*Folklore of Kerala* ; Kavalam Narayan Panikkar ; উক্ত ; ১৯৯১; 57-58 পৃ.)। কেরলের লোকবিশ্বাস, সাপদের মধ্যে চারটি বর্ণ— ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। ব্রাহ্মণ-সাপ সাধারণত কামড়ায় না ; কামড়ালে বাঁচার সম্ভাবনা খুব কম ('The higher caste serpent never bites, unless it is a dire necessity dictated by providence. In case of such bites, the chances of cure will be rare.'—58 পৃ.)।

৩. অন্ধ্রপ্রদেশ সর্পবিদ্যকদের বলা হয় 'পামুলাবাল্লু'। তাদের কেউ কেউ বাঙালি সর্পবিদ্যকদের মতোই মুসলমান— 'by mesmerists belonging to certain Muslim Communities.' (*Folk Performing Arts of Andhra Pradesh* : M. Nagabhushana Sarma ; Telugu University, Hyderabad ; ১৯৮৫ ; 134 পৃ.)। 'These mesmerists (especially the snake-charmers) also make a snake and mongoose fight. The snake dies, but the mesmerist brings it back to life. The final trick is to allow a snake bite an on-looker and when he starts crying out of pain, remove the pain by applying a root of a tree. He then sells the roots for snake bite and scorpion-bite. (ঐ ; উক্ত)।

৪. রেভারেন্ড হেনরি হোয়াইটহেড সর্প-দেবতার কিছু পরিচয় সংগ্রহ করেছেন তাঁর *Village Gods of South India* গ্রন্থে। সেখান থেকে উদ্ধার করছি কিছু তথ্য। বেল্লারির দুর্গাম্মার মন্দিরে একটি বৃহৎ সাপ থাকার কিংবদন্তী শুনেছেন তিনি · 'about forty years ago, a large snake lived in the ruined wall behind the shrine', সেটিকে নাকি পূজার উপাচার উৎসর্গও করা হত। হোয়াইটহেড যখন এই তথ্য সংগ্রহ করেছেন সে সময় অবশ্য সেটিকে তেমন দেখা যেত না— 'Apparently it very rarely makes its appearance now.' (*Village Gods of South India* ; উক্ত ; 75 পৃ.)। এই সর্পরূপী দেবতা বা দেবতার প্রতিনিধিকে ধারাবাহিক কোন পূজা-সংস্কৃতির অন্তর্গত করে আলোচনা করা যায় না।

মানে মঞ্চি-মন্দির এক বৎসরের জন্যে বন্ধ থাকে— বার্ষিক উৎসবের দিন খোলা হয়। মন্দিরে একটি সাপের গর্ত দেখা যায়— 'Which is said to be the abode of an unknown serpent, to which the name of Mane Manchamma is given.' (উক্ত ; ঐ ; অদৃশ্য কোন সাপের দেবীত্ব স্মরণ করায় কেরলের 'সর্পকোয়া'র কথা। এনিয়ে আগে আলোচনা করেছি। এখন পুনরুক্তি করছি না।

॥ ৩০ ॥

সর্পদেবতার উৎস সম্পর্কে প্রস্তাব ও আলোচনা

সর্পদেবতার ধারণা বাংলায় উত্তর ভারত থেকে এসেছে, একথা বলার মতো যথেষ্ট প্রমাণ নেই। ফার্গুসেন মনে করেছিলেন সর্পপূজা ভারতের বাইরে থেকে এসেছে। চণ্ডীগড়ে এবং পাঞ্জাবের আরও দুয়েকটি জায়গায় সর্পদেবী রূপিণী মনসার মন্দির আছে। চণ্ডীগড়ের মনসা মন্দিরটি ইউরোপের নানা দেশে ছড়িয়ে থাকা জিপসিদের তীর্থক্ষেত্র। আর আছে হরিদ্বারের মনসা মন্দির। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য যুক্তিযুক্ত ধারণা পোষণ করেছেন : '.....সর্পপূজা দ্রাবিড় সংস্কৃতিরই একটি বিশেষ অঙ্গ ছিল, ইহার ব্যাপক প্রভাববশত পরবর্তীকালে আর্যসমাজও ইহা নিজ সভ্যতার মধ্যে বহুলাংশে গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছে।' (*বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস* : উক্ত ; ২৫৪ পৃ.)। এ মত অনেকটাই গ্রহণযোগ্য, তবে আমাদের মনে হয়, উত্তর-পূর্ব ভারতে কিরাত জনগোষ্ঠীর কথা, বাংলার সন্নিহিত অঞ্চলের নিষাদ-দের কথাও এ প্রসঙ্গে ভুলে যাওয়া উচিত হবে না। এ বিষয়ে কিছু উদাহরণ আগে দিয়েছি।

খাসিদের মধ্যে সর্পদেবতা 'উ-থেল্‌ন'-এর বিস্তৃত বর্ণনা পাচ্ছি বিকাশচন্দ্র গোঁহাই-এর *Human Sacrifice and Head-Hunting in North-Eastern India* গ্রন্থে। উ-থেল্‌ন একটি অতিবৃহৎ ও ভয়ঙ্কর সাপ ('a gigantic snake')। কিংবদন্তী অনুসারে চেরাপুঞ্জি অঞ্চলে উ-থেল্‌ন-এর প্রকোপ খুব বেশি হয়— দলে দলে মানুষ তার আহার হয়। শেষ পর্যন্ত এক বীর তাকে সুকৌশলে হত্যা করে : 'A brave man took a large number of goats with him and offered them one by one to the giganti cmonster, who later on became friendly with him and learnt to open mouth at a word from the man to receive lumps of flesh thrown in. After gaining the confidence of the snake the man, at the advice of the gods, heated a lump of iron red hot, and induced the snake of the usual signal to open its mouth. When the latter did so, he throw the red hot piece of iron and killed it.' (*Human Sacrtfice and Head-hunting in North-Eastern India*' : বিকাশচন্দ্র গোঁহাই ; Lawyer's Book Stall, Gauhati, আসাম; ১৯৭৭ ; 18 পৃ.)। উ-থেল্‌ন-কে হত্যা করার পর সাপটির শরীর টুকরো টুকরো করে ফেলা হয়— ঐ ধীর খাসিয়াদের নির্দেশ দেয় 'to eat the parts distributed among them.' এইভাবে ঐ অঞ্চল থেল্‌ন-এর ভয়ঙ্কর অত্যাচার থেকে মুক্তি পায়। 'but a small portion of the snake was left which nobody would eat, and from this piece sprang up numerous thelns which infest cherra and its neighbourhood.' (ঐ; উক্ত; 18-19 পৃ.)। থেল্‌ন-কে সন্তুষ্ট করতে ঘরে ঘরে নর রক্ত উৎসর্গ করা হয়। সামান্য চুল, নখ উৎসর্গ করাই যথেষ্ট। খাসিয়াদের বিশ্বাস, এই প্রক্রিয়ায় পরোক্ষভাবে বলি-প্রদত্ত মানুষটি অচিরেই মারা যাবে। কোথাও কোথাও উৎসর্গীকৃত মানুষের মাথায় কাঠের মুগুর দিয়ে আঘাত করে হত্যা করে পূজক। 'He kills the victim with a wooden club.' [উক্ত ; 19 পৃ.]

Encylopedia Americana-র ২৫ খণ্ডে ফ্রান্সিস লি উটলে লিখেছেন, 'Snake Cults and Worship' শীর্ষক নিবন্ধ। জেমস আর ওয়ালিন তার 'Having The Statis Baby' গ্রন্থে দেখিয়েছেন মেক্সিকোর সর্পদেবতা হুইজিলোপোচ্‌টলি (Huitzilopochtli)-র পূজার উদ্দেশ্য দুর্দিনের পরিস্থিতি থেকে উত্তীর্ণ হওয়া। 'In Mexico, where serpent worship was

prevalent, the image of the serpent deity, Huitzilopochtli, was dressed in a snake skin during times of danger.' [James R. Wallin : *The Egyptian Variant of the Geocentric Theory of the Universr* of the Geocentric Theory of the Universe' গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগ 'Extrapolations of the Old Sacrifice'-এর 68 পৃ ; South San Francisco ; ১৯৭৯]

সাপের খোলস বদলানোর বিষয়টি সমস্ত পৃথিবীতে আদিম জনগোষ্ঠীগুলির মনোজগতে স্পষ্ট ছাপ ফেলেছিল। তাদের মনে হয়েছে মানুষ মরে যায়, কারণ তার চামড়া ক্ষয়ে যায়! ....'people died because human skin was too thin. If it wear hard, people would live forever.' (ঐ ; উক্ত ; 69 পৃ.)। মধ্য আমেরিকার হুইটোটো (Huitoto)-দের মধ্যে বিশ্বাস, ঈশ্বর মানুষকে পুনর্যৌবন দান করতে পারেন, চামড়া বদলিয়ে। রোরো (Roro) -দের মধ্যে সংস্কার আছে, সাপের মতো খোলস বদলাতে পারলে অমরত্ব (immortality) লাভ করা যেতে পারে। (Robert Briffault-এর *The Mothers,* ম্যাকমিলান, নিউইয়র্ক, ১৯২৭; দ্বিতীয় খণ্ড 641-44 পৃ : পশ্য)

জল রক্ষক ও বৃষ্টি প্রদানকারী সাপের কথা লিখেছি। জলতলে যাবার পর সাপ নাকি রূপ বদলায়— 'In Vietnam, Russia, Melanesia and probably elsewhere, snakes which lived underwater could assume human form' [James R. Wallim ; উক্ত; 71 পৃ.]

সাপ সৌভাগ্য দান করে, ধন রক্ষা করে, গুপ্তধনের সঙ্গে সাপের সম্পর্ক নিবিড়— এই ধরনের সংস্কার, পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র। সাপের মাথায় মণি, যা বহুমূল্য ('সাতরাজার ধন') সম্পর্কিত কিছু সংস্কার ও কিংবদন্তী হয়ত এই ভাবনারই পরিবর্তিত রূপ। রূপান্তরিত রাজকুমার সাপের চেহারায় এক নারীকে বিবাহ করছে— সেই নারী সাপের মণির সাহায্যে জলতল ভেদ করে উঠে আসছে, এরকম একটি চমৎকার রূপকথা আছে বাংলায়। রেভারেন্ড লালবিহারী দের ভাষ্য : 'One day, while her husband was asleep as usual after his noonday meal, she rushed out of the palace with the snake-jewel in her hand, and came to the upperworld. ....The old woman, while in the act of washing the hair of the Princess, notice the bright jewel in her hand, and said— "Put the jewel here till you are bathed." In a moment the jewel was in the possession of Phakir's mothers, who wrapped it up in the cloth that was round her waist. Knowing the princess to be unable to escape, she gave the signal to the attendants in waiting, who rushed to the tank and made the princess a captive.' [*Folktales of Bengal* : Lal Behari Dey ; Book Society of India Ltd; কলকাতা ; 26-27 পৃ :]

সাপের চেহারা পুং-লিঙ্গের অনুরূপ। সেজন্যই সম্ভবত সাপকে প্রজননের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে ভাবা হয়েছে। সাপের এই বিশ্বব্যাপী ধারণার সমাপতনকে Phallic worship বলা যেতে পারে। শিবপূজাকে কেন্দ্র করেই অবশ্য Phallic Worship অধিকতর কেন্দ্রীভূত হয়েছে। মনসা পূজার সঙ্গে বিষয়টি আড়ালে থেকে যেতে পারে। তবে এ বিষয়ে খুব নিশ্চিতভাবে কিছু বলার মতো উপকরণ নেই।

।। ৩১ ।।

মনসামঙ্গলের তুলনায় ব্রতকথা ও রূপকথা

সর্প-কৃষ্টির প্রসঙ্গে আর দুটি বিষয় আলোচনা করে নেব। মনসামঙ্গল কাহিনীতে মনসা-ব্রতের (নাগপঞ্চমীর দিন অনুষ্ঠেয়) একটি কাহিনী মোটামুটি সারা বাংলায় প্রচলিত হওয়া সত্ত্বেও গ্রহণ করা হয়নি। সেই কাহিনীটি সম্পর্কে আমার অধীনে মনসামঙ্গল বিষয়ে গবেষণা করেছেন— শ্রীমতী সঞ্চিতা দাশ, উত্তরবঙ্গের নানা অঞ্চলে সন্ধান করে জানিয়েছেন— এ কাহিনীটি অবিকৃতভাবে বলাটা নাকি বাধ্যতামূলক। ব্রতিনীরা সে কাহিনী ছোট করে বলতে চান না কিছুতেই। কাহিনীটি এই—

সদাগরের সাত পুত্রেব সাত বউ ; ছোট বউ ছাড়া অন্যদের পিত্রালয় থেকে তত্ত্ব আসে। শাশুড়ি ছোট বউ-এর উপর ক্ষুণ্ণ। বর্ষার দিনে সবাই অনুরোধ করলে গর্ভবতী ছোট বউ বলল সে পান্তাভাত দিয়ে মাছের টক খাবে। বউয়েরা সন্ধ্যার সময় পুকুরে গা ধুতে গেল। ছোট বউ জলের মধ্যে ছোট মাছের ঝাঁক পেল। জায়েরা খুশি, যাক— ছোট বউয়ের আশা পূরণ হল। ছোট মাছগুলো বড় হল— ছোট বউ দেখল সেগুলো সাপ হয়ে গেছে। ছোট বউ এগুলোকে দুধ-কলা দিয়ে পুষতে লাগল। কিছুদিন পর সাপরা মনসাকে গিয়ে ছোট বউয়ের প্রশংসা করল। মনসা তাদের কথা শুনে স্থির করলেন ছোট বউকে নিয়ে আসবেন। শাঁখা-সিঁদুর নিয়ে চললেন তিনি।[১] ছোট বউয়েব কাছে গিয়ে বললেন, তিনি তার স্বামী। কিছুদিনের জন্যে নিয়ে যেতে চান। রথে চড়ে মনসা চললেন সদাগরেব ছোট বউকে নিয়ে। মনসার নির্দেশ— রথের ওপর চোখ বন্ধ করে থাকতে হবে ; ওখানে পৌঁছে মনসার আরও নির্দেশ— দক্ষিণ দিকে তাকানো যাবে না।[২] মনসার স্থলে ছোট বউয়ের কাজ, অষ্টনাগ— যাদের সে বড় করে তুলেছে, তাদের জন্য দুধ-জ্বাল দেওয়া— মনসার পূজা করা। একদিন দক্ষিণে তাকিয়ে ছোট বউয়ের চোখ আটকে গেল। দেবী অপরূপ ভঙ্গিতে নাচ করছেন। দুধ জ্বাল দেওয়া ভুলে গেল ছোট বউ। পরে তাড়াতাড়ি দুধ গরম করে নাগদের ক্ষিদের সময় পরিবেশন করতেই তাদের মুখে ছ্যাঁকা লাগল। নাগরা সঙ্গে সঙ্গে ছোট বউকে দংশন করতে চাইল। মনসা নিষেধ করলেন— তার আবাসে দংশনের দরকার নেই ; দংশন যদি করতেই হয় তবে মর্ত্যলোকে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে করুক। নাগরা রথে করে ছোট বউকে নিয়ে চলল। মনসা তাকে বলে দিলেন— মর্ত্যে গিয়ে যেন খুব ঘটা করে সাপদের সুখ্যাতি করে সে। ছোট বউয়ের অর্ধেক শরীরে অলঙ্কার পরিয়ে পাঠালেন মনসা। শ্বশুর বাড়িতে সবাই অবাক— তারা নিন্দা করতে থাকল। ছোট বউ— তার অষ্টনাগ ভাইদের প্রশংসা করল, তারা অর্ধেক গয়না দিয়েছে, বাকি অর্ধেকও নিশ্চয় দেবে। আড়াল থেকে দংশন করবে ভেবেছিল নাগরা তার মুখে প্রশংসা শুনে তারা খুশি। মনসাকে বলে বাকি অলঙ্কারও জোগাড় করে দিল তারা। মনসা আবির্ভূত হয়ে বললেন, তিনি দেবী মনসা, ছোট বউয়ের মাসী নন— সিজ মনসা গাছে থাকেন, দশহরা ও নাগপঞ্চমীর সময় তাকে পূজা করতে

(১. এই অংশে মনসার ব্যবহারের সঙ্গে বিপ্রদাসের রচনার মুক্তাসরোবরে বেহুলা-মনসা বিতর্ক প্রসঙ্গ টির সামান্য মিল রয়েছে। ২. গুরুভায়ুর মন্দিরে 'পঞ্চবাদ্য' অনুষ্ঠানে বাদ্য-কাররা দেবতার দিকে তাকান না— তারা চোখ বেঁধে কাজটি পারেন। কামাখ্যা দেবীর মন্দিরে এরকম অনুষ্ঠানে পুরোহিতকে চোখ বেঁধে কৃত্য সারার কথা শোনা যায়। মালদহের 'গোহিলা চণ্ডী' দেবীকে দেখবার পর বোবা হয়ে যাওয়া, বাঁকুড়ার 'কালীবুড়ি' (মনসা স্বরূপিণী)—র বর্ণনা দেবার পর মৃত্যু ঘটা— প্রভৃতি এই সূত্রে স্মরণ করতে পারি।)

হবে। নাগপঞ্চমীর দিন ঐ গাছ এনে পূজা করতে হবে— ভাদ্রমাসে অরন্ধনের ব্রত পালন করতে হবে। তাহলে সাপের ভয় থাকবে না। এই ব্রতকথাটি উত্তর ও পূর্ববঙ্গে প্রায় একইরকমভাবে প্রচলিত। রাঢ়ে এর সামান্য ব্যতিক্রম আছে। অষ্টনাগ এখানে মাছ রূপে নয়— ডিমের চেহারায় দেখা দিয়েছে।

এই কাহিনীর সঙ্গে মনসামঙ্গল কথার বাহ্যিক মিল নেই। আন্তরিক মিল— সদাগর পরিবারের কাহিনী এটি। আর নায়িকা বেহুলারই মতো ছোট বউ।

মানিকলাল সিংহ রাঢ় বাংলার একটি প্রচলিত কিংবদন্তী শুনিয়েছেন, তাঁর *রাঢ়ের মন্ত্রযান* নামক বইতে তা সংকলিত হয়েছে। ছান্দোড়ের বোথ পুষ্করিণীতে গোপীনাথপুর ও বৃন্দাবনপুরে বসবাসকারী লাহা পরিবারের 'এক প্রাচীন পুরুষ' বলদের পিঠে মাল চাপিয়ে আসছিলেন। বোথ পুষ্করিণীর ধারে এসে তৃষ্ণার্ত হয়ে জল পান করতে গিয়ে দেখেন 'একটি লোহার শিকল' তার দিকে এগিয়ে আসছে— ভয় পেয়ে একটা গাছের আড়ালে গিয়ে দাঁড়ালেন। কিন্তু 'শিকলটি অগ্রসর হইয়া আসিয়া বৃক্ষসমেত তাঁহাকে জড়াইয়া ফেলিয়া জলের মধ্যে তাঁহাকে নামাইয়া ফেলিল এবং তাঁহাকে টানিয়া জলের মধ্য দিয়া লইয়া চলিল।' জলের ভেতর দেবী মনসা— তার সুরম্য প্রাসাদ, রাস্তাঘাট, লোকজন প্রভৃতি দেখতে পেলেন তিনি। চম্পাই নগরীতে গেলেন লাহা— পাতালপথেই। দেখলেন মন্দির। সাতদিন সেখানে কাটিয়ে দেবীর নির্দেশে লাহা গেলেন তাঁর গ্রামে ; দেবী জানালেন : 'এবার তুমি তোমার গ্রামে ফিরিয়া যাও। আমার পূজা প্রবর্তন কর। যতদিন নরলোকে দেবী মনসার পূজা প্রচলিত থাকিবে ততদিন তুমি বাঁচিয়া থাকিবে। কিন্তু সাবধান, তুমি তোমার এই অবস্থানের কথা, আমার কথা, চম্পাই নগরীতে যাওয়া এবং অবস্থানের কথা কদাচ প্রকাশ করিবে না। যে মুহূর্তে তুমি রহস্যালোকের কথা প্রকাশ করিবে সে মুহূর্তেই তোমার মৃত্যু হইবে।' (মানিকলাল সিংহ : *রাঢ়ের মন্ত্রযান* ; উক্ত ; ৬১ পৃ.)। স্বীকৃত হলেন লাহা। তাকে আবার লোহার শিকল পুষ্করিণীর পাড়ে রেখে গেল। বলদ এর মধ্যে মাল-সহ লাহা-র বাড়ি পৌঁছে গেছে। আত্মীয়স্বজন তাকে বারবার প্রশ্ন করেও কোন কারণ জানতে পারল না। কিন্তু 'স্ত্রীর অত্যধিক পীড়াপীড়িতে' লাহা মশাই রাজি হলেন— শর্ত, 'ছান্দোড় গ্রামের দেআসীকে এবং অন্যান্য গ্রামের দেআসী, দেআসিনীগণকে অমুক দিন সন্ধ্যার সময়' ডেকে এনে—'চারি তরফের লোকদের সমবেত' করে, দেবমন্দিরে বসে সর্বসমক্ষে তিনি তার অনুপস্থিতির সময়কার কথা বলবেন। তাই হল। সকলের সামনে 'ছান্দোড় গ্রামের বর্ধন পরিবারের দেআসীর কাঁধে ভর' দিয়ে বোথ পুকুরের অলৌকিক কথা বললেন তিনি। মুখে রক্ত উঠে মারা গেলেন। সেইদিন থেকে লাহাদের বংশের কেউ ছান্দোড়ের বোথ পুষ্করিণীর নিকট যান না। 'দশহরার' দিনে 'ছান্দোড়ের অঞ্চল বিখ্যাত সর্পদেবী কালুবুড়ী'-র পূজায় 'গোপীনাথ ও বৃন্দাবনপুরের লাহা পরিবারের একজন পাটভক্ত্যা হন। এই পাটভক্ত্যা স্থানীয়ভাবে 'লাউবুড়া' নামে অভিহিত হন। (উক্ত , পৃ : ৬২)। এই পুকুরটি সম্পর্কে অঞ্চলের মানুষদের ভয় অত্যন্ত বেশি। কেউ পুকুরে নামে না— 'এমনকি গোরু বাছুরকে জল' খাওয়াতেও সাহস করে না।

রাঢ়ের এই কিংবদন্তী আর মনসার ব্রতকথার সামান্য মিল— দুই কাহিনীর মূল চরিত্র মনসার রাজ্যে (সাপ বা সাপের পরিবর্ত শিকলের সাহায্যে) গিয়ে পৌঁছেছে। ভয় আর ভক্তি— আসক্তি আর আপত্তি— লোক-দেবতা সম্পর্কে, টোটেম-শক্তি সম্পর্কে, পৃথিবীর সর্বত্র আদিম জাতিগুলির মধ্যে দেখা যায়। ফ্রয়েড একে বলেন উভবলিতা (ambivalance)। তাঁর *টোটেম*

ও *ট্যাবু* গ্রন্থে এ নিয়ে আলোচনা আছে। ছান্দোড়ের দেবী সম্পর্কে এই রকমই ভয়ভক্তির সমাপতন ঘটেছে— দেবী মনসার মধ্যেও তার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। রেভারেন্ড লালবিহারী দে-র ফকিরচাঁদ শীর্ষক রূপকথার রাজকন্যা জলতল ভেদ করে ওপরে আসার সময় সাপের মাথার মণির সাহায্য নিয়েছে— আগে সেটি বলে নিয়েছি। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে জলতল রক্ষাকারী সাপ বা ড্রাগনের কাহিনীর কথাও লিখেছি। আর একটি কথা বলে নেওয়া যাক, মালদহের গোহিলাচণ্ডী সম্পর্কিত গল্পটিও ছান্দোড়ের কালীবুড়ির কাহিনীর সঙ্গে প্রায় সম্পূর্ণ মেলে।

সর্প-কৃষ্টির সঙ্গে জলসম্পদের রহস্যময় সম্পর্ক, পাতালপুরীতে বিষনাশ ও বলবর্ধনের সংস্কার মহাভারতের সময়ও প্রচলিত ছিল। ভীমকে বিষপ্রয়োগ করে অচেতন করে জলে ফেলে দেবার পর ভীম মরেছেন ভেবে উৎফুল্ল হন দুর্যোধন। কিন্তু নাগরাজ বাসুকি ভীমের বিষক্রিয়া দূর করে বলবর্ধন করিয়ে ফিরিয়ে দেন। মনসামঙ্গলের ভাসান যাত্রা খেয়াল করলে বোঝা যায় জলের গভীরে— দূর দক্ষিণেই বাংলার মনসাদেবীর ক্ষেত্র। ভাটি দেশে যেতে যেতে বেহুলা যেখানে গিয়ে দেখেছেন সামনে অথৈ জল, কোনদিকে যাবেন ঠিক করতে পারছেন না। সেখানকার নাম বাংলার মনসামঙ্গলের কবিরা দিয়েছেন— 'নিলক্ষের বাঁক'।

নক্ষত্র পতন হেন ভেলার গমন।
নিলক্ষের বাঁকে গিয়া দিল দরশন।।
পূর্ব পশ্চিম নাহি উত্তর দক্ষিণ।
ভেলা লয়ে যাইতে না পায় পথ চিন।।

('বাইশ কবি মনসাপুথি' : চন্দ্রকান্ত চক্রবর্তী সংগৃহীত ;
পরিবেশক—স্ট্যান্ডার্ড পাবলিশার্স ; কলকাতা-৭ ; ৩৫২ পৃ.)

সেই অনন্ত অসীম জলরাশির মধ্যে কূলচিহ্ন দেখতে পাননি বেহুলা। তখন তিনি জলের গন্ধ নিতে শুরু করেছেন। যেদিকে ক্ষারের গন্ধ পাওয়া গেল সেদিকে ভেলা ভাসিয়ে চললেন তিনি।

ভাসিতে ভাসিতে কন্যা গেল ভাটি ঘাটে।
নেতেলা কাপড় ধোয় সুবর্ণের পাটে।।
নেতেলা কাপড় ধোয় ছাওয়াল আসে ঘন।
কাপড় ধুইতে না দেয় খাইতে চায় শুন।।

[*মনসামঙ্গল* : জগজ্জীবন ঘোষাল ; উক্ত ; ২৮৯ পৃ.]

দ্বিজ বংশী দাস অবশ্য ভাটি ঘাটে-র কথা লেখেননি— তার ভাষ্যে বেহুলা ভেলা ভাসিয়ে গেছেন উজান দেশে। সেখানে—

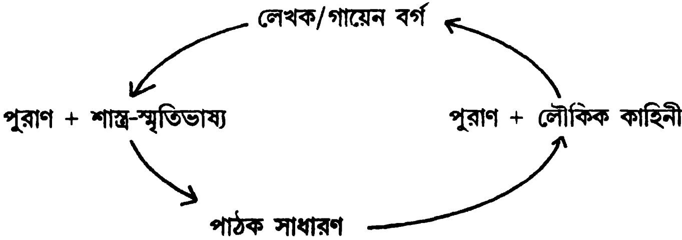
চন্দ্র সূর্য গতি নাই অন্ধকারময়।
হিমালয় বিদারি গঙ্গার স্রোতবয়।।
স্থানে স্থানে মুণিগণ বসি ধ্যান করে।
সিদ্ধ মুনি তপ করে বসিয়া কন্দরে।।
তথা হতে উজাইয়া কৈলাস নিকটে।
ভেলা গিয়া লাগিলেক ত্রিবেণীর ঘাটে।।

[*শ্রীশ্রীপদ্মাপুরাণ* : দ্বিজ বংশী দাস ; উক্ত ; ২২৩ পৃ.]

বাংলা রূপকথায় পাচ্ছি অনুরূপ যাত্রা। দক্ষিণ দেশে— সমুদ্রের অসীম দিক্‌চিহ্নহীন অঞ্চলে 'বুদ্ধু ভুতুমের দুইখানি সুপারীর ডোঙ্গা' উপস্থিত হয়। সেই স্থান— 'রাঙ্গা নদী ; রাঙ্গা নদীর চারিদিকে কূল নাই, কিনারা নাই, কেবল রাঙ্গা জল।' (*ঠাকুরমার ঝুলি* ; 'দুধের সাগর'— গল্প; দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার ; একবিংশতি সংস্করণ ; মিত্র ও ঘোষ প্রা. লি. ; কলকাতা; ১৩৯০; ৪৪ পৃ.)। জলের নিচে পাতালপুরী। যেখানে জীবন ও মৃত্যু নিয়ন্ত্রক ইন্দ্রজালের প্রয়োগ ঘটে। সোনার কাঠি রূপোর কাঠি আর প্রাণ ভোমরা-র কথা মনে পড়ছে ; 'ঢোল ডগর'-এর কথাও মনে পরতে পারে। সোনার কাঠি নব জীবনের, রূপোর কাঠি মৃত্যুকল্প অবস্থার ইন্দ্রজাল বস্তু। প্রাণ ভোমরা জীবনী শক্তির সমান্তরাল। বাংলার মধ্যযুগের সাহিত্যে রূপালী ভ্রমরের কথা বহুবার পেয়েছি— মনসা উষা অনিরুদ্ধের প্রাণ ভ্রমর রূপেই এসেছেন। গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাসের শেষে গোপীচন্দ্র নিজেই নিজেকে ভ্রমর করে ফেলেছেন। এ সবই একধরনের লোকভাবনার প্রকাশ— বলাই বাহুল্য।

।। ৩২ ।।
বিপ্রদাসের বর্ণনাভঙ্গি ও কথন রীতি

এইবার মনসামঙ্গলের কথন-ভঙ্গি (narration) বিষয়ে সামান্য আলোচনা করা দরকার। বিপ্রদাস (এবং পরবর্তীকালের গায়েনবর্গ) পুরাণ-চেতনায় ঋদ্ধ ছিলেন— কাহিনী গ্রন্থনের বৈশিষ্ট্য অনুসরণ করলে একথা বোঝা যায়। পাশাপাশি যে জনগোষ্ঠী বিপ্রদাসের কাহিনী শুনতেন তারা ছিলেন পুরাণ-সাহিত্যে অদীক্ষিত। তাদের একটা বড় অংশ নিরক্ষর ছিলেন— পুরাণ তাদের কাছে ধর্মশাস্ত্রের পরিবর্ত (substitute) হিসেবে গণ্য ছিল। সুতরাং বিপ্রদাসের কথনভঙ্গি তে তিনটি মাত্রা ও চারটি সূত্র তথা ধারাপ্রবাহ লক্ষ্য করা যায়।



লেখক (বা গায়েনবর্গ) চেয়েছেন পুরাণ প্রসঙ্গ ও শাস্ত্র-স্মৃতির ভাষ্য (discourse)-কে পাঠক সাধারণের মনে গেঁথে দিতে ; পাঠক সাধারণ তাদের ধ্যান-ধারণা ও বিভিন্ন লোক প্রচলিত উপাদান (Folk elements) যুক্ত করে দিতে চেয়েছেন। এই আবর্তনের প্রক্রিয়ায় গড়ে উঠেছে মনসামঙ্গলের কাহিনী। এই প্রক্রিয়াটি অন্তর্গত থাকার ফলে মনসামঙ্গল ব্যক্তিগত সাহিত্য না থেকে সমাজের নিশ্চেতনা (unconscious) বা অবচেতনা (subconscious) থেকে উঠেআসা যুগ-সাহিত্য। সামান্য কিছু উদাহরণ নেওয়া যাক :

১. মহেশ্বরী সম্পর্কে বিপ্রদাসের স্তুতি এইরকম—

> বন্দো মাহেশ্বরীরে ত্রৈলোক্যে করে পূজা।
> মৃগরাজ ধ্বজা তেজা অষ্টাদশ ভুজা।। (১. ২. ১৬)

২. নবগ্রহ সম্পর্কে বিপ্রদাস বলেছেন—

রবি শশী ভৌম বুধ গুরু শুক্র শনি।
রাহু কেতু নবগ্রহ বন্দো পটুপানি॥ (১. ২. ২০)

বোঝাই যায় বিপ্রদাস সংস্কৃত ভাষার পাঠ গ্রহণ করেছিলেন। অমরকোষ তাঁর পড়া ছিল। বস্তুত প্রচলিত শিক্ষার পাঠ গ্রহণ করার মাধ্যমেই তাঁর পুরাণ-চেতনা গড়ে ওঠে।

৩. প্রথম পালাতে বিপ্রদাস মনসার বেশ কয়েকটি নাম উল্লেখ করেছেন ; নামগুলি মনসার কোন-না-কোন কাহিনীর সঙ্গে যুক্ত। একটু উল্লেখ করছি।

জনম পাতালপুরী অযোনি সম্ভবা।
নির্মাণি জননী মহাদেব তেজসভবা॥
আপনা-আপনি কৈলা জীবনের সঞ্চার। (১. ৪. ৬২-৬৪)

নামগুলি এবং তার উৎস সম্পর্কে বিপ্রদাসের বিবরণটি একটি ছকের সাহায্যে প্রকাশ করা চলে।

নাম	কারণ/উৎস	প্রদাতা
পাতালকুমারী	'উদ্ভবা পাতাল'	—
নাগেশ্বরী	'নাগদান পাইয়া'	—
পদ্মাবতী	'কালিদহে পদ্মবনে হইল উতপতি'	—
মনসা কুমারী	'মনেতে জনম'	দেব ত্রিপুরারি
ব্রহ্মাণী	'নিরঞ্জন কায়ভেদ..... ব্রহ্মজ্ঞান' লাভ করে	—
'যোগেশ্বরী'/'পরম যোগিনী' (?)	'মহজ্ঞান দিশা'-প্রাপ্ত হয়ে	—
মন্দাক্ষি	'চণ্ডীর বিবাদে'	—
বিষপূর্ণ আখি	'চণ্ডী জিনি নাম হৈল'	—
শ্বেতাম্বরী	'শুভ্র পট্ট পারি যবে গেলা বনবাসে'	—
নির্বাসিনী	'চণ্ডীর বিবাদে'	—
পার্বতী	'পর্বতে পার্বতী নাম পর্বতবাসিনী'	—
জগৎগৌরী	'জরৎকার পত্নী'	—
পতি মন্দোদরী	'পতির বিচ্ছেদে'	—
জাগুলী	'জাগিয়া জাগুলী নাম সিজ বৃক্ষে স্থিতি'	

এই ১৪টি নাম সবই পুরাণ-চুম্বিত নয়। পার্বতী, পতি মন্দোদরী, জগৎগৌরী, জাগুলী নামের উৎস-কথায় পুরাণ-চেতনা ও তৎসংক্রান্ত কল্পনার ছাপ নেই। এই উৎসকথা নিতান্ত লৌকিক চেতনা-সঞ্জাত।

৪. বিশ্বকর্মা বা বিশাই-কে বাংলা সাহিত্যে দেবসমাজে ব্রাত্য করে রাখা হয়েছে মনে হয়। যে-কোন অবকাশে তাঁকে ডেকে পাঠানো হয়। যেমন মনসা তাঁর পুরী নির্মাণ করানোর সময়

স্মরণ করেছেন বিশ্বকর্মা আব হনুমানকে। 'ভল্লুক বাহনে বিশাই অন্তরীক্ষপথে' এসে হাজির হয়েছেন।

বিশ্বকর্মা প্রতি তবে পদ্মা কহে কথা।
পুরী নির্মাইয়া দেহ বঞ্চি আমি হেথা। ২. ১. ৩

কালিদহে জলের মধ্যে পুরী নির্মাণের ক্ষেত্রেও একইভাবে ডাক পড়েছে বিশ্বকর্মার। ভল্লুক-বাহন বিশ্বকর্মা আধুনিক সময়ে হস্তী-বাহন হয়েছেন।

৫. অপ্সরা বীণালতাকে দেখে ব্রহ্মার শুক্রপাত ঘটাব কাহিনী পুরাণের চরিত্রকে মনসামঙ্গলের লৌকিক কাহিনীর আদলে উপস্থাপিত করার চেষ্টা বলে মনে হয়। উক্ত শুক্রপাত হবার পর ব্রহ্মার অক্ষয় শক্তি থেকে সাতজন ঋষি জন্মায়— তাদের আকার বুড়ো আঙ্গুল পরিমাণ। পুবাণে বালখিল্য ঋষিদের বিবরণ পাওয়া যায়। এই ঋষিরা যেন তাদেরই তুল্য। বীণালতা ও ব্রহ্মার প্রসঙ্গ বিপ্রদাসের সংযোজন। এরপর আবার একই শক্তি থেকে দুই কুমারের জন্ম হল। আশ্চর্য তাদের রূপ :

দেব কায় সপ্ত মুখ পুচ্ছ পদভাগে। (২. ৩. ৩৬)

ব্রহ্মা তাদের 'দেব বিধি উপায়ন' করিয়ে সিজুয়া পর্বতে মনসার পুরী রক্ষার দায়িত্ব প্রদান করলেন। এই বিচিত্র-দর্শন দেব চবিত্র দুটিব কোন পরিণতি লক্ষ্য কবি না। লেখার ধরনে অবশ্য মনে হচ্ছে বিপ্রদাস কোন হারিয়ে যাওয়া কাহিনীর সূত্র এখানে যোজনা করেছেন।

'শুক্রপাত স্থানে' জল ঢালতেই সেখানে জন্মাল 'দুরন্ত ব্যাঘ্র'।

বিকট দশন গোপ করে ফর ফর।
সম্ভ্রমে বলেন ব্রহ্ম তাহা বরাবর॥
কপিলা নন্দন হইতে পারে পরাজয়।
গন্ধর্ব হইয়া যাবে ইন্দ্রের নিলয়॥ (১. ৩. ৩৯-৪০)

ঝড়ের বেগে ব্রহ্মার মায়ায় দুই ব্যাঘ্র উড়ে গেল।

৬. দেবতাদের 'সিদ্ধযজ্ঞে' রন্ধনকর্মে এসেছিলেন দেবী চণ্ডী, তিনি যখন নিদ্রায় আচ্ছন্ন আব তার 'বসনের বারি ছিল কনেষ্ঠ অঙ্গুলি'। তখন তাকে দেখে কামমোহিত হলেন ব্রহ্মা।

রূপ নিরক্ষিতে ব্রহ্মার চন্দ্র টলে।
প্রবেশ চণ্ডীর গর্ভে হৈল হেনকালে॥ (১. ৩. ৪৭)

চণ্ডী সেকথা ধ্যানযোগে জানলেন, তিনি নাথযোগীদের নিমন্ত্রণ করে আনলেন। তাদের কামমোহিত করার চেষ্টা করলেন। পরে বল্লুকা নদীর তীরে গর্ভমোচন করলেন তিনি। বিপ্রদাস জানাচ্ছেন :

সেই হৈতে গর্ভপাত হয় ত সংসারে (১. ৩. ৫৭)

চণ্ডীর স্খলিত-গর্ভ, ব্রহ্মার অক্ষয় শক্তি— তৃষ্ণার্ত কপিলা পান করলে তার মহাশক্তিশালী পুত্র মনোরথের জন্ম হল। এরপর মনোরথ আর ঐ মহাব্যাঘ্রের দ্বন্দ্ব সংঘর্ষের বিবরণ দিয়েছেন বিপ্রদাস। গোটা কাহিনীটি পুরাকথার লক্ষণাক্রান্ত। একই উৎস থেকে জাত বিভিন্ন প্রাণসত্তার দ্বন্দ্ব— পুরাণ কথার, আদিকথার বৈশিষ্ট্যটি বহন করছে। নিচের ছকটি থেকে এই দ্বান্দ্বিকতার ছবি স্পষ্ট। যথা—

ব্রহ্মা

বালখিল্য ঋষি | সপ্তমুখ দেবতা | মহাব্যাঘ্র | মনোরথ

মনোরথ ও মহাব্যাঘ্রের দ্বন্দ্বে সমাজ-বিবর্তনেব সংবাদ কেমন করে পাওয়া যায় আর সেই সূত্রে মনোরথ কেন বিজয় লাভ করে সে ব্যাপারে আগে আলোচনা করেছি।

৭. মনসার নাগ আভরণ দেখে ভয় পাওয়া আর জরৎকারুর শঙ্খের মধ্যে লুকিয়ে থাকার কাহিনীব পটভূমিতে চণ্ডীর পরিকল্পনা, মানবিক ব্যবহার যুক্ত করে দিয়েছেন বিপ্রদাস। চণ্ডী গিয়ে জরৎকারুকে বলেছেন .

নাগরূপী কন্যা এই নাগ অবতার।
মনি বস্ত্র এড়ি পরে নাগ-অলঙ্কার॥
আজি নিশি নাগভয় থাকিহ সত্বরে। (৩. ১৫. ১৯০-৯১)

অন্যদিকে মনসাকে পরামর্শ দিলেন চণ্ডী, তিনি যেন নাগ আভরণ পরে বাসর ঘরে যান।

না বুঝি চণ্ডীর মায়া মনসা কুবুদ্ধি।
নাগ আভরণ পদ্মা করি নানা বিধি॥ (৩. ১৫. ১৯৩)

মনসার আভরণ নাগগুলিকে চঞ্চল করার জন্য উপরন্তু চণ্ডী ছুঁড়ে দিলেন কিছু ব্যাঙ .

হেনকালে চণ্ডিকা চলিয়া ধীরে ধীরে।
দুয়ারে থাকিয়া ভেক পেলি দিল ঘরে॥
ভেক দেখি সর্ব নাগ গর্জয়ে সঘন।
উঠিয়া বসিল ঋষি চমকিত মন॥ (৩. ১৫. ১৯৭-৯৮)

কাহিনী উপস্থাপনেব ক্ষেত্রে কবি এখানে পুরাণের গাম্ভীর্য অতিক্রম করে লোকায়ত লঘু ভঙ্গি অবলম্বন করেছেন।

৮. স্বামী জরৎকারু নাগ ভয়ে ভীত হয়ে পালিয়ে গিয়ে লুকিয়ে রইলেন শঙ্খের ভেতর। মনসা তখন কুরলপক্ষীর রূপ ধারণ করে গেলেন দূর গভীর সমুদ্রে—

নিমেষে সব জানি সমুদ্রে আছে মুনি
শঙ্খের গর্ভে লুকাইয়া।
চলিল সসন্তাপে কুরল-পক্ষ রূপে
ডাকিয়া অন্তরীক্ষ হৈয়া॥
শুনিয়া পক্ষ ডাক ভাসিয়া উঠে শাঁখ
ছুইয়া তুলিলেন তীরে। (৩. ১৭. ২১৫-২১৬)

মনসার এই রূপান্তর ধারণ কোন ছিন্ন লোককথার অঙ্গ মনে হয়। কুরল পক্ষের উপস্থিতি ও সক্রিয়তায় ('ছুইয়া' তোলা— ক্রিয়াটির অর্থবোধ করা যাচ্ছে না) ভেসে উঠল শঙ্খ। শঙ্খের গর্ভ থেকে জরৎকারু বের হয়ে এলেন।

হইয়া চমৎকার উগারে জরৎকার
অতিসে শঙ্খ ভয় বাসি॥ (৩. ১৭. ২১৭)

বাংলা ব্রতকথায় শঙ্খ রাজপুত্রের কাহিনীতে এই অভিপ্রায় (লোক-অভিপ্রায় বা motif)-এর পরিচয় পাওয়া যায়।

৯. সঙ্ক ধন্বন্তরীকে মনসা কৌশলে নিহত করার পর 'গাড়র' মূর্তি করে রেখে দিয়েছেন।

জিয়াইয়া ধন্বন্তরি গাড়র মুরতি করি
যতনে রাখিলা রসাতলে। (৭. ৪. ৫০)

বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের মনসামঙ্গলে এই কাহিনী-সূত্রটি পরে আর যোজনা করা হয় নি। লখিন্দরের বিবাহ যাত্রার শেষে তার শ্যালকরা একটি বৃহৎ লোহার ঘণ্টা ও গাড়র মূর্তি রেখে দিয়েছিলেন। ক্ষুব্ধ লখিন্দর এসময় অসম্ভব বীরত্ব প্রদর্শন করেছেন।

সম্মুখে দেখিল বালা লোহার গাড়র।
দক্ষিণে ধরিল মুণ্ড কর্ণে বাম কর॥
মেড়া ধরি লখিন্দর মারে একটান।
ছিঁড়িয়া গাড়র মুণ্ড করে খান খান॥ (১২. ১৩. ১৬৩-৬৪)

এই গাড়র-মূর্তির সঙ্গে সঙ্ক ধন্বন্তরীর সম্পর্ক নির্ণয় করার মতো স্পষ্ট উপাদান আমাদের হাতে নেই। এই সামান্য একটি ইঙ্গিত থেকে এ-বিষয়ে সিদ্ধান্ত করা যাচ্ছে না। ধারণা হচ্ছে এখানে কোন সূত্র হারিয়ে গেছে।

১০. ভাসান যাত্রার সময় বেহুলা কয়েকটি নিদর্শন রেখে গেছেন।

কড়াকের তৈল বালি এড়িল প্রদীপ জ্বালি
করজোড়ে সভা প্রতি বলে।
যদি মোর এই তৈলে ছয় মাস দীপ জ্বলে
প্রভু লইয়া আসিব কুশলে॥ (১২. ৩৭. ৪৭২)

শুধু কি তাই, রেখে গেছেন সেদ্ধ-করা হলুদ আর ধান ('সিজান হরিদ্র ধান') বেহুলার ইচ্ছা:

যদি প্রাণনাথ জিবে তোরা ফল ফুল হবে
নিদর্শন লোক পরশানে॥ (১২. ৩৭. ৪৭৪)

'গোঁপীচন্দ্রের সন্ন্যাস'-এ একই ধরনের কাহিনী উপস্থাপনের রীতি লক্ষ করা যায়। আমার লেখা একটি প্রবন্ধের একাংশ উল্লেখ করি : ....' 'সত্যের পাশা' ঝুলিয়ে রাখা হল, একটি পাত্রে সামান্য পরিমাণ দুধ আর চাল রেখে দেওয়া হল ; জোড়া দামামা টানিয়ে রাখা হল। বলা হল এক জোড়া প্রদীপ জ্বালানোর কথা।

এ কড়ায় তৈল দিয়া জোড় রত্ন বাতি।
এই প্রদীপ জ্বলিবে তোমার কিবা দিবা রাতি॥

বার বছর পর, গোপীচন্দ্র যেদিন মহলে প্রবেশ করলেন, সঙ্গে সঙ্গে

দুয়ারের জোড় নাগরা বাজিয়া উঠিল।

দেখা গেল সেই প্রদীপ আজও জ্বলছে। রান্না হয়েছে সেই দুধভাত, বিনা আগুনেই!'— ('উত্তরবঙ্গের অনক্ষর কৃষকদের মৌখিক সাহিত্য— "গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস" : অচিন্ত্য বিশ্বাস; বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা ; যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। ২০০০-২০০১ সংখ্যা ; মার্চ ২০০১ ; ৭৬ পৃ :) ডালিম রাজকুমারের গল্পে ডালিমকুমার অভিযানে বের হবার পর পুঁতে রেখে গেছে একটি ডালিম গাছ। বলে গেছে তার বিপদের চিহ্ন ধরা পড়বে এই গাছে।

১১. লখিন্দর বেঁচে ওঠার পর দেখা গেল নিজের পায়ে তিনি দাঁড়াতে পারছেন না— তার 'আঁটুচাকি' খেয়ে গেছে একটি রাঘব বোয়াল। বিপ্রদাস লিখেছেন :

রঘু বোদালি খাইল লখাইর আঁটুচাকি।
ঘুরে পদ্মার স্থানে আইল শশিমুখী॥ (১২. ৫২. ৭০৩)

এই রকম অভিপ্রায় ব্যবহার করেছেন কালিদাস। *অভিজ্ঞান শকুন্তলম্* নাটকে অনুরূপ কাহিনী আছে। বাংলার বেশ কয়েকটি মনসামঙ্গলে একই রকম কাহিনী বিদ্যমান। লৌকিক ও পৌরাণিক উপাদান এখানে একাকার হয়ে আছে।

১২. পুরাণ কাহিনী বিপ্রদাস জানতেন। কখনো ক্বচিৎ তার কাহিনীর পাত্রপাত্রীরা পুরাণ প্রসঙ্গ স্মরণ করেছেন। বেহুলা সাবিত্রী-সত্যবাণের কথা বলেছেন একসময়। তবে সে কাহিনী সরাসরি পুরাণ থেকে আসেনি—এসেছে মৌখিক পরম্পরা (oral tradition) থেকে।

সত্যবতী নামে কন্যা সতী পতিব্রতা ধন্যা
তার কথা কর অবধান॥ (১২. ৩৭. ৪৭৫)

আঠার বাঁকড়ার প্রসঙ্গে পুরাণকথা স্মরণ করেছেন বিপ্রদাস—খুদিয়া ডিঙ্গর নামক বামনবীরের মুখে পুরাণ কীর্তিত সতের জন বীরের কথা পাওয়া যায়। এইসব চরিত্রের কথা পুরাণ থেকেই গ্রহণ করা হয়েছে। কেবলমাত্র শেষ যে বীর সেই-ই আধুনিক— উক্ত খুদিয়া ডিঙ্গব!

॥ ৩৩ ॥

বিপ্রদাসের রচনায় বিভিন্ন কাল ও বর্গের সমাজ-বাস্তব

বিপ্রদাসের কাব্যে বাস্তবের স্পর্শ পাওয়া যায়— এগুলিকে সেই কালের বাস্তব বলে মনে হলেও কখনো কখনো তাতে প্রাচীন কালের ধারাবাহিকতাও পাওয়া যায়। বিশেষত তদানীন্তন লোকসংস্কারগুলির কথা প্রাসঙ্গিক। বিপ্রদাসের বলা লোকসংস্কারের একটি বড় অংশ আজও অপরিবর্তিত হয়ে সমাজে প্রচলিত। বলাবাহুল্য, মানুষের জীবনভঙ্গি যত তাড়াতাড়ি বদলায় তত তাড়াতাড়ি লোকসংস্কার বদলায় না। ফলে বিপ্রদাসের রচনায় বাংলার সমাজ-মনের ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতার পরিচয় এগুলিতে মিলতে পারে। কিছু উদাহরণ দিচ্ছি—

১. পিতৃশ্রাদ্ধের বাৎসরিক উপলক্ষে মাছ খাবার প্রসঙ্গ আছে চাঁদ সদাগরের গুরুকৃত্য বর্ণনার অবকাশে।

চাঁদো রাজা গুরু কৃত্য করয়ে হরিষে।
মৎস্য আনিবারে রাজা করিলা আদেশে॥ (৫. ১০. ১৮৭)

—রীতিটি বাঙালির নিজস্ব।

২. শনিবারে অমাবস্যা তিথিতে ব্রত উদ্‌যাপনের বর্ণনা পাই বিপ্রদাসের রচনায়। সনকা তার ছয় পুত্রবধূ নিয়ে ব্রত পালন করছেন :

এথায় সনকা ছয় বধূ লৈয়া ঘরে।
শনি অমাবস্যা ব্রত হরষিতে করে॥ (৫. ১০. ২১৯)

শনি-মঙ্গলবার ভয়াবহ, ক্ষতিকারক, বিপদ ঘটাতে পারা দেবদেবীর পূজার জন্যে প্রশস্ত। ঘটনাচক্রে সেই দিনটি মনসা পূজা করছিল, জালুমালুর মা নিছনি। জোড়া বারি নিয়ে পূজা। 'হাথে কাখে দুই বারি' নিয়ে পূজা তাদের। সনকা নিছনির কাছে পূজাপদ্ধতি শিখে নিয়েছেন— মনসাও নিছনিকে নির্দেশ দিয়েছেন—'হরষিতে দেহ দুই বারি'। মনসার বারি বা বারা-র পূজা বাংলার সর্বত্র, বিশেষত দক্ষিণবঙ্গে—ব-দ্বীপ অঞ্চলে, বিশেষভাবে প্রচলিত।

৩. মন্ত্রতন্ত্র তথা গুণিনদের বিচিত্র প্রভাব বিশেষত নারী সমাজের মধ্যে প্রচলিত ছিল। মনসা সঙ্ক ধন্বন্তরীর স্ত্রীর সখী হয়ে যাবার পর রূপাকৃষ্ট সঙ্ক ধন্বন্তরী তাকে রাত্রে থেকে যেতে বলেছেন। মনসা প্রথমে রাজি নন,

অতি খরতর মোর স্বামী দুরাচার।
আজি যদি বঞ্চি শাস্তি করিব আমার॥ (৬. ১২. ২০২)

—সঙ্ক ধন্বন্তরী তাকে প্রবোধ দিয়েছেন।

সঙ্ক বলে কোন কার্যে এত ভয়ভাব।
দাস-মত তব স্বামী করাইয়া দিব॥ (৬. ১২. ২০৩)

ধনা-মনার জননী কাজলা মালিনীর সখী সেজে মনসা ধনা-মনার প্রাণ ফিরিয়ে দেবার অবকাশে বলেছেন, পিতার কাছে তিনি সামান্য কিছু মন্ত্র শিখেছেন। সেই মন্ত্র প্রয়োগ করার অনুমতি প্রার্থনা করেছেন মনসা। শর্ত, প্রাণ ফিরে এলে ধনা-মনাদের তাঁর চাই। মনসার কথা :

বাপ মোর মহাগুণী বিদিত সংসারে।
তার কিছু কিছু বিদ্যা শিখাইল মোরে॥
বিদ্যার পরীক্ষা আমি কিছু নাহি জানি।
জিয়ে বা না জিয়ে তাহা দেখিব এখনি॥ (৭. ১০. ১৫২-৫৩)

সঙ্ক ধন্বন্তরীর মৃত্যুর পর কমলাও মন্ত্রজাত করবার চেষ্টা করেছেন। এসব থেকে মনে হয় মন্ত্রশক্তির প্রতি সার্বিক বিশ্বাস বিপ্রদাসের পরিচিত সমাজে ছিল।

সর্পবিদ্যকদের মৌখিক পরম্পরা— চৌষট্টি বিদ্যা, 'জীব সঞ্চারিণ' বিদ্যা, 'অমৃত করণ' প্রভৃতির কথা বলা হয়েছে বর্তমান কাহিনীতে ; এ সমস্তের বাস্তব ধারাবাহিকতা ছিল কিনা জানি না— বিশ্বাসের পরম্পরা নিশ্চয় ছিল। সাধারণ মানুষ এসবে অগাধ বিশ্বাস ও পরম নির্ভরতা বোধ করত।

৪. সঙ্কের মৃত্যু আসন্ন হলে তিনি শিষ্যদের নির্দেশ দিয়েছেন তার শরীর ৮টি টুকরো করে পুঁতে ফেলতে হবে।

হইলে মোর নিপাতন নাহি দিবা হুতাশন
কাটিয়া করিহ অষ্টভাগ।
অষ্টদিগে স্থানে স্থানে পুতিহ হে সাবধানে
সঞ্চারিতে নারিবেক নাগ॥ (৬. ১৮. ৩৪২)

এইরকম রীতি স্বাভাবিক সৎকার বিধি নয়। ব্রাহ্মণের বেশে মনসা গিয়ে বলেছেন, এই 'যবন সুলভ' রীতি প্রয়োগের প্রয়োজন নেই। গুরুর নির্দেশ মেনে তার কনিষ্ঠ অঙ্গুলি কেটে নিয়ে পুঁতে ফেলা হোক। তারপর—

না করিহ দাহন গরুড়ি গুণমণি।
কলার মাজসে করি ভাসাও এখনি॥ (৭. ২. ৩৪)

চাঁদ সদাগর রীতিমতো কলার মান্দাসে করেই ভাসিয়ে দিয়েছেন তার ছয় পুত্রের শব এবং লখিন্দর ও বেহুলাকে। মনসার উচ্ছিষ্ট মৃতদেহের ধোঁয়া চম্পকনগরে ছড়িয়ে পড়ুক, তিনি চাননি।

৫. সাপের বিষক্রিয়া বেড়ে যায় রোগীকে তেঁতুল খাওয়ালে বা আগুনের সেঁক দিলে। পুত্রের উন্মত্ত-প্রায় ব্যবহার দেখে সনকা ভেবেছেন তারা নিশ্চয় সিদ্ধি বা ভাঙ সেবন করেছে, তখন তিনি 'তেতুলি গুলিয়া দেয়/আনল জ্বালিয়া দেয় তাপ।' তখন 'তেতুলি-অগ্নিস্পর্শে সর্বাঙ্গ জ্বলিল বিষে ছয় ভাই হরিল চেতন।' এই রকম দ্রব্যগুণ, বিশেষ পরিস্থিতিতে ওষধি প্রয়োগের বিধিনিষেধের চিহ্ন বিপ্রদাসের রচনায় আরও কিছু পাওয়া যায়।

৬. যাত্রাকালে 'হাঁচি জেটী' পাড়া অমঙ্গলজনক। চাঁদ সদাগরের নৌ-যাত্রার পূর্বে অনুরূপ বিপত্তি ঘটেছে।

হাঁচি জেটী পড়ে যবে যাত্রা করে রায়।
সনকা রমণী কর হানয়ে মাথায়।।

শিরে কর হেনে কান্নাও বোধহয় অযাত্রা-লক্ষণ। লখিন্দরের লোহার বাসর তৈরির আগে একইরকম ঘটনা ঘটতে দেখা গেছে।

হয় নানা অলক্ষণ সূত্র-ছেদ পুনঃ পুনঃ
রক্ত বৃষ্টি হয় সেই স্থলে।। (১২. ১ .৫)

সূত্রধারের সূত্র বারবার ছিন্ন হওয়া অলক্ষণের ইঙ্গিত বহন করছে।

৭. সন্তান জন্মাবার সময়কার বহু বিচিত্র কৃত্যের পরিচয় দিয়েছেন বিপ্রদাস। নমাস গর্ভকালে সনকার সাধভক্ষণ অনুষ্ঠান হয়েছে। সন্তান জন্মাবার সময় 'দাওন পাত'তে হবে প্রসূতিকে, দাওন— বিশেষ রকম আসন বলে মনে হয়। জাতক জন্মাবার পর তার অঙ্গ মার্জনার পর মস্তক ও নাসা উপরের দিকে তোলা হবে। তারপর হবে নাভিকর্তন ও হুলুধ্বনি। কুমারিকা লতায় সুতিকাগৃহের চারপাশে বেড়া দেওয়া হবে। দ্বারে রাখতে হবে গোমুণ্ড। তাঁতির সাহায্যে কুমার-জাতকের নাড়ি নিবন্ধন করাতে হবে। প্রভাতে সুতিকাকে দেওয়া হবে পাচন। খুব সংক্ষেপে যথাযথভাবে বিপ্রদাস এইভাবে লখিন্দরের জন্মকথা বলেছেন।

৮. বিবাহের পূর্বে 'তইল পিঠালি' অনুষ্ঠান, গণেশ পূজা—ষোড়শমাতৃকা পূজা— বসুধারা ও নান্দীমুখ শ্রাদ্ধের পর বৃদ্ধিশ্রাদ্ধের বর্ণনা দিয়েছেন বিপ্রদাস। এসব ক্ষেত্রে গায়েনদের প্রক্ষেপ প্রচুর পরিমাণেই পড়েছে। কিছু কিছু লোকাচারের মধ্যে স্থানীয় রূপ লক্ষ করা যেতে পারে। 'পড়া আঁখা', 'তণ্ডুল মঙ্গল', 'শ্রীতোলা' হয়ত তেমনি অনুষ্ঠান। কনের বাড়ির লোকজন কুম্ভকারের ঘর থেকে মঙ্গল কলস নিয়ে আসবে, আসার পথে গ্রাম প্রদক্ষিণ করবে— এই কৃত্যের নাম শ্রীতোলা। বিপ্রদাসের বিবরণ :

লখিন্দর-দোলায় বেহুলা আরোহিয়া।
শ্রী তুলিবারে যায় হরষিত হইয়া।।
ভ্রমিল কৌতুকে সব উজানি নগরে।
বিধানে তুলিল ছিরি কুম্ভকার ঘরে।। (১২. ১৩. ১৭০-১৭১)

|| ৩৪ ||

বিপ্রদাসের রচনারীতি : তালিকা প্রণয়ন প্রণালী

তালিকা প্রণয়ন প্রণালী (cataloguing) মধ্যযুগের কবির সাধারণ লক্ষণ। তালিকা একবার নয় বার বার দেওয়া হয়। ফলে এগুলি হয়ে ওঠে গায়েন সমাজের নিজস্ব উপকরণ। শ্রোতৃমণ্ডলীর মেজাজ, মানসিকতা এবং আসরের সামগ্রিক পরিবেশের ওপর নির্ভর করে বিবেচনানুসারী গায়েনরা এই সব তালিকা পূর্ণাঙ্গ বা আংশিকভাবে প্রয়োগ করতেন। শ্রোতৃ-মণ্ডলীর মনস্তত্ত্ব অনুযায়ী পরিবেশনের প্রয়োজনের কথা পাশ্চাত্য আলোচকরা বলেছেন ; তাদের মতে এই বৈশিষ্ট্য মৌখিক-পরম্পরার সাহিত্যধারার নিজস্ব। একে বলা হয়— 'psychodiynamics of orality.' লিখিত সাহিত্য থেকে উপস্থাপনের পদ্ধতি গায়েনদের নিজস্ব। ডব্লু. জে. ওং লিখেছেন : 'Verbal memory skill is understandably a valued assest in oral culture.' (*Orality and Literacy* : W.J. Ong ; Routledge, London and Newyork ; প্রথম সংস্করণ ১৯৮২ ; আমরা দেখছি ৭ম পুনর্মুদ্রণ— ১৯৯৭ সংস্করণ;

57 পৃ. । ওং দেখিয়েছেন, গায়েনরা 'Verbatin repetition'-এর সাহায্যে স্মৃতিধার্য অংশগুলি পরিবর্তন করে আসর অনুযায়ী পাল্টে পল্টে উপহার দিয়ে থাকেন। গোটা ব্যাপারটিকে তিনি নাম দিয়েছেন 'Oral memorization. মধ্যযুগের কাব্য সম্পাদনার ক্ষেত্রে এই তালিকাগুলি সম্পাদকদের কাজে লাগে— এক জায়গায় তালিকার নামশব্দ শৃঙ্খল অন্য জায়গায় মোটামুটি একই থাকে ; এইজন্যে পাঠ নির্ণয়ে রচনাংশগুলি সাহায্য করে বলাই বাহুল্য। নাগদের তালিকা আগে উল্লেখ করেছি। বলেছি মনসার নাম। নামান্তর প্রসঙ্গেও নাম-তালিকা। এবার জানাই অন্যরকম কিছু তালিকার কথা।

সিজুয়াতে মনসার রাজ্য সেখানে ছত্রিশ জাতির বাস। তাদের তালিকা :

> ১. ব্রাহ্মণ, ২. ক্ষেত্রি, ৩. বৈশ্য, ৪. বৈদ্য, ৫. কায়স্থ, ৬. ভট্ট, ৭. দৈবজ্ঞ, ৮. গোপ, ৯. বারই, ১০. কুমার, ১১. পঞ্চবণিক (অর্থাৎ, ১১. স্বর্ণবণিক, ১২. গন্ধবণিক, ১৩. কাংসবণিক, ১৪. শঙ্খ বণিক, ১৫. গ্রামিক বণিক, ১৬. কর্মকার, ১৭. বাদ্য (কার), ১৮. পূরক, ১৯. কলু, ২০. কুশলি, ২১. কাঠুর্‍্যা, ২২. শাঁখারি, ২৩. কাঁসারি, ২৪. তামলি, ২৫. সেকরা, ২৬. তাঁতি, ২৭. যুগী, ২৮. মালাকার, ২৯. রজক, ৩০. নাপিত, ৩১. ছুতার, ৩২. গাড়ার, ৩৩. ধীবর, ৩৪. তিয়র, ৩৫. মালা।

এখানে একটি জাতির নাম পাওয়া যাচ্ছে না। ৩৬ জাতি শব্দটিকে যদি যথাযথ বলে গণ্য করা হয় সেক্ষেত্রে একটি জাতির নাম পাওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল।

দ্বিতীয় পালার দ্বিতীয় গানে মনসার জলবিহার বর্ণনার ছলে বেশ কিছু পাখির নাম বলেছেন তিনি। একাদশ পালার ষষ্ঠ গান মুকুতা সরোবরে বেহুলা সখিদের সঙ্গে স্নান করার সময় একই তালিকা পুনরাবর্তিত করেছেন বিপ্রদাস, এই দুটি তালিকার তুলনা কবা যাক।

দ্বিতীয় পালা/দ্বিতীয় গান	দ্বিতীয় পালা/দ্বিতীয় গান
রাজহংস, [১]কারণ্ড[১] ; সরল ; কুরল ; [২]চাকোয়া[২] ; ডাহুকা ; সামুখাল ; [৩]কোড়া[৩]; কামি[৩]; গাঁড়াপোল ; সারস ; বক ; কঙ্ক; সরালি ; [৪]মৎস্যবঙ্ক[৪] ; শঙ্খচিল ; তিথির; [৫]ময়ূর[৫]।	রাজহংস ; সরল ; কুরল ; চকয়া , ডাহুকা ; সামুখাল ; কামী ; কোড়া ; গাঁড়াপোল ; সারস; বক ; কঙ্ক ; সরালি ; মৎস্যরঙ্গ ; চিল ; তিথির, মউর।

১. নেই (১১/৬) ; ২. 'চকয়া' (পাঠান্তর ১১/৬) ; ৩. পশ্য 'কামী, কোড়া' (পাঠান্তর ১১/৬); ৪. 'মৎস্য রঙ্গ' (পাঠান্তর-টি ১১/৬ গ্রহণযোগ্য) ; ৫. 'মউর' (১১/৬)।

লক্ষ করার বিষয়, তালিকা দুটি পাশাপাশি রাখলে সম্পাদক সহজেই অর্থভেদ ও পাঠ নির্ণয়ে অতিরিক্ত সাহায্য পেতে পারেন।

বেহুলার কাঁচুলি-র বামপাশে প্রচুর পাখির নাম পাওয়া গেছে। সেটি এই কাব্যের তৃতীয় পক্ষী তালিকা :

> **১. চকোকা, ২. সারস ৩. চকোর ৪. হিবির ৫. জই ৬. পয়রা ৭. বায়স ৮. কুরালী ৯. তিথির ১০. গাঁড়াপোল ১১. কামি ১২. সামুখাল ১৩. বক ১৪. গুড়গুড়্যা ১৫. ধনুস্করি ১৬. গিধিনি ১৭. শকুনি ১৮. সয়চান ১৯. শালিক ২০. বটুকা ২১. মউর ২২. খঞ্জন ২৩. নোটন পায়েরা ২৪. শুয়া ২৫. ভারই ২৬. টুন্টনিয়া ২৭. চড়ুই ২৮. রাগুই ২৯. দয়েল ৩০. পেঁচা ৩১. ঘুঘু ৩২. মৎস্য রাজা ('মৎস্য রাঙ্গা' হবে) ৩৩. ছাতারে ৩৪. বানিয়া বধু ৩৫. তালচাকা।**

তালিকা প্রণয়ন প্রণালী সমাজের অন্তর্বাস্তবকেও স্পর্শ করেছে। হাসনহাটীর মুসলমানদের নামের তালিকাটি এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য :

১. সাহাতন, ২. বাহাতন, ৩. পয়তন, ৪. গয়তন, ৫. আবদুল্লা, ৬. হালিম, ৭. মিঠাই, ৮. সেবদিন, ৯. অজদিন, ১০. সবদিন ১১. একরিন,* ১২. সবদন, ১৩. রোজই, ১৪. কোচাই, ১৫. হাছিম, ১৬. মাছিম, ১৭. দুলা, ১৮. গালিম, ১৯. করিমউলা, ২০. রসুলউল্লা, ২১. ইছাই, ২২. মদাই, ২৩. সুকুরুল্লা, ২৪. গরিবউল্লা, ২৫. হারুণ, ২৬. সেফালিউল্লা, ২৭. ফতে গানি, ২৮. মক্তাব, ২৯. হায়াত, ৩০. নাবাত, ৩১. ছটী, ৩২. সদারি, ৩৩. মাদারি, ২৪. লুদি, ৩৫. মইদ্দি, ৩৬. জইদ্দি, ৩৭. সাদি, ৩৮. করিম, ৩৯. উজাল, ৪০. ফতে সাহা, ৪১. ফুল সাহা, ৪২. দৌলত, ৪৩. মামুদ সাহা, ৪৪. দফর সাহা, ৪৫. নসিরদ্দি, ৪৬. খরদিন, ৪৭. পিরজ, ৪৮. আনার দিন, ৪৯. উমর সাহা, ৫০. আরিপ, ৫১. সারিপ, ৫২. জালু, ৫৩. সুলতান, ৫৪. মুলতান, ৫৫. মালু, ৫৬. তাজু, ৫৭. রাজু, ৫৮. লজু, ৫৯. হারু, ৬০. নছির, ৬১. তাছির, ৬২. এরু, ৬৩. কাদির, ৬৪. খিদির, ৬৫. খোরাম, ৬৬. জালাল, ৬৭. আলাল, ৬৮. হুরি, ৬৯. বাহাদুর, ৭০. গরিম, ৭১. বারাই, ৭২. হুমাই, ৭৩. ভোল, ৭৪. এবা, ৭৫. হাজি, ৭৬. গাজি, ৭৭. আমানুল্লা, ৭৮. আর মাদার, ৭৯. সুসুমোল্লা, ৮০. ফরিদ, ৮১. মুরিদ, ৮২. খবরদার, ৮৩. এমাম, ৮৪. জাফর, ৮৫. সাদি, ৮৬. মরুম, ৮৭. মাদারি, ৮৮. কাদি, ৮৯. মজলিল, ৯০. সিমকুল, ৯১. আক্কেল, ৯২. মক্কেল, ৯৩. কিনু, ৯৪. ফকির, ৯৫. মামুদ, ৯৬. দিনু, ৯৭. আলাবক্স, ৯৮. হাজাম, ৯৯. সদাই।

বিপ্রদাসের রচনারীতিতে পরিকল্পনার ছাপ এখানে সুস্পষ্ট। ১০০ জনের কথা বলতে চান তিনি। শততম ব্যক্তি হাসন স্বয়ং।

মুসলমানদের বিবিদের একটি তালিকা দিয়েছেন কবি। সে তালিকা ছোট।

১. জিরাবিবি, ২. হারি, ৩. কালাফুলি, ৪. বুলবুলি, ৫. দুলদুলি, ৬. নাজিরি, ৭. টগরি।
—এরা সাতজনই হাসনের বাঁদি।

হাসনের সৈন্যদলের সকলেই মুসলমান নয়। তাদের তালিকা :

১. ছৈয়দ, ২. মোল্লা, ৩. কাজি, ৪. মির, ৫. মজলিস, ৬. খোজা, ৭. পয়দল, ৮. নস্কর, ৯. সিফাই, ১০. ঘোড়া, ১১. হাথি, ১২. উট, ১৩. খর, ১৪. তরকি, ১৫. ধানুকি, ১৬. রায় বাঁশিয়া, ১৭. জুঝার, ১৮. গাহুল, ১৯. বম্বুল, ২০. বানা (?), ২১. চোঙ্গদার, ২২. হাজরা, ২৩. পহলান।

—এদের মধ্যে হাজরা কোঠাগ্রি আর জুঝার ধানুকি যথেষ্ট বীরত্ব প্রদর্শন করেছে।

সনকা বা ঝাউয়াদাসীর সঙ্গে বিবাহ-মঙ্গলকর্মে যাওয়া প্রচুর এয়োতির একটি বড় তালিকা আছে বিপ্রদাসের রচনায়। এগুলি মধ্যযুগের নামমালা হিসাবে গণনীয়। তালিকাটি উল্লেখ করছি :

১. কমলা, ২. বিমলা, ৩. চন্দ্রকলা, ৪. শীলা, ৫. অমলা, ৬. তিলা, ৭. শীলবতী, ৮. সুশীলা, ৯. মঙ্গলা, ১০. প্রবলা, ১১. চঞ্চলা, ১২. সুমঙ্গলা, ১৩. মালাবতী, ১৪. যশোদা, ১৫. প্রবোধা, ১৬. বরদা, ১৭. প্রমদা, ১৮. সারদা, ১৯. মিতানুমতি (মিতা, অনুমতী), ২১. সুমতি, ২২. শ্রীমতী, ২৩. ভাগীরথী, ২৪. সতী, ২৫. ইন্দ্রবতী, ২৬. জাম্ববতী, ২৭. অভয়া, ২৮. বিজয়া, ২৯. সদয়া, ৩০. নিদয়া, ৩১. সর্বজয়া, ৩২. ছায়াবতী, ৩৩. শুভা, ৩৪. স্বর্ণ রেখা, ৩৫. উষা, ৩৬. চিত্ররেখা, ৩৭. সনকা, ৩৮. মেনকা, ৩৯. শিবানী, ৪০. ভবানী, ৪১. রুদ্রাণী, ৪২. ইন্দ্রাণী, ৪৩. ব্রহ্মাণী, ৪৪. মালিনী, ৪৫. রমা, ৪৬. অপছরী, ৪৭. কিন্নরী, ৪৮. দারী, ৪৯. বিদ্যাধরী, ৫০. মনোরমা, ৫১. তিলোত্তমা।

বিভিন্ন সময়ে বাদ্যযন্ত্রের একটি তালিকা রচনা করেছেন বিপ্রদাস। সেগুলির মধ্যে ব্যতিক্রম, পাঠভেদ দেখা যাক।

দুন্দুভি, মরুজ, পড়া, বীণা, করতাল, ঝাঝরি, মুহরি, মৃদঙ্গ, রসাল, ভেউর, করনাল, ডিণ্ডিম, কাহাল, দুগরি, কপিলাস, ঘণ্টা, মন্দিরা, দুসরি, মঙ্গলা, সপ্তস্বরা। (৩/১৪)

দগড়, দামা, দড়মাসা, ঢাক, ঢোল, সানি, পড়া, ঠমক, বরগোল, কাড়া, ভেউর, করনাল, ধুসরি, মহরি, কাঁসি, কপিলাস, বীণা, বাঁশী, মৃদঙ্গ, পাখজ, রণশিঙ্গা (৪/২০)

মৃদঙ্গ, বিষাণ, ভেরি, সানি, বরুগো, দগড়, কাড়া, রবাব, পাখজ, পাড়া, কপিলাস, করতাল, ঘুসরি (ধুসরি-র ভ্রান্ত পাঠ?), মুহরি, খেমক, জোড়া-দামা, দড়মসা (১৩.৭)

ঢাক, ঢোল, সানি, বেনি, দড়মসা, দগড়, ভেউর, কর্নাল, সপ্তস্বরা, রসাল, মৃদঙ্গ, বীণা, কপিনাস, কাড়া, পড়া, কাহাল (৫.৯)

পূজার উপকরণ হিসাবে দশফলের নাম এসেছে বারবার। যথা :

কদলী কর্কট ফুটী নারিকেল জাম খাজুর পনস
তাল পূগ আম (৫.৯)

ত্রয়োদশ পালার অষ্টম গানে তালিকাটি আছে এইভাবে :

কদলি, কর্কট, ফুটি, নারিকেল, জাম্র, খাজুর, পনস, তাল, পূগ, আম্র।

—পূগ অর্থাৎ সুপারি।

চাঁদের নাখরা-বনে যেসব গাছ লাগানো হয়েছে তার তালিকা উল্লেখ করা যাক।

১. চ্যূত, ২. নারিকেল, ৩. তাল, ৪. রসাল পনস, ৫. গুবাক, ৬. আমলকি, ৭. চেউরি, ৮. তেঁতুলি, ৯. কদলী, ১০. ইক্ষুবন, ১১. (৭ রকম লেবুর বন), ১২. কলম্বগ, ১৩. ছোলঙ্গ, ১৪. বাতাবি, ১৫. নারঙ্গি, ১৬. পাতি, ১৭. গোঁড়া, ১৮. কাল (কালমেঘ?), ১৯. আমড়া, ২০. নিম্ব, ২১. বকুল, ২২. কদম্ব, ২৩. শেফালিকা, ২৪. জুতি, ২৫. কুন্দ, ২৬. চম্পক, ২৭. মল্লিকা, ২৮. নাগেশ্বর, ২৯. আউচ, ৩০. রঙ্গন, ৩১. সারুলি, ৩২. পারুলি, ৩৩. ঝাঁটি, ৩৪. জাতি, ৩৫. জবা, ৩৬. মাধবীলতা, ৩৭. করবী, ৩৮. অপরাজিতা, ৩৯. দোপাটী, ৪০. দোমুখি, ৪১. গন্ধরাজ, ৪২. কাঞ্চন, ৪৩. মালতী, ৪৪. টগর (ধবলমুখী), ৪৫. বক (শ্বেত-লোহিত), ৪৬. সুগন্ধী, ৪৭. কেতকী, ৪৮. কোড়া, ৪৯. কৃষ্ণকলি, ৫০. সূর্যমণি, ৫১. বাসক, ৫২. অশোক, ৫৩. কপিথ, ৫৪. পাকড়ি, ৫৫. ভেলা, ৫৬. হরতকি, ৫৭. বহেড়া, ৫৮. গিলা, ৫৯. জলপাই, ৬০. কাম-রাঙ্গা, ৬১. রক্তচন্দন (৫/১২)

সায়বেনে লখিন্দরের জন্য যেসব যৌতুক সামগ্রী দিয়েছেন, তার তালিকা :

আসন বসন ধেনু রতন কাঞ্চন অঙ্গদ কেয়ূর হার অঙ্গুরি মঞ্জরি বাটি খুরি বাটা ঝারি খাল ডাবর খাট বিচিত্র অম্বর চতুর্দোল হস্তি ঘোড়া সৈন্যদল দাস দাসী (১২/১২)

বিবাহ যাত্রার সময় যে-সব বাজি-পটকা ফাটিয়েছেন লখিন্দর ও চাঁদ সদাগরের দল :

হাউই, ভুঁই চাপা, তুবড়ি, চরখি, চাদর, কুমুরিকা প্রভৃতি।

বেহুলার কাঁচুলির ডানদিকে প্রচুর পশুর নাম পেয়েছি। তালিকা :

গণ্ডার, শার্দুল, সিংহ, কপিবর, মহিষ, কুঞ্জর, ভল্লুক, কৃষ্ণসার, বরাহ, জম্বুক, সুরঙ্গ, কুরঙ্গ, সাড়য়াল, নেগরু, ভাম, ইন্দুর, বিড়াল, দদ্ধক, গুধিকা, কাঁকলাস, ভেক, ধেনু পাল (বৎস্য- সহ)।

—এইসব তালিকার মাধ্যমে মনসামঙ্গল রচনাকালের পরিবেশ-পরিস্থিতি সমাজ ও বাস্তব সম্পর্কে ধারণা নিশ্চয় পাওয়া যায়।

।। ৩৫ ।।

বিপ্রদাসের রচনায় বাস্তবতা

আগেই লিখেছি কাব্যকথায় বস্তুগত বিবরণ বলে যা পাওয়া যায়, তা সম্পূর্ণ সত্য বলে গ্রহণ করা অসম্ভব। কবিকে প্রায়ই রস সৃষ্টির প্রয়োজনে বাস্তবের মায়া সৃষ্টি করতে হয়— সেই মায়িক জগৎ মোটেই বাস্তব নয়। মধ্যযুগের কোন কাব্যখণ্ড সম্পর্কে অবশ্য এইরকম সিদ্ধান্ত গ্রহণেব আগে ভাবতে হয় এই কাব্যধারা একক কবি-ব্যক্তিত্বের কল্পনার ফসল নয়। কাব্যখণ্ড বলে যা হাজির হচ্ছে সেখানে থেকে গেছে একটি সামাজিক বিশ্বাস, অনুষ্ঠান, উৎসব ও কার্যকলাপের ধারাবাহিকতা। পাশাপাশি কবির ভণিতার আড়ালে এখানে রয়ে গেছে অসংখ্য অজস্র সাধারণ মাপের মানুষের ভাবনা-চিন্তার ছাপ— গায়েনদের প্রক্ষেপ ঘটেছে যথেষ্ট। সুতরাং বিপ্রদাসের মনসামঙ্গল কাব্যধারায় পুঞ্জিত হয়েছে পূর্বাগত বাস্তবের ছাপ আর ও সমসাময়িক (পরবর্তী) বাস্তবের ছিন্ন-টুকরো উপাদান। মধ্যযুগের যে-সাহিত্যে ব্যক্তির ভূমিকা আড়াল হয়ে সমাজের ভূমিকা এইভাবে প্রবল হয়ে পড়ে। এই কথাটি স্মরণে রাখলে বিপ্রদাসের 'মনসা-মঙ্গল'-এ বাস্তবতার উপাদান সন্ধানের চেষ্টা করা চলে।

ডোমদের অস্পৃশ্য ভাবার সংবাদ প্রথম দিকেই পাচ্ছি। ডোম-নারীর ছদ্মবেশ ধারণ করেছেন পার্বতী। শিব তাকে কামনা করেছেন— ডোম-নারীবেশী পার্বতী বলেছেন

আমি মল মূত্র ধারী অতিহীন জাতি।
আমা পরশিলে তোর রহিবে অখ্যাতি।। (১. ১৪. ১৮৬)

মধ্যযুগের স্পৃশ্যাস্পৃশ্যের সংস্কার নিশ্চয় এই কথাটুকুতে স্পষ্ট। বেহুলা লখিন্দর ও ছয় ভাসুরকে নিয়ে ফেরার পথে শ্বশুরবাড়ির ঘাটে নৌ-বহর রেখে নিজে স্বামীর অনুমতি প্রার্থনা করেছেন, তিনি ডোম-নারীর ছদ্মবেশে শাশুড়ী সনকাকে ছলনা করবেন। লখিন্দর অনুমতি দিয়েছেন খুবই দ্বিধায় পড়ে :

বিমরিষ লখাই নিগদে বার বার।
লোকমুখে লজ্জা পাচ্ছে হয় তো আমার।। (১৩. ২. ১৭)

এই বিমর্ষতা, লজ্জার আশঙ্কা নিশ্চয় সমাজ-বাস্তবের প্রক্ষেপ। 'চুপড়ি-বিয়নি' (ঝুড়ি, ধামা, পাখা ইত্যাদি) নিয়ে বেহুলা যখন শ্বশুরালয়ে প্রবেশ করেছেন, তাকে দেখে বেদনার্ত হয়েছেন সনকা। তাঁর মনে হয়েছে বেহুলা জাত খুইয়েছেন।

কহ ল ডুমুনি মোরে করিয়া নিশ্চয়।
বেহুলার হেন দেখি দেহ পরিচয়।।
প্রাণ স্থির নহে মোর তোমারে দেখিয়া।
কোন বাঁকে পুত্রমোর দিলে ভাসাইয়া।। (১৩. ৪. ৩৩-৩৪)

পাশাপাশি, ডোম-নারীর লাস্য-হাস্য ও বিক্রয় সামগ্রীর মূল্য নিরূপণের যে বিবরণ পাওয়া যাচ্ছে (বিপ্রদাস এবং অন্যান্য কবির রচনায়) তাতে মনে হয় ডোম-সমাজের নিজস্ব পেশাগত নিরাপত্তাও সমাজে ন্যূনাধিক ছিল।

অস্পৃশ্যতার চেতনা অন্যত্রও লক্ষ করি। নিজেকেই অস্পৃশ্য ভাবছেন— এরকম বোধের পাশাপাশি অস্পৃশ্য মানুষকে অপমান করার ঘটনাও দুয়েকটি আছে। গোপজাতি নিজেকে অস্পৃশ্য ভেবেছে। মনসাকে গোপ কুলপতি পুরন্দর ঘোষ বলেছেন :

ত্রৈলোক্য দেবতা তুমি আমি গোপজাতি।
কেমনে উচ্ছিষ্ট দিব আমার শকতি।। (৪. ১৪. ৩১৫)

গোয়ালিনী বেশ ধারণ করে মনসা কাজলা মালিনীকে ছলনা করতে গেছেন, তখনও দেখি গোপদের অস্পৃশ্য বলে ভাবা হচ্ছে। কাজলা মালিনী তিরস্কার করছেন :

কেন তুঞি ছুলি মোর পুষ্পের পসার। (৭. ৮. ১১৫)

তবে গোপ আর মালিনী-র মধ্যে অস্পৃশ্যতার বোধ অবশ্য তেমন তীব্র থাকেনি। পুষ্প-পসার এলোমেলো করার জন্যেই গোয়ালিনী বেশী মনসার প্রতি কাজলা ক্ষুণ্ণ হয়েছেন। মনসা যখন বললেন 'পুষ্পমূল্য দিব তোরে মন্দ বল কেনি', তখনই মালিনীর ক্ষোভ সামান্য কমেছে। আর মনসার ছদ্মনাম পরিচয় (গৌরী জননী মহেশ্বর ঘোষ পিতা।। মোর নাম কাজলা সুগন্ধ গ্রামে ঘর।) শোনার সঙ্গে সঙ্গে মনসাকে মালিনী সই বলে অভিহিত করেছেন— কোলে তুলে নিয়েছেন।

চাঁদ সদাগর গন্ধবণিক জাতির মানুষ। প্রবল প্রতাপ তাঁর— রাজার মতো ব্যবহার। বণিক সমাজের নানা ভাগ, বিচিত্র ব্যবহার ; চাঁদ কুলপতি হলেও তারা তার সব নির্দেশ অবিরোধে মেনে নেয়নি। চাঁদের ছোট পুত্র লখিন্দরের পাত্রী পছন্দ করার চেষ্টা শুরু করার পর বণিকরা ভয় পেয়েছে, তারা জেনেছে 'বিবা রাত্রে লখাই মরিব সর্পাঘাতে'। সুতরাং

অবস্থিতা কুমারী আছিল যার ঘরে।
পরিজন লইয়া পলায় দেশান্তরে।। (১১. ৫. ৬৫)

বেহুলার সঙ্গে বিবাহ স্থির হওয়ার পর বণিকরা সদলবদলে এসেছে চম্পক নগরে।

চতুর-আশ্রমে জ্ঞাতি শুনি হরষিত।
জানায়ে চলিল তারা অতি উল্লসিত।। (১২. ২. ১৯)

চললেন তারা হাতির ঘোরার— কেউবা কাঁধে পিঠে :

হস্তি কান্ধে চড়িয়া অঙ্কুশ লইয়া হাথে।
গ্রামিক বণিকগণ চলিল অগ্রেতে।।
হয় বর প্রখর সাজিয়া নানা মতে।
সঙ্ক আশ্রমে বন্যা চলে শতে শতে।। (১২. ২. ২০-২১)

বণিকরা বেশ প্রতাপান্বিত ছিল বলে মনে হয়। তবে এই চিত্র কতটা ঐতিহাসিক কতটা কাল্পনিক তা বলা কঠিন।

পঞ্চম পালায় আছে সিজুয়া পর্বতে মনসার রাজ্য প্রতিষ্ঠার কথা। ছত্রিশ জাতির বাস সেখানে। হাসনহাটিতেও একই রকম সমাজ সংগঠন হয়েছে।

ছত্রিশ আশ্রম তথি বসাইল নরপতি
আওয়ারি আওয়ারি মনোহর।
প্রধান তাহার মধ্যে বৃহস্পতি তুল্য বুদ্ধে
পঞ্চ দ্বিজ পণ্ডিত সুন্দর।। (৫. ৮. ১২৪)

এখানে বিপ্রদাস কিংবা মনসাপূজক সমাজের ইচ্ছা পূরণ ঘটেছে।

সর্পবিদ্যকদের পরিচয় অল্পবিস্তর মনসামঙ্গলে পাওয়া যায়। তাদের মৌখিক পরম্পরা (Oral Tradition) অনুসারে বিভিন্ন বিদ্যার পরিচয় দিয়েছেন কবি। এগুলি যথাক্রমে— আগমের বাণী, উভার-সম্ভার-নিসম্ভার তত্ত্ব, সিদ্ধি, বাণ, তন্ত্র, কাঁচ, ধাতু, নাগবাচা, নিরক্ষণ, স্তম্ভন, মোহন প্রভৃতি। পরম্পরা তাদের, চৌষট্টি বিদ্যা জানে তারা ধনা-মনার আস্ফালন :

পৃথিবী-বিজয় গুরু নাম ধন্বন্তরি।
তাহার চৌষট্টি বিদ্যা সভে মোরা ধরি।। (৭. ৭. ৯৩)

এ নিয়ে আগে আলোচনা করেছি। গুরুমুখী এই বিদ্যাশিক্ষার প্রচলন মধ্যযুগে বেশ জনপ্রিয় ছিল। সঙ্ক ধন্বন্তরীর বিবরণে আছে শত শিষ্য তার— তাদের নিয়ে রাজার মতো ঝাপানে চলেন তিনি। এই প্রতিপত্তি পরে আর তেমন থাকেনি। মনসার চক্রান্ত ও সক্রিয়তায় ধন্বন্তরীর অহঙ্কার খর্ব হয়েছে।

॥ ৩৬ ॥

বিপ্রদাসের রচনায় সমাজের বিভিন্ন বর্গ

চাঁদের লাঞ্ছনাপর্বে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর বিবরণ পাই। দশম পালায় সেই জাতিগুলির পেশাগত পরিচয়টুকু পরবর্তী প্রক্ষেপ হতে পারে। বিপ্রদাস এই কাহিনীর মূল রূপটি নিশ্চয় লিখেছিলেন, তবে আসরের অনুরোধে কিছু কিছু বৃত্তির কথা, কিছু কিছু পরিস্থিতির সংযোজন ঘটেছে মনে হয়। দেখাই—

কাঠুরিয়া : লাঞ্ছিত চাঁদ সদাগর কাঠুরিয়াদের সঙ্গে জঙ্গলে কাঠ সংগ্রহ করতে গেছেন। মনসার মায়ায় নাগরা কাঠের রূপ ধরে থেকেছে।

কাঠ বলি চাঁদো রাজা নাগেরে কুড়ায়॥

প্রচুর কাঠ সংগ্রহ করার পর বোঝা মাথায় তুলতে পারেন নি চাঁদ। ধামাই নররূপ ধরে সেই বোঝা তার মাথায় তুলে দিয়েছেন :

ধীরে ধীরে প্রাণশক্তি কাষ্ঠ বোঝা কাঁধে।
চলিতে না পারে চাঁদো দাঁড়াইয়া কাঁদে॥ (১০.১৩.২১৫)

অন্যান্য মনসামঙ্গলে কবিরা এই অবকাশে বিভিন্ন ঘটনার সন্নিবেশ করেছেন। চাঁদ বনের ভিতর চন্দন কাঠ সংগ্রহ করেছেন—এই রকম কিছু ঘটনা।

কুমার : কুম্ভকারদের পল্লীর বাস্তব বিবরণ পাওয়া গেছে বিপ্রদাসের রচনায়। কুমারদের সঙ্গে দর হল 'কড়ি চারি পোণ' পেলে কাষ্ঠ বিক্রি করবেন চাঁদ। কিন্তু ভার বহনে অনভ্যস্ত চাঁদ সদাগর মাথার বোঝা ফেলেছেন কুমারদের সারি করে রাখা হাঁড়ির ওপর।

শিরে বোঝা চাঁদো রাজা হইল কাতর।
দারু বোঝা ফেলে হাঁড়ি পাখই উপর॥ (১০.১৩.২৩০)

কুমারদের ক্ষতি হল— চাঁদকে তারা লাঞ্ছনা করল। লাঞ্ছিত চাঁদো রাজাকে চোখে-মুখে জল দিয়ে চেতনা ফিরিয়ে আনল কুমারের স্ত্রীরা। তারা 'মধু বাক্য বলি কড়ি দিল চারি পোন।' এদিকে কাঠরূপ ত্যাগ করে নাগরা পালাল। কুমাররা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়েছে :

চারিভিতে নাগ দেখি কুমার সভয়।
বাদিয়ার কাষ্ঠ কিনি খাইনু আপনায়॥

তারা চাঁদকে তাঁতিপাড়ায় গিয়ে ধরে আবার লাঞ্ছনা করল।

তাঁতি : তাঁতিদের পাড়ায় চারিপণ কড়ি নিয়ে কাপড় কিনতে চাইলেন চাঁদ। তার কথা শুনে তাঁতিরাও তাকে লাঞ্ছনা করেছে।

ব্যাধ : পাখি ধরছিল ব্যাধরা। তাদের পাতা ফাঁদের কাছে লাঞ্ছিত চাঁদ উচ্চস্বরে কাঁদতে থাকলেন।

নিকটে দাঁয়ায়্যা তবে কান্দে উচ্চরায়।
পড়্যাছিল ফাঁদে পক্ষ উড়িয়া পালায়॥ (১৩. ১৬. ২৭৮)

ব্যাধরা তাকে উত্তম-মধ্যম দিল। চাঁদ বড়ই বিপন্ন, তাঁর বক্তব্য তিনি তো কোন দোষ করেননি। ব্যাধরা তাকে বলল, এবার তিনি যেন বলতে থাকেন :

ঝাঁক সহ আসি হেথা অবিলম্বে পড়। (১৩.১৬.২৭৯)

চাঁদ তাই বলতে থাকলেন। অকস্মাৎ সেখানে এসে পড়ল কিছু দস্যু। তাবা ভাবল তাদের উদ্দেশ্যেই চাঁদ একথা বলছেন। যথারীতি আবার তীব্র লাঞ্ছনা হল চাঁদের।

উক্ত ঘটনা-পরম্পরার পর চাঁদ এক ব্রাহ্মণ গৃহস্থের বাড়ি কৃষকের বৃত্তি গ্রহণ করলেন। চাঁদ দাবি করলেন— ত্রিসন্ধ্যা ভোজন, চারটি বস্ত্র আর 'এক তঙ্কা মাসে' মাহিনা চাই। ব্রাহ্মণ রাজি। নিড়ানোর কাজ করতে বসেছেন চাঁদ— এক পথিক পাশ দিয়ে চলেছে, বলছে সেই পথিক .

ভাল ধান্য-কড়া বিষহরি। (১৩.১৭.৩০২)

মনসার নাম শুনে ক্রোধে চাঁদের কাজকর্মে ভুল হয়ে গেল :

বিবর্ণ বদন হইয়া দুই আঁখি পাকালিয়া
তৃণ এড়ি কাটে সব ধান॥

ব্রাহ্মণ প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হয়ে তাকে ধানক্ষেত থেকে সরিয়ে নিয়ে গোরু চরাতে পাঠালেন। চাঁদ একাজেও চরম অবহেলার পরিচয় দিলেন।

গরু রাখে নৃপবর দিন দুই অপসর
কুবুদ্ধি দিলেন পদ্মাবতী।
চাঁদো হইল হতজ্ঞান গরু এড়ি দিল থানে
হাথে বাড়ি নাচে নরপতি॥ (১৩. ১৭. ৩০৭)

এই লাঞ্ছনা-র বিবরণে তদানীন্তন সাধারণ বৃত্তিধারীদের অবচেতন স্তরের ইচ্ছা পূরণ ঘটে থাকবে। এজন্যেই লিখেছি বাস্তব এখান সুস্পষ্ট নাও হতে পারে—কিছুটা জন-মনস্তাত্ত্বিক উপাদান এখানে থাকা সম্ভব। হয়ত অতিশয়নের কিছু আবেগ এখানে কাজ করেছে।

যোগী : যুগী-সম্প্রদায়ের ছবি মনসামঙ্গলে সামান্য আছে। তাঁতি এবং যুগী জাতির বিবরণ পাশাপাশি আছে মনসার সিজুয়া-পত্তনের সময়। ধারণা হয় যুগীদের প্রাথমিক বৃত্তি তাঁত চালানো ছিল। 'গোসানী মঙ্গল' নামক অর্বাচীন অপ্রধান মঙ্গলকাব্যে এক যুগী তাঁতির বর্ণনা পেয়েছি:

ভৈরব নামেতে তাঁতি জাতিতে সে যুগী।
তাঁতি কাজ করে কিন্তু সতত বৈরাগী॥
রাজার যোগায় বস্ত্র রাজা ভালবাসে।
দেখি সেনাগণ তারে জোলা বলি হাসে॥
ভাঙ্গি ফেলে তাঁত খোঁট ভৈরব রুষিল।
খুঁটা হস্তে করি তাঁতি যুদ্ধ আরম্ভিল॥

[রাধাকৃষ্ণ দাস বৈরাগী : "গোসানী মঙ্গল" ; নৃপেন্দ্রনাথ পাল সম্পাদিত ; অনিমা প্রকাশনী; কলকাতা ; ১৯৭৮ সংস্করণ ; ৬৭ পৃ.]

মনসামঙ্গলের শেষে পেয়েছি যোগী-সন্ন্যাসীর বেশ ধরেছেন বেহুলা ও লখিন্দর।

বেহুলা লখাই দোহে যুগিনীর বেশ।
আচ্ছাদিলো শিরোপরে দীর্ঘ জটা কেশ॥
লাউয়া লাঠী থাল বুঝি দোয়াদশ করে।
শ্রবণেতে কুণ্ডল বিভূতি কলেবরে॥ (১৩.১২.১৭৬-৭৭)

সাহের নগরে কৌতুকে ভ্রমণ করেছেন তারা ; কারো ভিক্ষা গ্রহণ করেননি। সুমিত্রা তাদের জন্য ভিক্ষা নিয়ে এসেছেন :

হেমথালে ভিক্ষা লইয়া আইলো ধাইয়া।।
সুবর্ণের পঞ্চ কড়ি তথি পর লয়।
দেখিয়া দুহার রূপ তথি মোহ যায়।।

বেহুলা লখিন্দরকে থাকতে অনুরোধ করলেন সুমিত্রা। আত্মপরিচয় দিয়ে বিদায় নিয়ে চললেন ফিরে— বেহুলা-লখিন্দর।

যোগীদের বেশ ধারণ করার মধ্য দিয়ে এক রকম আদর্শায়ন (idealization) ঘটে থাকবে। কাহিনীর বাস্তব স্মরণ করলে মনে হয় বিপ্রদাস যখন কাহিনীটি পেয়েছেন তখন যোগীরা সমাজে খুব সসম্মান আদর্শ অবস্থানে ছিল না। বেহুলার ভাসান যাত্রায় দেখেছি বুড়নিয়ারা যোগী-বেশ ধারণ করেছে। তাদের বৃত্তি দস্যুতা ও লুণ্ঠন।

যত বুড়নিয়া তথি নিবসতিন্ত দুষ্টমতি
ভ্রমতি কপট মায়াবেশে।।
ললাটে উজ্জ্বল ফোঁটা কান্ধ শোভা যোগ পাটা
পদ্মবীজে জপমালা করে।
মিছা মন্ত্র জপ করে গলায় রুদ্রাক্ষ ধরে
নিশি হইলে দুষ্ট-বিত্তি করে।। (১২.৪৬.৫৯৯-৬০০)

ফেরার পথে লখিন্দর তাদের ধরে শূলে চড়িয়ে শাস্তি দিয়েছেন :

বুড়নিয়া যত কথা কহিলা লখাই তথা
শুনিয়া হইল ক্রোধমুখি।
শীঘ্রগতি কূলে উঠে বুড়নিয়া যত কাটে
শূলে দিলা করি ঠেকাঠেকি।। (১৩.১.১০)

বোঝা যাচ্ছে, যোগীদের অবস্থা এই কাহিনী রচনার সময় ততদূর শ্রদ্ধাজনক ছিল না। মনসা-মঙ্গল কাব্যধারায় যোগীদের ভূমিকার স্পষ্ট দুটি মাত্রা— বেহুলা-লখিন্দর যখন যোগী বেশ ধারণ করেছেন তখনকার ধারণা যোগীদের জীবন ও সাধনা উচ্চমার্গের— সম্মানজনক। পাশাপাশি যোগীরা যখন ভণ্ড— তখন সাধারণের দৃষ্টিতে তাদের কৃত্য মোটেই উচ্চমার্গের নয়। ভৈরব নামক যোগীও কবির চোখে সম্মানিত হলেও কেউ কেউ তাকে ভালোচক্ষে দেখে না। এভাবে বিচার করলে এই কাব্যধারায় বাস্তবের দুটি অভিমুখ লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

গণক : স্ত্রীগণকের কথা লিখেছেন বিপ্রদাস। কাব্যের চতুর্থ পালায় দেখছি নেতা খড়ি হাতে গণনা করতে বসেছেন :

শুনিয়া পদ্মার বাণী করে লৈল খড়িখানি
গণে নেতো এ তিন সংসার। (৪.১১.২৩৫)

আমাদের মনে হয় না এটি কোন বাস্তব চিত্র। মধ্যযুগে অনুরূপ পেশায় নারীর পক্ষে থাকা অসম্ভব ছিল। খনা-র কিংবদন্তীর পিছনে সত্যস্পর্শ যদি কিছু থাকে তা তুর্কী আক্রমণ পূর্বের সত্য বলেই মনে হয়।

দাস : দাসপ্রথার পরিচয় মনসামঙ্গল কাব্যে অল্পবিস্তর পেয়েছি। গোরা মিনার গোলামের সংবাদ আছে হাসন হাটির বিবরণ প্রদানের অবকাশে। হাসনের বিবির সঙ্গে সাতজন বাঁদীর

কথা জানিয়েছেন বিপ্রদাস। তাদের নানারকম কাজ, কেউ জল আনে, কেউ গো-মাংস পরিষ্কার করে আনে। চাঁদের ছয় পুত্রের বস্ত্র যোগানোর দায়িত্বে ছিল দাসরা। স্নান সেরে আসার পর 'যার যেই যোগ্য বস্ত্র দাসেতে যোগান।' (৮. ৫. ১০৯)

মুসলমান সমাজের গোলামদের ব্যবহার নিয়ে সামান্য আমোদ-কৌতুক করেছেন বিপ্রদাস। বিষতিয়া সাপ যখন হাসনহাটির লোকজনকে নির্বিচারে বধ করছে তখন এক গোলামের সাধ হয়েছে মালিকের বিবিকে নিয়ে পালাবে।

মিঞা যদি ফৌত হইল গোলামের খোষ পাইল
বিবি লইয়া পলাইতে চায়। (৫.৫.৫১)

মুসলমান সমাজের অভ্যন্তরীণ বাস্তবের কিছু নিদর্শন মনসামঙ্গলে আছে। বোঝা যায়, হাসন-হাটির বর্ণনা দেবার সময় মুসলমান সমাজ বাংলায় রীতিমতো প্রতিষ্ঠিত। অভিজাত সৈয়দ হাসনকে কর্পূর তাম্বুল যোগান দেয় গোলাম (৪.১৯.৪০৬), হাসনের শত বিবি, তিনি তাদের সঙ্গে আনন্দে রঙ্গ-তামাসায় দিন কাটান। কাজিরা 'মজলিস করে, খাতা গুজবিজ করে।' (৪.১৯)। সৈয়দ মোল্লারা ধর্মপ্রাণ, তারা 'বিসমিল্লা'র নাম নিয়ে কাজ শুরু করে— 'সদাই মক্তবে রুজু' থাকে। এসব বর্ণনায় মুসলমান সমাজের আন্তরিক পরিচয়েব প্রমাণ পাচ্ছি। সাদিয়া গোলাম-রা বিশ্বস্ত, খাস চাকরের দায়িত্ব নিতেন। হাসন তাকে দায়িত্ব দিয়েছেন নস্করদের ডেকে আনতে। সাদিয়া গোলাম তাই করেছে। কবিকঙ্কণের কাব্যে ভাঁড়ু দত্ত চবিত্রটি বাংলা সাহিত্যে উজ্জ্বল হয়ে আছে। বিপ্রদাস একজন ভাঁড়ুর কথা বলেছেন। কৃষাণদের মণ্ডল জাতীয় চরিত্র ভাঁড়ু। মনসা গোরামিনার ৯৯ জন গোলামকে বধ করে একজনকে বাঁচিয়ে রেখেছেন— সে ভাঁড়ু। উদ্দেশ্য হাসনের কাছে দুঃসংবাদ বহন কববে সে। এই ভাঁড়ু নামটি কবিকঙ্কণ মুকুন্দ চক্রবর্তীর ভাঁড়ু দত্তকেই স্মরণ করায়। দরিদ্র মুসলমান চরিত্রও বিপ্রদাসের নজর এড়ায়নি। বিষতিয়ার আক্রমণে নকড়ি নামক দরিদ্র মুসলমান যখন কেঁদে ওঠে—

মুরগী করিয়া কোলে নকড়ি কান্দিয়া বলে
আজি কালি বএদা পাড়িত। (৫. ৫. ৫৪)

নিঃস্ব দরিদ্র মুসলমান জনসাধারণের সংবাদ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে খুব বেশি নেই। নকড়ি সেক্ষেত্রে ব্যতিক্রম বলে মনে হয়।

শুধু মুসলমান সমাজে নয়, হিন্দু সমাজেও পুরুষের বহুবিবাহ চালু ছিল, তার বেশ কিছু পরিচয় পাওয়া গেছে মনসামঙ্গল কাব্যে। মনসা চণ্ডীকে পুনর্জীবন দান করবেন না, শিবকে আশ্বস্ত করে বললেন :

মনসা বলেন বাপু মনে দেহ ক্ষমা।
আর একশত বিভা করাইব তোমা॥ (৩.৫.১১৫)

নিছক সৎ-মায়ের প্রতি ক্ষোভ হলেও এখানে হিন্দু সমাজের বাস্তব ধরা পড়েছে বলেই মনে হয়।

বাল্যবিবাহ ছিল সে সময়কার আর এক প্রথা। অতি অল্প বয়সে বিবাহ হওয়ার কিছু পরোক্ষ প্রমাণ আছে কাব্যের মধ্যে। মনসা সনকার বোন মেনকা সেজে চাঁদ সদাগরের গৃহে প্রবেশ করার সময় শিরে কর হেনে বলেছেন :

সনকা চাঁদের রাণী আমার ভগিনী।
পলাইল প্রভু মোরে রাখি একাকিনী॥ (৫.১৪.২৮৮)

সনকা অতি শৈশবকালেই চাঁদ সদাগরের পরিবারে এসেছেন, মেনকারও বিয়ে হয়েছে শৈশবে। তেমন ঘটনা না ঘটলে এরকম কাহিনী পরিকল্পনা সম্ভব হত না।

পুরুষের বহু নারী সম্ভোগ এবং নির্লজ্জ কামুকতার পরিচয় পাওয়া যায় মনসামঙ্গলে। শিব কালিদহে ডোম-নারীকে ভোগ করতে চেয়েছেন। পরে কুশলী রিপুকার সেজে চণ্ডীর কাঁচুলি সেলাই করে তাকে ভোগ করতে চেয়েছেন। পার্বতী শর্ত রক্ষার জন্যে তা স্বীকারও করেছেন। দেবতাদের যৌনজীবনে অনুরূপ স্বেচ্ছাচার অবশ্য পুরাণ সাহিত্যেও আছে। বিপ্রদাস সামান্য অভিনব পরিকল্পনার পরিচয় রেখেছেন— মহাব্যাঘ্র আর মনোরথের জন্মের পটভূমি প্রস্তুতিতে। ব্রহ্মার নির্লজ্জ কামুকতা সেখানে উপস্থিত। এ নিয়ে আগে আলোচনা করেছি। পুরুষের স্বেচ্ছাচারী মনোভাব, যে-কোন স্ত্রীলোককে ভোগ করার ইচ্ছা, নিজের স্ত্রীর কাছে শ্যালিকাকে ভোগ করার বাসনা জ্ঞাপন চাঁদ সদাগরের চরিত্রের পক্ষে চরম অবনতির প্রমাণ। সনকা এই পরিস্থিতিতে নিজের বোন মেনকাকে বলেছেন :

দুরন্ত নৃপতি তোমা দেখিল কেমনে।।
মদনে কাতর হয়্যা চাহে আলিঙ্গন।
কেমনে বলিব হেন ছার কুবচন।। (৫. ১৪. ৩০১-৩০২)

চাঁদ অবশ্য তার বাসনা স্পষ্ট করেই বলেছেন :

গুপ্তে সনকায় ডাকি বুঝাইয়া বলে।
তব ভগিনী দেখি অঙ্গ দহে কামানলে।।
তারে বুঝাইয়া প্রাণ রাখহ আমার।

মনসাও সহজ ভাবেই বলেছেন : 'তুষিব নৃপতি তব পিরিতি কারণ।' বস্তুত মনসার অন্য পরিকল্পনা ছিল— চাঁদকে কামমোহিত করে মহাজ্ঞান হরণ তার উদ্দেশ্য ছিল। সে উদ্দেশ্য পূরণ করার জন্যই তিনি সহজে চাঁদকে তুষ্ট করতে চেয়েছেন।

মহাজ্ঞান হরণের উদ্দেশ্যে সঙ্ক ধন্বন্তরীর সঙ্গেও প্রায় একই রকম কামোত্তেজনা সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন মনসা। সেখানেও সঙ্ক তার স্ত্রী কমলার সখীরূপী মনসাকে রাত্রে তাদের গৃহে থেকে যেতে বলছেন। স্বামী দুরন্ত দুরাচার ক্রোধী— একথা জেনে সঙ্ক বলেছেন ওষুধ দেবার কথা— সেই ওষুধের প্রভাবে তার স্বামী—দাসবৎ ব্যবহার করবেন তার সঙ্গে!— সামগ্রিকভাবে মনসামঙ্গলে পাচ্ছি পুরুষ-প্রধান সমাজ ব্যবস্থা আর যৌনজীবনে স্বেচ্ছাচারী পুরুষের নির্লজ্জ কামুকতার পরিবেশ।

সহমরণ, স্বামীর চিতায় আরোহণ করে স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ বা সতীত্ব বিপ্রদাসের রচনায় কয়েকবার এসেছে। শিব দ্বিতীয় মন্থনজাত বিষ পান করে মারা গেল পার্বতী দেবতাদের অনুরোধ করেছেন :

'যদি মোর হিত চাহ চিতা সাজাইয়া দেহ' (৩. ৫. ৫২)

বতারা অনুরোধমত চিতা সজ্জা করেছেন।

আমাদে
অসম্ভব :
সত্য বলে
দাস :
সংবাদ আ

তবে সর্ব দেবগণ চণ্ডিকার বোলে।
করিলা বিচিত্র চিতা ক্ষীরোদের কূলে।।
দিলেন চন্দন-কাষ্ঠ ঘৃত বহুতরে।
করাইয়া স্নান শোয়াইলা গঙ্গাধরে।। (৩. ৬. ৫৩-৫৪)

কমলাও সঙ্ক ধন্বন্তরীর মৃত্যুর পর চিতারোহণে প্রাণত্যাগের বাসনা জানিয়েছেন।

তেজিব জীবন আজি আনহ আগুনি। (৭.৩.৪৫)

এই বাস্তব মনসামঙ্গল কাব্যধারার আদি-রূপটি যখন গড়ে উঠছিল তখনকার হয়ত নয় ; কারণ বেহুলা তাঁর দাদাদের স্পষ্টভাবেই বলেছেন— বৈধব্য সংস্কার মান্য করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। একদিকে নারীর সংযম আত্মদহন আর অন্যদিকে ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য সংগ্রামী মনোভাব— দুই বিপরীত জীবনসত্য এই কাহিনীতে ধরা পড়েছে।

বাস্তুবিদ্যা : বাংলার লোকায়ত শিল্প সম্পর্কে একটি ধারণা লাভ করি মনসামঙ্গলে। বিশ্বকর্মা মনসার ক্ষেত্র প্রস্তুত করার জন্য শিল্পীদলকে নিয়ে যে গৃহ নির্মাণ করেছেন তাতে বাংলার লোক প্রচলিত শিল্পকলার পরিচয় নিশ্চয় পাওয়া যাচ্ছে। পঁচিশ বর্গ হাত (৫ × ৫ হাত) পরিমাণ স্থানে 'পোতা' তৈরি করে কাথ নিবিড় করা, স্ফটিকের স্তম্ভ পুঁতে পাষাণের সাড়ক রুয়ে ছায়ানি চৌকাঠ, কপাট ও প্রাচীর রচনা— উপরে সুবর্ণ কলস স্থাপন এবং সবার উপরে নেতের পতাকা উড়িয়ে এই গৃহ নির্মাণ করা হল। এই নির্মাণ-প্রণালী বাংলার লোক-প্রচলিত ঐতিহ্যানুসৃত বাস্তুবিদ্যার ফল বলে মনে হয়।

হাসন মনসার মন্দির নির্মাণে প্রচুর অর্থব্যয় করেছেন। তার অর্থে তৈরি হয়েছে মন্দির। বাংলার আটচালা মন্দির স্থাপত্যের বিবরণটি সে যুগের বাস্তুবিদ্যার আর একটুখানি উপাদান বলে মনে করি। প্রথমে চারিধারে সূত্র দিয়ে মাপজোখ করে নেওয়া হল :

আজ্ঞা মাত্রে শিল্পকার সূত্রধরে চারিধার
পাষাণে গাথয়ে মনোহর।
করিয়া বিচিত্র চিত্র মন্দির গঠায় তত্র
দেখি হরষিত নৃপবর॥ (৫.৮.১১২)

এবার দেওয়াল গাঁথা, চিত্রবর্ণ লাগানো, চারিদিকে স্ফটিক স্তম্ভ বসানো, দেওয়াল 'নিবাড়' করে দীর্ঘ চালের পত্তন করা হল।

দেয়াল নিবাড় করি শিল্পকার ত্বরাত্বরি
করে দিঘ চালের পত্তন॥ (৫.৮.১১৬)

রুয়া পাতা, সাড়ক প্রস্তুতি, বন্ধন দান। 'ছিটনি' প্রস্তুত করার পর ঝুমকি দিয়ে চাল নিবাড় করে স্তম্ভের উপর দেওয়া হল 'স্বর্ণপাড়ী'। তিলাটে তীর বসানো হলে তার ওপর 'বাওলা' রেখে উপরে 'ভাণ্ডার' গেড়ে দেওয়া হল। ছাউনি তৈরি হল ময়ূরের পালকে ; দূর থেকে করা হল আয়তন :

বিচিত্র ময়ূর পাখে ছাওনি করিল সুখে
দেখি লোক ঝুরে অতিশয়॥
বেড়িয়া অনেক দূর আয়তন কৈল পুর
যেন দেখি কৈলাস ভুবন। (৫. ৮. ১২০-২১)

লোহার বাসর গঠনের সময়ও এই রকম বাস্তুকলার বিস্তৃত পরিচয় পাওয়া গেছে।

বাস্তুবিদ্যার আর একটু পরিচয় পাওয়া গেছে নৌকা নির্মাণের অবকাশে। দুর্লভ কাণ্ডারিকে ডেকে চাঁদ সদাগর পুরনো নৌকা 'ডুবারু' দিয়ে গুঙ্গড়ির জল থেকে তুলে আনিয়েছেন। তারপর সেই নৌকাগুলি দীর্ঘ যাত্রার জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। নৌকায় গাব ধুনা দেওয়া হয়েছে— তোলা হয়েছে 'মালুম কাঠ'।

॥ ৩৭ ॥

বিপ্রদাসের বর্ণনায় ভৌগোলিক পটভূমি

চাঁদ সদাগরের বাণিজ্যযাত্রার বিবরণে বর্তমান কাব্যে যথেষ্ট প্রক্ষেপ পড়েছে। প্রক্ষেপের প্রমাণ পাওয়া যায় চাঁদের যাওয়া-আসার সময়কার স্থান নাম, নদনদীর নাম ও ক্রমের তুলনা করলে।

যাওয়া	সিংহল রাজের কাছে চাঁদের বর্ণনা	ফিরে আসা	মন্তব্য
রাজঘাট রামেশ্বর ধর্মখাল নদী অজয় শিবা নদী সাড়াই	✓ ✓ অজয়/বিজয়/সুরেশ্বরী ✓ সাখাই	[নেই] [নেই] [নেই] [নেই] [নেই]	এই অংশে চাঁদ পদব্রজে ফিরেছেন
উজানি কাটোয়া ইন্দ্রঘাট ইন্দ্রানি নদিয়া আঁবুয়া ফুলিয়া হাতিকান্দা গুপ্তিপাড়া মির্জাপুর ত্রিবেণী (৯.২)	সুধানপুর ইন্দ্রেশ্বর [নেই] [নেই] ✓ ✓ [নেই] [নেই] [নেই] ✓	[নেই] [নেই] ✓	যাবার সময় ইন্দ্রঘাটে সামান্য যাত্রা বিরতি ; সেখানে ইন্দ্রপূজা করেছেন চাঁদ ফুলিয়ার যাত্রা বিরতি ; রাত্রি বাস ফেরার সময় চাঁদ সপ্তগ্রাম এখানে দরবেশদের দ্বারা লাঞ্ছিত হন। (১০.১৮) সপ্তগ্রামে দুদিন যাত্রাবিরতি করেছেন চাঁদ (৯.৩)
কুমারহট্ট হুগলি ভাটপাড়া বোরো কাঁকীনাড়া, মূলাজোড়, গাড়ুলিয়া, পাইকপাড়া,	[নেই] [নেই] [নেই] [নেই]	[নেই] ✓	এখানে চাঁদ ব্রাহ্মণের কৃষি-শ্রমিকের বৃত্তি গ্রহণ করেছেন (১০.১৮)

যাওয়া	সিংহল রাজের কাছে চাঁদের বর্ণনা	ফিরে আসা	মন্তব্য
ভদ্রেশ্বর, চাপাদানি, ইছাপুর, বাঁকিবাজার চাপাদানি,	[নেই]	[নেই]	
দিগঙ্গ	[নেই]		দিগঙ্গে—চাঁদ—'পূজিল নিমাই তীর্থ' ; সেখানে নিমগাছে দেখে জবা। (৯.৪) দিগঙ্গে চাঁদ সদাগর নগর পুড়তে দেখেন (১০.১৮)
বুড়নিয়ার দেশ,	[নেই]	[নেই]	
আকনা	[নেই]		জনৈক অধিবাসীর পুত্রের দাহন দেখেন চাঁদ (১০. ১৮)
মাহেশ	[নেই]		মহেশ-এর সোজামুনি
খড়দহ, শ্রীপাট, রিসিড়া, কোননগর কোতরং, কামারহাটি আড়িয়াদহ,	[নেই]	[নেই]	
চিৎপুর	[নেই]	[নেই]	চিৎপুরে সর্বমঙ্গলা পূজা করলেন চাঁদ (৯. ৪)
কলিকাতা	[নেই]	[নেই]	
বেতড়	[নেই]		বেতড়ে বেতাইচণ্ডী পূজা করলেন চাঁদ ডিঙ্গা বেখে রন্ধন ভোজন করা হল। (৯. ৪)
ধনগু			
কালিঘাট	[নেই]	✓	কালিকা পূজন (৯.৪.৪৭) ফেরার সময় দস্যুদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও লাঞ্ছনা (১০. ১৮)
হুলিয়ার গঙ্গ	'খনিয়া'— আছে	[নেই]	তীর্থকার্য করলেন চাঁদ। বদরিকা কুণ্ড থেকে নেওয়া হল প্রচুর জল। (৯. ৪) ফেরার পথে চাঁদ এখানে অম্বুলিঙ্গ-পূজা করেছেন (১০.৯)
ছত্র ভোগ	[নেই]		
হাথিয়াগড়	[নেই]	[নেই]	
শতমুখী			

যাওয়া	সিংহল রাজের কাছে চাঁদের বর্ণনা	ফিরে আসা	মন্তব্য
চৌমুখি সঙ্কেত মাধব	চৌমুখা ✓	✓ ✓	তীর্থকার্য, বিশেষত পিতৃশ্রাদ্ধ করেছেন চাঁদ (৯. ৪)
সঙ্গম/সাগরসঙ্গম বিহগের দেশ কিরাতের দেশ অশ্বমুখ এক ঠেঙ্গিয়ার দেশ	✓ ✓ [নেই]	[নেই]	
বিপরীত কাঁকড়ার দেশ হাতিয়াদহ জোকাদহ সর্পদহ	✓ [নেই] ✓ [নেই]	[নেই]	
কড়িয়াদহ শঙ্খদহ	✓ ✓	✓ ✓	এখানে কড়ি ও শঙ্খ সংগ্রহ করা হয় (১০. ৯)
সিংহ দহ অনুপম পাটন	[নেই] ✓	[নেই]	

আশুতোষ ভট্টাচার্য লিখেছেন বিপ্রদাসের কাব্যে যেহেতু কলকাতার নাম আছে তাই এ কাব্যকে প্রাচীন বলে ধরা উচিত নয়। তাঁর যুক্তি—'চাঁদের বাণিজ্যযাত্রা সম্পর্কে কয়েকটি প্রাচীন গ্রামের নামের সঙ্গে কুমারহাট, হুগলি, ভাটপাড়া, কাঁকিনাড়া, মূলাজোড়, পাইকপাড়া, ভদ্রেশ্বর, ইছাপুর, খড়দহ শ্রীপাট, খড়দহ, রিষড়া, কোন্নগর, কোতরং, কামারহাটি, এঁড়েদহ, ঘুষুড়ি, চিৎপুর, কলিকাতা, বেতড় ইত্যাদি নিতান্ত আধুনিক স্থানের নামোল্লেখ রহিয়াছে। ইহা উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের পূর্ববর্তী হওয়া অসম্ভব।' (*বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস* ; উল্লেখিত ; ৩৪৫ পৃ.) । আশুতোষ বাবু কুমারহট্ট স্থলে লিখেছেন কুমারহাট, কোননগর স্থলে লিখেছেন কোন্নগর, আড়িয়াদহ স্থলে এঁড়েদহ—এই 'আধুনিকতা'র দায় নিশ্চয় বিপ্রদাসের কাব্যখণ্ডের নয়। আমরা লক্ষ করেছি ড. ভট্টাচার্য-কথিত স্থান নামগুলির কোনটিই চাঁদ সদাগর সিংহল রাজের কাছে পথনির্দেশের সময় বলেননি। ফেরার সময়ও এই সব স্থানের উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে না। ফেরার সময়কার স্থান নামগুলি অন্য কারণেও পৃথক হয়েছে। কালিদহের পর চাঁদ সদাগর লাঞ্ছিত হতে হতে ফিরেছেন— মূলত নদীর তীর ধরে ধরে পদব্রজে ; সেজন্যও কিছু কিছু নাম বাদ পড়েছে। লক্ষ করার বিষয় চাঁদ সদাগরের যাত্রাপথে কিছু কিছু তীর্থের কথা উল্লেখিত হয়েছে। যথা:

কাটোয়ার নিকটবর্তী ইন্দ্রঘাট : চাঁদ এখানে ইন্দ্রপূজা করেছেন
দিগঙ্গ : এখানে নিমাইতীর্থে পূজা দিয়েছেন, দেখেছেন নিমগাছে জবাফুল ফুটেছে
চিৎপুর : সর্বমঙ্গলা পূজা করেছেন
বেতড় : বেতাই চণ্ডী পূজা করেছেন

কালিঘাট : কালিকা পূজা করেছেন
ছত্রভোগ : অম্বুলিঙ্গ-পূজা প্রদান করেছেন
সঙ্কেতমাধব : তীর্থকার্য, বিশেষত পিতৃশ্রাদ্ধ করেছেন।

এই স্থানগুলির মধ্যে একমাত্র নিমাইতীর্থ ছাড়া অন্যগুলি ষোড়শ শতাব্দী, এমনকি আরও পুরোন সময়কার বলে মনে হয়।

লাঞ্ছিত চাঁদের ফেরার পথে গায়েনরা ইচ্ছামতো সংযোজন কিছু কিছু ঘটিয়েছেন। শেষে লাঞ্ছনার ঘটনাগুলিকে স্থান চিহ্নিত করে এই পয়ারগুলি লিখেছেন। ধারণা হয় পংক্তিগুলি বিপ্রদাস লেখেননি।

কালিদহে ডুবিল চাঁদের মধুকর।
আসিয়া বারুইপুর উঠে নৃপবর॥
তথা কুমারের ঘরে বেচে কাষ্ঠ বোঝা।
চৌতলেতে চোপা কুড়াইল চাঁদো রাজা॥ (১০. ১৮. ৩১৯-২০)

অনুরূপে কালিঘাটে 'দৈস্য সনে দরশন', হুগলিতে 'রাখিল গরু ব্রাহ্মণ-আশ্রমে', ত্রিবেণীতে 'দেখিল দরবেশ পঞ্চজনে'। এই স্থাননামগুলি যোজিত হয়েছে পরে। সুতরাং বাণিজ্যযাত্রার অংশে সবটাই আধুনিক কালের প্রক্ষেপ এই বক্তব্য মেনে নিতে যাচ্ছে না।

বেহুলার ভাসান যাত্রার সঙ্গেও কবি কিছু স্থাননাম যুক্ত করে দিয়েছেন। তার একটুখানি উল্লেখ করা দরকার। এই স্থাননামগুলি অবশ্য রূপকথাধর্মী। নদীর বাঁক ও জল-যাত্রার সামান্য কিছু সত্য-নির্মাণ এখানে থাকতে পারে।

যাওয়া	আসা	মন্তব্য
চম্পক নগরী	✓	
উজানী	✓	
ধনা পুলা	✓	
গোদা বড়স্বর বঙ্ক	✓	গোদার নাম জনার্দন , তিনি আবার লখিন্দরের মামা
জুয়ার বঙ্ক	—	—
বড়সিয়ার বঙ্ক	বড় সেয়ালের বাঁক	—
গিধিনী-শকুনির বঙ্ক	গিধিনী-শকুনির বাঁক	'শকুনি নগর' নামক নগর স্থাপন
ব্যাঘ্র বঙ্ক	✓	'বাঘডেঙ্গা' নামক নগর পত্তন
চানকের গঙ্গ	বুড়নিয়াদের শূল দেওয়া	—
নেতার ঘাট	—	—
কালিদহ	কালিদহ	—

ফেরার পথে বেহুলার কথা শুনে লখিন্দর কাউকে শাস্তি কাউকে পুরস্কার দিতে দিতে এগিয়ে এসেছেন। এই বিবরণের প্রায় সবটাই কবি কল্পনা, বাস্তব বোধ করি নৌকাযাত্রীদের কাছ থেকে শুল্ক আদায়কারী বড়সিয়াদের কথা আর চাণকের গঙ্গে-র বুড়নিয়াদের কথাটুকু।

চাঁদোর লখাই-এর সম্বন্ধ নির্ণয়ের জন্যে যাত্রা, বিবাহ উদ্দেশ্যে লখিন্দরের বরযাত্রা প্রভৃতি প্রসঙ্গে কিছু স্থান নামের উল্লেখ পাচ্ছি। চম্পনগরী, গোলাট নগর, বাঁকের বাজার, কাঞ্চননগর,

চৌহাটাবাজার, ফুলোটা নগর, বিশ পাড়া, ধাহলি নগর। এগুলি যথাযথ বিশ্লেষণ করলে মধ্যযুগের বাংলার গ্রাম-নগরের বিন্যাসের সামান্য কিছু পরিচয় পাওয়া সম্ভব।

বাণিজ্যযাত্রার সময় চাঁদ সদাগর সঙ্গে নিয়েছেন কাঁড়ার, গাঁথর ও চাকরদের। কাঁড়ার-রা নৌকা চালায়, গাঁথররা নৌকায় জিনিসপত্র ভালোমত সাজিয়ে রাখে, চাকররা ভার বহন করে। যাত্রার এক-একটি সুনির্দিষ্ট স্থানে বিরতি, রন্ধন-ভোজন, তীর্থকার্য, পরিভ্রমণ, বিশ্রাম— করেছেন চাঁদ। বোঝা যায়, এক সুদূর অতীতের যাত্রার স্মৃতি এখানে সন্নিবেশিত হয়েছে। পাশাপাশি সময় বদলে গেছে, বদলের ছাপছবিও নিশ্চিতভাবে ধরা পড়েছে এই যাত্রায়। সামান্য হলেও বাস্তবের বোধ কাণ্ডজ্ঞানের পরিচয় মনসামঙ্গলের কবিরা এই পর্যায়ে রক্ষা করেছেন। বিপ্রদাসের বাস্তব-বোধ ও কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞান তুলনামূলকভাবে বেশি বই কম নয়। ছত্রভোগ থেকে জালা ভর্তি করে নেওয়া হল জল :

> হুলিয়ার গঙ্গে বাহি চলিল তুরিত।
> ছত্রভোগ গিয়া রাজা চাপায় বুহিত।।
> তীর্থকার্য চাঁদো রাজা করিল তথায়।
> বদরিকা-কুণ্ডে জল লইল নৌকায়।। (১০. ৬. ৮০-৮১)

কড়িয়াদহ ও শঙ্খদহে কড়ি ও শঙ্খ 'বন্দি' করা হল। বন্দীকরা অর্থাৎ জীবন্ত কড়ি ও শঙ্খ জালবদ্ধ করে বালির মধ্যে ডুবিয়ে দেওয়া। সমুদ্রের অগভীর অংশে বা উপকূলে এই কর্ম করা হত। ফেরার সময় কড়ি ও শঙ্খের মাংসল অংশ অনেকটাই বের হয়ে যেত— ধুয়ে সেসব নৌকায় ভরে নেওয়া হত। এই বিবরণ বিপ্রদাস সংক্ষেপে সারলেও তাঁর রচনায় তখনকার ভৌগোলিক বাস্তবতা বোঝা যায়। ফেরার সময় :

> হরষিত চাঁদো রাজা পাটন বাহিল।
> কড়ি সঙ্ক দহে রাজা কড়ি সঙ্ক লইল।। (১০. ৯. ১৩০)

।। ৩৮ ।।

বিপ্রদাসের কাব্যে সত্যস্পর্শী ঐতিহাসিক উপাদান

বিচ্ছিন্নভাবে কিছু কিছু ঘটনার কথা লিখেছেন বিপ্রদাস, এগুলি তাঁর প্রখর বাস্তব জ্ঞানের পরিচয় বহন করে। এগুলিকে সত্যস্পর্শী ঐতিহাসিক উপাদান বলে গণ্য করা যায়। এর কোনটি তদানীন্তন আর্থ সামাজিক কাঠামোর চিত্র, কোনাটির মধ্যে রাজনৈতিক-প্রশাসনিক সংবাদ বিধৃত।তেমনি কিছু ঘটনার কথা স্মরণ করা যাক।

১. **বাণিজ্যযাত্রা কালে সনকার গর্ভলক্ষণ জানিয়ে নিদর্শনপত্র দান** : ধনপতি সদাগরও বাণিজ্যযাত্রা কালে একই রকম নিদর্শনপত্র দিয়ে গেছেন খুল্লনাকে। সে-যুগে সমাজে চরিত্রহীনতার অপবাদ দেওয়া যেত সহজেই। নারীরা হত অপবাদের সাধারণ লক্ষ। স্বাভাবিকভাবেই সনকা তাঁর স্বামী চাঁদ সদাগরের বাণিজ্য প্রসার প্রাক্কালে নিদর্শনপত্র লিখিয়ে নিয়েছেন।

> হেনকালে সনকা বলয়ে বিদ্যমানে।
> পঞ্চমাস গর্ভ মোর কেহ নাহি জানে।।
> লোকধর্মাচারে পাছে হয় অপমান।
> তবে পত্র দেহ রাজা সভা বিদ্যমান।।

রাজা লিখে দিয়েছেন :

পুত্র হয় থোবে নাম লক্ষিন্দর বালা।
দুহিতা হইলে নাম থুইয় জয় মালা॥
পত্র দিলা চাঁদো রাজা লোকধর্মভয়।
যাত্রা করি পাটনে চলেন মহাশয়॥ (৮.২০.৩১৬-১৭)

পারিবারিক সম্মানরক্ষা, বংশধরের পিতৃপরিচয়জনিত সমস্যার সমাধান হিসেবে প্রাচীন সমাজে এ ধরনের রীতি কোন না কোনভাবে দেখা যায়।

২. **ঘোষণা প্রদান** : বিভিন্ন সময় রাজকীয় ঘোষণা প্রদানের অবসরে চাঁদ সদাগর কিংবা তার পুত্র লখিন্দর প্রচলিত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। চাঁদের সাধের নখরা বাগানটি ধ্বংস হয়ে যাবার পর তিনি ডেকে আনেন সঙ্ক-ধন্বন্তরীকে। সঙ্ক মারা যাবার পর আবার বাগান ধ্বংস হয়— এবার চাঁদ ঘোষণা প্রদান করলেন :

সভার সম্মতি এক করি মন্ত্রণা।
সুবর্ণ চেঙ্গড়া রাজ্যে ফিরাই ঘোষণা॥
বৃক্ষ জিয়াইব চল রাজ-সন্বিধান।
নানা ধন দিয়া তার করিব সম্মান॥ (৭.৫.৬১-৬২)

অসম্ভব লাঞ্ছনার শেষে বিকৃতদর্শন চাঁদ সদাগর যখন কোনক্রমে ফিরে এসেছেন তাকে দেখে চম্পকনগরের রাখালরা ভূত বলে ভেবেছে। চলমান প্রেত 'ভুল'-জাতীয় ভূত হবে এই প্রাণী— চম্পকনগরে প্রবল গুজব ছড়িয়েছে। লখিন্দর তখন একইভাবে ঘোষণা-প্রদান করেছেন।

লখাই চেঙ্গড়া দিল সকল নগরে।
গ্রামে ভুল আসিয়াছে থাকিবা সত্বরে॥ (১১.১.১৬)

৩. **শিক্ষাব্যবস্থার ছবি** : লখিন্দরের পাঠশালায় যাত্রা (এবং তার পূর্ববর্তী ভাইদেরও), পাঠগ্রহণ প্রভৃতি বিবরণ সেকালের শিক্ষা ব্যবস্থার একটি মনোজ্ঞ চিত্র রূপে উপস্থাপিত হয়েছে। চাঁদের ছয় পুত্র তখনকার নিয়ম অনুসারে পাঠশালায় যেতেন সকালে :

প্রভাত সময় উঠে ছয় যুবরাজ।
পড়িবারে যায় সুখে গুরুর সমাজ॥ (৮. ৫. ৮৯)

লখিন্দরের পাঠগ্রহণের বর্ণনা আরও বিস্তৃত। উল্লেখ করছি। লখিন্দরের শিক্ষাক্রম এইরকম :

তন্ত্র-মন্ত্র, ভার-সন্তারণ, উচ্চারণ-মাত্রা ইত্যাদি শেখার পর 'হাথে খড়ি'।
ক, খ, গ, ঘ, ঙ ইত্যাদি চৌত্রিশ অক্ষর, অষ্টদশ ফলা, অষ্ট ধাতু, অষ্ট শব্দ— বাড়িতে শিক্ষা হল। 'শাস্ত্রশাল'-এ যাওয়া হল তার পর। সেখানে শেখা হল— ব্যাকরণ ; ভট্টি, রঘু ইত্যাদি সাহিত্য ; অলঙ্কার ; অভিধান ; জ্যোতিষ ; নাটক ; কাব্য ; অষ্টাদশ পুরাণ। ক্রমে 'পড়িল চৌষট্টি বিদ্যা স একে একে'।

৪. **বাণিজ্যের বস্তুবদল** : এই অংশটি মধ্যযুগের বাঙালি কবিদের রচনায় বারবার পাওয়া গেছে। কবিদের মূল রচনার ওপর এখানে পড়েছে গায়েনদের প্রক্ষেপ। বাস্তব বিবেচনার তুলনায় আসরের শ্রোতাদের ইচ্ছাপূরণের দাবি এখানে বেশি করে মানা হয়েছে। পণ্যদ্রব্য বিনিময়ের ক্ষেত্রে বাঙলার বণিকরা যাতে লাভ করেন, শ্রোতারা তাই চেয়েছেন। আর আসরের বিধানের তুষ্টি জন্যে গায়েনরা এই অবকাশে কাল্পনিকতার আশ্রয় নিয়েছেন। ফলে রচনাংশটিতে বাস্তবতার

মাত্রা গেছে কমে। কি ধরনের দ্রব্যের বিনিময়ে চাঁদ কি দাবি করছেন, কি পাচ্ছেন— তার একটা তালিকা দেওয়া যাক।

চাঁদ দিলেন	বদলে দাবি করলেন ও পেলেন
ঝুনা নারিকেল	দক্ষিণাবর্ত শঙ্খ
হরিদ্রা	সোনা
খোম ধুতি	পাট ভোট
পাড়ু কুমড়া	সিসার খাপর
মেষ	অশ্ব, দন্তী
তণ্ডুল	মুক্তা, প্রবাল
পিপলি	গুড়ঞ্চক
জোয়ানি	মরিচ
কাল্যাজিরা	লবঙ্গ
ভেলা	জায়ফল
নিম্বপত্র	জাইত্রি
হরীতকী	কর্পূর
আমলকী	হিঙ্গ
শুক্তাপত্র	তেজপত্র

হরিদ্রার পরিবর্তে সোনা পৃথিবীর কোন বৈষয়িক লেনদেনে সম্ভব নয়। পাড়ু কুমড়ার বদলে সিসার খাপর (বড় থালা) পাওয়াও অসম্ভব। অন্যান্য দ্রব্যগুলির মধ্যে মোটামুটিভাবে বাংলার রপ্তানি দ্রব্য ও আমদানি দ্রব্যের তালিকা প্রস্তুত করা সম্ভব। তবে পাশাপাশি অন্য তথ্য সংগ্রহ করা দরকার।

৫. **পুজারি ব্রাহ্মণদের অবস্থা** : সাধারণের চোখে পূজারি ব্রাহ্মণদের সম্বন্ধে ধারণা খুব উচ্চ ছিল না। ছয় পুত্র মনসার কোপে মারা গেলে পাত্র-মিত্ররা দাহকার্য করতে বলেছেন। তখন ব্রাহ্মণ পুরোহিতের উদ্দেশে চাঁদ বললেন :

দক্ষিণার লেভে সভে কহ অনুচিত। (৮. ৮. ১৬৮)

মনসা পূজার অনুরোধ যখন সবাই মিলে করছেন, চাঁদ প্রায় একইভাবে বললেন :

না বুঝিয়া সর্বলোক বলে অনুচিত।
দক্ষিণার লোভে বলে সোমাই পণ্ডিত।। (১৩. ৮. ৯৪)

৬. **সোনায় দাঁত বাঁধানো** : সেকালের অভিজাত মানুষ সোনায় দাঁত বাঁধিয়ে নিতেন। চাঁদ সদাগর নানাভাবে লাঞ্ছিত হয়ে সনকার কাছে সেই বাঁধানো দাঁতগুলি প্রদর্শন করে আত্ম পরিচয় দিয়েছেন।

ভুল নাহি আমি হই চাঁদো দণ্ডধর।
সুবর্ণ বাঁধান দণ্ড দরশন কর।। (১১. ৩. ৪১)

সনকা তখন প্রদীপ এনে স্বামীকে সনাক্ত করেছেন।

৭. **মুসলমান দরবেশ দল** : ত্রিবেণীর ঘাটে চাঁদ সদাগরকে তারা বড়ই লাঞ্ছিত করেছে। কাহিনীর ধারা অনুসরণ করলে মনে হয় এই দরবেশরা মনসার নির্দেশে নাগদলের রূপান্তর।

গরু রাখতে গিয়ে যখন চাঁদ চরম বিপত্তি ঘটিয়েছেন— তার প্রভু তাকে অত্যাচার করে তাড়িয়ে দিয়েছেন :

বাড়ি দশ বিশ মারে শোণিত পোড়য়ে ধারে
ভূমি পড়ি যায় গড়াগড়ি। (১০.১৭.৩০৮)

এসময় মনসা নাগদের ডেকে নির্দেশ দিলেন :

পদ্মা মায়া পাতে হেন কালে।
পঞ্চনাগ মায়াবেশে অভিনব দরবেশে
চাঁদোরে রহায় তরুতলে॥ (১০. ১৭. ৩০৯)

দরবেশদের ব্যবহার উন্মত্ত প্রায়— সুরাপানে মত্ত নেশাগ্রস্তের মতো তারা স্খলিত পদ (ফকিরি পদ্ধতিতে যাকে বলা 'মাতোয়ালা' হওয়া)। চাঁদকে তারা ঘিরে ধরলেন—

ভালা হইল আইল হিন্দু আমার নগর। (১০. ১৮. ৩১১)

তারা সবাই মিলে চাঁদের প্রতি যে ব্যবহার করেছেন তা নাগদের রূপান্তর-গ্রহণেব ফল ভাবা

কেহ দুষ্ট ভাত লইয়া যাচায় রাজায়।
কেহ মুখে ঝুটা পানি দিতে চাহে গায়॥
আর দরবেশ মাতোয়ালা হইয়া যায়।
চামড়ার বাড়ি মারে চাঁদোর মাথায়॥ (১০. ১৮. ৩১৩ ৩১৪)

ধর্মভীত চাঁদ শিবের নাম নিয়েছেন। তা শোনার পর দরবেশরা বলেছেন :

শুনিয়া ভূতের নাম কুপিল সত্বর।
ছাড়িয়া ভূতের নাম বল পেগাম্বর॥ (১০.১৮.৩১৬)

একে তদানীন্তন মুসলমান সমাজের বাস্তব বলেই মনে হয়।

॥ ৩৯ ॥

মনসামঙ্গলের সাঙ্গীতিক ঐতিহ্য

মধ্যযুগের কাব্য মানেই সঙ্গীত। মনসামঙ্গল কাব্যও তাই। বিপ্রদাস তাঁর কাব্যে গান হিসেবে উপস্থিত পালাগুলিতে রাগ-রাগিণীর নাম দিয়েছেন। অন্যথায় পয়ার বা ত্রিপদী উল্লেখ করেছেন। এ সম্পর্কে সন্ধানের ফল জানাই। 'পয়ার' হিসাবে উল্লেখ করা গানের সংখ্যা ৬৬ ; 'ত্রিপদী' হিসেবে উল্লেখ করা গানের সংখ্যা ১৮। এছাড়া কতকগুলি উল্লেখ রাগ-রাগিণীর নাম যুক্ত নয়। যেমন :

পাঁচালী	:	৯ বার	(১.৯, ১.১৭, ১.২০, ১.২২, ২.১, ২.৩, ২.৭, ৩., ১০.১৩)
অষ্টমঙ্গলা	:	১ বার	(১৩.১৩)
মন্ত্রজাত	:	২ বার	(৩.৯, ৭.১১)
যথারাগ	:	৬ বার	(৪.২১, ৫.১, ৫.৫., ৬.৪, ১২.৬)
নাচাড়ি	:	১ বার	(১.৬)

অর্থাৎ সর্ব মোট ১০৩টি গানে রাগ-রাগিণী অনুল্লেখিত।

যেসব রাগ-রাগিণী বিপ্রদাসের কাব্যে পাওয়া গেছে, সেগুলির তালিকা প্রদত্ত হল :

পাহাড়ি	(পাহিড়া, পাহাড়ি রাগ, রাগ পাহিড়া ইত্যাদি নামেও আছে)	:	৬ বার
	(২.১৩, ৪.১৯, ৭.১২, ৮.৪, ১০.৮, ১২.৪৮)		
কামোদ রাগ	(১.৫, ৭.৬, ৮.১৮, ১২.৩, ১২.১৬, ১২.২১)	:	৬ বার
কেদার	(৬.১৭, ১০.১৯)		২ বার
কল্যাণ	(৮.৩)		১ বার
মালসী রাগ	(মালসি নামেও আছে)		
	(৮.২, ১২.৫৯)	:	২ বার
আহিরী রাগ	(৩.১, ১২.১৮, ১৩.১)	:	৩ বার
ধানসী রাগ	(১.৭, ৬.১১, ১২.৪)	:	৩ বার
পট মঞ্জরী	(১.১২, ১.১৯, ২.৬, ২.৯, ২.১৪, ৩.৩, ৩.১১, ৪.১৫, ৮.৬, ৮.১৪, ৯.৮, ১০.১০, ১১.৪)	:	১৩ বার
নাটরাগ	(১.১৪, ৩.১৩, ৪.৩, ৪.৮, ৫.১৩, ৯.৩, ১১.৭, ১৩.২)	:	৮ বার
রাগ সুহাই (সুহাই, সুঈ নামেও আছে)			
	(১.১৬, ২.২, ২.১১, ৮.৯, ৯.৫, ১১.৬, ৬.৫)	:	৬ বার
মহারাটী	(১.২১, ২.৪, ৩.৫, ১০.২, ১১.১১)	:	৫ বার
কৌ রাগ	(৩.৪, ৩.১৭, ৬.১৫, ৮.১৬, ১২.৩১, ১২.৫১)	:	৬ বার
করুণা (করুণা রাগ নামেও আছে)			
	(৩.৭, ৩.১৬, ৫.৩, ৭.১, ৮.৭, ১২.৩৭, ১৩.২)	:	৭ বার
রাগ বাগেশ্বরী	(৪.৫, ৪.১৮)	:	২ বার
রাগ বেহাগ	(৬.১০)	:	১ বার
ভাটীয়ারি (ভাটীয়ারী)			
	(৭.৩, ৭.৬, ১১.৮)	:	৩ বার
বরাড়ি	(৭.২, ৯.৭, ১১.১, ১১.৯, ১৩.৯)	:	৫ বার
শ্রীরাগ	(১.৮, ৪.২, ৪.৯, ৪.১১, ৬.২, ৬.৭, ৬.১৮, ৭.৭, ৮.১১, ১০.১৪, ১০.১৭, ১২.৯, ১২.২৭, ১৩.৩)	:	১৪ বার
মল্লার (রাগমল্লার)			
	(৪.২৩, ৮.২০)	:	২ বার
রাগ প্রভাতী	(৪.২৪)	:	১ বার
সিন্ধুড়া (রাগ সিন্ধু)			
	(১.১০, ৩.১২, ৫.১৪, ৬.৯, ৭.৯, ১০.৪, ১৩.৫)	:	৭ বার
বসন্ত রাগ	(৯.১, ১১.২)	:	২ বার
মঙ্গল রাগ	(১২.২২)	:	১ বার
ধানসি	(১৩.১২)	:	১ বার
ঝারিখণ্ড (ঝারিখণ্ড)			
	(৪.৬, ৫.৮)	:	২ বার
জমক ছন্দ	(৪.১০, ৪.১৪, ৭.৫, ১০.৯, ১০.২০, ১১.৫, ১২.৮, ১৩.১০)	:	৮ বার
পূরবী রাগ	(৪.১৩)	:	১ বার

ভৈরবী	(৫.২, ৫.১২, ১০.১৫, ১২.৭, ১২.১৯)	:	৫ বার
রাগ কানড়া	(৫.৬)	:	১ বার
রাগ ইমন	(৫.১০)	:	১ বার
রাগ গৌরী	(৫.১১)	:	১ বার
গান্ধার	(৮.১৩, ১২.২৪)	:	২ বার
	মোট	:	১২৮ বার

অর্থাৎ ২৩১টি গানের মধ্যে ১২৮টিতেই রাগ রাগিণীর উল্লেখ আছে এই কাব্যটিতে। মনসা-মঙ্গলের গায়নরীতি উক্ত রাগরাগিণীর উল্লেখ থেকে কিছুটা স্পষ্ট হয়।

॥ ৪০ ॥

বিপ্রদাসের কাব্যভাষার বৈশিষ্ট্য

বিপ্রদাসের ভাষাশৈলী গতিশীল, নাটকীয়, সরল, সংযত আর বেশ কিছু স্থলে মধ্যযুগীয় কাব্যভাষা হিসাবে সুন্দর। সংস্কৃত তৎসম রীতির সঙ্গে লোকায়তকে মিশিয়ে তাঁর নির্মাণ শ্লাঘনীয় হয়েছে। কথ্যরীতির প্রয়োগ দেখতে পাই কখনও কখনও। যেমন :

১. আপনা খাইয়া নায়ে তুলিলাম কেনি। (১. ১৪. ১৯১)
২. আপনা খাইয়া মোরে বল কুবচন। (১. ২২. ৩০৫)
৩. তপ ভঙ্গ করি বিভা করিব কিসেরে। (৩. ১১. ১০৫)
৪. যমের সংবাদ আজি হইল তাহারে। (৬. ১. ১৩)
৫. আপনা চিনিয়া মন্দ না বলহ মোরে। (৬. ১০. ১৭৭)
৬. হয় নয় ধনা মনা ঐ ধূর্ম দেখ। (৬. ১৭. ৩২৯)
৭. কিসেরে বিবাদ ভাব ত্রৈলোক্য ঈশ্বরী। (৮. ৩. ৬৪)
৮. হয় নয় নৃপবর দেখহ আপনি। (৮. ৮. ১৫৫)
৯. প্রভাতে দেশেরে চলো ছাড়ি মিছা মায়া। (১০. ৭. ১১০)
১০. যাইব দেশেরে মিতা দেহ ত বিদায়। (১০. ৯. ১২১)
১১. বাদিয়ার কাষ্ঠ কিনি খাইনু আপনায়। (১০. ১৩. ২৪০)
১২. যার যেই ভবিতব্য এড়ায় ভুঞ্জিয়া।
    হয় নয় সভে চিত্তে দেখ বিচারিয়া॥ (১১. ১০. ১৩৯)
১৩. আপনা খাইয়া কোনো না গুণিনু মনে।
    হেন অপমান মোর ঘুষিব ভুবনে॥ (১১. ১১. ১৬২)
১৪. হেন অসম্ভব কথা সম্ভবে কোথায়। (১১. ১২. ১৬৭)
১৫. কিসেরে প্রহরী জাগে প্রভুরে দংশিয়া নাগে
    কহো মোর শ্বশুর গোচরে। (১২. ৩১. ৩৯২)
১৬. কিসের লোহার ঘর করিনু যতনে। (১২. ৩৬. ৪৫০)
১৭. শাপ দিতে মাত্র ভস্ম হইবে এখন।
১৮. কিসেরে আমার তরে করহ যতন॥ (১২. ৪৪. ৫৫১)
১৯. হয়ে নহে চিনিহ আপনি। (১৩. ৩. ২৮)
২০. কোথায় সম্ভবে হেন অসম্ভব নয়ে।
    লক্ষ লক্ষ মৃত জীব জিয়াইতে পারে॥ (১৩. ৭. ৭৬)
২১. দেবতার সঙ্গে বাদ সম্ভবে কোথায়। (১৩. ৮. ৮৭)
২২. আপন প্রকৃতি যেন দেখসি আমায়। (১. ২২. ৩০৬)
২৩. দৈবের নির্বন্ধ তার না যায় খণ্ডন। (২. ৩. ৬৪)

২৪. অবশ্য প্রমাদ হৈব খণ্ডন না যায়। (৩. ১.১)
২৫. দুর্বাসা মুনির শাপ খণ্ডন না যায়। (৪. ৪. ৬১)
২৬. করিল যতেক দ্রব্য না যায় লিখন। (৪. ৪. ৭৪)
২৭. গণনে না যায় অতি দেখিতে সুন্দর। (৪. ৭. ১২৯)
২৮. আইল যতেক মুনি লিখিতে না পারি। (৪. ৭. ১৩৪)
২৯. আছুক অন্যের কাজ সঙ্কের সঙ্গে বাদ। (৬. ৩. ৮২)
৩০. চাঁদোর কুগ্রহ দশা না যায় খণ্ডন। (১০. ৯. ১৩৭)
৩১. আছুক সিদ্ধের কাজ না হয় উথাল। (১১. ১০. ১৫৬)
৩২. কেন পুত্র মরিবেক রূপের মুরারি। (১২. ৩৬. ৪৫৫)
৩৩. মোরে কী বলসি তুই পুত্র আছে রূপের মুরারি। (৭. ৯. ১২৭)
৩৪. রাজার মন্ত্রণা কিছু বুঝন না যায়। (৮. ৪. ৫৯)
৩৫. সোঙরিতে রূপগুণ ধরিতে না পারি মন
রজনি প্রভাতে দেশে নড়ি। (১০. ৭. ১১৬)
৩৬. আছুক পবন হংস ভ্রমুক নিবাট। (৩. ৯. ১০৫)
৩৭. নাগেরে বাড়িল কোপ আস্তীক জননী। (৬. ১৪. ২৬৪)
৩৮. নহিল নহিল যজ্ঞ দ্বিজে দেহ দান। (৪. ৯. ১৯৩)
৩৯. নহিবেন রুষ্ট মোরে শুন ত্রিলোচন। (১. ২০. ২৮৯)
৪০. জন্মিয়া নহিল কিছু সুখ। (৩. ১৬. ২১২)
৪১. শোক দুঃখ রোগ পীড়া নহিবে কখন। (৪. ১৬. ৩৩৬)
৪২. আপনে ত স্থির নহো চাঁদের নিকটে। (৮. ১. ২০)
৪৩. হেলায় শ্রদ্ধায় যদি পূজ বিষহরি।
তবে কেন মরে মোর রূপের মুরারি॥ (৮. ৫. ৮৪)
৪৪. অমৃত আনিয়া দিলে তাহার ছোড়ান। (১. ২০. ২৬৩)
৪৫. ভালো বস্ত্র লৈতে সত্ত কিছু নাহি পুরে। (৩. ৮. ৭৫)
৪৬. হর ছাড়ি উঠ যদি নাহিবা বিনাশ। (৩. ৯. ১১০)
৪৭. স্বর্গেরে তোমার পিতা করিলা গমন। (৪. ৪. ৭১)
৪৮. রাখালেরে হও বরদাতা। (৪. ১৩. ২৬৯)
৪৯. আজি রক্ষা পাও তবে ভাণ্ডিলে শমন। (৬. ১. ২০)
৫০. মোর সঙ্গে করে বাদ জীবনের এড়ে সাধ
যমের সম্বাদ হৈল তারে। (৬. ২. ৭৩)
৫১. পাত্র মিত্র বলে রাজা নহিব চঞ্চল। (৬. ৮. ১৩৮)
৫২. সকল বুহিত্র দিয়া পাঠাবো দেশেরে। (১০. ১১. ১৬১)
৫৩. সহজে পাগল তুমি ত্রিদশের নাথে। (১২. ৪৯. ৬৪৮)
৫৪. চিরদিন হইল পাটনে। (১১. ৪. ৫২)
৫৫. ছয় পুত্র মৈল কেন মোর মৃত্যু নাই। (১১. ৩. ৩৬)
৫৬. তব দোষে দেশেরে না যাব নিস্তারিয়া। (১০. ১১. ১৫২)
৫৭. ধনপুত্র প্রাণ আর নৌকার চাকর।
লক্ষ লক্ষ নরবধ কানির উপর॥ (১০. ১২. ১৯৮)
৫৮. অনাথিনী করি পুত্র এড়ি যাহ মোরে।
কেন বা পাপিষ্ঠ প্রাণ আছয়ে শরীরে॥ (৮. ৭. ১৪৭)
৫৯. শুন শুন জালু মালু তোরা দুই ভাই। (৫. ১০. ১৯০)
৬০. এতেক বৈভব হৈল কহত কারণ। (৫. ১১. ২২৯)

৬১. **তিন উপবাসী** আমি পারনা না করি। (৫. ১০. ১৯৬)
৬২. **দাসমত** তব স্বামী **করাইয়া দিব**। (৬. ১২. ২০৩)
৬৩. **ডালে মূলে মৈল** সেই তরু। (৭. ৬. ৭৫)
৬৪. **ক্ষেণার্ধ হইলে গৌণ** হারাব জীবন। (৪. ১২. ২৫৮)
৬৫. সভে মাত্র ভক্ষি আমি **মুনির ভিতরে**। (৪. ১২. ২৬৫)
৬৬. যমের সম্পদ আইল **কারে**। (৪. ৩. ২৭)
৬৭. অতিসে **শঙ্ খ ভয় বাসি**। (৩. ১৭. ২১৮)

উক্ত সাতষট্টিটি উদাহরণে বিপ্রদাসের কাব্যভাষা (Poetic Dicton)-র চারিত্র্যটি অনেকটাই স্পষ্ট।

নারী জনোচিত সংলাপধর্মিতা, আত্মভাষ (soliloquy)-এর ভঙ্গি পাওয়া যাচ্ছে ১ ও ২ নং উদাহরণে। একই ভঙ্গি মিলছে ৫, ১৪ সংখ্যক উদাহরণে।

'রে' বিভক্তি প্রয়োগের বহুমাত্রিক সিদ্ধি লক্ষ করা গেছে বেশ কয়েকটি উদাহরণে। কি কারণে অর্থে 'কিসেরে' প্রয়োগ (৩নং ও ৭নং উদাহরণ) পশ্য। এসব ক্ষেত্রে কাকু বা কণ্ঠস্বরের উচ্চাবচতা কবি কামনা করেন। ১৬ ও ১৭ নং উদাহরণে তেমনি কাকু বা কণ্ঠস্বরের উচ্চাবচতা আপেক্ষিত। কণ্ঠস্বরের উচ্চাবচতা গায়েনদের অনুশীলন-সাপেক্ষ গুণ। মধ্যযুগের কাব্য উপস্থাপনা (performance)-র সঙ্গে নিবিড়ভাবে সংশ্লিষ্ট।

বাস ধাতুর আধুনিক প্রয়োগ ভালোবাসা শব্দে ; রাঢ়ী উপভাষায় অন্য কিছু ক্রিয়ারূপ লক্ষ করা গেছে— ৬৭নং উদাহরণে ভয় পাওয়ার স্থলে 'ভয়বাসা' ব্যবহৃত। এই রীতি আরও দেখা গেছে মধ্যযুগের বহু কাব্যে।

ব্যঞ্জনা-গর্ভ গতিশীল রচনারীতির উদাহরণ প্রচুর। ৬০ নং উদাহরণে এক-আধটি শব্দ আড়ালে আছে— পাঠককে ভেবে নিতে হয়—

'এতেক বৈভব হৈল (কিভাবে, কখন, কোন প্রক্রিয়ায়) কহত কারণ'

অনুরূপে ৪৯ নং উদাহরণের রূপ হতে পারত :

'আজি (যদি) রক্ষা পাও তবে (বুঝে নাও তুমি) ভাগিলে শমন।'

৫৪নং উদাহরণের বিশ্লিষ্ট রূপ—

(মনে হয় যেন) 'চিরদিন হইল পাটনে।'

বিপ্রদাস এখানে সংহতি, মিতভাষণ ও গতিশীলতাকে আয়ত্ত করতে চেয়েছেন। মধ্যযুগের পুনরাবর্তনমূলক বহুভাষণের পল্লবগ্রাহিতা আর অতিকথনের ভঙ্গি সর্বস্বতার মাঝখানে বিপ্রদাসের ভাষা ব্যবহারের ঐশ্বর্য এখানে সপ্রতিভ, সেগুলি যথার্থ মনি মানিক্যের মতো ঝলমল করে উঠেছে।

নঙর্থক ক্রিয়াপদ আধুনিক বাংলায় যেমন ব্যবহৃত হয়— বিপ্রদাস তেমন ব্যবহার করেননি। তাঁর প্রয়োগগুলি উত্তরবঙ্গ ও রাঢ়ের উপভাষার ভঙ্গি স্মরণ করায়। নঙর্থক অব্যয়টি পূর্বে বসিয়ে ক্রিয়ার সঙ্গে সন্ধি করে প্রয়োগ এই দুই উপভাষায় আছে—বাংলার মান্য-চলিতে নেই। বিপ্রদাসের রচনা যে প্রাচীন এখানে তার প্রমাণ বিদ্যমান। নহিল (না হইল), নহিবেন (না হইবেন), নহো (না হও), নহিবা (না হইবা), নহিয় (না হইও) প্রভৃতি প্রয়োগের উদাহরণ উত্থাপন করেছি।

আছ ধাতুর প্রয়োগ মধ্যযুগের নিজস্ব ভঙ্গিতে করেছেন বিপ্রদাস। 'আছুক অন্যের কাজ' বা 'আছুক সিদ্ধের কাজ'.....প্রভৃতি বাক্যাংশের প্রয়োগটি বাংলা ভাষার একান্ত নিজস্ব বৈশিষ্ট্য।

না যায়— ক্রিয়াপদের প্রয়োগ পুরোন দিনের নঙর্থক শব্দ প্রয়োগের মতোই। এর মাধ্যমে 'খণ্ডন না যায়' বা 'না যায় খণ্ডন', 'বুঝন না যায়' প্রভৃতি প্রয়োগ করেছেন কবি।

হয় নয়, হয়ে নহে প্রভৃতি শব্দবন্ধযুক্ত বাংলার নিজস্ব ভঙ্গিতে কিছু বাক্য লিখেছেন বিপ্রদাস। এসবই ইংরেজি ভাষার প্রভাবে গড়ে ওঠা আজকের বাংলা বাক্যগঠন রীতির তুলনায় স্বতন্ত্র। বিপ্রদাসের ভাষা কতকাংশে ফারসি ভাষার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে দেখতে পেয়েছি। হাসনহাটির প্রসঙ্গ নিয়ে যখন লিখেছেন তিনি। তেমন একটি বাক্য :

হায়াত নবাত ছুটী গড়াগড়ি ভূমে লুটী
তোবা তোবা সঙ্করে সত্বর। (৪. ১৭. ৩৬৯)

কিংবা : শুনিয়া এতেক হকিকত। (৪. ২০. ৪১৯)

তবে শব্দের ক্ষেত্রেই এই প্রভাব সীমাবদ্ধ রয়েছে। ভাষার নিবিড় নির্মিতি বা আন্তরিক লক্ষণে ফারসির তেমন কোন গুরুতর প্রভাব দেখতে পাই নি।

কিছু প্রবাদ প্রবচন প্রৌঢ়োক্তির পরিচয় পাচ্ছি বিপ্রদাসের রচনায়। কয়েকটি উল্লেখ করি। এগুলি-র মধ্যে কিছু কিছু কবির নিজস্ব নির্মাণ হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

১. দুষ্টের সংহতি দুষ্ট হইনু আসিয়া। (২. ৪. ৭১)
২. অতিশয় লোভে হৈল সকলি বিনাশ। (২. ৪. ৭৩)
৩. শিষ্যবর্গ দেখ যত সম্পদ সময়।
আপদ পড়িলে সহি কেহ কারো নয়॥ (৬. ১২. ২২১)
৪. রাজস্থানে পুরাণে শুনিল যথা তথা।
কদাচিত না কহিবে স্ত্রীরে মর্মকথা॥ (৬. ১২. ২৪০)
৫. ললাটে লিখন ছিল সেইসব সার হইল
ভাবিলে চিন্তিলে কিবা হয়। (১২. ৫৭. ২০৭)
৬. কোথায় সম্ভবে বাদ দেব আর নরে (৭. ১০. ১৩৬)

এ সমস্তের মধ্যে দিয়ে মধ্যযুগের একজন কবির নির্মাণধর্মী প্রতিভা ও ঐতিহ্য অনুসরণের পরিচয় পাওয়া যায়।

অলঙ্কৃত ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিপ্রদাসের চৈতন্য বিশেষভাবে কাজ করেছে। তাঁর রচনায় দেশজ শব্দ ও উপাদান ব্যবহার করা অলঙ্কার যেমন আছে, তেমনি আছে সংস্কৃত সাহিত্য-অনুগত অলঙ্কার। এসব থেকে নিশ্চয় বলতে পারি, কবিত্বের শক্তিতে বিপ্রদাস যথেষ্ট কৃতিত্বের অধিকারী ছিলেন। তাঁর রচনার মধ্য থেকে প্রচলিত অলঙ্কারগুলির একটি তালিকা প্রস্তুত করছি:

১. দণ্ডাঘাতে বিদারয়ে প্রবল দুরন্ত।
রুধিরে সুরঙ্গ অঙ্গ সিন্দুরে শোভন্ত॥ (১. ১. ৬)
২. অলকাবলি চিত্রনাগ হইল শোভন।
যেন নীল মেঘেতে উদয় তারাগণ॥ (১. ৩. ৩৩)
৩. জীবন্যাস করিয়া মনসা থুইল নাম।
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন দেখি অনুপাম॥ (১. ১৮)
৪. ব্রহ্মাণ্ড ভেদিল যেন শেলের প্রহারে।
লাঙ্গল সিবাল যেন নখেতে বিদারে॥ (২. ৭. ১২৩)
৫. সূর্যের কিরণ যেন দীপ্ত সেই পুরী। (৩. ৮. ৭৬)
৬. তথি যেন আচম্বিতে কুলিশ পড়িল মাথে। (৩. ৭)
৭. কোমল নবনী হেন বজ্র নাহি ফুটে। (৩. ৯. ১০৪)

৮. মহাবীর্য যেন সূর্য তপে তেজময়।
বৃহস্পতি তুল্য অতি বিদ্যার বিজয়॥ (৪. ৯. ১৬৫)
৯. কুবের সমান ধনরত্ন মণিময় (৪. ১০. ২০৬)
১০. পুত্রগণ মদন জিনিয়া রূপবান (৪. ১০. ২১১)
১১. মহা পরাক্রম যেন যমের দোসর।
ধরিয়া গিলিতে পারে পর্বত শিখর॥ (৪. ২২. ৪৬২)
১২. মহাতেজে দীপ্ত কৈল যেন মেঘে গরজিল
পঞ্চ সূর্য যেমন গগনে। (৪. ৮. ৪৫)
১৩. সর্ব নামে নাগেতে মাথার সিতিপাটি।
নীল মেঘ তটে যেন বিজুলি-দিপতি॥ (১. ৩)
১৪. কালচিতি নাগে দেবীর ভুরুযুগ সাজে।
কালিন্দীর হস্তী যেন স্বর্ণগিরি মাঝে॥ (১. ৩)
১৫. কালি-নাগিনী হৈল নয়নে কজ্জল।
কুবলয় দলে যেন খঞ্জন যুগল॥ (১.৩)
১৬. সীমন্তে উজ্জ্বল ছটা সুচারু সিন্দুর ফোঁটা
যেন রবি বালক সময়। (৬. ৪. ৮৯)
১৭. পারিজাত জিনি আভা অধর সুরঙ্গ শোভা
মুক্তা জিনি দশন উজ্জ্বল। (৬. ৪. ৯১)
১৮. কালনিদ্রা যায় সঙ্ক নিশ্চিন্ত শরীরে।
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন উদয় শিখরে॥ (৬. ১৪. ২৫৯)
১৯. ব্যগ্র হইয়া চুম্ব দেই বদন মণ্ডল।
মধুযুত ফুলে যেন ভ্রমে অলিকুল॥ (৭. ১. ৪)
২০. হের তব হস্তপদ বিথানে লোটায়।
সূর্যের আতপ যেন মৃণাল শুখায়॥ (৭. ১. ৯)
২১. প্রসারিয়া দুই বাহু পুত্র লৈল কোলে।
ঝাঁপিলেক রাহু যেন চন্দ্রের মণ্ডলে॥ (৭. ১০. ১৪৯)
২২. তবে পদ্মা পদ্মাসনে বসিল তুরিতে। (৭. ১০. ১৫৭)
২৩. কান্দে কান্দে সনকা হইয়া ব্যাকুলী।
কে হরিয়া লৈল পুত্র সোনার পুথলি॥
একে কালে কোন পাপে হৈল যম দণ্ড।
স্বর্ণগিরি ভাঙ্গি যেন হৈল খণ্ড খণ্ড॥ (৮. ৭. ১৪৩-৪৪)
২৪. তুমি তো পাষাণ হিয়া কঠিন দারুণ। (১০. ৮)
২৫. দিব্যাঙ্গনা বেষ্টিত সনকা রামা মাঝে।
তারায় বেষ্টিত যেন পূর্ণচন্দ্র সাজে॥ (১৩. ১১. ৫৭)
২৬. ভাবি দুঃখ অপমান শরীরে বিদরে।
কমল শুখায় যেন চন্দ্রের শিশিরে॥ (১১. ১১. ১৫৮)
২৭. মকর কুণ্ডল কর্ণে ঝলমল
জ্বলন্ত আগুনি সম। (৬. ৯. ১৬০)
২৮. শতেক শিষ্যগণ মদন রূপে যেন
বদন পূর্ণ শশধর। (৬. ৬. ১১৫)

২৯. কুসুম টোপর শিরে শোভে দিব্যজ্যোতি।
হেমগিরি শৃঙ্গে যেন বিজুলি দিপতি॥ (১২. ৮. ৭৬)

৩০. ললাটেতে মৃগমদ নয়ানে কজ্জল।
মধু লোভে ভৃঙ্গ যেন কনক কমল॥ (১২. ৮. ৭৮)

৩১. চাঁচর চিকুর করবি সুন্দর
তাহে মালতীর মালা।
নীল গিরিবরে বিচ্ছেদ করে
যেন শশী ষোলকলা॥ (১২. ১৬. ২১১)

৩২. উজ্জ্বলিত ভালে সিন্দুর মণ্ডলে
তাথে চন্দনের ভাতি।
এক ঠামে বসি যেন রবিশশী
দেখি মনোহর অতি॥ (১২. ১৬. ২১২)

৩৩. লক্ষ লক্ষ দিয়টি চৌদিকে জ্যোতির্ময়।
নাশে ত তিমির যেন সূর্যের উদয়॥ (১২. ২০. ২৬৪)

৩৪. সহজে সুন্দরী গোরি পট্ট চীর পরি।
প্রভাতের সূর্য যেন ঢাকে হেমগিরি॥ (১২. ২১. ২৭৬)

৩৫. সুরঙ্গ অধর তব অম্বু পাড়িত সব
ঈষৎ হাসিতে রস খসে।
অই পূর্ণ সুধা সিন্ধু শরৎ পূর্ণিমা ইন্দু
নিরবধি অমিয়া বরিষে॥ (১২. ৩৭. ৩৪৭)

৩৬. লখাই বেহুলা শোভে যেন রতি কামদেবে
অঙ্গে অঙ্গে নানা অলঙ্কাব।
নানা রত্ন মণিময় যেন স্বর্গ গিরিচয়
জুতি যেন বিজুলি ঝঙ্কার॥ (১২. ২৯. ৩৭৯)

৩৭. ছলছল যুগল নয়ন নীর ঝরে।
অমিয়া গলিত যেন পূর্ণ শশধরে॥ (১২. ৩৮. ৪৮৩)

৩৮. দেখিয়া পদ্মার রূপ মূর্ছিত হইয়া।
নিরক্ষিয়া একমনে দেখে দাঁড়াইয়া॥ (৬. ১০. ১৬৭)

৩৯. কামধনু যেন ভুরু যুগ তেন
কটাক্ষে বিন্ধিল শর। (৬. ১১. ১৯৫)

৪০. ঈষৎ হাসিলে যেন বিজলি প্রকাশে। (৫. ১৩. ২৮২)

৪১. দুই ওঝা বৈসে যেন অগ্নি অবতার। (৬. ১. ৩৩)

৪২. অতি খিনি মাঝাখানি পরিয়া বিচিত্রখুনি
চলিতে হেলিয়া পড়ে বায়। (৬. ৪. ৯৩)

৪৩. ছলিয়া পিরিতি রতি দাম্পত্য রমণ।
যেন রতি কামদেব মিলিল দুজন॥ (৬. ১৪. ২৫২)

৪৪. মুখে দম্ভ আরম্ভ অন্তরে মহাভয়। (৪. ২৩. ৪৮৭)

৪৫. চরণে পবন বৈসে শৃঙ্গে বৈসে যম।
ত্রিভুবনে বীর নাহি হয় তার সম॥ (২. ৫. ১০৩)

৪৬. কোপে যেন হৈল কানানল। (৪. ২০. ৪১৫)

৪৭. মুনি মন-মোহন দুহে করে কুতূহলে। (৫. ১৪. ২৯৫)

৪৮. কি কহিব তার রূপ মোহে জগজন। (১১. ৫. ৮২)

৪৯. অনিমিখ দুই আঁখি ডুমুনি নেহালি।
লিখিয়াছে পটে যেন চিত্রের পুথলি॥ (১৩. ৪. ৩১)

৫০. সনকার ছয় বধূ অতি মহা স্নেহ ভাবে।
হাথ বাড়াইয়া স্বর্গ পায় যেন এবে॥
আজন্ম অন্ধের হইল নয়ন নির্মল।
বদ্ধ সরোবর যেন পূর্ণ হইল জল॥
যেমন শুখান কাষ্ঠে হইল মুঞ্জরি।
ময়ূরের শিখি যেন পুচ্ছে নৃত্য করি॥ (১৩. ৬. ৬১-৬৩)

এই উপমাগুলি সুপরিচিত, কবিপ্রসিদ্ধ তুলনাবাচক শব্দ ও উপমান উপমেয়কে অবলম্বন করেছে। এগুলির প্রয়োগ এক অর্থে চিরায়ত। বাংলা ভাষার মধ্যযুগের কবিরা এই রকম ভাষাশৈলী পেয়েছেন আরও প্রাচীন ঐতিহ্য থেকে। যাকে বলে ঐতিহ্য সৃজন, বিপ্রদাস তা করতে পারেননি— তিনি ঐতিহ্যকে মোটামুটি অবলম্বন করেছেন।

সামান্য কিছু উপমার ক্ষেত্রে কবি স্বাধীনতা গ্রহণ করেছেন। তিনি বাংলার চেনা প্রাকৃতিক পরিবেশ, ফারসি ভাষার শব্দ দিয়ে তৈরি চিত্র নির্মাণ এবং সুপরিচিত উপমার ক্ষেত্রে নিজস্ব প্রয়োগ নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। তেমনি কতকগুলি অলঙ্কার উদ্ধার করছি।

১. চলিল হরিষ ভাবে হাথে যেন স্বর্গলাভে
অন্ধ যেন নয়ন প্রসারে। (১২. ৪৬. ৬২০)

২. অমল কমল দল জুয়া মুখমণ্ডল
সুবাসিত আমিয়া রসাল। (১২. ২৭. ৩৪৫)

৩. উচ্চস্বরে কান্দে রায় আখি জল ঝুরে।
কালিয়া কমল যেন কনক শিখরে॥ (১২. ১৮. ২৪০)

৪. গায় খড়ি উড়ে তার পাকা দাড়ি চুল।
অভিনব শোভা করে বৃক্ষে যেন ভুল॥ (১১. ১. ১২)

৫. পাকলায় লোচন কঠোর যেন ভুল॥ (১০. ১৩. ২১২)

৬. গণ্ড বেদনাতে যেন মুদ্গরের ঘা।
পুত্র পুত্র বলিয়া অধিক বাড়ে রা॥ (৮. ৮. ১৬৫)

৭. কামের কামান ভুক নয়ানে অঞ্জন। (৫. ১৩. ২৭৫)

৮. ভুরু যুগ শোভে জিনি কামের ধনুক। (৫. ১৩. ২৭১)

৯. আমি শূলপানি তোরে বিনয় আমার।
ভজিয়া আমারে কর কাম সিন্ধুপার॥ (১. ১৩)

১০. সঘনে ফোফায় কোপে কাঁপে মনোরথ।
প্রবল পবন যেন বহে ঘন বাত॥ (২. ৫. ৯৯)

১১. বিষ জ্বালে ধড়ফড় নাগের কামড়ে।
যেন পাঁডু কুসণ্ডিকা চালে হৈতে পড়ে॥ (৪. ২৪. ৫৪১)

১২. হাত পাঁচ কাঁচাখানি কাঁকতলে থুয়্যা। (৩. ৮. ৭৬)

১৩. খোলা ছেই হেন যেন ভাসিয়া বেড়ায়। (৪. ২৪. ৫৩৭)

১৪. পাকাতাল হেন শীঘ্র গাছে হৈতে পড়ে। (৪. ২৪. ৫৩৯)

১৫. দাবানলে দহে যেন অতিশুষ্ক বন।
খেদাড়িয়া সব সৈন্য করয়ে নিধন॥ (৪. ২৪. ৫৪৪)

১৬. ধারা শ্রাবণের জল ঝরে দুই আখি। (৫. ১. ১৩)

১৭. ক্রোধিত হইল মুনি আনল সমান। (২. ১০)

১৮. পলাইয়া শৃগাল প্রায় যাও কেন দূরে। (২. ৭. ১২১)
১৯. এক এক মেলি হৈয়া জলক্রীড়া করে।
ফুটিল কমল যেন সরোবর নীরে॥ (৮. ৫. ১০৪)
২০. শরীর অবশ তোর বদনমণ্ডল।
নিরহতো কূলে যেন ঘুমায় কমল॥ (১২. ৩৪. ৪২৮)
২১. চণ্ডিকারে মনসা বিনয় বলে যত।
জ্বরপিত্ত মুখে যেন চিনি লাগে তিতো॥ (১. ২২. ৩২৯)

এই উপমাগুলি কোন না কোন ভাবে অভিনবত্বের পরিচয় রেখেছে। ১৯, ১৫, ৯, ৩, ২ ও ১ নং অলঙ্কার প্রচলিত উপমানকে অবলম্বন করলেও প্রয়োগ নৈপুণ্য যথেষ্ট। চাঁদ সদাগরের সঙ্গে ভূত ('ভুল')-এর তুলনা কিছুটা আকস্মিক ও হাস্যরসের আয়োজন বলে মনে হয়। ২০ সংখ্যক অলঙ্কারটির অর্থ ভেদ করা কঠিন ; খুব সম্ভবত জলশেষ কাদার শুরু এমন জায়গাকে 'নিরহতো কূল' ভাবা হয়েছে। খোলা ছেই-এর মতো ভেসে বেড়ানো—পাকা তালের মতো পড়া, বিশেষত জ্বরপিত্তের সময় চিনি যেমন তিতো লাগে তার সঙ্গে মনসার বিনয় বচনের তুলনা— লোকায়ত সাধারণের চিন্তন প্রণালীর কথা স্মরণ করায়। বিপ্রদাসের রচনারীতির সার্থকতার আস্বাদ এখানে পাওয়া যায়।

॥ ৪১ ॥

সুকুমার সেন সম্পাদিত পাঠের সঙ্গে বর্তমান পাঠের তুলনা

বিপ্রদাস পিপিলাই-এর প্রথম সংস্করণ সুকুমার সেনের সমর্থ সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। দীর্ঘ দিন পর এই গ্রন্থের সম্পাদনা প্রকাশ করা হল। পুঁথি-নির্ভর এই সংস্করণের সঙ্গে ড. সুকুমার সেনের সম্পাদনার তুলনায় বেশ কিছু অভিনবত্ব আছে। আমরা অষ্টমঙ্গলা সহ ১৩টি পালার ২৫০টি গানের ৫২৪৪টি মিলান্তিক পয়ার বা ত্রিপদীর জোড়া-পংক্তি পেয়েছি। পালাগান ও জোড়া-পংক্তির সংখ্যা নিম্নলিখিত সারণীটিতে উত্থাপন করছি :

পালা	গান	পয়ার বা ত্রিপদীর জোড়া
১	২৩	৩৫০
২	১৫	২৭০
৩	১৭	২২৫
৪	২৪	৫৪৯
৫	১৪	৩২২
৬	১৮	৩৪৬
৭	১৩	২০০
৮	২০	৩২২
৯	৯	১৩৫
১০	২০	৩৪৯
১১	১২	১৮৮
১২	৫২	৭২৮
১৩	১৩	২৬০
অষ্টমঙ্গলা সহ	১৩	২৬০
১৩	২৫০	৪২৪৪

সুকুমার সেন সম্পাদিত *মনসাবিজয়*-এর তুলনায় আমাদের পাঠ সামান্য বড়।

সুকুমারবাবুর সম্পাদিত বইটিতে পাঠান্তর প্রদত্ত হয়েছে 'Variant Readings' অংশে। আমরা গানগুলির নীচে পাঠান্তর প্রদান করেছি। ফলে পাঠক মূলের সঙ্গে অন্যান্য পাঠের স্বাদ সহজেই পাবেন— দৃষ্টি বিক্ষিপ্ত হবার সম্ভাবনা থাকছে না। সুকুমার সেনের পাঠের তুলনায় আমাদের পাঠের আর একটি প্রধান পার্থক্য বানানরীতিতে। তৎসম শব্দের বানান একালের গৃহীত বানান রক্ষা করার পক্ষপাতী আমরা। যেন স্থলে 'জেন', যখন স্থলে 'জখন' লিখলে মধ্যযুগের কবির কোন অসুবিধা হত না। কারণ তিনি উচ্চারণ করে পড়তেন। (তিনি বা তার প্রতিনিধি কোন গায়েন বা তার দল)—শ্রোতারা শুনতেন। আজ সেই রকম হচ্ছে না। সুতরাং বানান পুথির মতো রাখার যুক্তি দেখছি না। কিছু কিছু ক্ষেত্রে সুকুমারবাবুর গৃহীত পাঠে অমনোযোগ, গোটা ব্যাপারটিকে না দেখার ত্রুটি লক্ষ করে আমাদের মনে হয় এসব ক্ষেত্রে তিনি অন্য কারো সাহায্য গ্রহণ করেছেন। এসিয়াটিক সোসাইটির সংস্করণের Acknowledgement অংশে ড. সেন লিখেছেন : 'The publication of Vipradas's Manasamangala (then known in three fragmentary manuscript copies) was contemplated as early as 1938, and Sudhir Kumar Mukherjee one of our students that had just taken his M. A. degree in Comparative Philology offered me help and copied one of the manuscripts. The early death of that very promising carrer put a stop to the project. Now when at last the entire work is published my thoughts go to the memory of that brilliant young friend of mine.'

আমাদের অনুমান ঐ সুধীর কুমার মুখোপাধ্যায় বা অন্য কারো হস্তাবলেপ আছে এই সমস্ত পাঠের ক্ষেত্রে। সামান্য তুলনা করলেই আমাদের মন্তব্যের সারবত্তা প্রমাণিত হবে। আমরা তুলনামূলক পাঠসারণী প্রস্তাব করলাম।

সুকুমার সেনের পাঠ	বর্তমান সংস্করণের পাঠ	মন্তব্য
খোপার পঞ্চফুল আভিলা চপলা	খোপার পদ্মফুল (১.৩.৩২) অভিন্ন চপলা (১.৩.৩৫)	সুকুমার সেন-এর *An Etymological Dictionary of Bengali*-তে আভিলা শব্দের অর্থ নির্ণীত: 'extreme difficulty, danger, difficult task' (৫০ পৃ.)। এখানে অর্থ সঙ্গতি হয় না। দধির সঙ্গে এর কোন সঙ্গতি নেই।
দধির কারণে নাম ...	তথির কারণে নাম... (১.৪.৬৫)	
ধর্মের বন্ধন দেখি গঙ্গা ধবলমুখী	ধর্মের বদন দেখি... (১.৮.১১৯)	
বিবাদ ভাবিয়া পক্ষ কাঁদে	বিবাদ ভাবিয়া... (১.১৭.২২৪)	

সুকুমার সেনের পাঠ	বর্তমান সংস্করণের পাঠ	মন্তব্য
প্রভাতে ত্রিদশ রায়/ প্রবেশিলা কালিদহে... আবার বিনতা বৈল	প্রভাতে ত্রিদশ রায়/প্রবেশিলা কালিদায় ... (১.১৯.২৫৫) আমার বিনতা বৈল (১.২০.২৬৫)	মিলের অনুরোধে আমাদের পাঠটি সঙ্গত। আগে আছে 'তোমার কদ্রু'— সুতরাং আমাদের পাঠ সঙ্গতিপূর্ণ।
যতনে করিব সত্ত	যতনে করিব সত্য (১.২০.২৯০)	
পরম সন্তা হয় ভাবেন আক্ষেমা	পরম সন্তাপ হর ভাবেন অক্ষেমা (১.২২.৩১৫)	
সারস বক বঙ্ক	সারস বক কঙ্ক (২.২.২৬)	'বঙ্ক' যদি 'বক্ত' হয় তাহলে অর্থহীন।
চণ্ডিকারে নিয়েজিল করিতে বন্ধনে	চণ্ডিকারে নিয়োজিল করিতে রন্ধনে (২.৩.৪০)	
কপিল দুর্জয় ব্যাঘ্র...	কুপিল দুর্জয় ব্যাঘ্র (২.৭.১১৯)	
বিষম বিক্রম ব্যাঘ্র...	বৃষের বিক্রমে ব্যাঘ্র বল নাহি টুটে (২.৭.১২৬)	
ক্ষীরোদ ভিতরে ...	ক্ষীরোদ সমুদ্রে দেবী থাকিল লুকায়্যা (২.১২.২১২)	
ঘোটা দড়ি হৈল পশুপতি	খোটা গড়ি হৈল পশুপতি (২.১৩.২২৫)	পশুপতি ঘোটা দড়ি হবেন কি করে? মপুনের খোটা দড়ি হলে মোটেই অর্থচ্যুতি হয় না।
হরি হরি শুনিয়া বাপের মৃত বাণী	হরি হরি শুনিয়া বাপের মৃত্যু বাণী (৩.৭.৬৫)	মৃত্যু সংবাদ অর্থে মৃত্যুবাণী প্রযুক্ত।
বিচিত্র খোপা বান্ধি/কুসুম গন্ধ আদি...	বিচিত্র খোপা বান্ধি/কুঙ্কুম গন্ধ আনি/সুগন্ধি পুষ্প আরোপিয়া (৩.১৪.১৭৬)	পরে পুষ্প থাকায় আগে কুসুম না থাকাই সম্ভব।
মনসা নেতো দুষ্ট মতি	প্রসবে শুভক্ষণে/পুত্রের দরশনে /মনসা নেতো দুষ্ট মতি (৩.১৭.২২৩)	পুত্র মুখ দেখে দষ্ট মতি হওয়া অসম্ভব।
পুত্র দ্বারা সর্পঘাতে...	পুত্রজায়া সর্পাঘাতে মৈল আশ্চমিত (৪.৫.৯৪)	পুত্র দারা হলেও হতে পারত, দ্বারা ভুল পাঠ
দৈব দেষে সৃষ্টি নাশো হব আশ্চম্বিত	দৈব দোষে সৃষ্টি নাশে হেরো আশ্চম্বিত (৪.৯.১৭৯)	
বিশ্বকর্মে দিল ধমে তরু	বিশ্বকর্মা দিন ধর্ম তরু (৪.৯.১৭৯)	
কুতূহলি সিদ্ধ সুলি দেহ মহাজ্ঞান...	কুতূহলি সিদ্ধ শূলি দেহ মহাজ্ঞান ... (৪.৯.২২১)	
অনুক্ষণ রাখে বলে সব শিশুগণ	অনুক্ষণ রাখে বুল সব শিশুগণ (৪.১২.২৪৫)	গোরু রাখে অর্থাৎ রক্ষা করে ; বুলে অর্থাৎ ঘুরে ফেরে।

সুকুমার সেনের পাঠ	বর্তমান সংস্করণের পাঠ	মন্তব্য
আনন্দে করিলা পান হৈয়া অধোমুখ	আনন্দে করিলা পান হৈয়া উৰ্ধ্বমুখ (৪.১৪.৩১৩)	সুকুমার সেনও উর্ধ্বমুখ পাঠ পেয়েছিলেন—পশ্য *Manasa Vijaya* ; 244 পৃ.। নাগ রূপে নন মনসাতো মানবী হয়ে রাখালদের মধ্যে গেছেন — অধোমুখে দুগ্ধপান কষ্টকল্পনা।
জালাল আলাল হরি ...	জালাল আলাল স্থরি (৪.১৭.৩৭২)	এখানে হরি/স্থরি—দুই পাঠই সম্ভব।
বিষের জ্বালায় সবে পড়িল চলিয়া	বিষের জ্বালায় সবে পড়িল ঢলিয়া (৪.১৮.৩৮৪)	সুকুমার বাবুর পাঠ বিভ্রান্তিকর।
পরিয়া বিচিত্র খনি...	পরিয়া বিচিত্র খুনি... (৬.৪.৯৩)	খুনি অর্থাৎ ক্ষৌম বস্ত্র
নিবা বা না নিবা এক বলহ বচন	নিবা কিনা নিবা দধি বলহ বচন (৬.১০.১৬৯)	দধি-বিক্রেত্রী মনসার সূত্রে আমাদের পাঠ অর্থ যুক্ত
খরস্রোতে সাভাইল দোহাড়ি ভিতরে	খরস্রোতে ভাসাইল দোহাড়ি ভিতরে (৮.১.৩২)	সাভাইল যতটা সক্রিয় (active) ততটা সক্রিয় নয় ভাসাইল ; এখানে দ্বিতীয় ক্রিয়াটি বেশি যোগ্য
অভিনব পশুপতি হৈলা পদ্মাবতী	অবিলম্বে পশুপতি হৈলা পদ্মাবতী (৮.৯.১৮৬)	
ধর্মখান বাহিয়া অজয় নদী পায়	ধর্ম খাল বাহিয়া অজয় নদী পায় (৯.২.১৬)	ধর্মখান ভুল পাঠ
জলেতে ভাসিয়া রাজা বল নাহি গায়	জলেতে ভাসিয়া রাজা বল নাহি পায় (১০.১১.১৭০)	
ঢেকা মারি খেদা লিয়া	ঢেকা মারি খেদালিলা (১০.১৩.২৩৮)	অসমাপিকা (খেদালিয়া) অপেক্ষা সমাপিকা (খেদালিলা) যোগ্য পাঠ
খড় বেলা আড়াইহালা আনিল কাটিয়া	খড় বেনা আড়াই হালা আনিল কাটিয়া (১১.১২.১৬৯)	খড় অর্থে বেনা সার্থক, বেলা অনর্থক
জুতে জুতে বলবন্ত	যূথে যূথে বলবন্ত (১২.১০.৯৬)	
দক্ষিণ পাশেতে তবে নিখিল বিস্তরে	দক্ষিণ পাশেতে তবে লিখিল বিস্তরে (১২.১৪.১৮২)	কাঁচুলির চিত্রে শিখিল চরাচর আঁকছেন—এমন হওয়া অসম্ভব নয়, তবে লিখিল পাঠই অধিকতর সঙ্গত।
অমল কমলদল তুয়া মুখ মণ্ডল সুভাষিত অমিয়া রসাল	অমল কমল দল তুয়া মুখ মন্ডল. সুবাসিত অমিয়া রসাল (১২.২৭.৩৪৫)	'সুভাষিত' খুব সঙ্গত পাঠ নয়।

সুকুমার সেনের পাঠ	বর্তমান সংস্করণের পাঠ	মন্তব্য
আছে ত বিশেষ কিছু কালিনি সাখিনি	আছে ত বিশেষ কিছু কালি নিশা খিনি (১২.২৮.৩৫০)	সংকীর্ণ কালরাত্রি-অর্থে আমাদের পাঠ অনেক সঙ্গত।
নিরহতো কূলে(?) যেন ঘুমায় কমল	নির হতো কূলে যেন ঘুমায় (১২.৩৪.৪২৮)	জিজ্ঞাসা-চিহ্নের দরকার ছিল না; পশ্য : টীকা।.
কিছু ধন দিয়া করি দিল তার দু:খে	কিছু ধন দিয়া করি দিল তোর দুঃখে (১২.৪৪.৫৫২)	বেহুলার প্রত্যক্ষ উক্তি এখানে—সুতরাং তোর অনেক ইঙ্গিতপূর্ণ পাঠ।
উপমা দিবার নাহি প্রবীণ কোরও .	উপমা দিবার নাহি প্রবীণ কোরন্ড (১২.৪৪.৫৫৮)	খুব সম্ভব ছাপার ভুল। কারণ সুকুমার সেন 'কোরণ্ড' শব্দের অর্থ দিয়েছেন। পশ/ : 318 পৃ.

আপাতত সারণীটি দেখলে পাঠক আমাদের বক্তব্য স্বীকার করবেন। সুকুমার সেনের সম্পাদিত গ্রন্থটির বিভাজন নিম্নরূপ :

১. Introduction : i-xliii অর্থাৎ ৪৫ পৃ.
২. Test : 1-235 অর্থাৎ ২৩৫ পৃ.
৩. Variant Readings : 236-251 অর্থাৎ ১৬ পৃ.
৪. The Poem Sum marised : 253-291 অর্থাৎ ৩৯ পৃ.
৫. Notes : 293-310 অর্থাৎ ১৮ পৃ.
৬. Glossary : 311-350 অর্থাৎ ৪০ পৃ.
৭. Index : 351-353 অর্থাৎ ৪ পৃ.

সর্বমোট : ৩৯৭ পৃ.

আমরা Text ও Variant Readings-এর জন্য ভিন্ন অংশে রাখি নি। আমাদের পাঠ ও পাঠান্তর একসঙ্গে উপস্থিত করা হয়েছে। পাঠান্তরের অক্ষরের মাপ (font size) একটু ছোট রাখা হয়েছে, পাঠক সহজেই এর সঙ্গে মূল পাঠ মিলিয়ে নিতে পারবেন। পাঠান্তর দেবার একটি নির্দিষ্ট রীতি আমাদের অবলম্বিত সম্পাদিত পাঠে রাখা হল—যে শব্দটির পাঠান্তর দেওয়া হবে তার আগে ও পরে সংখ্যা চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে—গানের নিচে সংখ্যাটি দেখে সেখানে উদ্দিষ্ট পাঠান্তর লেখা হয়েছে—পাশে বন্ধনী ভুক্ত হয়েছে উৎস। অপ্রচলিত শব্দের সূচি, প্রয়োজনে প্রয়োগ (উৎস সহ—প্রথমে পালা, তারপর গান ও পংক্তির সংখ্যা—) ও অর্থ প্রদান করা হয়েছে।

এসো-৩ সপ্তম পঙক্তিতে লেখা একপদ নেই

বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের

মনসামঙ্গল

সম্পাদিত পাঠ

এসিয়াটিক সোসাইটির 'জি-৩৫৩০' সংখ্যক পুথির একটি পৃষ্ঠা। আমরা এটিকে এসো-১ হিসাবে চিহ্নিত করেছি।

আমরা এসিয়াটিক সোসাইটির এই পুথিটিকে এসো-২ হিসাবে চিহ্নিত করেছি। চতুর্থ পংক্তিতে লিপিকর লোচন নাপিত নামটি পাওয়া গেছে।

প্রথম পালা

১

[পয়ার]

খর্ব স্থূল কলেবর গজেন্দ্র বদন। লম্বোদর সুন্দর মূষক বাহন।।
ত্রিনয়ন চতুর্ভুজ সেবক বৎসল। কুন্দ-ইন্দু রুচি এক দশন উজ্জ্বল।।
শৈল সুতাসুত গণপতিমহং বন্দে। সর্ব কার্য সিদ্ধি বরপ্রদ মহানন্দে।।
দন্ত কুম্ভ গণ্ড মুণ্ড মদ বিগলন্ত। ভ্রমরা নিকর বর লুব্ধ-পুষ্পবন্ত।।
মদে মত্ত হেম অঙ্গ মদে মত্ত বান। শ্রুতিমূলে নিবাবণ সুললিত গান।। ৫
দণ্ডাঘাতে বিদারয়ে প্রবল দুরন্ত। রুধিরে সুরঙ্গ অঙ্গ সিন্দুরে শোভন্ত।।
গ্রীবেন্দক দিব্যজ্যোতি গজ মুকুতার হার। রাতুল আঁচলে যেন বিজুলি-সঞ্চার।।
বেদেন্ত করেন ভীষ্ম সর্ব সিদ্ধি অন্ত। বিঘ্ন বিনাশন হেতু ত্রৈলোক্য ভজন্ড।।
গানে বিপ্রদাস ভক্তি ভজন্তি হেরম্বে। বিঘ্ন নাশ কর দেব সঙ্গীত আরম্ভে।।

২

[পয়ার]

দেব নিরঞ্জন বন্দো ত্রিদেবের স্রষ্টা। তাহা কেহ নাহি জানে সেই সব দ্রষ্টা।। ১০
প্রণমহো ব্রহ্মা দেব পিতামহ ধাতা। শ্রুতি মূলে সুপ্রভব তিন লোকে স্থাতা।।
প্রণমহো নারায়ণ ত্রৈলোক্য পালন। মুখ্য মোক্ষদাতা দুষ্ট দৈত্য নিবারণ।।
গরুড়ারূঢ় শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম হাতে। লক্ষ্মী সরস্বতী বন্দো তার দুই ভিতে।।
পরম-ভকতি বন্দো দেব মহাদেবে। সুরাসুর নর যাহার পদ সেবে।।
বৃষারূঢ় অর্ধচন্দ্র শিরে ধরে গঙ্গ। ত্রিলোচন শূলপানি প্রথমে সুসঙ্গ।। ১৫
বন্দো মাহেশ্বরীরে ত্রৈলোক্যে করে পূজা। মৃগরাজ ধ্বজা তেজা অষ্টাদশ ভুজা।।
ঋদ্ধি সিদ্ধি নিধি বরপ্রদা সেই সার। পারিষদগণ বন্দো কার্তিক কুমার।।
ডাকিনী জুগিনী বন্দো মোর ধর্ম মা। মোর অঙ্গে কোন কালে না করিহ ঘা।।
ইন্দ্র অগ্নি যম নৈরি বরুণ আনল। কুবের ঈশান আর বন্দো দিগপাল।।
রবি শশী ভৌম বুধ গুরু শুক্র শনি। রাহু কেতু নবগ্রহ বন্দো পুটপাণি।। ২০
নারদাদি ঋষি বন্দো সিদ্ধ বিদ্যাধর। নানা স্থানে নানা মূর্তি বন্দো জোড় কর।।
জরৎকার মুনি বন্দো তপো তেজময়। আস্তিক কুমার বন্দো পদ্মার তনয়।।
নেতোর চরণ বন্দো পদ্মার মন্ত্রিণী। সর্বনাগ গণ বন্দো সকল নাগিনী।।
[১]সাগরের পুত্রগণ অন্যাসন অস্য। কপিলার শাপে তারা হইয়াছিল ভস্ম।।
(ভগিরথ) ভাগীরথী আনিয়া অবনী। পরশে পরম পদ পাইল তখনি।। ২৫
ত্রিভুবনে কেনা জানে গঙ্গার মহিমা। বিধি বিষ্ণু হর আদি জানে মহিমা।।
কিঞ্চিত মহিমা বুঝি জানে গঙ্গাধর। অদ্যবধি আছে গঙ্গা মস্তক উপর।।[১]
দ্বিজ গুরু [২]প্রণমহো[২] জনক জননী। যাহার প্রসাদে ভোগ সম্ভবে অবনী।।
ভাবক সেবক বর দেহ বিষহরি। দ্বিজ বিপ্রদাস বলে কর জোড় করি।।

১ অংশটি অতিরিক্ত ; সুকুমার সেন প্রদত্ত Variant Readings-এ গৃহীত। এর শুরুতে আছে 'শ্রীশ্রী কৃষ্ণ। ভকতি মুকতি হয় জাহার সঙ্গে।' বন্ধনীভুক্ত শব্দগুলি ছাড় পড়েছে। এশিয়াটিক সোসাইটি-১ নং পুথি ; জি ৩৫৩০ ; ২/ক পত্র। এখন থেকে এসো/১ ; ২ প্রণমহ

৩

[পয়ার]

জয় জয় বিষহরি বিষধারি ভূষণ। সর্ব অঙ্গে শোভে দেবীর নাগ আভরণ।। ৩০
সেবক রক্ষিতে দেবী হইলা সুবেশ। চিরনিয়া নাগ লৈয়া কুরুলিলা কেশ।।
নাইনাড়া নাগে কৈলা করবী প্রত্যুল। উদয় কাল নাগেতে খোপার [১]পদ্মফুল[১]।।
অলকাবলি চিত্র নাগ হইল শোভন। যেন নীল মেঘেতে উদয় তারাগণ।।
সিন্দুরিয়া নাগ হইলা সীমন্তে সিন্দুর। উদয়গিরি সূর্য যেন করিছে মেদুর।।
ধুসরিয়া বোড়া দেবীর হইল সুকুন্তলা। কুইয়া বোড়া হইল দেবীর [২]অভিন্ন[২] চপলা।। ৩৫
সর্বনামে নাগেতে মাথার সিতি [৩]পাটি[৩]। নীল মেঘতটে যেন বিজুলি-দিপতি।।[৪]
কালচিতি নাগে দেবীর ভুরু-যুগ সাজে। কালিন্দীর হস্তী যেন স্বর্ণগিরি মাঝে।।
কালি-নাগিনী হৈল নয়নে কজ্জল। কুবলয় দলে যেন খঞ্জন যুগল।।
কনক চিতি নাগে দেবীর নাসিকা উজ্জ্বল। কুণ্ডলিয়া নাগ হৈল শ্রবণে কুণ্ডল।।
সুরঙ্গ সিন্দুর নাগে অধরের কান্তি। ধবলিয়া চিতি হৈল দশনের পাতি।। ৪০
এতেক উরগে যদি মস্তক শোভন। কলেবরে [৫]শোভেরে[৫] প্রবল নাগগণ।।
শ্বেতকর্ণ নাগেতে গলার কেয়াপাতি। পীত গিরি বেড়ি যেন [৬]বহে[৬] ভগীরথী।।
কণ্ঠে ভূষিত মণিনাগের দিপতি। উদয় শিখরে যেন স্বর্ণময় [৭]জ্যোতি[৭]।।
হালিয়া নাগ দেবীর হৃদয়ে শোভে হার। সুমেরু শিখরে যেন বিজুলি-ঝঙ্কার।।
কণক মৃণাল ভুজে বলয় প্রকার। রাজসর্প হৈল দেবীর তাড় অলঙ্কার।। ৪৫
সঙ্কনিয়া চিতি হৈল দুই ভুজে শঙ্খ। [৮]বাহুটি[৮] কঙ্কণ হৈল আড়িয়াল বঙ্ক।।
বিঘতিয়া বোড়া হৈল অঙ্গুলে অঙ্গুরি। গন্ধচিতি [৯]নাগে[৯] দেবীর কুঙ্কুম কস্তুরি।।
মলয়জ নাগেতে চন্দন শোভে গায়। তাহার [১০]বিমল[১০] গন্ধ দশদিগে ধায়।।
মঙ্গলিয়া বোড়া দেবীর হৃদয় কাঁচুলি। নেতের আঁচলে হৈল নাগ ধনিয়াহুলি।।
উলু বোড়া নাগ দেবীর[১১] কাছিয়া চরণ। বেত আছাড় কটি ধটি করিল বন্ধন।। ৫০
লাউ ডুগি নাগে দেবীর[১১] গাথিয়া বসন। চরণে নূপুর শোভে নাগ আভরণ।।
কাল চিতি নাগে কৈল অঙ্গুলে অঙ্গুরি। আর যত নাগগণ পায়ের পাশুলি।।
নাগ অভরণে দেবী হইলা প্রচণ্ড। কালি নাগিনী তাঁর শিরে ধরে দণ্ড।।
দুই ভিতে নাগদল ধরিল জোগান। বাসুকি পঠেন কাছে শাস্ত্রপুরাণ।।
অনন্ত তক্ষক নৃত্য করেন আপনি। সঙ্ক মহাসঙ্ক করেন জয়ধ্বনি।। ৬০
সেবকেরে বর দিতে উর মর্ত্য পুরী। দ্বিজ বিপ্রদাস বলে কর জোড় করি।।

১. পঞ্চ (সু.সেন) ২ আভিলা (সু.সেন) ৩ পাতি (সু.সেন) ৪ (এখানে এসো/৩ পুথিতে পাঠ অতিরিক্তঃ 'স্বক্ষর শ্রী কেশব রাম সিংহ সাকিম দত্তপুর নিবাসী') ৫ শোভে দেবীর (এসো/১ অর্থাৎ জি ৩৫৩০), ৬ কহে (সু.সেন—ভুল পাঠ) ৭ জুতি (এসো/১, সু.সেন) ৮ বাউটি (এ. সো/১) ৯ নাগ এসো/১) ১০ সৌরভ (এসো/১) ১১ (অতিরিক্ত ; এসো/৩)

৪

[পয়ার]

জনম পাতাল পুরী অযোনিসম্ভবা। নির্মাণি জননী মহাদেব তেজসভবা।।
আপনা-আপনি কৈলা জীবের সঞ্চার। বাসুকি দিলেন বিষ নাগ-অধিকার।।

উদ্ভবা [১]পাতাল[১] নাম পাতাল কুমারী। নাগ দান পাইয়া নাম হৈল নাগেশ্বরী।।
কালিদহে পদ্মবনে হইল উতপতি। [২]তথির[২] কারণে নাম হৈল পদ্মাবতী।। ৬৫
মনেতে জনম জানি দেব ত্রিপুরারি। তথির কারণে নাম মনসা কুমারী।।
নিরঞ্জন কায়ভেদ সর্বশাস্ত্রে জানি। ব্রহ্মজ্ঞান পাইয়া নাম হইল ব্রহ্মাণী।।
মহাজ্ঞান দিলা যদি দেব শূলপানি। যোগেশ্বরী নাম আর [৩]সরস[৩] যোগিনী।।
চণ্ডীর বিবাদে নাম হইল মন্দাক্ষি। চণ্ডী জিনি নাম হইল বিষপূর্ণ-আখি।।
[৪]শুভ্র পট্ট[৪] পরি যবে গেলা বনবাসে। শ্বেতাম্বরী নাম তার সর্বলোকে ঘোষে।। ৭০
চণ্ডীর বিবাদে নাম হৈল নির্বাসিনী। পর্বতে পার্বতী নাম পর্বতবাসিনী।।
জরৎকার-পত্নী নাম হৈল জগৎগৌরী। পতির বিচ্ছেদে নাম পতি মন্দোদরী।।
জাগিয়া জাগুলী নাম সিজ বৃক্ষে স্থিতি। আমি কি বলিতে পারি আমার শকতি।।
মুকুন্দ পণ্ডিত সুত বিপ্রদাস নাম। চিরকাল বসতি [৫]বাদুড্যা[৫] বট গ্রাম।।
বাৎস্য গোত্র [৬]পিপিলাই[৬] পঞ্চপ্রবর। সামবেদ কুতুব শাখা চারি সহোদর।। ৭৫
শুক্লা দশমী তিথি বৈশাখ মাসে। শিয়রে বসিয়া পদ্মা [৭]কৈল[৭] উপদেশে।।
পাঁচালি রচিতে পদ্মা করিলা আদেশ। সেই সে ভরসা আর না জানি বিশেষ।।
[৮]কবি[৮] গুরু ধীর জনে করি পরিহার। রচিল পদ্মার গীত শাস্ত্র অনুসার।।
সিন্ধু ইন্দু বেদ মহী শাক পরিমাণ। নৃপতি হুসেন সাহা [৯]গৌড়ের প্রধান[৯]।।
হেনকালে রচিল পদ্মার ব্রতগীত। শুনিয়া [১০]ত্রিবিধ[১০] লোক পরম পীরিত।। ৮০
পদ্মাবতী-চরণ সরোজ মধুলোভে। দ্বিজ বিপ্রদাস তথি ভৃঙ্গ রূপে শোভে।।

---

১ পাতালে (এসো/৩) ২ দধির (সু. সেন) ৩ পরম (এসো/১, এসো/২) ৪ শুক্লপট, (এসো/২), শুক্ল বস্ত্র (এসো/১) ৫ নাদুড্যা (এসো/১) ৬ পিপলায় (সু. সেন), পিপালাই (এসো/১) ৭ কহিলা (এসো/১) ৮ করি (এসো/১) ৯ গৌড়ের সুলতান (এসো/৩) গৌড়ে সুলক্ষণ (এসো/১), ১০ দ্রবিদ (সু. সেন)

৫

কামোদ রাগ

ত্বং ভব আদ্যাশক্তি ত্বং সতী পার্বতী
ত্বং ভব সাগর সারং।
ভ্রনক্তি সত্ত্ব রজ ত্বং ভব অগ্র অজ
ত্বং ভব শুচি অধিকারং।।
ত্বং ভব কান্তি মুক্তি ত্বং ভব যুক্তি ভক্তি
ত্বং ভব ভূত নিদানং।
ত্বং ভব [১]ব্রহ্মজ্ঞানং[১] ত্বং তত্ত্ব নিরুপম
প্রকৃতি ত্বং ভব ধ্যানং।।
প্রথমে কহিব তত্ত্ব শুন নর একচিত্ত
মহাযজ্ঞ করে দেবগণে।
গঙ্গা হরের ঘরে নিরঞ্জন আসি তারে
যেন মতে দিলা দরশনে।।

[২]কালিদহে দেবরাজে নাগ-ইন্দ্র রক্ষা কাজে
মনসা জন্মিলা যেন মতে।[২]
চণ্ডীর সহিত বাদ হৈল বড় পরমাদ
নির্বাসিলা সিজুয়া পর্বতে॥ ৮৫
কহিব যজ্ঞের কথা কপিলা-বন্ধন [৩]যথা[৩]
ব্যাঘ্র মনোরথে মহারণ।
ব্রহ্মশাপ ইন্দ্রে হৈল লক্ষ্মী জলধি গেল
ক্ষীর নদী করিল মথন॥
বিশ্বেশ্বর পশুপতি আসিয়া ত পদ্মাবতী
[৪]যেন মতে[৪] করাইল চেতন।
বিষ বাঁটি দিল নাগে মনসার বিভা যোগে
জরৎকার মুনি মহাজন॥
আস্তিক কুমার হৈল নাগ-ইন্দ্র রক্ষা পাইল
জন্মেজয়-যজ্ঞ নাশ করি।
মায়া পাতি পদ্মা গিয়া রাখালের পূজা লৈয়া
[৫]বধ কৈলা[৫] হাসনের পুরী॥
জালু নৈল নিজ স্থান হরিল চাঁদোর জ্ঞান
[৬]যেমতে বধিল[৬] ধন্বন্তরি।
ধনা মনা বধ করি চাঁদোর ছয় পুত্র মারি
অনিরুদ্ধ উষা আনি হরি॥
নৃপতি-পাটনে যায় লখাই বেহুলা হয়
চাঁদ রাজা আইল নিজ দেশে।
উজানি নগরে গিয়া লখাই বেহুলা বিয়া
এড়িল লোহার গুপ্তবাসে॥ ৯০
সুতার সঞ্চারে আসি লোহার [৭]মন্দিরে[৭] বসি
দংশিলেক কালনাগিনী।
মাজসে ভাসিয়া গেল মৃত পতি জীয়াইল
দেবপুরে করিল মেলানি॥
তাহা দেখি চাঁদ রাজা করিল পদ্মার পূজা
লখাই বেহুলা স্বর্গবাসী।
সংক্ষেপে পদ্মার ব্রত কহিল মঙ্গলগীত
বিস্তারে কহিব সপ্ত নিশি॥[৮]
[৯]সম্পূর্ণ সঙ্গীত-ব্রত[৯] যেই শুনে একচিত
ধনপুত্র সিদ্ধি [১০]হয়[১০] আশ।
পদ্মা-পদপঙ্কজে পুট-চাটু করি ভুজে
বিরচিল দ্বিজ বিপ্রদাস॥

১ ব্রহ্মজ্ঞান (এসো/১, এসো/৩) ২ নাগ ইন্দ্র রক্ষা কাজে কালি দহে দেবরাজে (এসো/১) ৩ কথা (এসো/৩) ৪ জেন মনে (সু. সেন) ৫ বধিলেন (এসো/১) ৬ জেন মতে বধি (এসো/১) ৭ বাসরে (এসো/১)

৮ 'শ্রীরাম' (এসো/১-এর ২ পত্র সমাপ্ত. সেই জন্য পাদপূবক হিসেবে লেখা) ৯ এসব অপূর্ব গীত (এসো/১) ১০ পুরে (এসো/১)।

৬

নাচাড়ি ছন্দ

যখন না ছিল গোসাঞি সৃষ্টি স্থিতি লয়। [১]পবন[১] আকার গোসাঞি ছিলা জ্যোতির্ময় ॥
নাহি আদ্য অন্ত মধ্য কেবল করণ। পঞ্চ-মহাভূত সৃষ্টি করিলা সৃজন॥ ৯৫
আকাশ পবন তেজ জল বসুমতী। মন বুদ্ধি অহঙ্কার কৈল সৃষ্টি স্থিতি॥
আদ্যা শক্তি সৃজন করিলা মহাশয়। কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড সৃজিলা তেজোময়॥
সত্ত্ব রজ তম গুণে ব্রহ্মা হরিহর। সৃজন পালন ক্ষয় করে নিরন্তর॥
জন্মিয়া অসুর যত সেবে মহেশ্বরে। ত্রিলোচন বিশ্বপতি করি দেবতারে॥
চণ্ডীরূপা হৈলা কোপে দেব নারায়ণ। মায়াযুদ্ধে দুষ্ট দৈত্য কৈলা নিবারণ॥ ১০০
দৈতগণ বধিয়া হরিষ দেবগণে। দৈত্য-সুই মহাযজ্ঞ কৈল শুভক্ষণে॥
গঙ্গারে আদেশ কৈল করিতে রন্ধন। শান্তনু-আশ্রমে গেলা দেব ত্রিলোচন॥[২]
সম্ভ্রমে পূজিয়া ঋষি দিলেন আসন। কর জোড়ে জিজ্ঞাসিলা কোথা আগমন॥
তবে প্রত্যুত্তর কৈল দেব পশুপতি। যজ্ঞের রন্ধন হেতু দেহ ভাগীরথী॥
শান্তনু বলেন গোসাঞি শুন ত্রিলোচন। আজি আনি [৩]দিহ[৩] গঙ্গা আমার সদন॥ ১০৫
যদি ভাগীরথী আজি বঞ্চেন তথাই। তবেত গঙ্গারে আমি নাহি দিব ঠাঞি॥
ঋষির বচনে হর সত্য দড়াইয়া। যজ্ঞস্থানে শীঘ্র গেলা গঙ্গারে লইয়া॥
হরিষে করিলা গঙ্গা যজ্ঞের রন্ধন। যজ্ঞ সাঙ্গ করি পূর্ণা দিলা দেবগণ॥
সেদিন বঞ্চিলা গঙ্গা সেই যজ্ঞ কাজে। প্রভাতে চলিলা হর ঋষির সমাজে॥
কোপে ঋষি গঙ্গারে না লৈলা নিজ ঘরে। গঙ্গা লৈয়া গেলা নিজপুর মহেশ্বরে॥ ১১০
তপস্বীর বেশ ধরি দেব ত্রিলোচন। তপ করে শঙ্কর দেখিতে নিরঞ্জন॥
দ্বাদশ বৎসর তপ কৈলা মহেশ্বর। দ্বিজ বিপ্রদাস বশে [৪]মনসা-কিঙ্কর[৪] ॥

[১] পরম (এসো/১) ২ স্বক্ষর শ্রীকেশব রাম সিংহ সাকীম আনার পু(র) দত্ত পুখরিয়া (এসো/৩) ৩ দেহ (এসো/১, এসো/৩) ৪ মনসার বরে (এসো/১)

৭

ধানসী রাগ

হাথে লইয়া জাপ্য-মাল তপ করে চিরকাল
পঞ্চ মুখে করেন স্তবন।
ব্রহ্মমন্ত্রে বেদ-বলে মুখেতে [১]আগুন[১] জ্বলে
প্রকাশিত তিন লোচন॥
নানা পুষ্প লৈয়া করে অনাদ্যের পূজা করে
একচিত্ত ধ্যান অনুক্ষণ।

গলায় রুদ্রাক্ষ-মাল বিভূতি মাখয়ে ভাল
বল্লুকা দেখিতে নিরঞ্জনে।।
মূলমন্ত্র জপ করি ত্রিশূল ডম্বুর ধরি
করিলা বিস্তর তপধ্যান।
কভু বায়ু ধূম্র খায় ভর করি এক পায়
নিরবধি যোগেতে গেয়ান।। ১১৫
ঊর্ধ্ব বাহু করি ক্ষণে ক্ষণে নাগ শয়নে
নিদাঘেতে আনল বেষ্টিত।
জলে রহি শীতকালে শিরে ধারা বর্ষাকালে
দ্বিজ বিপ্রদাস বিরচিত।।

---

[১] আনল (এসো/৩)

৮

শ্রী রাগ

ধবল ছত্র ধরি শিরে দণ্ড কমণ্ডুল করে
উলূকে করিয়া আরোহণ।
ধবল শ্যামলতর শোভে দিব্য কলেবর
হরের আশ্রমে দরশন।।
ডাকিলা শিবের তরে করিয়া মধুর স্বরে
গঙ্গা আছিলা সেই ঘরে।
অতি সুললিত বাণী অভ্যন্তরে গঙ্গা শুনি
উপসন্ন গোসাঞি গোচরে।।
দেখি নিরঞ্জন কায় গঙ্গা চমকিত হয়
কর-জোড়ে কৈলা পরিহার।
ধর্মের [১]বদন[১] দেখি গঙ্গা ধবলমুখী
রথে ভর কৈলা অবতার।।
অন্তরীক্ষে ধর্মরায় গঙ্গে দিলা পরিচয়
জানাইহ হরের অগ্রেতে।
দ্বাদশ বৎসর হর আমা পূজে নিরন্তর
আইলাম তাহারে দেখিতে।। ১২০
না [২]দেখিনু[২] ত্রিলোচন আছিল অনন্যমন
আমারে দেখিল দৃষ্টিবলে।
হের বলি [৩]সন্নিধান[৩] দ্বিজ বিপ্রদাস গান
গঙ্গা বলেন হেন কালে।।

---

১ বন্ধন (সু. সেন) ২ দেখিল (এসো/১) ৩ সম্বিধান (এসো/১)

৯
পাঁচালি

শুন শুন কৃপানাথ কর অবধান। তুমি সে কারুণ্য-গুরু কারুণ্য নিদান।।
সংসার সৃজিয়া গোসাঞি ভার দিলা হরে। তোমার সৃজন সৃষ্টি দিলা মহেশ্বরে।।
তোমারে দেখিতে হর অনেক সাধনা। বল্মুকায় দুখ পায় ক্লেশ যাতনা।।
দ্বাদশ বৎসর [১]হয়[১] বড় পায় দুখ। তোমা না দেখিয়া হর না ধরিবে বুক।। ১২০
অস্থিচর্ম সার মাত্র হৈল দেব-রায়। [২]বার এক দেখা[২] দেহ হইয়া সদয়।।
গঙ্গার উত্তর শুনি বলে নিরঞ্জন। এই কথা কহিয় আইলে ত্রিলোচন।।
তোমারে দেখিলে হর সেই দেখা মোরে। শিবে জটা মেলি যেন লয়ে তোমা শিরে।
তবে যদি অতি খেদ করে দেব রায়।[৩] কালিদহে কমল তুলিতে যেন যায়।।
কালিদহে কমল তুলিব মায়াধর। তবে কন্যা রূপ মায়া দেখিবেক হর।। ১২৫
কহিয়া গেলেন প্রভু গঙ্গা হেঁট মাথা। আমি কি বলিব হর এই [৪]মনে চিন্তা[৪]।।
বলিল ধবল খাটে হৈয়া শ্বেতকায়। ওথা তপবন তেজি আইল দেবরায়।।
সাজি কমন্ডুল থুইয়া দেব মহেশ্বরে। ধবল আকার গঙ্গা দেখিল মন্দিরে।।
দ্বিজ বিপ্রদাস বলে সকরুণ বাণী। দেখিয়া গঙ্গার রূপ বলে শূলপাণি।।

---

১ হর (এসো/৩) ২ বাবেক দর্শন (এসো/১) ৩ শ্রী বামকেশব সিংহ (এসো/১) ৪ মনকথা

১০
সিন্ধুড়া

গঙ্গা ধবল দেখি শঙ্কর বিস্মিত মুখি
দাণ্ডাইয়া চাহে [১]ঘন[১] ঘন।
সাজি কমণ্ডলু হইয়া দুই কর জোড় হৈয়া
জিজ্ঞাসা করেন ত্রিলোচন।। ১৩০
অত্র গঙ্গা বেরি-একু হও কৃপাময়।
দেখি তেজপুঞ্জ তোর এ তিন লোচন মোর
বলিতে না পারি কিবা হয়।।
কহ [২]গো[২] ধবলমুখি এথা আমা নাহি দেখি
গিয়াছিলা কাহার [৩]উদ্যানে[৩]।
কেমত দেখিলা তথা কহগো স্বরূপ কথা
ধবল হইলা কি কারণে।।
হরের বচন শুনি গঙ্গা যুগল পাণি
পরিহার করিয়া সুভাষে।
তোমা দিতে দরশন আসিছিলা নিরঞ্জন
বিরচিত দ্বিজ বিপ্রদাসে।।

---

১ ঘনে (সু. সেন) ২. গঙ্গা (এসো/১) ৩ উদানে (সু. সেন)

১১

পয়ার

ধবল-আকার [১]তার প্রকাণ্ড[১] শরীর। তব নাম ধরিয়া ডাকিলা ধীরে ধীর।।
ঘরের বাহির হইয়া দিনু দরশন। দিব্য এক পুরুষ দেখিল মহাজন।। ১৩৫
দেখিল লোচন ভরি ধর্ম-যুগপতি। তথির কারণে হইল ধবল-মূরতি।।
অন্তরীক্ষ হৈয়া প্রভু দিলা পরিচয়। মহাদেবে দেখা দিতে আইনু এথায়।।
এই কথা কহিবে হরের বিদ্যমান। এতেক বসিয়া প্রভু হৈলা অন্তর্ধান।।
গঙ্গার বদনে বাণী শুনি শূলপাণি। হস্তিপদ আছাড়িয়া পড়িলা ধরণি।।
ওথায় এসব কথা শুনি দেবগণ। গঙ্গারে পরম ব্রহ্মা দিলা দরশন।। ১৪০
হংসপৃষ্ঠে চড়ি ব্রহ্মা সাবিত্রী সহিতে। খগাসনে বিষ্ণু লক্ষ্মী আইলা তুরিতে।।
ঐরাবত চড়ি ইন্দ্র শচীর সংহতি। দশ দিগপাল আইলা অতি শীঘ্রগতি।।
দ্বাদশ আদিত্য আর নবগ্রহগণ। নারদাদি ঋষি মুনি আইল সর্বজন।।
দেখিলা গঙ্গার মূর্তি ধবল-আকার। চতুর্মুখে ব্রহ্মা স্তব করেন গঙ্গার।।
[২]সম্ভ্রমে[২] পুলক হর ভাবিয়া অন্তরে। ভক্তিভাবে গঙ্গারে তুলিয়া লৈল শিরে।। ১৪৫
তবে যত দেবগণ গেলা নিজ স্থান। কালিদহে পুষ্প হেতু হরের পয়ান।।
দ্বাদশ বৎসর [৩]তপ করে ত্রিলোচন[৩]। দ্বিজ বিপ্রদাস বলে [৪]পদ্মার[৪] চরণ।।

১ তাঁর প্রগাণ্ড (সু. সেন) ২ সম্ভ্রম (এসো/৩) ৩ হব তপস্যায মন (এসো/৩) ৪ মনসা (এসো/৩)

১২

পটপঞ্জরী

দ্বাদশ বৎসর হর পুষ্প তুলে নিরন্তর
দেখিবারে ধর্মের চরণ।
পুষ্প হেতু কালিদহে নিত্য পশুপতি যায়
তপস্বীর বেশ ত্রিলোচন।।
তপরূপ অবিশাল গলায় রুদ্রাক্ষমাল
নিশাকর ললাটের ফোটা।
অস্থিমালা শোভে হার ভুজঙ্গের অলঙ্কার
বাসুকি-নাগের হৈল পাটা।।
চলে দেব মহেশ্বরে ত্রিশূল ডম্বুর করে
বিভূতিভূষণ কলেবর।
রুদ্ররূপ জগদীশ কণ্ঠে কালকূটী বিষ
পরিধান করি [১]বাঘ[১] ছাল।। ১৫০
দেখিল হরের বেশ তপরূপ জগদীশ
মনে ভাবে হেমন্ত নন্দিনী।
কেমন হরের মতি কেমন বা শুদ্ধমতি
ছলিয়া দেখিব শূলপাণি।।[২]

করজোড় করি বলে ধীরে ধীরে বাক্যছলে
অবধান কর ত্রিলোচন।
তব অঙ্গীকার পাই পশ্চাৎ গোড়াইয়া যাই
দেখিব কেমন পুষ্পবন।।
শুনিয়া গৌরীর বাণী বলে দেব শূলপাণি
শুন শুন হেমন্ত দুহিতা।
কূলে যত বৃক্ষ ছিল বিষ-জ্বালে ভস্ম-হৈল
কেমনে যাইবে তুমি তথা।।
সেই দুষ্ট কালি দহে উরগ বেষ্টিত তাহে
দেবাসুর না যায় তরাসে।
শুনিয়া হাসেন দেবী মনসা চরণ সেবি
[৩]বিরচিত[৩] দ্বিজ বিপ্রদাসে।।

১. ব্যাঘ্র (এসো/১) ২ শ্রী গোকুল সিংহ সাপুড়িয়া (এসো/৩) ৩ বিরচিল (এসো/১)

১৩

পয়ার

কর জোড় করিয়া বলেন ভগবতী। যাহ পুষ্পবনে আমি না যাব সংহতি।। ১৫৫
শুনিয়া চলিলা হর মন হরষিতে। পশ্চাতে [১]চলিল[১] দেবী মহেশ ছলিতে।।
চাচর প্রচুর কেশ সুবিচিত্র খোপা। কুসুমের মালা তথি নাগেশ্বরী চাঁপা।।
ভুরু যুগ অতিশোভা কামের ধনুক। [২]নয়ন[২] কটাক্ষে বিন্ধে মন্মথের বুক।।
শ্রবণে পিতল কড়ি করে ঝলমল। অমল কমল জিনি বদন মণ্ডল।।
শ্রীরাম-লক্ষ্মণ শঙ্খ দুই ভুজে সাজে। চরণে নূপুর শোভা সুললিত বাজে।। ১৬০
কালিদহে যাইতে আছে জোকা নদীপার। সেইখানে পাতে দেবী মায়া অবতার।।
ভাঙ্গা নৌকা হৈল এক দেবীর মায়ায়। তথির উপরে ভ্রমে দেবী মহামায়।।
হেনকালে গেলা হর তার বিদ্যমান। হাসিয়া কটাক্ষ তারে হানে কামবাণ।।
দেখি হত চিত্ত কামে হরমন টলে। দাঁড়াইয়া নদীকূলে ডোমনি নেহালে।।
দেখিয়া মজিল চিত্ত সুবদনী রামা। ডাক দিয়া বলে হর পার কর আমা।। ১৬৫
কোন জাতি কার সুতা কাহার রমণী। হেন রূপ-যৌবন সলিলে ভাস কেনি।।
তবেত ডুমনি বলে পরিহার করি। হইতো ডুমনী এই ঘাটের খেয়ারি।।
তুমি কোন মহাশয় যাও বা কোথায়। বড় তপ-বেশ দেখি সঙ্কল আমায়।।
তবে হর বলে রামা আমি ত্রিলোচন। কালিদহে পুষ্প তুলি পূজি নিরঞ্জন।।
শুনিয়া হরের বাক্য বলেন রূপসী। অনুমানে বুঝি তুমি ভণ্ড তপস্বী।। ১৭০
সেই দেব পশুপতি যদি হও জানি। অর্ধ অঙ্গে গৌরী তার [৩]শুনহ কাহিনী[৩]।।
বৃষবর বাহন গমন দশ দিগে। নন্দী আদি পারিষদ জটা বেড়া নাগে।।
আমি পার করি প্রভু যত নারীগণে। তোমায় আমার এই সম্ভবে কেমনে।।
এখনে আমার [৪]স্বামী[৪] আসিব হেথায়। ভাল নায়ে পার করি এড়িব তোমায়।।
মোর ভাঙা [৫]নায়[৫] তব না সহিব ভর। বুড়িয়া মরিবে আজি ত্রিদশ-ঈশ্বর।। ১৭৫

বুঝায় ডুমুনী হয় বিরহে কাতর। মন দিয়া শুন কিছু আমার উত্তর।।
দ্বাদশ বৎসর পুষ্প তুমি কালিদহে। বল্লুকায় পূজা করি ধর্ম-মহাশয়ে।।
লোটাইয়া কলেবর নাগের শয়নে। [৬]তমু[৬] না দেখিনু আমি [৭]ধর্ম নিরঞ্জনে[৭]।।
ঝুসি ফল ভক্ষণ [৮]পবয়ে[৮] বাঘ ছাল। বিভূতিভূষণ দেখ গলে হাড় সকল।।
একেলা ভ্রমণ করি কিসের সংহতি। বেলি অবসান পার করলো যুবতি।। ১৮০
শুনিয়া ডুমনী নৌকা চাপাইল কূলে। নৌকায় চড়িলা হর বড়ো কুতূহলে।।
কতদূরে গিয়া ধরি ডুমনীর হাতে। আলিঙ্গন দেহ রামা কহে ভূতনাথে।।
আমি শূলপানি তোরে বিনয় আমার। ভজিয়া আমারে কর কামসিন্ধু পাব।।
ভেদিলেক কামবাণ তুয়া দরশনে। শুনিয়া ডুমুনী বলে বিপ্রদাস ভণে।।

---

১ চলিলা (এসো/১) ২ নযান (এসো/১) ৩ বিদিত অবনি (এসো/১) ৪ পতি (এসো/১) ৫ নৌকা (এসো/১) ৬ তবু (এসো/১) ৭ দেব নিবাঞ্জনে (এসো/১) ৮ পবিত্র (সু সেন)

১৪

নাটরাগ

ডুমুনী বলয়ে হের দেখ পরমাদ। ত্রিদশ ঈশ্বর হইয়া অজুগত সাদ।। ১৮৫
আমি মল মূত্রধারী অতিহীন জাতি। আমা পরশিলে তোব রহিবে [১]অখ্যাতি[১]।।
নহে নহে মহাদেব এড় মোর হাথ। আমি ত ডুমুনী তুমি ত্রিদশের নাথ।।
হেন অসম্ভব বা সম্ভবে কোন দেশে। দেবতা-মানুষে রতি নৌকায় বিশেষে।।
দেব হৈয়া কেন কর হেন দুরাচার। এ তোমার অপযশ ঘষিব সংসার।।
চরণে [২]পড়হ[২] প্রভু কৃপা কর কোরে। হেন ব্যবহার নহে [৩]নিসেদি[৩] তোমারে।। ১৯০
তখনি বলিনু ভণ্ড দণ্ডধারী তুমি। আপনা খাইয়া নায়ে তুলিলাম কেনি।।
যদি প্রভু দেখে মোর এই ব্যবহার। কর্ণ নাসা কেশ ছেদ করিব আমার।।
তেজিব জীবন [৪]আজি[৪] ঝাঁপ দিয়া জলে। ভণে বিপ্রদাস পদ্মা চরণ কমলে।।

---

১ খেয়াতি (এসো/১) ২ পড়হ (ঐ) ৩ নিবেধি (সু.সেন) ৪ আমি (এসো/১)

১৫

পয়ার

বিরহে কাতর দেখি ত্রিদশ-ঈশ্বরে। কহেন ডুমুনী মৃদু গদগদ স্বরে।।
বিশেষ মনের কথা কহিয়ে তোমায়। রত্ন অঙ্গুরি দিয়া ভজহ আমায়।। ১৯৫
কামে হতচিত হৈয়া ত্রিদশের নাথ। রতন অঙ্গুরি দিলা ডুমুনীর [১]হাত[১]।।
শঙ্করের রত্ন ধন লইল হরিয়া। রতিরঙ্গ বঞ্চিলেক হরষিত হৈয়া।।
মায়া ছাড়ি মহাদেবে দিলা পরিচয়। তুমি তো তপস্বী ভণ্ড জানিল নিশ্চয়।।
[২]প্রমথ[২] হইলা গোসাঞি লজ্জাযুক্ত হৈয়া। নিজপুরে গেল তবে তপ সঙ্কলিয়া।।
ধরিয়া মূষিক রূপ দেব শূলপাণি। চণ্ডীর [৩]কাঁচুলি[৩] কাটি কৈলা খানি খানি।। ২০০
[৪]কাঁচুলি[৪] দেখিয়া দেবী চিন্তিয়া আকুলি। পদ্মারে ইঙ্গিত কৈলা আনহ কুশলি।।
কুশলির রূপে হর রহিলেন দ্বারে। ডাকিয়া আনিল পদ্মা চণ্ডীর গোচরে।।

চণ্ডিকা বলেন শুন এ বৃদ্ধ কুশলি। মূষিকে কাটিল মোর হৃদয়ে কাঁচলি॥
কাঁচলি নির্মাও মোর করিব সম্মান। কুশলি বলেন সত্য কর মোর স্থান॥
না বুঝিয়া দেবী সত্য করিল অমনি। যেই চাহ তাহা দিব বলিলা ভবানী॥ ২০৫
সত্য করাইয়া হর হরষিত-মন। বিচিত্র [৫]কাঁচুলি[৫] তবে [৬]করিল[৬] নির্মাণ॥
এ তিন ভুবনে যত বৈসে চরাচর। দেবাসুর নাগ নর [৭]লিখিল সকল[৭]॥
কাঁচলি নির্মাইয়া দিলা দেবী বিদ্যমান। কুশলি বলিলা গৌরী রতি দেহ দান॥[৮]
শিব শিব বলি দেবী গণিল প্রমাদ। বৃদ্ধ [৯]কুশলিয়া তব[৯] রতি কেন সাধ॥
ত্রৈলোক্য-জননী আমি হরপ্রিয়া উমা। না বুঝিয়া সত্য কৈল কর মোরে ক্ষমা॥ ২০৫
চলিল কুশলি তবে হৈয়া ক্রোধ মুখি। তুমি সত্যভঙ্গ কৈলা চন্দ্র সূর্য সাক্ষী॥
[১০]গুপ্ততে[১০] কুশলি দেবী আনিল ডাকিয়া। দিল রতি গৌরী বড় মনে দুঃখ পাইয়া॥
তবে হর [১১]নিজ রূপে[১১] দিল পরিচয়। অপমানে হেঁট মাথা চণ্ডিকা লজ্জায়॥
আমি ভণ্ড তপস্বী তুমি ত বড় সতী। বৃদ্ধ কুশলি লইয়া বঞ্চ রঙ্গ-রতি॥
হেন সর্ব রহস্য কৌতুকে হর গৌরী। কালিদহে প্রভাতে প্রবেশে ত্রিপুরারি॥ ২১৫
প্রসর গভীর জল অস্থল অমল। প্রকাশ প্রফুল্ল চারু শোভিত কমল॥
চক্রবাক আদি রাজহংস করে কেলি। সরল কুরল বক সারস সরালি॥
অলিকুল সঙ্কুল করয়ে মধুপান। রতিক্রীড়া করে কেহ হর বিদ্যমান॥
দেখি মহাদেব কামে হৈলা হতজ্ঞান। পদ্মাপদ চিত্ত দ্বিজ বিপ্রদাস গান॥

১ হাথ (এসো/১) ২ প্রমত (ঐ) ৩ কাঁচলি (ঐ) ৪ কাঁচলি (ঐ) ৫ কাঁচলি (ঐ) ৬ করেন (ঐ) ৭ লিখিলা সত্বর (ঐ) ৮ দুর্লভ কাঁচালি তব করিনু নির্মাণ।/যদি আসা প্রীততে সুরতি দেহ দান॥ (বি. পুথি) ৯ কুশলির এত ১০ গোপথে (এসো ১) ১১ নিজ বেশে (ঐ)

১৬
রাগ সুহাই

মদনে পীড়িত হর ভেদিলেক কাম শর
সর্বাঙ্গ সহিত হুতাশনে।
শরীর অস্থির হৈল হৃদয়ে বেদনা পাইল
বিষাদিত দেব ত্রিলোচনে॥ ২২০
প্রাণের দোসর গৌরী আনিতু সংহতি করি
দম্পতী ভঞ্জিতু রঙ্গরতি।
চক্রবাক ক্রীড়া রঙ্গে প্রাণে মোর কাম লঙ্গে
কেমনে নিভাব দুঃখ মতি॥
অতিশয় কাম ভোলে শঙ্করের [১]চন্দ্র[১] টলে
করেতে ধরিল দেব নাথে।
দুঃখমনে পঞ্চানন ভাবিয়াত নিরাঞ্জন
এড়িল বিচিত্র পদ্মপাতে॥
অন্যচিত্তে মহেশ্বর পুষ্প তুলে নিরন্তর
বায়স দম্পতী চূত ডালে।

দেখিল হরের বিন্দু স্বর্গে যেন উড়ে ইন্দু
ভক্ষণ করিল কুতূহলে॥
অন্তরীক্ষ হইয়া উড়ে আপন ভুবনে পড়ে
কম্পিত হইল কলেবরে।
সম্ভ্রমে করুণা ভাষে বলে দ্বিজ বিপ্রদাসে
পদ্মা-নেতো[২] আস্তিকের[২] বরে॥

১ বির্য্য (এসো/১) ২ আস্তিকেব (ঐ)

১৭

পাঁচালি

হরবিন্দু ভক্ষে পক্ষ জ্বলে সর্ব গা। সকম্পিত অঙ্গ বাড়াইতে নারে পা॥ ২২৫
দেখিয়া ভক্ষিনু বিষ কোন দৈবদোষে। [১]বিষাদ[১] ভাবিয়া পক্ষ কাঁদে ত তরাসে॥
নির্বল নিঃশেষ তনু মৃত্যু মনে গণি। কি বুদ্ধি করিব বল প্রাণের পক্ষিণী॥
লোটাইয়া কান্দে পক্ষ হইয়া কাতর। বেথিত পক্ষিণী বলে প্রবোধ উত্তর॥
উগরিয়া আহার [২]এড়িল[২] সেইখানে। তবে রক্ষা পাও [৩]যদি[৩] বুঝি অনুমানে॥
তুরিতে চলিলা পক্ষ পক্ষিণী বচনে। উগরিয়া আহার এড়িল সেইখানে॥ ২৩০
প্রসন্ন হৃদয় পক্ষ চলিল আনন্দে। পরিত্রাণ পাইয়া পক্ষ বড়ই সানন্দে॥
পদ্মপত্রে হর-চন্দ্র হইল [৭]সুস্থির[৭]। [৪]অম্বু[৪] ভেদিয়া পড়ে বাসুকির শির॥
বজ্রাঘাত-শব্দ যেন পাইল বীরবর। দ্বিজ বিপ্রদাস বলে মনসা-কিঙ্কর॥

১ বিবাদ (সু. সেন) ২ এড়িয় (এসো/২) ৩ জানি (এসো/২) ৪ অমু (এসো/২)

১৮

পয়ার

জয় জয় বিষহরি কৈল পরকাশ। সকল দেবতাপুরী হইল উল্লাস॥
জ্যোতির্ময় দীপ্ত করে [১]দেখিল[১] নির্মাণি। ধেয়ানে জানিল চন্দ্র এড়িল শূলপানি॥ ২৩৫
নিমিষে জানিলা সেই জাতক কারণ। শিবের নন্দিনী হৈলা মনসা-জনম॥
ভাবিয়া পরম শিক্ষা জানিল ধেয়ানে। প্রথমে মৃণাল সহ বপুর সৃজনে॥
হৃদয় জঠর স্থান নির্মাণ করিল। উরুযুগ কণ্ঠ চারু পয়োধর হৈল॥
নিতম্ব জঘন কটি গঠিল সত্বর। সৃজিল মস্তক কেশ ললাট [২]প্রসর[২]॥
তরল চঞ্চল আখি সুললিত গ্রীবা। শশধর জিনি হৈল বদনের শোভা॥ ২৪০
দুই বাহু করতল অঙ্গুলি সুভাতি। পদযুগ সুবলিত হৈল পদ্মাবতী॥
[৩]জীবন্যাস করিয়া মনসা থুইল নাম। পূর্ণিমার চন্দ্র যেন দেখি অনুপাম॥
পরিধান করাইল বিচিত্র বসন। কুণ্ডল কেজুর হার কঙ্কন ভূষণ॥[৩]
পদ্মা দেখি নির্মাণি হরিষ অতিকায়। তথা হৈতে চলিলা পরমানন্দময়॥
পদ্মাবতী লৈয়া গেল বাসুকি-অগ্রেতে। পদ্মা দেখি বাসুকি গৌরব [৪]নানা মতে[৪]॥ ২৪৫
নির্মাণি বলেন পুত্র লও পরিচয়। আমিত নির্মাণ কৈল তব ভগনী হয়॥

মহেশের চন্দ্রে জন্ম হইল ইহার। নাম মনসা নিরঞ্জন অবতার॥
জননীর বাক্য শুনি হরিষ বাসুকি। বৈস বৈস করি বলে পরম কৌতুকী॥
পূর্বে পৃথুরাজা যবে পৃথিবী দুহিল। অমৃত [৪]দুহিয়া[৪] সব দেবগণে দিল॥
দুহি নানা শস্য স্থাপি রাখিলেন খিতি। দুহিয়া নাগেরে বিষ দিল মহামতি॥ ২৫০
সেই বিষ অধিকার দিলা পদ্মা স্থানে। উনকুটী নাগ আর দিল হস্তদানে॥
নাগের বেভার দেবী জিজ্ঞাসিল সার। পশু-পক্ষ মনুষ্যাপি করিব সংহার॥
পদ্মা রাখি নির্মাণি আপন [৫]পুরে[৫] গেলা। আমোদে প্রমোদে পদ্মা কালিদহে [৬]রইলা[৬]॥
শুন শুন আরে ভাই অমৃত কথন। মনসা চরণে দ্বিজ বিপ্রদাস গান ॥

১ থূইলা (এসো/১) ২ সুন্দর (এসো/১) ৩ (এতখানি অংশ এসো/৩-এ নেই) ৪ নামতে (সু. সেন), মানতে (এসো/৩) ৫ পুরী (এসো/১) ৬ রৈলা (এসো/১, এসো/৩)

১৯

পটপঞ্জরী

প্রভাতে ত্রিদশ রায় প্রবেশিলা [১]কালি দয়[১]
পুষ্পনাশে রোষে কৃত্তিবাস।
ভাবিল গরুড়-পক্ষে আইল বীর অন্তরীক্ষে
নাগগণ করিতে বিনাশ॥ ২৫৫
আজ্ঞায় আহার লৈল তার কার্যে ফল পাইল
পাখে আচ্ছাদিল নাগগণ।
ভয়ে নাগ করে স্তুতি নাহি করি তব ক্ষেতি
কেন আমা কর সংহারণ॥
গরুড় বলেন ভাই পরিচয়-কথা কই
বিনতা কদ্রু কশ্যপের নারী।
বিনতা [২]তনয়[২] আমি কদ্রুর তনয় তুমি
[৩]যে[৩] কারণে তুমি মোর বৈরী॥
অরুণ অগ্রজ ভাই তার কথা তোরে কই
পক্ষ অতি প্রকাশিতময়।
শীতে অতিকম্পমান বাপে লৈয়া সন্নিধান
থাকিল সূর্যের নিজালয়॥
আমি ত জন্মিল যবে ক্ষুধার্ত হইনু তবে
পিতা-আজ্ঞায় সংহার করিতে।
তথি ব্রহ্মা জাগ পাইয়া তার পুর দিয়া গিয়া
মারি গজ-কচ্ছপ নিশ্চিতে॥
নহুষ রাজা যজ্ঞ কৈল মুষলধারে ঘৃত দিল
অগ্নিমান্দি হইল ব্রহ্মার।
দেব ঋষি মুক্তি পাইল খাণ্ডবে আনল দিল
মাংস খাইয়া হৈল প্রতিকার॥ ২৬০

তথায় নিবসি পূর্বে পক্ষিণী-সঙ্গম গর্ভে
চারি পুত্র জন্মিল কাননে।
দাবাগ্নি পুড়িয়া মরে আর্তনাদ ডাক ছাড়ে
তথি আমি করিনু রক্ষণে॥
নৃমুণ্ড তথি পঞ্চ পাইয়া আহার [৪]কবন্ধে লৈয়া[৪]
চুঞ্চে করি [৫]ভ্রমিয়ে ভুবন[৫]।
পদভর যাহে করি সে যায় পাতালপুরী
বৃক্ষ রূপে আইলা নারায়ণ॥
তথি সলি চার করি সত্য করাইল হরি
[৬]হৈল[৬] আমি তাহার বাহন।
পদ্মা পদপঙ্কজে পুট-চাটু করি ভুজে
দ্বিজ বিপ্রদাস সুরচন॥

১ কালিদহে (সু সেন) ২ তনযা (ঐ) ৩ সে (ঐ) ৪ কবঙ্গে লইযা (এসো/১) ৫ ভ্রমি ত্রিভুবন (এসো/৩)
৬ হইলু (এসো/১), হৈলু (এসো/৩)

২০

পাঁচালি

পূর্বকথা কহি আমি তোমা বরাবরি। জ্ঞাতি হৈয়া যে কারণে তুমি মোর বৈরী॥
কহিল তোমার কদ্রু উচ্চশ্রবা কালো। [১]আমার[১] বিনতা বৈল উচ্চশ্রবা ধলো॥ ২৬৫
নাগ আচ্ছাদিয়া কালো কৈল উচ্চশ্রবা। হারিয়া করিল মাতা তব মায়ের সেবা॥
সেবিল অনেক কাল দাসী-রূপ হৈয়া। তমু তোমা পাপিষ্ঠে নহিল কোন দয়া॥
অমৃত আনিয়া দিলে তাহার ছোড়ান। জন্মিয়া মায়ের দুঃখে আমি [২]দুঃখবান[২]॥
ইন্দ্র সহ যুদ্ধ ইন্দ্র বজ্র অস্ত্র এড়ে। বজ্র অস্ত্রে আমার সকল পাখা পুড়ে॥
[৩]ব্রহ্ম অস্ত্রে[৩] এড়াইনু সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া। পলাইল ইন্দ্র মোর সংগ্রামে হারিয়া॥ ২৭০
পরাজয় হইল ইন্দ্র মোরে কৈল স্তুতি। অমৃত হরিতে ইন্দ্র দিলেন সম্মতি॥
অমৃতে করিনু মুঞি মায়ের উদ্ধার। মায়া পাতি ইন্দ্র তাহা লইল পুনর্বার॥
অমৃত রাখিয়াছিনু কুশা-ঝাড় তলে। ভক্ষণের কাজে নাগ আইল হেন কালে॥
[৪]কুশায়ে[৪] কামড় খাইল হইয়া অস্থির। [৫]সে[৫] কারণে জিহ্বা তব হৈল দুই চির॥
সেই বৈরী ভাবে মোর নহে [৬]বিসরণ[৬]। তে কারণে তোমা বধ করি অনুক্ষণ॥ ২৭৫
কালিনাগিনী গেল মনসা গোচরে। গরুড় তোমার সর্ব সর্প বধ করে॥
মনসা দাঁড়াইলা মহাদেবের অগ্রেতে। দেখিয়া লোভিত হর চাহে কাম চিত্তে॥
ভয় পাইয়া মনসা কহেন পূর্ব কথা। আমি সে তোমার সুতা তুমি মোর পিতা॥[৭]
চক্রবাক ক্রীড়া দেখি তব চন্দ্রটলে। নির্মাণি পাইয়া আমা নির্মাইল পাতালে॥
নাগবিষ দান দিয়া এড়িলা আমায়। পরিচয় পাইয়া হৃষ্ট ত্রিদশের রায়। ২৮০
ধ্যান করি মহাদেব নিশ্চয় জানিল। ব্রহ্মজ্ঞান দিয়া নাম মনসা থুইল॥
বাপের চরণে পদ্মা করে পরিহার। গরুড় আমার নাগ করে ত সংহার॥
তবে শিব গরুড়েরে কৈল সন্বিধান। নাগ উগারিয়া দিয়া যাও নিজস্থান॥

প্রতিমাসে এক নাগ [৮]পাইবে[৮] আহার। যত নাগগণে তুমি না হিংসিয় আর॥
চলিল গরুড় নাগ মনসারে দিয়া। মহেশ চলিলা ঘরে কুসুম তুলিয়া॥ ২৮৫
মনসা বলেন তবে জুড়ি দুই কর। তব সঙ্গে চলি যাব যথা নিজঘর॥
হর বলে চণ্ডী তোমা নারিব দেখিতে। অকারণে মোর ঘরে চাহত যাইতে॥
মনসা বলেন পুন শুন মহাশয়। কহিল অবশ্য আমি যাইব নিশ্চয়॥
যতনে করিব [৯]সত্য[৯] মায়ের সেবন। নহিবেন রুষ্ট মোরে শুন ত্রিলোচন॥
পুষ্পের ভিতরে [১০]রহে[১০] মনসা লুকাইয়া। পুরে গিয়া পুষ্প হর এড়িল তুলিয়া॥ ২৯০
স্নান করিবারে হর করিলা গমন। বিস্ময় হইয়া চণ্ডী ভাবে মনে মন॥
আর দিন পুষ্প সাজি দিত মোর স্থান। আজি কেন তুলিয়া এড়িল ত্রিলোচন॥
বিস্মিত হইয়া চণ্ডী ভাবে মনে মনে। খুঁজিয়া আনিল সাজি নিজ বিদ্যমানে॥
ঘুচাইয়া একদৃষ্টে নেহালে সত্বরে। মনসা পাইল দেবী পুষ্পের ভিতরে॥
দৃষ্টিমাত্র দুষ্ট নষ্ট বলে দুরাচার। অবিচারে [১১]কেশে[১১] ধরি করয়ে প্রহার॥ ২৯৫
পদ্মা বলে না মারিহ চণ্ডী গো সতাই। দ্বিজ বিপ্রদাস বলে পরিচয় হই॥

---

১ আবার (সু. সেন), আমারে (এসো/১) ২ দুঃখমান (এসো/১, এসো/৩) ৩ ব্রহ্মমন্ত্রে (এসো/১) বজ্র অস্ত্রে (সু. সেন) ৪ কুশায় (এসো/১) কুসায় (এসো/৩) ৫ জে (এসো/১) ৬ বিস্মবণ (সু. সেন) ৭ এসো/১ পুথিতে আছে "১লা জৈষ্ঠ ধর্মদাস বসুর শ্রাদ্ধ" ; সংবাদটি কৌতূহলোদ্দীপক ৮ পাইবা (এসো/১) ৯ সপ্ত (এসো/১, এসো/৩), সত্ত (সু সেন—ভুল পাঠ) ১০ রাখেন (এসো/১) ১১ কেশ (এসো/৩)।

২১

মাহারাটী

তেজ ক্রোধ ক্ষেমা হও হের পরিচয় লও
নিবেদি তোমার বরাবরি।
চক্রবাক ক্রীড়া করে দেখি হর-চন্দ্র টলে
জন্মিলাম অন্ধকার পুরী॥
পাইয়া নির্মাণি রামা নির্মাণ করিল আমা
নাগ-বিষ [১]দিয়া[১] হস্তদান।
আমা পদ্মপত্রে থুইয়া গেল হরষিত হৈয়া
প্রবেশি বাপের বিদ্যমান॥
না মারিহ চণ্ডী গো সতাই।
শুন গো প্রবোধ-বাণী বাপ মোর শূলপাণি
পরিচয় হই তব ঠাঞি[৪]॥
দেখিয়া ত্রিদশ রায় নাম থুইলা মনসায়
পরিচয় দিলাম তাহারে।
মোরে বিধি বিড়ম্বনে আইলাম বাপুর সনে
যত্ন করি অনেক প্রকারে॥ ৩০০
তুমি [২]সত্ত[২] জননী জনক মোর শূলপাণি
একত্রে বঞ্চিব সুখে ঘরে।

নাহি করি তব ক্ষেতি নহি আমি দুষ্টমতি
কোন দোষে মারহ আমারে॥
যত বলে পদ্মাবতী প্রবোধ না মানে সতী
অধিক দুঃখিত মহেশ্বরী।
বলে দুষ্ট অবিনয় কভু জাতি নাহি তোএ
বলে তুঞি বাপ ভাতারি॥
যত তপ করে হর জাতি নাহিক তার
রতিরঙ্গ করে তোর সনে।
আজি এড়িবারে তোএ [৩]সত্য[৩] নাহি পুরে [৪]মোরে[৪]
দ্বিজ বিপ্রদাস সুরচনে॥

১ দিযে (সু. সেন) ২ সত্য (?), সপ্ত (এসো/১) ৩ সত্ত (এসো/১) ৪ মোয়ে (এসো/১)

২২
পাঁচালি

বাপের সহিত রতি ভুঞ্জ নিরন্তরে। লুকাইয়া রাখে আজি পুষ্পের ভিতরে॥
শুনিয়া মনসা কোপে হৈল হুতাশন। আপনা খাইয়া মোরে বল কুবচন॥ ৩০৫
আপন প্রকৃতি যেন [১]দেখসি[১] আমায়। হেন অসম্ভব কথা [২]প্রস্তাবে[২] কোথায়॥
মহা কোপে চণ্ডিকা লইল কুশাসন। তার [৩]ঘায়ে[৩] মনসার চক্ষু হৈল কাণ॥
হৃদয়ে যন্ত্রণা বড় পাইল প্রবল। বিষ দৃষ্টে চাহে পদ্মা উঠিল আনল॥
বিষ দৃষ্টে বিষ বর্ষে চণ্ডীর উপর। ঢলিয়া পড়িল চণ্ডী উত্তর শিয়র॥
দেখিয়া প্রমাদ গণি কার্তিক গণাই। কান্দিয়া কহিল গিয়া শঙ্করের ঠাঞি॥ ৩১০
মন্দিরে আনিলা বাপু কাহার রমণী। কেমন প্রকারে মোর বধিল জননী॥
কার্তিক গণাই বাপু করিলা অনাথ। শুনিয়া আইল ঘরে ত্রিদশের নাথ॥
দেখিল মনসা কান্দে আকান্দ ক্রন্দন। চণ্ডীর বদন চাহি নাহিক চেতন॥
দেখিয়া মূর্ছিত হর ভাবেন বিষাদ। কি হইল পদ্মা [৪]কেন[৪] হেন পরমাদ॥
পরম সন্তাপ [৫]হর[৫] ভাবেন অক্ষেমা। [৬]কেমনে[৬] বঞ্চিব আমি যদি মৈল উমা॥ ৩১৫
তবে ত মনসা বলে ক্রন্দন তেজিয়া। না কর সন্তাপ বাপু দিব জিয়াইয়া॥
সম্ভ্রমে বলেন হর কাতর হইয়া। সত্বরে চণ্ডিকা মোরে দেহ জিয়াইয়া॥
অমৃত লোচনে তবে চাহে বিষহরি। উঠিয়া বসিলা তরে দেবী মাহেশ্বরী॥
মনসা দেখিয়া কোপে অগ্নি হেন জ্বলে। লাফ দিয়া ধরিলেক মনসার চুলে॥
তাহা দেখি কোপে কাঁপে দেব পশুপতি। চণ্ডীরে ঠেলিয়া কোলে শৈল পদ্মাবতী॥ ৩২০
মহেশ বলেন চণ্ডী ক্রন্দন সম্বল। কেমনে কোন্দল ঘুচে অবিলম্বে বল॥
তবে চণ্ডী বলে যদি তেজ দুষ্টমতি। অরণ্যে নির্বাস উহা দেহ শীঘ্রগতি॥
তাহা শুনি মহাদেব মনসা বুঝায়। আর সতাইর ঘরে [৭]এড়িব[৭] তোমায়॥
দাণ্ডাইয়া হর পাশে রোদন-বদনে। অবিরত জল ধারা ঝরে ত লোচনে॥
অন্তরে বিষাদ পদ্মা বলে মৃদুস্বরে। তেজিয়া তোমার ঘর যাব কোথাকারে॥ ৩২৫
আসিতে নিরেধ [৮]বাপু কহিলা পশুপতি[৮]। আপনা খাইয়া আইলাম [৯]তোমার সংহতি[৯]॥

সত-মা হইয়া এত করে অপমান। কতেক লাঞ্ছনা আর চক্ষু হৈল কাণ॥
এত সব দুঃখ পদ্মা বিসরিয়া মনে। পুনরপি ধরিলেক চণ্ডীর চরণে॥
চণ্ডিকারে মনসা বিনয় বলে যত। জ্বরপিত্ত মুখে যেন চিনি [১০]লাগে[১০] তিতো॥
কিসেরে পাতসি মায়া আমার গোচরে। না পাইবা লজ্জা যদি চলহ সত্বরে॥[১১] ৩৩০
মহাদেব বলে পদ্মা বুঝাই তোমারে। চণ্ডীর কোন্দলে নিন্দা হব দেবপুরে॥
শুনিয়া নিষ্ঠুর কথা মনসা নৈরাশ। মমতা ছাড়িয়া চলে বলে বিপ্রদাস॥

১ দেখিস (এসো/১) ২ সম্ভবে (ঐ) ৩ ঘায় (এসো/৩) ৪ কৈল (সু. সেন) ৫ হয় (সু. সেন) ৬ কেমতে (এসো/৩) ৭ রাখিব (এসো/১) ৮ মোরে কৈলে নানা মতে (ঐ) ৯ তোমা সঙ্গেতে (ঐ) ১০ হয়ে (এসো/৩) ১১ 'স্বাক্ষর শ্রীরামজয় বসোস্য গাঁ চানক' (এসো/৩)

২৩

পয়ার

চণ্ডিকারে পদ্মা সত্য করাইল যত্নে। হের মোর নিদর্শন লহ পঞ্চরত্নে॥
যখন বাপুর [১]হয়ে[১] আপদ সময়। তখন অবশ্য মোরে জানাইবা নিশ্চয়॥
চলিল শঙ্কর পদ্মা প্রবেশে কাননে। শ্রম যুক্ত হৈলা দেবী কানন ভ্রমণে॥ ৩৩৫
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় ব্যথিত ত্রিলোচন। সিজুয়া পর্বতে হর হৈল উপসন্ন॥
তুলিল পর্বতে ধরি মনসার করে। সিজবৃক্ষ আছে সেই পর্বত উপরে॥
চারিদিগে প্রকাশিত রম্য সিজ তরু। সুন্দর শীতল ছায়া পরম সুচারু॥
সুশীতল দেখি বলে মনসা কুমারী। এইখানে বসি বাপু চলিতে না পারি॥
[২]বসিলা[২] মনসা দেবী সিজবৃক্ষ তলে। অবসন্ন মনসা শুইলা [৩]তরুমূলে[৩]॥ ৩৪০
দক্ষিণা শীতল বহে মলয়া-পবন। নিদ্রাযুক্তা পদ্মা হর ভাবে মনে মন॥
ধীরে ধীরে মহাদেব মনসা এড়িয়া। নিকটে দাঁড়াইয়া কান্দে ব্যথিত হইয়া॥
পড়িল নেত্রের জল [৪]নেত[৪] হৈল তায়। [৫]নেতে[৫] বলে বাপু কোথা এড়ি যাও মোয়॥
তবে তারে মহাদেব মহাজ্ঞান দিয়া। পদ্মার সহিত থাক অনুচরী হৈয়া॥
[৬]কথোদূর[৬] গিয়া হর ভাবে মনে মন। কানন ভিতরে রহে কন্যা দুই জন॥[৭] ৩৪৫
ললাটের ঘর্মে হর ধামাই সৃজিয়া। দুহাকার রক্ষা হেতু দিলা পাঠাইয়া॥
মমতা ছাড়িয়া গেলা দেব ত্রিলোচন। নিদ্রাভঙ্গ মনসা হইল সচেতন॥
আখি মুটি পদ্মাবতী হর না দেখিয়া। কান্দিতে লাগিলা তবে করুণা করিয়া॥
হেনকালে নেতো তারে দিলা পরিচয়। আমি ও [৮]ভগিনি[৮] হই তোমার সহায়॥
[৯]শিব-লোচনের জলে জনম আমার। ব্রহ্মজ্ঞান দিল মোরে বাপু মহেশ্বর॥ ৩৫০
তোমার সেবন হেতু পাঠাইল আমায়। না করিহ চিন্তা কিছু আমি তো সহায়॥[৯]
[১০]নেতোর[১০] বচনে দেবী হরষিত মনে। হেনকালে ধামাই আইল সেইখানে॥
ধামাই বলেন আমি পরিচয় হই। মহেশের পুত্র আমি তোমা দুহার ভাই॥
তোমা একেশ্বরী থুইলা [১১]সঙ্গী[১১] কেহ নাই। সঙ্গতি দিলেন মোরে নাম ধামাই॥[১২]
[১৩]নেত[১৩] পদ্মা ধামাই হরিষ [৬]হৈলা[৬] মন। আজি রহিল গীত বিপ্রদাস গান॥ ৩৫৫

১ হয় (এসো/১) ২ বসিলা (এসো/১) ৩ ক্ষিতিতলে (ঐ) ৪ নেতো (সু. সেন) ৫. নেতো (ঐ) ৬ কত দূর (ঐ) ৭ এসো/৩ পুথিতে এর পর আছে— 'শ্রী শ্রী'শ্রী গোকুল চন্দ্র সিংহ সাপুড়েই আছেন সাক্ষী

শ্রীকেশব বাম সিংহ।' ৮ ভগনী (সু. সেন) ৯. এসো/১-এ এ অংশ নেই ১০ নেতব (এসো/৩) ১১ সঙ্গে (এসো/৩) ১২ এসো/১-এব পয়ার :

ললাটের ঘর্ম্মে হর আমা সৃজিয়া।
তোমা দুহা রক্ষা হেতু দিল পাঠাইয়া।। আসলে ৩৪৬ পয়ারের পরিবর্ত পাঠ ১৩ নেৎ (এসো/৩)

প্রথম পালা সাঙ্গ

দ্বিতীয় পালা

১

[১]পাঁচালি[১]

[২]নেতো[২] পদ্মা ধামাই করিয়া অনুমানে। বিশ্বকর্ম্মা হনুমান চিন্তিল ধেয়ানে।।
ভল্লুক বাহনে বিশাই অন্তরীক্ষ পথে। উপনীত হৈলা আসি সিজুয়া পর্বতে।।
বিশ্বকর্মা প্রতি তবে পদ্মা কহে কথা। পুরী নির্মাইয়া [৩]দেহ[৩] বঞ্চি আমি [৪]হেথা[৪]।।
ত্বরিতে বিশাই স্থান করেন নির্মাণ। নানা বর্ণে পাথর আনেন হনুমান।।
বিচিত্র পাষাণে পোতা কৈল পঞ্চ হাত। শুভক্ষণে সূত্র ধরি নিবড়িল কাথ।। ১
ফটিকের[৫]স্তম্ভরূপা[৫] করিয়া গঠন। পাষাণে সাড়ক রূয়া পাটের বন্ধন।।
রূপসী ঝুমুকি তা মাঝে রত্নমণি। বিচিত্র ময়ূর পাখে করিল ছায়নি।।
চৌকাটা কপাট নির্মাইল [৬]তথি[৬] শোভা। নানা রত্ন ফণি মণি দীপ্ত অতি আভা।।
সকল পাচিরে শোভে সুবর্ণ কলস। নেতের পতকা তাহে দেখিতে রূপস।।
নির্মাইয়া পুরী বিশাই গেল নিজ স্থান। পাষণ্ডির দেশে বিশাই নিয়োজিল বাণ।। ১০
রাজ্য ছাড়ি প্রজা যত আইল ত্বরিতে। বসিল পদ্মার পুরে সিজুয়া পর্বতে।।
প্রথমে ব্রাহ্মণ বৈসে জানে শাস্ত্রনীত। ক্ষেত্রি বৈশ্য বৈদ্য বৈসে কাএস্থ হরষিত।।
ভট্ট দৈবজ্ঞ গোপ বারই কুমার। পঞ্চ বণিক বৈসে আর কর্মকার।।
বাদ্যপূরক কলু কুশলি কাঠুয়া। শাঁখারি কাঁসারি বৈসে [৭]তামলি[৭] সেকরা।।
তাঁতি যুগী মালাকার রজক নাপিত। ছুথার গাড়ার বৈসে হৈয়া হরষিত।। ১৫
ধীবর তিয়র মালা বৈসে নদী কূলে। হরিষে ছত্রিশ জাতি বৈসে কুতূহলে।।
নাহি শোক দুঃখ লোক সদা আনন্দিত। মনসা-চরণে বিপ্রদাস বিরচিত।।

---

১ পয়ার (এসো/১) ২ নেত (এসো/৩) ৩ দেও (সু. সেন) ৪ এথা (এসো/১) ৫ স্তম্ভে রূয়া (এসো/১) ৬ অতি (এসো/৩) ৭ কামার (এসো/১)

২

সুহাই

মনসা চলিল রঙ্গে প্রচুর সখীর সঙ্গে
আনন্দে বিচিত্র বেশ করি।
মোহন চামর গঞ্জি চাঁচর চিকুর বঞ্জি
বন্ধন করিয়া সুকবরী।।

ললাটে সিন্দুর-ভাতি তিলক অলক-পাতি
কজ্জলে উজ্জ্বল দু-নয়ান।
শ্রবণে কুণ্ডল দোলে ঝলমল গণ্ডস্থলে
ভুরু-যুগ কামের কামান।।
[১]অধরে[১] প্রকাশ ঈষত সুভাষ
পীযূষ বরিষে শশী।
গিবক যুবতী কেয়াপাতি অতি
বিজলী উজ্জ্বল নিশি।। ২০
কণ্ঠে কালকুটী হার গজমোতি
বিচিত্র কাচলি বেশে।
কেজুর কঙ্কণ নানা অভরণ
শঙ্খ ভুজে সবিশেষে।।
রাম রম্ভা তরু জিনি দুই উরু
মঞ্জীর বাজে সুললিত।
পদ্মার পয়ান উরগ যোগান
প্রজাগণ [২]উল্লসিত[২]।।
প্রতি-দ্বারে চারু রুপি রম্ভাতরু
তথি শোভে নানা ফুলে।
সব ঘরে ঘরে ভ্রমিয়া নগরে
আইলা সরোবর কূলে।।
রক্ত-উৎপল জিনি পদতল
কোমল চারু প্রকাশে।
যত অলিকুল চঞ্চল আকুল
বিহ্বল আমোদ রসে।।
কত রাজহংস [৩]কারণ্ড[৩] অবতংস
সরল কুরল সকল।
চকোয়া অবিশাল ডাহুকা সামুখাল
কোড়া কামি গাড়াপোল।। ২৫
সারস বক [৪]কঙ্ক[৪] সরালি মৎস্যবঙ্ক
শঙ্খচিল উড়ি বুলে।
তিথির ময়ুর বিহগ প্রচুর
চরন্তি সরোবরকূলে।।
চৌদিগে অবিশাল রসাল ফলে তাল
পনস [৫]চ্যুত[৫] নারিকেল।
সুগন্ধি পুষ্পবন অপূর্ব রচন
ভ্রমর পিকু কোলাহল।।
তেজি সবে ব্রীড়া করন্তি জলক্রীড়া
মনসা সঙ্গে সহচরী।

জলেতে করতালি আনন্দে সখী মেলি
কওয়া কওয়া বোল করি।।
কেহ ডুব দিয়া মৃণাল তুলিয়া
ভাঙ্গি সেই সুবদনে।
মেলিয়া আর সখী কৌতুকে তাহা দেখি
কাড়িয়া লয় রস মনে।।
তুলিয়া পদ্মদণ্ড করিয়া [৬]দুই-খণ্ড[৬]
চুমুক দিয়া জল তোলে।
[৭]অন্যে অন্যে[৭] কেলি জল পেলা পেলি
দিয়ন্তি বড় কুতূহলে।। ৩০
কমল-ফুল তুলি আকাশে দেই ফেলি
[৮]লুকিয়া[৮] ধরে কেহরঙ্গে।
ভাঙ্গিয়া পদ্ম ডাঁড়ি প্রচুর ফুল ছিঁড়ি
ফেলিয়া মারে কারো অঙ্গে।।
কেহ পদ্মফুল তুলিযা কুতূহল
পরের অঙ্গে হরষিতে।
সমাদি জল-কেলি চলিল সভে মেলি
বিপ্রদাস বিরচিতে।।

---

১ অধব (এসো/১, এসো/৩) ২ উল্লাসিত (এসো/১) ৩ কবে (ঐ) ৪ বঙ্ক (সু সেন) ৫ চুত (ঐ) ৬ খণ্ড খণ্ড (এসো/১, এসো/৩) ৭ জনে জনে (এসো/৩) ৮ লোফিযা (এসো/১)

৩

পাঁচালি

হেনই সময়ে তথা গন্ধর্ব কুমারী। বিনালতা উপনীত ব্রহ্মা বরাবরি।।
তাহা দেখি ব্রহ্মার হইল শুক্রপাত। [১]অঙ্গুষ্ঠ[১] প্রমাণ [২]জন্মে[২] ঋষি সাত শত।।
ব্রহ্মার আজ্ঞায় তারা গেল তপোবনে। তবে অবশেষে দুই কুমার সৃজনে।। ৩৫
দেব কায় সপ্ত মুখ পুচ্ছ পদভাগে। ব্রহ্মা বরাবরেতে অমর বর মাগে।।
দেখিয়া সদয় ব্রহ্মা [৩]সে দুই কুমার[৩]। দেব বিধি উপায়ন করিল তাহার।।
আসন বসন দ্বিজে সুসিদ্ধি জগতে। সিজুয়া পর্বতে থাকে দেবীর অগ্রেতে।।
শুক্রপাত স্থানে দিল কমণ্ডল জল। জন্মিল [৪]দুরন্ত[৪] ব্যাঘ্র দেখি ভয়ঙ্কর।।
বিকট দশন গোপ করে ফরফর। সম্ভ্রমে বলেন ব্রহ্মা তাহা বরাবর।। ৪০
কপিলানন্দন হইতে পাবে পরাজয়। গন্ধর্ব হইয়া যাবে ইন্দ্রের নিলয়।।
ঝড় প্রায় উড়ে ব্যাঘ্র ব্রহ্মার মায়ায়। খিরদ নিকট রহে বিপরীত কায়।।
তবে দুই ব্যাঘ্র বলে [৫]পদ্মা[৫] বিদ্যমানে। ব্রহ্মার তনয় মোরা রব এইখানে।।
পরম গৌরব করি থুইল কুতূহলে। দেবগণে নিদ্রা-যজ্ঞ করে হেন কালে।।
চণ্ডিকারে নিয়োজিল করিতে [৬]রন্ধনে[৬]। আপনি চলিলা ব্রহ্মা চণ্ডীর [৭]ভবনে[৭]।। ৪৫

শয়নে আছিলা দেবী নিদ্রায় আকুলি। বসনের [৮]বাহির[৮] ছিল [৯]কনেষ্ঠ[৯] অঙ্গুলি।।
রূপ নিরক্ষিতে ব্রহ্মার চন্দ্র টলে। প্রবেশ চণ্ডীর গর্ভে হৈল হেন কালে।।
নিদ্রাভঙ্গ হৈয়া দেবী জানিল ধেয়ানে। যজ্ঞস্থানে গিয়া দেবী করিল [১০]রন্ধনে[১০]।।
মহামায়ার মোহিত সকল সিদ্ধাগণ। হরিল সিদ্ধার মন করিয়া মোহন।।
তাঁরে ছলিবারে গোর্থ প্রবেশি উদরে। দ্বার রুদ্ধ কৈল দেবী প্রসবিতে নারে।। ৫০
দেবীরে কাতর দেখি দিলেন এড়িয়া। গর্ভপাত কৈল যমুকার জলে গিয়া।।
সেই হৈতে গর্ভপাত হয় ত সংসারে। সেই স্থানে কপিলা আইলা হেন কালে।।
তৃষায় আকুল দেবী জলপান করে। [১১]জল মধ্যে[১১] গর্ভপাত প্রবেশে উদরে।।
ব্রহ্মবীর্যে কপিলা হইল গর্ভবতী। এক দুই তিন চারি পাঁচ মাস স্থিতি।।
ছয় সাত অষ্ট নয় হৈল দশ মাস। প্রসব বেদনা কাল হইল প্রকাশ।। ৫৫
গর্ভের লক্ষণে তেজময় অসম্ভব। পূর্ণ দশ মাস হইল পুত্র প্রসব।।
তেজ বল অদভুত দেখি মহাবীর। দেখিয়া প্রভাব ক্ষিতি [১২]হয়েত[১২] অস্থির।।
চোরা গাই মিলে গিয়া কপিলা সংহতি। পরশস্য হরিবারে দিলেক কুমতি।।
দুবরাজ নামে এক ছিল দ্বিজবর। তার বাড়ি দেবী লৈয়া চলিল সত্বর।।
নবীন কনকা শাক দুই জনে খায়। মহাশঠ চোরা গাই চারিদিক চায়।। ৬০
হেন কালে দ্বিজ আইল হাথে লৈয়া বাড়ি। পলাইল চোরা গাই দিয়া রড়ারড়ি।।
শাক খায় কপিলা কিছুই [১৩]নাহি[১৩] জানে। ধরিল ব্রাহ্মণ গিয়া কপিলার কানে।।
গলায় পাটের কাছি খোটায় বান্ধিয়া। হেম ঘণ্টা কাড়ি লয় কাষ্ঠ-ঘন্টা দিয়া।।
দৈবের নির্বন্ধ তার না যায় খণ্ডন। বিপ্রদাস বলে দেবী করয়ে ক্রন্দন।।

১ আঙ্গুল (এসো/১) ২ জর্মে (সু. সেন) ৩ দেখি সুকুমার (এসো/১) ৪ দারুণ (ঐ) ৫ পদ্মার (ঐ) ৬ বন্ধন (সু. সেন) ৭ ভুবন (ঐ) ৮ বাহিরে (এসো/১) ৯ কনিষ্ঠ (ঐ) ১০ বন্ধনে (সু. সেন) ১১ সঙ্গে (এসো/১ এসো/৩) ১২ হয়েন (এসো/৩) ১৩ না (এসো/১)

৪
মাহরাটী

আক্ষেমা ভাবেন মাতা দাঁড়ায়্যা ভূতলে। অবিরত জল ঝরে নয়ন যুগলে।। ৬৫
কেন এতদূর আইল পাইল কুবুদ্ধি। এত অপমান মোরে কেনি করে বিধি।।
কান্দেন কপিলা মাতা অঝর-নয়ানে। সংসার ভরিয়া হৈল এত অপমানে।।
[১]অন্যজাত[১] পুত্র কোথা আইল এড়িয়া। হাব্যাসে মরিব পুত্র দুগ্ধ না খাইয়া।।
এতক্ষণ পুত্র মোর চায় কার মুখ। ভাবিতে চিন্তিতে বিদরয়ে মোর বুক।।
জানিয়া শুনিয়া মোর এতেক কুমতি। আপনা খাইয়া আইনু দুষ্টের সংহতি।। ৭০
দুষ্টের সংহতি দুষ্ট হইনু আসিয়া। কলাইল বিধি আমা এই দোষ দিয়া।।
আমি ত্রিভুবনেশ্বরী জগৎ জননী। আপনা পাসরি হেন কর্ম কৈল কেনি।।
অতিশয় লোভে হৈল সকলি বিনাশ। মনসা চরণে বলে দ্বিজ বিপ্রদাস।।

১ অন্য জাত (সু. সেন)

৫
[১]মহারাটী[১]

বিষাদিত হৈয়া দেবী করেন ক্রন্দন। যত জল পড়ে হয় [২]রতন[২] কাঞ্চন।।
আসিয়া ব্রাহ্মণ দেখি দেবীর মহিমা। চরণে পড়িয়া করে করুণা অক্ষেমা।। ৭৫
কোন দেব মায়ারূপী না [৩]জানি[৩] নিশ্চয়। তবে ত কপিলা তারে দিলা পরিচয়।।
লোটায়্যা ধরণা দ্বিজ কপিলার পায়। অজ্ঞানে করিনু দোষ ক্ষেম মহামায়।।
হেম-ঘণ্টা দিল দ্বিজ সর্ব রত্ন লৈয়া। পুত্র দেখিবারে যান উর্ধ্বমুখী হৈয়া।।
মহাব্যাঘ্র দুর্জয় আইল আচম্বিতে। নিদয় বাঘিনী দুই ডম্বুর সহিতে।।
কপিলা রহায়্যা পথে চাহে সংহারিতে। কাতর হইয়া বলে তাহার সাক্ষাতে।। ৮০
প্রসব হইনু কালি নিশিতে তনয়। আজি এতক্ষণ হৈল দুগ্ধ নাহি খায়।।
দুগ্ধ না খাইয়া পুত্র [৪]হারাইব[৪] পরান। তবে দুগ্ধ দিয়া আসি তোমা বিদ্যমান।।
দয়াযুক্ত হৈল বাঘ দেখি কপিলায়। সত্য করাইয়া তারে দিলেক বিদায়।।
এথা মনোরথ বীর তৃষ্ণায় বিকল। বম্লুকার যত জল খাইল সকল।।
তবে যত জল জন্তু গড়াগড়ি বুলে। শয়ন করিলা বালা [৫]কানন ভিতরে[৫]।। ৮৫
জননী না দেখি শিশু করেন ক্রন্দন।[৬] হেন কালে কপিলা আইলা সেই স্থান।।
জননী দেখিয়া বালা হরষিত মন। পুচ্ছ তুলি মনোরথ দুগ্ধ করে পান।।
পুত্র দেখি কপিলায় করেন ক্রন্দন। মনোরথ দেখিলেন মায়ের [৭]বদন[৭]।।
মনোরথ বলে মাতা কান্দ কি কারণ। কান্দিয়া কহিল দেবী সকল কারণ।।
সত্য করিয়াছি আমি ব্যাঘ্র বিদ্যমানে। তার ভক্ষ হব তোমা রাখিয়া কেমনে।। ৯০
শুনি মনোরথ এত ক্রোধে কম্পমান। ব্যাঘ্র বধি মায়ের করিব দুগ্ধ পান।।
কোথা সত্য করিয়াছ [৮]ব্যাঘ্রের সম্মুখে[৮]। প্রবোধ না মানে বীর [৯]চলে উর্ধ্বমুখে[৯]।।
আগে মনোরথ বীর কপিলা পশ্চাতে। উপনীত হৈল গিয়া ব্যাঘ্রের অগ্রেতে।।
কপিলা দেখিয়া ব্যাঘ্র সংহারিতে যায়। অহঙ্কার করি মনু বাঘেরে রহায়।।
তোমা আমা খানিক করিয়া দেখি রণ। আমারে জিনিয়া মায়ে [১০]করিহ[১০] ভক্ষণ।। ৯৫
রুষিয়া বলেন ব্যাঘ্র দুর্জয় শরীর। ত্রিভুবনে মোর সম কেবা আছে বীর।।
পতঙ্গ হইয়া আইস আনলে পড়িতে। নাসিকার শ্বাসে উড়ি যাবে কোন ভিতে।।
তবে মনোরথ বীর কুপিত অন্তরে। বিশ্বম্ভর [১১] মূর্তি[১১] ধরি কাঁপে থর হরে।।
সঘনে ফোফায় কোপে কাঁপে মনোরথ। প্রবল পবন যেন বহে ঘন-বাত।।
শৃঙ্গে উজালিয়া মাটি পেলায় গগনে। ইন্দ্র আদি দেবগণ চমকিত মনে।। ১০০
কোপে মনোরথ বীর হৈল কালানল। চরণের ভরে ক্ষিতি করে টলমল।।
ব্রহ্ম তেজে জন্ম বীর বিদিত ভুবনে। ব্রহ্মা আদি দেবগণ সবে অধিষ্ঠানে।।
চরণে পবন বৈসে শৃঙ্গে বৈসে যম। ত্রিভুবনে বীর নাহি হয় তার সম।।
দুই[১২] আঠ[১২] পাতি করে বিপরীত শব্দ। শুনি ত্রিভুবনে লোক সবে হৈল স্তব্ধ।।
চরণে উড়ায় ধূলা পুচ্ছ বাউলায়। নিকটের তরুগণ কিছু নাহি রয়।। ১০৫
ঘোরতর ডাক ছাড়ে দেয় হুহুঙ্কার। স্বর্গ মর্ত্য রসাতল লাগে চমৎকার।।
সারি দুই বিষাণ বধিতে যায় রোষে। মনসা চরণে বলে দ্বিজ বিপ্রদাসে।।

---

১ পাচালি (এসো/৩) ২ রজত (এসো/১, এসো/৩) ৩ জানো (এসো/১) ৪ হারাবে (এসো/১) ৫ বম্নুকার কূলে (এসো/১) ৬ এসো/৩ পুথিতে 'লিক্ষ্য শ্রীলক্ষ্মী কান্ত সিংহস্য তেরিখ অগ্রহায়ণ' কথাটুকু

লেখা ৭ রোদন (সু. সেন) ৮ বাঘের সহিতে (এসো/১, এসো/৩) ৯ চলিল ত্বরিতে (ঐ) ১০ করহ (এসো/৩) ১১ শক্তি (এসো/৩) ১২ আটু (এসো/১)

৬

পটমঞ্জরী

মনোরথ দেখি ব্যাঘ্র ক্রোধে কালানল। প্রবীণ শরীর তার উভে সপ্ত-তাল॥
যম সম চোখ নখ যেন হীরাধার। প্রচণ্ড যুগল-আখি অগ্নি-অবতার॥
কোপে কালানল ব্যাঘ্র বিপরীত বল। চরণের ভরে ক্ষিতি করে টলমল॥[১] ১১০
বিকট দশন ঘন তোলা [২]দেয়[২] গোপে। বিক্রম করিয়া ক্ষিতি লাফ দেয় কোপে॥
দুই কর্ণ তুলিয়া আনল-দৃষ্টে চায়। পাষাণ ভাঙ্গিতে পারে দশনের ঘায়॥
ঘন পুচ্ছ বাউলায় মস্তক উপরে। বিক্রম করিয়া যায় মনোরথ তরে॥
দোহার বিক্রম দেখি কপিলা তরাস। মনসা-চরণে বলে দ্বিজ বিপ্রদাস॥

১ পত্রের শেষে এসো/১ পুথির সামান্য সংবাদ '২৩ জ্যেষ্ঠ ভর্ত্তি ( ) না ২৪ জ্যেষ্ঠ হইল' ২ দেই (এসো/১)

৭

[১]পাঁচালি[১]

পরাক্রম করি উঠে মনোরথ বীর। শরীর প্রচণ্ড বলে বিক্রমে সুধীর॥ ১১৫
ব্রহ্মাতেজে জন্ম তার কপিলা জননী। অতি বলবন্ত রণে জিনিয়া ধরণী॥
দুর্জয় শরীর ব্যাঘ্র মহাবল ধরে। শরীর বজ্রের সম জিনিয়া সংসারে॥
[২]তবে মনোরথ বীর রুষিল তাহারে। শৃঙ্গ সারিয়া যায় বধিবার তরে॥
[৩]কুপিল[৩] দুর্জয় ব্যাঘ্র ধরিল বিষাণে। মহাশব্দ করি বীর শৃঙ্গ ধরি টানে॥[২]
তবে মনোরথ বীর শৃঙ্গ-নাড়া দিল। এক লাফ দিয়া বাঘ অন্তরে রহিল॥ ১২০
ছি ছি বলি মনোরথ উপহাস করে। পলাইয়া শৃগাল প্রায় যাও কেন দূরে॥
ক্রোধ মুখে আসি ব্যাঘ্র তাহার নিয়ড়। লাফ দিয়া তার পৃষ্ঠে মারিল কামড়॥
ব্রহ্মাণ্ড ভেদিল যেন শেলের প্রহারে। [৪]লাঙ্গল সিবাল[৪] যেন নখেতে বিদারে॥
সর্বাঙ্গ বাহিয়া ধারে পড়িছে রুধির। মহাক্রোধে মনোরথ কম্পিত শরীর॥
শৃঙ্গ সারি মনোরথ মারিবারে যায়। লাফে লাফে বুলি ব্যাঘ্র বাঙ্গালি খেলায়॥ ১২৫
[৫]বৃষের বিক্রমে[৫] ব্যাঘ্র বল নাহি টুটে। লাফ দিয়া উঠে গিয়া মনোরথ ঝুটে॥
ঘাড় ভাঙ্গিবারে চাহে ধরিয়া চোয়ালে। মুখে রক্ত উঠে বীর চক্রাবর্তে বুলে॥
হৃদয়ে বেদনা বড় সম্বিত না পায়। ঝাঁকারিয়া মনোরথ বাঘেরে পেলায়॥
বিক্রম করিয়া মনু তাহার [৬]সম্মুখে[৬]। [৭]দুই আঠু পাতি ক্ষিতিতলে দিয়া বুকে[৭]॥
বুক মাঝে দুই শৃঙ্গ বিদারিল কোপে। ঘুঁটা দিয়া হুঙ্কারিয়া বার কত [৮]লোকে[৮]॥ ১৩০
লুকিয়া ক্ষেপেতে ফেলে ক্রোধে হুতাশন। টানিয়া পেলিল বাঘে উপর গগন॥
তৃণ যেন উড়াইল বিপরীত ঝড়ে। যাজন অন্তরে গিয়া ভূমিতলে পড়ে॥
বিপরীত শব্দ করি পড়ে মহাসুর। হাড় গোড় পাঁজর ভাঙ্গিয়া হৈল চুর॥
বাঘিনী রুষিল তবে বাঘের মরণে। চরণ প্রহারে তার বধিল পরাণে॥

দুই গোটা ছা তার পলায় তুরিতে। সেই [৯]বাঘ[৯] সঞ্চার হইল অবনীতে॥[১০] ১৩৫
গন্ধর্ব হইয়া বাঘ গেল ইন্দ্রপুরে। যুদ্ধ জিনি মনোরথ গেল নিজ ঘরে॥
থাকিল বাঘের যুদ্ধ ঘুষিতে সংসার। দ্বিজ বিপ্রদাস বলে মনসা-কিঙ্কর॥

১ পয়ার (এসো/১) ২ এই পয়ার দুটি এসো/৩-এ অতিরিক্ত ৩ কপিল (সু. সেন) ৪ গিরি শৃঙ্গ হেন (এসো/১) ৫ বিষম বিক্রম (সু. সেন) ৬ সাক্ষাতে (এসো/১) ৭ ক্রোধ করি দুই আটু পাতিল ক্ষিতিতে (ঐ) ৮ লোকে (সু. সেন) ৯ ব্যাঘ্র (এসো/১) ১০ 'স্বক্ষর শ্রীকেশব সিংহ সাং দত্ত পুখরিয়া' (এসো/৩)

৮

পয়ার

মুনিগণ সঙ্গে করি দেব প্রজাপতি। স্নান করিবারে গেলা বড় হৃষ্ট মতি॥
আশ্চম্বিতে দেখে সবে সমুদ্রের নাশ। সংশয় দেখিয়া সভের হইল হুতাশ॥
ধ্যান করি প্রজাপতি জানিল বিশেষ। মুনিগণ সঙ্গে গেলা যথায় মহেশ॥ ১৪০
কহিল সকল কথা ঋষি প্রজাপতি। [১]শুষিল[১] সিন্ধুজল কাহার শকতি॥
মৎস্য আদি জলজন্তু মরিল আপার। কেমত প্রকারে তার হয়ে [২]প্রতিকার[২]॥
শুন শূলপাণি সব [৩]জানিল[৩] ধেয়ানে। অবিলম্বে সিন্ধু তীরে আইলা ততক্ষণে॥
হর বলে শুনহ নারদ মহামুনি। কপিলা আনহ গিয়া তুরিতে আপনি॥
কপিলা বড়ই সতী বলে দেবগণ। ব্রহ্মা বীর্যে জন্ম হৈলা কপিলা নন্দন॥ ১৪৫
হর আজ্ঞা পাইয়া নারদ মুনি যায়। কপিলা দেখিয়া মুনি বন্দিলা বিনয়॥
চলহ কপিলা মাতা পুত্রের সংহতি। তোমারে [৪]যাইতে[৪] আজ্ঞা কৈলা পশুপতি॥
নারদ বচন দেবী শুনিয়া শ্রবণে। সিন্ধুতীরে সত্বরে পয়ান তিনজনে॥
কপিলারে সভে হয়ে সম্ভ্রমে প্রণাম। কোন যুগে দেব নারে না হইয় বাম॥
কবি বিপ্রদাস বলে বন্দিয়া জগতী। কপিলারে [৫]স্তব[৫] করে দেব পশুপতি॥ ১৫০

১ কে শুষিলা (এসো/১) ২ প্রতিকারে (সু. সেন) ৩ জানিলা (সু. সেন) ৪ জানাইতে (এসো/১) ৫ স্তুতি (এসো/১)

৯

পটমঞ্জরী

তুমি দেব নিরঞ্জন কৈলা সৃষ্টি পালন
যত কিছু তোমার সৃজন।
জগৎ জননী তুমি কি আর বলিব আমি
রক্ষা কৈলা এ তিন ভুবন॥
অযোনিসম্ভবা কায়া কে বুঝে তোমার মায়া
ভুবন পালিকা তুমি উমা।
ব্রহ্মা আদি দেবগণ ধ্যান আদি স্তবন
[১]তমু[১] ত বলিতে নারে তোমা॥

কপিলা, কেবা জানে মহিমা তোমার।
জলজন্তু লক্ষ লক্ষ মরে কেহ নাহি পক্ষ
কেমনে হইবে প্রতিকার॥
তুমি যদি হও স্থির দেহ একবার ক্ষীর
সমুদ্রের হউক পরিত্রাণ।
ব্যাস আদি যত ঋষি যত সব স্বর্গবাসী
কহি কিছু কর অবধান॥
[২]কি[২] জানি মহিমা তব নিন্দিল দেবতা সব
সেই অপরাধ ক্ষেম মোরে।
এই মনোরথ বীর শুষিল সমুদ্রনীর
অকালে সকল জীব মরে॥ ১৫৫
শুনিয়া হরের কথা লাজে দেবী হেঁট মাথা
একবার দুগ্ধ তথি দিল।
কপিলা ভকত বন্ধু পুরিয়া উঠিল সিন্ধু
ধন্য [৩]ধন্য[৩] ঘোষে দেবকুল॥
কপিলা বিদায় হৈলা গৃহস্থ [১]পুরীতে[১] আইলা
স্নান দান করে দেবগণ।
কহে বিপ্রদাস কবি বন্দিয়া মনসা দেবী
কৈলাসে বসিলা ত্রিলোচন॥ ১৫৭

১ তবু (এসো/১) ২ না (ঐ) ৩ পুণ্য (ঐ)

১০

পয়ার

ঘুষিবারে সংসারে থাকিল এ বারতা। তপ করে সিন্ধুতীরে দুর্বাসা সর্বথা॥ ১৫৮
বিচিত্র তাম্বের পাত্র লইয়া বিধাতা। সিন্ধুকূলে সাজিফুলে হৈলা উপনীতা॥
গতমাত্র বিধি তত্র পাত্র মাজিবারে। এক টিয়া সিরজিয়া আদেশিল তারে॥ ১৬০
আসিবারে মর্ত্যপুরে [১]তেতুলির[১] ফল। পাঠাইয়া দিল টিয়া গেল মহীতল॥
লইয়া তেতুলি টিয়া ধাতা অঙ্গীকারে। দেহ কিছু ডাকে পিছু দুর্বাসা তাহারে॥
নাহি দেয় টিয়া যায় মুনিশাপ দিল। মুখ হৈতে আশ্চম্বিতে ক্ষীরোদে পড়িল॥
[২]তেতুলিতে[২] দুগ্ধেতে হইল এক ঠাঞি। [৩]ততক্ষণে[৩] মিলনে সকল হৈল দই॥
স্নান বিনে ক্রিয়া হীনে চিন্তে সুর পুরে। ব্রহ্মা বলে হবে ভালো কিছু [৪]অবসরে[৪]॥ ১৬৫
হৃদয়ে বিস্ময় করি চলে দেবগণ। দুর্বাসা লইয়া কিছু শুন বিবরণ॥
কৌতুকে দুর্বাসা মুনি ভ্রমেন কৈলাসে। কৈলাসের রূপ গুণ দেখেন হরিষে॥
অচল কৈলাস অতি দিব্য রম্য ধাম। ব্রহ্মা আদি করি তথা দেবতা বিশ্রাম॥
ভৃগু পরাশর ঋষি আছয়ে যেখানে। আছয়ে তপস্যা করি পরম গেয়ানে॥
কোথাও পরম যোগী সিদ্ধ বিদ্যাধরে। কোথাও তম্বুরু গান মধুর সুস্বরে॥ ১৭০

গায়ন্তি মধুর গীত শুনি মনোহরে। মত্ত মধুকর যেন আনন্দে গুঞ্জরে।।
বিদ্যাধর অপছর আছে কুতূহলে। গায়ন্তি নৃত্যন্তি তথা সুচাঁদ [৫]সুভালে[৫]।।
স্থানে স্থানে কল্পতরু তথায় নিবসে। জরা মৃত্যু দুঃখ শোক হবে তপ-রসে।।
তথায় অমরগণ থাকে নিরবধি। পিয়ন্তি অমৃতধারা ঝরে কলানিধি।।
মহা-মহৌষধি তরু আছে কোন স্থানে। দুঃখ শোক মৃত্যু নহে তার [৬]পরশনে[৬]।। ১৭৫
পক্ষিগণ কোলাহল সুললিত ধ্বনি। পবন আহার করি আছে কত ফণী।।
নানা বর্ণে পশু তথা মৃগ নানা জাতি। নৃত্যন্তি ময়ূরগণ পরম পীরিতি।।
এত সব দেখি মুনি করেন ভ্রমণ। হেন কালে দেখে তথা বিদ্যাধরীগণ।।
সেইখানে মুনিবর চলিল সত্বরে। পারিজাত দেখে মুনি বিদ্যাধরী করে।।
দুর্বাসা বলেন মালা দেহত আমারে। যতন পূর্বকে মালা লৈল মুনিবরে।। ১৮০
তপস্থানে আগমন কৈল মুনিবর। সেই পারিজাত দিলা দেখি পুরন্দর।।
সেই পুষ্প থুইল ইন্দ্র ঐরাবত শিরে। দৈবযোগে খসি পড়ে পথের উপরে।।
পুষ্প দেখি মুনিবর [৭]কোপে[৭] কম্পমান। বিনাশ করিব আজি সহস্র নয়ান।।
এত অহঙ্কার ইন্দ্র মোরে হেলা করে। [৮]লক্ষ্মী[৮] শাপ দিলে কেবা রাখিবারে পারে।।
আজি হৈতে ইন্দ্র তোর ছাড়ুক কমলা। অক্ষয় সূত্র আর ছিঁড়ে জাপ্য মালা।। ১৮৫
ক্রোধিত হইল মুনি আনল সমান। প্রমাদ [৯]গণিল[৯] দেখি যত ঋষিগণ।।
সুরপতি সুর সঙ্গে গন্ধর্ব কিন্নর। চরণে ধরিয়া স্তুতি [১০]করন্তি[১০] বিস্তর।।
ইন্দ্রের স্তবন স্তুতি মুনি নাহি শুনে। লক্ষ্মীপানে দুর্বাসা চাহেন কোপমনে।।
লক্ষ্মী [১০]কহে[১১] ইন্দ্র তোর হৈল সর্বনাশ। চিন্তিয়া জগৎগৌরী বলে বিপ্রদাস।। ১৮৯

---

১ তেতুলেব (এসো/১) ২ তেতুলে (এসো/১) তে তুলেতে (এসো/৩) ৩ ততক্ষণ (সু সেন) ৪ অপসরে (এসো/১, এসো/৩) ৫ সুতালে (এসো/১) ৬ দবশনে (এসো/৩) ৭ ক্রোধে (এসো/১) ৮ আমি (ঐ) ৯ তুলিল (এসো/৩) ১০ কবেন (এসো/১) ১১ কহেন (এসো/১, এসো/৩)

১১

সুহাই

লক্ষ্মী বলে ইন্দ্ররাজ নষ্ট কৈলা সর্ব কাজ
দুর্বাসা মুনির শাঁপ লৈয়া।
[১]পাইয়া[১] পারিজাত মালা কৈলা তারে অবহেলা
ত্রিপথে আইলা পেলাইয়া।। ১৯০
তপ সঙ্কলিয়া ঋষি সেই পথে পরবেশি
পুষ্প দেখি কোপে হুতাশন।
কোপে কাঁপে মুনিবরে শাপ দিল তোমা তরে
যাই আমি তাহার কারণ।।
ইন্দ্রের বদন দেখি হৃদয়ে পরম দুঃখী
বলে দেবী স্বরূপ বচন।
যা কর [২]অক্ষেমা[২] তুমি বঞ্চিতে নারিব আমি
দুর্বাসা বড়ই নিদারুণ।।

আমি জলনিধি যাই অলক্ষণে রক্ষা নাই
পূজা না পাইব দেবগণ॥
কপিলা হরিব ক্ষীর মেঘেতে হরিব নীর
রাজচর্চা হরিব রাজন॥
কুবের হরিব ধন অধর্মে [৩]রহিব[৩] মন
চন্দ্র সূর্য নহিব উদয়।
সিদ্ধায় হরিব জ্ঞান ঋষি মুনি হতধ্যান
দিবা রাত্রি [৪]নিহব[৪] নিশ্চয়॥ ১৯৫
পৃথিবী হরিব শস্য সলিলে হরিব মৎস্য
ধরণী হইব সঙ্কলিত।
নদীতে হরিব জল বৃক্ষেতে হরিব ফল
শাস্ত্র নীত হরিব পণ্ডিত॥
পুণ্য ছাড়ি যত সতী অধর্মে পাতিব মতি
দুষ্ট জনে হৈব অধিকার।
শূদ্র দ্বিজে [৫]সংহারিব[৫] লঘু-গুরু না মানিব
সকলি হইব একাকার॥
শুনিয়া লক্ষ্মীর বোল মৃতবৎ আখণ্ডল
কান্দে ইন্দ্র অঝর-নয়নে।
স্বর্গে যত দেবগণ অতি বিষাদিত মন
বিধি পশুপতি নারায়ণে॥
ছাড়ি লক্ষ্মী ইন্দ্রপুরে যান দেবী ধীরে ধীরে
প্রবেশ করিলা বনবাস।
মনসা-চরণ গতি চিন্তিয়া যে একমতি
বিরচিল দ্বিজ বিপ্রদাস॥ ১৯৯

---

১ পাইলা (এসো/৩) ২ অক্ষেম (এসো/১), অপেক্ষা (সু. সেন) ৩ হরিব (এসো/৩) ৪ নহিব (এসো/১)
৫ নামানিব (এসো/৩)

১২

পয়ার

তেজিয়া অমরাবতী লক্ষ্মী বনবাস। এ তিন [১]ভুবনে[১] লোকে লাগিল তরাস॥ ২০০
বৃক্ষরাজ প্রতি দেবী কৈল সম্বিধান। বঞ্চিব তোমার লক্ষে দেহ মোরে স্থান॥
মিনতি করিয়া বৃক্ষ কহে বিদ্যমান। নিবেদন [২]শুন[২] মাতা কর অবধান॥
আমি বৃক্ষ তুমি ত্রিভুবনের ঈশ্বরী। কি শক্তি আমার তোমা সম্বরিতে পারি॥
তথা হৈতে পদ্মালয়া করিলা গমন। পর্বত নিকটে গিয়া দিলা দরশন॥
দাঁড়াইয়া পর্বত কাছে [৩]বলিলা[৩] তথাই। বঞ্চিব তোমার লক্ষে [৪]দেহ মোরে[৪] ঠাঞি॥ ২০৫
সুমেরাদি গিরি বলে করিয়া মিনতি। রাখিবারে নারি আমা সভার শকতি॥
তথা হৈতে জননী করিলা [৫]আগমন[৫]। সমুদ্রের তীরে গিয়া [৬]হইল উপসন্ন[৬]॥

ক্ষীর নদী প্রতি বলে নিকটে দাঁড়াইয়া। দুর্বাসা গেলেন ইন্দ্রে [৭]পারিজাত[৭] দিয়া।।
মদগর্বে ইন্দ্র পথে ফেলাইল মালা। কোপে মুনি শাপ দিলা ছাড়ুক কমলা।।
মুনি শাপে সুরপুর ছাড়িলাম আমি। বঞ্চিব তোমার লক্ষে স্থান দেহ তুমি।।
ক্ষীর-নদী বলে মাতা তুমি সর্বমই। [৮]বঞ্চিহ[৮] আমার লক্ষে আমি দিব ঠাঁই।। ২১০
ধান্য আদি শস্য চন্দ্রামৃত ঐরাবত। উচ্চশ্রবা পারিজাত লক্ষ্মী অনুগত।।
ক্ষীরোদ [৯]সমুদ্রে[৯] দেবী থাকিল লুকায়্যা। প্রমাদ পড়িল এথা দেবপুর লৈয়া।।
দেবত্ব নাহিক পাপ পুণ্যের বিচার। দিবারাত্রি নাহি সব হৈল একাকার।।
ইন্দ্র আদি করিয়া সকল দেবগণ। বিধি লইয়া [১০]একত্র[১০] করেন অনুমান।।
দেবলোক ছাড়ি লক্ষ্মী রহে সিন্ধুদেশে। কেমতে প্রতুল হয় কহত বিশেষে।। ২১৫
ভাবিয়া বলিলা তবে ব্রহ্মা হরি হর। সভে মেলি ক্ষীর-নদী মথহ সত্বর।।
ক্ষীর নদী দধিভাণ্ড হব বসুমতী। ঘোটাগড়ি হইব আপনি পশুপতি।।
মন্দার মথন দণ্ড বাসুকি টানাদড়ি। হনুমান বাসুকির ধরিব লেঙ্গুড়ি।।
সর্ব দৈত্য ধরিবেক বাসুকির মাথা। লক্ষ্মীর উদ্ধার হৈব চল সভে তথা।।
সর্বদেব মেলিয়া বিষ্ণুরে পুরস্কার। ক্ষীরনদী তীরে সভে কৈলা আগুসার।। ২২০
তবে কূর্মরূপে হরি পৃথিবী ধরিয়া। ক্ষীরোদের তীরে আইলা বাসুকী লইয়া।।
হনুমান গেল তবে মান্দারের ঠাঞি। বিধি-অঙ্গীকারে আমি তোমা লৈয়া যাই।।
মান্দার বেড়িয়া বীর দিল নখ-চির। উপাড়িয়া পর্বত লইল মহাবীর।।
ক্ষীরোদ পর্বত এড়ে বাসুকি বেষ্টিত। দৈত্যগণ আইল বিপ্রদাস বিরচিত।। ২২৪

১ ভুবন (সু. সেন) ২ করি (এসো/৩) ৩ বসিলা (এসো/১) ৪ জদি (= যদি) দেহ (ঐ) ৫ গমন (ঐ) ৬ দিলা দরশন (এসো/৩) ৭ ব্রহ্মসাপ (এসো/১) ৮ বঞ্চহ (এসো/৩) ৯ ভিতরে (সু. সেন) ১০ একত্রে (এসো/৩)

১৩

পাহিড়া

দেব ঋষি মুনিগণ করিয়া ত অনুমান
ব্রহ্মা হরি হরের সম্মতি।
ক্ষীরোদে মন্দার থোয় বাসুকি বেষ্টিত তায়
[১]ঘোটা[১] গড়ি হৈল পশুপতি।। ২২৫
সহস্রেক ঐরাবত মহাবল ধরে যত
প্রবল দৈত্যের এক হাত।
হেন দৈত্য সহস্রস্তে সবে ধরি হাথে হাথে
টান দেই মস্তকের ভিত।।
মাছনি মন্দার গিরি বাসুকি করিয়া দড়ি
ক্ষীরোদ মথেন দেবগণ।
বিপরীত হৈল বোল বসুমতী টলমল
চমকিত হৈল ত্রিভুবন।।

একা বীর হনুমানে প্রজাপতি সন্নিধানে
বাসুকি লেঙ্গুড় ধরি টানে।
শব্দ হৈল বিপরীত ত্রিভুবন চমকিত
ত্রাস পাইল দেবগণে॥
পাইয়া বিষম টান দধি ভাঙ্গে খান খান
[২]ফেনা বান্ধি উঠে অবিশাল[২]।
মথন [৩]আন্দোল[৩] রোল দশদিগ গণ্ডগোল
চমকিত হৈল রসাতল॥
মথন যন্ত্রণা অতি উচ্চশ্রবা উঠে তথি
সভে মেলি দিলেন ইন্দ্রেরে।
দ্বিতীয় মথন হৈতে শশধর উঠে তাথে
তাহা লৈলা দেব মহেশ্বরে॥ ২৩০
ধান্য আদি কর যত নানা শস্য বিধিমত
মনুষ্যেরে দিলা মর্ত্যপুরে।
তৃতীয় মথন হৈতে ঐরাবত উঠে তাথে
হরিষে লইলা পুরন্দরে॥
উঠিল অপছরাগণ অতি উল্লসিত-মন
রহে তারা ইন্দ্রের সভায়।
কেহ নাচে গায় গীত ত্রিভুবন আনন্দিত
মথন মথয়ে দেবরায়॥[৪]
চতুর্থ মথন হৈতে লক্ষ্মী উঠিলা তাতে
পারিজাত-পুষ্প সঙ্গে সাজে।
পুষ্প দিয়া পুরন্দরে থাকিলা বিষ্ণুর ঘরে
শাপ বিমোচন ইন্দ্ররাজে॥
দেখি সব দেবগণে পরম আনন্দমনে
পুনরপি [৫]করিল[৫] মথন।
অমৃত [৬]কুম্ভন[৬] ধরি উঠিলা যে ধন্বন্তরি
দ্বিজ বিপ্রদাস সুরচন॥ ২৩৪

---

১ মোটা দড়ি (সু. সেন) ২ বাঁধি উঠয়ে বিসাল (বিশাল) (এসো/৩) ৩ আন্দল (খুব সম্ভব 'আকুল') (এসো/৩), আনন্দ (এসো/১) ৪ স্বাক্ষর শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্র মিত্র (এসো/১) ৫ করয়ে (এসো/১), করেন (এসো/৩) ৬ কমণ্ডুল (সু. সেন)

১৪

পটমঞ্জরী

অমৃত কমণ্ডুল ধরি উঠিল যে ধন্বন্তরি
দেখি সানন্দিত দেবগণে।
ব্রহ্মা বিষ্ণু ত্রিলোচন সভে মেলি থুইল নাম
ধন্বন্তরি ঘুষি ত্রিভুবনে॥ ২৩৫

জতনে অমৃত লৈয়া ব্রহ্মা তার তরে দিয়া
সিদ্ধি-ঝুলি দিল জয়নেত।
বিষ্ণু অংশে অবতরি নাম হৈল ধন্বন্তরি
মথনে জন্মিল আশ্চম্বিত ॥
নিবেদয়ে ধন্বন্তরি [১]শুন হের দেবপুরী[১]
কেমতে আমার হয় পাত।
কেমন ঔষধে তরি [২]কহ মোরে দেবপুরী[২]
শুনি সভে বড়ো হরষিত ॥
জয়নেত সিদ্ধি-ঝুলি যদি হরে বিষহরি
উদয়কাল খায় বক্ষ-স্থলে।
আপনিত বিষহরি যদি মহাভার মারি
তবে মৃত্যু হয়ে ধরাতলে ॥
আছে এক প্রতিকার শুনহ বিশেষ তার
ঔষধের শুনহ কারণ।
শালি বিশালি গাছে গন্ধমাদনে আছে
তাহা দিলে রহে ত জীবন ॥
ক্ষীরোদ নদীর ফেনা ঘা মুখে দিবেক আন্যা
[৩]তব[৩] সম ওঝা [৪]নাহি ক্ষিতি[৪]।
শুনি হৃষ্ট ধন্বন্তরি দেবগণে নমস্করি
ভ্রমে ওঝা [৫]হরষিত-মতি[৫] ॥ ২৪০
দিগবিজয় করি সদা বুলে ধন্বন্তরি
পরাজয় নহে কোন স্থানে।
পদ্মা পদপঙ্কজে পুট চাটু করি ভুজে
দ্বিজ বিপ্রদাস রস গানে ॥ ২৪১

---

১ শুন হে দেবতা পুরী (এসো/১) ২ কেমন প্রকারে মরি (এসো/১) তার (এসো/৩) ৪ নাই আর (এসো/১) ৫ হরিষ আপার (এসো/১)

১৫

পয়ার

ব্রহ্মা বলে দেবগণ কর অবধান। এই ত অমৃত সভে করহ ভোজন ॥ ২৪২
দেখহ অমৃত এই জগতের সার। জরা মৃত্যু [১]জন্ম[১] ঘুচে পরশে যাহার ॥
দৈত্যগণ বলে কেন সাগর মথিব। যতেক জন্মিব তাহা দেবগণে [১]লৈব[১] ॥
অনুমান করি তারা কিছু না পাইয়া। সকল অমৃত তারা লইল হরিয়া ॥ ২৪৫
পলায়্যা অরণ্য মাঝে সকল অসুরে। ব্রহ্মা [২]বলে[২] প্রমাদ পড়িল দেবপুরে ॥
অসুরে অমৃত খাইয়া হইব অমর। অমৃত ছলিয়া ঝাট আন গদাধর ॥
মায়ায় স্ত্রীরূপ হৈলা ত্রৈলোক্য সুন্দরী। প্রচুর চাচর কেশ রচিল কবরী ॥

কুটিল অলকাবলি তবকের ছটা। সীমন্তে সিন্দুর ভালে চন্দনের ফোঁটা॥
শ্রবণে কুণ্ডল শোভে নয়নে কজ্জল। অনঙ্গ কামান ভুরু অতিসে চঞ্চল॥ ২৫০
বদন কমল জিনি সুরঙ্গ অধর। গ্রীবায় শোভিত নানা রত্ন মনোহর॥
কেজুর কঙ্কণ শঙ্খ শোভে দুই ভুজে। কামের ভাণ্ডার পীন পয়োধর সাজে॥
রসনা মঞ্জীর শোভে [৩]জঘন[৩] চরণে। মুনিমন টলে শিখি-পেখম গমনে॥
কামশাড়ী পরি কন্যা মোহন আলাপে। দৈত্যের সমীপে বসি কান্দেন বিলাপে॥
দৈত্যগণ শুনিলেক কন্যার রোদন। সভে [৪]মিলি[৪] সেই খানে দিল দরশন॥ ২৬০
কামবাণে হতচিত্ত কন্যার আলাপে। কহনা সুন্দরী [৫]বামা[৫] কান্দ কোন তাপে॥
মুখে আধো বস্ত্র দিয়া কহেন মায়ায়। পলাইল প্রাণনাথ এড়িয়া [৬]এথায়[৬]॥
দৈত্যরাজ বলে কন্যা চল মোর ঘরে। কন্যা বলে সত্য কর আমা বরাবরে॥
কোনো কর্ম না করিবা মোর অসম্মতি। তবে জন্মে জন্মে তুমি হও মোর পতি॥
মায়া মোহে সত্য করিল বিধানে। কন্যা লৈয়া গেল দৈত্য সুখে নিজস্থানে॥ ২৫৫
অমৃত ভক্ষিতে সভে করে অনুমান। কন্যা বলে দৈত্যরাজ শুন সন্বিধান॥
এইখানে অমৃত আমার ঠাঞি থুইয়া। স্নান করি আসি সভে খাও ত বাঁটিয়া॥
দৈত্য বলে কেনো বা কন্যার ঠাঞি থোব। এই ক্ষণে সভে মেলি অমৃত [৭]ভক্ষিব[৭]॥
কন্যাবলে সত্য যদি করিলা লঙ্ঘন। ভুঞ্জিবে নরক আমি করিনু গমন॥
দৈতরাজ বলে শুন কন্যা একেশ্বরী। অমৃত উহার শক্তি হরিবারে পারি॥ ২৬৫
অমৃত এড়িয়া তবে গেল দৈত্যগণ। হরিয়া অমৃত শীঘ্র লৈলা নারায়ণ॥
সভা বিদ্যমানে দিলা অমৃত আনিয়া। বিধাতা বলেন সবে লহত বাঁটিয়া॥
মহাদেব বলেন অমৃত সভে লহ। আর বার মথন করিয়া [৮]মোরে[৮] দেহ॥
ব্রহ্মা বৈলা প্রমাদ না কর মহেশ্বর। আর কিছু নাহি এই ক্ষীরোদ ভিতর॥
মহাদেব পিতামহ বুঝান আপনে। প্রভাতে উঠিব বিষ [৯]দোওজ[৯] মথনে॥
শুনরে ভকত লোক হৈয়া একমন। মনসামঙ্গল দ্বিজ বিপ্রদাস গান॥ ২৭০

১ জর্ম (সু. সেন) ২ আদি (এসো/১) ৩ কমল (এসো/৩) ৪ মেলি (এসো/১) ৫ কন্যা (সু. সেন) ৬ আমার (এসো/১) ৭ খাইবে (এসো/১) ৮ আমায় (ঐ) ৯ দ্বিতীয় (ঐ)

দ্বিতীয় পালা সাঙ্গ

তৃতীয় পালা

১

আহিরী রাগ

হাথে ধরি পিতামহ শঙ্করে বুঝায়। অবশ্য প্রমাদ হৈব খণ্ডন না যায়॥
এই ত অমৃত আছে সকলি তোমার। ক্ষীর নদী মথন না কর আরবার॥
[১]ব্রহ্মা বলে শঙ্কর না কর বিসম্বাদ। পুনরপি মথনে হইব পরমাদ॥[১]
অতি লোভে ভালো নহে দেখ ত্রিভুবনে। অতি সতী নারী সীতা হরিল রাবণে॥

অতি তপে বলি রাজা গেল রসাতলে। অতি তপে মীননাথ কদলিতে ভোলে॥ ৫
অতি দানে হরিশ্চন্দ্র অন্তরীক্ষ গতি। আমার বচন যদি লঙ্ঘ পশুপতি॥
ভালো মন্দ [২]যত হয়ে[২] সব তব দায়। প্রমাদ পড়িব দ্বিজ বিপ্রদাস গায়॥ ৭

১ (এসো/১-তে নেই) ২ যদি হয় (এসো/১)

২

পয়ার

ব্রহ্মার বচন শুনি বলে ত্রিলোচন। ভালো মন্দ সব মোর করিব মথন॥ ৮
ওথায় অমৃতহত যত দৈত্যগণ। প্রধান অসুরে সভে করয়ে গঞ্জন॥
রড়ারড়ি আসি দৈত্য ক্ষীরোদের তীরে। দেবগণ দেখি বড় চিন্তিত অন্তরে॥ ১০
মহেশ বলেন হের শুন দৈত্যগণ। সতেক [১]জন্মিল[১] সব শৈল দেব গণ॥
আমা তোমা দুইজনে হইল বঞ্চিত। পুনরপি মথন করহ ত্বরান্বিত॥
এখন যতেক পাব ক্ষীরোদ-মথনে। প্রচুর করিয়া তোমা করাব ভোজনে॥
বাসুকি মস্তক দৈত্য ধরে সাবধানে। লেঙ্গুড়ে ধরিল গিয়া বীর হনুমানে॥
হরের আজ্ঞেয় সভে [২]ঘনে[২] দেই টান। ত্রিভুবন মহানন্দে হৈল কম্পমান॥ ১৫
বাসুকির শ্বাস বহে যেন মহাঝড়। মুখে ভাঙ্গে ফেনা নাল অঙ্গে গেল ছড়॥
শ্রমযুক্ত হনুমান আর দৈত্যগণ। দেবগণ নিরবধি করয়ে বারণ॥
মহাকোপে হর-চক্ষে আনল উঠিল। সেই অগ্নি ক্ষীরোদে পড়িয়া বিষ হৈল॥
প্রলয় মথন তাহে গরল জন্মিল। দশদিক অন্ধকার মহা [৩]ধূম হৈল[৩]॥
যেন অগ্নিবাণে পোড়ে সকল সংসার। বিনা মেঘে অন্ধকার বিজুলি ঝঙ্কার॥ ২০
প্রলয়ের কালে যেন ঝনঝনা পড়ে। চারিদিগে সর্বজন ধায় উভরড়ে॥
[৪]তবে[৪] দৈত্য পলাইল যত দেবগণ। বাসুকি পলাইয়া গেল পাতাল ভুবন॥
হনুমান মন্দার এড়িল নিজ স্থানে। ক্ষীরোদ নেহালে হর রয়্যা সেই স্থানে॥
বৃষ হনুমান সভে আছে হর সনে। বিশেষ [৫]বুঝায়া[৫] শিবে পবন নন্দনে॥
ইষ্ট মিত্র যত দেখ সম্পদ-সময়। পড়িলে আপদ কাল কেহ কারো নয়॥ ২৫
বিষম বিসর মনে দেব জগদীশ। মায়া মোহ তেজিয়া ভক্ষণ করো বিষ॥
নিষেধ করিলা আগে দেব প্রজাপতি। তাহার বচন কিছু না করিলা মতি॥
আপন কুবুদ্ধি হেতু সৃজিলা গরল। লঙ্ঘিয়া ব্রহ্মার বাক্য মজাল্যা সকল॥
পুরুবে করিলা সত্য দেবতা সভায়। [৬]যে জন্মে[৬] লইবা সব কারো নাহি দায়॥
আপনি সংহারো বিষ দেব কৃত্তিবাস। তুমি না ভক্ষিলে বিষ সৃষ্টি হয় নাশ॥ ৩০
বিষম বিষের জ্বালে পোড়ে ভূমণ্ডল। চন্দ্র সূর্য পলাইল গগন মণ্ডল॥
যেই ভিতে যায় বিষ সেই ভিতে জ্বলে। দ্বিজ বিপ্রদাস রস ভাবে কুতূহলে॥ ৩২

১ জর্মিল (সু. সেন) ২ পুন (এসো/১) ৩ কম্প হইল (ঐ) ৪ ভয়ে (এসো/৩) ৫ বুঝাএ (সু. সেন)
৬ জে জর্মে (ঐ)

৩

পটমঞ্জরী

পবন নন্দন শুনিয়া বচন
মুখ তুলি হর চাহে।
বন্ধু সহোদরে পলায়ে সত্বরে
আপদে কাহারো নহে।। ৩৩
ভাবি জগদীশ গণ্ডূষিল বিষ
সব গেল অভ্যন্তর।
[১]বিযোগে[১] আসন হরিল কেতন
অঙ্গ কাঁপে থর থর।।
ভাবি ঈশ পতি যোগাসনে তথি
তত্ত্বজ্ঞান ভাবে মনে।
করি যুগসন্ধি মন বায়ু বন্দি
ঢলি পড়ে ত্রিলোচনে।। ৩৫
সব দেব লোক নেহালয়ে মুখ
চেতন নাহিক হরে।
নারদ তৎপর [২]চলিলা[২] সত্বর
গেলা চণ্ডী বরাবরে।।
শুন শুন মামী মর্ম কহি আমি
প্রমাদ তোমারে লৈয়া।
ক্ষীর নদী তীরে ত্রিদশ-ঈশ্বরে
চলিলা গরল খায়্যা।।
শুনি হেন বাণী চিন্তিত ভবানী
আকাশ ভাঙ্গিল মুণ্ডে।
দুই পুত্রে ধরি আর্তনাদ করি
প্রভূ বলি ডাকে তুণ্ডে।।
ভাবিয়া হতাশ মুক্ত কেশপাশ
সিন্ধু কূলে দেবী ধায়।
দেখে দেব রায় চৈতন্য না পায়
বিপ্রদাস রস গায়।। ৩৯

১. বিজোগে (সু. সেন) ২ চলিল (এসো/১)

৪

কৌ রাগ

দেখিয়া হরের মুখ ·চণ্ডীর বিদরে বুক
কাঁদে দেবী অঝর-নয়নে।

লোটায়্যা [1]ক্ষীরোদ[1] তীরে করাঘাত হানি শিরে
প্রভু বিনে কি মোর জীবনে।। ৪০
যতেক দেবতা লইয়া আইলা হরিষ হৈয়া
ক্ষীর নদী করিতে মথন।
তেজিয়া অমৃত পান বিষেরে পাতিলা জ্ঞান
আত্মদোষে মজাল্যা জীবন।।
শঙ্কর করিয়া কোলে কাঁদিয়া চণ্ডিকা বলে
বারেক [2]সম্বোধ[2] চিয়াইয়া।
মোর কর্মে দৈব-ফলে আসিয়া ক্ষীরোদ-কূলে
প্রমাদ পড়িল বিষ খায়্যা।।
জগতের নাথ হৈয়া আদি অন্ত না গুনিয়া
না করিলা মনে বিমরিষ।
নিরঞ্জন-হৃত তোমা হরিল সকল ক্ষেমা
ভক্ষণ করিলা কাল-বিষ।।
নিষেধিল ব্রহ্মা মুনি না শুনিয়া তার বাণী
প্রাণ হৃত আপন কুমতি।
মোর সবে তুমি সার তোমা [3]বিনা[3] নাহি আর
অনাথ কার্তিক গণপতি।।
পাগল তোমার মন তেজি রত্ন অভরণ
অস্থি-মালা ধরহ দ্বাদশ।
অর্ধচন্দ্র ধরো মাথে ত্রিশূল ডম্বুর হাতে
লাউয়া লাটি ঝুলি থাল বশ।। ৪৫
মলয়জ কস্তুরি মৃগমদ পরিহরি
বিভূতিভূষণ সব গায়।
বিচিত্র বসন এড়ি পরিধান বাঘ ছড়ি
ভিক্ষা রসে বুলো সর্বথায়।।
কান্দিয়া বলেন বাণী শুন ব্রহ্মা চক্রপাণি
ইন্দ্র আদি যত দেবগণ।
ষড়ানন গণপতি দুই পুত্র দৃঢ়মতি
তোমা সভা কৈল সমর্পণ।।
মায়া মোহ তেয়াগিব প্রভুর সংহতি যাব
সাজাইয়া দেহ হুতাশন।
চণ্ডীর বদন দেখি সর্বদেবগণ দুখী
দ্বিজ বিপ্রদাস সুরচন।। ৪৮

১ সিন্ধুর (এসো/১) ২ সম্বাদ (ঐ) ৩ বিনে (ঐ)

৫
মহারাটী

প্রাণনাথ চিয়াইয়া [১]সম্বোধো[১] আমারে।
কার্তিক গণাই হের মুখ চাহি কান্দে তোর
সম্মতি না দেও কেন তারে।। ৪৯
কেন বা উন্মত্ত বেশ ধূলায় ধূসর কেশ
জটাভার ধূলায় লোটায়।
লাউয়া [২]লাটী[২] থলি ঝুলি বিথানে এড়িল ফেলি
শিঙ্গা আদি গড়াগড়ি যায়।। ৫০
ভাবিতে অকূল দুখ কি মোর জীবনে সুখ
কি মোর সম্পদ অভরণ।
ছিঁড়িল গলার হার ফেলি নিজ অলঙ্কার
দেখি মৃতবত দেবগণ।।
শুন ইন্দ্র ব্রহ্মা হরি যথা হর তথা গৌরী
[৩]সবে[৩] মিলি শুনহ তুরিত।
যদি মোর হিত চাহ চিতা সাজাইয়া দেহ
দ্বিজ বিপ্রদাস বিরচিত।। ৫২

১ সম্বর (এসো/১) ২ লাটি (সু. সেন) ৩ সভে (এসো/১)

৬
পয়ার

তবে সর্বদেবগণ চণ্ডিকার বোলে। করিলা বিচিত্র চিতা ক্ষীরোদের কূলে।। ৫৩
দিলেন চন্দন-কাষ্ঠ ঘৃত বহুতরে। করাইয়া স্নান শোয়াইলা গঙ্গাধরে।।
[১]পূর্ব[১] রত্ন দিল পদ্মা [২]দুর্গার[২] গোচরে। তাহা দেখি স্মরণ হইল হেন কালে।। ৫৫
ব্রহ্মা আদি করিয়া শুনহ দেবগণ। [৩]মনসা[৩] দিলেন মোরে পঞ্চরত্ন ধন।।
যখন হরের হব আপদ সময়। অবশ্য আমায় আমা জিয়াব নিশ্চয়।।
তবে সব দেবগণ করি অনুমান। নারদ পাঠাইয়া দিল মনসার স্থান।।
ওথায় জানিল ধ্যানে দেবী বিষহরি। মায়ায় ঘুচায় দিব্য রত্নময় পুরী।।
পত্রের ছাউনি গৃহ আঙ্গিনা জঞ্জাল। তথি বসি রহে পদ্মা পরি বাঘছাল।। ৬০
হেনকালে নারদ প্রবেশ কৈল তথা। মুনির চরণ বন্দে হৈয়া সলজ্জিতা।।
পাদ্য অর্ঘ দিলা আনি বসিতে আসন। তবেত কহিল মুনি সকল কারণ।।
বিষ [৪]খাইয়া মৈলা[৪] হর ক্ষীরোদের তীরে। যদি জিয়াইবা হরে আইসহ সত্বরে।।
ত্বরায় চলহ দেবী পিতা জিয়াইতে। বিপ্রদাস বলে পদ্মা লাগিলা কান্দিতে।। ৬৪

১ (সু. সেন সংস্করণে নেই) ২ পদ্মার (এসো/২) ৩ (সু. সেন সংস্করণে নেই) ৪ খায়্যা মৈল (এসো/৩)

৭

করুণা

হরি হরি শুনিয়া বাপের [১]মৃত্যু[১] বাণী।
তথি যেন আশ্চম্বিতে কুলিশ পড়িল মাথে
রোদন্তি ললাটে কর হানি।। ৬৫
নেতোর গলায় ধরি [২]অতি সে[২] করুণা করি
কোলাকুলি পাড়য়ে দুইজনে।
হইয়া হুতাশমুখী মরমে বড়ই দুখী
বিগলিত অরুণ নয়নে।।
শুনরে নারদ ভাই আমার নিস্তার নাই
দড় মৈল ত্রিভুবনেশ্বর।
আমরা দ্বিতীয় সুতা থাকিলাম অবস্থিতা
আর না যাইব দেবপুরে।।
পিতার বর্তমানে সতা রহিতে না দিল তথা
কেমতে যাইব তার লক্ষে।
কে পালিবে আমা সভা কেবা আর দিবে বিভা
কান্দে দেবী ভাবি মন-দুঃখে।।
দেবীর ক্রন্দন শুনি বলেন নারদমুনি
আপনা বিসর কি কারণ।
জিয়াইতে জটাধর অবতার ঝাট কর
দ্বিজ বিপ্রদাস বিরচন।। ৬৯

১ মৃত (সু. সেন) ২ কান্দয়ে (এসো/১)

৮

[১]পাঁচালি[১]

পদ্মা বলে এই রূপে বঞ্চি বন দূরে। বস্ত্রহীন কেমনে যাইব দেবপুরে।। ৭০
একখানি বস্ত্র লৈয়া আইসেন সতাই। তবে বাপু জিয়াইতে আমি তথা যাই।।
চলিলা নারদ ঋষি পদ্মার বিধানে। কহিল সকল কথা চণ্ডী বিদ্যমানে।।
অনেক দুর্গতি তার বৈসে বন-মাঝে। মোর সনে দেবপুরে না আইল লাজে।।
একখানি বস্ত্র লৈয়া তুমি যাও তথা। তবে হর জিয়াইতে আসিবেন এথা।।
শুনি চণ্ডী [২]শীঘ্র গেলা[২] আপনার ঘরে। ভালো বস্ত্র লৈতে সত্ত কিছু নাহি পুরে।। ৭৫
হাত পাঁচ কাঁচাখানি কাঁকতলে থুয়্যা। চলিল সত্বরে দেবী সখীগণ লৈয়া।।
ওথায় মনসা সর্ব জানিয়া ধেয়ানে। পূর্বমত রত্নপুরী কৈলা ততক্ষণে।।
রত্ন সিংহাসন পরে বসি বিষহরি। অঙ্গে নানা অলঙ্কার পট্ট-চীর পরি।।
[৩]চারিভিতে[৩] দাসীগণ চামর ঢুলায়। হাস্য পরিহাস্য কেহ তাম্বুল যোগায়।।
হেনকালে [৪]চণ্ডী[৪] উপনীত হৈলা তথা। যে দিগে চাহেন সর্ব রত্ন-বিভূষিতা।। ৮০
বিস্ময় হইল মনে দেবী মাহেশ্বরী। [৫]কক্ষতলে[৫] বস্ত্রখানি রাখে যত্ন করি।।

সূর্যের কিরণ যেন দীপ্ত সেই পুরী। সোনার প্রাচীর তাহে মুক্তা সারি সারি॥
বিহন্দে বিহন্দে কাঁচ চালে জ্যোতির্ময়। দেখিয়া বিস্মিতা অতি দেবী মহামায়॥
উপনীত হৈল গিয়া [৬]পদ্মা বরাবর।[৬] দেখিয়া সম্ভ্রমে পদ্মা উঠিলা সত্বর॥
[৭]বিনতি[৭] প্রণতি করি কৈলা বহু স্তুতি। মনসার স্তবে তুষ্ট হইলা পার্বতী॥ ৮৫
দুর্গা বৈলা চল তব পিতা জিয়াইতে। বিলম্বে নাহিক কার্য চলহে তুরিতে॥
হৃদয়ে ভাবিয়া তবে দেবী বিষহরি। চণ্ডীস্থানে সেই বস্ত্র লইল যত্ন করি॥
দুইজনে সেথা হৈতে করিলা গমন। রথ আরোহণ করি গেলা ততক্ষণ॥
ক্ষীরোদের তীরে গিয়া দেখে ত্রিলোচন। ব্রহ্মা আদি দেবগণ করিলা স্তবন॥
করুণা করিয়া কহে আস্তীক জননী। শুন শুন সর্বজন অপূর্ব কাহিনী॥ ৯০
সতাই নিষ্ঠুর না থুইল দেবপুরে। পর্বতে [৮]অরণ্যবাসী[৮] করাইল মোরে॥
কহিল নারদ আসি যত বিবরণ। সে সকল সমাচার জান সর্বজন॥
দেখ দেখ অপরূপ সকল দেবতা। যত্নে এই বস্ত্র মোরে দান কৈল সতা॥
সতাইর গুণ কহিবারে নাহি ঠাঞি। ব্রহ্মা বিষ্ণু ইন্দ্র আসি মনসা বুঝাই॥
মন-দুঃখ ঘুচায়্যা জিয়াও তব পিতা। সভে মিলি সুসম্মান করিব সর্বথা॥ ৯৫
ক্রোধে চণ্ডী উঠিল তেজিয়া লাজভয়। মারিবারে মনসারে মুষ্টিক উঠায়॥
ক্রোধে বিষ-দৃষ্টে চাহে দেবী বিষহরি। ঢলিয়া পড়িলা তথা দেবী মাহেশ্বরী॥
ধরিয়া তুলিলা পদ্মা দেব মহেশ্বরে। সর্ব দেব দেখে তথা হরিষ অন্তরে॥
চেতন করাইল হরে হরের নন্দিনী। দ্বিজ বিপ্রদাস বলে জুড়ি যুগ-পাণি॥ ৯৯

১পয়ার (এসো/১) ২ গেলা তবে (ঐ) ৩ চারিদিকে (সু. সেন) ৪ পদ্মা (ঐ) ৫ কক্ষ তুলি (এসো/৩) ৬ পদ্মার গোচর (সু. সেন) ৭ মিনতি (এসো/১, এসো/৩) ৮ অরণ্যবাস (এসো/১)

৯

মন্ত্রজাত

মহাযোগী মহারুদ্র চিত্ত যোগাসনে। নিরঞ্জন আদি ব্রহ্মতত্ত্বে দেহমনে॥ ১০০
খড়্গা ভেদি উঠে [১]তার[১] গগন উপরে। কামরূপা চন্দ্র সূর্য সুমেরু শিখরে॥
কেন ত্রিভুবন নাথ আপনা বিসরো। মন পবনেতে জীব পরিচয় করো॥
চিত্ত [২]সূক্ষ্ম[২] ব্রহ্ম সেই অচিন্ত্য অমল। নাই ছোট বড় দৃঢ় নির্মল কেবল॥
অহর্নিশ খসে রস কিছু নাই টুটে। [৩]কোমল[৩] নবনী হেন বজ্র নাহি ফুটে॥
দশমী দুয়ারে বাপু খসাও কপাট। আছুক পবন হংস [৪]ভ্রমুক[৪] নিবাট॥ ১০৫
পুনরপি নিবর্তিয়া যাউক স্বস্থান। যথায় কমলে ভৃঙ্গ করে মধুপান॥
ত্রিপুর দাহনে হর অগ্নি উঠে মুখে। দানব পুড়িয়া অগ্নি পৃথিবীতে থাকে॥
পৃথুরাজা পৃথিবী দুহিলা যেই কালে। [৫]দুহিয়া[৫] নাগেরে বিষ দিলেন পাতালে॥
সেই বিষ বাসুকি দিলেন মোর ঠাঞি। শুন শুন বিষ তোর [৬]জন্ম[৬] কথা কই॥
হর ছাড়ি উঠ যদি নহিবা বিনাশ। মর্ম শুনি ত্রাসে বিষ বলে বিপ্রদাস॥ ১১০

১ বিষ (এসো/১) ২ সুক (= সুখ) (ঐ) ৩ কমল (ঐ) ৪ চরুক (ঐ) ৫ দুইয়া (ঐ, এসো/৩) ৬ মর্ম (সু. সেন)

১০

পয়ার

পদ্মার আজ্ঞায় বিষ উঠে হর-মুখে। সুবর্ণের থাল পদ্মা পাতিল সম্মুখে॥ ১১১
কিছু বিষ শঙ্করের থাকিল গলায়। নীলকণ্ঠ হইলা গোসাঞি মৃত্যুঞ্জয়॥
জয় জয় ধ্বনি কৈলা যত দেবগণ। চণ্ডীর দুর্গতি দেখি বলে ত্রিলোচন॥
হর বলে কেন মাগো জিয়াইলা আমা। [১]কেমতে[১] বঞ্চিব আমি যদি মৈল উমা॥
মনসা বলেন বাপু মনে দেহ ক্ষেমা। আর একশত বিভা করাইব তোমা॥ ১১৫
মহাদেব বলে আব বিভা কিবা [২]কাজ[২]। অর্ধ অঙ্গ গৌরী মোর [৩]দেবের সমাজ[৩]॥
অমৃতলোচনে তবে চাহে বিষহরি। উঠিয়া বসিলা মাতা দেবী মাহেশ্বরী॥
মনসা দেখিযা কোপে অগ্নি হেন জ্বলে। দেবগণ অনুরোধে কিছু নাহি বলে॥
সভে মেলি পুরস্কার [৪]কৈল[৪] মনসায়। পদ্মা বলে এই বিষ এড়িব কোথায় ॥
হৃদয়ে ভাবিয়া বলে সর্ব দেবগণে। তোমা [৫]বহি[৫] আর কেহ নাহি সম্বরণে॥ ১২০
তবে পদ্মা নাগগণ চিন্তিল ধেয়ানে। ঘোর অন্ধকার করি আইসে নাগগণে॥
প্রথমে অনন্তরাজ বাসুকি তক্ষক। পদ্ম শঙ্খ কদম্ব কুহক চঞ্চুবক॥
কুলির কর্কট ধনঞ্জয় মহাবলী। হালাই কালাই আর গন্ধ জয় কালী॥
বেত-আছাড় অজাগর আড়িয়াল বঙ্কা। আইল আড়ইরাজ দেখি লাগে শঙ্কা॥
ষোল চিতি বোড়া আর ধামাই অষ্ট বোড়া।আইল সর্পের দল দশদিগ জোড়া॥[৬] ১২৫
দেখিয়া নাগের ঠাট দেবতা তরাসে। পদ্মা প্রণামিয়া নাগ কারণ জিজ্ঞাসে॥
পদ্মা বলে মথনে জন্মিল কাল-বিষ। ইহা খাইয়া অচেতন ছিলা জগদীশ॥
চেতন করিনু হরে তুলিয়া গরল। সভাকারে বাঁটি ইহা [৭]দিব সে[৭] সকল॥
ছোট বড় যত নাগে গরল পুরিয়া। [৮]যার যেই[৮] স্থানে নড় হরষিত হৈয়া॥
আপনি জুখিয়া বিষ দেই পদ্মা বালি। বিষ পাইয়া তেজময় নাগ মহাবলী॥ ১৩০
তোলা মাষা রতি পল যার যে বুঝিয়া। সভাকারে বিষ পদ্মা দিলেন জুখিয়া॥
[৯]তমু[৯] এক শত পল বিষ তথা থাকে। অর্ধভাগ মনসা পুরিল একচক্ষে॥
সর্বশেষ লৈল কালি কাঁপে থর থর। তারে স্থান দিলা পদ্মা মলয়া শিখর॥
বোল্লা পিপীলিকা আর বিছা ভেঙ্গরুল। পড়িয়া গরল-স্থানে [১০]বিষধর হৈল॥[১০]
হেনকালে ধামাই দাঁড়ায় বিদ্যমান। অবশেষে নাহি পদ্মা বলিল বিধান॥ ১৩৫
বিষ কণ্টকের স্থানে লোটাও লেঙ্গুড়ি। দংশিয়া মারিহ তারে লেঙ্গুড়ের বাড়ি॥
জয়ধ্বনি করিলা সকল দেবগণ। সভা লৈয়া অনুমান করে ত্রিলোচন॥
পদ্মার মহিমা যত সভার গোচর। পদ্মা বিভা হেতু চিন্তি অনুরূপ বর॥
ধেয়ানে জানিয়া হর হরিব-অন্তর। জরৎকারু মুনি আছে বর মনসার॥
পদ্মা পাঠাইয়া হর চলিলা ত্বরিত। তপস্থানে মুনির গোচরে উপনীত॥ ১৪০
ঋষি বলে আজি মোর হৈল কাম্যফল। তপ জপ জ্ঞান আমি জীবন সফল॥
পরম সন্তোষ মনে পায়্যা ত্রিলোচন। পুলকে আকুল তনু সজল নয়ন॥
হৃষ্ট হৈয়া মহাদেব বলিলা [১১]তখন[১১] ঋষিকে কহিলা চল আমার ভবন॥
দুই কন্যা বিভা দিব দুই তপধনে। বিলম্বে কি আর ফল চল মোর সনে॥

তবে জরৎকার হরে বলে সবিনয়। বিভারে না কর যত্ন নিবেদি তোমায়॥
শুন শুন অরে ভাই হৈয়া এক মন। মনসা চরণে দ্বিজ বিপ্রদাস গান॥ ১৪৬

১ কেমনে (এসো/১) ২ কার্য (ঐ) ৩ জানে সর্ব রাজ্য (ঐ) ৪ কৈল্যা (এসো/৩) ৫ বিনে (ঐ) ৬ অতিরিক্ত পয়ার :

কুলির কর্কট ধনঞ্জয় মহাবলী।
হানাই কানাই আর গন্ধজয় কালী॥ (এসো/১)

৭ দিব ত (সু. সেন) ৮ আর জেই (সু. সেন) ৯ তবু (এসো/১) ১০ বিষ ধরো ফুল (ঐ) ১১ বচন (এসো/৩)

১১
পটমঞ্জরী রাগ

তপ অন্ত নাহি হয় নাহি ধরে ফল। আজি তপ ভঙ্গ নষ্ট ক্রতু-কর্ম ফল॥ ১৪৭
তপ জপ ধ্যান মোর পরম গেয়ান। ইহা ত ছাড়িয়া মোর মনে নাহি আন॥
না করহ যত্ন মোরে শুন দেবরাজ। তপ জপ করি আমি বিভা নাই কাজ॥
অযোনিসম্ভবা [১]জন্মি[১] বিধাতার বরে। নিরবধি তপ করি বম্নুকার তীরে॥ ১৫০
অমর হইতে তপ করি নিরন্তর। তপভঙ্গ হৈলে ব্রহ্মা [২]নাহি দিবে[২] বর॥
উর্দ্ধপদ ভূমে শির অনিমিখ আঁখি। জন্মিয়া রমণী মুখ কভু নাহি দেখি॥
রতিসুখ [৩]না ভুঞ্জি[৩] স্ত্রী নাহি ছুঞি করে। তপভঙ্গ করি বিভা করিব কিসেরে॥
হর বলে ত্রিদশের আমি অধিকারী। যে অভীষ্ট সিদ্ধি বর আমি দিতে পারি॥
বিভা কর তপ জপ করিহ বিধানে। পদ্মার চরণে দ্বিজ বিপ্রদাস গানে॥ ১৫৫

---

১ জর্মি (সু. সেন) ২ না দিবেন (এসো/১) ৩ না ভুঞ্জ (সু. সেন) নাই খুঁজি (এসো/৩)

১২
রাগ সিন্ধু

হরের বচনে মুনি হেট [২]কৈল[২] মুখ। অন্তরীক্ষে ডাকিয়া বলয়ে পিত্য-লোক॥ ১৫৬
বিভা কর জরৎকার হউক সন্ততি। তোর বংশ বিনে মো সভার নাহি গতি॥
পিত্য লোক বাক্যে মুনি কম্পিত হৃদয়। শিবেরে বলিল বিভা করিব নিশ্চয়॥
মুনি লৈয়া মহাদেব চলিলা তুরিত। চক্ষুর নিমেষে নিজ ঘরে উপনীত॥
বিবাহের উজ্জোগে লাগিলা দেবরাজে। [৩]বিষাণ[৩] দুন্দুভি আদি নানা বাদ্য বাজে॥ ১৬০
ব্রহ্মা বিষ্ণু ঋষি মুনি সিদ্ধি বিদ্যাধর। ভৈরব বেতাল নন্দী গন্ধর্ব কিন্নর॥
শচী আদি স্বর্গের সুন্দরী বিদ্যাধরী। সব সুরনারী গেলা শঙ্করের পুরী॥
[৪]বিচিত্র [৫]ছাদনা[৫] মাঝে কনকের বারা। চারিভিতে লাগে গজ-মুকুতার ঝারা॥
বিজলির ছটা যেন দিল আলিপনা। বিধানে মঙ্গল গীত গায় দিব্যাঙ্গনা॥
চারিমুখে বিধাতা আপনি পড়ে শ্রুতি। শুভগ্রহ যুক্ত হৈল শুভলগ্ন স্থিতি॥ ১৬৫
হেনকালে মনসার কৈল অধিবাস।[৪] পদ্মা পদাম্বুজে বলে দ্বিজ বিপ্রদাস॥ ১৬৬

---

১ পদ্মার (এসো/১) ২ কৈল্যা (সু. সেন) ৩ রবাব (এসো/৩) ৪ (নেই—এসো/১) ৫ ছান্দনা (সু. সেন)

১৩
নাট রাগ

আপনি ব্রহ্মামুনি করেন বেদধ্বনি
অমরে হরষিত মনে।
পরম উল্লাস পদ্মার অধিবাস
করিল যত আইয়গণে।। ১৬৭
হরিদ্রা তৈল লৈয়া পদ্মার অঙ্গে দিয়া
বাঁধিল সূত্র বাম করে।
চলিল সুরনারী লইয়া হেম- [1]ঝারি[1]
জল সহে ঘরে ঘরে।।
বাজাএ নানা [2]বাদ্য[2] দুন্দুভি বীণা নাদ
মরুজ পড়া শঙ্খধ্বনি।
আনন্দ মুনি পুরে মনসা বিভা করে
জরৎকার মহামুনি।।
প্রভাতে দেবরাজে মাতৃকাগণ পূজে
নৈবিদ্য বিবিধ বিধানে।
বৈদিক নান্দীমুখ পূজিলা অতিসুখ
দিলেন বসুধারা দানে।। ১৭০
সকল আইয় মেলি [3]তণ্ডুল মঙ্গলি[3]
যতনে পুন গোপ্য করে।
পরম আনন্দ বসিল নরসুন্দ
হরিষে খেউর করে।।
সকল আইয় মেলি মঙ্গল হুলাহুলি
আনন্দে মনসারে লৈয়া।
আমলা তৈল দিয়া হরিদ্রা মাখাইয়া
স্নান করাইল গিয়া।।
লগ্নের অনুবন্ধে শঙ্কর মহানন্দে
বরণ করে হরষিতে।
বিচিত্র পুষ্পমাল সুগন্ধি সুরসাল
বসন আদি নানা মতে।।
তৎপরে জরৎকার লইয়া অভ্যন্তর
হরিষে সব সুরনারী।
করিলা স্ত্রী আচার আনন্দে আপার
আপনি দেবী মাহেশ্বরী।।
যতেক কুলাচার করিয়া অঙ্গে তাঁর
বিবিধ ঔষধ করি।
যতেক রামা মেলি আনন্দে কুতূহলী
গাওয়ে সুন্দরী গুরি।। ১৭৫

মনসা সুসাজ্জন করেন আইয়গণ
বিবিধ রত্নমণি দিয়া।
বিচিত্র খোপা বান্ধি [৪]কুঙ্কুম[৪] গন্ধ আদি
সুগন্ধি পুষ্প আরোপিয়া॥
বিচিত্র পট্ট চীর মনসা অতি ধীর
জিনিয়া জ্যোতি দিবাকর।
বসাইয়া পাট পরে ফিরিল সাতবারে
ছায়নি করে তারপর॥
দৈত্যের কন্ধে মুনি পাটেতে পদ্মাধনি
রমণী জয়ধ্বনি করে।
[৫]মহেন্দ্র ক্ষেণ[৫] কালে মনসা ধরি তুলে
চৌদিকে মঙ্গল পুরে॥
বিবিধ বাদ্য বাজে আনন্দে পুরমাঝে
গভীর অতিঘোর ধ্বনি।
ব্রাহ্মণ বিপ্রদাসে মনের অভিলাষে
রচিল পুষ্পের [৬]ছায়নি[৬]॥ ১৭৯

---

১ বারি (এসো/৩) ২ শব্দ (ঐ) ৩ মঙ্গল হুলাহুলি (এসো/১) ৪ কুসুম (সু. সেন—পরেই আছে 'সুগন্ধি পুষ্প') ৫ মাহিন্দ্র ক্ষেপ (সু. সেন) ৬ ছাওনি (এসো/১), ছামনি (এসো ৩)

১৪

পয়ার

হরষিত সুরপুর জয়-জয় ধ্বনি। জরৎকার-মনসায় পুষ্পের [১]ছাওনি[১]॥ ১৮০
দুন্দুভি মরুজ পড়া বীণা করতাল। ঝাঝরি মুহুরি বাজে মৃদঙ্গ রসাল॥
ভেউর করনাল বাজে ডিণ্ডিম কাহাল। দুগরি বাজায়ে ঘন অতি সে রসাল॥
কপিলাস ঘণ্টা আর [২]বাজয়ে[২] মন্দিরা। দুসরি মঙ্গলা আর বাজে সপ্ত সরা॥
[৩]ছাওনি করয়ে[৩] দুহে সানন্দিত মন। ইন্দ্র আদি দেব করে পুষ্প বরিষণ॥
[৪]ছাওনি[৪] করিয়া দুহে [৫]তুলে[৫] ধরাতলে। বসিলা ছান্দলা-তলে বিপ্রদাস বলে॥ ১৮৫

১ ছামনি (এসো/৩) ২ বাজায় (এসো/১) ৩ ছামনি করেন (এসো/৩) ৪ ছামনি (ঐ) ৫ ওলে (সু সেন)

১৫

পয়ার

জরৎকার মনসায় [১]ছান্দলা[১] বসাইল। বশিষ্ট মুনিরে আনি নেতা বিভা দিল॥ ১৮৬
দুই কন্যা বিভা দিল বিবিধ বিধানে। নানা রত্ন যৌতুক দিলেন নানাধনে॥
মন্দিরে প্রবেশ সমর্পিয়া [২]সম্প্রদান[২]। ভোজন করিল দুহে অমৃত সমান॥
পুষ্পশয্যা রচিল সকল সুরনারী। জরৎকার মুনিরে বুঝায় মহেশ্বরী॥
নাগরূপী কন্যা এই নাগ অবতার। মনি রত্ন এড়ি পরে নাগ-অলঙ্কার॥ ১৯০

আজি [৩]নিশি[৩] নাগভয় থাকিহ সত্বরে। ওথায় কুবুদ্ধি দিলা মনসার তরে॥
যত অভরণ এড়ি বেশ কর নাগে। তবে ঋষি তোমারে করিব অনুরাগে॥
না বুঝি চণ্ডীর মায়া মনসা কুবুদ্ধি। নাগ অভরণ পদ্মা করি নানা বিধি॥
যাইতে মুনির পাশে রচেন সুবেশ। চিরনিয়া-নাগ লৈয়া কুরলিলা কেশ॥
শয়ন মন্দিরে পদ্মা দিলা দরশন। হরিষে প্রভুর পাশে করিলা শয়ন॥ ১৯৫
মনসা দেখিয়া ঋষি মনে ভয় বাসে। নিদ্রা নাহি যায় মুনি নাগের [৪]তরাসে[৪]॥
হেনকালে চণ্ডিকা [৫]চলিয়া[৫] ধীরে ধীরে। দুয়ারে থাকিয়া ভেক পেলি দিল ঘরে॥
ভেক দেখি সর্ব নাগ গর্জয়ে সঘন। উঠিয়া [৬]বসিল[৬] ঋষি চমকিত মন॥
হাথে ঝারি সম্ভ্রমে পলাইয়া যায় ডরে। ধামাই দুয়ারি পায়্যা রহাইল দ্বারে॥
ঋষি বলে নাগভয় নাহিক নিস্তার। আজি হৈতে পদ্মাবতী নিশ্চয় তোমার॥ ২০০
ঋষিরে কাতর দেখি দিলেন এড়িয়া। সমুদ্রে শঙ্খের গর্ভে রহে লুকাইয়া॥
নিদ্রাভঙ্গ হৈল দেবী ঋষি নাহি পাশে। ধেয়ান করিয়া দেবী জানিল বিশেষে॥
নাগভয়ে মুনিবর গেল পালাইয়া। [৮]সমুদ্র[৮] শঙ্খের গর্ভে আছে লুকাইয়া॥[৭]
নিশ্চয় জানিল পদ্মা দুঃখ অপমান। অবিরত কান্দে দেবী বিপ্রদাস গান॥ ২০৪

১ ছান্দনা (এসো/৩), ২ কন্যাদান (সু. সেন) ৩ রিসি (এসো/৩) ৪ নিশ্বাসে (এসো/১, এসো/৩) ৫ চলিলা (এসো/১) ৬ বসিলা (সু. সেন) ৭ (নেই—এসো/১) ৮ সমুদ্রে (এসো/৩)

১৬
করুণা

পুষ্পশয্যায় বসিয়া বিরসে। কান্দিয়া [১]নেতোর[১] প্রতি ভাষে॥ ২০৫
অঝর লোচনে জল ঝরে। উপহাস্য হৈল দেবপুরে॥
কান্দে দেবী নেতো হাতে ধরি। ঋষি গেল থুয়্যা একেশ্বরী॥
মোর কর্মে কি লিখিল বিধি। সতাই যে দিলেন কুবুদ্ধি॥
পারিনু নাগের অভরণ। ডরাইল ঋষির নন্দন॥
সতাই হইল দুরাচার। দেবপুরে করিল খাঁখার॥ ২১০
তাহে [২]প্রবোবিধ[২] কি বলিয়া। কেন ঋষি না গেনু গোড়াইয়া।
জন্মিয়া[৩] [৪]নহিল[৪] কিছু সুখ। কতেক সহিব মনদুঃখ॥
মনসা কান্দয়ে উর্ধ্বশ্বাসে। দ্বিজ বিপ্রদাস রস ভাষে॥ ২১৩

১ নেতার (সু. সেন) ২ প্রবোধিমু (এসো/১) ৩ 'স্বক্ষর প্রতাপ নারায়ণ বসো সাকিম জাগুলিয়া' (এসো/৩) ৪ নাজানি (এসো/১)

১৭
কৌ রাগ

রজনী পরভাতে মনসা-অগ্রেতে
প্রমথ নাগ উপনীত।
[১]রোদন[১] পদ্মা রাণী শুনিয়া শূলপাণি
জিজ্ঞাসে হইয়া মোহিত॥ ২১৪

[২]বদন্তি[২] পদ্মাবতী 			সতাই অনুমতি
	পরিনু নাগ-আভরণ।
উরগ-ভয়ে ঋষি 			তরাসে অর্ধনিশি
	পলাইয়া করিল গমন।। ২১৫
নিমেষে সব জানি 			সমুদ্রে আছে মুনি
	শঙ্খের গর্ভে লুকাইয়া।
চলিল সসন্তাপে 			কুরল-পক্ষ রূপে
	ডাকিয়া অন্তরীক্ষ হৈয়া।।
শুনিয়া পক্ষডাক 			ভাসিয়া উঠে শাঁখ
	[৩]ছুইয়া[৩] তুলিলেন তীরে।
তোমার অভ্যন্তরে 			তপস্বী জরৎকারে
	উগারি ঝাট দেহ মোরে।।
হইয়া চমৎকার 			[৪]উগারে[৪] জরৎকার
	অতিসে শঙ্খ ভয় বাসি।
ঋষির ধরি হাথে 			বুঝাইয়া ভূতনাথে
	মন্দিরে লইল দুঃখনাশি।।
মনসা সহ বনে 			বঞ্চিত কথো দিনে
	বদন্তি পদ্মা সন্বিধান।
শুনহ পদ্মাবতী 			দেহ গো অনুমতি
	যাইব আমি নিজস্থান।।
বলন্তি বিষহরি 			আমি যে একেশ্বরী
	সংহতি নাহি পুত্র-সুতা।
এই ত দেবপুরে 			কি বোল করে মোরে
	ছাড়িয়া যাবে মোরে কোথা।। ২২০
শুনিয়া মুনিবর 			পদ্মা গর্ভে কর
	বুলায় সুসন্তান-উৎপত্তি।
আস্তিক নাম তার 			হইব সুকুমার
	করিব ইন্দ্রের উদ্ধার।।
বশিষ্ট-মুনিবর 			নেতোরে দিল বর
	দুই মুনি গেলা তপস্থানে।
মনসা নেতোবতি 			হইলা গর্ভবতী
	বিদিত লোক পরমাণে।।
প্রসবে শুভক্ষণে 			পুত্রের দরশনে
	মনসা নেতো [৫]হৃষ্টমতি[৫]।
অমর ইন্দ্র আদি 			অনন্ত বিষ্ণু বিধি
	পরম আনন্দিত মতি।।
ঋষির আজ্ঞা পাইয়া 			আস্তিক নাম থুয়্যা
	দিলেন বাসুকি-অগ্রেতে।

বাসুকি হরষিতে পড়াইয়া শাস্ত্র নীতে
এড়িল সিজুয়া পর্বতে॥
শুনিহ রজনিতে বড়ই অদ্ভুতে
সর্পপত্র যজ্ঞ নাশে।
তৃতীয় পালা সাঙ্গ দিবসে নানারঙ্গ
কহিল দ্বিজ বিপ্রদাসে॥ ২২৫

---

১ কান্দে (এসো/১) ২ বোদন্তি (ঐ) ৩ চুইয়া (এসো/৩), চুমাইয়া (এসো/১) ৪ উগরে (এসো/৩)
৫ দুষ্ট মতি (সু. সেন, বিভ্রান্তিকর পাঠ)

তৃতীয় পালা সাঙ্গ

চতুর্থ পালা

১

পয়ার

সর্প সত্র নামে যজ্ঞ কহিব বিধানে। পরীক্ষিতে ব্রহ্ম শাপ হইল যেমনে॥[১]
একদিন মৃগ হেতু চলিল কাননে। সঙ্গমে হরিণ সঙ্গে হৈল দরশনে॥
অবুধ নৃপতি বাণ হানিলেক তায়। হরিণা পড়িল তার হরিণী পলায়॥
খেদাড়িয়া নৃপতি চলিল তার পাছে। সমাধিস্থ মুনি তথা গেল তার কাছে॥
ডাক দিয়া নৃপতি বলএ উচ্চস্বরে। থাক থাক হরিণী বিন্ধিব তীক্ষ্ণ শরে॥ ৫
মুনি দেখি গেল রাজা তাহার সমুখে। কোপে কম্প ঘন ঘন জিজ্ঞাসয়ে দুঃখে॥
ধ্যান নাহি ভাঙে মুনি মুখ নাহি তোলে। তাহা দেখি পরীক্ষিত-রাজা কোপে জ্বলে॥
দৈব [১]যোগে তথাকারে[১] সাপের উপায়। ধনুকের [২]হুলে দিলে[২] মুনির গলায়॥
পাণ্ডুপুত্রে মহামুনি কোপে দিল শাপ। সপ্ত দিনান্তকে তোরে দংশিবেক সাপ॥
মৃতবৎ হৈল রাজা ব্রহ্মশাপ পাইয়া। সৈন্যসহ নিজ স্থানে উত্তরিল গিয়া॥ ১০
কহিল সকল কথা পাত্রমিত্র লইয়া। কহে পাত্র মিত্র নৃপে সম্মুখে দাঁড়াইয়া॥
শুন শুন মহারাজ না করিহ ভয়। এক ওঝা সঙ্ক ধন্বন্তরি মহাশয়॥
তাহার প্রতাপ কহি তোমার অগ্রেতে। মহাসঙ্ক নামে ছিল ধবল পর্বতে॥
ধন্বন্তরি হুট করি কৈল পরাজয়। পাতালে চলিল [৪]ধন্বন্তরির বিজয়[৪]॥
সঙ্ক জিনি সঙ্ক ধন্বন্তরি হৈল নাম। তাহারে [৪]আনিহ[৪] রাজা অতি অনুপাম॥ ১৫
নাগভয় কদাচিত নহিব তোমার। এই নিবেদন রাজা আমা সভাকার॥
এত শুনি মহারাজা অতিহৃষ্ট হৈয়া। সঙ্ক-ধন্বন্তরি ওঝা আনে ডাকাইয়া॥
শাপ ভয় সম্বরিয়া আছে নিজপুরে। সপ্তম দিবসে নাগ কোপিত অন্তরে॥
মুনিশাপ হৈল[৫] দংশিতে রাজনে। শীঘ্রগতি চলে নাগ দংশিবারে মনে॥
লোকমুখে শুনিয়াছে ওঝা ধন্বন্তরি। মহাকোপে গর্জিয়া উঠিল দন্ত করি॥
দ্বিজ বিপ্রদাস বলে মনসা-কিঙ্কর। ধন্বন্তরি-তক্ষকে বিরোধ পাঠান্তর॥ ২০

---

১ দোষে তথাকালে (এসো/৩) ২ হুল দিয়া (এসো/১) ৩ ধন্বন্তরি মহাশয় (ঐ) ৪ জানাহ (ঐ) ৫ মোরে (ঐ)

২
শ্রীরাগ

মুনির ইঙ্গিত পায়্যা হরিষ অন্তর হৈয়া
তক্ষক করিল আগমন।
বিরোধ আরম্ভ রোষে হইয়া ব্রাহ্মণ বেশে
কালকূট পুরিয়া লোচন।।২১
দৃঢ় করি নিজ চিত হৈয়া বড় হরষিত
শিষ্যরূপে করিলা গমন।
ললাটে চন্দন ফোটা গলে শোভে নাগপাটা
সর্ব অঙ্গে নাগ [১]অভরণ[১] ।।
প্রবেশে সঙ্কের পুরী বধিবারে ধন্বন্তরি
দাঁড়াইল চাহে ঘনে ঘন।
অভ্যান্তরে যেই যায় ডাকিয়া বলএ তায়
সঙ্কেরে করাও দরশন।।
বাদখাড়ু দুই করে লোমাঞ্চিত কলেবরে
জিজ্ঞাসা করয়ে সভাকারে।
কোন জন ধন্বন্তরি নিবসয়ে কোন পুরী
বিপক্ষ [২]হইনু[২] আসি তারে।।
সেই সঙ্ক ওঝা বড় কোন শিক্ষা জানে দড়
বড়াই করয়ে অকারণ।
মহীতলে ছিল যত জিনিলাম শতে শত
ধন্বন্তরি দেখিব কেমন।। ২৫
শুনি লোক গেল ধায়্যা ধন্বন্তরি আগে গিয়া
কহিল সকল বিবরণ।
শুন ওঝা ধন্বন্তরি তোমারে হইয়া বৈরী
আইল ব্রাহ্মণ একজন।
তাহা শুনি সঙ্ক রায় কোপানলে কাঁপে কায়
যমের সম্পদ আইল কারে।
সাজে শিষ্য দশবিশ [৩]নাহি করে[৩] বিমরিষ
চলিল বিবাদ করিবারে।।
কোপেতে অরুণ আখি ঝাঁপান বিষম ঢাকি
কত ভাবি সাজিল প্রকারে।
যথায় তক্ষক আছে উপনীত তার কাছে
সর্বলোক দেখি চমৎকার।
শতশিষ্য অনুগত নানা শিক্ষা অদ্ভুত
করয়ে বিষম অবতার।।
লোক ধায় শতে শত বাল বৃদ্ধ যুবা যত
দেখিবারে আইল তার পাশে।

দুই ওঝা তরুতলে দাঁড়াইল কুতূহলে
বিরচিল দ্বিজ বিপ্রদাসে।। ৩০

১ আভবণ (সু সেন) ২ হইলু (এসো/১) ৩ নাই হয় (ঐ)

৩

[১]নাট রাগ[১]

ধন্বন্তরি বলে ওঝা কি নাম তোমার। কোন জাতি কোথা বৈস তনয় কাহার।। ৩১
কিবা অভিলাষ করি আইলা এই দেশে। গমন কি কার্য হেতু কহ ত বিশেষে।।
কহেন তক্ষক [২]তাহে[২] শুন সঙ্ক রায়। [৩]আইনু[৩] বিরোধ হেতু তোমায় আমায়।।
জিনিলাম যত ওঝা ছিল মহীতলে। অহঙ্কার করিয়া সঙ্কেরে পুন বলে।।
যত শক্তি থাকে বাণ হানহ আমায়। সম্বরিয়া পুন [৪]বাণ[৪] হানিব তোমায়।। ৩৫
দম্ভ করি বলে নাগ সঙ্ক বরাবর। [৫]শুভ ধর্ম-নদী তীরে মোর[৫] বাটী ঘর।।
ওঝা শিরোমণি [৬]নাম বটে[৬] তো আমার। ব্রাহ্মণ কুমার তোমা কহি সারোদ্ধার।।
গৌড় আদি করিয়া ভ্রমিণু সব রাজ্যে। না পাইল সম ওঝা বিবাদের কার্যে।।
শুনিল তোমার দম্ভ লোকের বদনে। [৭]তোমার গোচরে আইনু[৭] বিবাদ কারণে।।
[৮]আপনার দম্ভ কর[৮] সব অকারণ। কালপ্রাপ্তি হৈল আজি মোর সনে রণ।। ৪০
যদি রক্ষা পাও আজি সফল জীবন। জানিলাম তবে [৯]ওঝা[৯] ভাণ্ডিলা শমন।।
শুনিয়া কঠোর বাক্য সঙ্ক চূড়ামণি। হুঙ্কারিয়া কহে লোক স্তব্ধ হৈল শুনি।।
পদ্মাপদাম্বুজে সদা হইয়া ভ্রমর। দ্বিজ বিপ্রদাস কহে কিঙ্কর [১০]তাহার[১০]।। ৪৩

---

১ নাটক রাগ (এসো/১) ২ মুহে (এসো/৩), অহে (এসো/১) ৩ আইল (এসো/৩) ৪ আসি (এসো/৩) ৫ সুরধনি তীরেতে আমাব (এসো/১) ৬ বটে (এসো/৩) ৭ আইলু তোমার সহ (এসো/১) ৮ যত দম্ভ কর সঙ্ক (ঐ) ৯ আজি (এসো/৩) ১০ তোমার

৪

পয়ার

সিংহনাদ করি বলে ওঝা ধন্বন্তরি। মিছা দম্ভ কর কেন মোর বরাবরি।। ৪৪
দ্বিজের তনয় [১]হও[১] তেঞি আজি সণ্ডো। অন্য জাতি হৈলে যম দুয়ারে পাঠাণ্ডো।।
সভার গোচরে মোরে বল অহঙ্কারে। ব্রহ্মবধ হেতু [২]তেঞি সহিনু তোমারে[২]।।
দ্বিজ বলে সঙ্ক তুমি হৈলা পরাজয়। বিনয় বচনে বুঝি [৩]ভাণ্ডিবে[৩] আমায়।।
লোকধর্ম সাক্ষী ব্রহ্মবধে নাহি ভয়। এড়হ আপন অস্ত্র যত শক্তি হয়।।
তক্ষকের বাক্যে সঙ্ক হৈল ক্রোধমুখি। লোকধর্ম চন্দ্র সূর্য সঙ্ক কৈল সাক্ষী।।
তিন লোক সাক্ষী করি সঙরে গোসাঞি। আপনি মরয়ে দ্বিজ মোর দোষ নাঞি। ৫০
তরুতলে আসনে বসিলা দুইজন। গালাগালি দুই ওঝা কোপে হুতাশন।।
বিষদৃষ্টি তক্ষক তরুর দিগে চাহে। ভস্মময় হৈল বৃক্ষ কিছু নাহি রহে।।
কিছু ভস্ম রাখে সঙ্ক বাম হস্ত দিয়া। পুনর্বার জিয়াইল পরম চিন্তিয়া।।

সমরণ দুই জন সভায় বিদিত। মইত্রতা কৈল দোহে অতি হরষিত।।
নিভৃতে আসিয়া সঙ্কে কহিল কারণ। ছাড়হ রাজার আশ দিব মহাধন।। ৫৫
অনুমতি দিল সঙ্ক ধনলোভ পাইয়া। পরিতোষ কৈল [৫]সঙ্ক[৫] নানা ধন দিয়া।।
ছাড়িল রাজার পাশ ওঝা ধন্বন্তরি। করে করি লৈল রাজা অকাল-বদরি।।
দ্বিজবেশে তক্ষক রাজার অগ্রে গেল। করজোড় করি রাজা দ্বিজেরে বন্দিল।।
আশীর্বাদ করি দ্বিজ সম্মুখে দাঁড়াইয়া। অকাল-বদরি নৃপে দিল তুষ্ট হৈয়া।।
তথিমধ্যে রহে নাগ সূতার সঞ্চারে। তুষ্ট হৈয়া লৈল রাজা না বুঝি বিকাবে।। ৬০
[৬]দুর্বাসা[৬] মুনির শাপ খণ্ডন না যায়। আঘ্রাণ লইতে নৃপে নাসাপথে খায়।।
নির্ঘাত ভাবিয়া নাগ করিল গমন। বিষজ্বালে নৃপবর তেজিল জীবন।।
রাজার মরণ দেখি পাত্রমিত্রগণ। সৈন্য সেনাপতি প্রজা কান্দে সর্বজন।।
অন্তঃপুরে ক্রন্দনে উঠিল মহারোল। ক্ষিতি লুটি কান্দে সভে হইয়া বিভোল।।
করুণা করিয়া কান্দে [৭]রাজরানী[৭] গণে। কি উপায় হবে রাজা তোমার বিহনে।।৬৫
হেন রাজ্য ছাড়ি রাজা নিষ্ঠুর হইলা। বিনা দোষে আমা সভা অনাথ করিলা।।
হের জন্মেজয় পুত্র কান্দিয়া ব্যাকুল। শীঘ্রগতি সম্বোধন কর সমতুল।।
কান্দিতে কান্দিতে সভে হইয়া মূর্ছিত। পড়িল ধরণীতলে নাহিক সম্বিত।।
[৮]চতুবর্ণে মিত্র পাত্র[৮] সকলি ক্রন্দন। রাজপুত্র ধরি তোলে করিয়া যতন।।
চৈতন্য করাইল তার মুখে জল দিয়া। অশেষ প্রকারে সভে বুঝায় ধরিয়া।। ৭০
স্বর্গেরে তোমার পিতা করিলা গমন। পুত্র কার্য কর তুমি কান্দ কি কাবণ।।
স্থির হৈল জন্মেজয় সম্বরে ক্রন্দন। অগ্নিকার্য কৈল পিতা শোকাকুলি মন।।
শ্রাদ্ধের উজ্জোগ কৈল একাদশ দিনে। লক্ষ লক্ষ ভাণ্ডার পুরিল [৯]রত্নধনে[৯]।।
করিল যতেক দ্রব্য না যায় লিখন। দেশে দেশে নিমন্ত্রিয়া আনে রাজাগণ।।
বিধিমতে শ্রাদ্ধ কৈল দানযজ্ঞ আদি। ক্ষিতি পরিতোষ কৈল দিয়া রত্ননিধি।। ৭৫
[১০]সুবর্ণের ভাণ্ডার পুরিয়া লক্ষ লক্ষ। হেনমতে দ্বিজে দান করিল অসংখ্য।। [১০]
অর্বুদ অর্বুদ ধেনু উৎসর্গ করিয়া। দুঃখিত [১১]ব্রাহ্মণে দিল[১১] পৃথিবী জুড়িয়া।।
অবশেষে জন্মেজয় পুরোহিতগণে। দক্ষিণান্ত করিল বড়ই হৃষ্টমনে।।
সকল সম্পূর্ণ হৈল নাহি অবশেষ। ইষ্ট মিত্র বন্ধু গণ গেল নিজদেশ।।
নিজপুরে জন্মেজয় পাত্রমিত্র লৈয়া। যুক্তি করে সভে মেলি নিভৃতে বসিয়া।। ৮০
মহাবুদ্ধি মন্ত্রিগণ করিল বিচার। ছত্রদণ্ড লহ রাজা বিলম্ব কি আর।।
শুভ লগ্ন তিথি যোগ বিচার করিল। মঙ্গল বিধানে জন্মেজয়ে রাজা কৈল।।
শ্রীমনসা চরণে করিয়া পরিহার। দ্বিজ বিপ্রদাস কহে কিঙ্কর তাঁহার।। ৮৩

১ হেতু (এসো/৩) ২ তেই সইল আমারে (এসো/১) ৩ ভাড়িবে (ঐ ; এসো/৩) ৪ এরপর (এসো/৩ পুথি খণ্ডিত) ৫ সঙ্কে (এসো/১) ৬ অব্যর্থ (ঐ) ৭ রাজারানী (ঐ) ৮ চতুর্বর্গ পাত্র মিত্র (ঐ) ৯ নানা ধনে (ঐ) ১০

লক্ষ লক্ষ সুবর্ণের ভাণ্ডার পুরিয়া।
দিলেন দ্বিজেরে দান অসৌক্ষ করিয়া।। (ঐ)

১১ দারিদ্রে দিলা (ঐ)

৫
রাগ বাগেশ্বরী

পাত্রমিত্র সভে মেলি এক যুক্তি হৈয়া। রাজ্যের বিচার করে রাজারে লইয়া।। ৮৪
বাপের সমান রাজা বিচারে পণ্ডিত। প্রতাপে সূর্যের সম ধর্মে অখণ্ডিত।।
বলবীর্য [১]অতিশয় যুদ্ধেতে শমন[১]। কি আর বলিব যুধিষ্ঠিরের লক্ষণ।।
রত্ন সিংহাসনে বৈসে রাজা জন্মেজয়। [২]রাজ্যের পালন করে লইয়া মন্ত্রীচয়।।[২]
[৩]চৌদিগে বেষ্টিত আছে পাত্রমিত্রগণ। সৈন্য সেনাপতি ঠাট অসংখ্য গণন।।[৩]
পিতা শোকে জন্মেজয় হৃদয় পীড়িত। ভাবিতে চিন্তিতে হৈলা বড়ই মোহিত।।
অন্তরে বিস্মিত হৈয়া রাজা জন্মেজয়। মৃগয়া করিতে রাজা মনে অনুনয়।। ৯০
সিংহাসন হৈতে রাজা উঠিল সত্বর। সৈন্য সেনাপতি ঠাট চলিল বিস্তর।।
পাত্রমিত্র কক্ষে রাখি রাজ্যের বিচারে। মৃগয়া করিতে গেলা অরণ্য ভিতরে।।
হেনকালে আশ্চম্বিতে দৈবের ঘটন। বড়ই অপূর্ব কথা শুনে সর্বজন।।
জয় নামে এক দ্বিজ বড়ই দুঃখিত। [৪]পুত্র জায়া[৪] সর্পাঘাতে মৈল আশ্চম্বিত।।
শোকেতে পাগল হৈয়া সেই দ্বিজবর। সর্প মারি ফিরে দ্বিজ অরণ্য ভিতর।। ৯৫
জন্মেজয় রাজা যথা করিছে গমন। সেইখানে গেল দ্বিজ দৈবের ঘটন।।
দ্বিজের চরিত্র রাজা দেখিল নয়নে। সর্প মারি বুলে দ্বিজ গহন কাননে।।
ডাকিয়া দ্বিজেরে কহে রাজা জন্মেজয়। অদ্ভুত তোমার কর্ম দেখি লাগে ভয়।।
সর্প মারি অরণ্যে বুলহ কি কারণ। ইহার বৃত্তান্ত কহ দ্বিজের নন্দন।।
শুনিয়া রাজার বাক্য জয় দ্বিজবর। কহিতে লাগিল অতি দুঃখিত অন্তর।। ১০০
দ্বিজ বলে অবধান কর মহাশয়। লোচনের জলে দ্বিজ তিতে সর্বদায়।।
কান্দিতে কান্দিতে কহে গদ গদ ভাষ। ক্ষণেক রহিয়া দ্বিজ ছাড়িল নিঃশ্বাস।।
কি আর কহিব রাজা হৃদয় বিদরে। পুত্র জায়া সর্পাঘাতে মৈল মোর ঘরে।।
শোকানলে দহে প্রাণ [৫]নিবারিতে[৫] নারি। তে কারণে কাননে বেড়াই সর্প মারি।।
শুনিয়া এতেক বাক্য রাজা জন্মেজয়। পিতার দারুণ শোক [৬]বাড়িল[৬] হৃদয়।। ১০৫
লোচনের জলে রাজা তিতে কলেবর। বাপের মরণ কহে দ্বিজের গোচর।।
শুন শুন দ্বিজবর কহিয়ে তোমারে। সদাই জ্বলিছে প্রাণ অন্তরে বাহিরে।।
দারুণ মুনির শাপ জনকের হৈল। সপ্তম [৭]দিবস[৭] অন্তে তক্ষকে দংশিল।।
সর্পাঘাতে পিতা মোর হৈলা পরলোক। ধরিতে না পারি প্রাণ বাড়ে অতি শোক।।
হেন শোক নিবারিব কেমন প্রকারে। ইহার উপায় দ্বিজ ঝাট কহ মোরে।। ১১০
এতেক শুনিয়া দ্বিজ ভাবিল অন্তরে। নৃপতির বিদ্যমানে বলয়ে সত্বরে।।
ইহার উপায় কহি শুনহ নৃপতি। সর্পসত্র যজ্ঞ কর আমার যুকতি।।
রাজচক্রবর্তী তুমি হৈলে মোর মিত। করহ সর্পের ক্ষয় আমি পুরোহিত।।
ত্রিভুবনে যত নাগ মারিব [৮]পোড়ায়্যা[৮]। কহিল উপায় এই কর শীঘ্র হৈয়া।।
বড়ই অদ্ভুত যজ্ঞ সর্পের বিনাশ। অবশেষে হবে ভাল বলে বিপ্রদাস।। ১১৫

১ যুদ্ধে বুদ্ধে নাহিক তুলন (এসো/১) ২ ছত্র দণ্ড শিরে ধরে দীপ্ত অতিশয় (সু. সেন) ৩ (নেই—এসো/১) ৪ পুত্রদ্বারা (সু. সেন ; বলাবাহুল্য বিভ্রান্তিকর পাঠ ; ছিল পুত্রদারা) ৫ নিবেদিতে (এসো/১) ৬ কাড়িল (সু. সেন) ৭ দিবসে (সু. সেন) ৮ পুড়িয়া (এসো/১)

৬
ঝারিখণ্ড

শুনিয়া দ্বিজের বাণী সর্পের নিধন জানি
অতি হৃষ্ট হইল রাজন।
কহে রাজা দ্বিজবরে কি কব তোমার ওরে
তুমি মিতা হৈলে শুভক্ষণ।। ১১৬
তোমা আমা দুইজন দৈবযোগে সম্মিলন
হেন ঘোর গহন কাননে।
চল শীঘ্র দুই জনে পাত্রমিত্র সন্নিধানে
ঝাট কর যজ্ঞের সন্ধানে।।
নিশানে পড়িল কাটী রণ-শিঙ্গা পরিপাটী
ঘন বাজে দগড় দড়মসা।
কুঞ্জরে মাহুত হাঁকে অতিবেগে ঘন ডাকে
সংসারে জীমূত যেন ঘোষা।।
চলে সৈন্য সেনাপতি হস্তী অশ্ব মহারথী
পয়দল না যায় লিখন।
যেন রজনীর পতি জন্মেজয় মধ্যে তথি
বেষ্টিত পরম বন্ধুজন।।
তথা হৈতে নরপতি অতিবেগে শীঘ্রগতি
[১]নিজ ঘরে[১] দিল দরশন।
আসিয়া আপন পুরে দ্বিজ লৈয়া [২]যুক্তি[২] করে
ইষ্ট মিত্র বন্ধুবর্গ জন।। ১২০
পিতা শোক বাড়ে অতি জন্মেজয় নরপতি
কোপে যজ্ঞ করে সর্পসত্র।
আদেশিল বন্ধুজনে ডাকে পুরোহিতগণে
কহিল দ্বিজের সব তত্ত্ব।।
অবিলম্বে সভে গিয়া রাজ্য সহ সঙ্গে লৈয়া
করহ যজ্ঞের নানা বিধি।
শীঘ্রগতি সর্বস্থানে পাঠাইল নিমন্ত্রণে
মহা মহা মুনি ব্যাস আদি।।
রাজ্যে রাজ্যে রাজাগণ জ্ঞাতি আদি বন্ধুজন
নিমন্ত্রিল যজ্ঞের আরম্ভে।
জন্মেজয় নরপতি অন্তরে কুপিত অতি
[৩]ত্বরা[৩] অতি ডাকে মহাদম্ভে।।
জয় দ্বিজ পুরোহিত করিব যজ্ঞের নীত
ত্রিভুবনে নাগের বিনাশ।
মনসা চরণ গতি হৃদয় দ্রবিত অতি
বিরচিল দ্বিজ বিপ্রদাস।। ১২৪

১ নিজ পুরে (এসো/১) ২ যুক্ত (সু. সেন) ৩ দ্বারী (এসো/১)

৭

পয়ার

দ্বিজ পুরোহিত সভে পবন গমনে। পুরের বাহিরে গিয়া দিল দরশনে।। ১২৫
ঠাট সৈন্য প্রজা আদি চারিদিগে বেড়ে। যারে যে আদেশ করে ততক্ষণে নড়ে।।
কিঙ্কর গানেরে আজ্ঞা দিল দ্বিজগণ। কাটিল যজ্ঞের কুণ্ড অতি সুগঠন।।
সারি সারি মণ্ডব বান্ধিল তার কাছে। দ্বিজগণ শীঘ্র শীঘ্র ঘন ডাকে [১]পাছে[১] ।।
আওয়ারি আওয়ারি ঘর বান্ধিল বিস্তর। গণনে না যায় অতি দেখিতে সুন্দর।।
বস্ত্র আচ্ছাদনে তার বেড়ে চারিধার। ক্রোশেক জুড়িয়া রবি ঢাকিল উপর।।[২] ১৩০
প্রস্তুত করিল নানা দ্রব্য আদি করি। অবশেষে নাহি কিছু ধায় ত্বরাত্বরি।।
কহিল রাজারে গিয়া সর্ব বিবরণ। শুনি জন্মেজয় রাজা আনন্দিত জন।।
স্নান কৈল নরপতি ত্বরিত গমনে। দ্বিজ পুরোহিত সনে গেল যজ্ঞস্থানে।।
আইল যতেক মুনি লিখিতে না পারি। ব্যাস আদি মণ্ডবে বসিলা সারি সারি।।
ইষ্ট মিত্র বন্ধুবর্গ নৃপ আদি করি। পৃথিবী জুড়িয়া সভে আইল রাজপুরী।। ১৩৫
হইল অপূর্ব সভা শোভা অনুপাম। জন্মেজয়ে সর্বজনে করিল আহ্বান।।
সকল সম্পূর্ণ হৈল রাজার প্রতাপে। দশদিগ বেড়ি লোক রহে এক চাপে।।
পিতা-শোকে জন্মেজয় দহে শোকানলে। মহা [৩]কোপে[৩] সর্পসত্র করে মহাবলে।।
বিপ্রদাস বলে পদ্মা [৪]চরণ কমলে[৪]। অন্তে যেন পাই সুখে তব [৫]পদস্থলে[৫] ।। ১৩৯

---

১ নাছে (এসো/১) ২ 'রম্য সভাস্থান কৈল তাহার ভিতর।' এরপর এসো/২-তে লেখা 'একপদ নাই'।
৩ ক্রোধে (এসো/১) ৪ চরণ কমল (ঐ) ৫ পদতল (ঐ)

৮

নাট রাগ

জন্মেজয় কুতূহলে বসন অঙ্গুরি মাল্যে
পুরোহিত করিল বরণ।
হোম যজ্ঞ নানাবিধি সর্ব মুনি ব্যাস আদি
বরণ করিল সর্বজন।। ১৪০
নৃপতি জনক-শোকে হৃদয় সন্তাপ কোপে
সর্পসত্র করে মহাশয়।
জয় দ্বিজ পুরোহিত কোপে অতি সকম্পিত
পূর্বশোক বাড়ে অতিশয়।।
প্রথমে অর্চনা করি পঞ্চদেব পূজা করি
যজ্ঞ কুণ্ডে জ্বালে হুতাশন।
চন্দনের কাষ্ঠ লৈয়া ঘৃতকূপে জাবড়ায়্যা
তথি পরে দিল ততক্ষণ।।
ঘৃত ঢালে ঘনে ঘন মন্ত্র পড়ে দ্বিজগণ
পূজে রাজা বিবিধ বিধানে।
সুগন্ধি কুসুম গন্ধ উপহার সুপ্রবন্ধ
নানা রত্ন বসন ভূষণে।।

বহ্নি উঠে পঞ্চমুখে হৃদয় পরম সুখে
সঘন গর্জিয়া ঘোবতর।
ঢালিছে প্রচুর ঘৃত শুষ্ক কাষ্ঠ অবিরত
সঘনে যোগায় নৃপবর॥
মহাতেজে দীপ্ত কৈল যেন মেঘে গরজিল
পঞ্চ সূর্য যেমন গগনে।
জন্মেজয় নরপতি [১]হৃদয়ে কুপিত[১] অতি
ঘন ঘন করয়ে গর্জনে॥ ১৪৫
টলমল ভূমণ্ডল স্বর্গ মর্ত্য রসাতল
বিধি হরি শিব পুরন্দর।
দেব ঋষি কম্পমান সভে আসি অধিষ্ঠান
বাহনে রহিল শূন্য পর॥
যতেক নাগের কুল অনন্ত তাহার মূল
বাসুকি তক্ষক আদি যত।
প্রাণে সকাতর হৈয়া চারিদিকে সভে ধাইয়া
সত্বরে পলায় অবিরত॥
দিগে দিগে ধায় বেগে কেহ গিয়া স্বর্গে লাগে
কেহ যায় [২]জলনিধি তীরে[২]।
ক্ষীরোদ শয়ানে যথা প্রভু নারায়ণ তথা
অনন্ত রহিল গিয়া করে॥
বাসুকি জীবন ভয়ে ভূতনাথ-বক্ষে রয়ে
যোগ পাটা হৃদয়ে শোভিল।
যতেক নাগের বংশ ত্রিভুবনে নানা-অংশ
চারিদিগে গিয়া পলাইল॥
দেখিয়া বিষম কার্য শোক কুলি মহাআর্য
ধায় কালি-নাগ অতিভয়।
মনসা গোচরে গিয়া কহে গড়াগড়ি দিয়া
নাগ কুল সব করে ক্ষয়॥ ১৫০
জন্মেজয় নরপতি মহারাজা বৈসে ক্ষিতি
তক্ষকে দংশিল তার পিতা।[৩]
সেই শোকে নরবর যজ্ঞ অতি ঘোরতর
সর্পসত্র নামে অবস্থিতা॥
না রহিল তব দর্প যদি মৈল সর্বসর্প
ঝাট গিয়া কর যজ্ঞনাশ।
শুনিয়া এত বিবরণ মনসা চিন্তিত মন
বিরচিল দ্বিজ বিপ্রদাস॥ ১৫২

১ হৃদয় সপিত (এসো/১) ২ জলধি ভিতরে (সু. সেন) ৩ এরপর একটি ধুয়াপদ : 'নম নারায়ণী নগ কুলাঙ্গিনি চণ্ডি গ মা' (এসো/১)

৯
শ্রীরাগ

[১]নাগকুল নির্মূল শুনিয়া বিষহবি। [২]শীঘ্রগতি[২] ডাকে সতী নেতো সহচরী।। ১৫৩
নেতো পাণি ধরি বাণী জিজ্ঞাসে মনসা। নাগবংশ হৈল ধ্বংস পড়িল বিদশা।।
জন্মেজয় করে ক্ষয় যত ফণিগণ। কহ দেখি শশিমুখী সুসার বচন।।
সর্পসত্র যজ্ঞে যত ভুজঙ্গ বিনাশ। দুঃখমতি পদ্মাবতী ভাবেন হুতাশ।।
নেতো কহে যজ্ঞ রহে বাঁচে নাগগণ। রক্ষিবারে সবে পারে তোমার নন্দন।।
দুই কুল রক্ষামূল আস্তিক কুমার। পুত্রে কার্যে পাঠাইয়া করহ উদ্ধার।।
তেজময় অতিশয় যেন পিতামহ। আপনি আস্তিকে [৩]মানি[৩] বুঝাইয়া কহ।।
এত শুনি ব্রাহ্মণী [৪]পুত্রে[৪] ডাকি কয়। নাগবংশ করে ধ্বংস রাজা জন্মেজয়।। ১৬০
যাহ পুত্র কবি যোত্র যজ্ঞ মাগি লহ। রক্ষাহ মাতুলকুল বন্ধুগণ সহ।।
তোমা বহি আর নাহি করিতে উপায়। দ্রুত চল যজ্ঞস্থল নৃপতি যথায়।।
চলে মুনি এত শুনি মায়ের বচন। বাল্য বেশ বিশেষ সুন্দর সুশোভন।।
মহাবীর্য যেন সূর্য তপে তেজময়। বৃহস্পতি তুল্য অতি বিদ্যায় বিজয়।।
দেবধ্যান বেদগান করিতে করিতে। যজ্ঞ যথা আসি তথা মিলিলা তুরিতে।। ১৬৫
বেদধ্বনি সবে শুনি শিশুর বদনে। ধন্য ধন্য করি মান্য কৈল দ্বিজগণে।।
নৃপতি আনন্দ অতি দ্বিজ শিশু দেখি। পদ্য [৩]আদি[৩] যথাবিধি পূজিল সম্মুখি।।
দেশ ধাম কিবা নাম গমন কারণ। জিজ্ঞাসিল সকল হইয়া হৃষ্টমন।।
আশীর্বাদ সম্বাদ জানাইয়া মুনিবর। ভিক্ষাআশে তব বাসে আইনু নৃপবর।।
[৫]জন্মেজয় রাজাকয় যাহা চাহ তুমি। প্রাণ হয় নিশ্চয় তথাচ দিব আমি।।[৫] ১৭০
[৬] মুনিবরে সত্বরে আশ্বাসি নরবর। ডাকিয়া কহিছে মুনি দ্বিজ বরাবর।।[৬]
রাজা বলে তক্ষকে খাইল মোর পিতা। দেখ দেখ সর্পাধম পলাইল কোথা।।
বিশেষ জানিয়া সভে ধ্যানে মুনিগণ। পুরন্দর-শয্যাপর কহে সর্বজন।।
জন্মেজয় বলে শুন দ্বিজ পুরোহিত। দৈব দোষে সৃষ্টি নাশে [৭]হেরো[৭] আশ্চম্বিত।।
আহুতি করহ অতি শীঘ্রতর গতি। দ্বিজবর সত্বর হইয়া দৃঢ় মতি।। ১৭৫
তক্ষক ইন্দ্রের সহ শুনিতে আহুতি। করে করি লৈল ধরি রাজা শীঘ্রগতি।।
হেনকালে তথা বলে আস্তিক-কুমার। তব পিতা পুণ্যে [৮]শীঘ্র[৮] এক দান কর।।
অশ্বমেধ গোমেধ সকল যজ্ঞ জানি। রাজ্য সুই কৈল দুই ধর্ম নৃপমণি।।
[৯]বিশ্বকর্ম দিল ধর্ম[৯] তরু সাজাইয়া। সুরনাথ পারিজাত দিল পাঠাইয়া।।
বহ্নি [১০]মুক্তি[১০] আমি তথি হৈলা উপনীত। মন্ত্র পড়ি ঘৃত ব্রহ্মা ঢালয়ে বিদিত।। ১৮০
হেন যজ্ঞ আমি সাঙ্গ দেখিল বিদ্যমান। সেহ সব নহে তব যজ্ঞের সমান।।
অমৃত সমান বাক্য শুনি সুললিত। রাজা আদি যত বিধি হইল মোহিত।।
তবে রাজা মহাতেজা বলে সবিনয়। রাজ্য ধন কোন দান দিব মহাশয়।।
আস্তিক বলয়ে ধিক সত্য কর তুমি। তবে সে অক্লেশে দান লৈতে পারি আমি।।
রাজা বলে বিস্ময় না কর দ্বিজবর। সত্য কৈনু না লঙ্ঘিব তোমার উত্তর।। ১৮৫
শুনিয়া হরিষ হৈয়া বলে সন্নিধান। হস্তের আহুতি এই মোরে দেহদান।।
নৃপবর শিরোপর যেন বজ্রাঘাত। আস্তিকের উত্তর শুনিয়া অকস্মাত।।
ভাবিয়া চিন্তিয়া রাজা বলে সবিনয়। ইহা বিনা চাহ অন্য দিব মহাশয়।।

রাজ্যধন প্রাণপণ সকলি তোমার। শুন শুন মহাজন বচন আমার।।
মুনি বলে [১১]আখণ্ডলে[১১] শুন নৃপমণি। সত্য লঙ্ঘনের তত্ত্ব জানহ আপনি।। ১৯০
অগোয়ানে অপ্রমাণে করে হেন কাজ। অবুধ বিবুধ লৈয়া তোমার সমাজ।।
অদ্য যদি শচীপতি হয়ে নিপতন। বিকট সঙ্কট ভোরে হইব রাজন।।
পাত্রমিত্র বলে তবে রাজা বিদ্যমান। নহিল [১২]নহিল[১২] যজ্ঞ দ্বিজে দেহদান।।
বুঝিল সকল ছল রাজা জন্মেজয়। তুমি কোন মহাজন দেহ পরিচয়।।
এত শুনি হাসি মুনি কুতূহলী হৈয়া। মধুর উত্তর কহে রাজারে চাহিয়া।। ১৯৫
জরৎকার পিতা মোর মনসা জননী। মোর নাম অনুপাম আস্তিক [১৩]মহামুনি[১৩]।।
হরি বিধি শিব আদি সবার সম্মতি। ইন্দ্র ফণি ক্ষয় জানি আইনু শীঘ্রগতি।।
ইহা শুনি নৃপমণি দুখিত হৃদয়। বিফল হইল যজ্ঞ বলহ উপায়।।
মুনি বলে কুতূহলে দিব মোক্ষ-বর। চিরকাল রাজ্য পালো এ মহী ভিতর।।
অন্তকালে মহীপালে যাবে স্বর্গভূমি। মোর বরে ক্ষিতি পরে সুখে থাক তুমি।। ২০০
মুনিবর সত্বর করিল আগমন। আস্তিকেরে লৈয়া শিরে নাচে নাগগণ।।
পদ্মাবতী মেতো সতী অতি হৃষ্ট হৈয়া। বদন চুম্বন কৈলা পুত্র কোলে লৈয়া।।
হেন রূপে রসকূপে রহে নিজপুরী। রোগ শোক [১৪]ক্ষোভ নাহি[১৪] পদ্মার নগরী।।
শুন শুন সর্বজন অপূর্ব কথন। চাঁদ রাজা মহাতেজা পাত্রমিত্রগণ।।
কহিব তাহার সব বিধান প্রকার। বিপ্রদাস ভাসে পদ্মার পদ মাত্র সার।। ২০৫

১ এরপর এই অংশ সু. সেন সম্পাদিত সংস্করণে মূল পাঠে গ্রহণ করা হয়েছে। এটি কাব্যের অন্তর্গত নয় :
সংসার বিষম ঘোর নাহিক নিস্তার। রাধাকানু পদরেণু সবে মাত্র সার।।
চক্ষেতে দেখিয়া নর শমন প্রহার। অমৃত ছাড়িয়া কর গরল বেভার।।
রাম রাম মহামন্ত্র জপ একমনে। তরিবে সংসারে যবে লইবে শমনে।। (এসো/১)
২ ব্যগ্র গতি (ঐ) ৩ আমি (ঐ) ৪ পুত্ররে (সু. সেন) ৫ (নেই—এসো/১) ৬ পরিবর্তিত পয়ার
ডাকিয়া কহিছে মুনি দ্বিজ বরাবর। কিবা ভিক্ষা চাহ তুমি কহনা সত্বর।। (এসো/১)
৭ হব (সু. সেন) ৮ রাজা (এসো/১) ৯ বিশ্বকর্মে দিল ধর্মে (সু. সেন) ১০ মূর্ত্রি (ঐ) ১১ অবধান (এসো ১) ১২ রহিল (সু. সেন) ১৩ বলনি (ঐ) ১৪ ভোক নাই (এসো/১)

১০

জমক ছন্দ

চম্পক নগর ঘর চাঁদ অধিকারী। গন্ধবণিক কুলে জনম তাহারি।। ২০৬
রাজচক্রবর্তী রাজা রাজ্য বহু দূর। কুলেশীলে ধনেজনে বলে [১]মহাশূর[১]।।
কুবের সমান ধনরত্ন মণিময়। অসংখ্য অমূল্য নিধি দীপ্ত অতিশয়।।
সেনাপতি মহারথী সৈন্য অগণন। কুঞ্জর প্রচুর অশ্ব করয়ে গর্জন।।
তন্ত্রি-মন্ত্রি পাত্রগণ আমাত্য বান্ধব। পুরবাসী দাসদাসী কতো আছে সব।। ২১০
পুত্রগণ মদন জিনিয়া রূপবান। নাহিক তুলনা ধিক তাহার সমান।।
রাজ্যের ভিতর সুখে বৈসে প্রজালোক। [২]দুঃখিত দরিদ্র নাহি কোন রোগশোক।।
হেনমতে অচিরাতে সুখে রাজ্য করে। গভীর সুস্থির অতি চাঁদ নরবরে।।
মনোনীত বাঞ্ছিত সু-বর অভিলাষে। শিব দুর্গা অপবর্গা সেবে অনায়াসে।।

চিরকাল ভূপাল ভক্ষিয়া ফলমূল। অপরূপ বহুতপ করে সমতুল॥ ২১৫
রথের উপর হরগৌরী লৈয়া সুখে। মর্ত্যপুর মহেশ্বব ভ্রমের কৌতুকে॥
চাঁদ দেখি পিনাকী সদয় হৈল অতি। বর দিতে ভূতনাথে আইলা শীঘ্রগতি॥
চাহিয়া হাসিয়া আজ্ঞা কৈলা মহেশ্বর। কি তোর [৩]অরিষ্ট[৩] বর মাগ নৃপবর॥
সত্বরে কাতরে অতি চাঁদ দণ্ডধর। প্রেমমদে গদ গদে [৪]নির্মল[৪] অন্তর॥
গড়াগড়ি ভূমে পড়ি ঘন প্রণিপাত। জোড় করে মহেশ্বরে বলে নরনাথ॥ ২২০
যদি বর দিবে মোরে কহি সম্বিধান। কুতূহলি [৫]সিদ্ধি[৫] ঝুলি দেহ মহাজ্ঞান॥
জরামৃত্যু জন্ম দুই না হয় সংসারে। অচির করিব ঘর চম্পকনগরে॥
[৬]কৃপান্বিত ভূতনাথ[৬] নিজ ভক্তজনে। নরপতি মনোনীত দিলা ততক্ষণে॥
জয়নেত শিরে হস্ত দিলেন শঙ্কর। সিদ্ধিজটা অতিছটা হইল সত্বর॥
মহাতেজা চাঁদ রাজা হৈল শিব বরে। সংসারে অবধ্য সিদ্ধি চাঁদো নরেশ্বরে॥ ২২৫
তবে চণ্ডী কুবুদ্ধি দিলেন তার তরে। শুন শুন কারণ বচন নরবরে॥
পদ্মাবতী দুষ্ট মতি বড় দুরাচারী। সিজুয়া-শিখরে ঘর সদা মন্দকারী॥
দেবপুর মাঝে তার বড় অপমান। না পুজিহ তারে কভু শুন সম্বিধান॥
বুঝাইয়া হরপ্রিয়া গেলা নিকেতনে। সেই তো কুবুদ্ধি অতি রহে চাঁদো মনে॥
ওথায় পদ্মায় লৈয়া শুনহ কারণ। বিপ্রদাসে ভাষে রসে মনসা চরণ॥ ২৩০

১ মহীশূর (এসো/১) ২ এখান থেকে এসো/২ অর্থাৎ জি ৩৫৩০ সংখ্যক পুথির পাঠ পাওয়া যাচ্ছে
৩ অভীষ্ট (এসো/১) ৪ বিভোল (ঐ) ৫ সিদ্ধ (সু সেন) ৬ কৃপান্বিতে ভূতনাথে (ঐ)

১১

শ্রীরাগ

একদিন বিষহরি বসিয়া সিজুয়াগিরি
নেতোরে আনিয়া বিদ্যমান।
বলন্তি মধুর ভাষা শুন হে প্রাণের স্বসা
কহি হেদে কর অবধান॥ ২৩১
যতেক অমরগণ [১]দিকপাল[১] মুনিজন
পৃথিবী সভার অধিকার।
আমি দেব বিষহরি ঐ তিন ভুবন ভরি
সবে পূজা নাহিক আমার॥
চিন্তাকুলি মনসা কুমারী।
শুন ভগ্নি [২]নেতোবতী[২] যুক্তি বল শীঘ্রগতি
প্রচার হইব মর্ত্যপুরী॥
নাহি তব অগোচর ক্ষিতি বৈসে যত নর
[৩]শুদ্ধমতি[৩] আছে কোন জন।
খড়ি পাতি ঝাট বল কোন জন আছে ভাল
আগে পূজা লব কার স্থান॥

শুনিয়া পদ্মার বাণী করে লৈল খড়িখানি
গণে নেতো এ তিন সংসার।
প্রথমে গনিল মরু স্থাবর জঙ্গম তরু
মনোনীত গনিছে সুসার।। ২৩৫
সিংহ আদি মৃগ যত [৪]শুনিল[৪] বিহঙ্গম ত
গণে রামা সকল ভুবন।
পার্বতি হরের বরে আছে এক নরবরে
চাঁদ নাম ধরয়ে রাজন।।
চাঁদ অধিকারী পায়্যা বলে হরসিত হয়্যা
শুন দেবি আস্তিক জননী।
হরগৌরী তুষ্ট তারে আছে এক শুদ্ধাচারে
নাম তার চাঁদ নৃপমণি।।
চম্পক নগর নাম অতিরম্য অনুপাম
তথাই নিবসে কুতূহলে।
মহাজ্ঞান জানে সার কারো ডর নাহি তার
সিদ্ধি বিদ্যা জানে মহা বলে।।
পূজে [৫]সব[৫] দেবতায় তোমা নিন্দা করে রায়
হর গৌরী-দম্ভের কারণ।
বুঝাইয়া সেই রাজা মর্ত্যপুরে লহ পূজা
দ্বিজ বিপ্রদাস সুরচন।। ২৩৯

১ দিগপাল (সু. সেন) ২ নেতবতী (ঐ) ৩ দুষ্টমতি (ঐ) ৪ গনিল (এসো/৩) ৫ সর্ব (ঐ)

১২

পয়ার

একদিন নেতো পদ্মা রথ আরোহণে। পৃথিবী ভ্রমিতে আইল হরষিত-মনে।। ২৪০
হেন কালে গোধন রাখয়ে শিশুগণ। প্রান্তর মধ্যেতে পদ্মা কৈলা নিরক্ষণ।।
মনসা বলেন নেতো অপরূপ দেখ। কানন ভিতরে ধেনু চরে লাখে লাখ।।
লেঙ্গুড়ে ধরিয়া হাঁকে শিশু বহুতর। ইহার কারণ মোরে কহত সত্বর।।
নেত বলে বিষহরি কর অবধান। এই যে গোধন দেখ জগতের প্রাণ।।
অনুক্ষণ রাখে [১]বুলে[১] সব শিশুগণ। মন দিয়া শুন পদ্মা ইহার কারণ।। ২৪৫
দন্তবোড় মুনি কুশমূল পান করে। সকল রাখাল তাহা দেখিল সত্বরে।।
বলিছে রাখাল সব মুনিরে ডাকিয়া। হরসিতে খাও কিবা [২]ঘটিতে[২] পুরিয়া।।
রাখালের বাক্যে মুনি কহে ততক্ষণ। না জান রাখাল মদ্য করিয়ে ভক্ষণ।।
সকল রাখাল মেলি ভাবে চমৎকার। সেই হেতু মুনিবরে হৈল অনাচার।।
অন্যদিন অন্তরীক্ষে রাখিত বসন। না রহিল সেই দিন সেই সে কারণ।। ২৫০
বিস্মিত হইয়া মুনি ভাবিছে অন্তরে। চিরদিন তপ করি ক্ষীরোদের তীরে।।
আজি কেন বসন না রহে অন্তরীক্ষে। মারিব পবন আজি কোন দেব রক্ষে।।

আমার সহিত বাদ করয়ে পবন। অবহেলা করি মোর ফেলায় বসন॥
ধ্যান করি মুনি সর্ব জানিলা অন্তরে। অবুধ রাখাল নিন্দা কৈলা মোর তরে॥
হাসিয়া সকল কোধ [৩]সম্বোধিল[৩] মুনি। সব শিশু মাঝে মায়া পাতিল তখনি॥ ২৫৫
উঠিতে না পারে মুনি হইল আকুল। মায়া [৪]মোহে[৪] ডাকে মুনি রাখাল সকল॥
তৃষায় পীড়িত আমি চলিতে না পারি। প্রাণ রাখ কুশমূল দেহ শীঘ্র করি॥
বিলম্ব না কর ঝাটো আন সর্বজন। ক্ষেণার্ধ হইলে গৌণ হারাব জীবন॥
শুনিয়া মুনির বাক্য সব শিশুগণ। [৫]হৃদয়ের দ্রবিত[৫] হৈয়া ধায় সর্বজন॥
ঘটী পুরি কুশমূল আনিল সত্বরে। হরষিতে ঝাটো লইয়া দিল মুনিবরে॥ ২৬০
হৃদয়ে পরমানন্দ মুনির নন্দন। সেইখানে বসি মুনি করিলা ভক্ষণ॥
মুনির অগ্রেতে সভে জোড় করি কর। জিজ্ঞাসা করএ সভে সভয় অন্তর॥
শুন শুন মহাশয় কহিবে কারণ। ঘটী পুরি কিবা এই করিলা ভক্ষণ॥
হাসিয়া [৬]রহসে[৬] মুনি সকলি কহিল। ভক্ষণ করিল মদ্য সারদ্ধার বৈল॥
মুনি হৈয়া হেন কর্ম কেহ নাহি করে। সভে মাত্র ভক্ষি আমি মুনির ভিতরে॥ ২৬৫
আজি সে রাখিলা প্রাণ সকল রাখাল। এই পুণ্যে [৭]তোমা সভার হৈবে ভাল[৭]॥
এত বলি মুনিবর গেলা নিজ স্থান। চিন্তিয়া জগত গৌরী বিপ্রদাস গান॥ ২৬৭

---

১ বলে (সু সেন) ২ মুটিতে (ঐ) ৩ সম্বরিল (এসো/১) ৪ মোয়ে (সু. সেন) ৫ হৃদয় প্রবিণ (ঐ) ৬ বলএ (ঐ), বসএ (এসো/২) ৭ সুখে গোঙাইবে চিরকাল (এসো/১)

১৩
পূরবী রাগ

[১]বদন্তি রাখালগণ[১] জানি [২]মুনি কারণ[২]
মদ্য নহে কুশমূল খায়।
হরসিত মুনিবর তপ করে নিরন্তর
বায়ুভরে বসন শুখায়॥ ২৬৮
অবগতি কর হরসুতা।
প্রথমে ধরণী মাঝে করহ পূজার কাজে
[৩]রাখালেরে[৩] হও বরদাতা॥
ঝাট উর মহিতলে রাখালের মধ্যস্থলে
শিশু দেখি না করিহ হেলা।
ক্ষেণে হৈয়া তপস্বিনী ক্ষেণে নাগবাহিনী
রাখাল মোহিতে পাত কলা॥ ২৭০
নেতোর বচন শুনি হাসে হরনন্দিনী
হরসিত হৈলা পদ্মাবতী।
দ্বিজ বিপ্রদাস কবি জনমে জনমে সেবি
পদ্মা-পদে পরম ভকতি॥ ২৭১

---

১ নেতো কহে হৃষ্ট মনে (এসো/১) ২ সব বিবরণে (ঐ) ৩ রাখালের (সু. সেন)

১৪

জমক ছন্দ

প্রথমে মনসা দৃষ্টি দিলা [১]মহিতলে[১]। রাখালের মেলা ক্ষিতি দেখি কুতূহলে।। ২৭২
ছলিতে রাখালে মায়া [২]পাতিলে[২] বিশেষ। [৩]মায়ায় হইলা বৃদ্ধ[৩] ব্রাহ্মণ বেশ।।
অতিবৃদ্ধ রূপ মুখে দশন গলিত। বচন না আইসে তাহে লোচন ঘূর্ণিত।।
শালগাছ হেন দীর্ঘ মূর্তি ভয়ঙ্কর। চাহিতে মাথার পাগ পড়ায় সত্বর।। ২৭৫
প্রচুর ধবল কেশ নারে সম্বরিতে। ক্ষেম ধুতি পরিধান সদাই কম্পিতে।।
[৪]মহাপদ্মা উরগ[৪] করেতে ধরি নড়ি। বিচিত্র লইল কাকে রঙ্গন চুপড়ি।।
হেন বেশে প্রবেশিলা রাখাল ভিতর। দেখিয়া রাখালগণ হাসিয়া বিকল।।
অন্তরে সভয় সভে করে কানাকানি। কোথা হইতে আইল বুড়ি রাক্ষসী ডাইনি।।
শিশুগণ বলে বুড়ি তুমি কেন এথা। কোথা হইতে আইলে এবে যাবে তুমি কোথা।। ৩৮০
মায়ামোহে বলে দেবী অস্তিক জননী। অনেক কালের আমি বৃদ্ধা সুব্রাহ্মণী।।
কল্য আমি উপদেশ কৈল একাদশী। না হয়ে [৫]পারণসিদ্ধ[৫] দুই-উপবাসী।।
তুমি সব ধর্মজ্ঞানী আছ মনে করি। তে কারণে আইনু এথা বৃদ্ধা একেশ্বরী।।
যদি কিছু দুগ্ধ দেহ করিব পারণ। তোমা সভা কল্যাণ করিব অনুক্ষণ।।
শুনিয়া সকল শিশু করে অনুমান। মায়া পাতি ডাইনি [৬]করিল[৬] রক্তপান।। ২৮৫
কুবুদ্ধি রাখাল সভে [৭]বেড়ি[৭] মনসার। কেহ হাতে ধরি টানে ধুলা দেয় গায়।।
মায়ায় কাতর বাণী কহে মনসার। একেশ্বরী পাইয়া কেন মারহ আমায়।।
হরের দুহিতা আমি মনসা কুমারী। শুনরে অবুধ তোরা পরিচয় করি।।
ভক্তি করি একমনে যদি পূজ মোরে। যেই বর মাঙ্গ তাহা দিবত সত্বরে।।
কহে পুরন্দর ঘোষ রাখাল প্রধান। যদি পদ্মা হও নাগ আন বিদ্যমান।। ২৯০
হাসিয়া মনসা তথা বসিলা ধেয়ানে। হাঁকারিয়া সাক্ষাতে আনিলা নাগগণে।।
ত্রাসে সভে বলে বুড়ি [৮]নাগ-চালা[৮] জানে। মন্ত্র পড়ি যত নাগ ডাক দিয়া আনে।।
সভেরে [৯]খাইবে[৯] আজি নাগ শিখাইয়া। সভে মেলি ধায়্যা গেল হাথে বাড়ি লৈয়া।।
রাখালের কুবুদ্ধি দেখিয়া মনসায়। নাগ রাখি অন্তরীক্ষ হৈলা মহামায়।।
দেবী না দেখিয়া বলে শিশু সর্বজনে। ভাল হৈল ডাইনি পলাইল ভয়-মনে।। ২৯৫
গগনে হইল বেলি তৃতীয় প্রহর। জল [১০]দিতে[১০] গরু লৈয়া চলিল সত্বর।।
পদ্মার মায়ায় তথা নাবাল হইল। জল পিতে সর্ব গরু নাবালে পড়িল।।
নাড়িতে চড়িতে নারে দেখিল প্রমাদ। সকল রাখাল কান্দে ভাবিয়া বিষাদ।।
হেনই সময় পদ্মা সেই রূপ ধরি। দাঁড়াইয়া হাসেন রাখাল বরাবরি।।
দেখিয়া রাখালগণ পড়িল চরণে। নাবালে পড়িল গরু তোমার কারণে।। ৩০০
গরু বিমোচন করি দেহ শীঘ্র গতি। পূজিব চরণ তব করিয়া ভকতি।।
রাখালের বাক্যে পদ্মা হৈলা হৃষ্ট মন। আজ্ঞামাত্রে সর্ব গরু হৈল বিমোচন।।
উঠিয়া ধাইল পাল হাম্বা রব দিয়া। হরিষে রাখালগণ রহিল বেড়িয়া।।
বসিলা মনসা তথা রম্য তরুতলে। রাখালে বলেন দুগ্ধ দেহ কুতূহলে।।
শুনিয়া সকল শিশু ভাবে মনে মন। পালের অরিষ্ট গাই আনিল তখন।। ৩০৫
কহে পুরন্দর ঘোষ মনসার ঠাঞি। এক কোষ দুগ্ধ কভু ইহাতে না পাই।।

জন দুই তিনে ধরি দুহিবার কালে। এখন ইহার বৎস নাই লই পালে॥
ভাণ্ড মাত্র নাহি দুগ্ধ দুহিব কেমনে। শুনিয়া আস্তিক মাতা ভাবে মনে মনে॥
ধামাই পাঠাইয়া দেবী বাছুর আনায়। নাগে দৃঢ় ছান্দিয়া ধরিল চারি পায়॥
কাঁধের চুপড়ি দেবি ফেলাইয়া দিল। দেখিয়া রাখাল সব ত্রাস যুক্ত হৈল॥ ৩১০
চুপড়ি দুহিব গাবি না পড়িব ক্ষিতি। ভয় কিছু [১১]নাহি বলে[১১] অন্তরে ভকতি॥
দুইল অসোচ্য দুগ্ধ ঘোষ পুরন্দর। নিমিখে চুপড়ি ভরি উঠিল সত্বর॥
হরসিতে দিল আনি দেবির [১২]সম্মুখ[১২]। আনন্দে করিলা পান হৈয়া [১৩]উর্ধ্বমুখ[১৩]॥
চুপড়ি দিলেন পুন রাখাল গোচর। দেখিয়া বিনয় বলে ঘোষ পুরন্দর॥
ত্রৈলোক্য-দেবতা তুমি আমি গোপজাতি। কেমনে উচ্ছিষ্ট দিব আমার শকতি॥ ৩১৫
পুনর্বার কেমনে করিবে দুগ্ধপান। কহিবারে ভয় বাসি বলহ বিধান॥
রাখালের বাক্য শুনি পদ্মাবতী হাসে। মনসা বিজই বলে দ্বিজ বিপ্রদাসে॥ ৩১৭

---

১ ক্ষিতিতলে (এসো/১) ২ পাতেন (ঐ) ৩ অপরূপ হৈলো দেবী (ঐ) ৪ মহাপদ্ম-উরগে (ঐ) ৫ পরণা সিদ্ধি (এসো/২) ৬ করে (ঐ) ৭ বেড়ে (ঐ) ৮ নাগবাচা (এসো/১) ৯ খায়াবে (সু.সেন) ১০ পিতে (এসো/২) ১১ নহিব সে (সুসেন) ১২ সাক্ষাত (ঐ) ১৩ অধো মুখ (সু. সেন—বিভ্রান্তিকর)

১৫

পটমঞ্জরি

দুগ্ধ পান করি দেবি বিষহরি
বসিয়া তরুর তলে।
নেতো বাম পাসে আইলা হরিষে
ডাকিয়া রাখালে বলে॥ ৩১৮
সদয় হৃদয় বলে মনসার
শুন সব শিশুগণ।
হইয়া একমতি করিয়া প্রণতি
পূজহ মনসা-চরণ॥
প্রচারিব ক্ষিতি আমি পদ্মাবতী
শুনহ কারণ-বাণী।
পূজ অতি সুখে দেখি নরলোকে
ঘুষুক মনসা জানি॥ ৩২০
জ্যৈষ্ঠ মাস তথি শুক্লা দশমী তিথি
করি নানা উপহার।
নৈবিদ্য প্রচুর মিষ্টান্ন বিস্তর
দিব্য দশ ফল আর॥
কদলি কর্কটী নারিকেল ফুটী
পনাস রসাল অতি।
গুবাক খাজুর আনিবে প্রচুর
আম্র জাম তাল তথি॥

পূগ [১]পূর্ণ[১] দিয়া [২]প্রচুর করিয়া
সুগন্ধি কুসুম গন্ধে।
ধূপ-দীপ জ্বালি মন কুতূহলী
নানা বাদ্য সুপ্রবন্ধে॥
আনি স্বর্ণ-বারি জলপূর্ণ করি
সিজ-শাখা তথিপর।
স্নান দান করি দেবী বিষহরি
পূজহ ভকতি চার॥
শুন মন দিয়া আমি তথা গিয়া
ঘটে হব অধিষ্ঠান।
মনের বাঞ্ছিত করিব পূর্ণিত
ধনপুত্র আদি মান॥ ৩২৫
রথে ভর করি দেবী বিষহরি
চলিলা সিজুয়া-গিরি।
শিশু সর্বজন অতিহৃষ্ট মন
আছয়ে আপন পুরী॥
নানা কুতূহলে বঞ্চয়ে সকলে
জ্যৈষ্ঠ মাস পরবেশ।
দশমী দশহরা তিথিযোগ তারা
শুভক্ষণ সবিশেষ॥
রাখাল সকল মহা কুতূহল
আনিল সুবর্ণ-বারি।
বিশাল বাজনা নিবিদ্য রচনা
যথাবিধি সারি সারি॥
পূর্বে যেন মতে সবার সাক্ষাতে
পদ্মা বৈলা উপদেশ।
সভে সেই মত করিয়া বিদিত
পূজা করে সবিশেষ॥
প্রণতি ভকতি করজোড় স্তুতি
সভে করে একমতি।
আস্তিক জননী কৃপায় আপনি
সানন্দে চলিলা তথি॥ ৩৩০
রাখালে মোহিত দেখিয়া ব্যথিত
ভকত-বৎসল দেবী।
কহে বিপ্রদাসে ভকতি প্রয়াসে
যুগল চরণ সেবি॥[২] ৩৩১

১ পঞ্চ (এসো/২) ২ পরিবর্ত পাঠ ঃ

তবে গন্ধ পুষ্প ধূপদীপে।।
সিজ বৃক্ষ কবিযা বোপণ।
বিশাল বাজনা কবি পূজহ বিষহবি
এথি আমি হইব সুপ্রসন্ন।।
সদয অন্তব ভাব অভিমত বব দিব
ব্যর্থ নহে আমাব বচন।
শুন নেত বিব তোবে তম দীপ অন্তবে
আব তোব নাই অকুশল।।
ঘটিযে বচিযা বাবি খিতি আবোহণ কবি
উপবে বিচিত্র সিজডাল।
দশমী দশহবা পায্যা নানা আত্মজন নিযা
দেবীপূজা কবিযে বাখাল।।
নানা পাদ্য কুতূহলে নাচে শিশু সকলে
ঘটো পবে দেই পুষ্পমাল।
প্রণতি ভকতি স্তুতি বাখাল সব একমতি
দেখ্যা দেবি হবষিত হৈল।।
বাখালেবে দিতে বব বথে পদ্মা কবি ভব
দ্বিজ বিপ্রদাস বিবচিত। (এসো/২)

১৬

পয়ার

প্রসন্ন হইলা দেবী ঘটে অধিষ্ঠান। সকল রাখালে ডাকি বলে বিদ্যামান।। ৩৩২
সদয [১]হইলু[১] তোরে আমি পদ্মাবতী। অবিলম্বে লও বর যেই লয মতি।।
হৃদয দ্রবিত হইল রাখাল সকল। আনন্দের সীমা নাই মহা কোলাহল।।
অভিমত সুখে বর লৈল সর্বজন। সম্পূর্ণ করিলা মাতা হরষিত মন।। ৩৩৫
শুনরে রাখাল সব আমার বচন। শোক দুঃখ রোগ পীড়া [২]নহিবে[২] কখন।।
জবা মৃত্যু আদি করি নাহি দুঃখ লেশ। সুখের নাহিক ওর আনন্দ বিশেষ।।
পুত্রে পৌত্রে ধনে জনে বাড়িবে আপার। নাহিক সর্পের ভয় তোমা সভাকার।।
বর দিয়া বিষহরি বসাইল গ্রাম। থুইল রাখাল গাছি নাম অনুপাম।।
আশ্চর্যিতে তথা হৈতে হৈলা অন্তর্ধান। রথ ভরে শীঘ্র গেলা আপনার স্থান।। ৩৪০
আর এক অপরূপ শুন মন দিয়া। কহিব কারণ কিছু তুড়ুক লইয়া।।
[৩]হাসন হুসেন তার[৩] প্রধান দুইজন। চিরকাল আছে সুখে আপন ভুবন।।
শতেক কৃষাণ সদা আছে নিয়োজিত। চষিতে গমন কৈল বড় হরষিত।।
জোয়ালি জুড়িয়া গরু লৈল [৪]খেদাইয়া[৪]। হরিষে চলিল হাতে পাচনি লইয়া।।
বুহিতা বাকুড়ি দিয়া দিল দরসন। লাঙ্গল জুড়িয়া চাষ চষে সর্বজন।। ৩৪৫
গোরা মিনা নামে তার প্রধান কৃষাণ। তাহার গোলাম গেল করিবারে স্নান।।
যেখানে রাখালগণ পূজে মনসায়। দৈবযোগে সে গোলাম তথাকারে যায়।।
ক্রোধযুক্ত হৈল সবে তুড়ুক দেখিয়া। ধর ধর ডাক ছাড়ি গেল খেদাড়িয়া।।

একেলা গোলাম সবে রাখাল বিস্তর। পলাইয়া গেল গোরা মিনার গোচর॥
সভয় কম্পিত অতি সব কথা কয়। বিনি দোষে রাখালে মারিতে মোরে [৫]ধায়[৫] ॥ ৩৫০
করিছে [৬]ভুতের থানা[৬] সিঁরক্তের তলে। বড় হরষিত হৈয়া রাখাল সকলে॥
রাখিয়া সিজের ডাল ঘটের উপর। ঘন ঘন [৭]তছলিম[৭] করয়ে বহুতর॥
জল আনিবারে আমি যাই সেই পথে। খেদাড়িয়া ধায় সভে আমারে মারিতে॥
ইহা শুন্যা গোরা মিনা [৮]ক্রোধেতে[৮] জ্বলিল। মারিতে রাখালগণে সভারে ভেজিল॥
ধর ধর তুড়ুক ডাকয়ে [৯]অবিশাল[৯]। এড়িয়া দেবীর ঘট পলায় রাখাল॥৩৫৫
দাড়াইল গোরা মিনা ঘট যথা রয়। কোপেতে মনসা দেবী ভাবিল হৃদয়॥
হাথে ছিল বিঘতিয়া কাঁচ পোকা করি। অন্তরীক্ষে আসিয়া রাখিলা ঘট ভরি॥
গোলামের কুবুদ্ধি পাইল হেন কালে। ডাল ঘুচাইয়া ঘট সঘনে নেহালে॥
অপরূপ কাঁচ পোকা পাইয়া তুড়ুক। হের [১০]ঘট বিচে ভাই[১০] দেখহ কৌতুক ॥
খোসাল হইল গোরা মিনা অতিশয়। হাথে করি কাঁচ পোকা লইল তথায়॥ ৩৬০
ইহা নিয়া দেখাইব রাজার গোচর। লুকাইয়া রাখ যত্নে ইজার ভিতর॥
উৎকট চাপন নাগ সহিতে না পারে। কামড় খাইল পেটে ইজার ভিতরে॥
আশ্চম্বিতে পেটে পড়ে বজ্রাঘাত। ইজার চিরিয়া মিনা পেটে দেই হাথ॥
মনসা বলেন ডাকি শুন বিঘতিয়া। বধহ তুড়ুক সব জনেক রাখিয়া॥
আজ্ঞা পায়্যা বিঘতিয়া হরষিত মন। দ্বিজ বিপ্রদাস বলে মনসা চরণ॥ ৩৬৫

১ হইনু (এসো/১) ২ নহিব (ঐ) ৩ হাঁসন হুসান তবে (সু. সেন) ৪ খেদাড়িয়া (ঐ) ৫ ধাযে (ঐ) ৬ ভুতে খানা (ঐ) ৭ তছমিল (ঐ) ৮ কোপেতে (এসো/১) ৯ অভিসাল (সু. সেন) ১০ ভুত ঘটে বিচে (এসো/১)

১৭
ত্রিপদী

বিষম বিষের জ্বালে — উত্তর শিয়রে চলে
প্রথমে পড়িল গোরা মিনা।
মনসার আজ্ঞা পাইয়া — হরষিত বিঘতিয়া
একে একে বধে সর্বজনা॥ ৩৬৬
সাহাতন বাহাতন — পয়তন গয়তন
আবদুল্লা হালিম মিঠাই।
উত্তর [১]শিয়রে[১] পড়ি — সভে যায় গড়াগড়ি
খোদা খোদা ফুকরে সদাই॥
সেবদিন [২]অজদিন[২] — [৩]সবদিন একরিন[৩]
সবদন রোজই [৪]কোচাই[৪]।
হাছিম [৫]মাছিম দুলা[৫] — গালিম [৬]করিম উলা[৬]
[৭]রসুল-উল্লা[৭] ইছাই মদাই॥
সুকুরুল্লা গন্নিবউল্লা — হারুন [৮]সেফলি উল্লা[৮]
ফতেগাজি মত্তাব দুসর।

হয়াত নবাত ছটী গড়াগড়ি ভুমে লুটী
তোবা তোবা সঙরে সত্বর॥
সদারি মাদারি [৯]লুদি[৯] মইদ্দি জইন্দি সাদি
[১০]করিম[১০] উজাল আদি যত।
ফতে সাহা ফুলসাহা দৌলত মামুদ সাহা
দফর সাহা হইল মুর্চ্ছিত॥ ৩৭০
[১১]নসিরদ্দি[১১] খরদিন পিরজ [১২]আনর দিন[১২]
[১৩]উমর[১৩] সাহা পড়িল তরাসে।
আরিপ সরিপ জালু সুলতান [১৪]মুলতান মালু[১৪]
দেখি পদ্মা অন্তরীক্ষে হাসে॥
তাজু রাজু নজু হারু নছির তাছির এরু
কাদির খিদির খোরাম তোবা।
জালাল আলাল [১৫]হুরি[১৫] বাহাদুর [১৬]গরিম[১৬] গুরি
বারাই হুমাই [১৭]ভোল[১৭] এবা॥
হাজি গাজি আমানুল্লা [১৮]আর মাদার[১৮] সুনু মোল্লা
ফরিদ মুরিদ খবরদার।
এমাম জাফর সাদি মরুম মাদারি কাদি
[১৯]মজলিল সিমকুল[১৯] দিদার॥
আক্কেল মাক্কেল কিনু ফকির মামুদ দিনু
আলাবস্ক পড়িল হাজাম।
দ্বিজ বিপ্রদাস বলে মনসার পদতলে
নিজ চিত্ত রাখি অবিরাম॥ ৩৭৪

১ শিয়রি (সু. সেন) ২ মুজদিন (এসো/১) ৩ খরদিন তকদিন (ঐ) ৪ গোচাই (সু. সেন) মাছিম বুড়া (ঐ) ৬ করিম উড়া (ঐ) ৭ রছুল্লা (ঐ) ৮ সের উল্লা (ঐ) ৯ নুদি (ঐ), 'লুদি' পাঠ পাচ্ছি এসো/২-তে এটি গ্রহণযোগ্য ১০ কবির (এসো/১) ১১ নবিছবি (সু. সেন) ১২ আনথা দিন (ঐ) ১৩ সুবার (ঐ) ১৪ মুলতান মালু (ঐ) ১৫ হরি (সু. সেন—পাঠটি বিভ্রান্তিকর) ১৬ গনিম (এসো/১) ১৭ ভোলা (ঐ) ১৮ আবদার (ঐ) ১৯ জলিলদ্দি মাঙ্গন (ঐ)

১৮

রাগ বাগেশ্বরী

উনশত কৃষান খাইল বিঘতিয়া। একজনা রাখিল দেবীর আজ্ঞা পাইয়া॥ ৩৭৫
ভাঁড়ু নামে তুড়ুক শতেক জন মাঝে। বাঁচিল রাজারে বার্তা কহিবার কাজে॥
বিপরীত দেখি ভাঁড়ু রড়ারড়ি ধায় ধায়। [১]হাসন হুসেন[১] আছে বসিয়া যথায়॥
সেই খানে গেল ভাঁড়ু কান্দিয়া বিকল। [২]তছলিম করিয়া[২] কহে খবর সকল॥
কুড়ুমা করিল সনে রাখাল সকল। করয়ে ভুতের [৩]থানা[৩] দরক্তের তল॥
সেইখানে পানি পিতে দেখিল গোলাম। খেদাড়ি আইল তারে রাখাল তামাম॥ ৩৮০
বড়ই বাড়িল [৪]গোবা[৪] মোরা শত জনে। সভে গেলু রাখালেরে মারিবার মনে॥

ভাগিল রাখাল সব পাইয়া দহশত।। সিজ ডাল [৫]ঘটে দিয়া[৫] হিন্দু পুজে ভূত।।
তার বিচে কাচ পোকা জমিন পাইল। সেই পোকা সাপ হৈয়া সভারে খাইল।।
বিষের জ্বালায় সবে পড়িল [৬]ঢলিয়া[৬]। আমি সে আনু সবে পরাণে বাঁচিয়া।।
শুনিয়া তাহার [৭]বাত[৭] কুপিল হাসন। এথায় মনসা লৈয়া শুনহ কারণ।। ৩৮৫
হাসনেরা সেই ঘাটে জল লৈয়া যায়। সে ঘাটে বসিয়া মায়া পাতে মনসায়।।
আপনার ঘট আরোপিয়া পথি মাঝে। [৮]পুষ্প[৮] জল দিয়া দেবী নিজ ঘট পুজে।।
হেনকালে সাত বান্দি কাঁখে কুম্ভ লৈয়া। জল আনিবারে যায় সেই পথ দিয়া।।
জিরা বিবি হারি আর যায় [৯]কালাফুলি[৯]। বুলবুলি দুলদুলি নাজিরি টগরি।।
দেখিয়া পদ্মার মায়া বলে রুষ্ট বাণী। রোজা [১০]মাসে[১০] ভূত কেন্ পূজিস ডাইনি।। ৩৯০
জানাইব এখনি" [১১]হাসন [১১] বিদ্যমান। নাক চুল কাটিয়া করিব অপমান।।
কোথা হৈতে আইলি ডাইনী হিন্দুয়ানি। পথ ছাড়ি দেহ বুড়ি [১২]লে জাহ আপনি[১২]।।
কুপিয়া বলেন তবে দেবী মনসায়। আর পথে [১৩]যারে চেড়ী[১৩] তোর কিবা দায়।।
ক্রুদ্ধ হইয়া যায় সভে মনসা ধরিতে। [১৪]বিঘতিয়া[১৪] ঘটে থুইয়া ভর কৈলা রথে।।
ধীরে ধীরে গেল বাঁদি ঘটের নিকটে। ঘুচায় সিজের ডাল হাত ভরে ঘটে।। ৩৯৫
কাচ পোকা তার মাঝে পাইল সুন্দর। দেখিয়া সকল বাঁদী খোসাল অন্তর।।
এখনি বিবিরে এই কাঁচ পোকা দিব। বাকুড়ি একেক কুড়ি এনাম পাইব।।
হাথে করি কাঁচ পোকা লইল চাপিয়া। উৎকট চাপনে হাতে খায় বিঘতিয়া।।
উই মা বলিয়া বান্দি নাগেরে ফেলায়। বিঘতিয়া পড়ে গিয়া আর বাঁদির গায়।।
[১৫]মাঝ বুকে[১৫] কামড় লইল বিঘতিয়া। দুই হাথে বুক চাপি পড়িল [১৬]ঢলিয়া[১৬]।। ৪০০
একে একে ছয় বান্দি খায় হেন মতে। রাখিল টগরি বাদি বারতা কহিতে।।
ধাইয়া গেল টগরি হাসন বরাবরি। বিপ্রদাস কহে তথা যায় বিষহরি।। ৪০২

---

১ হাসেন হুসেন (এসো/১) ২ তছমিল করি (সু. সেন) ৩ খানা (ঐ) ৪ গোস্‌সা (এসো/১) ৫ সিন্দুর ঘাট (ঐ) ৬ চলিয়া (সু. সেন—ভুল পাঠ) ৭ রাত (সু. সেন—ভুল পাঠ) ৮ পুষ্ট (ঐ) ৯ কাফালি (সু. সেন) ১০ মাঝে (ঐ) ১১ রাজার (ঐ) ১২ লৈয়া জাই পানি (এসো/১) ১৩ যাবে চেড়ি (সু. সেন) ১৪ বিঘুতিয়া (ঐ) ১৫ মাজবুকি (ঐ) ১৬ চলিয়া (ঐ)

১৯
পাহাড়ি রাগ

হাসনের বাঁদি ধায় রথ ভরে মনসায়
প্রবেশিল হাসন-নগরে।
সুবর্ণ-রচিত পুরী ঘর শোভে সারি সারি
নৃত্যগীত আনন্দ বিস্তরে।। ৪০৩
বৈসে যত প্রজাগণ সভে অতি বিচক্ষণ
নানা রত্ন শোভে কলেবর।
রূপে গুণে মনোহর [১]দীপ্ত যেন দিবাকর[১]
[২]প্রজাগণ হরিব অন্তর[২]।।

পদ্মা [৩]প্রবেশিল[৩] হাসনের পুরী।
নাহি কিছু দুঃখশোক সদা আনন্দিত লোক
দেখিয়া কৌতুকী বিষহরি॥ ৪০৫
শতেক বিবির সঙ্গে হাসন আনন্দ রঙ্গে
রভসে নিবসে সর্বক্ষণ।
কর্পূর তাম্বুল খায় কস্তুরি চন্দন গায়
গোলামে যোগায় ঘনে ঘন॥
কেহ মলে অঙ্গ পদ কেহ করে খোসামদ
কেহ শ্বেত চামর ঢুলায়।
কেহ বা প্রাণের ভয় কর জোড় করি রয়
কেহ বলে [৪]রসুল[৪] খোদায়॥
কেহ আনন্দিত হৈয়্যা সুবর্ণের হুকা লৈয়া
তমাকু [৫]সাজিয়া[৫] দেয় আগে।
কেহ করে পরিপাটী তাহে কিছু নাহি [৬]আটী[৬]
নিরবধি সেবে ভাগে ভাগে॥
কাজি [৭]মজলিস করি[৭] কেতাব কোরান ধরি
খাতাগুলা তজবিজ করে।
সোয়ার পেয়াদা [৮]মজুদাত[৮] শত শত
সদা পাঁচ হাথিয়ার ধরে॥
কেহ বা জুলুম করে কেহ গুনা শিরে ধরে
[৯]রুজু[৯] [১০]করি করয়ে নছাব[১০]।
যতেক ছৈয়দ মোল্লা জপয়ে ত বিসমল্লা
সদা মুখে কলিমা কেতাব॥ ৪১০
হিন্দুত কলিমা দিল মুছলমানি শিখাইল
তথা বৈসে যত মুছলমান।
শিখয়ে নমাজ [১১]অজু[১১] সদাই মক্তবে রুজু
নিরন্তর [১২]খলিফা[১২] যোগান॥
নিকা বিভা ঘনে ঘন তথা করে সর্বজন
সদাই খোসালিত অতিশয়।
[১৩]মোকাদিমে[১৩] লৈয়া যায় কলিমা কোরান তায়
[১৪]ফএতা[১৪] পড়িয়া সাঙ্গ হয়॥
কোথা মোল্লা ডাকি লয় পীরের হাজত দেয়
সিরনি [১৫]ফএতা[১৫] কুতূহলে।
মোকামে [১৬]তছলিম[১৬] করি সভে যায় ঘরাঘরি
নানা সুখে বঞ্চয়ে সকলে॥
হেনকালে [১৭]আদি[১৭] গিয়া শিরে করাঘিয়া
হাসন গোচরে গিয়া কয়।

[১৮]লেঙুড়ি[১৮] কৃষান মৈল   শুনিয়া রাজা ক্রুদ্ধ হৈল
বিপ্রদাস কহে সবিনয়॥ ৪১৪

---

১ দিপ্ত জেন দ্বিপাকর (সু. সেন) ২ প্রজায় বেষ্টিত নিরন্তর (এসো/১) ৩ প্রবেশিয়া (ঐ) ৪ রছুল (সু. সেন) ৫ ভরিয়া (এসো/১) ৬ ঘাটী (ঐ) ৭ মোল্লা সকরি (সু. সেন) ৮ মজুদাদ (ঐ) ৯ অজু (ঐ) ১০ করে অঙ্গি সার (ঐ) ১১ তুজু (সু. সেন) ১২ খলিমা (ঐ) ১৩ মোকাদিমা (ঐ) ১৪ ফয়তা (ঐ) ১৫ ফয়তা (ঐ) ১৬ তছমিল (ঐ) ১৭ বাদি (?) ১৮ নেউড়ি (ঐ)

২০
ত্রিপদী

চরমুখে আকস্মাত   শুনিয়া এতেক বাত
কোপে যেন হৈল কালানল।
সঘনে মুচড়ে দাড়ি   বিষম নিশ্বাস ছাড়ি
সঘন কম্পিত কলেবর॥ ৪১৫
সাদিয়া গোলামে ডাকি   কহে পাকাইয়া আখি
বোলাইতে তামাম নস্কর।
[১]শোনরে সাদিয়া বাত   নস্কর করিয়া সাথ
যত কিছু আছয়ে আমার॥[১]
হাসন হুকুম পাইয়া   সাদিয়া গোলাম ধায়্যা
যথায় মজলিস করে কাজি।
তথা রুজু সর্বজনে   নস্কর পয়দল সনে
সভে [২]পহলওনি মর্দ[২] গাজী॥
সাদিয়া তথায় গেল   কাজি আগে দাড়াইল
সেলাম করিল বহুতর।
কৃষাণ [৩]নেউড়ি কতো[৩]   হাসন কহিল যত
হকিকত কহিল সত্বর॥
কাজি মোল্লা খোজাগণ   মজলিসে সর্বজন
শুনিয়া এতেক হকিকত।
সভে গেল শীঘ্রগতি   যথা আছে নরপতি
[৪]অক্কহিন[৪] নস্কর মজুত॥
হাসন হুসেন কোপে   ঘন তোলা দেই গোঁপে
দুই ভাই নেকলে বাহির।
সাজ সাজ ডাকে ঘন   বেগে [৫]ধায়[৫] সর্বজন
সভে হয় হুজুরে [৬]হাজির[৬]॥ ৪২০
লক্ষ লক্ষ মাতা হাথি   সাজিল অশেষ ভাতি
মাহুতে [৭]ফিরায় আনিবার[৭]।
[৮]সাজে পাখরিয়া ঘোড়া   দশদিগ হৈল জোড়া
কুটি কুটি হাজারে হাজার॥

কামানে পুরিয়া গোলা গাড়ির উপর তোলা
সাজে তাহা যত গোলদার।[৮]
খর উট কত কত লক্ষ লক্ষ শত শত
নানা অস্ত্র সাজিল আপার॥
সাজে যত চোঙ্গদার বিক্রমে অপার সার
চোঙ্গে চোঙ্গে তুলি ধরে [৯]বানা[৯]।
বন্দুকি ধানুকি যত নানা অস্ত্র বিভূষিত
হাসন হুসেন বেরি থানা॥
সঘনে প্রতাপ দাপে [১০]দশনে[১০] অধর চাপে
হাসন হুসেন খরসান।
রাক্ষসী ধামনি তায় দেখে কতদূর যায়
ধরিয়া হুজুরে তারে আন॥
দগড়ে পড়িল কাটী নানা বাদ্য পরিপাটী
দামা দড়মসা মহারোল।
ঢাক ঢোল সানি পড়া ঠমক বরগোল কাড়া
[১১]ভেউর করনাল[১১] গণ্ডগোল॥ ৪২৫
ধুসরি মহরি কাঁসি কপিলাস বীণা বাঁশী
মৃদঙ্গ পাখজ সুমধুর।
রণশিঙ্গা শত শত ঘোরতর শব্দে কত
নানা বাদ্য বাজয়ে প্রচুর॥
সাজিল মুৎছদ্দিগণ বড় হরষিত মন
কেহ চড়ে বিচিত্র [১২]পালগি[১২]।
কেহ চাপে হস্তীপর কেহ [১৩]অশ্বে[১৩] আসোয়ার
কেহো তো আরহে লালগি॥
কোরান লইয়া কাজি নানা অভরণ সাজি
বিচিত্র দোলায় আরোহিল।
খোজা মোল্লা [১৪]সৈয়দাদি[১৪] সভে [১৫]নানা অস্ত্র বাঁধি[১৫]
রণমুখে সত্বর সাজিল॥
মাথায় তইকা দিয়া মির [১৬]মালত[১৬] গেল ধায়্যা
যায় হাসনের কাছে কাছে।
রাজারে কুবুদ্ধি পায় মনসা ধরিতে যায়
বিপ্রদাস ইহ রঙ্গ রচে॥ ৪২৯

---

১ (অতিরিক্ত ; এসো/১, সু. সেন সংস্করণে নেই) ২ পাইলাম নম (সু. সেন) ৩ লেঙুড়ি ফৌত (এসো/১) ৪ অক্ষহিনী (ঐ) ৫ সাজে (সু. সেন) ৬ জাহির (ঐ) ৭ ফিরে হাজার (ঐ) ৮ (অতিরিক্ত, এসো/১) ৯ বাণ (সু. সেন) ১০ সঘনে (ঐ) ১১ ভেউর করতাল (ঐ) ১২ পালিগি (সু. সেন) ১৩ ঘোড়া (এসো/১) ১৪ ছইয়দাদি (সু. সেন) ১৫ অস্ত্র বাদি (ঐ) ১৬ মানত (ঐ)

২১
[১]যথারাগ[১]

কুবুদ্ধি হাসনে দেবীর হৈল বাদী। সমুখে যোগায় পান হরষিতে সাদি।। ৪৩০
ষোলো শত কাজি [২]নড়ে[২] সম্মুখে কোরান। শত শত [৩]ছৈয়েদ নড়িল[৩] আগুয়ান।।
[৪]পেসাপে চেরাগ জ্বলে [৪]বুজরগি আপার। কত শত মোল্লা চলে মুরিদ মক্কার।।
মির মজলিস চলে তইকা মাথায়। কুটী কুটী পাইক পয়দল আগু ধায়।।
লক্ষ লক্ষ হাথি ঘোড়া সহিস বিস্তর। অসংখ্য অপার অস্ত্র বহে উট খর।।
[৫]ধানুকী তুরকি রায়বাঁশিয়া জুঝার।[৫] কুটী কুটী লক্ষ লক্ষ হাজারে হাজার।। ৪৩৫
এক অক্ষহিনি সেনা সাজিল হাসন। টলমল পৃথিবী করয়ে সঘন।।
মনসা ধরিতে রাজা করিল পয়ান। হেনকালে চাঁপা বিবি বলে আগুয়ান।।
সাপের দেবতা বটে সেই ত মনসা। হিন্দুর গোসাঞি যবনের [৬]হাওয়াসা[৬]।।
তাহার সঙ্গে রাজা তুমি না করিহ বাদ। নাগেতে বেড়িব রাজ্য হবেক প্রমাদ।।
আপদ সঞ্চার হৈল নৃপতি হাসনে। বিবির জবাব কিছু না শুনিল কানে।। ৪৪০
এত ঠাট [৭]লইয়া সাজিয়াছি[৭] তারে। একেলা [৮]বামনি[৮] বুড়ি কি করিতে পারে।।
না শুনি বিবির বাক্য উর্ধ্বমুখে ধায়। বেড়িল যতেক ঠাট যথা মনসায়।।
মনসা চাহিয়া রাজা বেড়ায় তথায়। দেখা দিয়া পুন দেবি তথায় লুকায়।।
কোপে ধর ধর ডাকে নৃপতি হাসন। এই খানে বামনিরে দেখিলাম এখন।।
জগৎ জননী কোথা পাইব তুড়ুক। শূন্যে থাকি নিজ মনে করেন কৌতুক।। ৪৪৫
কুবুদ্ধি দিলেন মাতা হাসনের তরে। বড়ই আশ্চর্য এবে যেই কর্ম করে।।
না পাইয়া বামনি সঘনে কাঁপে গায়। পথে ঘট দেখি রাজা কোপানলে ধায়।।
ভাঙ্গিল দেবীর ঘট করি মহারোষে। তুলসী পাইয়া সুখে ঘাড়ে লইয়া ঘষে।।
পদ্মার মায়ায় তাহা হইল বিছুটী। [৯]জ্বালায়[৯] কাতর হৈয়া করে ছটফটী।।
শীতল চন্দন পায়্যা দুই গালে লেপে। আনল হইয়া তার লাগে দাড়ি গোঁপে।। ৪৫০
সর্বাঙ্গে হাসন রাজা ঘষে চাঁপা কলা। দেবীর মায়ায় সর্ব অঙ্গ হৈল ফুলা।।
দাড়ি গোঁপ [১০]পুড়িয়া[১০] ফুলিল সর্ব অঙ্গ। ভূমে পড়ি গড়াগড়ি ডাকয়ে তরঙ্গ।।
ফাফর হইয়া রাজা সঘরে খোদায়। আগুনের জ্বালে দুই গালেতে চড়ায়।।
সত্বরে দাড়িতে [১১]বান্ধে পাইয়া[১১] চাঁপা ফুল। সঘনে কামড়ে খায় হইয়া ভেঙ্গুরুল।।
ঘুরি ঘুরি ফিরি বুলে [১২]সোয়াস্তি[১২] না পায়। তোবা তোবা বলি সদা সঙরে খোদায়।। ৪৫৫
সহিতে না পারি জ্বালা বলে সভা প্রতি। বিষম বামনি বুড়ি ধর শীঘ্রগতি।।
হেড়ো খাওয়াব তায় দেহু পাখড়িয়া। দরবেশে নিকা দিব কলিমা পড়াইয়া।।
ফকিরের [১৩]মুছলাত[১৩] করাইব তায়। শুনিয়া কুপিল অতি দেবী মনসায়।।
নাগবাচা শিক্ষা দেবী জপিয়া ধেয়ানে। ত্রিভুবনে যত নাগ হাঁকারিয়া আনে।।
অবিলম্বে সম্মুখে আইল নাগগণ। দ্বিজ বিপ্রদাস কহে মনসা চরণ।। ৪৬০

---

১ (মূল পুথিতে নেই) ২ লড়ে (সু. সেন/১) ৩ ছয়দ লড়িল (ঐ) ৪ পেষে চেরাক জলে (ঐ) ৫ ধানবি তবকি রায় কাসীয়া জকার (এসো/১) ৬ হাওয়াল (ভুল পাঠ ; ঐ) ৭ লৈয়া আমি সাজি জাই (এসো/১) ৮ বামা (সু. সেন) ৯ জানায় (ঐ ; ভুল পাঠ) ১০ জুড়িয়া (সু. সেন) ১১ বান্দে পায়্যা (ঐ) ১২ ছ্যাতি (ঐ) ১৩ মুসলমাত (এসো/১)

২২

পয়ার

বেড়িল নাগেব দল অতি ভয়ঙ্কর। এক এক ভুজঙ্গ জিনিয়া গিরিবব।। ৪৬১
মহা পরাক্রম যেন যমেব [১]দোসর[১]। ধরিয়া গিলিতে পারে পর্বতশিখর।।
প্রচণ্ড ফণায় ঢাকে অবনীমণ্ডল। বিক্রম করিয়া বলে ভুজঙ্গের দল।।
শুন শুন অবধান করগো জননী। কোন কার্যে আমা সভা ডাকিলা আপনি।।
কহিতে লাগিলা পদ্মা সভাব গোচর। দেখিয়া নাগের দর্প হরিষ অন্তর।। ৪৬৫
রাখালের পূজা আদি সর্ব সমাচার। শতেক কৃষাণ বধ ছয় বান্দি আর।।
কহিলা সকল তত্ত্ব ভুজঙ্গ সকলে। সাজিল হাসন এক অক্ষহিনি দলে।।
ধরিতে আইল মোরে বলে কুবচন। ধিক ধিক কিবা মোর বৃথায় জীবন।।
অবিলম্বে নাগদল বেড়ি চারিধার। বধহ তুড়ক সব নাহিক বিচার।।
[২]নাগগণ[২] শুনিয়া এতেক সমাচার। দ্বিগুণ বাড়িল ক্রোধ গর্জে আনিবার।। ৪৭০
পবন গমনে ধায় মহাদম্ভ করি। সত্বরে বেড়িল গিয়া হাসন নগরি।।
দশদিগে বেড়িল ভুজঙ্গ ভয়ঙ্কর। ফণায় ঢাকিল ক্ষিতি সব [৩]অন্ধকার[৩]।।
ভাগে ভাগে বেরিল নাগের পাটোয়ায়। মাজিল হাসন হাটী নাহি প্রতি কার।।
বাসুকি ভুজঙ্গ রঙ্গে সহস্র বদনে। দুই লক্ষ নাগ লৈয়া বেড়িল দক্ষিণে।।
অনন্ত প্রতাপ কোপে দশ লক্ষ নাগে। সঘনে বেড়িল সভে রহে পূর্ব ভাগে।। ৪৭৫
মহাপদ্ম নাগের পশ্চিম দিগে থানা। যোগান বিংশতি লক্ষ সারি রহে ফণা।।
উত্তরে বেড়িল শঙ্খ গর্জে বিপরীত। ভুজঙ্গ বাইশ লক্ষ তাহার সহিত।।
প্রলয় পবন যেন [৪]বহে[৪] ভয়ঙ্কর। নিশ্বাসে অনলবৃষ্টি পোড়ে তরুবর।।
বায়ু কোণে তক্ষক সারিয়া রহে ফণা। যোগান ছত্রিশ লক্ষ দিল লৈয়া থানা।।
[৫]হসানে বেড়িল ফণি[৫] রহিল আরম্ভে। লক্ষ লক্ষ নাগ লৈয়া করে মহা দম্ভে।। ৫৮০
কুহক অন্ধক রহে বেড়িয়া নৈঋতে। ধামাই বেড়িল অগ্নি কোণে সত্বরেতে।।
আট দিগে নাগদল বেড়ে হেন মতে। দেখিয়া হাসন রাজা ভয় পায় চিতে।।
প্রলয়ের মেঘ যেন গর্জে অনিবার। হেনমতে নাগদল গর্জয়ে আপার।।
দেবাসুর কম্পমান দেখিয়া নাগারম্ভ। ঘন ঘন নাগগণ করে মহাদম্ভ।।
হাসনের [৬]রাজ্যে[৬] নাগেতে বেষ্টিত। মনসা বিজই বিপ্রদাস বিরচিত।। ৪৮৫

---

১ সোসর (সু সেন) ২ নাগদল (এসো/১) ৩ অম্বর (ঐ) ৪ রহে (সু . সেন ভুল পাঠ) ৫ ঈশানে বেড়িয়া কালি (এসো/১) ৬ রাজ্য আদি (ঐ)

২৩

রাগ মল্লার

প্রবল নাগের [১]দম্ভ[১] দেখিয়া [২]হাসন[২]। থর থর সত্বর কাঁপয়ে ঘনে ঘন।। ৪৮৬
মুখে দম্ভ আরম্ভ অন্তরে মহাভয়। ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখে মরণ নিশ্চয়।।
নিজ দলে রাজা বলে করি মহাদম্ভ। কুপিয়া রুষিয়া অতি করিয়া আরম্ভ।।
মার মার সত্বর বেড়িয়ে যত সাপ। হাসন [৩]সঘন[৩] বলে প্রবল প্রতাপ।।

অধিক তক্ষক নাগ শুনিয়া কুপিল। প্রবীণ বদন মেলি গিলিবারে গেল।। ৪৯০
অসীম বিক্রম নাম হাজরা কোঠাঞি। প্রবল শাবল হাথে আছিল তথাই।।
রুষিয়া লুকিয়া হানে তক্ষকের গায়। পিছলিয়া ভাঙ্গিয়া শাবল গুঁড়া হয়।।
অবিচারে নাগ তারে অস্ত্রসহ গিলে। নাম তার জুঝার ধানুকি হেন কালে।।
কুপিয়া ধাইয়া আইল নাগের উপর। ধনু লৈয়া গুণ দিয়া টঙ্কারে সত্বর।।
আকর্ণ পুরিয়া তূর্ণ যত এড়ে শর। ঠেকি মাত্র নাগ গায় ভাঙ্গে নিরন্তর।। ৪৯৫
পরিপাটী জাঠা জাঠি ছিল যার হাথে। সভে মেলি নাগে তুলি মারে চারি ভিতে।।
জুঝার তাহার নাম বিক্রমে বিশাল। তক্ষকের উপর হানিল করবাল।।
অসীম বিক্রম নাগ কুপি মুখ মেলে। অস্ত্র সহ দুঃসহ জুঝার বীর গিলে।।
চারিভিতে হেন মতে করয়ে তুড়ুক। শূন্য পরে রথ ভরে মনসা কৌতুক।।
শীঘ্রগতি পদ্মাবতী ভারিয়া অন্তরে। বিঘতিয়া ডাকিয়া বলিলা তার তরে।। ৫০০
শীঘ্র গতি মোর যুক্তি শুন বিঘতিয়া। কৌতুকে তুড়ুক বধ হাসন রাখিয়া।।
মনসার অঙ্গিকার বিঘতিয়া পায়। অবিলম্বে মহাদম্ভে সৈন্য মাঝে ধায়।।
প্রথমে সাঁভায় গিয়া ইজার ভিতর। হুসেন হরিব মনে খাইল সত্বর।।
আশ্চম্বিতে নাভি ভিতে পড়ে যেন বাজ। সত্বর ইজার চিরি পড়ে [৫]খিতি[৫] মাঝ।।
অগ্নিবত অবিরত বিষ জ্বলে গায়। সত্বরে ফাফর হৈয়া সঙরে খোদায়।। ৫০৫
পরিত্রাই ডাকে ভাই হাসন বলিয়া। উত্তর শিয়র তথা পড়িল চলিয়া।।
প্রধান সিফাই দেখি হাথির উপরে। ক্রুদ্ধ হৈয়া বিঘতিয়া ধাইল সত্বরে।।
নিজ সুখে তার বুকে খাইল কামড়। অমনি ধরনী পড়ি করে ধড়ফড়।।
করিবর খোজা আদি সোয়ার ঘোড়ায়। কোপানলে বক্ষ স্থলে [৬]তারে[৬] গিয়া খায়।।
ঘোড়া হইতে ধরনিতে পড়িল [৭]অমনি[৭]। বিষজ্বালে খোদা বলে চলিল তখনি।। ৫১০
দোলার উপর কাজী নানা রত্নময়। বিঘতিয়া দেখিয়া কুপিল অতিশয়।।
পাগের ভিতর তার তখনি পশিল। মধ্য শিরে ক্রোধ ভরে কামড় খাইল।।
শিরোপরে সত্বরে পড়িল যেন বাজ। দোলা হইতে আশ্চম্বিতে পড়ে ক্ষিতি মাঝ।।
ভূমে পড়ি গড়াগড়ি তোবা তোবা বলে। ছটফট [৮]আপু[৮] ঘাতি বিশেষ আনলে।।
অরুণ নয়ান ঘন কম্পিত শরীর। ঢলিয়া পড়িল তথা হইয়া অস্থির।। ৫১৫
[৯]তাহা দেখি [৯] ত্রস্ত হইয়া অতিভয় মনে। প্রাণ ভয় পলায় সৈয়দ সর্ব জনে।।
বিঘতিয়া [১০]ডাকাতিয়া[১০] দেখিবারে পায়। অতি কোপে ঘন কাঁপে পাছু পাছু যায়।।
জনে জনে সঘনে বধিল একে একে। কারো মাথে কারো হাথে কারো মধ্যে বুকে।।
গড়াগড়ি ভূমে পড়ি যায় সর্বজন। তোবা তোবা খোদা খোদা সঙরে সঘন।।
সকল ছৈয়দ কুল পড়িল ঢলিয়া। তথা হইতে অলক্ষিতে ধায় বিঘতিয়া।। ৫২০
যথায় আছয়ে সব খোজা মোল্লাগণ। হৃষ্ট মতি নাগ অতি দেখি সর্বজন।।
ধাইয়া পড়িল গিয়া সভার মাঝেতে। কাহারো বুকেতে খায় কারো মস্তকেতে।।
কাহারো পিঠে কারো পেটে কাহারো গলায়। ভূমে পড়ি ডাক ছাড়ি গড়াগড়ি যায়।।
কেহ কেহ দুঃসহ দেখিয়া ধায় রড়ে। ক্রুদ্ধ হৈয়া নাগ গিয়া খায় মধ্য ঘাড়ে।।
অমনি ধরনী পড়ি ডাকে বিপরীত। আউলিয়া [১১]বলিয়া হিয়া[১১] হারায় সম্বিত।। ৫২৫

মোল্লাগণ ঘনে ঘন উচ্চরে কলিমা। পেগাম্বর নিরন্তর বলে আল্লা হুমা।।
তোবা তোবা হাজার [১২]তোবা[১২] সোঙরে। খোদায় কেহ বলে কোথা গেলে হইবে উপায়।।
এমন দারুণ সাপ কোথা হইতে আইল। কেহ বলে মোর [১৩]গলে[১৩] লহু নিকলিল।।
উহু উহু বলি কেহ ঘাড়ে দেই হাত। কেহ বলে দেহ জ্বলে না নেকোলে বাত।।
আকুলি জমিনে ফেলি কোমরের ছুরি। খোদায় রুসিয়া ঠায় পড়ে ঘুরি ঘুরি।।
খোজা মোল্লা যত ছিল মৈল সর্বজন। দ্বিজ বিপ্রদাস আশ মনসা চরণ।। ৫৩১

---

১ দল (এসো/১) ২ হোসন (সু. সেন— ভুল পাঠ) ৩ হোসন (ঐ) ৪ ওঝার (সু. সেন) ৫ ক্ষিতি (এসো/১) ৬ তার (সু. সেন) ৭ তখনি (এসো/১) ৮ আতি (ঐ) ৯ তা দেখিয়া (ঐ) ১০ তাকাইযা (ঐ) ১১ বন্যা হিয়া (সু. সেন) ১২ স্তোবা (ঐ) ১৩ গনে (সু. সেন—ভুল পাঠ)

২৪

[১]রাগ প্রভাতী[১]

অপরূপ কৌতুক শুনহ সর্বজন। যেমতে তুড়ুক-কুল করয়ে নিধন।। ৫৩২
পলায় সকল লোক নাহি দেখে পথ। চৌদিগে বেষ্টিত নাগ যেন সিন্ধুবত।।
যথা যায় সর্পময় দেখে বিপরীত। সর্ব সৈন্য ফাঁফর হইল চারিভিত।।
হরষিতে বিঘতিয়া অতিবেগে ধায়। সম্মুখে যাহারে পায় অবিলম্বে খায়।। ৫৩৫
কোন কোন তুড়ুক পলায়্যা তুলে জলে। তাহারে জলের বোড়া খায় [২]কুতূহলে[২]।।
ধড়ফড় করি মরে বিষের জ্বালায়। খোলা ছেই হেন যেন [৩]ভাসিয়া[৩] বেড়ায়।।
কেহ কেহ পলায়্যা তরাসে উঠে গাছে। [৪]অন্তরীক্ষে তথায়[৪] দেবীর নাগ আছে।।
কুপিয়া কামড় খায় তুড়ুকের ঘাড়ে। পাকাতাল হেন শীঘ্র গাছে হৈতে পড়ে।।
প্রাণভয় কেহ যদি উঠে গিয়া চালে। তাহারে চালের চিতি খায় হেনকালে।। ৫৪০
বিষ জালে ধড়ফড় নাগের কামড়ে। যেন পাঁড়ু কুসণ্ডিকা চালে হৈতে পড়ে।।
পলাইতে পথ নাই সর্প দলে বেড়া। যে ভিতে পলাইয়া যায় সেই দিগ জোড়া।।
জীবনে নৈরাশ হৈয়া কান্দে সব লোক। বাপ ভাই বন্ধু মরে বাড়ে বড় শোক।।
হস্তি ঘোড়া উট খর গো মহিষ যত। লাফে লাফে বিঘতিয়া খায় অবিরত।।
বিপরীত ডাকে অতি বিষের জ্বালায়। ঠাই ঠাই লক্ষ লক্ষ গড়াগড়ি যায়।। ৫৪৫
দাবানলে দহে যেন অতি শুষ্ক বন। খেদাড়িয়া সব সৈন্য করয়ে নিধন।।
[৫]অর্বুত অর্বুত[৫] সৈন্য পড়ে অনিবার। [৬]গাছল বম্বুল[৬] পড়ে লেখা নাহি তার।।
এক অক্ষহিণী ঠাট সকলি মরিল। কেবল হাসন রাজা একেলা রহিল।।
বিপরীত দেখি রাজা ভাবিল নৈরাশ। আজি [৭]গীত রহিল রচিল[৭] বিপ্রদাস।। ৫৪৯

১ পয়ার (এসো/২) ২ কোপানলে (সু. সেন) ৩ আসিয়া (ঐ) ৪ অন্তরিক্ষেতে যায় (ঐ) ৫ অর্বুদ অর্বুদ (এসো/১) ৬ গাছে নব ঘন (ঐ) ৭ রহিল গীত বলে (ঐ/১)

চতুর্থ পালা সাঙ্গ

পঞ্চম পালা

১

যথা রাগ

সঘনে কম্পিত তনু ধুল উড়ে মুখে। হায় হায় বলে রাজ হস্ত দিয়া নাকে।।
খোদায় খোদায় বলে করি [১]উচ্চনাদ[১]। কাঁদিয়া বলয়ে রাজ ভাবিয়া বিষাদ।।
একেলা বামনি বুড়ি ছিল এই পথে। এতেক সাপের ঠাট আইল কোথা হৈতে।।
কি কাজ করিলু [২]মুঞি[২] বামনি ধরিতে। মানা কৈল বিবি মোরে তখনি আসিতে।।
তাহার জবাব কিছু না শুনিলু কানে। বুকের কলিজা ভাই হারানু হুসেনে।। ৫
ছৈয়দ মোল্লা কাজি মরিল সকল। মির মজলিস খোজা যত পয়দল।।
নস্কর সিফাই ঘোড়া হাথি উট খর। তবকি ধানুকি রায়বাঁশিয়া জুঝার।।
গাহুল বম্বুল আর লক্ষ লক্ষ বানা। [৩]চোঙ্গদার হাজরা[৩] যতেক মোর সেনা।।
পহ্‌লান যত ছিল রণে মহাকাল। বামনি বুড়ির বাদে মজিল সকল।।
দশদিগ বেড়িলেক [৪]বামনিয়া[৪] নাগে। পলাইতে পথ নাই যান কোন ভাগে।। ১০
[৫]জীবারে কি আর সাধ হৈল[৫] সর্বনাশ। কান্দিতে কান্দিতে রাজা হৈল নৈরাশ।।
ধারা শ্রাবণের জল ঝরে দুই আখি। মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে উপায় না দেখি।।[৬]
গড়াগড়ি দিয়া রাজা কান্দে উচ্চরায়। সকলি ভুজঙ্গময় যেই দিগে চায়।।
ফাঁফর হইয়া রাজা হারায় সম্বিত। মনসা চরণে বিপ্রদাস বিরচিত।।১৪

১ আর্ত্তদান (এসো/১) ২ আমী (সু. সেন) ৩ চোকদার হাজরা (ঐ) ৪ বামনির (এসো/১) ৫ জিবারে সাদ নাই হইল (সু. সেন) ৬ এখানে এসো/১-এ 'গদ' কথাটি লিখিত। উদ্দেশ্য গায়ককে নির্দেশ দান। এই অংশ গদগদভাবে পড়তে হবে।

২

ভৈরবী

হেনকালে বিষহরি নাগ অভরণ পরি
হস্তে কাল বিকাল উরগে।
বেষ্টিত নাগের ফণা তর্জ্জিত গর্জ্জিত হানা
নাগ পাটা শোভে দুইদিগে।। ১৫
নাগের আসনে বসি মুখে মন্দ মন্দ হাসি
শিরোপরে কালি ধরে দণ্ড।
চামর ঢুলায় নাগে নৃত্য করে চারিদিগে
গেলা দেবী হৈয়া প্রচণ্ড।।
হেন মায়া রূপ ধরি হাসনের বরাবরি
আসি দেখা দিলা আচম্বিত।
[১]তেজোময়[১] দীপ্ত অতি দেখিয়া হাসন অতি
ত্রাসে রাজা হইল কম্পিত।।
সক্রোধ মনসা দেখি হাসন মুদিয়া আখি
পলাইয়া করিলা পয়ান।

যথা যায় নরপতি সর্পময় দেখে তথি
লুকাইতে নাই পায় স্থান॥
মনে অতি ভয় পাইয়া পোয়াল গাদায় গিয়া
লুকাইল তাহার [২]ভিতর[২]।
হেনই সময় তথা কাঁকলাস নাড়ে মাথা
দেখি ভয়ে কাঁপে [৩]থর থর[৩]॥
হাসন হৃদয় জ্বলে কাঁকলাস প্রতিবলে
এই দুষ্ট বামনির ভিতে।
আমায় রাখিয়া আড়ে ঘন ঘন মাথা নাড়ে
বলে ঐ আক্ষারে ধরিতে॥ ২০
দন্তে দন্তে চাপে ওষ্ঠে পোয়াল ফেলিয়া উঠে
কাঁকলাস মারিবারে যায়।
ত্রাস ভয় পরিহরি হাথে বজ্রমুষ্টি ধরি
দেখিয়া হাসেন মনসায়॥
হাসন বেড়িল নাগে বিবি ছলিবার যোগে
চলিলা দৈবজ্ঞ রূপ হৈয়া।
করে খড়ি [৪]পাঁজি[৪] লৈয়া বিবির অগ্রেতে গিয়া
বলে পদ্মা মায়ায় ভাঁড়ায়্যা॥
যত সৈন্য সাজি গেল ভূতের বিবাদে মৈল
[৫]আইসে হেরো লইতে[৫] তোমায়।
এই বাড়ি জানা পথে এখনি আসিব ভূতে
অগ্নি জ্বালি দেহ তার গায়॥
রঙ্গে ছলি চাঁপা বিবি চলিল মনসা দেবী
উপনীত যথায় হাসন।
চারি ভিতে নাগ বেড়া বাড়-জানা পথ ছাড়া
[৬]খেদাড়িল[৬] সব নাগগণ॥
হাসন তরাসে ধায় [৭]রাজা না[৭] পথ পায়
শব্দ পায়্যা চাঁপা বিবি আইল।
দৈবজ্ঞ বলিয়া গেল তেঁই হেন গুনা কৈল
মোক-দুঃখ কান্দিয়া বিকল॥২৫
কাকুতি মিনতি করি হাসনের হাথ ধরি
নিজপুরে করিল গমন।
[৮]রাজ্যের বিনাশ দেখি[৮] হাসন হৃদয়ে দুঃখী
দ্বিজ বিপ্রদাস সুরচন॥ ২৬

১ তেজোর্ময় (সু. সেন) ২ ভিতরে (এসো/১) ৩ থরহরে (ঐ) ৪ বাজি (সু. সেন) ৫ আসিয়াছি বলিতে (এসো/১) ৬ খেদাড়িয়া (সু. সেন) ৭ বাড়-জানা (এসো/১) ৮ (নেই—সু. সেন সম্পাদিত পাঠে এই অংশ বাদ পড়েছে)

৩
করুণা

চাঁপা বিবি করয়ে করুণা।
প্রাণের অধিক মোর [১]সাত[১] বাঁদি ছিল ঘব
বিপাকে মরিল সব্বজনা।। ২৭
কালাফুলি বাঁদিমৈল হেড়া [২]ধুইবারে[২] ছিল
ছালন চাকিবে আর কে।
বুলবুলি ছোট বাঁদি [৩]তা লাগি[৩] বিকল কাঁদি
জবাব করিত ভাল সে।।
কান্দে বিবি বুকে মারি ঘা।
সকলি নাশিল মনসা।।

হুলা হুলি বাঁদি কৈ [৪]বেশ বানাইত[৪] সেই
সদাই থাকিত মোর সনে।
জাফরি মরিয়া গেল পান যোগাইত ভাল
নিবারিতে নারি আর মনে।। ৩০
ছোট বড় মোল্লাগণ ফৌত হৈল সর্বজন
তাহারা বেদনা ভাল জানে।
বুড়া মিনা দয়া ছিল [৫]সেই ত হায়াত[৫] হৈল
এয়াদি কবিব কোনজনে।।
সৈয়দ যতেক ছিল সকলি মরিয়া গেল
সাদিয়া গোলাম আর যত।
হাথি ঘোড়া সেনাগণ নাহি বাঁচে একজন
হেন শোক নিবারিব কত।।
জীবনে কি আর সুখ চাহিব কাহার মুখ
যদি মৈল প্রাণের হুসেন।
নিবারিতে নারি চিত জ্বলি উঠে অবিরত
শিরে কর হানে ঘনে ঘন।।
কান্দিতে কান্দিতে [৬]অতি[৬] মূৰ্চ্ছিত হইয়া তথি
আছাড় খাইয়া পড়ে ক্ষিতি।
দ্বিজ বিপ্রদাস কবি জনমে জনমে সেবি
পদ্মাপদে ভকতি-প্রণতি।। ৩৪

১. সতে (সু. সেন) ২ বুহিবারে (ঐ) ৩ তাহা না দেখি (ঐ) ৪ বেসরম হইত (ঐ) ৫ সেও ত ফৌত (ঐ) ৬ আতি (এসো/১)

৪
পয়ার

বিপরীত রোল হৈল হাসন নগরে। তুড়ুকের পাড়া কান্দে প্রতি ঘরে ঘরে।। ৩৫
শোকেতে আকুল প্রাণ [১]ধরিতে না পারে[১]। ফুকরি ফুকরি ঘন কান্দে উচ্চস্বরে।।
কেহ বলে পুত্র মৈল চাঁদের সমান। আর না দেখিব মুখ হারাব পরাণ।।
কেহ বলে শোকানলে হইয়া কাতর। মরিল গুণের ভাই প্রাণের দোসর।।
কেহ শিরে হানে কর কান্দে উভরায়। [২]বাপ বাপ[২] বলি [৩]পড়ি[৩] গড়াগড়ি যায়।।
কেহ বলে [৪]চাচা[৪] মৈল গুণের সাগর। ভাগিনার শোকে কেহ কান্দিয়া ফাঁফর।। ৪০
করুণা করিয়া কেহ কান্দে পতিশোকে। ঘরে ঘরে ক্রন্দন করয়ে [৫]সর্ব লোকে[৫]।।
অবিরত গালি পাড়ে সকল তুড়ুকে। ধরিয়া বামনি বুড়ি হেড়া ঘষ মুখে।।
একেলা রাক্ষসী বুড়ি দেখিলু তখন। কোথা হৈতে এত সাপ বেড়িল সঘন।।
সুখের [৬]হাসন হাটী[৬] সোনার নগর। কতেক পুরুষের রাজা হাসন তৎপর।।
এতদিনে হেন রাজ মজিল সকল। নিষ্ঠুর বামনি বুড়ি অতি বড় খল।। ৪৫
অন্তরীক্ষে বিষহরি রথের উপর। শুনি তুড়ুকের গালি কুপিলা [৭]সত্বর[৭]।।
আজ্ঞা কৈলা বিঘতিয়া বধহ সকল। ঘরের রক্ষণে রাখ জনেক কেবল।।
হরষিতে বিঘাতিয়া করিল পয়ান। মনসা চরণে দ্বিজ বিপ্রদাসে গান।। ৪৮

১ ধরিবারে নাবে (এসো/১) ২ বার বার (সু. সেন) ৩ ক্ষিতি (এসো/১) ৪ থুড়া (ঐ) ৫ সর্বশোকে (ঐ ভুল পাঠ) ৬ হাসন হাট্টী (সু সেন) ৭ সঙর (ঐ)

৫
যথা রাগ

বিনায়্যা করুণা ছাদে শোকেতে তুড়ুক কাঁদে
বিঘতিয়া আইলা হেনকালে।
মনসার আজ্ঞা পায়্যা হরিষে বিঘতিয়া
বেগে অতি ধায় কুতূহলে।। ৪৯
দয়া-মায়া নাহি তায় যারে পায় তারে খায়
[১]ঢলি ঢলি[১] পড়য়ে [২]সত্বরে[২]।
লাফে লাফে বায়ুগতি [৩]অনিমেষে[৩] ধায় তথি
দংশিয়া চলিল ঘরে ঘরে।।
বড়মিঞা ভাগে ভাগে তাহারে দংশিল [৪]রাগে[৪]
বিষ জ্বালে সগুরে খোদায়।
মিঞা যদি ফৌত হইল গোলামেরে খোব পাইল
বিবি লইয়া পলাইতে চায়।।
বিঘতিয়া যায় রড়ে বুড়া মিঞার খায় ঘাড়ে
বাপ বাপ করি ঘন ডাকে।
পড়িয়া গড়াগড়ি ভূমে লোটাইয়া দাড়ি
কেহ কেহ বেড়ি তাঁরে দেখে।।

খেলিতে ছাওয়াল যায় তথা বিঘতিয়া খায়
কান্দিতে কান্দিতে সেহ চলে।
দুই হাথে বুকে কুড়ি বিবি যায় রড়ারড়ি
কান্দয়ে ছাওয়াল করি কোলে।।
মুরুগ দেখিয়া পথে অবিচারে খায় মাথে
বিষ জ্বালে মরে কত শত।
মুরুগী করিয়া কোলে [৫]নকড়ি[৫] কান্দিয়া বলে
আজি কালি বএদা পাড়িত।।
নিষ্ঠুর হিন্দুর ভূত খায় [৬]বক্ষে[৬] দেখে যত
হাসন হাটী পড়িল প্রমাদ।
ভাবিয়া মনসাদেবী বিপ্রদাস রচে কবি
কান্দে তুড়ুক ভাবিয়া বিষাদ।। ৫৫

১ চলি চলি (সু. সেন) ২ সত্বর (ঐ—ভুল পাঠ) অনিমিষে (সু. সেন) ৪ আগে (ঐ) ৫ মাকুড়ি (এসো/১)
৬ চক্ষে (সু. সেন)

৬
রাগ কানড়া

দেখিয়া জোলার পাড়া ধায় বিঘতিয়া বোড়া
আছে জোলা আপনার কাজে।
মাথায় তইকা বাঁধা তাহে কালি কালো রাঙা
কামড় খাইল তার মাঝে।। ৫৬
মাথায় খাইল সাপ জোলা করে বাপ বাপ
খোদায় সঙরে ঘনে ঘন।
তোবা তোবা ঘন বলি ফেলিল হাথের নলি
ঢলিয়া পড়িল ততক্ষণ।।
[১]বুড়ো[১] জোলা একমনে তাঁত বোনে [২]ঘনে ঘনে[২]
ঘাড় নাড়া দিয়া অতিশয়।
দেখি হাসে বিষতিয়া অবিলম্বে তথা গিয়া
তাহার ঘাড়ের মাঝে খায়।।
ঘাড়ে হাথ বুলাইতে [৩]লহু নিকলিল[৩] তাতে
খোদায় খোদায় বলি চলে।
হাসন নগরে যত জোলা বৈসে শত শত
বধে বিষতিয়া কালানলে।।
অতিরম্য পরিপাটী মজিল হাসন হাটী
এবে রাজা যেই কর্ম করে।
ভাবিয়া মনসাদেবী দ্বিজ বিপ্রদাস কবি
বিরচিত হরিষ অন্তরে।। ৬০

১ বড় (সু. সেন) ২ ঘন ঘন (ঐ) ৩ নছলি কাটিল (ঐ)

৭

পয়ার

সকলি মজিল রাজ্য হাসন নগর। অবিরত্ত সর্পময় প্রতি ঘরে ঘর।। ৬১
হেনকালে হাসন বিবির ঠাঞি বলে। [১]খানা[১] পাকাইয়া দেহ ভোকে দেহ জ্বলে।।
শুনিয়া রাজার বাত হইল কাতর। গোছল করিতে বিবি গেল শীঘ্রতর।।[২]
লাকুড়ি আনিয়া চুলা জ্বালিবারে যায়। হাঁড়ির ভিতে হাত দিতে ভুজঙ্গ ফোঁফায়।।
উই মা করিয়া কর হানে শিরোপর। বিষম হিন্দুর ভূত হাঁড়ির ভিতর।। ৬৫
হায় হায় বলি বিবি কান্দিয়া বিকল। রাজ্য ধন প্রাণ [৩]আদি[৩] মজিল সকল।।
কান্দিয়া বিবির আগে বলয়ে হাসন। উপায় নাহিক আর নিশ্চয় মরণ।।
সাপময় সকলি রহিতে নাহি ঠাঞি। হুসেন ভাইর শোক জ্বলিছে সদাই।।
আমি কেনে বাঁচিনু হুসেন কেন মৈল। কলিজা ভিতর মোর শেল মারি গেল।।
হুসেন হুসেন বলি হইল মূর্ছিত। ধরি চাঁপা বিবি তারে করায়ে সম্বিত।। ৭০
হেন কালে নেতো পদ্মা রথে আরোহিয়া। দয়া অতি উপজিল হাসনে দেখিয়া।।
ডাকিয়া বলেন শুন অবুধ হাসন। আমি পদ্মাবতী তোরে কহি যে কথন।।
পূজহ মনসাপদ একান্ত ভাবিয়া। যেই বর চাহ সুখে পাবে হৃষ্ট হৈয়া।।
শুনিয়া হাসন রাজা উঠিয়া সত্বর। চাহিয়া আকাশ পানে কান্দে বহুতর।।
কান্দিয়া হাসন বলে [৪]কিছুই না[৪] জানি। কেমনে পূজিব কোথা পাব ফুলপানি।। ৭৫
চাঁপা বিবি বলে আমি মজুত করিব। করা ভরি জল বাবুরে ফুল দিব।।
সেতাব গোছল করি আইল হাসনে। ফুল পানি লৈয়া অতি ভক্তি করি মনে।।
ডাকি বলে বামনি [৫]না হয়[৫] ফুলপানি। জিয়াইয়া দেহগো হুসেন ভাইখানি।।
হাসিয়া বলেন পদ্মা শুনরে হাসন। আমি [৬]যেই মতে[৬] বলি করহ পূজন।।
স্বর্ণবারি বিচিত্র নৈবিদ্য দশ ফল। ভক্তি ভাবে তুলসী কমল শতদল।। ৮০
মনসা কুমারি নামে পুজ একমনে। এখনি জিয়াইয়া দিব সব পুরি জনে।।
শুনিয়া হাসন রাজা আনন্দ হৃদয়। পুলকে আকুল ভক্তি বাড়ে অতিশয়।।
প্রাণপণে আনিল নির্মল তীর্থজল। স্বর্ণবারি বিচিত্র কমল শতদল।।
নানা [৭]দিব্য[৭] রচনা নৈবিদ্য আদি যত। অতিরম্য দশ ফল করিল মজুত।।
কদলী কর্কট ফুটী নারিকেল জাম। খাজুর পনস তাল [৮]পূগ পূর্ণ আম[৮]।। ৮৫
গভীর শবদে বাদ্য বাজয়ে [৯]রসাল[৯]। ঘটের উপর তুলি দিল সিজ ডাল।।
ঘট আরোপিয়া পূজে মনসা চরণ। মনসার বরে জিয়া উঠিল হুসেন।।
একে একে সর্বরাজ উঠে ঘনে ঘন। যেই জীয়ে সেই পূজে মনসা চরণ।।
মনসার ভক্তি বহি মনে নাহি আর। একান্ত হাসন রাজা মনে কৈল সার।।
সদয় মনসাদেবী হইলা হাসনে। সর্বরাজ্য জীয়াইয়া দিলা ততক্ষণে।। ৯০
হৃষ্ট হইয়া পুনর্বার বলেন জগতি। হের বলি মন দিয়া শুন নরপতি।।
মোর বরে অচিরাতে ঘুচিল বিপদ। সকলি সম্পূর্ণ হইল নাহিক আপদ।।
যাহা ইচ্ছা থাকে বর মাগ নরপতি। ছত্রিশ আশ্রম লৈয়া করহ বসতি।।
শুনিয়া হাসন রাজা [১০]পিরিত[১০] হৃদয়। ক্ষিতি লুটি [১১]অষ্টাঙ্গে[১১] প্রণাম করি কয়।।
অপরাধ ক্ষেমা কর জগৎ জননী। পাপমুখে কতেক বলিল মন্দ বাণী।। ৯৫

জগৎ ঈশ্বরী তুমি আদি নিরঞ্জন। তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি নারায়ণ॥
স্বর্গ মর্ত্য রসাতল এ তিন ভুবন। চন্দ্র সূর্য ইন্দ্র আদি তুমি সে [১২]কারণ[১২]॥
বরুণ আনল বায়ু সিদ্ধ সাধ্য যত। স্থাবর জঙ্গম তরু তোমাতে মিশ্রিত॥
কি বলিতে জানি আমি অতি দুরাচার। কহিতে না পারে বিধি মহিমা তোমার॥
পুলকে আকুল হৈয়া বলয়ে হাসন। বৃথা কেন ধরি আমি এ ছার জীবন॥ ১০০
অধম দুর্মতি দুষ্ট আমি হীন জাতি। তব নিন্দা দোষে মোর হব অধগতি॥
নিজগুণে কৃপা যদি কর একবার। পাপিষ্ঠ হাসন [১৩]মাথে[১৩] চরণ প্রহার॥
হরিষে মনসা দেবী তুষ্ট হইয়া অতি। অধিক বাড়িল দয়া হাসনের প্রতি॥
কহিতে লাগিলা মাতা হাসনের তরে। ধন্য ধন্য ক্ষিতি মাঝে তুমি নৃপ বরে॥
[১৪]অচিরাতে[১৪] রাজ্য কর নিজ মনসুখে। মোর বরে জরা মৃত্যু নাহি শোক দুখে॥ ১০৫
ছত্রিশ আশ্রম লইয়া সুখে ভুঞ্জ রাজ্য। প্রচার করিহ ক্ষিতি মোর পূজা কার্য॥
বর দিলা হাসনেরে ভকত বৎসলা। পদাঘাত কৈলা শিরে হাসিয়া কমলা॥
আচম্বিতে অন্তর্ধান হৈলা তথা হৈতে। [১৫]এথায়[১৫] হাসন রাজা রহে হরষিতে॥
মনসা চরণ সদা চিন্তে মনে মন। মনসার চরণে বিপ্রদাস বিরচন॥ ১০৯

১ দানা (এসো/১) ২ এরপর এসো পুথিতে লেখা 'শঙ্কর শ্রী কৃষ্ণচন্দ্র সিং' ৩ আজি (এসো/১) ৪ কিছু নাহি (ঐ) ৫ লহগো (ঐ) ৬ জেন মত (সু. সেন) ৭ দ্রব্য (এসো/১) ৮ পুগগু আম্র ৯ বিশাল (ঐ) ১০ দ্রবিদ (এসো/১) ১১ অষ্টাঙ্গ (ঐ) ১২ সকল (সু. সেন) ১৩ মুখে (ঐ) ১৪ অতি রাতে (এসো/১—ভুল পাঠ) ১৫ তথায় (ঐ)

৮

ঝারিখণ্ডি

মনসার পূজা [১]নীতি[১] প্রচার করিতে ক্ষিতি
হাসন আনন্দ অতিশয়।
গুণবন্ত শিল্পকারে শত শত আনিবারে
আজ্ঞা দিল আনন্দ হৃদয়॥ ১১০
দূত অঙ্গীকার পায়্যা চারিদিগে গেল ধায়্যা
শিল্পকার আনিল সত্বর।
আজ্ঞা দিল নরপতি মন্দির বিচিত্র অতি
নিরমান করহ তৎপর॥
আজ্ঞা [২]মাত্রে[২] শিল্পকার [৩]সূত্র[৩] ধরে চারিধার
পাষাণে গাঁথয়ে মনোহর।
করিয়া বিচিত্র চিত্র মন্দির গঠয় তত্র
[৪]দেখি হরষিত[৪] নৃপবর॥
বিচিত্র দেয়াল গাঁথে নানা চিত্র করি তাথে
নানা বর্ণে মুরতি অপার।
যেন দেখি মূর্তিমন্ত অতিশয় বলবন্ত
ঠাঞি ঠাঞি বিকৃতি আকার॥

দেবাসুর আদি যত অপছর কিন্নর কত
স্থানে স্থানে গঠে অনিবার।
রাক্ষস গন্ধর্বগণ কৈল রম্য নিরমান
চারি ভিতে করিলা সুসার॥
অতিরম্য চারি ভিতে গঠে নিজ [৬]মনোনীতে[৬]
ফটিকের স্তম্ভ সারি সারি।
নানা বর্ণে [৭]পশু[৭] পক্ষ লিখে তাহে লক্ষ লক্ষ
মীন আদি লিখিতে না পারি॥ ১১৫
দেয়াল নিবাড় করি শিল্পকার ত্বরাতরি
করে [৮]দিঘ[৮] চালের পত্তন।
সুবর্ণের রূয়া পাতি সাঁড়ক [৯]বরেয়া[৯] জাতি
তাহে কৈল রূপার বন্ধন॥
সোনার ছিটনি মাঝে নানা রত্নময় সাজে
প্রবাল মানিক থরে থরে।
বসয়ে কতক ভাতি নিরন্তর দিবারাতি
হীরা চুনি মণি দীপ্ত করে॥
রূপসি ঝুমকি তায় ঝলমল করে বায়
কতক অমূল রত্ন নিধি।
গজ মুকুতার ঝারা চারি ভিতে নাম্বে সারা
ঝলমল করে নিরবধি॥
নিবাড় করিয়া চাল শিল্পকার গড়ে ভাল
স্বর্ণ পাড়ী স্তম্ভের উপর।
নক্‌স কৈল কত তাতি সুসার বাঁধিল জাতি
আড় কাঠা তথির উপর॥
[১০]তিলাটে বসায়া তীর[১০] বাওলা তাহার শির
উপরে ভাণ্ডার গাড়ি দিল।
নিবাড় বন্ধন করি [১১]সবে ধায়[১১] তরাতরি
চারি চাল উপরে তুলিল॥ ১২০
গঠিল বিচিত্র ঘর নানা রত্ন মনোহর
যেনে রবি করিছে উদয়।
বিচিত্র ময়ূর পাখে ছাওনি করিল সুখে
দেখি লোক ঝুরে অতিশয়॥
বেড়িয়া অনেক দূর আয়তন কৈল পুর
যেন দেখি কৈলাস ভুবন।
সোনায় গঠিল তথি প্রাচীর বিচিত্র অতি
মহা আনন্দিত সর্বজন॥
পুরী দেখি নরবর পুলকিত কলেবর
অপার আনন্দ বাড়ে মনে।

শিল্পকার জনে জনে তুসিল আনন্দ মনে
অলঙ্কার নানা রত্ন ধনে।।
ছত্রিশ আশ্রম তথি বসাইল নরপতি
আওয়ারি আওয়ারি মনোহর।
প্রধান তাহার মধ্যে বৃহস্পতি [১২]তুল্য[১২] বুদ্ধে
পঞ্চ দ্বিজ পণ্ডিত সুন্দর।।
তবে ত হাসন রাজা ডাকি পাত্র মিত্র প্রজা
পঞ্চ দ্বিজ সভার প্রধান।
সভাকরি নরপতি আনন্দে বসিল তথি
নিবেদিল দ্বিজ সম্বিধান।। ১২৫
প্রচারিব রাজ রাজ্য মনসা পূজার কার্য্য
বিধান করাহ মহাশয়।
শুনিয়া রাজার বাণী কহিল ববস্থা জানি
দ্বিজ বিপ্রদাস রস গায়।। ১২৬

---

১ নিত (সু. সেন) ২ মাত্র (ঐ) ৩ ছত্র (ঐ) ৪ দেখিয়া হরিষ (এসো/১) ৫ ভিত করিল (সু. সেন) ৬ মননিতে (ঐ) ৭ প্রস্থ (এসো/১—ভুল পাঠ) ৮ দিব্য (এসো/১) ৯ ররয়া (সু. সেন) ১০ তিলাটের সায্যাতির (ঐ) ১১ সভে জায় (ঐ) ১২ তুল (এসো/১)

৯

পয়ার

হরিষে হাসন রাজা করিয়া আদেশ। অবিলম্বে দূত পাঠাইল নানা দেশ।। ১২৭
মহা মহা তীর্থ অতি নির্মল সলিল। চারিদিগ থাকিয়া তুরিত আনি দিল।।
[১]সুবর্ণে রচিত[১] বারি মনের মানসে। আনিল মঙ্গল বাদ্য মনের হরিষে।।
নানা দিব্য উপহার কতো লব নাম। [২]মিষ্টান্ন মনোহরা[২] অতি অনুপাম।। ১৩০
দুগ্ধ দধি ভারে ভারে অসংখ্য প্রমাণ। ক্ষীর সর ঘৃত আদি কৈল বিদ্যমান।।
অধিক শর্করা মধু আনিল বিশেষ। রচিয়া সুবর্ণ পাত্র নৈবিদ্য [৩]অশেষ[৩]।।
নানা পুষ্প আনিল সুগন্ধি মনোহর। শতদল পদ্ম জবা আদি বহুতর।।
ধূপদীপ জ্বলিয়া যোগায় নিরবধি। ধুনার পাজল্যা জ্বালে নাহিক অবধি।।
বাজয়ে বিশাল বাদ্য গভীর নিনাদ। ঢাক ঢোল সানি বেনি বাজয়ে সুছাঁদ।। ১৩৫
দড়মসা দগড় বাজয়ে বিপরীত। মেঘেতে গগনে যেন গর্জে আশ্চম্বিত।।
ভেউর কর্নাল সপ্তস্বরা নিরবধি। কতশত শত [৪]বাজে[৪] নাহিক অবধি।।
রসাল মৃদঙ্গ বীণা সুললিত ধ্বনি। যন্ত্র কপিনাস অতি সুমধুর শুনি।।
গভীর শবদে বাদ্য বাজয়ে বিশাল। [৫]কাড়া[৫] পড়া উচ্চধ্বনি ফুকরে কাহাল।।
ঘোরতর গভীর শবদে অনিবার। কতেক বাজনা বাজে সংখ্যা নাহি তার।। ১৪০
[৬]কন্দ্য বন্দ্যোপাধ্যায়[৬] বড়ই পণ্ডিত। মনসার পূজা কার্য কৈল নিয়োজিত।।
স্নান করি দ্বিজবর কৃতাহ্নিক হৈয়া। মন্দিরে প্রবেশ কৈল জয়ধ্বনি দিয়া।।
শুভক্ষণে দ্বিজগণ মঙ্গল বিধান। স্বস্তি স্বস্তি উচ্চারণ কৈল বেদগান।।

গৃহ মাঝে বসাইল রত্ন সিংহাসন। তথিমধ্যে স্বর্ণ বারি কৈল আরোহণ।।
সিজের পল্লব শোভে ঘটের উপর। তড়িত বিজুলি [৭]যেন[৭] জোতি মনোহর।।
প্রকাশিত রবি যেন দীপ্ত করে অতি। মনসার স্বর্ণ বারি প্রকাশিত তথি।।
[চাবিবেদ উচ্চারণে সঙ্কল্প করিল। ( ) অর্ঘ্য প্রথমে গণেশ পূজা কৈল।।
দুগ্ধ দধি ঘৃত চিনি নারিকেল জলে। দান করাইল ঘট মন কুতূহলে।।] [৮]
বিধিমতে বিধানে আরম্ভ কৈল পূজা। পুস্তক [৯]ধরিল[৯] করে দ্বিজ মহাতেজা।।
বিবিধ বিধানে কৈল শাস্ত্রের বিহিত। একমনে পূজে [১০]ঘট[১০] হৃদয় দ্রবিত।। ১৫০
নানা [১১]দিব্য[১১] উপহার কহিব কতেক। বর্ণনে না যায় তাহা [১২]করিল যতেক[১২]।।
প্রচুর শর্করা মধু কলসি পুরিয়া। ঘৃত দধি দুগ্ধ ক্ষীর ভারে ভারে দিয়া।।
আর যত উপহার মিষ্টান্ন বিস্তর। নৈবিদ্য রচনা অতি দেখিতে সুন্দর।।
অতি রম্য অমৃত সমান দশফল। আর যত উপহার আনিল সকল।।
কদলী কর্কটী ফুটী নারিকেল জাম্র। খাজুর পনস আর পূগ[১৩] পূর্ণ আম্র।। ১৫৫
আনন্দে বিভোল হৈয়া পূজে একমনে।[১৪] কার্য সহ নরপতি বেড়িয়া সঘনে।।
গভীর শবদে বাদ্য বাজয়ে বিশাল। মেঘের গর্জন [১৫]জিনি ফুকরে[১৫] কাহাল।।
হেন মতে ভক্তিভাবে পূজে নরপতি। হরষিতে সর্বলোক ভকতি প্রণতি।।
ঘন ঘন প্রণিপাত অষ্টাঙ্গ লুটিয়া। কতো স্তব স্তুতি করে ধরণী পড়িয়া।।
অধিষ্ঠান হৈলা দেবী [১৬]ঘটের[১৬] উপর। দেখি হাসনের ভক্তি হরিষ অন্তর।। ১৬০
ডাকিয়া বলেন [১৭]পুত্র[১৭] শুনরে হাসন। অভিমত বর মাগ যেই লয় মন।।
শুনিয়া হাসন রাজা পুলকে আকুল। প্রেমানন্দ হইয়া স্তুতি করয়ে বহুল।।
তুমি নিরঞ্জন আদ্যা ব্রহ্ম নিরূপণ। তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি ত্রিলোচন।।
তুমি ইন্দ্র যম তুমি কুবের বরুণ। তুমি চন্দ্র বায়ুভূত আনল অরুণ।।
গন্ধর্ব দানব আদি সিদ্ধ বিদ্যাধর। সিদ্ধ সাধ্য ঋষি মুনি অপছর কিন্নর।। ১৬৫
স্বর্গ মর্ত রসাতল সচর অচর। স্থাবর জঙ্গম তরু পর্বতশিখর।।
অবতার [১৮]কৈলে[১৮] সৃষ্টি আপন হরিষে। সৃজন পালন ক্ষয় কর অনায়াসে।।
অখিল আধার তুমি কে জানে মহিমা। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর দিতে নারে সীমা।।
মূঢ় অতি অল্পমতি আমি দুরাচার। নর হৈয়া কি জানিব মহিমা তোমার।।
না জানি ভকতি স্তুতি ভজন পূজন। অবিরত পাপেতে জড়িত পাপ মন।। ১৭০
[১৯]কেমনে[১৯] তরবি ঘোর দুস্তর সংসার। কৃপা করি অধমেরে বল প্রতিকার।।
হাসন এতেক যদি করিল স্তবন। মনসা ব্যথিত অতি হইলা তখন।।
অধিক বাড়িল দয়া আপন কিঙ্করে। ডাকিয়া বলেন মাতা মধুর সুস্বরে।।
শুন অরে পুত্র নৃপতি হাসন। একান্ত জানিলু মনে তুমি ভক্তজন।।
শুদ্ধ মতি অতিশয় ধর্মেতে তৎপর। অতিদান্ত পুণ্যবন্ত শান্ত কলেবর।। ১৭৫
মহাতুষ্ট [২০]কৈল[২০] তোরে সদয় হৃদয়। অনায়াসে বর মাগ যেই মনে লয়।।
এতেক শুনিয়া রাজা কর জোড় করি। গদগদ ভাবে বলে পদ্মা বরাবরি।।
রত্ন ধন রাজ্য আদি তোমার প্রসাদে। নানা সুখে চিরকাল ভুঞ্জি অবিবাদে।।
আপন কৃপায় যদি মোরে [২১]দিবে[২১] বর। তব পদে ভক্তি [২২]অতি রহে[২২] নিরন্তর।।
হাসিয়া মনসা অতি হইয়া সদয়। অধিক যাচয়ে বর আপন কৃপায়।। ১৮০
দিনে দিনে বংশবৃদ্ধি হব চিরজীবি। বাড়িব অমূল্য রত্ন রাজ্য ধন আদি।।

আয়ু যশ বুদ্ধি হব ধর্মে শুদ্ধমতি। হেন মতে বর দিলা হাসনের প্রতি॥
মহা-আনন্দিত মনে মনসা কুমারী। তথা হৈতে আশ্চম্বিতে অন্তর্ধান করি॥
রথ ভরে উপনীত সিজুয়া শিখরে। বঞ্চেন পরম সুখে তথা নিরান্তরে॥
হাসনের পূজা ক্ষিতি হইল প্রচার। দ্বিজ বিপ্রদাস বলে হরিষ আপার॥ ১৮৫

১ সুবর্ণের চিত্র (সু. সেন) ২ মিষ্ট অন্ন মনহরা (এসো/১) ৩ বিশেষ (ঐ ভুল পাঠ) ৪ বান্ধে (এসো/১) ৫ গড়া (সু. সেন) ৬ মহাবীর্য পঞ্চদ্বিজ (এসো/১) ৭ জিনি (ঐ) ৮ পয়ার দুটি অতিরিক্ত— এসো/১ ৯ ধারণ (সু. সেন) ১০ যত (ঐ) ১১ দ্রব্য (এসো/১) ১২ নহে পরতেক (ঐ) ১৩ তাল (সু. সেন) ১৪ এখানে এসো/১ পুথিতে লেখা 'রথ জাত্রা পূর্ব দিবস' ১৫ জকু করে (সু. সেন) ১৬ খাটেব (ঐ) ১৭ পদ্মা (ঐ) ১৮ কৈল্যা (এসো/১) ১৯ কেমতে (সু. সেন) ২০ হৈনু (এসো/১) ২১ দেহ (সু. সেন) ২২ মতি হবে (ঐ)

১০

রাগ ইমন

আর একদিনে পদ্মা আরোহিয়া রথে। ভ্রমিতে পরম রঙ্গে আইলা মরতে॥ ১৮৬
চাঁদো রাজা গুরু [১]কৃত্য[১] করয়ে হরিষে। মৎস্য আনিবারে রাজা করিলা আদেশে॥
জালু মালু দুহা কারে দিল পাঠাইয়া। শীঘ্র গতি যায় দুহে কান্ধে জাল লয়্যা॥
হরষিতে আসি জাল এড়িলেক জলে। হেনকালে পদ্মাবতী মায়া পাতি বলে॥
শুন শুন জালু মালু তোরা দুই ভাই। এ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণী আমি একাকিনী যাই॥ ১৯০
হইবেক মহাপুণ্য মোরে পার কর। ভিক্ষা হেতু যাই আমি চম্পক নগর॥
জালু মালু বলে শুন বৃদ্ধ একেশ্বরী। চাঁদোর পিতার কৃত্যে দুহে মৎস্য ধরি॥
বিলম্ব হইলে রাজা বধিবে পরাণে। সেই ভয় বড় মৎস্য না পাই যতনে॥
নারিব করিতে পার [২]যাও[২] অন্য পথে। কাতর হইয়া দেবি পুন পুন কথে॥
আশীর্বাদ লও মোর হইবে কল্যাণ। তব পিতৃপুণ্য পার কর এই দান॥ ১৯৫
তিন উপবাসী আমি পারনা না করি। ভিক্ষা হেতু [৩]যাই[৩] আমি চাঁদ রাজার পুরি॥
তোমা দুহা দিব কিছু আসিবার কালে। শুনি জালু মালু অতি ক্রুদ্ধ হৈয়া বলে॥
বিপরীত দেখি বুড়ি হিড়িম্বি ডাইনি। মায়া পাতি রক্ত পিতে [৪]চাহসি[৪] বামনি॥
মনসা গঞ্জিয়া জাল জলেতে এড়িল। দেখিয়া মনসা অতি ক্রোধ উপজিল॥
প্রহরেক জাল এড়ে মৎস্য নাহি পায়। চিন্তাকুলি দুই ভাই ভাবে সবিস্ময়॥ ২০০
নিজ মনে অনুমান করে দুই ভাই। [৫]ব্রাহ্মণীকে[৫] করি হেলা মৎস্য নাহি পাই॥
কর জোড় করি বলে পদ্মার চরণে। মৎস্য নাহি পড়ে জালে তোমার কারণে॥
আইস পার করিলাম উঠহ সত্বর। তবে জালে মৎস্য পাব তোমা বরাবর॥
মায়া পাতি বলে তবে অস্তিক জননী। [৬]কি হইবে[৬] মোরে পার করিলে এখনি॥
[৭]ভক্তি যুক্ত[৭] দুই ভাই না করিল হেলা। কেরোয়াল দড়া লয়্যা জাল কৈল দোলা॥ ২০৫
কান্ধে করি দুই ভাই লইল মনসায়। গৌরব করিয়া সুখে বসাইল নায়॥
চরণে প্রণতি করি জাল ফেলে জলে। তুলিতে না পারে এত মৎস্য পড়ে জালে॥
নৌকা ভরি মৎস্য জালু হরিষ আপার। মনসা বলেন জাল ফেল আরবার॥
পদ্মার আজ্ঞায় পুন জাল ফেলে জলে। মনসার স্বর্ণবারি উঠে হেন কালে॥

সর্বাঙ্গ লোটাইয়া ধরে মনসা চরণ। দেহ পরিচয় কহ ঘটের কারণ।। ২১০
হাসিয়া বলেন আমি মনসা কুমারী। অধিষ্ঠান হৈলু তোরে সুবর্ণের বারি।।
বর মাগ দুই ভাই আমার গোচর। ঘরে লৈয়া বারি পূজা করহ সত্বর।।
জালু মালু বর মাগে মনসার পায়। হউক সুবর্ণময় মোর এই নায়।।
হাসিয়া হরিষে বর দিলা বিষহরি। স্বর্ণ [৮]বৃষ্টি নায়ে আর হৈল[৮] তার পুরী।।
হরিষে জালুর মাতা আইল পুত্র ঠাঞি। নায়ে গিয়া স্বর্ণ বৃষ্টি দেখিল তথাই।। ২১৫
আনন্দে ঘরের কথা কহিল পুত্রেরে। হাথে মাথে মনসার বারি লৈল ঘরে।।
রত্নময় সিংহাসনে মনসা বসায়। দুই বধূ লৈয়া মঙ্গল গীত গায়।।
বিশাল বাজনা করি নানা [৯]দ্রব্য লৈয়া[৯]। মনসা চরণ পূজে হরষিত হৈয়া[১০]।।
এথায় [১]সনকা[১১] ছয় বধু লৈয়া ঘরে। [১২]শনি[১২] অমাবস্যাব্রত হরষিতে করে।।
[১৩]সঙ্গতি[১৩] করিতে স্থান যায় কুতূহলে। ছয় বধূ সংহতি প্রচুর সখি চলে।। ২২০
হেনকালে আশ্চম্বিতে শুনিল সত্বরে। বিশাল বাজনা বাজে জালু মালুর ঘরে।।
ঝাউয়া দাসী ডাকিয়া করিলা অঙ্গীকার। ইহার কারণ জানি আইসহ সত্বর।।
শুন্যা ঝাউয়া [১৪]তুরিতে[১৪] করিল গমন। জালুর পুরীতে গিয়া দিল দরশন।।
দেখিল বিচিত্র বারি জালুর মন্দিরে। হরিষে মনসা পূজে নানা উপহারে।।
স্বর্ণময় দেখিল জালুর সর্বপুরী। সত্বরে কহিল গিয়া সনকা বরাবরি।। ২২৫
শুনিয়া সনকা আইল জালুর ভুবনে। গৌরব করিয়া দিল বসিতে আসনে।
হরিষে নিছনি তার চরণ বন্দিল। মনসা চরণে বিপ্রদাস বিরচিল।। ২২৭

১ কির্ত্তি (সু. সেন) ২ যাহ (এসো/১) ৩ জাতি (সু. সেন, বিভ্রান্তিকর পাঠ) ৪ চাইসি (সু. সেন) ৫ ব্রহ্মধনকে (ঐ, বিভ্রান্তিকর পাঠ) ৬ কিছু হবে (সু. সেন) ৭ ভক্তি হৈয়া (এসো/১) ৮ বিষ্টি না হইল (সু. সেন) ৯ দিব্য নিয়া (ঐ) ১০ নানা দিব্য লৈয়া (সু. সেন) ১১ মনসা (ঐ, ভুল পাঠ) ১২ মুণি (সু. সেন) ১৩ সুকৃতি (ঐ), ১৪ ত্বরিত (ঐ)

১১

রাগ গৌরী

সনকা বলেন শুন জালুর জননী। কেমন দেবতা পূজা [১]করসি[১] আপনি।। ২২৮
অদ্য অন্নশূন্যা তুমি ছিলা এই স্থান। এতেক বৈভব হৈল কহত কারণ।
[২]পুন পুন[২] সনকা নিছনি প্রতিভাষে। আরাধ কেমন দেব কহ সবিশেষে।। ২৩০
জালুর জননী বলে [৩]শুনহ[৩] বচন। ভকতি প্রণতি পূজি মনসা চরণ।।
সমুদ্র সলিলে জালে উঠে দিব্য বারি। তাহার প্রসাদে মোর স্বর্ণময় পুরী।
শুনিয়া সনকা মনে বাড়িল ভকতি। পুনর্বার জিজ্ঞাসয়ে নিছনির প্রতি।।
কি বিধি বিধানে পূজা কহত সত্বর। কেমন ভাবনা পাহ অভিমত বর।।
আবাহন পূজন কেমন ভক্তি স্তুতি। আমি আরাধিব পদ্মা তোমার সংহতি।। ২৩৫
শুনিয়া নিছনি বলে হরষিত হয়্যা। মনসা পূজার কথা সনকা চাহিয়া।।
এক চিত্তে রাজরানী কর অবধান। পদ্মার পূজার কথা কহিব বিধান।।
সুবর্ণের ঘটে দিয়া সিজের পল্লব। রত্ন-সিংহাসনে রাখি মনের উৎসব।।
দশমী দশহরা তিথি জ্যৈষ্ঠ বাসরে। নানা দ্রব্য উপহার করিয়া বিস্তরে।।

মিষ্ট অন্ন রচনা নৈবেদ্য দশফল। [৪]দুই[৪] বধূ লৈয়া [৫]গাই[৫] পদ্মার মঙ্গল।। ২৪০
নিত্য নিত্য এই রূপে করিয়ে পূজন। আদ্যোপান্ত এইমত কহিল বচন।।
দেখিয়া শুনিয়া রানী আনন্দ প্রকাশে। মনসা বিজই দ্বিজ বিপ্রদাস ভাষে।। ২৪২

---

১ করিস (এসো/১) ২ শুন শুন (সু. সেন) ৩. সুভ্রড় (ঐ) ৪ ছয় (ঐ) ৫ গাইয় (ঐ)

১২

ভৈরবী রাগ

সনকা বলেন বাণী শুনলো নিছনি ধনি
মনসার ঘট দেহ মোরে।
যাবত না আনি বারি তদবধি পূজা করি
এই নিবেদন করি তোরে।। ২৪৩
দেব নহে আপ্ত পর ভক্তি [১]বশে[১] নিরন্তর
বিশেষে আপনি কর দয়া।
তুমি তার প্রেমদাসী জলেতে উঠিলা ভাসি
দরিদ্রতা নাশে ধন দিয়া।।
নিছনি শুনিয়া বাণী মহা দুঃখ মনে গণি
রাজরানী কি করিতে পারি।
ঝাট পদ্মা রথভরে ডাকি বলে নিছনিরে
হরষিতে দেহ দুই বারি।। ২৪৫
সনকা [২]করুণ[২]-আঁখি পদ্মার প্রতাপ দেখি
বুঝাইয়া জালুর জননী।
যত্নে লইল সুন্দরী হাথে কাখে দুই বারি
নিজপুরে গেল রাজরানী।।
স্নান করি কুতূহলে নানা দিব্য দশফলে
নৈবিদ্য রচনা ধূপ দীপে।
ছয় বধূ সঙ্গে লৈয়া জয়ধ্বনি ঘন দিয়া
পূজা করে আনন্দ স্বরূপে।।
গায় সুমঙ্গল গীত মনে অতি উল্লসিত
হেন কালে ধাইল সত্বর।
নেড়া [৩]ঝাউয়া ঝাট[৩] গিয়া চাঁদোরে কহিল ধাইয়া
বিস্ময় হইল দণ্ডধর।।
অবিলম্বে শীঘ্র গতি উঠিলেক নরপতি
সত্বরে ধাইল চাঁদো রায়।
কোপে কাঁপে কলেবর দেখি যেন ভয়ঙ্কর
উপনীত হইলা তথায়।।
দেখিয়া পদ্মার পূজা ক্রোধে [৪]কাঁপে[৪] চাঁদো রাজা
হেন্তালের দণ্ড করে ধরি।

আপদ সঞ্চারে নৃপে আপনা পাসরে কোপে
ভাঙিলেক মনসার বারি।। ২৫০
সনকা কাতর হৈয়া মনে অতিদুঃখ পায়্যা
গালি পাড়ে চাঁদ বরাবর।
লঙ্ঘিয়া দেবীর বারি এ সুখ সম্পদ গারি
[৫]মজিল[৫] অবুধ নৃপবর।।
নিছনি সত্বরে গিয়া দুই বারি লৈল ধায়্যা
মনসা চলিলা নিজস্থান।
চাঁদ দম্ভময় দেখি মনসা চিন্তিতমুখী
নেতো লয়্যা করে অনুমান।।
নেতো বলে হরসুতা পূর্বে যে কহিনু কথা
হরগৌরী দিলা মহাজ্ঞান।
সেই হৈতে দম্ভময় চাঁদোর নাহিক ভয়
নিবেদন করি সম্বিধান।।
চাঁদোর [৬]প্রয়াস[৬] অতি সুরম্য নাখরা প্রতি
নিরবধি দেখে প্রাণ সম।
আপনি তথায় গিয়া সঙ্গে নাগ দল লৈয়া
কাট শীঘ্র নাখরা উত্তম।।
[৭]রথ ভরে[৭] বিষহরি প্রবেশে চাঁদোর পুরী
দাঁড়াইয়া নাখরা নিকটে।
আজ্ঞা দিল নাগদলে সভে ধায় কুতূহলে
[৮]অস্ত্র ধরি[৮] রম্য বন কাটে।। ২৫৫
বিচিত্র নাখরা বন সারি সারি তরুগণ
দেখি যেন [৯]সুন্দর[৯] নগরী।
জিনিয়া অমরাবতী নানা বৃক্ষ রম্য অতি
নাগগণে কাটে তরাতরি।।
চ্যুত নারিকেল তাল রসাল পনস [১০]তাল[১০]
গুবাক খাজুর আমলকি।
চেউরি তেঁতুলি তথি কদলী বিচিত্র অতি
ইক্ষুবন [১১]অভি রম্য[১১] দেখি।।
বিচিত্র লেবুর বন সাত জাতি বিরচন
কলম্বগ ছোলঙ্গ আপার।
বাতাবি [১২]নারাঙ্গি[১২] পাতি গোঁড়া কাল আছে তথি
খণ্ড খণ্ড কৈল আনিবার।।
বহুত আমড়া নিম্ব বকুল কদম্ব [১৩]গন্ধ[১৩]
সুবাসিত কুসুম কানন।
শেফালিকা জুতি কুন্দ চম্পক মল্লিকা গন্ধ
নাগেশ্বর আউচ রঙ্গিন।।

সারুলি পারুলি ঝাঁটি জাতি জবা পরিপাটী
বিচিত্র মাধবীলতা অতি।
করবী অপরাজিতা দোপাটী দোমুখি তথা
গন্ধরাজ কাঞ্চন মালতী।। ২৬০
টগর ধবলমুখী কাটে নাগগণ সুখী
বক শ্বেত লোহিত বরণ।
সুগন্ধী কেতকী কোড়া কৃষ্ণকলি লতা বেড়া
সূর্যমণি বাসক অশোক।
কাটিল কুসুম বন হরষিতে নাগগণ
মনে অতি বাড়িছে কৌতুক।।
কপিথ পাকড়ি ভেলা হরতকি বহেড়া গিলা
জলপাই কামরাঙ্গা আদি।
রক্তচন্দনের বৃক্ষ কাটী পাড়ে লক্ষলক্ষ
ছেদিলেক এতেক অবধি।
নাখরা রক্ষক ছিল অবিলম্বে ধাইয়া গেল
জানাইল চাঁদো বরাবর।
রক্ষকের বাক্য শুনি মহাদুঃখী নৃপমণি
কোপে তনু করে থর থর।।
হরগৌরী ভাবি মনে ধাইল নাখরা বনে
সত্বরে হইল অধিষ্ঠান।
দেখিয়া নাখরা বন বিস্ময় হইল মন
অন্তরে ভাবিয়া ততক্ষণ।।
মহাজ্ঞান জপে মনে জয়নেত আচ্ছাদনে
[১৪]নিমিষে[১৪] নাখরা জিয়াইল।
দম্ভময় অহঙ্কারে গালি পাড়ে মনসারে
দেখি পদ্মা ত্রাসযুক্ত হৈল।। ২৬৫
নেতো বলে [১৫]পদ্মাবালি[১৫] হইয়া চাঁদোর [১৬]শালী[১৬]
ছলিয়া আনহ মহাজ্ঞান।
করুণা করয়ে অতি চিন্তাকুলি পদ্মাবতী
ভাবি [১৭]বলে[১৭] নেতো বিদ্যমান।।
আমি শঙ্করের ঝি বৃথা আর কেন জী
সংসার ভরিয়া অপমান।
নর হৈয়া দম্ভ করে কুবচন বলে মোরে
ধিক ধিক আমার পরাণ।।
নেতো বলে বিষহরি গোকুল নগরে হরি
গোপ সঙ্গে শয়ন ভোজন।

কংস রাজা বধিবারে কৈলা হেন ব্যবহারে
বিবেক করহ অকারণ।।
আর দেখ অপরূপ রামচন্দ্র ব্রহ্মরূপ
মৈত্রতা বানর সংহতি।
ভগবান মহারাজে সীতা উদ্ধার কাজে
হেন ব্যবহার কৈল তথি।।
দেখহ পাণ্ডবকুলে দয়মন্তী রাজা নলে
[১৮]বঞ্চে অশ্বপতি-নিকেতনে[১৮]।
চিন্তাদি শ্রীবৎস সনে রাজারানী দুইজনে
[১৯]নানা ক্লেশ পাইলা কাননে[১৯]।।
নেতোর বচন শুনি মনসা হৃদয়ে গুণি
সুবেশ হইলা ততক্ষণ।
মনসা চরণ ধন শিরে করি অভরণ
দ্বিজ বিপ্রদাসে সুরচন।। ২৭১

১ রসে (সু. সেন) ২ সজল (ঐ) ৩ দাসি ঝাটো (ঐ) ৪ জুলে (এসো/১) ৫ মজিলে (সু. সেন) ৬ প্রেয়সী (ঐ) ৭ রথে ভর (এসো/১) ৮ অস্ত্রধারী (সু. সেন) ৯ ইন্দ্রের (এসো/১) ১০ ভাল (সু. সেন—ভুল পাঠ) ১১ অতিরম্য (এসো/১) ১২ নাঙ্গি (সু. সেন) ১৩ দম্ভে (ঐ) ১৪ নিমিখে (ঐ) ১৫ পদ্মাবাণি (এসো/১—ভুল পাঠ) ১৬ সানি (ঐ) ১৭ মনে (সু. সেন) ১৮ নানা ক্লেশ পাইলা কাননে (ঐ) ১৯ বঞ্চে অশ্বপতি নিকেতনে (ঐ)।

১৩

নাট রাগ

চাঁচর প্রচুর কেশ করবী প্রবন্ধে। মালতীর মালে ভৃঙ্গ মধুগন্ধে।। ২৭২
সীমন্তে সিন্দুর ভালে চন্দনের ফোঁটা। অভিনব যেন দীপ্ত শত ইন্দু ছটা।।
অলক তিলক সূক্ষ্ম চন্দনের রেখ। কতেক প্রকারে তাহা শোভে পরতেক।।
কামের কামান ভুরু নয়ানে অঞ্জন। দেখিলে মুনির মন টলে ততক্ষণ।। ২৭৫
বিচিত্র [১]পাটের শাড়ি[১] পরিধান করি। রত্নময় অলঙ্কার অঙ্গে অঙ্গে পরি।।
নিবিড় নিতম্ব কটী কিঙ্কিনীর ধ্বনি। চরণে নূপুর রুণু ঝুনু শুনি।।
নানা মায়া রূপ পদ্মা করিয়া সত্বরে। হরিষে পয়ান কৈলা চম্পক নগরে।।
ভুরু যুগ শোভে জিনি কামের ধনুক। নয়ান কটাক্ষে বিন্ধে [২]মনুষ্যার[২] বুক।।
মকর কুণ্ডল গণ্ডে করে ঝলমল। নানা রত্নে শোভে হার [৩]কণ্ঠায় উজ্জ্বল[৩]।। ২৮০
রাম রম্ভা উরু যুগ চরণ কমল। ময়ুর পেখম যৈছে গমন [৪]সচ্ছল[৪]।।
ঈষত হাসিলে যেন বিজলি প্রকাশে। সুরাসুর মুনিমন মোহে অনায়াসে।।
রামেশ্বর ঘাটে আইলা চান্দের [৫]অন্তপুরী[৫]। কহে বিপ্রদাস মায়া পাতে বিষহরি[৬]।। ২৮৩

১ পটের সাড়ি (সু. সেন) ২ মন্দরের (ঐ) ৩ কণ্ঠার উপর (ঐ) ৪ সুন্দর (ঐ) ৫ রত্নাপুরী (ঐ) ৬ 'আষাড়ি পূর্ণিমা ২৮ আষাঢ় অদ্যই' লেখা এসো/১ পুথিতে

১৪

সিন্ধুড়া

মায়া মোহে কান্দিতে লাগিলা উচ্চস্বরে। কোথা গেল প্রভু মোরে রাখি একেশ্বরে।। ২৮৪
হেন কালে সনকা আইলো সেইখানে। মায়ায় মোহিত রানী পুছে ঘনে ঘনে।।
কহ লো সুন্দরি কেনে কান্দ মনদুঃখে। আখি মুছি বলে পদ্মা সনকা সম্মুখে।।
জাতি গন্ধ বণিক মহেশ দত্ত পিতা। মেনকা আমার নাম মহেশ্বরি মাতা।।
সনকা চাঁদের রানী আমার ভগিনী। পলাইল প্রভু মোরে রাখি একাকিনী।।
কি কর্ম কবির এবে যাইব কোথায়ে। সনকা বহিনী [১]বাড়ী[১] কোন রূপে পায়ে।।
বঞ্চিব তাহার গৃহে মান উপেক্ষিয়া। সনকা পদ্মার হাতে ধরিল হাসিয়া।। ২৯০
সনকা আমার নাম শুনহ ভগিনী। মনসা লইয়া ঘরে গেলা রাজরানী।।
কথোপকথন দুহে করে কুতূহলে। চাঁদো রাজা সেইখানে আইল হেন কালে।।
পদ্মার মায়ায় চাঁদো মোহে কাম বাণে। সনকারে জিজ্ঞাসে এ কন্যা কোনজনে।।
সনকা বলেন এই আমার ভগিনী। স্বামী এড়ি পলাইল আইল একাকিনী।।
মুনি মনোমোহন মনসা অঙ্গভঙ্গ। কাতর নৃপতি অতি বাড়িল তরঙ্গ।। ২৯৫
নিবারিতে নারে মন হইল অস্থির। পাগল হইল রাজা আইল বাহির।।
[২]গুপ্তে সনকায়[২] ডাকি বুঝাইয়া বলে। তব ভগিনী দেখি অঙ্গ দহে কামানলে।।
তারে বুঝাইয়া প্রাণ রাখহ আমার। কর্ণে হস্ত দিয়া রানী করে হাহাকার।।
শোক দুঃখে মোর ঘরে আইল ভগিনী। কেমনে বলিব হেন অসম্ভব বাণী।।
নৃপতি অধিক বলে হইয়া কাতর। বিষাদে চলিল রানী মনসা গোচর।। ৩০০
সবিস্ময়ে কহিল পদ্মার বিদ্যমানে। দুরন্ত নৃপতি তোমা দেখিল কেমনে।।
মদনে কাতর হয়্যা চাহে আলিঙ্গন। কেমনে বলিব হেন ছার কুবচন।।
পদ্মা বলে আমা লাগি দুঃখ পাও মনে। তুষিব নৃপতি তব পিরিতি কারণে।।
সনকা কহিল গিয়া নৃপতির স্থানে। [৩]শয়ন[৩] মন্দিরে রাজা করিল শয়নে।।
জ্ঞান শুনিবারে পদ্মা সেই ঘরে যায়। রুণু ঝুনু শবদে নূপুর বাজে পায়।। ৩০৫
ঈষৎ কটাক্ষে পদ্মা মোহে চাঁদোরায়। অস্থির সুরতি আশে পরশিতে যায়।।
[৪]না ছোড়ো[৪] নৃপতি কিছু বুঝাই কারণ। নৃপতি পাপের মন আপদ লক্ষণ।।
মহাজ্ঞান কেমনে আছয়ে তব স্থানে। তাহার বিশেষ কহ মোর সন্নিধানে।।
তাহাতে কার্পণ্য যদি হও মহাশয়। না চাহ সুরতি মোরে দেহত বিদায়।
চাঁদ বলে মর্ম কথা [৫]কহিয়ে[৫] কেমনে। তোর রূপে স্থির নহি দেহ আলিঙ্গনে।। ৩১০
কাতর হইয়া [৬]চাঁদ[৬] বলে [৭]মহারাজ[৭]। মায়ায়ে মোহিত পদ্মা সাধে নিজ কাজ।।
যদি আমা প্রতি রাজা [৮]করহ[৮] কপট। না দিব সুরতি-দান নহিব নিকট।।
মনসা নিষ্ঠুর দেখি নৃপতি বিকল। হরিল গেয়ান মর্ম কহিছে সকল।।
মহাদেব সেবিয়া পাইল মোক্ষ বর। শিরে দিলা [দিব্য] জটা মস্তক উপর।।
আর জয়-আঁচল দিলেন দেব রায়। তাহার প্রসাদে মোর ত্রিভুবনে জয়। ৩১৫
তবে পদ্মা হাসিয়া সাধেন নিজ কাজ। কেমন আঁচল দেখি দেহ মহারাজ।।
কুবুদ্ধির নৃপতি আঁচল দিল হাতে। শীঘ্র জটা ছিঁড়ি পদ্মা ভর কৈল্যা রথে।।
হতজ্ঞান রাজা মনে ভাবয়ে বিষাদ। মৃতবৎ হইয়া কান্দে ডাকে আর্তনাদ।।

ত্রাসে আসি সনকা জিজ্ঞাসে সম্বিধান। চাঁদ বলে কানি আসি হরিলেক জ্ঞান।।
তখনি জানিনু তোমা [৯]সঞ্চরে[৯] আপদ। আপন কুবুদ্ধি হেতু মজাইলা সম্পত।। ৩২০
হরষিত পদ্মাবতী চাঁদোরে ছলিয়া। নিজস্থানে গেলা [১০]পদ্মা[১০] নাখরা কাটিয়া।।
সানন্দে শ্রীমন্ত রায়ে পদ্মা দেহ বর। দ্বিজ বিপ্রদাস কহে তাহার কিঙ্কর।। ৩২২

১ বার্তা (সু. সেন) ২ গুপ্ততে সনকা (ঐ) ৩ শয়নে (ঐ) ৪ ল পুত্ত (এসো/১, ভুল পাঠ) ৫ কহিব (ঐ/১)
৬ যত (ঐ) ৭ চাঁদোরাজ (ঐ) ৮ করত (ঐ) ৯ সঙরে (সু. সেন) ১০ পুন (ঐ)

পঞ্চম পালা সাঙ্গ

ষষ্ঠ পালা

১

পয়ার

পুনরপি পদ্মাবতী নাগ বেশ হৈয়া। চাঁদোরে কহেন স্বপ্ন নাগগণ লৈয়া।। ১
সর্বাঙ্গে বেষ্টিত নাগ সংহারিতে যায়। কি কর্ম করিলি রাজা লঙ্ঘিয়া আমায়।।
আজ কালি মজাইব চম্পক-নগর। স্বপ্ন কহি গেলা দেবী রাজা ভয়ঙ্কর।।
পাত্র মিত্র সভে ডাকি সব কহিল সপন। নাগ [১]রূপ[১] কন্যা এক নাগ অভরণ।।
মহাজ্ঞান ছলি মোরে সংহারিতে চায়। কেমনে রাখিব রাজ্য বলহ উপায়।। ৫
পাত্রমিত্র সভে মেলি বলে যুক্তি করি। যত্ন করি আন রাজা সঙ্কর ধন্বন্তরি।।
তাহার প্রতাপ কহি তোমার অগ্রেতে। মহাসঙ্ক নামে ওঝা ধবল পর্বতে।।
তার দম্ভ লোকমুখে শুনি ধন্বন্তরি। ঝাট ধায় বিবাদ করিতে তার পুরী।।
হিমা নদী আছে এক সেই গিরিবরে। শিষ্যগণ সঙ্গে করি বসি তার তীরে।।
চর পাঠাইল ওঝা সকলি কহিয়া। সর্ব কথা কহে চর সঙ্ক আগে গিয়া।। ১০
অবধান কর হের মহাসঙ্ক রাজ। হেন বুঝি আজি নষ্ট হয় সর্বকাজ।।
এক ওঝা অহঙ্কার করে নদী তীরে। কহে আজি পরাজয় করিব তোমারে।।
এতেক শুনিয়া সঙ্ক কুপিল অন্তরে। যমের সংবাদ আজি হইল [২]তাহারে[২]।।
শিষ্যগণ ডাকিয়া আনিল ততক্ষণ। হিমা নদী তীরে গিয়া দিল দরশন।।
শীতল বকুল চারু হিমানদী কূলে। শিষ্য সঙ্গে [৩]করি ওঝা বৈসে[৩] তার তলে।। ১৫
ধন্বন্তরি দেখি সঙ্ক জিজ্ঞাসে বারতা। কোন জাতি কি নাম নিবাস তব কোথা।।
তবে পরিচয় দিল সঙ্ক বরাবরি। সমুদ্রে আমার জন্ম নাম ধন্বন্তরি।।
গৌড় আদি করিয়া জিনিল সব রাজ্য। তোমার সহিত আছে জিনিবার কার্য।।
শুনিয়া তোমার দম্ভ লোকের বদনে। বিবাদ করিতে আইলু হরষিত মনে।।
যত দম্ভ কর সঙ্ক সব অকারণ। আজি রক্ষা পাও তবে ভাগিলে শমন।। ২০
ধন্বন্তরি বাক্য শুনি মহাসঙ্ক রোষে। হেন বাক্য তোর মুখে আইল দৈবদোষে।।
মহাসঙ্ক নাম মোর ত্রিভুবন জিনি। মোর বাণে যম [৪]ঘরে[৪] যাইবি এখনি।।
ইহা শুনি ধন্বন্তরি বলে অহঙ্কারে। হেন বুঝি দম্ভ করি ভাগিবা আমারে।।
কেমন জানহ শিক্ষা ক্ষেপহ আমায়। ইহা শুনি পুন বলে সঙ্ক মহাশয়।।
নরবধ মহাপাপ ঘুষিব সংসারে। তেই এতক্ষণ রক্ষা পাও বারে বারে।। ২৫

শুনহ সম্ভ্রম চিত্তে আমার উত্তর। এই হিমানদী আছে ধবল [৫]শিখর[৫]।।
এই জল শুখাও শুনহ ধন্বন্তরি। পুনরপি পুরিব [৬]সলিল[৬] পূর্ণ করি।।
প্রতিষ্ঠা করিল দুহে করিতে বিবাদ। যেই হারে রসাতলে যাব অবিবাদ।।
ধন্বন্তরি প্রতি সঙ্ক কহে বিদ্যমান। যদি হার শিষ্য সঙ্গে পাতালে পয়ান।।
আমি যদি হারি [৭]দৃঢ় কহি[৭] সন্বিধান। মোর কন্যা কমলা তোমারে দিব দান।। ৩০
পাতালে যাইব আর পুত্র নারী লৈয়া। প্রতিজ্ঞা [৮]করিল[৮] দুহে হরষিত হৈয়া।।
সত্য কৈলা দুই জনে সাক্ষী সর্বজন। যেই হারে সেই যাব পাতাল ভুবন।।
দেখিতে আইল লোক হরিষ আপার। দুই ওঝা বৈসে যেন অগ্নি অবতার।।
লোক ধর্ম চন্দ্র সূর্য দুহে সাক্ষী করি। সঙ্ক বলে সলিল শুখাও ধন্বন্তরি।।
ইহা শুনি ধন্বন্তরি এড়ে শুষ্ক বাণ। শুখাইল নদী ত্রাস পায় সর্বজন।। ৩৫
জলজন্তু যত ছিল সকলি মরিল। নদী দেখি মহাসঙ্ক সবিস্ময় হৈল।।
জীব সঞ্চারণ বাণ এড়ে সঙ্ক রায়। মহাজ্ঞানে ধন্বন্তরি কাটিয়া ফেলায়।।
নাহি জীল জলজন্তু সঙ্ক চমকিত। জল পুরাইতে বিদ্যা ক্ষেপিল ত্বরিত।।
অগ্নিবাণ এড়ে ধন্বন্তরি নিরন্তর। কাটিল সঙ্কের বিদ্যা না পুরিল জল।।
ধন্বন্তরি বলে সভে কর অবধান। পরাজয় মহাসঙ্ক দেখ বিদ্যমান।। ৪০
নিজকন্যা দান মোরে কর কুতূহলে। স্ত্রী পুত্র লইয়া তুমি যাও রসাতলে।।
সঙ্ক বলে ধন্বন্তরি হিমানদী পুর। তবে কন্যা দান দিয়া [৯]যাই নাগপুর[৯]।।
শুনি ধন্বন্তরি মনে জপে মহাজ্ঞান। সলিলে পুরিল নদী দেখে সর্বজন।।
পরাজয় পাইল সঙ্ক জিনে ধন্বন্তরি। কন্যা বিভা দিয়া সঙ্ক গেলা নাগপুরি।।
সঙ্ক জিনি সঙ্ক নাম ধরে ধন্বন্তরি। পরাভব করি সঙ্ক আছে সেই পুরী।। ৪৫
সেই সঙ্ক ধন্বন্তরি আন নৃপবর। নিমিষে নাখরা বন জিয়াইবে সত্বর।।
এতেক শুনিয়া রাজা হৈল হরষিত। গারুড়ি আনিতে দূত পাঠায় ত্বরিত।।
সত্বর গমনে দূত ধায় ত্বরাত্বরি। উপনীত হৈল যথা সঙ্ক ধন্বন্তরি।।
হিমানদী তীরে সঙ্ক শিষ্যগণ লৈয়া। নানা রস কুতূহলে আছে হৃষ্ট হৈয়া।।
হেনকালে দূত গিয়া কহে সমাচার। অবধান কর ওঝা শুন সারোদ্ধার।। ৫০
চম্পক নগরে বৈসে চাঁদ নরপতি। তাহার আদেশে তুমি চল শীঘ্রগতি।।
দূত মুখে ধন্বন্তরি শুনি বিবরণ। অবিলম্বে শিষ্য সঙ্গে করিল গমন।।
উপনীত হৈল সবে চম্পক নগর। রাজ্য সভা করি বৈসে চাঁদো দণ্ডধর।।
সম্ভ্রমে উঠিয়া রাজা পাত্রমিত্রগণ। ধন্বন্তরি আহ্বান করিল ততক্ষণ।।
কহিতে লাগিল রাজা ওঝার গোচরে। তব সম ওঝা নাই ভুবন ভিতরে।। ৫৫
মোর ভাগ্যে তুমি আসি হৈলা অধিষ্ঠান। মনসার যত কথা কহে বিদ্যমান।
বিচিত্র নাখরা দেখ প্রাণের সমান। তাহা বিনাশিয়া হরি লৈল মহাজ্ঞান।।
জ্ঞানহত শোকাকুলি আছিনু শয়নে। দেখিনু কুৎসিত [১০]সর্প[১০] মহাভয় মনে।।
নাগরূপা কন্যা এক বসিয়া শিয়রে। প্রচুর ভুজঙ্গ সঙ্গে অতি ভয়ঙ্করে।।
অধিক বাড়িল ত্রাস হইনু মূর্ছিত। ইহার উপায় ওঝা করহ ত্বরিত।। ৬০
প্রাণতুল্য নাখরা জিয়ায়্যা দেহ মোরে। তবে সে হইব স্বস্তি মোর কলেবরে।।
এতেক শুনিয়া সঙ্ক করএ গরিমা। জিয়াইব নাখরা বন ভয় নাহি তোমা।

কোথায় সুরম্য বন দেখাও [১১]আমাকারে[১১]। মহাদম্ভ রম্ভ [১২]করে অতি[১২] অহঙ্কারে।।
সঙ্ক লৈয়া গেল চাঁদ নাখরা কাননে। দেখি সঙ্ক মহাজ্ঞান জপে নিজমনে।।
আচ্ছাদিল জয়নেতো কানন উপর। নিমিষে নাখরা বন জিয়াইল সত্বর।। ৬৫
নাখরা দেখিয়া চাঁদ মহা আনন্দিত। বহুত সম্মান সঙ্কে করিল ভূষিত।।
একশত শিষ্য সদা সঙ্কের যোগান। বান্ধিয়া ছত্রিশ বানা নাগের ঝাঁপান।
তথির উপর চড়ে নাগ অভরণ। বিষম শবদ আর ঢাকের বাজন।।
সঙ্কের প্রতাপ যত দেখি মন সায়। মনে চমকিত হৈল বিপ্রদাস গায়।। ৬৯

---

১ রূপ (সু. সেন) ২ কাহারে (ঐ) ৩ করিয়া বসিল (ঐ) ৪ গৃহে (ঐ) ৫ আকাব (ঐ) ৬ সুশীল (ঐ) ৭ দ্রড় করি (ঐ) ৮ করিলা (এসো/২) ৯ যাইব সত্বর (ঐ) ১০ স্বপ্ন (ঐ) ১১ আমারে (ঐ) ১২ ওঝা (ঐ)

২
শ্রীরাগ

এথাকারে বিষহরি বসিয়া সিজুয়া গিরি
নেতোরে আনিয়া বরাবরি।
সঙ্কের প্রতাপ দেখি অতি সে চিন্তিতমুখি
নেতোরে কহেন যত্ন করি।। ৭০
হের দেখ ধন্বন্তরি অহঙ্কারে দম্ভ করি
জিয়াইল নাখরা কানন।
নাগ-অভরণ পরি নাগের ঝাপান করি
মোরে মন্দ বলে কুবচন।।
বিষম ঢাকের ধ্বনি অতি বিপরীত শুনি
স্থির নহে মোর কলেবর।
অশেষ প্রকার করি মহাজ্ঞান নিলু হরি
[১]তবু[১] হরষিত নৃপবর।।
কোপে জ্বলে বিষহরি দেখি সঙ্ক ধন্বন্তরি
সর্বাঙ্গ কম্পিত থরহরে।
মোর সঙ্গে করে বাদ জীবনের এড়ে [২]সাধ[২]
যমের সম্বাদ হৈল তারে।।
কোপে ভর করি রথে চলিলা পবন-পথে
উপনীত চম্পক নগরে।
হেনকালে ধন্বন্তরি শিষ্যগণ সঙ্গে করি
ভ্রমে ওঝা হরিষ-অন্তরে।।
[৩]সঙ্কের[৩] প্রতাপ যত নাগ দেখে তৃণাবত
গণ্ডূষ করিয়া পিয়ে বিষ।
ছয় মাসের মৃত পায় নিমিষে জিয়াইয়া দেয়
তিলেক না করে বিমরিস।। ৭৫

নাগের ঝাপানে চড়ে শিরে জয়নেত উড়ে
বাদখাড়ু করেতে ভূষণ।
মহাবুদ্ধি বিচক্ষণ নিরবধি হৃষ্ট মন
শত শিষ্য সহিত সাজন।।
স্বর্ণ জ্যোতি কলেবর রূপে গুণে বিদ্যাধর
নানা রত্ন সর্বাঙ্গে উজ্জল।
নিশিদিশি কুতূহলে ভ্রমিয়া [ভ্রমিয়া] বুলে
চৌদিগে বেষ্টিত শিষ্যদল।।
তাহা দেখি বিষহরি হৃদয় বিস্ময় করি
সিজুয়া শিখরে উপনীত।
নেতো আনি বাম পাশে নিগদে করুণাভাষে
দ্বিজ বিপ্রদাস বিরচিত।। ৭৮

১ তমু (সু. সেন) ২ সাদ (এসো/১) এ কি কব (সু. সেন)

৩
পয়ার

নেতো প্রতি বিষ-হৃদে নিগদে বিষহরি। কোথা হৈতে আইল ওঝা নাম ধন্বন্তরি।। ৭৯
নখরা জিয়ায় কত করে অহঙ্কার। তার বলে চাঁদ মন্দ বলে আনিবার।।
বিষম ঝাপান ঢাকি শিষ্য একশত। নর হৈয়া মন্দ বলে প্রাণে সহে কত।।
আচম্বিতে ধন্বন্তরি মরিবারে সাধ। আছুক অন্যের কাজ সঙ্কের সঙ্গে বাদ।।
কেমনে বধিব সঙ্ক বলহ উপায়। নেতো বলে অবধান কর মনসায়।।
মায়া পাতি সুবেশ মালিনী রূপ হৈয়া। বিবিধ সুগন্ধি পুষ্প পসার সাজিয়া।।
কালকূট গরল দারুণ হলাহল। ভেদাভেদ মহাবিষ আনহ সকল।। ৮৫
পুষ্পেতে ভরিয়া বিষ যাও তার পুরী। সেই বিষ জনে জনে মরে ধন্বন্তরি।।
নেতোর বচন শুনি অস্তিক জননী। দ্বিজ বিপ্রদাস বলে হবেন মাল্যানী।। ৮৭

৪
যথা রাগ

চাচর চিকুর কেশ চামর জিনিয়া বেশ
বিচিত্র কবরী বান্ধি তথি।
পুষ্পমালা শোভে শিরে যেন নীল গিরিবরে
আর নব বহে ভাগীরথী। ৮৮
কুসুম সঙ্কলে অলি কুটিল অলকাবলী
তেনমতে উপরে উদয়।
সীমন্তে উজ্জ্বল ছটা সুচারু সিন্দুর ফোঁটা
যেন রবি বালক-সময়।।

যাত্রা কৈলা বিষহরি তেজিয়া সিজুয়া গিরি
শিরে লৈয়া পুষ্পের পসার।
ধরিয়া [১]মাল্যানী[১] বেশ মর্ত্তপুরে পরবেশ
বধিতে গারুড়ি দুরাচার।। ৯০
পারিজাত জিনি আভা অধর সুরঙ্গ শোভা
মুক্তা জিনি দশন উজ্জ্বল। ২
অরুণ অনুজ জুতি নাসিকা বিলোল অতি
শ্রুতি মূলে মকর কুণ্ডল।।
তরলা চঞ্চলা ঠানে কটাক্ষে মদন হানে
কজ্জলে উজ্জ্বল অতিশয়।
কণ্ঠে নানা রত্নমাল সর্বাঙ্গে চন্দন তাল
বিচিত্র করুণ শঙ্খ বায়।।
অতি খিনি মাঝাখানি পরিয়া বিচিত্র [২]খুনি[২]
চলিতে হেলিয়া পড়ে বায়।
নিতম্ব আরম্ভ দম্ভ উরু গুরু রম্ভাস্তম্ভ
কিঙ্কিণীর ধ্বনি অতিশয়।।
পসার করিয়া মাথে যায় পদ্মা রাজপথে
দেখি লোক হইল মূর্ছিত।
মায়ায় সুবেশ ধরি চলি যায় বিষহরি
দ্বিজ বিপ্রদাস বিরচিত।। ৯৪

১ মালিনী (সু. সেন) ২ খনি (সু. সেন—ভুল পাঠ)

৫

সুহি

কালকূট গরল সকল পুষ্পে দিয়া। ভেদ-অভেদ বিষ পসার করিয়া।। ৯৫
প্রবেশি সঙ্কের পুরী সানন্দিত মনে। প্রকারে সঙ্কের কত বধে পুরী জনে।।
কুসুমের সমীরণ কত দূরে যায়। তরুলতা ভস্ম হৈয়া উড়িয়া পলায়।।
মনসার মায়া-কার্য বিবাদ-কারণ। সংসার এড়িয়া বধে ধন্বন্তরিগণ।।
ভ্রমিলা সকল রাজ্য চম্পক-নগরী। সঙ্কের উদ্দিশে [১]যান[১] রাজ্য অন্তপুরী।।
হেনকালে শিষ্যগণ ভ্রমে কুতূহলে দেখিয়া প্রবীণ তরু বৈসে তার মূলে। ১০০
সেইখানে পদ্মাবতী হৈলা উপনীত। পসার [২]ওলায়ে[২] তথা বৈসে হরষিত।।
দেবীর সুবেশ দেখি মোহে সর্বজন। জিজ্ঞাসা করয়ে সভে কারণ-বচন।।
কোন জাতি কোথা ঘর কিসের পসার। একাকিনী এইরূপে কোথা আগুসার।।
হাসিয়া মনসা বলে [৩]মায়ার[৩] বচন। চিরকাল করি ঘর নগর-কাঞ্চন।।
হইতো মাল্যানি এই পুষ্পের পসার। বিচিবারে কুসুম আমার অনুসার।। ১০৫
তবে সর্বজন বলে শুনহ মাল্যানি। মূল্য বল কেমন তোমার পুষ্প কিনি।।
শুনিয়া মনসা বলে ভাবিয়া অন্তরে। সঙ্কের বিবাদে পাছে এইসব মরে।।

কপট প্রবন্ধে বলে ওলায়্যা চুপড়ি। [৪]পোণেকের[৪] ফুল বলে চারি পণ কড়ি।।
শুনিয়া বলয়ে সবে কপট মাল্যানি। এমত পুষ্পের মূল্য কভু নাহি শুনি।।
হরিষে মনসা তবে পসার তুলিয়া। চলিলা সঙ্কের পুরী আনন্দিত হৈয়া।। ১১০
কথো দূরে দেখি গিয়া দিব্য সরোবর। পসার ওলায়্যা তথা বসিলা সত্বর।।
দ্বিজ বিপ্রদাস করি পদ্মা গুণ গায়। [৫]মনসা মাথায় হৈতে পসার ওলায়[৫]।। ১১২

১ জায় (সু. সেন) ২ লইয়া (এসো/১) এ মায়ায় (ঐ) ৪ পশেকের (সু. সেন—ছাপার ভুল হতে পারে)
৫ ভকত জনেরে দেবী হইবে সদয়।।

৬
কামদ রাগ

বিচিত্র সরোবর অতি সে মনোহর
সুরম্য [১]তরুবর[১] তলে।
মনসা মাথায় হৈতে পসার ওলাইতে
শতেক শিষ্য হেনকালে।। ১১৩
চাঁদোর বিসম্বাদে তথায় অনুরোধে
বসিলা সুখে বিষহরি।
কুসুমে বিষ দিয়া পসার [২]বিরচিয়া[২]
বধিতে সঙ্ক ধন্বন্তরি।।
শতেক শিষ্যগণ মদন রূপে যেন
বদন পূর্ণ শশধর।
কেজুর হার সাজে নূপুর পদে বাজে
সর্বাঙ্গে নানা অলঙ্কার।। ১১৫
জিনিয়া স্বর্ণজ্যোতি শরীর দিব্যভাতি
প্রবেশ সরোবর তীরে।
মনসা-রূপ দেখি সকলে কৌতুকী
নেহালে প্রমোদ শরীরে।।
মনসা মনে গুণি এই যে সঙ্ক মুনি
জানিনু সত্য আন নহে।
বধিয়া ধন্বন্তরি যাইব [৩]আপন[৩] পুরী
পূজিব চাঁদো মহাশয়।।
সঙ্কের শিষ্য যত কুসুম [৪]মুলায়ত[৪]
শুন গো [৫]মাল্যানি[৫] ধনি।
কিনিব পুষ্প তব কতেক কড়ি দিব
স্বরূপ বলহ শুনি।।
লজ্জিত মনসায় কাণ্ডার মূল্য কয়
শুনিয়া কোপে সুকুমার।

সকলে যুক্তি করি মালিনী একেশ্বরী
লুটিব পুষ্পের পসার।।
কুবুদ্ধি শিষ্য পায় লুটিয়া পুষ্প লয়
হাসেন শ্রীমনসায়।
ভাবিয়া বিষহরি চরণ হৃদে করি
বিপ্রদাস সবিনয়।। ১২০

১ তরুর (এসো/১) ২ বিচারিয়া (ঐ) ৩ নিজ (সু সেন) ৪ মেলায়ত (এসো) ৫ মালিনী (সু. সেন) বল সুবদনী (ঐ)

৭

শ্রীরাগ

শতেক কুমার ঢলে মনসা পসার তোলে
অন্তরীক্ষে রহিলা সত্বর।
হেনকালে ধন্বন্তরি ধনা মনা সঙ্গে করি
আইসে ওঝা ভ্রমিতে নগর।। ১২১
তাহা দেখি বিষহরি হৃদয়ে বিস্ময় করি
মায়া পাতি রহিলা ত্রিপথে।
নানা মায়ারূপ ধরি কপট ক্রন্দন করি
নিবেদিল সঙ্কের অগ্রেতে।।[১]

নিগদন্তি মায়ার প্রকার।
কি আর কহিব কথা কোনো ধর্ম নাহি এথা
দেখিনু বড়ই দুরাচার।।
লোকমুখে শুনি বাণী চম্পক-নগর ধনি
আইনু[২] নানা দুঃখ পাইয়া।
সরোবর-তীর দেখি মনেতে হইনু সুখী
পসার এড়িনু বিরচিয়া।।
আসিয়া শতেক জন বলে মোরে কুবচন
লুটিলেক পুষ্পের পসার।
তারা একশত মেলি আমি ত একলা নারী
ভাগ্যে জাতি রহিল আমার।। ১২৫
দেবীর কপট মায়া ধন্বন্তরি না বুঝিয়া
আশ্বাসিয়া বলয়ে গারুড়ি।
[৩]যার[৩] এত দোষ হয় আমি ফল দিব তায়
প্রবোধ করিয়া দিব কড়ি।।
সান্ত্বনা করিয়া যায় অন্তরীক্ষ দেবী হয়
প্রবেশিল সরোবর-তীরে।

শতেক কুমার মৃত দেখি অতি সবিস্মিত
ক্রোধ হৈল ওঝার শরীরে।।
বলে ওঝা গুণমণি ছলিয়া পলাইল কানি
বধিয়া শতেক শিষ্যগণ।
বিবাদ করিতে আইল পলাইয়া [৪]কেনে[৪] গেল
শিশুগণ বধে কি কারণ।।
শিরে জয়নেত ছিল তুরিতে বাড়ায়্যা দিল
ধনা মনা ধরে [৫]দুই পাশ[৫]।
শতেক কুমার জীল মনসা তরাস পাইল
সুকবি রচিল বিপ্রদাস।। ১২৯

১ ধুয়া (এসো/১) ২ তেঞি (সু সেন—পাঠের সংযোজন) ৩ জবে (সু সেন) ৪ কেশ (ঐ) ৫ দুপাশ (এসো/১)

৮

পয়ার

শিষ্যগণ দেখিয়া জিজ্ঞাসে ধন্বন্তরি। করজোড়ে বলে তারা গুরু বরাবরি।। ১৩০
আইল মালিনী [১]পুষ্পে[১] রচিয়া পসার। কিনিবার হেতু পুষ্প মুলাইনু তার।।
কাণ্ডার অসংখ্য মূল্য বলিল আপার। অনুমান করি সভে লুটিনু পসার।।
সেই পুষ্প পরিয়া ঢলিল সর্বজন। নিশ্চয় জানিল ওঝা [২]বিষের[২] কারণ।।
[৩]চাঁদোরাজা[৩] স্থানে গিয়া দিলা দরশন। কহিলা পদ্মার কথা যতেক কারণ।।
বিষ দিয়া বধিলেক [৪]শতেক[৪] কুমারে। ঢলিয়া পড়িয়া ছিল সরোবর তীরে।। ১৩৫
জিয়াইনু নিমিখে নেতের পরশনে। পলাইয়া গেল কানি ভয় পায়্যা মনে।।
শুনি কোপে ধর ধর ডাকে নৃপমণি। কোথা যায় তুরিতে ধরিয়া দেহ কানি।।
চারি ভিতে ঠাট [৫]পাত্য[৫] মাঝে ভূমণ্ডল। পাত্রমিত্র বলে রাজা নহিয় চঞ্চল।।
রথে ভর করি গেলা মনসা কুমারী। কেমতে তাহার লাগ পাবে অধিকারী।।
এথায় মনসা গেলা আপনার স্থানে। কহিলা সকল কথা নেতো বিদ্যমানে।। ১৪০
বধিনু শতেক শিষ্য পুষ্পে বিষ দিয়া। [৬]নিমিষেতে[৬] ধন্বন্তরি জিয়ায় আসিয়া।।
দুষ্ট নষ্ট কটু ভাষা বৈল অবিচারে। ধন্বন্তরি [৭]বধিব[৭] কেমন পরকারে।।
[নেতো বলে পদ্মাবতী শুনহ বচন। না করহ দুঃখ চিন্তা স্থির কর মন।।
গোয়ালিনী রূপ ধর নামেতে কমলা। সঙ্কের রমণী সঙ্গে পাতহ সহেলা।।
খুড়ি রূপ হৈয়া আমি লইব পসারে। মহাজ্ঞান হরি সঙ্কে বধহ প্রকারে।।[৮]] ১৪৫
পদ্মাবতী হরষিত জানি বিবরণ। গোয়ালিনী রূপ ধরে জগৎমোহন।।
ত্রৈলোক্য মোহন রূপ ধরে মনসায়। দ্বিজ বিপ্রদাস বলে মনসার পায়।। ১৪৭

১ পুষ্প (সু. সেন) ২ বিশেষ (এসো/১) ৩ চাঁদো রাজা (ঐ) ৪ জতেক (সু. সেন) ৫ পাচে (ঐ ; অর্থ?)
৬ নিমিকেতে (এসো/১) ৭ বধিলেক (সু. সেন, ভুলপাঠ) ৮ (নেই—এসো/১)

৯

সিন্ধুড়া রাগ

সস্থল কমল চরণ শীতল
কোমল সুন্দর অতি।
[১]সুবর্ণ[১] পাসুলি শোভয়ে অঙ্গুলি
কি দিব তুলনা তথি।। ১৪৮
মুখর মঞ্জীর নিনাদ গভীর
রুণুঝুনু ঘন বাজে।
জিনি রম্ভাতরু উরুযুগ চারু
নিবিড় নিতম্ব সাজে।।
করি-ঐরি জিনি অতি মাঝা খিনি
[২]মন্দ মন্দ বাতে[২] হেলি।
বর্তুল আকার স্থূল পয়োধর
কনক কমল কলি।। ১৫০
মৃণাল অখণ্ড জিনি ভুজদণ্ড
অঙ্গুলি সুন্দর ভাতি।
তাহে পরিপাটী কঙ্কণ [৩]বাউটি[৩]
গুঞ্জরা পঁইছা পাতি।।
নানা অলঙ্কার শোভিছে সুসার
কতেক বলিতে পারি।
রত্ন-মণিময় দীপ্ত অতিশয়
প্রতি অঙ্গে সারি সারি।।
বিচিত্র কেজুর কণ্ঠে দোলে হার
বিজুলি চমকে অঙ্গে।
বধূলোভে অলি প্রেমেতে আকুলি
সঘনে ধাওত রঙ্গে।।
পূর্ণ শশধর নির্মল সুন্দর
কমল বদনখানি।
তাহে ঘর্মবিন্দু যেন সুধা [৪]ইন্দু[৪]
চকোর ধাওত জানি।।
বিম্ব ফল জিনি অধর [৫]দুখানি[৫]
তাহে মন্দ মন্দ হাসি।
যেন তিলফুল নাসিকা বিলোল
বাক্য যেন সুধারাশি। ১৫৫
কুরঙ্গ-নয়ানী কামধ[illegible]
ভুরুযুগ অতি শোভা।
ললাটে সিন্দুর উজ্জ্বল প্রচুর
দীপ্ত যেন রবি-আভা।।

অলক-তিলক চন্দনের রেখ
কজ্জলে উজ্জ্বল আঁখি।
যেন ধায় রাহু [৬]পসারিয়া[৬] বাহু
দিবাকর-শশী দেখি।।
চাঁচর চিকুর দীঘল প্রচুর
বিচিত্র বন্ধন ছাঁদে।
সুগন্ধি কুসুম অতি অনুপাম
মাল্য বেড়া কতো ছাঁদে।।
পট্ট চীর পরি ত্রৈলোক্য সুন্দরী
তুলনা কি দিব কারে।
দেখি সুরাসুর সিদ্ধি মুনিবর
প্রাণ ধরিবারে নারে।।
মকর কুণ্ডল কর্ণে ঝলমল
জ্বলন্ত আগুনি সম।
দেবী বিষহরি মায়ারূপ ধরি
নেতো-সঙ্গে অনুপাম।। ১৬০
নেতোর মস্তকে পসার কৌতুকে
আগে চলে পদ্মাবতী।
পড়ি ভবদহে বিপ্রদাস কহে
অন্তে পদ্মা-পদ গতি।। ১৬১

১ স্বর্ণ (এসো/১) ২ মন্দ বাতে পড়ে (সু. সেন) ৩ বাহুটী (ঐ) ৪ কুম্ভ (এসো/১) ৫ মুখানি (ঐ) ৬ প্রসারিয়া (ঐ)

১০

রাগ বেহাগ

তেজিয়া সিজুয়া গিরি নেতো পদ্মাবতী। মর্ত্যপুরে দরশন দিলা শীঘ্রগতি।। ১৬২
পাছে নেতো আগে চলে মনসাকুমারী। ভ্রমিতে ভ্রমিতে রঙ্গে নগর আওয়ারি।।
চম্পক নগর দুহে হৈলা উপনীত। সকল [১]নগর[১] ভ্রমে অতি হরষিত।।
যথায় সন্ধের পুরী কমলাসুন্দরী। দধি দুগ্ধ কে লইবে ডাকে উচ্চ করি।। ১৬৫
বচন অমৃতকণা কোকিলের ধ্বনি। শুনিয়া সম্ভ্রমে ধাএ কমলা রমণী।।
দেখিয়া পদ্মার রূপ মূর্ছিত হইয়া। নিরক্ষিয়া একমনে দেখে দাঁড়াইয়া।
দ্রবিদ কমলা ধনি হরিল গেয়ান। হাসিয়া মনসা কিছু কহে সম্বিধান।।
দধি মূল্য না কর দাঁড়াইল কি কারণ। [২]নিবা কিনা নিবা দধি বলহ বচন।।[২]
কমলা বলেন হের শুন গোয়ালিনী। উচিত দধির মূল্য বল কত শুনি।। ১৭০
মায়া পাতি বলে দেবী অস্তিক-জননী। পঞ্চাশ কাহন কড়ি মোর দধিখানি।।
ঈষত হাসিয়া বলে সন্ধের রমণী। এমত দধির মূল্য কভু নাহি শুনি।।

না [৩]লিব[৩] তোমার দধি ভ্রম মায়াবেশে। দধি-ছলে ভ্রম কিবা রতির হাব্যাসে।।
বুঝিনু চরিত্র [৪]তোর[৪] চল লো রূপসী। দধি-ছলে মায়াবেশে নগর ভ্রমসি।।
হইয়া [৫]আহিরি[৫] তোর কুলটা বেভার। অন্য স্থানে হৈলে তোর [৬]লুটিএ[৬] পসার।। ১৭৫
অসম্ভব হেন বাক্য কহসি রমণী। নারিব কিনিতে দধি চল সুবদনী।।
শুনি মায়া পাতি দেবী বলে অহঙ্কারে। আপনা চিনিয়া মন্দ না বলহ মোরে।।
যদবধি ধন্বন্তরি আছয়ে নগরে। কে মোর পসার এথা লুড়িবারে পারে।।
শুনিয়া কমলা ধনি হাসিয়া বিকল। আমার প্রভুর গর্ব করসি সকল।।
তবে কেন গোয়ালিনী কর অহঙ্কার। মায়া পাতি পদ্মাবতী বলে পুনর্বার।। ১৮০
আমি ত না জানি তুমি সঙ্কের রমণী। অহঙ্কারে কৈলু দোষ ক্ষেম সুবদনী।।
দধি লহ সুখে তুমি প্রসন্নবদনে। দেহ বা না দেহ কড়ি যেবা লয় মনে।।
হাসিয়া কমলা তারে জিজ্ঞাসে বারতা। কি নাম কাহার সুতা [৭]নিবসহ[৭] কোথা।।
মনসা বলেন হাসি মায়ার প্রকার। মহেশ্বর ঘোষ নাম জনক আমার।।
কমলা আমার নাম গৌরী জননী। এই ত আমার খুড়ি বৃদ্ধ গোয়ালিনী।। ১৮৫
নিজ নাম কমলা শুনিয়া কুতূহলে। সহি সহি বলিয়া মনসা কৈল কোলে।।
সহেলা করিব দুহে সানন্দ বদনে। নানা দ্রব্য আনিয়া আনিল [৮]আইয়গণে[৮]।।
নানা দ্রব্য গন্ধপুষ্প আনিল কমলা। পরম সানন্দে দুহে করিল সহেলা।।
আপদ সঞ্চার কৈল কমলা রমণী। নিশ্চয় জানিহ মৈল ওঝা গুণমণি।।[৯]
কাল সম বৈসে দেবী সঙ্কের মন্দিরে। দ্বিজ বিপ্রদাস বলে মনসার বরে।। ১৯০

---

১ নগরে (এসো/১) ২ নিবা বা না নিবা এক বলহ বচন (সু. সেন) ৩ নিব (ঐ) ৪ তব (ঐ) ৫ আভিরি (এসো/১) ৬ লোটএ (সু. সেন) ৭ নিবাসহ (এসো/১) ৮ আয়ো গণে (ঐ) ৯ এসো/১ নতুন পত্র (৪৩) সূচনায় 'শ্রীশ্রী দুর্গা' লেখা সেইসঙ্গে 'নিশ্চয় জানিহ মৈল ওঝা গুণমণি' পংক্তিটি লেখা হয়েছে।

১১

[১]ধানসী[১]

দিয়া নানা দ্রব্য তুষি আইয় সর্ব
দুই সহি হৃষ্ট বৈসে।
হেনকালে ওঝা পাঠাইয়া রাজা
নিজ পুরী পরবেশে। ১৯১
কটাক্ষ [২]নয়নে[২] কামবাণ হানে
ভেদিলেক ধন্বন্তরি।
কাতর হইয়া পুছে নিজ জায়া
মন্দিরে কাহার নারী।।
কহে গুণমণি শুন প্রাণধনি
বাক্য সম্বোধহ মোএ।
ঘরে কার নারী অতিসে সুন্দরী
কি জাতি বৈসে কোথায়।।

চাচর চিকুর জিনিয়া চামর
[৩]প্রবন্ধ নানা[৩] ছান্দে।
বকুল মালতী নানা পুষ্প তথি
ধায়ে মধুকর গন্ধে।।
কামধনু যেন ভুরু-যুগ তেন
কটাক্ষে বিন্ধিল শর।
আমার হৃদয় হানে অতিশয়
কলেবর জরজর।। ১৯৫
সঙ্ক যত দেখে বস্ত্র দিয়া মুখে
হাসি বলে পদ্মাবতী।
নেতো বামপাশে লুকাইয়া ভাষে
[৪]হুই[৪] আভিরী যুবতী।।
বৈসি কাণ্ঠী গ্রাম কমলা যে নাম
দধি বিক্রি আইনু এথা।
পায়্যা তব নারী রাখি যত্ন করি
সহেলা করিল তথা।।
অধিক অনঙ্গ বাড়িল তরঙ্গ
বেয়াকুল ধন্বন্তরি।
বিপ্রদাস ভণে পদ্মার চরণে
অবিরত শিরে ধরি।। ১৯৮

১ ধানসী রাগ (সু. সেন) ২ নয়নে (ঐ) ৩ প্রবন্ধ নানা (ঐ) ৪ হইয়া (এসো/১)

১২

পয়ার

শুনিয়া যুবতী-বাক্য সানন্দিত মন। রন্ধন ভোজন হেতু দিল আয়োজন।। ১৯৯
আজি এথা বঞ্চি সানন্দে যাইয় কালি। শুনিয়া প্রবন্ধ করি বলে পদ্মা বালি।।
অতি খরতর মোর স্বামী দুরাচার। আজি যদি বঞ্চি [১]শাস্তি করিব[১] আমার।।
সঙ্ক বলে কোন কার্যে এত ভয় ভব। দাস-মত তব স্বামী করাইয়া দিব।।
হেন কালে মনসা করিলা মায়া সৃষ্টি। আশ্চম্বিতে তথায় হইল ঝড় বিষ্টি।।
মন্দিরে যাইতে পদ্মা করে অনুমান। আসিয়া কমলা তাঁরে কহে সম্বিধান।।
[২]সহেয়ার[২] হাব্যাস যদি বাড়ে তব মনে। রঙ্গে নিশি বঞ্চিহ আমার স্বামী সনে।। ২০৫
মায়া পাতি কৈল দেবী রন্ধন ভোজন। দিবা গত রজনী হইল [৩]প্রত্যাসন[৩]।।
কমলা সুন্দরী ঘরে করিল রন্ধন। আনন্দে সকল পুরী করিল ভোজন।।
গমন করিল ওঝা শয়ন মন্দিরে। শয়ন করিল দিব্য শয্যার উপরে।।
সহির যতেক রূপ ভাবিতে হৃদয়ে। মদনে পীড়িত হৈল কামে প্রাণ দহে।।
ওথায় কমলা পদ্মা বসি দুইজন। হরসিত পুগ পূর্ণ করয়ে [৩]ভক্ষণ[৩]।। ২১০

পদ্মা বলে শুন সহি করি পরিহার। তব স্বামী হেন ওঝা নাহিক সংসার।।
শুন শুন আগো সহি করহ প্রসাদ। শিখিব তোমার বিদ্যা মনে বড় সাধ।।
প্রাণের সমান তুমি সএয়ার বনিতা। তন্ত্রে মন্ত্রে সর্বগুণে তুমি সাবহিতা।।
তার কিছু কিছু বিদ্যা শিখাও আমারে। দাসীরূপ হৈয়া সেবা করিব তোমারে।।
কমলা বলেন আমি কিছুই না জানি। পদ্মা বলে আলো সহি আমা ভণ্ড কেনি।। ২১৫
বিনয় কমলা সত্য করে পদ্মা ঠাঞি। আপনার সব দি যদি তোমারে ভাঁড়াই।।
নাসিকা পরশি পদ্মা বিষাদ বদনে। তোমা হেন অবুধিনী নাহি ত্রিভুবনে।।
আমি (হ) বুঝাই তোমা না-করিহ হেলা। মনসা পাতেন মায়া মোহিত কমলা।।
শুন শুন আরে সই বুঝাই তোমাকে। শিখিহ সয়ার বিদ্যা যতন পূর্বকে।।
কাল সর্প লইয়া [৪]সখা[৪] ভ্রমে সর্বক্ষণ। অবশ্য সখার আছে আপদ লক্ষণ।। ২২০
শিষ্যবর্গ দেখ যত সম্পদ সময়। আপদ পড়িলে সহি কেহ কারো নয়।।
আপনি জানিলে হয় প্রমাদে নিস্তার। যতন পূর্বকে তোমা বুঝাই প্রকার।।
কোন সর্প খাইলে হয় সখার মরণ। কোন স্থানে খাইলে কোন ঔষধ তারণ।।
যতন করিয়া সহি [৫]শিখিহ[৫] সকল। এত সব মর্ম কথা [৬]তোমায়ে[৬] কুশল।।
কমলার মন তবে হরষিত হৈল। প্রভুর মন্দিরে যাইতে নানা বেশ কৈল।। ২২৫
বিচিত্র বসন রামা কৈল পরিধান। নানা রত্ন অলঙ্কার সঙ্গে দীপ্তমান।।
কর্পূর তাম্বুল আদি পুরিয়া বদনে। চলিল প্রভুর পাশে হরষিত মনে।।
খট্টায় বসিল রামা ঈষত হাসিয়া। সেই ঘরে গেলা পদ্মা অন্তরীক্ষ হৈয়া।।
দাম্পত্য আনন্দ দেখি ভাবিল বিধান। মনসা হানিল সঙ্কে মদনের বাণ।।
কামে হত জ্ঞান সঙ্ক কমলারে বলে। আইস প্রিয়ে রতিসুখ ভুঞ্জি কুতূহলে।। ২৩০
কমলা কুবুদ্ধি লৈয়া দিলা হেন কালে। বিধির নির্বন্ধ আসি ঘটে সেই ফলে।।
বুঝাইল পদ্মা যত কমলার প্রতি। প্রভু চাহি কহে রামা গদ গদ স্তুতি।।[৭]
স্থির হও মহাশয় শুনহ উত্তর। এক নিবেদন করি তোমার গোচর।।
তুমি ওঝা [৮]গুণবন্ত[৮] বিদিত সংসারে। বহুগুণ আছে প্রভু তোমার শরীরে।
তার কিছু কিছু বিদ্যা শিখাও আমাকে। শুন প্রভু গুণমণি বুঝাই তোমাকে।। ২৩৫
আর এক কথা প্রভু জানিহ নিশ্চয়। আপদে বনিতা বিনা নাহিক সহায়।।
কোন সর্পে খাইলে হয়ে তোমার মরণ। কোন স্থানে খাইলে কিবা ঔষধ তারণ।।
শিষ্যগণ দেখ যত সম্পদ-সময়। আপদ পড়িলে প্রভু কেহ কারো নয়।।
ধন্বন্তরি বলে তব কুবুদ্ধি সঞ্চার। এত সব মর্ম কথা কি দায় তোমার।।
রাজস্থানে পুরাণে শুনিল যথা [৯]তথা[৯]। কদাচিত না কহিব স্ত্রীরে মর্ম কথা।। ২৪০
শুনি সঙ্কে গঞ্জিয়া কমলা বলে বাণী। একই শরীরে ভেদ কোথাও না [১০]শুনি[১০]।।
যদি বা দাম্পত্য-ভেদ পিরিতি তোমার। তবে কিবা রতিসুখ পিরিতি আমার।।
শুনি অধোমুখ সঙ্ক ভাবি মনে মনে। সঙ্কেরে কুবুদ্ধি পদ্মা দিলা ততক্ষণে।।
কাম বাণে বুদ্ধিহত সঙ্কের হৃদয়। আপনার মর্মকথা কমলারে কয়।।
দৈব লাগিল সঙ্কে আপদ-লক্ষণ। পদ্মা-পদে দ্বিজ বিপ্রদাস বিরচন।। ২৪৫

১ এথা বধিব (এসো/১) ২ সয়ার (ঐ) ৩ ভোজন (ঐ) ৪ সয়া (ঐ) ৫ শিখহ (ঐ) ৬ তোমারি (ঐ)
৭ 'শ্রীশ্রী দুর্গাচরণ'—পাদপূরক হিসাবে লেখা—(এসো/১) ৮ গুণমন্ত (এসো/১) ৯ যথা (ঐ)

১৩

ত্রিপদী

মর্ম কহে সঙ্ক-রায় কুবুদ্ধি সঞ্চারে তায়
শুন [১]প্রিয়ে[১] আমার বচন।
প্রাণের অধিক তুমি সেই তত্ত্ব কহি আমি
মন দিয়া শুনহ কারণ।। ২৪৬
জয়নেত সিদ্ধিঝুলি যদি হরে পদ্মা বালি
উদয়কাল খায় বক্ষস্থলে।
আপনি মনসা যদি [২]ভার[২] হানে নিরবধি
তবে ওঝা ধন্বন্তরি চলে।।
হরি হরি কুবুদ্ধি পাইল ধন্বন্তরি।
মনের মরম-বাণী নারীরে কহিল জানি
শুনিয়া হাসেন বিষহরি।।
আছে তার প্রতিকার শুন লো বিশেষ তার
ঔষধের শুন লো অবধি।
ধনা মনা যায় ধার্যা গন্ধমাদনে গিয়া
সালিবিসালি আনে যদি।।
সমুদ্রের ফেনা আর ঘা-মুখে দিবেক মোর
তবে রক্ষা করিব গোসাঞি।
না পায় ঔষধসিদ্ধি ব্রহ্মা বিষ্ণু আইসে যদি
তবু মোর প্রাণরক্ষা নাই।। ২৫০
না শুনিহ যত্ন করি শুনে পাছে বিষহরি
তবে আমি হারাব জীবন।
শুনিয়া সঙ্কের কথা হাসেন হরের সুতা
দ্বিজ বিপ্রদাস সুরচন।। ২৫১

১ প্রিয়া (সু. সেন) ২ তায় (ঐ)

১৪

পয়ার

ছলিয়া পিরিতি রতি দাম্পত্য-রমণ। যেন রতি কামদেব মিলিল [১]দুজন[১]।। ২৫২
ওথায় মনসা নেতো ভাবিয়া বিশেষে। চিন্তিয়া উদয়কালে আনিলা নিমিষে।।
কোলে নাগ লৈয়া দেবী বুঝান প্রকার। সঙ্কের প্রতাপে চাঁদো করে অহঙ্কার।।
সদাই নিন্দিত গালি পাড়এ আমারে। কতেক সহিব প্রাণে শুন নাগবরে।। ২৫৫
সঙ্কের ললাটে আছে এমন লিখন। বক্ষস্থলে তুমি খাইলে [২]হয়[২] ত মরণ।।
সঙ্ক মৈলে চাঁদো-রাজার পূজা [৩]লৈতে[৩] পারি। তুমি ত দংশিয়া মোরে দেহ ধন্বন্তরি।।
নাগ বলে আমি খাইলে [৪]হয়[৪]ত মরণ। কোন কর্ম এই সঙ্কে বধিব এখন।।
কাল নিদ্রা যায় সঙ্ক নিশ্চিন্দ শরীরে। পূর্ণিমার চন্দ্র যেন উদয়শিখরে।।

সঙ্কের মন্দিরে নাগ গেল হেন কালে। শিয়রে বসিয়া নাগ বদন নেহালে।। ২৬০
দেখিয়া ব্যথিত নাগ দুঃখ ভাবে বনে। হেন রূপগুণ ওঝা বধিব কেমনে।।
আজি হৈতে সঙ্কের হইল শূন্য পুরী। কেমনে জীবেক প্রিয়ে কমলাসুন্দরী।।
ভাবিতে চিন্তিতে দুঃখ মুখে নাহি রা। কেমন প্রকারে দিব দশনের ঘা।।
নাগেরে বাড়িল কোপ অস্তীক-জননী। আশ্চম্বিতে হৈল তথা অন্তরীক্ষ-বাণী।।
মোর নিন্দা করে সঙ্ক অই পাপমতি। ঝাট বধ কর কেন করহ [৩]মমতি[৩]।। ২৬৫
শুনিয়া সভয় নাগ হৈল ক্রোধমুখি। লোকধর্ম চন্দ্র সূর্য সভে [৭]হৈয়ে[৭] সাক্ষি।।
অহঙ্কারে আমার ঈশ্বরী নিন্দা করে। মোর দোষ নাহি ওঝা আত্মদম্ভে মরে।।
নির্ঘাত কামড় নাগ [৮]লয়[৮] বক্ষস্থলে। মহাভয় পাইয়া সঙ্ক সত্বরে গা তোলে।।
জয়নেত সিদ্ধিঝুলি উদয়কাল লৈয়া। চলিল মনসা সঙ্কে দারুণ ভারিয়া।।
জয়নেত সিদ্ধিঝুলি চাহিয়া না পায়। মৃত্যু উপসন্ন সঙ্ক জানিল নিশ্চয়।।
দারুণ হতাশে সঙ্ক ছাড়িল নিঃশ্বাস। মনসামঙ্গল গীত বলে বিপ্রদাস।। ২৭১

---

১ সঘন (সু সেন) ২ হয়ে (ঐ) ৩ নিজে (এসো/১), ৪ হযে (ঐ) ৫ নাই (ঐ) ৬ মামতি (ঐ) ৭ হইয (সু সেন) ৮ লইল (ঐ)

১৫

কৌ রাগ

দংশি ওঝা ধন্বন্তরি পবনেতে ভর করি
ঝাটো নাগ করিল গমনে।
হৃদয়ে বেদনা পায়্যা অতিশয় ত্রাস হৈয়া
বৈসে ওঝা গরুড়-আসনে।। ২৭২
প্রাণেতে নৈরাশ হৈয়া [১]চিয়ায়[১] প্রাণের জায়া
নিদ্রাভঙ্গ করাএ চেতন।
চিয় চিয় সুবদনী প্রমাদ-লক্ষণ জানি
দৈবযোগে হারানু জীবন।।
চিয় চিয় কমলা রমণী।
মোর কর্মে দৈবফলে দংশিল উদয়কালে
আজি সে মরণ হৈল জানি।।
মোরে বিড়ম্বিল বিধি হরিল সকল বুদ্ধি
মহাজ্ঞান কহিল তোমারে।
গোয়ালিনী রূপ ধরি সায়া পাতি বিষহরি
মোরে বধ করিল প্রকারে।। ২৭৫
জয়নেত সিদ্ধঝুলি তাহা লৈয়া গেল ছলি
দংশিলেক নাগ উদয়কালে।
ভারিলেক মনসায় এই বিষ জ্বলে গায়
সহিতে না পারি [২]বিষ জ্বালে[২]।।

তখনি জানিনু চিতে নিষেধিনু বিধিমতে
না শুনিলে আমার বচন।
কুবুদ্ধি লাগিল তোরে মনসা আসিয়া ঘরে
মজাইলা আমার জীবন।।
[৩]ডাক[৩] ধনা মনা শিষ্য সর্বাঙ্গে ভ্রময়ে বিষ
বলে সঙ্ক হইয়া কাতর।
গন্ধমাদনে গিয়া ঔষধ আনুক ধায়্যা
তবে রক্ষা পায় প্রাণেশ্বর।।
অনুগত জন ধায়্যা ধনা মনা [৪]আনে[৪] গিয়া
আইল সকল শিষ্যগণ।
কান্দে ওঝা ধন্বন্তরি প্রমাদ পড়িল পুরী
দ্বিজ বিপ্রদাস সুরচন ।। ২৭৯

১ চিয়াএ (সু. সেন) ২ বিষজ্বলে (এসো/১) ৩ ডাকে (ঐ) ৪ আনি (সু. সেন)

১৬
পয়ার

কমলা বলয়ে প্রভু শুন গুণধাম। নিজ মনে মহাজ্ঞান চিন্ত অবিরাম। ২৮০
খড়্গা ভেদিয়া বিষ গগন-[১]শিখর[১]। ঈঙ্গলা পিঙ্গলা চিন্ত সমুদ্র [২]ভিতর[২]।।
কেনি প্রাণনাথ হেরো আপনা পাসর। [৩]মন পবনেতে জীব[৩] পরিচয় কর।।
কিন্তু সেই সুক্ষ মুক্ষ [৪]অচিন্ত্য[৪] অমল। নহে ছোট বড় দৃঢ় নহে ত কোমল।।
অহর্নিশ খসে রস কিছুই না টুটে। কোমল নবনি হেন বজ্র নাহি ফুটে।।
দশমী দুয়ার প্রভু খসাও কপাট। [৫]আসুক[৫] পবন হংস ভ্রমুক সুবাট।। ২৮৫
নিজ বাটে পুনরপি যাউক স্বস্থান। যথায়ে কমল ভৃঙ্গ করে মধুপান।
উজানে উপান্তে বায়ু বুলো অকুঞ্চনে। চন্দ্রসূর্য সমরস হউক এখনে।।
ভুরু-মধ্যে দৃষ্টিরস হউক নিশ্চয়। মনসা-চরণে বিপ্রদাস গায়।। ২৮৮

---

১ শিখরে (সু. সেন) ২ ভিতরে (ঐ) ৩ মনপবনে আনি (এসো/১) ৪ আ চিন্ত (সু. সেন) ৫ আছুক (এসো/১)

১৭
কেদার

সঙ্ক বলে আরে পুত শুন ধনা মনা। আজি সে [১]মজিলু[১] আমি বিধির ঘটনা।। ২৮৯
মায়া পাতি পদ্মাবতী গোয়ালিনী হৈয়া। কমলা সহেলো কৈল মায়ায় মোহিয়া।।
মর্মকথা কহিলাম প্রিয়ার গোচর। তখনি কহিল গিয়া দেবী বরাবর।।
শুন পুত্র ধনা মনা প্রাণের সোসর। হেন বিপত্তের কালে প্রাণরক্ষা কর।।
গন্ধমাদনে যাও ঔষধ কারণে। শীঘ্র গতি নড় [২]সভে[২] পবন গমনে।।
এই মত আছে মোর ললাটে লিখন। বক্ষস্থলে উদয়কালে করিব দংশন।।

আপনি মনসা যদি মহাভার মারি। জয়নেত সিদ্ধি ঝুলি হরে বিষহরি।। ২৯৫
সেই মত হৈল মোর নাহিক নিস্তার। হিত মধ্যে সবে একে আছে প্রতিকার।।
সালি বিসালি গাছ ঝাটো আন গিয়া। প্রাণ বাখ ঘা মুখে দেহ ত বাটিয়া।।
ধনা মনা বলে গুরু শুন এক বাণী। কেমন গাছের ফল আমি নাহি জানি।।
সঙ্ক বলে ঝাটো লও মারিয়া মার্জার। গাছের পরশে মরা জিবেক সত্বর।।
রজনি থাকিতে পুত্র [৩]আসিবে[৩] সত্বর। তবে ঔষধের কার্য করিবেক মোর।। ৩০০
আর এক কথা পুত্র কর অবগতি। সত্ববে আসিহ পাছে ছলে পদ্মাবতী।।
গুরুকে প্রণাম করি চলে দুই ভাই। লইলেক মার্জার এক বধিয়া তথাই।।
গুরুকার্য সাধিবারে শঙ্কা নাই মনে। উপনীত হৈল দুহে গন্ধমাদনে।।
ঔষধ চাহিযা ধনা পাইল বিশেষে। জীল মৃত মার্জার তাহার পবশে।।
ঔষধ পাইয়া ধনা বান্ধিল মস্তকে। রথে ভর করিয়া মনসা তাহা দেখে।। ৩০৫
নেতোর সহিত পদ্মা [৪]কৈলা[৪] অনুমান। ঔষধ হরিতে গেলা ধনা বিদ্যমান।।
বৃদ্ধ ব্রাহ্মণীর বেশে অস্থিচর্মসার। বসিযা কান্দেন মাতা মায়ার প্রকার।।
হেন কালে ঔষধ লইয়া ধনা যায়। মায়ায় মোহিয়া জিজ্ঞাসেন মনসায়।।
ধনা মনা বলে শুন এ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণী। এত রাত্রে বসিযা প্রান্তরে কান্দ কেনি।।
মনসা বলেন পুত্র শুন দুঃখ বাণী। নিত্য রোজ দিত মোরে ওঝা গুণমণি।। ৩১০
মনসা-বিবাদে তার হইল মরণ। আজি হইতে পোষণ [৫]করিবে[৫] কোনজন।।
[ধনা মনা বলে শুন এ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণী। কোথায় শুনিলে মৈল ওঝা গুণমণি।।
মনসা বলে পুত্র কহি তব ঠাঞি। সঙ্কের মরণ কালে আছিল তথাই।।
করিল অগ্নির কার্য [৬]দেখিলু[৬] নয়ানে। সেই হেতু কান্দি আমি শুন দুইজনে।।
ধনা মনায় কুবুদ্ধি দিলেন মনসায়। ঔষধ ফেলিয়া তারা কান্দি কান্দি যায়।। ৩১৫
ঔষধ লইয়া পদ্মা ভর কৈলা রথে। ধনা মনা উপনীত গুরুর অগ্রেতে।।
[৭]দেখে[৭] ধন্বন্তরি আছে গরুড় আসনে। ধনা মনা দেখি সঙ্ক বলে হৃষ্ট মনে।।
ঔষধ বাটিয়া দেহ রাখহ জীবন। তাহা শুনি ধনা ধনা করয়ে ক্রন্দন।।
কান্দিতে কান্দিতে তারা কহে সব বাণী। মায়া পাতি ঔষধ ছলিয়া লৈল কানি।।[৮]
ইহা শুনি ধন্বন্তরি পরাণে নৈরাশ। মস্তকে হানিয়া কর কান্দিয়া হতাশ।। ৩২০
তবে সঙ্ক বলে শুন অরে ধনা মনা। সমুদ্রে ঔষধ আছে সমুদ্রের ফেনা।।] [৯]
ত্বরিতে ধাইয়া গেল সমুদ্রের তীরে। ঔষধ পাইয়া তুলি বধিলেক শিরে।।
পুনরপি মনসা ব্রাহ্মণ রূপ হইয়া। ধনামনা আগে বলে মায়ায় মোহিয়া।
অত্যন্ত বেথিত হৈয়া জিজ্ঞাসেন কথা। এত রাত্রে দুই ভাই গিয়াছিলা কোথা।।
ধনামনা প্রবোধ বলয়ে হেন কালে। মনসা বিবাদে সঙ্কে দংশে উদয় কালে।। ৩২৫
ঔষধ লইয়া যাই তথির কারণে। তবে সেই দ্বিজ বলে ধনা বিদ্যমানে।।
কিসের ঔষধ লৈয়া যাও তরাতরি। এখনি মরিল সঙ্ক সেই ধন্বন্তরি।। [১০]
ওখানেতে মায়া পাতি জ্বালিল অনল। আকাশে ঝাপিয়া ধূর্ম উঠিল আনল।।
দ্বিজ বলে মোর বাক্য নহে ত পরতেক। হয়ে [১১]নয়[১১] ধনা মনা ঐ [১২]ধূর্ম[১২] দেখ।।
তাহা দেখি অনুমান করে দুই ভাই। পাছে কানি মায়া করি থাকে এই ঠাঞি।। ৩৩০
স্থির হইল দুই ভাই পদ্মার মায়ায়। নাহি ফেলে ঔষধ ত্বরিতে লইয়া যায়।।
মনসা বলেন তথা পাতিয়া মন্ত্রণা। কেমন ঔষধ দেখি সমুদ্রের ফেনা।।

দেখিতে ঔষধ মাত্র দিল তার হাথে। ঔষধ লইয়া পদ্মা ভর কৈল্লা রথে।।
কান্দিয়া চলিল তারা গুরু বিদ্যমানে। দেখে ধন্বন্তরি আছে গরুড় আসনে।।
পড়িল ধরণীতলে [১৩]অবশ হৈয়া[১৩] গা। হইল চৈতন্য হত মুখে নাহি রা।। ৩৩৫
ক্ষেণেক সম্বিত পাইয়া কান্দে দুইজন। একান্ত জানিল গুরু অবশ্য [১৪]মরণ[১৪]।।
কান্দিতে কান্দিতে কহে সঙ্কের অগ্রেতে। ঔষধ আনিতে কানি হরিলেক পথে।।
শিরে কর হানি সঙ্ক হইল নৈরাশ। নিশ্চয় জানিল মৃত্যু বলে বিপ্রদাস।। ৩৩৮

১ মজিল (সু. সেন) ২ দুহে (ঐ) ৩ আসিহ (ঐ) ৪ কৈল (এসো/১) ৫ করিব (সু. সেন) ৬ দেখিল (ঐ) ৭ দেখি (এসো/৩ ; এটি নতুন একটি পুথির অংশ, ছিন্ন কিছু পত্রের সমাবেশ—এসো ৩৫৩০-এর মধ্যে থাকলেও এটি ভিন্ন পুথি। এখন থেকে এসো/২) ৮ এসো/১-এ পাদপূরক—শ্রীশ্রী দুর্গা। ৯ এসো/৩-এর পাদপূরক 'শ্রীগোপিনাথ সিংহ' ১০ এসো/১ পুথির পৃষ্ঠা এখানে খণ্ডিত ১১ নহে (সু. সেন) ১২ আনল (এসো/২) ১৩ আপসায়্যা (ঐ) ১৪ পতন (ঐ)

১৮
শ্রীরাগ

দৈবদোষে ধন্বন্তরি জীবন অসার করি
কান্দে ওঝা ভাবিয়া গোসাঞি।
আপনা করিনু বধ পদ্মার সহিত বাদ
আর মোর প্রাণরক্ষা [১]নাই[১]।। ৩৩৯
আমি মলমূত্রধারী কত সম্বরিতে পারি
জানিয়া করিনু বিসম্বাদ।
অহঙ্কারে মত্ত হৈনু পূর্বাপর না [২]গণিলু[২]
নিজ দোষে হইল প্রমাদ।। ৩৪০
নিশ্চয় মরণ জানি হৃদয় বিশেষ গণি
ধনা-মনা প্রতি কিছু বলে।
ধনা মনা শুন তুমি বিশেষ বুঝাই আমি
এই ছিল মোর কর্মফলে।।
হইলে মোর নিপাতন নাহি দিবা হুতাশন
কাটিয়া করিহ অষ্ট ভাগ।[৩]
অষ্ট দিগে স্থানে স্থানে [৪]পুতিহ[৪] হে সাবধানে
সঞ্চরিতে নারিবেক নাগ।।
নিশি গেলা অস্তাচলে সঙ্কের আসন টলে
বহিছে বদনে ঘন শ্বাস।
কম্পিত শরীর অতি হস্ত পসারিয়া ক্ষিতি
জীবনেরে হইল নৈরাশ।।
ব্রহ্মাণ্ড ভেদিল বিষ লোমে লোমে পরবেশ
হস্তপদ অবশ সকল।
বিগলিত নাল মুখে ভাসিল সকল বুকে
দুই আঁখি রাঙ্গা উত্পল।।

বিষজ্বালে নিরন্তর কালো হইল কলেবর
ডাকিলে প্রবোধ নাহি সরে।
যতেক গুরুর ফল বিশেষ মনসা খল
ঢলে ওঝা উত্তর-শিয়রে।। ৩৪৫
কমলা কমলমুখী প্রভুর মরণ দেখি
কান্দে রামা হইয়া হতাশ।
পদ্মা-পদপঙ্কজে পটু চাটু করি ভুজে
বিরচিল দ্বিজ বিপ্রদাস।।[৫] ৩৪৬

---

১ নাহি (সু. সেন) ২ গুণিনু (ঐ) ৩ 'শ্রীহরি' পাদপূরক (এসো/২) ৪ পুতিও (ঐ) ৫ এ পুস্তক নিজ শ্রী রামপ্রসাদ সিংহ ছয় পালা সমাপ্ত ইতি ইতি ২০ আষাঢ় (ঐ)।

ষষ্ঠ পালা সাঙ্গ

সপ্তম পালা

১

করুণা

প্রসারিয়া বাহু মৃত প্রভু করি কোলে। পড়িল আকুল শোক সমুদ্রের জলে।।
দারুণ সন্তাপ মুখ দিয়া পতি-মুখে। অনিবার অশ্রুপাত আর্তনাদ ডাকে।।
হরি হরি কমলা হইল নৈরাশ। কে মোর সংসার সুখ করিল বিনাশ।।
ব্যগ্র হইয়া [১]চুম্ব[১] দেই [২]বদনমণ্ডল[২]। মধুযুত ফুলে যেন [৩]ভ্রমে অলিকুল[৩]।।
কান্দিতে কান্দিতে রামা হইল মোহিত। মুহূর্তেক রহি পুন পাইল সম্বিত।। ৫
পতিমুখ নিরক্ষিরা কান্দে উচ্চস্বরে। পাপিনী রাখিয়া প্রভু যাও কোথাকারে।।
তুমি ওঝা গুণবন্ত বিদিত সংসার। তবে গুণে সর্বলোক কৌতুক আপার।।
সোনার শরীর তব লোটায় ধরণী। বারেক দুঃখিণী ডাকে শুন গুণমণি।।
হের [৪]তব[৪] হস্তপদ [৫]বিথানে[৫] লোটায়। সূর্যের আতপে যেন মৃণাল শুখায়।।
তোমার পঞ্চত্ব হৈল মোর দৈবদোষে। না জানি বিধাতা কেন মোরে কৈল রোষে।। ১০
কি মোর জীবনসুখ পৃথিবী রহিলা। কেমনে ধরিব বুক বঞ্চিব কি লইয়া।।
আনলে প্রবেশি কিবা গরল ভক্ষিব। নহে বা সলিলে গিয়া ডুবিয়া মরিব।।
কাঁদিতে কাঁদিতে রামা হইল নৈরাশ। মনসা বিজই বলে দ্বিজ বিপ্রদাস।।

---

১ মুখ (এসো/২) ২ বদনমণ্ডলে (ঐ) ৩ ভ্রমরে ভ্রমরে (ঐ) ৪ তোর (ঐ) ৫ ধরণী (ঐ)

২

বরাড়ি রাগ

মৃতবত কমলা কান্দিছে অনিবার। ধন্যা মনা কাঁদে আর শতেক কুমার।।
ওথা চাঁদো নৃপবর শুনি লোকমুখে। অন্তরে চিন্তিত রাজা ভাবিত শোক-দুঃখে।। ১৫
অনুমান করে রাজা জ্ঞাতিবন্ধু লইয়া। সঙ্কের সৎকার হেতু আইল ধাইয়া।।

হেনকালে ধনামনা বলে দুইজন। সত্য করাইল গুরু সভা বিদ্যমান।।
পরলোক হইলে শরীর অস্থিমাংস। অষ্টদিগে পুথিহ করিয়া অষ্ট অংশ।।
তবে মনসার নাগ [১]নারিবে[১] আসিতে। ইহা শুনি [২]সর্বজন[২] লাগিল কহিতে।।
শুন শুন ধনা মনা দৃঢ় করি মতি। যেমত কহিলা সঙ্ক তোমা দুহা প্রতি।। ২০
গুরু আজ্ঞা লঙ্ঘন না কর দুইজন। কহিল তোমারে এই বিশেষ কারণ।।
হেন কালে মনসা জানিলা কার্যকথা। ধরিয়া [৩]ব্রাহ্মণ রূপ[৩] উপনীত তথা।।
দ্বিজ দেখি প্রণাম করিল সর্বজন। হস্ত তুলি আশীর্বাদ কৈল ততক্ষণ।।
কহিতে [৪]লাগিল[৪] দ্বিজ সভার অগ্রেতে। মোর বাক্য শুন সভে সাবধান চিত্তে।।
শূদ্র কুলে উৎপত্তি তোমরা সর্বজন। যবন আচার কর কিসের কারণ।। ২৫
লোকধর্ম নষ্ট কর কিছু না বুঝিয়া। আমি যেই যুক্তি বলি শুন মন দিয়া।।
হেনকালে ধনা মনা দুই সহোদর। জোড় করে কহে দুহে দ্বিজ বরাবর।।
শুন শুন মহাশয় করি নিবেদনে। সত্য করাইল গুরু লঙ্ঘিব কেমনে।।
আমা দুহা ডাকি গুরু কৈলা অঙ্গীকার। অষ্টভাগে ভাগ করি দেহ [৫]কাটিবা[৫] আমার।।
অষ্টদিগে পুতিয়া রাখিহ যত্ন করি। মনসার সর্প তবে না আসিব পুরী।। ৩০
ব্রাহ্মণ বলেন হের শুনরে ধনাই। নিশ্চয় গুরুর সত্য লঙ্ঘিবারে নাই।।
একশত শিষ্য তোরা একুঠাই মেলি। সঙ্কের কাটিয়া লহ [৬]কনেষ্ট[৬] অঙ্গুলি।।
উত্তর দিগেতে লৈয়া এড়হ পুতিয়া। আর এক যুক্তি মোর শুন মন দিয়া।।
না করিহ দাহন গারুড়ি গুণ মনি। কলার মাজসে করি ভাসাও এখনি।।
ভাগ্যে যদি গুণবন্ত পায় ধন্বন্তরি। জীয়াইবে ধন্বন্তরি অতি যত্ন করি।। ৩৫
এতেক কহিয়া দ্বিজ করিল গমন। দ্বিজ বিপ্রদাস বলে মনসা-চরণ।।

---

১ নারিব (সু. সেন) ২ সর্বলোক (এসো/২) ৩ ব্রাহ্মণী রূপ (ঐ) ৪ লাগল (সু. সেন—মুদ্রণ প্রমাদ?)
৫ করিয়া (এসো/২) ৬ কনিষ্ঠ (সু. সেন)

৩

ভাটীয়ারি

ব্রাহ্মণের বাক্য সত্য করিল পালন। কনেষ্ঠ অঙ্গুলি পোতে উত্তরে তখন।।
মালাকার ত্বরিতে আনিল ডাক দিয়া। আজ্ঞা দিল তার প্রতি সত্বর হইয়া।।
শীঘ্র হৈয়া মালাকার না করিল হেলা। প্রচুর করিয়া কাটি আনে রাম কলা।।
বিচিত্র মাজস তবে করিল গঠন। [১]পাটনে[১] দিয়া তাহা কৈল আচ্ছাদন।। ৪০
মাজস লইয়া ওলাইল জল মাঝে। মুকুতা প্রবাল ঝারা চারি ভিতে সাজে।।
গঙ্গাজল দিয়া সঙ্কে করাইল স্নান। দিব্য বস্ত্র পরাইল[২] রত্ন অভরণ।।
কস্তুরি চন্দন সঙ্কের দিল কলেবরে। শয়ন করাইল লৈয়া মাজস ভিতরে।।
ভাসাইল[২] মাজস নক্ষত্র যেন ছুটে। দাণ্ডাইয়া বিবাদ লোক কান্দে দুই তটে।।
কমলা কান্দেন শোকে পড়িয়া ধরণী। তেজিব জীবন আজি আনহ আগুনি।। ৪৫
কমলারে প্রবোধ করয়ে নিজগণে। দ্বিজ বিপ্রদাস বলে মনসা-চরণে।।

১. পূর্ব মুখ করি ধরি মান্দাসে বসান (এসো/২) ২ (নেই)

৪

ত্রিপদী

ঐমত উদয়কালে মাজসে ভাসিয়া চলে
যথায় আছেন বিষহরি।
সত্বরে তথায় গিয়া কহে দণ্ডবত হইয়া
বধিলাম ওঝা ধন্বন্তরি॥
শুনি দেবী পদ্মাবতী হৃদয় সন্তোষ অতি
সাজিল সকল নাগগণ।
সত্বরে তথায় গিয়া [১]বসিয়া[১] কৌতুকী হইয়া
সুস্থির করিয়া নিজ মন॥
ধন্বন্তরি নিরখিয়া পদ্মহস্ত বুলাইয়া
জিয়াইতে কৈলা অনুসার।
সঙ্কেরে তুলিয়া ধরি মন্ত্র পড়ে বিষহরি
নানামতে করে অবতার॥
জিয়াইয়া ধন্বন্তরি [২]গাড়র[২]-মুরতি করি
যতনে রাখিলা রসাতলে।
উদয়কালের স্থানে লইলেন যত্নমানে
সিদ্ধি জয়নেতের আঁচলে॥ ৫০
নেতো আর বিষহরি আসিয়া সিজুয়া গিরি
বসিলা বড়ই কুতূহলে।
সঙ্ক-ধন্বন্তরি বধ পদ্মার বিজই পদ
কহি দিল মনসামঙ্গলে॥
যে জন তোমার ভক্ত কর্ণে শুনে অবিরত
পূরহ তাহার অভিলাষ।
জনমে জনমে সেবি চিন্তিয়া মনসাদেবী
বিরচিল দ্বিজ বিপ্রদাস॥

১ বসিলা (এসো/৩) ২ গাভার (ঐ)

৫

জমক ছন্দ

হরষিতে নেতো পদ্মা রথে করি ভর। কৌতুকে ভ্রমিতে আইলা চম্পকনগর॥
ধন্বন্তরি বধিয়া [১]আইনু[১] নিজ পুরী। এখন কি বলে রাজা চাঁদো অধিকারী॥
কেমতে জানিব নেতো বলহ কারণ। নেতো বলে পদ্মাবতী শুন নিবেদন॥ ৫৫
চন্দনের বৃক্ষ আছে রাজ-অন্তঃপুরে। তার তলে পুজে রাজা দেব মহেশ্বরে॥
দেবতুল্য চাঁদো রাজা দেখে সর্বক্ষণে। তাহা ভস্ম কর তুমি গরল-লোচনে॥
যদি গুণবন্ত থাকে জিয়াইতে পারে। টুটাবে চাঁদোর গর্ব বধিয়া তাহারে॥
শীঘ্র পদ্মা সেই বৃক্ষ কৈলা ভস্মময়। দেখি চাঁদো ভয় অতি বেথিত হৃদয়॥

পাত্রমিত্র লইয়া রাজা করে অনুমান। কেমনে জিবেক বৃক্ষ কহ সন্বিধান।।[২] ৬০
সভার সম্মতি এক করি মন্ত্রণা। সুবর্ণ চেঙ্গড়া রাজ্যে ফিরাই ঘোষণা।।
বৃক্ষ জিয়াইব [৩]চল[৩] রাজ-সন্বিধান। নানা ধন দিয়া তার করিব সম্মান।।
তাহা শুনি ধনা মনা করে অনুমান। বৃক্ষ জীয়াইলে পাবো রাজার সম্মান।।
অধিক হইল ক্রুদ্ধ মালির কুমার। আপদ সঞ্চার হেতু করে অহঙ্কার।।
পদ্মার মায়ায় স্থির নহিল তথাই। মরণের অনুমান করে দুই ভাই।। ৬৫
ধনা মনা কহে দুহে সভার গোচর। জিয়াইব চন্দন বৃক্ষ কানিরে কী ডর।।
গুরুর যতেক জ্ঞান আগমের বাণী। উভার সম্ভার নিসম্ভার তত্ত্ব জানি।।
সিদ্ধি বাণ তন্ত্র কাঁচ ধাতু সবিশেষ। [৪]নাগ-বাচা[৪] শিক্ষা জানি গুরু-উপদেশ।।
[৫]নিরীক্ষণ[৫] স্তম্ভন মোহন গুণ ধরি। হুঙ্কারেতে মৃত জীব জিয়াইতে পারি।।
জিয়াইব চন্দন বৃক্ষ আখির নিমিষে। নৃপতি গৌরব অতি করিব বিশেষে।। ৭০
ধনা বলে মনা ভাই কর অবধান। নারিলে জিয়াইতে বৃক্ষ পাব অপমান।।
বিদ্যা পরীক্ষিয়া যাব রাজ-বিদ্যমান। মনসামঙ্গল দ্বিজ বিপ্রদাস গান।।

১ আনিলু (এসো/২) ২ 'সক্ষর মিদং শ্রীরাম প্রসাদ সিংহ সাং দত্তপুখরিয়া কালি কলম ভাল নহে এর ছাঁদ ভাল হয় না' (ঐ) ৩ জেই (সু. সেন) ৪ নাগ চাপা (এসো/২) ৫ নিপুক্ষণ

৬

[১]ভাটীয়ারী রাগ[১]

বিদ্যা পরীক্ষার কাজে হরষিত হইয়া সাজে
ধনা মনা দুই সহোদর।
সম্মুখে দেখিল তরু অতি সে বিপুল চারু
দৃষ্টি হইল তাহার উপর।।
নিরবধি মন্ত্র জপে হুঙ্কারে করিয়া দাপে
সঘন কাঁপয়ে কলেবর।
বসিয়া গরুড়াসনে মহামন্ত্র চিন্তিয়া মনে
ভার হানে বৃক্ষের উপর।।
বিষম ভারের [২]ঘায়[২] ফুলপত্র নাহি [৩]রয়[৩]
ডালে মূলে মৈল সেই তরু।
জীব-সঞ্চারিণী শিক্ষা পুনরপি ক্ষেপে দীক্ষা
শীঘ্র জিল মৃত বৃক্ষ চারু।। ৭৫
দুই ভাই হৃষ্ট হইয়া মৃত বৃক্ষ জিয়াইয়া
মহাদম্ভ সানন্দবদন।
বান্ধিয়া বত্রিশ বানা সর্বাঙ্গে নাগের ফণা
বাদখাড়ু দ্বিভুজে ভূষণ।।
বিদ্যা পরীক্ষা পায়্যা পরম সানন্দ হয়্যা
[৪]আনিল[৪] সকল শিষ্যগণ।

বিদ্যার বিবাদ কাজে নাগের [৫]ঝাপান[৫] সাজে
তথি কুতূহলে আরোহণ।।
ধনার প্রতাপ যত নাগ দেখে [৬]তৃণবত[৬]
গণ্ডূষ করিয়া পিয়ে বিষ।
ছয় মাসের মৃত পায় নিমিষে জিয়ায় তায
তিলেক না করে [৭]বিমরিষ[৭]।।
বাজায় বিষম ঢাক গর্জিয়া ফুকরে হাঁক
সর্বলোক আনন্দ প্রবল।
এক শত শিষ্য সঙ্গে নগর [৮]ভ্রময়ে[৮] রঙ্গে
সদাই মনসা [৯]অকুশল[৯]।।
ধন্বন্তবি সম সর্ব ধনা মনা করে গর্ব
নিকটে মরণ নাহি দেখে।
এসব প্রমত্ত বাণী কাজলা মালিনী শুনি
নিবদন্তি পুত্রের সম্মুখে।। ৮০
মনসা সহিত বাদ কেন হেন পরমাদ
না কর এমত অহঙ্কার।
ভাবিয়া মনসা দেবী দ্বিজ বিপ্রদাস কবি
পদ্মাপদে কবি পরিহার।।

১ ভাটীযাবী (সু সেন) ২ ঘাযে (ঐ) ৪ আনি (এসো/২) ৫ ঝাপানে (সু সেন) ৬ তৃণাবত (ঐ) ৭ বিমবিখ (সু সেন) ৮ ভ্রমণ (এসো/২) ৯ অনেষণ (সু সেন)

৭

শ্রীরাগ

পরম সন্তাপে রামা আখি অশ্রু ঝরে। সকাতরে বুঝায় পুত্রের ধরি করে।।
গুরু ধন্বন্তরি তোর পৃথিবী-বিজয়। সে হেন গুণিন ওঝা বধে মনসায়।।
কে দিল কুমতি হেন তোমা দুহাকারে। জানিয়া শুনিয়া পুত্র ইচ্ছি মরিবারে।।
তোমা দুহা বিনে মোর আর কেহ নাই। পুষ্প বেচি খাব পুত্র না কর বড়াই।। ৮৫
দেবতা না জিয়ে পুত্র মনসার বাদে। মানব হইয়া তুমি জিনিবা কী সাদে।।
তবে ধনা মনা বলে মায়ের গোচর। না [১]করিহ[১] চিন্তা মাতা নাহি কোন ডর।।
না জানিয়া দৈব গুরু মৈল ধন্বন্তরি। সত্বরে থাকিব কী করিব বিষহরি।।
রাজস্থানে গৌরব পাইব [২]বহু ধন[২]। মায়েরে প্রবোধ করি [৩]করিল গমন[৩]।।
উপনীত হইল গিয়া রাজার অগ্রেতে। দেখি চাঁদ জিজ্ঞাসা করিল হরষিতে।। ৯০
কিবা জাতি কিবা নাম কাহার নন্দন। কোথা হইতে আইস কহ স্বরূপ বচন।।[৪]
নিন্দেয়ে দুই ভাই রাজার গোচর। ধনা মনা নাম ধরি মালির কুঙর।।
পৃথিবী-বিজয় গুরু নাম ধন্বন্তরি। তাহার চৌষট্টি বিদ্যা সভে [৫]মোরা[৫] ধরি।।
কেমন চন্দন বৃক্ষ হত দুঃখী তুমি। আজ্ঞা কর এখনি জিয়াইয়া দিব আমি।।
শুনি হরষিত রাজা দুহা সন্নিধানে। অবিলম্বে লইয়া গেলা সেই-বৃক্ষ স্থানে।। ৯৫

মহাজ্ঞান চিন্তি ধনা বসিল [৬]আসনে[৬]। জীব সঞ্চারিণী বিদ্যা ভাবিলেক মনে॥
অমৃত করণ ভাবি দিলেন হুঙ্কার। যেমত আছিল বৃক্ষ হৈল পুনর্বার॥
ধনার প্রতাপে চাঁদো করে অহঙ্কার। নানা রত্ন স্বর্ণ ময় করে পুরস্কার॥
পদ্মা নিন্দা করে রাজা তেজিয়া বিষাদ। আনন্দে নিবসে ঘরে ধনার প্রসাদ॥
ওথায় মনসা নেত করে অনুমান। রথ আরোহণে আসি চাঁদ সন্নিধান॥ ১০০
ধনার প্রতাপে রাজার বাড়ে অহঙ্কার। দেখিয়া বাড়িল ক্রোধ চিন্তিল প্রকার॥
তবে নেত পদ্মা দুহে অনুমান করি। ধনা মনা বধিয়া চাঁদোর দর্প হরি॥
গোয়ালিনী রূপধরি ত্রৈলোক্য-ঈশ্বরী। সহেলা করিতে যান কাজলার পুরী॥
ধনা মনা দৈবযোগে আপন গণয়। [৭]বিশেষে[৭] মনসা খল প্রমাদ নিশ্চয়॥
গোয়ালিনী রূপ ধরি ক্ষিতি অনুপমা। ধনা মনা বধিবারে বাড়িল অক্ষেমা॥ ১০৫
নানাবিধি প্রকারে করেন সুবেশ। দ্বিজ বিপ্রদাস বলে মনসা আদেশ॥

---

[১] করহ (এসো/২) ২ বহুতর (ঐ) ৩ চলিল সত্বর (ঐ) ৪ সহক্ষে শ্রী রামদেব শর্ম্মনং (ঐ) ৫ আমি (সু. সেন) ৬ শয়নে (এসো/২) ৭ শুনরে (সু. সেন)

৮

পয়ার

চাচর প্রচুর কেশ বাঁধিয়া কবরী। নানা অলঙ্কার অঙ্গে মণিরত্ন ঝুরি॥
চন্দন তিলক শোভে ললাটে সিন্দুর। নয়ানে কজ্জল তাহে অলক প্রচুর॥
দশন মুকুতা পাতি জিনিয়া ভ্রমর। আমিয়া বরিখে [১]বিম্ব[১] জিনিয়া অধর॥
তপত কাঞ্চন জিনি দেহের বরণ। সুবর্ণ পরিধান সূর্যের কিরণ॥ ১১০
চরণে নূপুর ধ্বনি বাজে রুনু ঝুনু। নানা রত্ন মণিময় দীপ্ত করে তনু॥
ঘৃত ঘোল দুগ্ধ দধি রচিয়া পসার। চলিলা শঙ্কর-সুতা মায়া অবতার॥
চম্পকনগর আসি হৈলা উপনীত। পদ্মারূপ দেখি লোক হইল মোহিত॥
নগর ভ্রমিয়া গেলা মালিনীর বাসে। পসরা ওলায় দেবী কাজলার পাশে॥
অবিচারে তাহার পুষ্পের লয় ঘ্রাণ। কুপিয়া কাজলা তারে বলে সন্নিধান॥ ১১৫
কেন [২]তুঞি ছুলি[২] মোর পুষ্পের পসার। কোথা হৈতে গোয়ালিনী আইল দুষ্টাচার॥
মায়ায় মনসা বলে শুন ল মালিনী। পুষ্পমূল্য দিব তোরে মন্দ বল কেনি॥
হাসিয়া [৩]বসিল[৩] পদ্মা মালিনীর পাশে। মায়ায় মোহিত হইলা কাজলা জিজ্ঞাসে॥
কোথা হইতে আইস তুমি ঘর কোন গ্রাম। কে তোমার মাতা পিতা কিবা তোর নাম॥
কাজলার প্রতি পদ্মা কহে দৃঢ় কথা। গৌরী জননী মহেশ্বর ঘোষ পিতা॥ ১২০
মোর নাম কাজলা সুগন্ধ গ্রামে ঘর। শুনিয়া কাজলা রামা হরিষ অন্তর॥
নিজ নাম শুনিয়া কাজলা কুতূহলে। সহী সহী বলিয়া মনসা নৈল কোলে॥
সহেলা করিব দুহে আনন্দ বদনে। নানা দ্রব্য আনিয়া আনিল আইয়ো গনে॥
নানা বাদ্য গন্ধ পুষ্প আনিল কাজলা। পরম আনন্দে দুহে করিল সহেলা॥
মনসার মায়া যে বুঝিব কোন জন। দ্বিজ বিপ্রদাস বলে মনসাচরণ॥ ১২৫

---

১ বিম্বু (সু. সেন) ২ তুই ছুঞিলি (ঐ) ৩ বসিল (এসো/২)

৯

সিন্ধুড়া রাগ

দুই সহী কোলাকুলি অতিশয় কুতূহলী
মনসা লইয়া গেল [১]ঘরে[১]।
সহির রন্ধন সজ্জ করিল উত্তম কার্য
স্নান হেতু আইল সরোবরে।।
বলে পদ্মা মায়া করি রত্নময় দিব্যপুরী।
কেমনে [২]বঞ্চিস[২] একেশ্বরী।
কাজলা বলয়ে সহী মোরে কী বলসি তুই
পুত্র আছে রূপের মুরারি।।
সঙ্ক-ধন্বন্তরি ছিল পদ্মার বিবাদে মৈল
তাহার জ্ঞান মোর পুত্র জানে।
রাজারে বিদায় করি এখনি আসিব পুরী
দেখিয়া যাইয় নিজ স্থানে।।
রন্ধনের সজ্জ হইল স্নানেতে মনসা গেল
প্রবেশিল সরোবরকূলে।
রাজারে বিদায় করি ধনা-মনা আইসে পুরী
দেখিয়া মনসা কুতূহলী।।
মনসা জানিল মনে ধনা-মনা দুই জনে
এইক্ষণে বধিব হেলায়।
বিঘতিয়া ছিলা হাথে বুঝাইয়া নানা মতে
লুকাইয়া এড়িল ধূলায়।। ১৩০
বিঘতিয়া ক্রোধমুখি লোকধর্ম কৈল সাক্ষী
প্রথমে ধনার পদে খায়।
কড়িয়া আঙ্গুলে [৪]খায়[৪] সাপ সাপ ডাকে [৫]ভয়[৫]
নির্ঘাত ভারিল [৬]মনসায়[৬]।।
বিস্ময় হইয়া ত্রাসে মনা দেখিবারে আইসে
কৈ সাপ লুকাইল কোথায়।
মনা ধুলা ঠেলে পায় তার পদ-অঙ্গুলি খায়
কোলাকুলি কাঁদেন তথায়।।
পদ্মা ভারে নিরন্তর বিষ জ্বলে কলেবর
দুই ভাই হইল কাতর।
নিশ্চয় মরণ জানি কান্দেন প্রমাদ গণি
দেখিতে হারাইনু প্রাণেশ্বর।।
গুরু ধন্বন্তরি ছিল মনসার বাদে মৈল
তবে আমা বিড়ম্বিল বিধি।

দ্বিজ বিপ্রদাস ভণে ধনা-মনা দুই জনে
[৭]জানি শুনি পাইল[৭] কুবুদ্ধি ॥

১ ঘর (সু সেন) ২ বঞ্চসি (ঐ) ৩ রাখিলা (এসো/২) ৪ খাএ (সু. সেন) ৫ ভএ (ঐ) ৬ মনসাএ (ঐ)
৭ জান্য শুন্য হইল (এসো/২)

১০

পয়ার

কম্পিত শরীর তার নয়নেতে পানি। ধনা বলে মনা তাই না দেখি জননী॥ ১৩৫
[১]কি নিয়া[১] এমত বুদ্ধিহত হইল মোরে। কোথায় সম্ভবে বাদ দেব আর নরে॥
নিশ্চয় মরণ আজি আমা দুহাকার। মনসা সহিত হট রক্ষা নাহি আর॥
[২]খড়গ[২] ভেদিয়া বিষ লোমে লোমে চড়ে। অবশ হইল অঙ্গ মুখে নাল পড়ে॥
চৌদিগে কুহড়ি চাপে [৩]অরুণ[৩] লোচন। [৪]ডাকলে[৪] প্রবোধ নাহি না স্ফুরে বচন॥
ঢলিয়া পড়িল দুহে উত্তর-শিয়রে। দুহা বধি গেলা দেবী কাজলা গোচরে॥ ১৪০
এক অপরূব সহী কহি গো তোমারে। প্রমাদ দেখিয়া আইনু সরোবরতীরে॥
দুইটি কুমার শোভে নানা অভরণে।[৬] কোলাকুলি ঢলিয়া পড়্যাছে সেইখানে॥
কত কত লোক তাহা নেহালিয়া [৭]যায়[৭]। কেহ বলে ধনা-মনা মালিনী-তনয়॥
ইহা শুনি কাজলা হৃদয়ে হানে হাত। আশ্চম্বিতে মুণ্ডে যেন পড়ে বজ্রাঘাত॥
পুত্র পুত্র বলিয়া আর্তনাদ ডাক [৮]ছাড়ে[৮]। মোর দুই পুত্র সই [৯]কিছুই না নড়ে[৯]॥ ১৪৫
মনসা সহিত পুত্র সদাই বিবাদ। [১০]আন[১০] নহে বিষহরি করিল প্রমাদ॥
বিগলিত কেশপাশ ধাইল হুতাশে। সরোবরতীরে গেল পাগলের বেশে॥
নাড়িয়া পুত্রেরে দেখে চৈতন্য না পাইয়া। নির্ঘাত পড়িল ক্ষিতি তনু আপসায়্যা॥
প্রসারিয়া দুই বাহু পুত্র লৈল কোলে। ঝাঁপিলেক রাহু যেন চন্দ্রের মণ্ডলে॥
বিমর্ষ হইল কান্দিবারে নাহি বল। নিরখিয়া পুত্রমুখ পরাণে বিকল॥ ১৫০
হেনকালে পদ্মা তারে বলেন প্রবোধ। না কর বিষাদ সহি শুনহ সম্বোধ॥
বাপ মোর মহাগুণী বিদিত সংসারে। তার কিছু কিছু বিদ্যা শিখাইল মোরে॥
বিদ্যার পরীক্ষা আমি কিছু নাহি জানি। জিয়ে বা না জিয়ে তাহা দেখিব এখনি॥
সভয় কাজলা পুত্র কোলে হৈতে থুয়্যা। সহির চরণ ধরে সর্বাঙ্গ লোটাইয়া॥
পদ্মা বলে আলো সহি সত্য কর তুমি। তোর দায় নাহি পুত্র লইয়া যাইব আমি॥ ১৫৫
শোকেতে পাগল রামা সত্য কৈল [১১]তায়[১১]। জিয়াইয়া লহ পুত্র মোর নাহি [১২]দায়[১২]॥
তবে পদ্মা পদ্মাসনে বসিল তুরিতে। ধনা মনা চাহে দেবী নিরক্ষর তত্ত্বে॥
দ্বিজ বিপ্রদাস কহে পদ্মা পদ ভাবি। জনমে জনমে মাতা তব পদ সেবি॥

১ জানিয়া (এসো/২) ২ মর্ম (ঐ) ৩ অবশ (ঐ) ৪ ভাবিলে (সু. সেন) ৫ অপরূপ সহী (এসো/২)
৬ 'শ্রী শ্রী গুরুবে নম'—পাদপূরক (এসো/২) ৭ চায় (এসো/২) ৮ ছাড়ি (সু. সেন) ৯ কিছু নাহি নড়ি (ঐ) ১০ অন্য (এসো/২) ১১ তাএ (সু. সেন) ১২ দাএ (ঐ)

১১

মন্ত্রজাত

ত্রিপুর দহনে হর অগ্নি উঠে চক্ষে। দানব পুড়িয়া অগ্নি পৃথিবীতে থাকে।।
পৃথু রাজা পৃথিবী দুহিলা যেই কালে। দুহিয়া নাগেরে বিষ দিলেক পাতালে।। ১৬০
সেই বিষ বাসুকি দিলেন মোর ঠাঞি। শুন শুন বিষ তোমা [১]জন্ম[১] কথা কই।।
হর হর বিষ ধনা মনা অঙ্গে হর।[২] বিষহরির আজ্ঞায় ঘায় মুখে মর।।
সমুদ্রে [৩]জন্মিল[৩] বিষ কপিলার ক্ষীরে। দেবগণ মেলি তাহা দিল বাসুকিরে।।
রক্তের পরশে বায়ু জীবজন্তু কায়। তন্ত্রে মন্ত্রে সর বিষ ধর্মের আজ্ঞায়।।
সমুদ্র-মথনে জন্মে কালকূট বিষ। গণ্ডূষ করিয়া তাহা পিয়ে জগদীশ।। ১৬৫
বাপে ঝিয়ে কহি তোর আদ্যের কাহিনী। হরের আজ্ঞায় বিষ [৪]ঝাট[৪] হও পানি।।
বিনতা জিনিল কদ্রু বিষের কারণ। জন্মিয়া গরুড় কৈলা নাগের গঞ্জন।।
সাগরের মধ্যে হয় কুরলের স্থান। কুরলের নামে বিষ [৫]হয়ে কম্পমান[৫]।।
আদ্যনাথ রূপে প্রভু কহিল গোসাঞি। কুরলের নামে বিষ ঘা-মুখে নাই।।
উধা করি ফিরে কঙ্ক আকাশ উপর। তাহার পরশে বিষ কাঁপে থরথর।। ১৭০
তাহার পরশে ভস্ম হয় ত গরল। কঙ্কের আজ্ঞায় বিষ [৬]যাও[৬] রসাতল।।
নাগবাচা শিক্ষা ঝাট জপে পদ্মাবতী। বিঘাতিয়া আসি বিষ নিল শীঘ্রগতি।।
কলেবরে প্রাণ দিয়া দিলেন হুঙ্কার। উঠিয়া বসিল দুহে মালির কুঙর।।
মনসা বলেন [৭]সহি[৭] শুন মোর বাণী। পুত্র লৈয়া যাই ঘরে দেহত মেলানি।।
দ্বিজ বিপ্রদাস বলে ভাবিয়া জগতি। অন্তকালে হয় যেন পদ্মাপদে গতি।। ১৭৫

---

১ জর্ম (সু. সেন), মর্ম (এসো/২) ২ 'শ্রীশ্রী কৃষ্ণ' (পাদপূরক—এসো/২) ৩ জর্মিল (সু. সেন), জন্মিলা (এসো/২) ৪ ঝাটো (সু. সেন) ৫ হএ ত (ঐ) ৬ জাও (ঐ) ৭ সই (এসো/২)

১২

রাগ পাহিড়া

মনসা বলেন [১]সহি[১] বিশেষ তোমারে [২]কহি[২]
বিদায় মেলানি দেহ মোরে।
বেলা হইল অবশেষ বহদূর মোর দেশ
পুত্র লৈয়া যাই নিজ ঘরে।।
দেখিতে পুত্রের মুখ কাজলা হৃদয় দুঃখ
শুন [৩]সহি[৩] নিবেদি তোমারে।
তুমি মোর প্রাণ-সই নিবেদি তোমার ঠাঞি
একখানি পুত্র দেহ মোরে।।
সইর চরণ ধরি কাজলা বিলাপ করি
সকাতরি গোচরি তোমারে।
মোর পুণ্য ভাগ্যফলে তোমা হেন [৪]সহি[৪] মিলে
পার কর এ দুঃখসাগরে।।

মনসা বলেন [৫]সহি[৫] বিশেষ তোমারে [৬]কহি[৬]
তেজ মায়া কর অবধান।
সত্য লঙ্ঘে যেই জন শুন তার বিবরণ
কুম্ভীপাকে হয়ে তার স্থান।।
সত্য করি [৭]লঙ্ঘ[৭] পুন কেন কহ অকারণ
এ তোমার নহে ব্যবহার।
কেন বল সবিনয় লোকধর্ম নাহি ভয়
তেজ মায়া চল নিজ পুর।। ১৮০
কাজলা বলয়ে শুন সত্য না লঙ্ঘিব পুন
দুই পুত্র বটে ত তোমার।
হও মোরে কৃপামই মাগিনু তোমার ঠাই
দয়া করি দুঃখে কর পার।।
না দেখি পুত্রের মুখ ভাবিয়া পরম দুঃখ
মরিব পুত্রের দুঃখ শোকে।
আমার স্ত্রী বধ-ভাগে তোমার উপর লাগে
ভালই না চাহ ধর্মলোকে।।
যত কাল ক্ষিতি বাসী হইব তোমার দাসী
ভক্তি স্তুতি করিব বিধানে।
তুমি মোর [৮]হইলা[৮] ধাতা হও মোরে কৃপা দাতা
ছোট পুত্র মোরে দেহ দানে।।
ওথা চাঁদ নৃপবরে শুনি আইসে দেখিবারে
ইহা শুনি মনসা চিন্তিত।
ধনা-মনা ধরি করে চলিলেন রথ-ভরে
দ্বিজ বিপ্রদাস বিরচিত।।

১ সই (এসো/২) ২ কই (ঐ) ৩ সই (ঐ) ৪ সই (ঐ) ৫ সই (ঐ) ৬ কই (ঐ) ৭ বৈল (ঐ) ৮ হইলে (ঐ)

১৩
পয়ার

মনসার মায়া জানি কাজলা মাল্যানি। বিষাদ ভাবিয়া কান্দে পড়িয়া ধরণী।। ১৮৫
হরিল দুর্লভ পুত্র না দেখিব আর। [১]সহি[১] রূপে আসি পুত্র হরিল আমার।।
কার মন্দ কৈনু মুঞি কেবা দিল শাপ। তথির কারণে মোর হইল এত তাপ।।
দেখিতে দেখিতে পুত্র হারাইনু নিধি। ললাট চিরিয়া দেখ্ কী লিখিল বিধি।।
ধরণী লোটাইয়া রামা করয়ে ক্রন্দন। হেন কালে চাঁদো রাজা জিজ্ঞাসে কারণ।।
কহিল সকল কথা চাঁদোর গোচরে। শুনিয়া বেথিত রাজা কহে কাজলারে।। ১৯০
তোর বধূ হইল কানী বিদিত সংসারে। বিভারাত্রে পতি এড়ি পলাইল তারে।।
তোমার কুমার দুই সুন্দর দেখিয়া। স্বামী করিবারে কানী লইল কাড়িয়া।।
মাল্যানি বলয়ে শুনি চাঁদোর বচন। মোর দুই পুত্র [২]মৈল[২] তোমার কারণ।।

দেবতার নিন্দা কর অজ্ঞান নৃপতি। এহো লোকে দুঃখ-শোক মৈলে অধোগতি॥
নৃপতি তর্ছিয়া রামা সঙ্কলে ক্রন্দন। পুত্রের মমতা ছাড়ি গৃহে আগমন॥ ১৯৫
সিজুয়া [৩]শিখরে[৩] পদ্মা ধনা মনা লইয়া। দুই ভাই রাখিলেন সেবক করিয়া॥
বিক্রম টুটিল চাঁদো নাহি অহঙ্কার। ধনা মনা বধ হইল মালির কুমার॥
নেতো পদ্মা দুহে বসি পরম হরিষে। করেন [৪]যুকতি[৪] চাঁদোর পুত্র বধ আশে॥
যেই শুনে ভণে গায় পদ্মার মঙ্গল। ধন পুত্র বৃদ্ধি হয় সর্বত্র কুশল॥
জনমে জনমে সেবি পদ্মার চরণ। [৫]এখনে[৫] রহিল গীত বিপ্রদাস গান॥[৬] ২০০

১ সই (এসো/২) ২ গেল (ঐ) ৩ পর্বতে (ঐ) ৪ জুগতি (সু সেন) ৫ এখন (এসো/২)
৬ সাত পালা সমাপ্ত। শ্রীদুর্গাঐ নম শ্রী কৃষ্ণঐ নম শ্রী হরিঐ নম শ্রী বাধাঐ নম শ্রী লক্ষ্মীঐ নম শ্রী সবস্বতী নম পবগনে আনপুব ইজাদাব শ্রী দুর্গাগতি বায দেওযান শ্রীযুত কালিপ্রসাদ সিংহ শ্রী গুপীনাথ সিংহ (সা)পুড়িয়া ইতি সমাপ্ত সপ্তম পালা (এসো/২)।

সপ্তম পালা সাঙ্গ

অষ্টম পালা

১

পয়ার

যত মন্দ বলে চাঁদো মনসার প্রতি। নেতোর সাক্ষাতে গিয়া কহে পদ্মাবতী॥
[১]শুন[১] হেরো বলি নেতো প্রাণের ভগিনী। [২]এত[২] মন্দ বলে কত সহিব পরানি॥
যত অহঙ্কার কৈল সব কৈল দূর। [৩]তমু[৩] চাঁদো মোরে মন্দ বলযে প্রচুর॥
না করিল মোর পূজা চাঁদো নৃপবর। কি করিব যুক্তি মোরে বলহ সত্বর॥
এতেক শুনিয়া নেতো ভাবিল অন্তরে। নিগদে মধুর ভাবে মনসা গোচরে॥ ৫
শুন শুন বিষহরি স্থির করি মন। কেন তুমি এত দুঃখ ভাব কী কারণ॥
অবিরত দর্প করে চাঁদো নরপতি। এক যুক্তি বলি তাহা কর অবগতি॥
চন্দ্রসম ছয় পুত্র আছয়ে রাজার। তাহা বধি টুটাও চাঁদোর অহঙ্কার॥
শুনিয়া নেতোর বাক্য দেবী বিষহরি। সাধু সাধু প্রশংসিলা নেতো-কর ধরি॥
হৃদয় ভাবিয়া পদ্মা স্থির করি মন। হাকারিয়া আনে দেবী যত নাগগণ॥ ১০
[৪]প্রধান[৪] অনন্ত নাগ বাসুকি তক্ষক। শঙ্খ পদ্ম কদম্বাদি কুমুদ অন্ধক॥
ধনঞ্জয় কর্কট [৫]কুলীর[৫] মহাবলী। হালাই কালাই আইল গন্ধজয়কালি॥
বেত আছাড় আইল আর আড়িয়াল বঙ্কা। আইল আড়াইরাজ দেখি লাগে শঙ্কা॥
ঘোল চিতি ধামাই আইল অষ্ট বোড়া। গোখুরা উদয়কাল তেজবন্ত ধোড়া॥
দশ দিগ জুড়িল বিষম সর্প দল। মেঘ সম ঘোর নাদে গর্জয়ে প্রবল॥ ১৫
সিংহনাদ করে নাগ বিষম আরম্ভ। দেবাসুর কম্পমান দেখি নাগদম্ভ॥
মনসা বলেন নাগ শুনহ কারণ। পুত্রদম্ভে নিন্দে চাঁদো মোরে সর্বক্ষণ॥
কোন নাগ পাঠাইব চম্পকনগর। দংশিয়া কে দিবে মোরে চাঁদোর কুমার॥
যেই মাত্র মনসা কহিলা দৃঢ় কথা। ভয়যুক্ত হইয়া নাগ হেট করে মাথা॥
সভয় হইয়া নাগ বলে করপুটে। আপনি ত স্থির নহো চাঁদোর নিকটে॥ ২০
চাঁদো রাজা নাগ পাইলে বধিব জীবন। কেমনে বধিব গিয়া চাঁদোর নন্দন॥

নাগের বচনে কোপে মনসাকুমারী। বধিব সকল নাগ বিষ লব হরি।।
[৬]হেনকালে ধোড়া বলে পদ্মার গোচরে। দংশিয়া চাঁদোর পুত্র দিব গো তোমারে।।
ধামাইর রথখান দেহ তো আমায়। তবে অতি শীঘ্রগতি যাইব তথায়।।
হরিষে মনসা তারে কৈলা পুরস্কার। যাত্রা করি ধোড়া নাগ কৈল আগুসার।। ২৫
ধামাইর রথখান করি আরোহণ। চম্পকনগরে আসি দিল দরশন।।
প্রথম আষাঢ় মাস বরিষা প্রবেশ। জলে স্থলে প্রচুর বরিষে সর্বদেশ।।
মৎস্য অনুসারে যায় লোক রড়ারড়ি। আলি বান্ধি ঘাই কাটি পাতয়ে দোহাড়ি।।
ভেক-ডাক শুনি ধোড়া প্রাণে স্থির নহে। রথে বসি ধোড়া নাগ নেহালিয়া চাহে।।
কুবুদ্ধি পাইল ধোড়া হইল [৭]বিফলে[৭]। রথেরে বিদায় দিয়া ঝাপ দিল জলে।। ৩০
ডুবে ডুবে [৮]ভ্রমি বুলে[৮] হরিষ অন্তরে। খেদাড়িয়া ভেক মৎস্য ভরয়ে উদরে।।
মৎস্য-সুখে ধোড়া নাগ আপনা পাসরে। খরস্রোতে [৯]ভাসাইল[৯] দোহাড়ি ভিতরে।।
মৎস্য খাইয়া নিদ্রা যায় হরিষ [১০]অন্তর[১০]। গগনে হইল বেলি দ্বিতীয় [১১]প্রহর[১১]।।
হাল মেলি কৃষাণ সত্বরে ধাইয়া আইল। হরষিত মনে গিয়া দোহাড়ি তুলিল।।
নিদ্রা ভঙ্গ হইল নাগ উঠে ফোফাইয়া। হাথে হইতে দোহাড়ি ফেলিল ভয় পায়্যা।। ৩৫
সাপ সাপ করিয়া ভয়ে ডাকিল তখন। কি কি বলিয়া সব ধাইল কৃষাণ।।
উপনীত হইল দোহাড়ি বিদ্যমান। সাপ মারিবারে সভে করিল অনুমান।।
সকল কৃষাণ বলে হাথে ঠেঙ্গা লইয়া। দোহাড়ি সহিত সাপ মার ঠেঙ্গাইয়া।।
যাহার দোহাড়ি সে ভাবে মনে মনে। নতুন দোহাড়ি মোর ভাঙ্গিব কেমনে।।
দোহাড়ি পিছাড়ি বন্ধ খসায়্যা কৃষাণ। হাথে ঠেঙ্গা লইয়া দাণ্ডাইল বিদ্যমান।। ৪০
যখন দোহাড়ি হইতে যায় পলাইয়া। [১২]সেইখ্যানে[১২] সাপেরে মারিব ঠেঙ্গাইয়া।।
শুনিয়া সম্ভ্রম নাগ করয়ে ক্রন্দন। দ্বিজ বিপ্রদাস বলে মনসা-চরণ।।

১ হেরো (সু. সেন) ২ নরে (এসো/২) ৩ তবু (সু. সেন) ৪ প্রবীণ (ঐ) ৫ কুলিশ (এসো/২) ৬ 'শ্রীশ্রী দুর্গা' (পত্রসূচক ; এসো/২) ৭ বিকলে (এসো/২) ৮ ভ্রমে জলে (ঐ) ৯ সাভাইল (সু. সেন) ১০ অন্তরে (ঐ) ১১ প্রহরে (ঐ) ১২ সে ক্ষেণে (এসো/২)

২

[১]মালসী রাগ

আজি কেন পাপ বিধি মোরে [২]অনুসার[২]। প্রবীণ শতেক পাপ করম আমার।।
দৈব নির্বন্ধ মোর না যায় খণ্ডন। অযুগতি লোভ হেতু হারাইনু জীবন।।
কান্দিতে কান্দিতে ধোড়া বিষাদ ভাবিয়া। কোন কর্ম কৈনু মুঞি দোহাড়ি সাঁভ্যা।। ৪৫
[৩]বড় বড় নাগ আছে বিক্রমে প্রবল। যাহার ফণায় ঢাকে গগনমণ্ডল।।
হেন সব নাগগণ গেল পলাইয়া। আপনা খাইনু আমি আরতি মাথায়্যা।।[৩]
নিশ্চয় মরণ মোর লিখিল গোসাঞিঃ। বিষম ঠেঙ্গার ঘায় প্রাণ রক্ষা নাই।।
মোর কর্ম দৈবদোষে হেন শাস্তি ফলে। নিজ কার্য হেলা দিয়া ঝাপ দিনু জলে।।
রক্ষ মহেশ্বর সুতা কর প্রতিকার। এ ঘোর সঙ্কটে প্রাণ রক্ষহ আমার।। ৫০
কেমন মোচন হয়ে দৈব-নির্বন্ধন। দ্বিজ বিপ্রদাস বলে মনসা চরণ।।

১ 'শ্রীশ্রী কৃষ্ণ' (পত্রসূচক—এসো/২) ২ অনুদার (?) ৩ (নেই—এসো/২)

৩

কল্যাণ

অরুণ পূর্ণিত বেশি [১]তৃতীয়[১] প্রহর। ক্ষুধায় তৃষায় সব হইল ফাফর॥
ঊর্দ্ধমুখ হইয়া সব বেলি পানে চায়। দোহাড়ি হইতে ধোড়া বাহিরে পলায়॥
এক ডুবে ছাড়াইল বিঘা দশ বিশ। কতদূর গিয়া নাগ মনে বিমরিষ॥[২]
ভাবিয়া চিন্তিয়া নাগ না পায় পিরিত। না জানি কি করে আজি দেবী পদ্মাবতী॥ ৫৫
ভয়যুক্ত ধোড়া নাগ ধায় তরাতরি। উপনীত হইল মনসার বরাবরি॥
কাতর হইয়া নাগ কাঁপে থরহর। সকল বারতা কহে পদ্মার গোচর॥
শুনগো ঈশ্বর সুতা নিবেদন করি। যাইতে নারিনু মুঞি চাঁদোর নগরী॥
রাজার মন্ত্রণা কিছু বুঝন না যায়। [৩]পথা[৩] ফাঁদ পাতি বন্দী করিল আমায়॥
[৪]মারিবার[৪] অনুবন্ধ করিল আমারে। পলাইয়া [৫]আইনু[৫] অনেক পরকারে॥ ৬০
এতেক শুনিয়া রুষ্ট হইলা পদ্মাবতী। [৬]এক[৬] চক্ষু রক্তবর্ণ উঠে শীঘ্রগতি॥
কোপে পদ্মা মারে তারে[৭] নাথি[৭] দশ বিশ। কাড়িয়া লইল তার যত ছিল বিষ॥
শাপ দিল মর্ত্ত্যে গেল নির্ব্বিষ হইয়া। রুষিলা মনসা অতি বিষাদ ভাবিয়া॥
কালির নাগিনী কহে পরিহার করি। [৮]কিসেরে[৮] বিষাদ ভাব ত্রৈলোক্য ঈশ্বরী॥
মহীতলে কোন কর্ম অসাধ্য আমার। না কর বিষাদ আমি বধিব কুমার॥ ৬৫
[৯]হরষিত[৯] মনসা নাগিনী কৈলা কোলে। নানা বিধি প্রকারে তুষিয়া প্রিয় বোলে॥
তোমা হৈতে মোর কার্য হইবে সুসিদ্ধি। তোমার অসাধ্য নাহি তুমি মহাবুদ্ধি॥
বিলম্বে কী ফল আর নড় শীঘ্রগতি। দেবীর মধুর বাক্য নাগ হৃষ্ট মতি॥
শুভক্ষণে যাত্রা করে কালি নাগিনী। স্বস্তিক মঙ্গল পড়ে জয় জয় ধ্বনি॥
সুবুদ্ধি কুবুদ্ধি হইল নিদালি ঘুমালি। মর্ত্যপুরে প্রবেশ করিল জয়কালি॥ ৭০
দিনমণি অস্ত গেলা প্রদোষ সময়। হেনকালে নাগিনী চাঁদের পুরী যায়॥
প্রবেশে চাঁদোর পুরে প্রধান মন্দিরে। চালের বাতায় গিয়া রহে ধীরে ধীরে॥
ভোজন করিল তবে যত পরিজন। যার যে শয়ন স্থানে করিল শয়ন॥
আনন্দে শয়ন কৈল ছয় সুকুমার। দংশিবারে নাগিনী করিল অনুসার॥
নানা রঙ্গে বঞ্চয়ে চাঁদোর পুত্রগণ। দেখিয়া বলয়ে নাগ বিপ্রদাস গান॥ ৭৫

---

১ দ্বিতীয় (এসো/২) ২ 'শ্রী গুপীনাথ সিংহ মামিয়া হইয়াছে' (এসো/২) ৩ পথে (সু. সেন) ৪ ধরিবার (ঐ) ৫. আইলু (এসো/২) ৬ দুই (ঐ) ৭ লাথি (ঐ) ৮ উল্লসিত (ঐ)

৪

পাহিড়া রাগ

সর্বানন্দ নাম সর্বগুণ ধাম
রাজার জ্যেষ্ঠ নন্দন।
রমণী পুরুষে নিদ্রিত হরিষে
দেখি কৈল আগমন॥
সর্বাঙ্গ সুন্দর নাম পুরন্দর
পাশা খেলে ভার্যা সনে।

দেখি তার মুখ কালী মহাদুখ
চলিল বিষাদ মনে।।
দেখিয়া সুন্দর ব্যথিত অন্তর
[1]চাঁদরে[1] বলে কুবাণী।
পদ্মা সঙ্গে বাদ কৈল পরমাদ
হেন পুত্র মরে কেনি।।
অপর মন্দির তনয় সুন্দর
রমণী-রঙ্গরসে।।
তাহা দেখি কালী দয়ায় আকুলি
যায় আর গৃহবাসে।।
সর্বাঙ্গসুন্দর রত্ন অলঙ্কার
রমণী পুরুষে বঞ্চে।
নাম বিদ্যানন্দ সদাই আনন্দ
শৃঙ্গার-কৌতুকে আছে।। ৮০
আর ঘরে যায় নারায়ণ তায়
পূগপূর্ণ পূরি মুখে।
[2]কনেষ্ট নন্দন নাম জনার্দন
আর ঘরে রহে সুখে।।
রমণী পুরুষে বঞ্চয়ে হরিষে
নাগিনী দ্রবিদ মনে।[2]
এরূপে দংশিতে নাহি লয় চিতে
দ্বিজ বিপ্রদাস দুখে ভণে।।

১ চাঁদোরে (সু. সেন), ২ (নেই—এসো/২)

৫

পয়ার

দয়ায় আকুলি কালি পাড়ে গালাগালি। মনসা নিন্দিয়া চাঁদো [1]কোন[1] কর্ম কৈলি।।
হেলায় শ্রদ্ধায় যদি পূজ বিষহরি। তবে কেন মরে মোর রূপের মুরারি।।
নিদালি ঘুমালি তবে দিল পুরিজনে। শিয়রে বসিল কালি দংশিবার মনে।। ৮৫
দেখি কুমারের রূপ বেথিত অন্তরে। না দিব দন্তের ঘাত বধিব [2]প্রকারে।।[2]
রসইশালায় নাগ গেল শীঘ্রগতি। মুচায় অন্নের শরা বিবাদিত মতি।।
বহু বিমরিষ করি অন্নে এড়ে বিষ। গুপ্তবেশে নাগিনী রহিল বিমরিষ।।
প্রভাত সময় উঠে ছয় যুবরাজ। পড়িবারে শায় সুখে গুরুর সমাজ।।
ভয়ে কালি-নাগিনী ভাবয়ে মনে মন। বিষ অন্ন খায়্যা পাছে মরে পরিজন।। ৯০
কার্যসিদ্ধি নহিল হইল লজ্জা [3]মোরে[3]। কুবুদ্ধি লইয়া নাগ চলিল [4]সত্বরে[4] ।।
যথায় পড়িতে যায় ছয় যুবরাজ। কুবুদ্ধি লইয়া নাগ দিল তার মাঝ।।
ছয় ভাই যুগতি করিয়া সেইখানে। উপনীত হইল মায়ের বিদ্যমানে।।

মায়ের অগ্রেতে সভে কহে পরিহারে। অন্ন খায়্যা যাব মোরা পড়িবার তবে।।
শুনিয়া সনকা রামা বধূ প্রতি বলে। স্নান করি আসি অন্ন দেহ কুতূহলে।। ৯৫
সনকার বাক্যে বধূ চলিল তুরিতে।[৫] সরোবরে গেলা সভে হাসিতে খেলিতে।।
অপ্‌সরী কিন্নরী জিনি রূপের তুলনা। তপ ছাড়ি ব্যাকুল হইল মুনিজনা।।
নিজসুখে করে সভে অঙ্গের মার্জন। [৬]হেরিযা[৬] সকল লোক [৭]মোহিত মগন[৭]।।
তপত কাঞ্চন জিনি বরণ উজ্জ্বল। শশী জিনি পূর্ণ আভা বদনমণ্ডল।।
তিল ফুল জিনি নাসা খঞ্জননয়ানী। [৮]ভ্রূযুগ[৮] শোভা কবে কামধনু জানি।। ১০০
দশন মুকুতা-পাতি অধর সুরঙ্গ। মৃণাল জিনিয়া ভুজ মদন-তরঙ্গ।।
কনক কমল-কলি পীন পয়োধর। ক্ষীণ মধ্য নিতম্ব নিবিড় মনোহর।।
রম্ভা তরু জিনি উরু চরণে নূপুর। রুনু ঝুনু বাজে অতি শুনিতে মধুর।।
[৯]এক[৯] এক মেলি হৈয়া জলক্রীড়া করে। ফুটিল কমল যেন সরোবরনীরে।।
নানারত্ন মণিময় রত্ন অভরণ। হীরা মণি চুনি দীপ্ত করিছে সঘন।। ১০৫
জলক্রীড়া করি সভে উঠিল ডাঙ্গায়। আস্তে ব্যস্তে সহচরী বসন যোগায়।।
ছয় বধূ স্নান করি চলিল তুরিত। [১০]রন্ধন[১০]শালায় গিয়া হইল উপনীত।।
[১১]সুগন্ধী[১১] সুপক্ক তৈল মর্দন করিয়া। ছয় ভাই স্নানে গেল হরষিত হইয়া।।
জলক্রীড়া করিয়া সানন্দে কৈল স্নান। যার যেই যোগ্য বস্ত্র দাসেতে যোগান।।
সুগন্ধী চন্দন পুষ্পমাল্য অঙ্গে সাজে। সরোবর হইতে আইল [১২]পুরী[১২] মাঝে।। ১১০
ভোজনের স্থান হইল বিচিত্র আসন। সানন্দে বসিলা সভে করিতে ভোজন।।
পঞ্চত্ব [১৩]আগত[১৩] উপসন্ন হইল কাল। কিছুই না জানে কেহ এতেক জঞ্জাল।।
সুবর্ণের থালে অন্ন ব্যঞ্জন পুরিয়া। প্রত্যক্ষে সভারে [১৪]বধু[১৪] দিলেক আনিয়া।।
কাল অন্ন দেখিয়া করয়ে অনুমানে। ছয় ভাই বসিয়া ভাবয়ে মনে মনে।।
ডাকিয়া জিজ্ঞাসে সভে জননীর প্রতি। কাল কেন দেখি অন্ন কহ শীঘ্রগতি।। ১১৫
কুবুদ্ধি সনকা রামা বুঝায় পুত্রেরে। হস্ত পাখালিল বধূ থালের উপরে।।
সেই জল অন্নে দিল হইয়া বিসরণ। না কর বিস্ময় পুত্র করহ ভোজন।।
এক ভাই বলে সভে শুনহ বচন। পরীক্ষিয়া এই অন্ন করিব ভোজন।।
সভে বলে জননীর আজ্ঞা লঙ্ঘি নাই। [১৫]এ অন্ন খাব[১৫] তবে যে করে গোসাঞি।।
জ্যেষ্ঠ ভাই সর্বানন্দ কহে সভা প্রতি। ভদ্রাভদ্র হউক সভার একগতি।। ১২০
একে কালে সভে অন্ন করিব ভোজন। সভে মেলি সত্য করি দৃঢ় করি মন।।
গণ্ডূষ করিলা পঞ্চ ভাই ছয় জন। জিহ্বায় ভেদিল বিষ চমকিত মন।।
কিছু অন্ন খায় মাত্র ছয় সহোদর। জিহ্বা আড়াইল অন্ন না যায় উদর।।
অন্ন তেজি ছয় ভাই ভাবয়ে বিষাদ। দেখিতে দেখিতে ভাই পড়িল প্রমাদ।।
বচন না আইসে মুখে ঘোর দুই আখি। গরল [১৬]ভক্ষিনু[১৬] ভাই হেন প্রায় দেখি।। ১২৫
কুবুদ্ধি পাইল পথে পড়িবারে যাইতে। নেউটিয়া ছয় ভাই আইনু মরিতে।।
কোলাকুলি ছয় ভাই করেন ক্রন্দন। নিশ্চয় জানিল রক্ষা নাহিক জীবন।।
পরলোকে যাই ভাই চিন্ত নারায়ণ। এহো লোকে এই বিনে নাহি দরশন।।
পুত্রের ক্রন্দন তবে শুনিয়া সনকা। প্রমাদ গণিল রানী মুখে নাহি রা।।
পুত্র পুত্র বলি রানী ডাকে ঘনে ঘন। জননী চাহিয়া সভে করেন ক্রন্দন।। ১৩০
প্রমাদ পড়িল তবে ছয় পুত্র লৈয়া। বিপ্রদাস বলে পদ্মা চরণ [১৭]ধেয়াইয়া[১৭]।।

১ কেন (এসো/২) ২ পরকারে (ঐ) ৩ মোর (ঐ) ৪ সত্বর (ঐ) ৫ 'শ্রীকৃষ্ণ শরণং' (পাদ পূরণ—এসো/২) ৬ মন সুখে (সু সেন) ৭ মুচিত লঘন (এসো/২) ৮ ভুরু যুগে (ঐ) ৯ সভে (ঐ) ১০ রসুই (ঐ) ১১ সুগন্ধ (সু সেন) ১২ পুর (এসো/২) ১৩ আগল (সু. সেন) ১৪ মধু (এসো/২—এটি শ্রুতিলিখনেব ভুল) ১৫ অন্ন খা[ই]ব (সু. সেন) ১৬ ভখিনু (এসো/২) ১৭ ধ্যায়াইয়া (সু. সেন)

৬

পটমঞ্জরী

ভক্ষণ করিয়া অন্ন কাল হইল উপসন্ন
[১]মর্মে মর্মে[১] ভেদিল গরল।
বিষম বিষের জ্বালে হৃদয় জঠর জ্বলে
শরীরে নাহিক আর বল॥
কেহ বৈসে কেহ উঠে কেহ শোয় ধরা পিটে
কেহ কেহ করে বিমরিষ।
কেহ কেহ বলে ভাই ঘন কেন উঠে হাঁই
নিশ্চয় ভক্ষণ কৈনু বিষ॥
জননী করিয়া কোলে বিষাদ ভাবিয়া বলে
এ দুঃখে কেমনে আজি তরি।
থর হরি কাঁপে প্রাণী বদনে নাহিক বাণী
দুই আখি মেলিতে না পারি॥
ছয় ভাই ভেঙে ভাত বসনে মুছিল হাথ
খিতি-তলে শুইল সকল।
উন্মত্ত পাগল বেশ কেহ নাহি বাঁধে কেশ
ছয় বধু হাসিয়া বিকল॥ ১৩৫
বিষ ভ্রমে কলেবরে কেহ কাঁপে থরহরে
কেহ দূরে ফেলায় বসন।
কেহ মা বলিয়া ডাকে [২]কারো[২] বা নাহিক মুখে
কেহ কেহ করয়ে ক্রন্দন॥
কেহ সকাতর হৈয়া হৃদয় বেদনা পায়্যা
জননী চাপিয়া ধরে কোলে।
[৩]কেন[৩] গো জননী হেন কহ মোরে সম্বিধান
সর্বাঙ্গে আনল হেন জ্বলে॥
থরহরি কাঁপে গা প্রাণদান দেহ মা
হের দেখি সংসার অসার।
যাই হের পরলোক দেখি তো তোমার মুখ
দরশন নাহি আরবার॥
[৪]বদন্তি[৪] সনকা জায়া না বুঝি পুত্রের মায়া
কিবা খায়্যা পাতিয়াছে কাপ।

চিন্তিয়া সনকা ভয় তেতুলি গুলিয়া দেয়
আনল জ্বালিয়া দেয় তাপ।।
তেতুলি-অগ্নিস্পর্শে সর্বাঙ্গ জ্বলিল বিষে
ছয় ভাই হরিল চেতন।
ভাবিয়া মনসাদেবী দ্বিজ বিপ্রদাস কবি
ঢলিয়া পড়িল ছয়জন।। ১৪০

১ লোমে লোমে (সু সেন) ২ কাব (ঐ) ৩ কেহ (এসো/২) ৪ বোদন্তি (ঐ)

৭

করুণা রাগ

পুত্রের বদন রামা নেহালিয়া চায়। নাড়িয়া চাড়িয়া দেখে চেতন না পায়।।
নাসিকা বদনে কিছু নাহি পায় শ্বাস। পড়িল ধরণীতলে হইয়া হতাশ।।
কান্দে কান্দে সনকা হইয়া ব্যাকুলী। কে হরিয়া লৈল পুত্র সোনার পুথলি।।
একে কালে কোন পাপে হৈল যম দণ্ড। স্বর্ণগিরি ভাঙ্গি যেন হৈল খণ্ড খণ্ড।।
না জানি পুত্রের শোক জন্মিয়া সংসারে। কে মোরে ফেলিল বান্ধি এ শোকসাগরে।। ১৪৫
[১]নিঠুর[১] পদ্মার নাগে পুত্র মোর দংশে। তর্পণ করিতে ক্ষিতি না থুইল বংশে।।
অনাথিনী করি পুত্র এড়ি যাহ মোরে। কেন বা পাপিষ্ঠ প্রাণ আছয়ে শরীরে।।
বারেক পৃথিবী মোরে দেহ তো বিদায়। তথি প্রবেশিয়া হব শোকসিন্ধু পার।।
সনকা ক্রন্দনে কান্দে যত পুরীজন। দ্বিজ বিপ্রদাস বলে মনসা চরণ।।

১ নিষ্ঠুর (এসো/২)

৮

মথা রাগ

ছয় কুমারের মৃত্যু ছয় বধূ দেখিয়া। উচ্চস্বরে কান্দে মৃত পতি কোলে লৈয়া।। ১৫০
রোদন্তি যুবতি অতি পতি করি কোলে। রূপগুণ ভাবিতে বুড়িল শোকজলে।।
উর্ধ্বমুখে ঝাউয়া দাসী ধাইল সত্বর। নৃপতিরে কহিল গিয়া যতেক [১]আতান্তর[১]।।
পুত্রের মরণ শুনি রাজা চমৎকার। শোকেতে কাতর [২]হয়্যা[২] করে হাহাকার।।
এখনি দেখিনু পুত্র রূপের মদন। [৩]কেনি[৩] বা পুত্রে হেন বল কুবচন।।
ঝাউয়া দাসী বলে রাজা মিথ্যা নহে বাণী। হয় নয় নৃপবর দেখহ আপনি।। ১৫৫
তবে চাঁদো রাজা গিয়া তনয় নেহালে।[৪] শোক দুঃখে হাহাকার পুত্র লৈয়া কোলে।।
রূপে গুণে পুত্র মোর অভিন্ন মদন। হেন পুত্র মৈল মোর তেজিব জীবন।।
এখনি দেখিনু পুত্র মরিল এখনি। আন নহে মোর পুত্র লৈয়া গেল কানি।।
মনসার নিন্দা শুনি রানী [৫]বড়ো[৫] রোষে। সর্বনাশ হৈল রাজা তোর দন্তদোষে।।
হরিল ব্রহ্মজ্ঞান কুবুদ্ধি তোমার। ধন্বন্তরি ধনা-মনা মৈল ধুন্ধমার।। ১৬০
যদি রাজা পূজ তুমি মনসাকুমারী। কেন পুত্র মরিবেক রূপের মুরারি।।
ক্রুদ্ধ হৈয়া বলে রাজা চাঁদ অধিকারী। দৈব-দোষে পুত্র মৈল কি করিতে পারি।।
তোমা আমা কুশলে থাকিলে দুইজন। দুই [৬]বৎসরের পরে[৬] হবে [৭]এক এক[৭] নন্দন।।

তপস্যা করিয়া আমি মাগি লব বর। দ্বাদশ বৎসরে [৮]হবে[৮] ছয় কুলধর।।
গণ্ডবেদনাতে যেন মুদ্গরের ঘা। পুত্র পুত্র বলিয়া অধিক বাড়ে রা।। ১৬৫
[৯]মাজস[৯] গড়াও ঝাটো বলে চাঁদো রাজ। ভাসাব কানির মড়া রাখিয়া কি কাজ।।
পাত্র মিত্র পুরোহিত বলে সম্বিধান। অগ্নিকার্য শ্রাদ্ধ কর শাস্ত্রের বিধান।।
তবে চাঁদো রাজা বলে হইয়া ক্রোধিত। দক্ষিণার লোভে সভে কহ অনুচিত।।
কানির উচ্ছিষ্ট ধুঁয়া ভ্রমিব নগরে। অপমান কানি তবে বলিব আমারে।।
মালাকার ডাকি আনে সেবক সত্বর। মাজস গড়িয়া দেহ বলে নৃপবর।। ১৭০
আজ্ঞা পাইয়া মালাকার নাহি করে হেলা। মাজস করিল সজ্জ আনি রামকলা।।
রত্নময় অলঙ্কার ভূষিত কুমার। স্নান করি শোয়াইল মাজস ভিতর।।
অনুগত জন [১০]কত[১০] মাজস ধরিয়া। [১১]গুঙ্গড়ি গঙ্গের[১১] জলে দিল ভাসাইয়া।।
মহাগণ্ডগোল হইল ক্রন্দনের রোল। দুকূলের প্রজালোক কাঁদিয়া বিকল।।
মাজসে চড়িয়া কালি হরিষ অন্তর। অবিলম্বে লই আনে মনসা গোচর।।
দেখিয়া মনসা মনে হরিষ [১২]অপার[১২] যত্নে সম্বরিয়া [১৩]থুইলা[১৩] চাঁদোর কুমার।।
ভাবিয়া মনসা নেতো করে অনুমান। এখন কেমনে পূজে বল সম্বিধান।।
তবে নেতো হৃদয় ভাবিয়া নিরবধি। বিশেষ জানিয়া মনে বলে কার্যসিদ্ধি।।
অনিরুদ্ধ উষা হরি আন ইন্দ্রপুরে। [১৪]লখাই জন্মাও[১৪] তবে সনকা-উদরে।।
উজানি নগরে বৈসে [১৫]সাহে[১৫] সদাগর। বেহুলা জন্মাও তার রমণী-উদর।। ১৮০
চাঁদোরে বিদায় করো অনুপাম-পাটনে। বহু দুঃখ দিয়া পথে আনিবা রাজনে।।
বিবা-রাত্রে লখাই দংশিব লোহঘরে। মৃত পতি কোলে লৈয়া মাজস ভিতরে।।
আসিবে বেহুলা ভাসি অমরনগরে। জিয়াইয়া পুনর্বার পাঠাব দেশেরে।।
মৃত পুত্র পায়্যা রাজা পূজিব তোমায়। শুনিয়া হরিষ হৈল অস্তিকের মায়।।
স্বপ্ন কহিবারে যান চাঁদোর নগরী। দ্বিজ বিপ্রদাস বলে কর জোড় করি।। ১৮৫

---

১ আবান্তর (সু সেন) ২ হইয়া (ঐ) ৩ কেন (ঐ) ৪ 'শ্রীকৃষ্ণ' (এসো/২—পাদপূরক) ৫ বলে (সু. সেন) ৬ সমবৎসরে (ঐ) ৭ ক এক (ঐ) ৮ হব (ঐ) ৯ মান্দাস (এসো/২) ১০ যত (ঐ) ১১ অমনি গঙ্গার (ঐ) ১২ আপার (সু. সেন) ১৩ থুল (এসো/২) ১৪ নখাই জর্মাও (সু. সেন) ১৫ সায় (এসো/২)

৯

সুহাই[১]

চাঁদো নৃপবর হেতু মায়ার মুরতি। [২]অবিলম্বে[২] পশুপতি হৈলো পদ্মাবতী।।
শিরে বিপরীত জটা বিভূতিভূষণ। করেতে ডুম্বুর শিঙ্গা [৩]বলদা[৩] বাহন।।
[৪]বসিলা[৪] শঙ্করসুতা চম্পকনগরে। হর বেশ ধরি [৫]বৈসে[৫] চাঁদোর শিয়রে।।
চন্দ্র সূর্য জিনি তেজময় ত্রিলোচন। নির্মল ললাটে চন্দ্র উজ্জ্বল সঘন।।
বিচিত্র রুদ্রাক্ষ গলে অস্থিমালা সাজে। গঙ্গা তরঙ্গিনী [৬]ধারণ করিলা শির[৬] মাঝে।। ১৯০
বিভূতিভূষণ অতি সকল শরীরে। বসিলাত ভগবতী চাঁদোর শিয়রে।।
মায়ায় মোহিয়া তারে কহিল স্বপন। দ্বিজ বিপ্রদাস বলে মনসা-চরণ।।

---

১ 'শ্রী গোপীনাথ সিংহ' (এসো/২) ২ অভিনব (সু. সেন) ৩ বসোয়া (ঐ অর্থ?) ৪ চলিল (এসো/২) ৫ তবে (ঐ) ৬ বহে শিরোরুহ (সু. সেন)

১০

পয়ার

কপট করুণা ভাবে চাঁদোরে বুঝায়। আমি মহাদেব তোরে করি পরিচয়॥
মনসা কুমারী যত দুঃখ দিল তোরে। সেসব দেখিয়া দয়া লাগিল আমারে॥
তোর হেতু যাব আমি অনুপাম-পাটনে। তথায় আইস নৌকা করিয়া সাজনে॥ ১৯৫
পুনরপি তথা তোরে শিখাইব জ্ঞান। পাইবে সকল জ্ঞান আমা বিদ্যমান॥
ধন্বন্তরি ধনা-মনা ছয় পুত্র লৈয়া। [১]আসিহ[১] দেশেরে পুন হরষিত হইয়া॥
স্বপ্ন কহি মনসা হইলা অন্তর্ধান। নিদ্রাভঙ্গ চাঁদো রাজা হইলা চেতন॥
প্রাতঃক্রীড়া নিয়মিত কবিল রাজন। তুলসীর পত্র শিবে ললাটে চন্দন॥
কনকের ছত্র শিরে বসি দণ্ড-পাটে। পাত্র মিত্র আমাত্য বসিল রাজ-ঠাটে॥ ২০০
পুরোহিত পণ্ডিত আনিল সন্বিধান। স্বপ্ন কহে নরপতি সভা বিদ্যমান॥
আজ নিশি অবশেষ দেখি উপদেশ। খণ্ডিল এতেক দিনে মোর দুঃখক্লেশ॥
বাপু মহাদেব মোর শিয়রে বসিয়া। পরিচয় দিলা মোরে করুণা ভাবিয়া॥
সদয় হৃদয় বাক্য বলিলা আমায়। ঘুচিবে সকল দুঃখ আমার সভায়॥
প্রভু বৈলা যাব আমি অনুপাম-পাটন। তথাকারে আইস পুত্র তুরিত-গমন॥ ২০৫
তথাকারে গেলে দিবেন মহাজ্ঞান। পুত্র সভে পাব আর ওঝা পরিজন॥
[২]তুরিতে করহ মোরে[২] বুহিত্র-সাজন। অবিলম্বে যাব আমি অনুপাম-পাটন॥
পাত্র মিত্র বলে সভে শুন নৃপমণি। নৃপতি পাটনে যাত্রা কভু নাহি শুনি॥
সনকা রমণী তবে প্রভুরে বুঝায়। এথায় ইন্দ্রের পুরী গেল মনসার॥
পদ্মার চরণ-পদ্ম-মধুগন্ধ লোভে। দ্বিজ বিপ্রদাস তথি ভৃঙ্গরূপে শোভে॥ ২১০

---

১ আসিবে (এসো/২) ২ হরষিতে কর মোর (ঐ)

১১

শ্রীরাগ

বিচিত্র নিমাণ পুরী মহিমা বলিতে নারি
বিশ্বকর্মা নির্মাইল যত্নে।
কহিব কতেক লীলা মরকত মণি পলা
প্রবাল মুকুতা নানারত্নে॥
ধন্য ধন্য সুরপতি শচী সঙ্গে লৈয়া তথি
বসিয়াছে [১]রসক্রীড়া-সুখে[১]।
গন্ধর্ব কিন্নরে স্তুতি সদাই আনন্দমতি
কর্পূর তাম্বুল পূগ মুখে॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু ত্রিলোচন মুনি ঋষি দেবগণ
পবন শমন দিবাকর।
বরুণ [২]অনিল নীল[২] অরুণ কুবের [৩]আইল[৩]
গণপতি অগ্নি শশধর॥

লক্ষ্মী আর সরস্বতী ছায়া সঙ্গে বসুমতী
বসিলা সকল দেবগণ।
যক্ষ রক্ষ বিদ্যাধর অপছর কিন্নর আর
বড় হরষিত দেবগণ॥
হেনকালে বিষহরি উপনীত সেই পুরী
দেবসভা দেখি আনন্দিত।[৪]
জনমে জনমে সেবি ভাবিয়া মনসাদেবী
দ্বিজ বিপ্রদাস বিরচিত॥ ২১৫

১ ইন্দ্র নানা সুখে (এসো/২—এই লিপিকর 'সুরপতি' যে ইন্দ্র সেটা ভুলেছেন) ২ অনল আদি (এসো/২) ৩ আদি (ঐ) ৪ 'শ্রী গোপিনাথ সিংহ' (ঐ)

১২

পয়ার

মনসা দেখিয়া অতি সম্ভ্রমে সকলে। বিচিত্র আসনে বসাইল কুতূহলে॥
জিজ্ঞাসিলা সাদরে গমন কি কারণ। হরিষে মনসাদেবী কহেন কারণ॥
মর্ত্যপুরে নিন্দা করে মোরে চাঁদো রাজা। তুমি অনুবল হৈলে লই তার পূজা॥
[১]অনিরুদ্ধ উষা[১] দেহ সুর-অধিকারী। তবে সে চাঁদেরে পূজা আমি নিতে পারি॥
ইন্দ্র বলে [২]অনিরুদ্ধ[২] আমাত্য আমার। ইহা এড়ি জননী লইয়া যাহ আর॥ ২২০
শুনিয়া মনসাদেবী কহেন তখন। অন্য হইতে মোর কার্য নহিবে সাধন॥
নৃত্য করিবার আজ্ঞা দেহ বিদ্যাধরে। তালভঙ্গ হইলে শাপ তুমি দেহ তারে॥
তবে ইন্দ্র রাজা উষা অনিরুদ্ধ প্রতি। নৃত্য করিবারে আজ্ঞা দিলা শীঘ্রগতি॥
আজ্ঞা পায়্যা নানা রঙ্গে সাজে নটবেশ। নটবর-ছাঁদে নাট-স্থানে পরবেষ॥
মৃদঙ্গ রবাব আর বীণা সপ্তস্বরা। রুদ্র কপিনাস যন্ত্র বাজে মনোহরা॥ ২২৫
তাল ধরি নৃত করে গায় সুললিত। দৈব যোগে তাল ভঙ্গ হইল আশ্চম্বিত॥
কোপানলে সুরপতি একদিষ্টে চায়। তালভঙ্গ দোষ ইন্দ্র শাপ দিল তায়॥
মনসারে আজ্ঞা দিলা সুর-অধিকারী। লৈয়া যাও পাপিষ্ঠ [৩]জন্মাও[৩] মর্ত্যপুরী॥
কান্দে অনিরুদ্ধ শাপ পাইয়া দারুণ। [৪]নৃতরত[৪] বিদ্যাধর সরস করুণ॥
পদ্মার চরণে উষা করে পরিহার। দ্বিজ বিপ্রদাস বলে মনসা কিঙ্কর॥ ২৩০

১ অনিরুদ্র উষা (সু. সেন) ২ অনিরুদ্র (ঐ) ৩ জর্মাও (ঐ) ৪ মৃতাবৎ (এসো/২)

১৩

গান্ধার

মনসা ধরিল শীঘ্র [১]অনিরুদ্ধ[১] করে। তাহা দেখি [২]উষা[২] বালি কান্দিয়া নিস্বরে॥
কোথা কোন দেবের নয়ানে ধারা গলে। করুণা করয়ে সভে বাড়ে উতরোলে॥
কান্দে উষা বালি মনসার ধরি পায়। এড়হ প্রভুর হাত [৩]ভজি হে[৩] তোমায়॥
প্রদ্যুম্ন শ্বশুর মোর কৃষ্ণের নন্দন। নৃত্য গীত রঙ্গে বঞ্চি ইন্দ্রের সদন॥

কোন কালে তব পদে দোষ নাহি করি। কেন প্রাণনাথ মোর লৈয়া যাহ হরি॥ ২৩৫
স্বামী মোর মহাশয় সর্বত্র মহিমা। আপনি ভবানী তুমি [৪]সিরজিলা[৪] আমা॥
ক্ষেণেক বিলম্ব কর কহি সর্ববাণী। দ্বিজ বিপ্রদাস বলে মুড়ি যুগ পানি॥

১ অনিরুদ্র (সু. সেন) ২ উষা (ঐ) ৩ ভজিবে (এসো/২) ৪ নিয়োজিলা (সু. সেন)

১৪

পটমঞ্জরী

শুন গো মনসাদেবী বিশেষে হৃদয় ভাবি
বর দিলা হৈয়া সুবেথিত।
কৃষ্ণা চতুর্দশী রাত্রি যে তোমার ভজে পতি
সেই পতি তোমা নিয়োজিত॥
দৈব-স্বপনে রতি অনিরুদ্ধ সংহৃতি
চিত্রলেখা জানিল বিশেষে।
অনেক যতন করি আনিল আমার পুরী
বিবাহ করিল গুপ্ত বেশে॥
বেকত গুপত কাজ বাপ মোর বাণ রাজ
পাঠাইল বহু সেনাপতি।
প্রভু যুদ্ধ কৈল যত সর্ব সৈন্য হৈল হত
শুনিয়া [১]সাজিল[১] নরপতি॥ ২৪০
মহা সংগ্রামের রোষে প্রভু বন্দি নাগপাশে
শুনি কামদেব নারায়ণ।
সাজিয়া আইলা [২]হরি[২] প্রবেশে বাপের পুরী
আগুনের গড় নিবারণ॥
রক্ষিতে বাপুর পুরী মহাদেব যুদ্ধ করি
নন্দী আদি করিয়া ভৈরব।
হরি হর দুই জন অন্যে অন্যে করি রণ
বাণ রাজা কৈলা পরাভব॥
চণ্ডিকা সদয় করি আসি সেই [৩]বাণপুরী[৩]
রক্ষিবারে বাণ মহারাজে।
বস্ত্র এড়ি দিগম্বরী যুদ্ধ নিবারণ করি
হেট মুণ্ডে সভে হৈলা লাজে॥
রক্ষিলেন বাণ রাজ তাহার সহস্র ভুজ
প্রভুর বন্ধন বিমোচন।
বাণ রাজা আসি তবে মোর বিভা দিল যবে
রত্ন আদি দিল নানা ধন॥
বহু স্তুতি করি বাণ পাঠাইল নারায়ণ
হরিষে আইলা দ্বারিকায়।

আমারে পীড়িত বিধি তেজিয়া সে সব নিধি
রঙ্গে বঞ্চি ইন্দ্রের সভায়।। ২৪৫
শাপ দিল সুরপতি তুমি [৪]রাখ[৪] মোর পতি
তুয়া পায়ে লইল শরণ।
তোমার চরণ গতি অন্য নাহি লয় মতি
দ্বিজ বিপ্রদাস বিরচন।।

১ জানিল (এসো/২) ২ পুরি (সু সেন) ৩ বণস্থলী (ঐ) ৪ বাম (ঐ)

১৫

পয়ার

দেবী বলে পূর্বকথা কর অবধান। অনেক বৎসর মোরে করিলা সেবন।।
তবে বর দিলা আমি বেথিত-হৃদয়। তিন জন্মে মোক্ষ বর পাইবা নিশ্চয়।।
তোহার প্রথম [১]জন্ম[১] উজনি নগরে। পূর্ব জাতি বিসরণ নহো মোর বরে।।
তুমি রত্ন তব পিতা পুষ্পরাজ রাজা। বিবিধ প্রকারে আমা করিলে ত পূজা।। ২৫০
তবে আর [২]জন্ম[২] এই বাণ রাজা ঘরে। [৩]অনিরুদ্ধ জন্ম[৩] এথা রতির উদরে।।
রাজ-ভোগে বিসরিলা আমার সেবন। এই [৪]জন্ম[৪] মোক্ষ বর পাব দুইজন।।
এখনে [৫]জন্মিবা[৫] সাহে সুমিত্রা-উদরে। বেহুলা তোমার নাম উজানি-নগরে।।
লখিন্দর নাম [৬]জন্ম[৬] চম্পকনগরে। [৭]চান্দর[৭] হইব পুত্র সনকা-উদরে।।
চাঁদোয়ে সিজাইয়া দিবা লোহার কলাই। লোহার মন্দিরে সাপে খাইবে লখাই।। ২৫৫
মাজাসে ভাসিয়া যাবে আমা বিদ্যমানে। নৃত্য করি লখাই জিয়াইবে দেবস্থানে।।
চাঁদোর ছয় পুত্র আর দিব জিয়াইয়া। [৮]দেশে[৮] যাইতে নৌকা ধন দিব ত তুলিয়া।।
চাঁদোরে বুঝাইয়া পূজা করহ প্রচার। মোক্ষবর পাইয়া [৯]আসিবা[৯] পুনর্বার।
না কর বিলাপ সতী কর আগমন। ওথা কামদেব শুনি পুত্রের মরণ।।
অবিলম্বে আসি কাম ইন্দ্রের ভুবন। দেখিয়া পুত্রের মুখ বিষাদবদন।। ২৬০
পদ্মার চরণপদ্ম-মধুগন্ধ-লোভে। দ্বিজ বিপ্রদাস ভণি ভৃঙ্গরাগে শোভে।।

১ জর্ম (সু. সেন) ২ জর্ম (ঐ) ৩ অনিরুদ্র জর্ম (ঐ) ৪ জর্ম (ঐ) ৫ জর্মি (ঐ) ৬ জর্ম (ঐ ৭ চান্দোর (ঐ) ৮ দেশেরে (এসো/২) ৯ আসিবে (ঐ)

কৌ রাগ

পুত্রের বদন দেখি কামদেব মহাদুখি
মনসারে বলে রুষ্টবাণী।
দেব হইয়া বাদ কর [১]মানবে জিনিতে নার[১]
পুত্র মোর লইয়া যাও কেনি।।
এড়হ আমার পুত্র রূপ-মুরারি।[২]
কেনো পুত্র লইয়া যাও হরি।।

[৩]জন্মিয়া[৩] দেবের পুরে কারো মন্দ নাহি করে
  কারো ধন নাহি করে চুরি।
রতির নন্দন হয় তব সঙ্গে কিবা দায়
  কোনো পুত্র লই যাও ধরি॥
বিদ্যাধরগণ সঙ্গে নৃত্য গীত নানা রঙ্গে
  নিবসে ইন্দ্রের বিদ্যমানে।
ভুবনে দুর্লভসার পুত্র বিনে নাহি আর
  না দেখিয়া বঞ্চিব কেমনে॥ ২৬৫
জননী পুত্রের দেখি হৃদয় পরমদুঃখী
  কান্দে বালা অঝর নয়নে।
যত বিদ্যাধরগণ দেখিয়া বেথিত মন
  দ্বিজ বিপ্রদাস বিরচনে॥

---

১ মানব জীবন ধবো (এসো/২) ২ 'শ্রী গোপীনাথ সিংহ সুষুড়িয়া ঝিয়া মামি' (ঐ) ৩ জর্মিয়া (সু সেন)

১৭

পয়ার

মনসা বলেন কাম বুঝাই তোমারে। অকারণে তুমি ক্রোধ করিলা আমারে॥
নৃত্য করে [১]অনিরুদ্ধ[১] ইন্দ্রের সভায়। তাল-ভঙ্গ হৈলে সাঁপ দিল দেব-রায়॥
বিশেষ আমার কার্য আছে মর্ত্যপুরী। এই হেতু তোষে মোরে ইন্দ্র অধিকারী॥
অকারণে অহঙ্কার করিল আমারে। ইন্দ্রস্থানে সাধি লাও আপন কুমারে॥ ২৭০
তোর ঠাঞি মাগি যবে করি নিবেদন। অসাধ্য আমার কার্য না করিহ মন॥
মনসার স্থানে পাইল নিষ্ঠুর বচন। বিষাদ ভাবিয়া কাম করিল গমন॥
অনিরুদ্ধ ঊষা প্রতি বলে বিষহরি। বিলম্বের কি আর ফল চল মর্ত্যপুরী॥
পদ্মা প্রতি ঊষা বালি করে নিবেদন। খানিক বিলম্ব করো দেখি ইষ্টগণ॥
সর্ব বিদ্যাধরগণে মাগিল মেলানি। ছাড়িল অমরপুরী মায়া মোহ জানি॥ ২৭৫
চিরদিন সুখ বঞ্চি সভার সংহতি। সভাই থাকিলা সুখে আমি অধোগতি॥
শুনি বিদ্যাধরগণ সভে দুঃখমন। ইঁহার বিচ্ছেদ হেতু করেন ক্রন্দন॥
মনসার ভয় ভাবি করিলা গমন। দাঁড়ায়্যা ইন্দ্রের কাছে করয়ে ক্রন্দন॥
সেবিনু অনেক কাল অকারণে তোমা। তিল-এক দোষে হেন শাস্তি কর আমা॥
ক্ষেমা না করিলা অতি দারুণ হৃদয়। মর্ত্যপুর যাই আমি মাগিনু বিদায়॥ ২৮০
কিছু না বলিল ইন্দ্র চক্ষে নাহি চাহে। হাথে ধরি পদ্মাবতী লইলেন দুঁহে॥
মনসা সহিত দুহে চলিলা তুরিত। মন্দার পর্বতে গিয়া হইল উপনীত॥
নিশ্চয় মরণ জানি কান্দে কোলাকুলি। ধরিয়া পদ্মার পায় করে পুটাঞ্জলি॥
সত্য করো মোর সঙ্গে শুন বিষহরি। জাতিস্মর হব আমি গিয়া মর্ত্যপুরী॥
যখন চিন্তিব আমি আসিবা তখনি। পদ্মা বলে এই মত দৃঢ় কৈল্য আমি॥ ২৮৫
মন্দার পর্বতে দুহে শরীর ছাড়িল। দুহাকার প্রাণ লইয়া মনসা চলিল॥

রথ ভরে গেলা দেবী চম্পক নগরে। উপনীত হইল গিয়া চাঁদোর বাসরে।।
রিতু-স্নান করিয়াছে সনকা-সুন্দরী। পতি সঙ্গে রঙ্গে কেলি বঞ্চে যত্ন করি।।
লখাই [২]জন্মান[২] দেবী সনকা উদরে। গর্ভবতী সনকা জানিল সর্বজনে।।
পঞ্চম মাসের গর্ভ হইল উপসন্ন। চাঁদো রাজা যুক্তি করে যাইতে পাটন।। ২৯০
পাত্রমিত্র পুরোহিত আনিল সত্বর। বলিতে লাগিল রাজা সভার গোচর।।
স্বপ্নে মহাদেব মোর হইলা সদয়। জ্ঞান পুত্র পাটনে পাইব সুনিশ্চয়।।
যতনে পালিহ রাজ্য যত পুরীজন। সনকা রমণী মোর করিহ পালন।।
সনকা বলেন প্রভু শুনহ বচন। দ্বিজ বিপ্রদাস বলে মনসা চরণ।।

---

১ অনিরুদ্র (সু সেন) ২ জর্মান (ঐ)

১৮

কামোদ রাগ

সনকা বলেন রায় নিবেদি তোমার পায়
না যাইয় অনুপাম পাটন।
নৃপতি পাটন যায় এমন উচিত নয়
বিধি-বাম হইল ঘটন।। ২৯৫
তুমি প্রভু নৃপবর অশ্ব-দন্তি-নরেশ্বর
গেয়ান-চৈতন্য নাহি তোমা।
তেজি এই রাজ্যধন দণ্ডপাট সিংহাসন
অনাথিনী করি যাবে আমা।।
যুগল করিয়া পানি [১]নিশ্চয়ে[১] সনকা রাণী
শুন প্রভু নিবেদি তোমায়।
মনসা সহিত বাদ হইবেক পরমাদ
তেজ দম্ভ নিবসো এথায়।।
দেবী ত্রিভুবনেশ্বরী মহিমা ভুবন ভরি
তাঁর সঙ্গে তোমার বিবাদ।
এই রাজ্য নিজপুর আপনা রাখিতে নার
তথা গেলে হবে পরমাদ।।
শুন প্রভু গুণধাম জানিতা যে মহাজ্ঞান
মৃত জীব জিয়াইতে হেলে।
তাহা হরে বিষহরি বধিলেন ধন্বন্তরি
ধনা-মনা বধে শিষ্য মেলে।।
ছয় পুত্র ছিল তোর রূপে গুণে বিদ্যাধর
বধিলেন অন্নে বিষ দিয়া।
সকলি মনসা লয় তবু তোর নাহি ভয়
আসিবা সকল মজাইয়া।। ৩০০

যদি যাবে সেই পুরী চিন্তিহ যে বিষহরি
তবে হবে সর্বত্র কুশল।
ভাবিয়া মনসাদেবী · দ্বিজ বিপ্রদাস কবি
বিরচিত মনসা মঙ্গল।।

১ নিগদে (?)

১৯

পয়ার

সনকার বাক্য শুনি বলে নরপতি। কি কবিতে পাবে কানি তাহার শকতি।।
তথায় রক্ষিবা আমা বাপু মহেশ্বর। নিশ্চিন্দে থাকিহ ঘরে নাহি কোন ডর।।
সাজ সাজ সত্বরে ডাকিল নৃপবর। আনিল কাণ্ডারগণে নৌকার চাকর।।
দুর্লভ কাণ্ডারি প্রতি বলে হেন কালে। পুরাতন ডিঙ্গা আছে গুঙ্গড়ির জলে।। ৩০৫
ডুবারু আনিয়া ডিঙ্গা তুলিলেক কূলে। গাব ধুনা দিয়া তরী ভাসাইল জলে।।
দড়াদড়ি টাঙ্গাইল মহা কোলাহলে। আনিতে ডিঙ্গার দ্রব্য নৃপবর বলে।।
তুলিল মালুম কাট ডিঙ্গার উপর। নানা দ্রব্য কিনি ডিঙ্গা ভরে নৃপবর।।
প্রচুর করিয়া লয় ঝুনা নারিকেল। খেম-ধুতি খাসা আদি বসন সকল।।
নিম্বপত্র সুক্তাপাত আর কাল্যা জিরা। মেথি পাডু কুমুড়া জোয়ানি কৈল ভরা।। ৩১০
তৈল ঘৃত্ত মাষ মুগ কলাই সকল। যতনে প্রচুর করি লইল তণ্ডুল।।
গণক আনিয়া লগ্ন কৈল শুভক্ষণে। দ্বিজ বিপ্রদাসে বলে মনসা-চরণে।।

২০

মল্লার

হেন কালে সনকা বলয়ে বিদ্যমানে। পঞ্চমাস গর্ভ মোর কেহ নাহি জানে।।
লোকধর্মাচারে পাছে হয় অপমান। তবে পত্র দেহ রাজা সভা বিদ্যমান।।
পঞ্চমাস গর্ভ যবে সনকা রমণী। হেন কালে পাটনে চলিলা নৃপমুনি।। ৩১৫
পুত্র হয় থোবে নাম লক্ষিন্দর বালা। দুহিতা হইলে নাম থুইয় জয়মালা।।
পত্র দিলা চাঁদো রাজা লোকধর্ম-ভয়। যাত্রা করি পাটনে চলেন মহাশয়।।
সমুখেতে পূর্ণ ঘট করি আরোপণ। পুরোহিতগণ বেদ করে উচ্চারণ।।
নানা বাদ্য হুলাহুলি করে শঙ্খধ্বনি। যাত্রা করিয়া চলে চাঁদো নৃপমুনি।।
হাঁচি জেঠী পড়ে যবে যাত্রা করে রায়। সনকা রমণী কর হানয়ে মাথায়।। ৩২০
গুঙ্গড়ির কূলে গেল চাঁদো অধিকারী। প্রভাতে বরিব ডিঙ্গা সনকা সুন্দরী।।
এই সভাসতেরে মনসা পুরো আশ। আজি রহিল গীত বলে বিপ্রদাস।। ৩২২

অষ্টম পালা সাঙ্গ

নবম পালা

১

বসন্ত রাগ

রাজহংস-গতি জিনি মন্দমন্দ-গামিনী
সনকা রমণী অনুসারে।
সুবর্ণে সাবুড়া পুরি দূর্বা ধান্য কস্তুরি
ঝারি পুরি বারি করি করে।।
রামেশ্বর-ঘাটে আসি চারিদিগে বেড়ি দাসী
সনকার বিষাদ অন্তরে।
দূর্বা ধান্য লৈয়া করে শুভক্ষণে ডিঙ্গা বরে
গন্ধপুষ্পে [১]অর্চে[১] মধুকর।।
যুগল-করে সনকা রমণী।
প্রাণধন নৃপবর চলিলা যে দেশান্তর
শোকদুঃখে তেজিব পরানি।।
শুন প্রভু গুণমণি পালিহ আমার বাণী
মনেতে [২]চিন্তিয়[২] পদ্মাবতী।
তবে [৩]তার[৩] নাহি ভয় রক্ষিবেন মনসায়
কুশলে আসিবে অধিপতি।।
যদ্যপি কুবুদ্ধি পায় নিন্দা কর মনসার
তবে রক্ষে নাহিক জীবন।
বুহিত্র জীবন ধন [৪]সব[৪] হৈব বিঘটন
পুনর্বার নাহি দরশন।। ৫
ডিঙ্গার চাকর যত [৫]সবে[৫] ভক্ত অনুগত
সনকা বুঝায় সভাকারে।
সভে [৬]মিলি[৬] যুক্তি করি পূজিবে যে বিষহরি
যত্ন করি বুঝাবে রাজারে।।
অতি সকরুণ-মুখি অশ্রু ঝরে দুই আখি
কান্দে রামা করিয়া হতাশ।[৭]
মনসা-চরণ গতি চিন্তিয়া যে একমতি
বিরচিল দ্বিজ বিপ্রদাস।।

১ অৰ্চ্চ (এসো/১) ২ চিন্তিহ (সু. সেন) ৩ তব (ঐ) ৪ সভে (এসো/১) ৫ 'সভে (ঐ) ৬ মেলি (ঐ)
৭'শ্রীরাম স্মরণ' (পাদপূরক এসো/১)

২

পয়ার

গন্ধেশ্বরী প্রথমে বরিল সাবধানে। অনেক ছাগল করিয়া বলিদানে।।
সনকারে প্রবোধ করিয়া নৃপবর। শুভক্ষণে বুহিত্র [১]মেলিল[১] নরেশ্বর।।

দ্বিতীয় মেলিল ডিঙ্গা নামে সর্বজয়া। দুলক্ষ তঙ্কার দ্রব্য তাহাতে ভরিয়া॥ ১০
তৃতীয় মেলিল ডিঙ্গা নামে জগদ্দল। বারো বরিষের ধরে তণ্ডুল সম্বল॥
চতুর্থ মেলিল ডিঙ্গা নাম সুমঙ্গল। যার রূপে দুই [2]কূল হইল[2] উজ্জ্বল॥
পঞ্চমে মেলিল ডিঙ্গা নামে নবরত্ন। যার রূপ দেখিতে দেবের হয় যত্ন॥
ষষ্টমে মেলিল ডিঙ্গা নামে চিত্ররেখা। যার ধনে আদি অন্ত নাই লেখাজোখা॥
সপ্তমে মেলিল ডিঙ্গা নামে শশিমুখী। বহুদূর হৈতে যার ছই ঘর দেখি॥ ১৫
রাজঘাট রামেশ্বর বাহিয়া এড়ায়। [3]ধর্মখাল[3] বাহিয়া অজয়-নদী পায়॥
উজবনি বাহিয়া হইল উপনীত। শিবা নদী সাড়াই বাহিল ত্বরান্বিত॥
উজনি কাটোয়া বাহি রহে ইন্দ্রঘাটে। ইন্দ্র-চরণ পূজে সেই নদীতটে॥
ইন্দ্রানি বাহিয়া নদিয়ায় উপনীত। আঁবুয়া[4] ফুলিয়া[4] গিয়া চাপায় বুহিত॥
রন্ধন ভোজন করি গোঁয়ায় রজনী। বাহ বাহ বলি ডাকে চাঁদো নৃপমণি॥ ২০
বুহিত্র বাহিয়া সুখে চলিল প্রভাতে। ফুলিয়া বাহিয়া [5]হাতিকান্দা[5] উপনীতে॥
গুপ্তিপাড়া বাহিয়া [6]মির্জাপুর[6] আইসে। ত্রিবেণী লাগায় ডিঙ্গা বলে বিপ্রদাসে॥

---

১ মেলিযা (এসো/১) ২ কূল করি (ঐ) ৩ ধর্মখান (সু. সেন—ভ্রান্ত পাঠ) ৪ বাহিয়া (সু সেন) ৫ গিযা হৈল (এসো/২) ৬ সিঙ্গারপুব (সু সেন)

৩

[1]নাট[1] রাগ

বুহিত্র চাপায়্যা কূলে   চাঁদো অধিকারী বলে
দেখিব কেমন সপ্তগ্রাম।
তথা সপ্তঋষি স্থান   সর্বদেব অধিষ্ঠান
সোক্ষ মোক্ষ বম্যন্তর ধাম॥
যদি হৈয়া শুদ্ধমতি   ঋষি মুনি সেবে তথি
তপ জপ করে [2]নিরান্তর[2]।
গঙ্গা আর সরস্বতী   যমুনা নিবসে তথি
অধিষ্ঠান উমা-মাহেশ্বর॥
দেখিয়া ত্রিবেণী গাঙ্গ   চাঁদো রাজা মনে রঙ্গ
কূলেতে [3]চাপায়[3] মধুকর।
আনন্দিত মহারাজ   করে নৃপ তীর্থকাজ
ভক্তিভাবে পূজে মহেশ্বর॥ ২৫
তীর্থকার্য সমাপিয়া   অন্তরে হরিষ হয়্যা
উঠে রাজা ভ্রমিতে নগর।
ছত্রিশ আশ্রমে লোক   নাহি কোন দুঃখশোক
আনন্দ বঞ্চয়ে নিরন্তর॥
বৈসে যত দ্বিজগণ   সর্বশাস্ত্রে বিচক্ষণ
তেজময় যেন দিবাকর।
সর্বতত্ত্ব জানে মর্মে   বিশারদ গুরুধর্মে
[4]কুলগুরু[4] দেবের দোসর॥

পুরুষ মদন যেন রমণী সাবিত্রী হেন
অভরণ সব স্বর্ণময়।
তার রূপ গুণ যত তাহা বা বলিব কত
[৫]দ্বিজ গুরু অমর প্রণয়[৫] ।।[৬]
অভিনব সুর পুরী দেখি ঘর সাবি সারি
প্রতি ঘরে কনকের ঝারা।
নানা রত্ন অবিশাল জ্যোতির্ময় কাঁচ চাল
গজ মুক্ত-প্রলম্বিত বারা।।
সভে দেবে ভক্তি অতি প্রতি ঘরে নানা মূর্তি
রত্নময় সকল প্রাসাদে।
আনন্দে বাজায় বাদ্দি শঙ্খ ঘণ্টা মৃদঙ্গাদি
দেখি রাজা বড়ই [৭]প্রসাদে[৭] ।। ৩০
নিবসে যবন যত তাহা না বলিব কত
মোঙ্গল পাঠান মোকাদীন।
ছৈয়দ মোল্লা কাজি কেতাব কোরান বাজি
দুই ওক্ত করে তছলিম।।
মসিদ মোকাম ঘরে ছেলাম নমাজ করে
ফয়তা করয়ে পিত্য-লোকে।
বন্দিয়া মনসাদেবী দ্বিজ বিপ্রদাস কবি
উদ্ধারিহ ভকত সেবকে।।

১ নাটক (এসো/২) ২ নিরন্তর (ঐ) ৩ চাপায়্য (ঐ) ৪ জ্ঞানগুরু (ঐ) ৫ হেবি তে নিম্মিক বিনয় (ঐ) ৬ সং শ্রী লোচন না৺৩ সদড়... (পাদপূরক, ঐ) ৭ প্রমোদে (সু সেন)

৪

পয়ার

দিন দুই তথা রহি মেলিল বুহিত। কুমারহট্ট গিয়া ডিঙ্গা হইল উপনীত।।
ডাহিনে হুগুলি রহে বামে ভাটপাড়া। পশ্চিমে বাহিল বোরো পূর্বে কাঁকীনাড়া।।
মুলাজোড় গাড়ুলিয়া বাহিল সত্বর। পশ্চিমে পাইকপাড়া [১]বাহে[১] ভদ্রেশ্বর।। ৩৫
চাপদানি ডাহিনে বামেতে ইছাপুর। বাহ বাহ [২]বলি[২] রাজা ডাকিছে প্রচুর।।
বামে বাঁকিবাজার বাহিয়া যায় রঙ্গে। [৩]চাপাদানি[৩] বাহিয়া রাজা প্রবেশে দিগঙ্গে।।
পূজিল নিমাই-তীর্থ করিয়া উত্তম। নিমগাছে দেখে জবা অতি অনুপাম।।
চানক বাহিয়া যায় বুড়নিয়ার [৪]দেশে[৪]। তাহার মেলান বাহে আকনা [৫]মাহেশে[৫]।
খড়দহে [৬]শ্রীপাটে[৬] করিয়া দণ্ডবত। বাহ বাহ বলিয়া রাজা ডাকে অবিরত।। ৪০
রিসিড়া ডাইনে বাহে বামে সুকচর। পশ্চিমে হরিষে রাজা বাহে কোননগর।।
ডাহিনে কোতরং বাহে কামারহাটী বামে। পূর্বেতে আঁড়িয়াদহ ঘুসুড়ি পশ্চিমে।।
চিতপুরে পূজে রাজা সর্বমঙ্গলা। নিশি দিসি বাহে ডিঙ্গা নাহি করে হেলা।।
পূর্ব কূল বাহিয়া এড়ায় কলিকাতা। বেতড়ে চাপায় ডিঙ্গা চাঁদো মহারথা।।

[৭]স্নান তর্পণ করি কৈল ইষ্টি-পূজা।[৭] পূজিল বেতাই চণ্ডী [৮]চাঁদো মহারাজা[৮]।। ৪৫
নানা উপহারে কৈল রন্ধন ভোজন। ধনগু বাহিয়া গেল ত্বরিতগমন।।
কালিঘাটে [৯]চাঁদ[৯] রাজা কালিকা পূজিয়া। চূড়াঘাট [১০]বাহি[১০] যায় জয়ধ্বনি দিয়া।।
ধনস্থান এড়াইল বড় কুতূহলে। বাহিল বারুইপুর মহা কোলাহলে।।
হেনকালে মনসা ভাবেন মনে মন। দ্বিজ বিপ্রদাস কবি করিল বচন।।

১ বহে (এসো/২) ২ বলিয়া (ঐ) ৩ জমিন (সু সেন) ৪ দেশ (ঐ) ৫ মাহেশ (ঐ) ৬ শ্রীপাট (এসো/২)
৭ (নেই—এসো/২) ৮ 'চাঁদো দগুধব। হববিতে সাবি গায নাযেব নফব।।' (এসো/২) ৯ চাঁদো (সু সেন)
১০ বাই (এসো/২)

৫

সুহাই

নেতো লইয়া বিষহরি মনে অনুমান করি
প্রবেশিলা কালিদহ-কূলে।
বিশ্বকর্ম্মা অনুমানে আনিলেক দুইজনে
যত্ন করি দুহা প্রতি বলে।। ৫০
কালিদহে শীঘ্র করি [১]নির্ম্মাও বিচিত্র[১] পুরী
অবিলম্বে করহ গমন।
মনসার আজ্ঞা পায়্যা মণ্ডবে লাগিল গিয়া
পাষাণ যোগান হনুমান।।
গড়িল পাষাণপুরী ক্ষিতি অনুপাম করি
বহুমূল্য পাষাণ রচিত।
কনক-কলস চূড়ে [২]নেতের[২] পতকা উড়ে
হেমঘট স্থাপিত তুরিত।।
নির্ম্মায়্যা মণ্ডপ-ঘরে বিশ্বকর্ম্মা যাত্রা করে
নাগগণ চিন্তে বিষহরি।[৩]
বাসুকি তক্ষক তায় উদয়কাল ধনঞ্জয়
কদম্বাদি ধামাই দুয়ারি।।
মণি-নাগ হেনকালে শিরে যার মণি জ্বলে
আড়াইরাজ তেজিয়া কানন।
কালিনাগিনী নড়ে নাগের [৪]পাটার[৪] পড়ে
নিশ্বাসে কম্পিত ত্রিভুবন।।
বোল চিতি অষ্ট বোড়া কুহক কুলির বোড়া
ঝাটো আইল আড়িয়াল-বঙ্কা।
বেত-আছাড় ধায়্যা যায় কাল বেকাল ধায়
নাগ-সৈন্য দেখি লাগে শঙ্কা।। ৫৫
পদ্মা বলে নাগ-দলে এই কালিদহে জলে
আরাম্ভে থাকিবে সভে এথা।

দেখি যেন চাঁদো রাজা ভয়ে করে মোর পূজা
বিশেষ কহিনু এই কথা॥
আদেশিলা বিষহরি [৫]মহাঘোর দম্ভ[৫] করি
রহে নাগ চাঁদোর সমুখে।
তার মাঝে বিষহরি পদ্মপত্রে ভর করি
কমল-আসনে বসি সুখে॥
হেনকালে [৬]চাঁদ[৬] রাজা দেখিল দেউল-ধ্বজা
মহাদম্ভে নাগ-অবতার।
[৭]চাঁদ[৭] বলে কর্ণধার মেঘ বৃষ্টি অন্ধকার
দ্বিজ বিপ্রদাস গানে সার॥

১ নির্মাণ করিহ (এসো/২) ২ নেতোর (ঐ) ৩ 'সং সিংহস্য' (ঐ) ৪ পাঠার (সু. সেন) ৫ মহা অরম্ভ (আড়ম্বর?) (এসো/২) ৬ চাঁদো (সু. সেন) ৭ চাঁদো (ঐ)

৬

পয়ার

জানিয়া পদ্মার মায়া বলে কর্ণধার। বুঝাই নৃপতি না করহ অহঙ্কার॥
এই [১]কালিদহ[১] মনসার অধিকার। ঝড়বৃষ্টি নহে [২]শুন[২] নাগ-অবতার॥ ৬০
অইত দেউল ধ্বজা দেখহ রাজন। নাগের প্রতাপে রক্ষা নাহিক জীবন॥
মনসার পূজা তুমি কর একমনে। তবে ধন-প্রাণ লৈয়া যাইব পাটনে॥
যদি দম্ভদোষে [৩]নাহি[৩] পূজ মনসায়। ধন-প্রাণ বুহিত্র [৪]মজিব[৪] কালিদয়ে॥
ইহা শুনি চাঁদো রাজা ভাবে মনে মনে। কানি বলি গালি দিয়া ভজিব কেমনে॥
প্রাণ গেলে না করিব কানির স্মরণ। যদি রুষ্ট হয় তবে বধিবে জীবন॥ ৬৫
চাঁদো বলে কর্ণধার অবশ্য মরণ। সংগ্রামে মরিলে যাব অমরভুবন॥
হেতালের বাড়ি রাজা ধরে দুই করে। লাফ দিয়া উঠে গিয়া উচ্চ ছৈ-ঘরে॥
ধর ধর বলিয়া ডাকয়ে দণ্ডধর। একাকী বধিব সব ভুজঙ্গের দল॥
শুনিয়া চাঁদোর ডাক ত্রাসে নাগগণ। পাছে দুষ্ট চাঁদো পায়্যা বধয়ে জীবন॥
আরাম্ভ করিয়া যদি ভুজঙ্গ [৫]রহিত[৫]। ডিঙ্গার সহিত চাঁদো গিলিতে [৬]পারিত[৬]॥ ৭০
হেন সব নাগের কুবুদ্ধি গিয়া পায়। চাঁদোর তরাসে নাগ উঠিয়া পলায়॥
মনসা বলেন নেতো কোন কর্ম কৈল। চাঁদো-ভয়ে নাগগণ পলাইয়া গেল॥
নেতো বলে পদ্মাবতী ভর কর রথে। অবিলম্বে গেলা দুহে সিজুয়া পর্বতে॥
প্রবেশ করিল চাঁদো কালিদহ জলে। বাতালি চাপিয়া রাজা উঠে গিয়া কূলে॥
মনসার ঘটে মারে হেতালের বাড়ি। ভাঙ্গিয়া পদ্মার ঘট যায় গড়াগড়ি॥ ৭৫
[৭]কুবুদ্ধি লাগিল[৭] রাজা ভাঙ্গিল দেহারা। মন্দিরের যত ধনে ডিঙ্গা কৈল ভরা॥
চাঁদ বলে কর্ণধার দেখ বিদ্যমান। মোর ভয়ে পলাইল যত নাগগণ॥
তুমি ত না জান ভাই আমার মহিমা। কানির পরাণে কি করিতে পারে আমা॥
নানা বাদ্য বাজনে পাইকে গায় সারি। বুহিত্র মেলিয়া বাটো চাঁদো যায় ধাড়ি॥
ছলিয়ার গঙ্গে বাহি চলিল তুরিত। ছত্রভোগ গিয়া রাজা চাপায় বুহিত॥ ৮০

তীর্থকার্য চাঁদো রাজা করিল তথায়। বদরিকা-কুণ্ডে জল লইল নৌকায়॥
তাহার মেলান রাজা বাহে হাথিয়াগড়। শতমুখী বাহি রাজা যায় দড়বড়॥
চৌমুখি বাহিয়া রাজা হরষিতে যায়। তথায় চাপায় সব ডিঙ্গা চাঁদ রায়॥
সঙ্কেত মাধবে পূজে হইয়া একমন। তীর্থকার্য শ্রাদ্ধ কৈল পিত্রির তর্পণ॥
তাহার মেলান ডিঙ্গা সঙ্গমে প্রবেশে। তীর্থকার্য কৈল রাজা পরম হরিষে॥ ৮৫
দরিয়া প্রবেশ হৈল চাঁদোর মধুকর। নিশি দিসি বাহে অষ্টপ্রহর সত্বর॥
অন্তরীক্ষ হইয়া বিহগ যত বুলে। ছইয়া ডিঙ্গার লোক ধরি কত গিলে॥
কিরাতের দেশ দিয়া চাঁদো রাজা যায়। জীয়ন্ত মানুষ ধরি তারা সভে খায়॥
অশ্বমুখ গজমুখ বাহিল পাটন। এক ঠেঙ্গিয়ার দেশে করিল গমন॥
বিপরীত কাঁকড়া দেখিতে চমকিত। মন্ত্রণা করিয়া তথা এড়ায় তুরিত॥[৮] ৯০
হাদিয়াদহতে ডিঙ্গা করিল প্রবেশ। চারি ভিতে জল বিনে নাহি দেখে দেশ॥
জোকাদহ সর্পদহ বাহে একে একে। কড়িয়াদহ শঙ্খদহ বাহিল কৌতুকে॥
কড়ি শঙ্খ বন্দি করি করিল গমন। বাহিয়া মনসাদহ চলিল রাজন॥
সিংহদহ বাহি যায় হরষিত মনে। সম্মুখে দেখিল রাজা অনুপম-পাটনে॥
চাঁদ বলে শুনহ দুর্লভ কর্ণধার। কোন রাজ্য সম্মুখে বলহ সারোদ্ধার॥ ৯৫
রাজার বচন শুনি কর্ণধার বলে। দ্বিজ বিপ্রদাস কবি কহে কুতূহলে॥

---

১ কালিদহেতে (এসো/২) ২ অই (সু. সেন) ৩ নাই (এসো/২) ৪ মজিল (ঐ) ৫. কুবুদ্ধিযা চাঁদো (সু. সেন) ৮ এসো/২ পুথিতে—'যথাদীষ্ট তথা লিখিতং'

৭

বরাড়ি

কাণ্ডার বলয়ে কার্য অই অনুপাম রাজ্য
শুনিয়া হরিষ নৃপবর।
নানা বাদ্য কৈল ধ্বনি কূলে উঠে নৃপমণি
চাপাইল সপ্ত মধুকর॥
সে রাজ্যের নৃপবর জানিয়া ত সদাগর
হরিষে ডাকিল নিজগণে।
ডাক-চৌকিগণে ধায় চাঁদো রাজা প্রতি কয়
সভে আইস [১]রাজা-সম্ভাষণে[১]॥
শুনি চাঁদো নৃপবর সজে দিব্য মনোহর
আরোহণ বিচিত্র দোলায়।
চারিভিতে নিজগণ সভে হরষিত মন
রাজা-সম্ভাবণে চাঁদ যায়॥
রাজারে ভেটিবার মনে লইল [২]নানা[২] আয়োজনে
প্রবাল মুকুতা মণিরত্নে।
স্বর্ণময় অলঙ্কার দিব্য গজ-মত্তি হার
অশ্ব দন্তী আদি নানা ধনে॥ ১০০

নগর ভ্রমণ করি দেখে দিব্য রম্যপুরী
কুবের-সমান ধনবান।
অপছরি কিন্নরী সমা নারীগণ আনুপমা
প্রজাগণ মদন সমান।।
গেল রাজা দ্বার মাঝে দোলা এড়ি পদব্রজে
রাজা স্থানে গেলা কুতূহলে।
রাজারে সম্ভাষ করি বৈসে [৩]বাজা[৩] কুতূহলী
জিজ্ঞাসা করয়ে ভূমণ্ডলে।।
কোন জাতি অনুপাম কার পুত্র কিবা নাম
কহ কথা বৈস কোন দেশে।
বলে চাঁদো পুটপাণি মোর নাম চন্দ্রপাণি
শুনি রাজা পরম হরিষে।।
চম্পকনগরে ঘর পিতা মোর কোটীশ্বর
বণিকের বংশে উৎপতি।
মিতা মিতা বলি তারে সম্ভাষিল নৃপবরে
বিপ্রদাস পদ্মাপদে মতি।।

১ বাজসন্নিধানে (এসো/২) ২ নিজ (ঐ) ৩ চাঁদো (সু সেন)

৮

পটমঞ্জরী

অবধান কর নৃপমণি।
মধুকরে অহর্নিশি সলিলে ভাসিয়া আসি
দিগ-বিদিগ নাহি জানি।। ১০৫
নানা দুঃখ ক্লেশ পাইয়া পূর্ণিত [১]বুহিত্র[১] লইয়া
অবিলম্বে আসি তব পুরী।
প্রথমে বাহিনু জাল রামেশ্বর [২]ধর্মখাল[২]
[৩]অজয় বিজয়[৩] সুরেশ্বরী।।
উজবনি [৪]বক্র বাহি[৪] শিবা নদী সাখাই
শুধানপুর বাই ইন্দ্রেশ্বর।
বাহিনু নদিয়া দিয়া আঁবুয়া ফুলিয়া বায়্যা
ত্রিবেণী প্রবেশে মধুকর।।
নানা গাঁ বাহিয়া আসি কালিদহে পরবেশি
তথা কানি পাতে অবতার।
আনিলেক নাগগণ ত্রাস পায় সর্বজন
শুন মিতা বিক্রম আমার।।'
হেতালের বাড়ি ধরি ডাকিনু বিক্রম করি
নাগগণ পলায় সঘন।

ভাঙ্গিয়া মণ্ডপ-ঘর ভরা দিনু মধুকব
সাগরে দিলাম দরশন॥
দরিয়ায় পরবেশি নাহি জানি দিবানিশি
বাহি আসি [৫]আট[৫] প্রহর।
উড়িয়া বিহগ বুলে [৬]ছুইয়া[৬] মানুষ গিলে
তাহা দেখি কাঁপে প্রাণেশ্বর॥ ১১০
কাঁকড়া-জোকাই দিয়া সঙ্ক-কড়িয়া বায্যা
নানা দুঃখ বাহিনু সঘন।
সিংহলে প্রবেশ যথা পদ্মিনী জনমে তপা
সর্বাংশে পুরুষ বিচক্ষণ॥
এড়াইনু বহুদেশ তব রাজ্য পরবেশ
কহিল্যাম দুঃখের কাহিনী।
দ্বিজ বিপ্রদাস ভণে করি এই নিবেদনে
অন্তকালে তরাইবে ভবানী॥

১ বুহিত (এসো/২) ২ ধর্মখান (সু সেন) ৩ অজযা বিজযা (এসো/২) ৪ ক্রম বাই (ঐ) ৫ অষ্ট (ঐ) ৬ ছুই ঘব (ঐ)

৯

পয়ার

শুনিয়া মিতার বাণী নানা আয়োজন। আনাইয়া দিল রাজা চাঁদো বিদ্যমান॥
চাঁদোর অগ্রতে রাজা কহে হরষিতে। বিদায় হইয়া আজি যাহ আনন্দিতে॥
রন্ধন ভোজন করি নিশি গোঁয়াইয়া। [১]সভাতে[১] আসিহ কালি নগর ভ্রমিয়া॥ ১১৫
রাজার গোচরে চাঁদ বিদায় হইল। দোলা আরোহিয়া চাঁদো মধুকরে গেল॥
রন্ধন ভোজন রাজা কৈল কুতূহলে। সুখেতে ভক্ষণ কৈল কর্পূর তাম্বুলে॥
শয়ান করিল দিব্য পালঙ্ক উপরে। রজনি প্রভাতে উঠে প্রাতঃক্রীড়া করে॥
দোলায় চড়িয়া চাঁদ করিল গমন। নগর ভ্রমিয়া গেল নৃপতি-সদন॥
সম্ভাব আলাপে চাঁদো বৈসে হরষিতে।[৩] পাত্রমিত্র সেনাগণ বৈসে চারিভিতে॥ ১২০
ডিঙ্গার যতেক দ্রব্য করিতে বদলে। চাঁদোর সহিত রাজা চলে কুতূহলে॥
উত্তরিল গিয়া যথা আছে মধুকর। দুই মিতা উঠে গিয়া ডিঙ্গার ভিতর॥
কৌতুকে দেখায় রাজা ঝুনা নারিকেল। দক্ষিণাবর্ত শঙ্খ দেহ ইহার বদল॥[৪]
হরিদ্রা দেখায় চাঁদো করিয়া মন্ত্রণা। ইহাতে খণ্ডয়ে যত ব্যাধির যন্ত্রণা॥
ইহার বদল সোনা কহিনু তোমারে। ওজন করিয়া লও দেহ তো আমারে॥ ১২৫
খোম ধুতি কুড়ি যত [৫]দেখায়[৫] রাজন। বদলিয়া পাট ভোট দেহ ত বসন॥
পাঁড়ু কুমড়া দিয়া কহে নৃপবর। ইহার বদলে দেহ সিসার খাপর॥
অশ্ব দন্তী দেহ মোর মেষের বদল। তণ্ডুল বদলে দেহ মুকুতা প্রবাল॥
পিপলি জোয়ানি আর কাল্যা জিরা ভেলা। নিম্বপত্র হরীতকী আমলকি গিলা॥
ইহার বদলে দ্রব্য দেহ নৃপবর। গুড়ত্বক মরিচ লবঙ্গ জায়ফল॥ ১৩০

জইত্রি কর্পূর, হিঙ্গ দেহ ত সকল। শুক্তা-পত্রে তেজ-পত্র দেহ ত বদল।।
ডিঙ্গার যতেক দ্রব্য নৃপবরে দিল। চাকরে বহিয়া দ্রব্য [৬]ভরা[৬] তুলাইল।।
বদলিয়া যত দ্রব্য চাঁদো হরষিতে। গাথর চাকর দ্রব্য বহে আনন্দিতে।।
পুনরপি সপ্ত ডিঙ্গা করিল পূর্ণিত। দেখিয়া নৃপতি চাঁদো বড় হরষিত।।
পদ্মার মায়া চাঁদো রহে সেই দেশে। এখন রহিল গীত বলে বিপ্রদাসে।।[৭] ১৩৫

১ প্রভাতে (এসো/২) ২ মিতাব (ঐ) ৩ (এখানে অঙ্ক চিহ্নহীন ছিন্নপত্র পাওয়া গেছে—এসো/৪) ৪ দক্ষিণা বদল দেহ ইহাব সকল (এসো/৪) ৫ দেখহ (ঐ) ৬ মায (ঐ) ৭ এ পুস্তক শ্রীগোপীনাথ সিংহ সাকিম দত্ত পুখবিযা সংমিদং শ্রীশ্রী গণেশ সবন (ঐ)

নবম পালা সাঙ্গ

দশম পালা

১

পয়ার

মিত্র ভোলে চাঁদো রাজা রহিল পাটন। সনকা লইয়া এথা কহিব কাবণ।।
পঞ্চমাস যখন সনকা গর্ভবতী। হেনকালে পাটনে চলিলা নরপতি।।
ছয় সাত অষ্ট মাসে আসিয়া প্রবেশে। নয় মাসে ভক্ষ্য দ্রব্য দেই ত হরিষে।।
দুগ্ধ গুড় নারিকেল শর্করা নবাত। বিবিধ পিষ্টক সজ্জা করে নানা মত।।
উত্তম তণ্ডুল গুড়ি দুগ্ধ চিনি দিয়া। দুগ্ধ ফেনি সজ্জ কৈল প্রচুর করিয়া।। ৫
আসিকা ভিজায় দুগ্ধে রাখিল প্রচুর। খিরপুলি দুগ্ধ-চুষি রাখিল প্রচুর।।
নারিকেল পুলি মুগ সামলি বিস্তর। রুটী সরু চাকলি করিল বহুতর।।
রান্ধিল শাকের ঘণ্ট ডালি আর মৎস্য। কতেক প্রকার ভাজা করিল অসচ্য।।
লাউর অম্বল রান্ধে তাহে গুড় দিয়া। পরমান্ন রান্ধে বধূ হরষিত হইয়া।।
দুগ্ধে চিড়া দিয়া কাটি দিল বহুতর। অতি সূক্ষ্ম তণ্ডুল দিলেক তারপর।। ১০
পশ্চাতে শর্করা দিয়া ওলায়্যা রাখিল। আর বধূ [১]এক[১] হাড়ি ঘৃত চড়াইল।।
সুপক্ক হইল ঘৃত দেখিয়া সত্বর। পরমান্ন দিল নিয়া তাহার উপর।।
লবঙ্গ মরিচ জীরা আর জায়ফল। এলাইচ দালচিনি গুড়াইয়া সকল।।
আগে নারিকেল কোরা দিলেক তাহাতে। সকল মসলা লইয়া দিলেক পশ্চাতে।।
ঘন ঘন কাটি দিয়া ঢালিলো পাত্রেতে। শাল্যা তণ্ডুলের অন্ন রান্ধে হরষিতে।। ১৫
প্রস্তুত করিল অন্ন আনন্দিত মনে। পরে ভোজনের স্থানে করিল মার্জনে।।
বিচিত্র কাঞ্চন পিঁড়ি তাহাতে রচিয়া। সনকা বসায় অতি সাদর করিয়া।।
সুবর্ণের থালে অন্ন করিয়া চয়ন। প্রথমে দিলেক শাক হরষিত-মন।।
ক্রমে ক্রমে দিল সুখে যতেক ব্যঞ্জন। হরিষে সনকা রামা করয়ে ভোজন।।
কতেক প্রকার দিল পিষ্টক আনিয়া। দুগ্ধ-গুড় দিল রামা প্রচুর করিয়া।। ২০
বাটি ভরি পরমান্ন দিলেক হরিষে। অমৃত সমান দ্রব্য অশেষ [২]বিশেষে[২]।।
সাদরে সনকা রামা করিল ভোজন। সুবাসিত উদকে করিল আচমন।।
কর্পূর তাম্বুল পূগ পুরিয়া বদন। বিচিত্র শয্যায় সুখে করিল শয়ন।।

নিত্য নিত্য নানা দ্রব্য যেই লয় মন। হরষিতে তাহা আনি দেয় বধূগণ।।
দশমাস দশদিন হইল সম্পূর্ণ। প্রসব সময় আসি হৈলে উপসন্ন।। ২৫
প্রসব বেদনা-দুঃখে হইল কাতর। অমাত্য বান্ধবগণ আইল সত্বর।।
ডাকিয়া আনিল ধাত্রী দাসী ঝাউয়াবতী। দ্বিজ বিপ্রদাস বলে পদ্মা-পদ গতি।।

১ এক (?) ২ বিশেষ (সু সেন)

২

মহারাটী

হৃদয় জঘন কটি অবশ শরীর। উঠে বৈসে বেদনায় হইল অস্থির।।
চমকি চমকি উঠে পায়্যা বড় ভয়। আজি বা শরীরে প্রাণ রহে কিনা রয়।।
কান্দে কান্দে সনকা ভাবিয়া বিষাদ। কি হইল দারুণ মোরে বেদন প্রমাদ।। ৩০
ছয় পুত্র হারাইনু রূপ গুণনিধি। আর এত দুঃখ মোরে দেয় কেনি বিধি।।
বুদ্ধি নাহি মোর প্রাণ হইল শেষ। হেন কালে দৈবে মোর প্রভু দূরদেশ।।
তাহারে বলয়ে আসি ধাত্রী প্রিয়বাণী। শুভক্ষণে দাওন পাতহ ঠাকুরাণী।।
মনসার বরে তোর হবেক তনয়। মধুর সঙ্গীত দ্বিজ বিপ্রদাস গায়।।

৩

পয়ার[১]

গ্রহ লগ্ন যতো সব শুভক্ষণ হইল। হেনকালে সনকা তনয় প্রসবিল।। ৩৫
সর্বজন দেখে মহাপুরুষ লক্ষণ। পুত্রমুখ দেখি রানি সানন্দিত মন।।
তবে অঙ্গ মার্জিয়া মস্তক নাসা তুলি। নাভি সুকর্তন কৈল দিয়া হুলাহুলি।।
কুমারিকা লতায় সুতিকা-ঘর বেড়ি। নানা মহোষধিতে [২]গোমুড়[২] দ্বারে এড়ি।।
তাঁতি দিয়া নিবন্ধন করিল কুমারে। প্রভাতে পাচন দিল বিধি-লোকাচারে।।
দৈবজ্ঞ আনিয়া কোষ্ঠী তুলিল তাহার। গণিয়া দৈবজ্ঞ কোষ্ঠী প্রশংসে আপার।। ৪০
ছয় দিনে সুতিকা পূজিল সুবিধান। আট দিনে আট কলাই কৈল শিশুগণ।।
নবম বাসরে [৩]নত্তা[৩] করিল হরিষে। ত্রিশ দিনে অশোচত্তি করিল বিশেষে।।
একত্রিশ দিনে করে ষষ্ঠীর পূজন। নানা পরকারে কৈল নানা আয়োজন।।
স্তন পানে দিনে দিনে শিশু ভিন্ন ছাঁদ। কি বলিব তার রূপ পূর্ণিমার চাঁদ।।
ছয় মাস হইল যদি রাজার নন্দন। অন্ন দিতে করিল প্রচুর আয়োজন।। ৪৫
শুভ দিনে শুভলগ্ন পায়্যা হরষিত। পুরোহিত আনাইল সোমাই পণ্ডিত।।
আহ্বান করিয়া আনে যত জ্ঞাতিগণ। ঝাউয়া দাসী আইয়-গণে ডাকে ততক্ষণ।।
বিবিধ প্রকারে রানি করিল রন্ধন। শাল্যা অন্ন ব্যেঞ্জন পিষ্টক পরমান্ন।।
দেবার্চনা কৈল তবে হরষিত-মনে। নান্দীমুখ বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ করিল বিধানে।।
নানা রত্ন বিভূষণ পুত্র কৈল কোলে। নানা বিধি বাদ্য বাজে মহা কোলাহলে।। ৫০
শুভক্ষণে অন্ন দিল পুত্রের বদনে। লক্ষিন্দর নাম রাখে রাজার বিধানে।।
আচমন করি পূগ দিলেন বদনে। বিচিত্র শয্যায় বালা করিল শয়নে।।

মিষ্টান্ন ভোজন করাইল বিপ্রগণে। রমণী পুরুষে জ্ঞাতি করাইল ভোজনে॥
তৈল সিন্দুর খদি কদলক দিয়া। আইয়-গণে বিদায় করিল সম্বোধিয়া॥
পুত্র লইয়া সনকা নিবসে নিজ ঘরে। দ্বিজ বিপ্রদাস বলে মনসার বরে॥ ৫৫

১ (নেই— সু. সেন) ২ গুমুড় (সু সেন) ৩ নওয়া (?)

৪

সিন্ধুড়া

বিচিত্র প্রধান ঘর উপমা নাহিক তার
নানারত্নে বিচিত্র নির্মাণ।
প্রবাল-মুকুতা ঝরা চূড়ায় হেমের বারা
শিখি পাখে ছাউনি শোভন॥
ফটিকের স্তম্ভ মধ্যে বিচিত্র ছান্দনা বান্দে
তথি বৈসে পুত্র করি কোলে।
স্নেহেতে অমৃত ভাষে দেখি মন্দমন্দ হাসে
পূর্ণশশী বদনমণ্ডলে॥
সনকা হরিষ-মন পুত্র বাড়ে দিনে দিন
হইল বালক সম্বৎসর।
বরিষে দুই তিনে শ্রুতিবেধ শুভক্ষণে
নানাদ্রব্য কৈল বহুতর॥
সোমাই পণ্ডিত দ্বিজে আনিল মঙ্গল-কাজে
নানা বাদ্য বাজয়ে সঘনে।
নিমন্ত্রিয়া জ্ঞাতিগণে আনিলে [১]আইও[১] গণে
কর্ণভেদ কৈল শুভক্ষণে॥
সভারে বিদায় করি সনকা নিবসে পুরী
পুত্র লইয়া আছে কুতূহলে।
পরম হরিষ-মনে দিলেক পুত্রের কানে
গড়াইয়া রতন-কুণ্ডলে॥ ৬০
ওথায় উজানি ঘর সুমিত্রা সাহে সদাগর
কন্যা লাগি পূজে হরগৌরী।
জানিয়া ঈশ্বরীসুতা কন্যা [২]জন্মাইলা[২] তথা
সুমিত্রা রমণী গর্ভধারি॥
গর্ভশঙ্কা সুবদনী নিশ্চয় লক্ষণ জানি
সাধ দিল যতো বন্ধুজনে।
দশ মাস দশ দিন প্রসবরেদনা চিহ্ন
আইল সকল পুরীজনে॥

মাহেন্দ্র সময় পাইল কন্যারত্ন প্রসবিল
দেখিয়া সানন্দ বাড়ে মনে।
ধাত্রী হরষিত হইয়া কন্যারে কোলেতে লইয়া
নাড়িচ্ছেদ কৈল ততক্ষণে।।
এক দুই তিন চারি পঞ্চম দিবসে নারী
পাঁচটী করিল যথা আশে।
আটকলাই অষ্ট দিনে কৈল সব শিশুগণে
ষষ্ঠী পূজা কৈল একমাসে।।
ছয় মাসে অন্ন দিল বেহুলা তো নাম থুইল
দেখি সাহে হরষিত মন।
জনমে জনমে সেবি ভাবিয়া মনসাদেবী
দ্বিজ বিপ্রদাস সুবচন।। ৬৫

১ আও (সু সেন) ২ জর্মাইলা (সু. সেন)

৫

পয়ার

সাহের মন্দিরে ওথা বাড়েন বেহুলা। পঞ্চ ছয় বরিষের লক্ষিন্দর বালা।।
সুবর্ণের তাড় বালা মণিরত্ন-হার। শিশু সঙ্গে ভ্রমে বালা করিয়া বেহার।।
সব শিশু বেষ্টিত লখাই তার মাঝে। গগনমণ্ডলে যেন নিশাকর সাজে।।
এখনে খেলায় ভাড় পুরিয়া ধূলায়। হুক হুক করে কেহ অঙ্গুলি মটকায়।।
[মার্জার] লইয়া সুখে রাজা-পাত্র খেলে। যেই হারে তারে মারে শিশুগণ মেলে।। ৭০
তে াতিয়া বাঘচালি-মঙ্গল-পাঠান। কেহ হারে কেহ জীনে নহে সমাধা।।
শতরঞ্চ চৌপাড় খেলায় শিশুসঙ্গে। ছল করি আঠারো সতেরো ডাকে রঙ্গে।।
হেন মতে ফিরে সুখে রাজার নন্দন। নানা তন্ত্র-মন্ত্র শিখে ভার-সন্তারণ।।
উচ্চারণ মাত্রা শিক্ষা করে গুরু-স্থানে। পড়িবারে যত্ন করে জননীর স্থানে।।
লখাইর অনুমতি পায়্যা রাজরানি। সোমাই পণ্ডিত দ্বিজে ডাক দিয়া আনি।। ৭৫
সনকা বলেন দ্বিজ না করিহ হেলা। সনকা পড়াইহ মোর লক্ষিন্দর বালা।।
শুনিয়া হরিষ দ্বিজ রানির বচনে। লখাইর হাথে খড়ি দিল শুভক্ষণে।।
ক, খ, গ, ঘ, ঙ পড়ে হরিষ অন্তরে। চৌত্রিশ অক্ষর পড়ে বালা লখিন্দরে।।
[অষ্টাদশ] ফলা পড়ে হরষিত-মন। চৌত্রিশ অক্ষরে ফলা করিল পঠন।।
অষ্ট ধাতু অষ্ট শব্দ পড়িল সত্বরে। সোমাই পণ্ডিত দ্বিজ শুভদিন করে।। ৮০
শাস্ত্রশাল লইলেক বালা লক্ষিন্দর। প্রথমে পড়ায় সূত্র সুখে দ্বিজবর।।
তার পর ব্যাকরণ পড়ে রাজসুতে। ভট্টি রঘু সাহিত্য পড়িল হরষিতে।।
অলঙ্কার কুমার পড়িল অভিধান। জ্যোতিষ নাটক কাব্য পড়িল বিধান।।
অষ্টাদশ পুরাণ পড়িয়া অনিবার। হইল পণ্ডিত বড়ো রাজার কুমার।।
সকল সন্ধান শিখে ইঙ্গিতে সকল। লক্ষ মাত্র উপাধ্যায় পড়ায় অনুবল।। ৮৫
পড়িল চৌষটী বিদ্যা সব একে একে। জানিল সকল বিদ্যা কহিল কৌতুকে।।
সর্বগুণে গুণান্বিত বালা লখিন্দর। দ্বিজ বিপ্রদাস বলে মনসা-কিঙ্কর।।

৬

পয়ার

সর্বগুণে বিশারদ রাজার কুমার। গুরুরে দক্ষিণা দিলা কতেক প্রকার।।
সর্বাংশে ভাজন সর্বগুণের নিদান। পাত্র মিত্র পুরোহিত কৈল অনুমান।।
সনকার সম্মতি লইল রাজপাট। লখিন্দর রাজা করি শূন্য দণ্ডপাট।। ৯০
নানাবাদ্য মহোৎসব করিয়া যতেক। শুভক্ষণে লখিন্দরে কৈল অভিষেক।।
সর্বলোকে আনন্দিত জয়জয়-ধ্বনি। নানা বাদ্য কোলাহল কর্ণে নাহি শুনি।।
রাজা করি পাটে বসাইল লখিন্দরে। ছত্রদণ্ড ধরিলেক শিরের উপরে।।
ওথায় মনসা কহে নেতো বিদ্যমান। এখনে কি করিব বলহ সম্বিধান।।
নিজসুখে চাঁদো রাজা থাকিল পাটনে। লখাই-বেহুলা বিবাহ হইব কেমনে।। ৯৫
অন্তরে ভাবিয়া নেতো বলিল তখন। হের [1]বলি[1] বিষহরি শুন দিয়া মন।।
ধরিয়া সনকা-রূপ চাঁদোর শিয়রে। স্বপন দেখাও তারে মায়ার প্রকারে।।
শুনিয়া মনসা হইল আনন্দ আপার। ধরিয়া সনকা-রূপ মায়া অবতার।।
শীঘ্রগতি তথায় চলিলা বিষহরি। দ্বিজ বিপ্রদাস বলে কর-জোড় করি।।

১ বনি (সু সেন)

৭

পয়ার

রথ-আরোহণে গেলা অনুপাম পাটনে। নিশি-অবশেষ কহে কপট স্বপনে।। ১০০
অতি সকরুণমুখী আঁখি অশ্রু ঝরে। নৃপতি মোহিয়া কহে মায়ার প্রকারে।।
আমি তো সনকা প্রভু অনেক দুঃখিনী। শোক দুঃখে মৃতাবত বঞ্চি একাকিনী।।
রাজ্য নাশ হইল সব প্রজার দুর্গতি। কেমনে তেজিল প্রভু রাজ্যের মমতি।।
অভাগিনী সনকারে তিলেক নাহি দয়া। শোক দুঃখে বঞ্চিত আমি মৃতাবত হইয়া।।
অশেষ প্রকারে কহে হইয়া করুণ। তুমি তো পাষাণ-হিয়া কঠিন দারুণ।। ১০৫
যদি রাজ্য খণ্ড আমা প্রতি থাকে দয়া। প্রভাতে দেশেরে চলো ছাড়ি মিছা মায়া।।
নৃপতি মোহিয়া পদ্মা করিল গমন। নিদ্রা ভঙ্গ হইল রাজা বিপ্রদাস গান।।

৮

পাহাড়ি

ছলি গেলা পদ্মাবতী নিদ্রাভঙ্গ নরপতি
বসিলা হইয়া চমকিত।
ডাকি আনি কর্ণধারে হস্ত ধরি কহে তারে
স্বপ্নকথা হইয়া বিষাদিত।।
যামিনী প্রভাত শেষে অতি সকরুণ ভাষে
শিয়রে সনকা মোরে বলে।
মোর রাজ্য-অধিকার আসি অন্য নরবর
বল করি লয় অবহেলে।।

অহে অবগতি করো প্রাণসখা।
বাজ্যের মমতি দহে মোর প্রাণ স্থির নহে
সনকা কেমনে হবে দেখা।। ১১০
সোঙরিতে রূপগুণ ধরিতে না পারি মন
রজনি প্রভাতে দেশে নড়ি।
দারুণ সন্তাপ কহি যদি পক্ষ জাতি হই
অন্তরীক্ষ গতি উড়ি পড়ি।।
নৃপতি করুণবাণী কাণ্ডাব মনেতে গণি
করজোড়ে কহে সবিনয়।
তেজহ বিলাপ যত স্থিব কর মনরথ
প্রভাতে গমন সুনিশ্চয়।।
কথোপকথন-গতি রজনি বঞ্চিলা তথি
দিনমণি উদয় প্রভাতে।
দ্বিজ বিপ্রদাস কবি জনমে জনমে সেবি
পদ্মা-পদে কহে জোড় হাথে।।

৯

জমক ছন্দ

প্রভাত সময়ে রাজা প্রাতক্রীড়া করি। কাণ্ডার সেবক সঙ্গে চলে রাজপুরী।।
লোটায়্যা রাজার কাছে নিবেদি কারণ। স্বপন দেখিয়া রাজা স্থির নহে মন।। ১১৫
রাজ্যখণ্ড নষ্ট হয় কি করি এথায়। যাইব দেশেরে মিতা দেহ ত বিদায়।।
মিতার বিচ্ছেদে দুঃখভেদে অধিকারী। যদি দেশে যাবে মিতা কি বলিতে পারি।।
আহিঙ্কা পুরিয়া রাজা দিল বহু ধন। পাত্র মিত্র সম্ভাষ করিল সর্বজন।।
দুই মিতা কোলাকুলি পরম পীরিতে। নানা রত্নে কৈল রাজা চাঁদোরে ভূষিত।।
যাত্রা করি মিত্র স্থানে হইল বিদায়। যার যেই যোগ্য রাজা তুষিল সভায়।। ১২০
রাজার চাকর যত করে নিয়োজিত। অবিলম্বে যত সাজ হইল বুহিত।।
মিতার নিকটে রাজা পায় যত ধন। [সত্বরে] বাহিয়া করে ডিঙ্গা অভরণ।।
অনুবর্জি মিতারে চলিলা নৃপবর। চাঁদো রাজা উঠিল প্রধান মধুকর।।
বাহ বাহ বলিয়া ডাকয়ে চাঁদো রায়। শুভক্ষণে বুহিত্র মেলিয়া দেশে যায়।।
হরষিত চাঁদোরাজা পাটন বাহিল। কড়ি সঙ্ক দহে রাজা কড়ি সঙ্ক লইল।। ১২৫
দরিয়ায় প্রবেশ করিল মধুকর। দেশের উদ্দিশে ডিঙ্গা বাহে নিরন্তর।।
সঙ্কেত-মাধব পূজে হরিষ-অন্তর। দিবস-রজনি বাহি এড়ায় সাগর।।
মগরায় নৃপতি হইল উপনীত। চৌমুখা বাহিয়া রাজা এড়ায় তুরিত।।
ছত্রভোগ প্রবেশ করিল অম্বুলিঙ্গে। তীর্থকার্য স্নান দান করিলেক [১]রঙ্গে[১]।।
খনিয়া বহিয়া যায় তাহার মেলান। ওথায় মনসা নেতো করি অনুমান।। ১৩০
ঝড় বৃষ্টি মেঘ আর হনুমান লইয়া। কালিদহে উপনীত মহাক্রোধ হইয়া।।
চাঁদোর কুগ্রহ দশা না যায় খণ্ডন। কালিদহে আসি ডিঙ্গা দিল দরশন।।
মনসার বাদে কারো নাহিক নিস্তার। দ্বিজ বিপ্রদাস বলে পদ্মা-পদ সার।।

১ বঙ্গে (সু. সেন ছাপার ভুল?)

১০

পটমঞ্জরী

চাঁদোর কুমতি অতি মনে ভাবে পদ্মাবতী
আনিল প্রবল মেঘগণ।
পাণ্ডু আদি পুষ্কর ডাকে অতি ঘোরতর
হাড়িয়া যে প্রবল গর্জন॥
মেঘ লাগে ভাগে ভাগে রহিল সকল দিগে
মহাঘোর হইল অন্ধকার।
মেঘের আরাম্ভ ডাকে কেহ কারে নাহি দেখে
শুনিয়া নৃপতি চমৎকার॥ ১৩৫
উথলিল কালিদহের পানি।
মেঘে অন্ধকার কৈল দিনমণি লুকাইল
দিগ-বিদিগ নাহি জানি॥
দারুণ ঝনঝনা পড়ে ত্রাসে লোক প্রাণ ছাড়ে
চাঁদো রাজা দেখিয়া তরাস।
শিলাবৃষ্টি যতো হয় নাহি লেখা-জোখা তায়
ঝড় বহে প্রবল বাতাস॥
যতো বৃক্ষ ছিল কূলে ভাঙ্গিয়া পড়িল জলে
পঞ্চধারে হয় বরিষণ।
বিপরীত হইল ঝড় বড় ঘরের উড়ে খড়
ভাঙ্গিয়া রহিল খানে খান॥
বিষম স্রোতের ডাকে ডিঙ্গা ফিরে পাকে পাকে
পাড়ি দিতে হইল বিকল।
প্রমাদ ঢেউর শব্দ কর্ণে তালি লাগে শব্দ
গগনে উঠিয়া লাগে জল॥
কাণ্ডার ডাকিয়া বলে নোঙ্গর ফেলাও জলে
ধনে প্রাণে নাহিক নিস্তার।
ভাবিয়া মনসাদেবী বলে বিপ্রদাস কবি
অন্তকালে করিবা উদ্ধার॥ ১৪০

১১

পয়ার

ডাক দিয়া বলে চাঁদো হইল বিসম্বাদ। আন নহে কানি আসি করিব প্রমাদ॥
দৃঢ় মুষ্টি করি ভাই ধরহ কাণ্ডার। উমা মহেশ্বর চিন্ত পাইবা নিস্তার॥
নিজ বলে রক্ষ বাপু দেব ত্রিলোচন। কালিদহে কানি মোর লয় প্রাণ-ধন॥
অধিক মনসা কোপে ডাকে হনুমানে। সপ্ত ডিঙ্গা অবিলম্বে ডুবাও এখনে॥
যেই মাত্র আজ্ঞা দিলা অস্তিক-জননী। সাপটে জুড়িল সব কালিদহের পানি॥ ১৪৫

কাণ্ডার বলয়ে রাজা শুনহ বিচার। ভজহ মনসা-পদ পাইবা নিস্তার॥
সকল মজিল তব মনসা নিন্দিয়া। তব দোষে দেশেরে না যাব নিস্তারিয়া॥
চাঁদো বলে প্রাণ গেলে না ভজিব কানি। যদি রুষ্ট হয় তবে বধিবে পরাণী॥
ইহা শুনি মনসা অধিক বাড়ে দুঃখ। ডুবাও তুরিতে ডিঙ্গা চাহো কার মুখ॥
যতনিয়া বাড়িল কোপ পবনকুমার। লাফ দিয়া বুহিত্র উপরে করে ভর॥ ১৫০
লেই চাপিযা মাত্র নায় ভরা দিল। চক্রাবর্তে ফিরি ডিঙ্গা রসাতল গেল॥
চাঁদো বলে রক্ষ বাপু উমা মহেশ্বর। অবিলম্বে সেই নায় করে পদভর॥
আখির নিমেযে অবহেলায় ডুবায়। ত্রাস পাইয়া চাঁদো রাজা আর নায় যায॥
এই মতে ডুবাইল ছয় মধুকর। যেই নায় আছে চাঁদো তাহে কৈল ভর॥
মনসা বলেন শুন পবনকুমার। অখন বধিব চাঁদো শুনহ উত্তর॥ ১৫৫
এথা আমা পূজে যদি চাঁদো নৃপবরে। সকল বুহিত্র দিয়া পাঠাবো দেশেরে॥
পুনরপি কর্ণধার বলে বারবার। এমু পদ্মা ভাবো যদি পাইবে নিস্তার॥
চাঁদো বলে না ভজিব কানির চরণ। যদি রুষ্ট হয় তবে বধিবে জীবন॥
শুনি কোপে আজ্ঞা পদ্মা দিলেন সত্বর। ভাসাইয়া চাঁদোরে ডুবাও মধুকর॥
পদ্মার ইঙ্গিতে বীর কোপে অবিশাল। চাঁদোরে ভাসাইয়া ডিঙ্গা লইল পাতাল॥ ১৬০
ধনজন সঙ্গে ডিঙ্গা লইল বিষহরি। গচ্ছিত করিয়া রাখে বরুণের পুরী॥
মেঘ বায়ু নিজ স্থানে নাড়িল সত্বর। ভাসিয়া বেড়ায় চাঁদো জলের উপর॥
ঢোকে ঢোকে জল খায় তবু নাহি ডুবে। হেতালের বাড়ি রাজা ধরয়ে অভাবে॥
বুড়িয়া না মরে চাঁদো দেবীর মায়ায়। অন্তরীক্ষে রথভরে হাসে মনসায়॥
জলেতে ভাসিয়া রাজা বল নাহি [১]পায়[১]। হাঁকর-মকরে কেশ টানি ছিড়ি খায়॥ ১৬৫
কান্দে রাজা অতি দুঃখে হইয়া কাতর। কানির বিবাদে রক্ষা নাহি প্রাণেশ্বর॥
দেখিয়া মনসা মনে হইয়া বিমরিষ। মায়ায় সৃজিলা এক আনিলা বালিষ।
আপনার নাম দেবী তথিতে লিখিয়া। চাঁদোর নিকটে লইয়া দিলা ভাসাইয়া॥
ইহা দেখি চাঁদো রাজী লয়বা শরণ। কুশলে পাঠাবো দেশে দিয়া ধন জন॥
বালিষ পাইয়া রাজা স্বস্তি পায় মনে। তবে কৈল দয়া মোরে বাপু ত্রিলোচনে॥ ১৭০
মনসার নাম মাত্র দেখিল তাহায়। কোপেতে বালিষ ঠেলি ফেলে বাম পায়॥
পরশ কানির নাম কৈনু দৈবদোষে। হেতালের বাড়ি মারে পদ্মার বালিষে॥
ধামাই নাগেরে দেবী দিলা পাঠাইয়া। চাঁদোর হেতাল বাড়ি লইল কাড়িয়া॥
চাঁদো বলে কানি মোর বাড়ি কাড়ি লয়। কোপেতে ধামাই কেশ ছিঁড়িয়া ফেলায়॥
আর কতক্ষণ মনে ভাবিয়া কমলা। আপনার নাম লিখি দিল এক ভেলা॥ ১৭৫
ভেলা দেখি সম্ভ্রমে নেহালে নৃপবর। মনসার নাম লেখা ভেলার উপর॥
কুপিয়া চরণে ঠেলি ফেলিলেক ভেলা। মনসার নামে ফেলি দিল কুলকুলা॥
জলেতে ভাসিয়া চাঁদো বল নাহি [২]পায়[২]। নড়িতে না পারে ঢোকে ঢোকে জল খায়॥
নেতো বলে পদ্মাবতী চাঁদো পাছে মরে। অবিলম্বে তোলো কূলে যাউক দেশেরে॥
[৩]বায়ু[৩] ঢেউ প্রতি পদ্মা করিল ইঙ্গিত। চাঁদো নরপতি কূলে তোলহ ত্বরিত॥ ১৮০
হরষিতে চাঁদো কূলে তুলিলো কৌতুকে। ভাসিতে ভাসিতে পদ মৃত্তিকায় ঠেকে॥
ক্ষেণেক বিলম্বে চাঁদো মুখ তুলি চায়। নগরের প্রজাগণ দেখিবারে পায়॥
চাঁদো বলে প্রাণরক্ষা করিল গোঁসাই। পাপিষ্ঠ কানিরে মোর আর ভয় নাই॥

ধরণী ধরিয়া রাজা যায় ধীরে ধীরে। হামাকুড়ি হামাকুড়ি উঠি বৈসে তীবে।
চাঁদোর দুর্গতি কথা শুন সর্বজন। দ্বিজ বিপ্রদাস চিন্তে মনসা চরণ।। ১৮৫

১ গায় (সু. সেন) ২ গায় (ঐ) ৩ বাউ (ঐ)

১২
পয়ার

নির্বল বিশেষ তনু ভাসিয়া সলিলে। ধীবে ধীবে নৃপতি উঠিয়া বৈসে কূলে।।
রবির আতবে চাঁদো করিল শয়ন। শোক দুঃখে মৃতাবত করয়ে রোদন।।
কান্দে কান্দে চাঁদো রাজা বসিয়া বিষাদে। সর্বনাশ হইল মোর কানির বিবাদে।।
সর্ব অঙ্গ হস্তপদ বিথানে লোটায়। মুখে বোল নাহি মাত্র চারিভিতে চায।।
আর না দেখিব গিয়া চম্পকনগরী। কোথা রহে ঠাঠ-পাট সনকা সুন্দরী।। ১৯০
বিপাকে মরণ দেখি না যাইব আর। কুক্কুর-শিবার মাত্র হইল আহার।।
পাপিষ্ঠ কানির বাদে নাহি অব্যাহতি। শ্রাদ্ধ পিণ্ড দান বিনে হইল অধোগতি।।
ধন পুত্র প্রাণ আর নৌকার চাকর। লক্ষ লক্ষ নরবধ কানির উপব।।
শুনিয়া চাঁদোর কথা হাসে পদ্মাবতী। দ্বিজ বিপ্রদাস বলে পদ্মা-পদে গতি।।

১৩
পাঁচালী

ছলিবারে চাঁদো রাজা মনসা কুমারী। গৃহস্থের বধূরূপে কাখে কুম্ভ করি।। ১৯৫
চাঁদোর সাক্ষাতে গিয়া জিজ্ঞাসে বচন। তুমিত পুরুষবর নৃপতি লক্ষণ।।
এতেক দুর্গতি তব কহ কি কারণ। একেশ্বর উলঙ্গ কে লইল ধনজন।।
মুখ তুলি বলে রাজা করুণ ভারতী। চম্পকনগরে ঘর চাঁদো নরপতি।।
সপ্ত ডিঙ্গা সাজি গেনু অনুপাম পাটন। কানির বিবাদে মোর মজে ধনজন।।
হাসি বধূ বলে বুড়া কানি বলো কারে। চাঁদো বলে তোমরা মনসা বলো যারে।। ২০০
বধূ বলে দেবতা নিন্দিস কি কারণ। তথির কারণে দুঃখ ভুঞ্জহে রাজন।।
মনসা চরণ পূজ শুন নৃপবর। শিব শিব বলি রাজা কর্ণে দিল কর।।
প্রাণ গেলে না পূজিব কানির চরণ। শুনিয়া হাসেন বধূ বলেন বচন।।
শ্মশানের মৃতবাস পরিধান কর। কটি ভাঙ্গ শ্রীফলের নড়ি ভর কর।।
কার বচনে চাঁদো ভ্রমে নদীতীরে। মৃত বাস পরি শ্রীফলের নড়ি করে।। ২০৫
অন্নাভাবে মাংসহীন প্রবীণ উদর। লাগিয়াছে মৃত্তিকা সকল কলেবর।।
পাকালায় লোচন কোঠর যেন ভুল। তার মূর্তি দেখি পদ্মা হাসিয়া বিকল।।
মায়া পাতি পদ্মাবতী কহিলা নাগেরে। দারু রূপ রহ গিয়া কানন ভিতরে।।
গুড়ি গুড়ি চাঁদো রাজা কাননে সাঁভায়। কাঠ বলি চাঁদো রাজা নাগেরে কুড়ায়।।
ধীরে ধীরে প্রাণশক্তি কাষ্ঠ বোঝা বাঁধে। চলিতে না পারে চাঁদো দাঁড়াইয়া কাঁদে।। ২১০
বেথিত হইয়া দেবী ধামাই পাঠাইল। নররূপী গিয়া তথা কাষ্ঠ তুলি দিল।।
শিরে বোঝা করি চাঁদো যায় ধীরে ধীরে। উপনীত হইল গিয়া কুমার-বাসরে।।
কেমতে বেচিব কাষ্ঠ ভাবে অভিমান। এত দুঃখ ছিল মোর ললাটে লিখন।।

কুমার বলয়ে কাঠুরিয়া তাই শুন। এত কাষ্ঠ বোঝা লও কড়ি চারি পোন।।
শিরে বোঝা চাঁদো রাজা হইল কাতর। দারু বোঝা ফেলে হাঁড়ি-পাখই উপর।। ২১৫
দশ বিশ হাঁড়ি ভাঙে কুমার কুপিত। বাড়ি ধরি টানিয়া বেড়ায় চারি ভিত।।
কিল চড়ে চাঁদো রাজা হইল মূর্ছিত। ভয় পাইয়া কুমারের নারী চমকিত।।
মুখে জল দিয়া ভারে করয়ে চেতন। [মধু] বাক্য বলি কড়ি দিল চারি পোন।।
কচুর পাতায় কড়ি লইল বাঁধিয়া। ধীরে ধীরে নগরে প্রবেশ করে গিয়া।।
এই কড়ি দিয়া আজি কিনিব বসন। আর কাষ্ঠ আনি অন্ন করিব ভোজন।। ২২০
তাঁতির বাটিতে গেলো বসন কিনিতে। দেখিয়া সকল তাঁতি হরষিত চিতে ।।
যার যত বসন চাঁদোর আগে আনে। চারি পোন কড়ি বস্ত্র মুলায় তখনে।।
শুনিয়া সকল তাঁতি ক্রোধযুক্ত হইয়া। ঢেকা মারি [১]খেদালিলা[১] বলি ভূতলিয়া।।
মনসা বলেন নাগ শুনহ এখন। কাষ্ঠ রূপ ছাড়ি সভে করহ গমন।।
চারিভিতে নাগ দেখি কুমার সভয়। বাদিয়ার কাষ্ঠ কিনি খাইনু আপনায়।। ২২৫
বাপ পোয়ে কুমারেরা রড়ারড়ি ধায়। তাঁতিপাড়া নিকটে চাঁদোর লাগ পায়।।
টানিয়া চাঁদোর ছিঁড়ে পাকা গোপ-দাড়ি। কাড়িয়া লইল তার চারি পোন কড়ি।।
মৃতাবত হইয়া কান্দে চাঁদো নরবর। দুই হাতে মুছে রাজা লোচনের জল।।
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় রাজার পোড়ে তো শরীর। কান্দিতে কান্দিতে রাজা গেল নদীতীব।।
বসিয়া ভাবেন দুঃখ চাঁদো মহারাজ। হউক মরণ জীবনেতে নাহি কাজ।। ২৩০
পুনরপি পদ্মাবতী বধূরূপ হইয়া। কাঁখে কুম্ভ করি বলে চাঁদো কাছে গিয়া।।
সকল লক্ষণযুক্ত তুমি মহারাজে। কহ সত্য এতেক দুর্গতি কোন কাজে।।
শুনি চাঁদো মুখ তুলি বলে প্রত্যুত্তর। চম্পকনগরে [২]বাসি[২] চাঁদো নৃপবর।।
ধনপুত্র বুহিত্র সকল লৈল কানি। তেঞি মোর দুরাদৃষ্ট এতেক নাটানি।।
হাসিয়া বলেন পদ্মা কানি বলো কারে। চাঁদো বলে মনসা তোমরা বলো যারে।। ২৩৫
বধূ বলে দেবতা নিন্দিস কি কারণ। আপনা কুবুদ্ধি দুঃখ ভুঞ্জিস রাজন।।
কাতর হইয়া তবে বলে চাঁদো রায়। খুধায় বিকল প্রাণ বলহ উপায়।।
বিশেষ কৌতুকি [৩]পদ্মা[৩] চাঁদো প্রতি বলে। কলা-চোপা কুড়াইয়া খাও নদীকূলে।।
শিব শিব বলি চাঁদো করয়ে অক্ষেমা। তুমি না জানহ বধূ আমার মহিমা।।
হস্তী ঘোড়া সেনাপতি সৈন্য অগণন। সকল সম্পূর্ণ মোর আছয়ে ভুবন।। ২৪০
নৃপতি হইয়া চোপা কুড়াবো কেমনে। সংসার ভরিয়া লাজ কি মোর জীবনে।।
এতেক শুনিয়া পদ্মা চাঁদোরে বুঝায়। দ্বিজ বিপ্রদাস বলে মনসার পায়।।

১ খেদালিয়া (সু. সেন) ২ বসি (?) ৩ প্রথা (সু. সেন)

১৪
শ্রীরাগ

ত্রৈলোক্য-ঈশ্বর প্রভু রাম অবতার। হরিল তাহার সীতা রাবণ দুর্বার।।
শুন শুন বারতা অবুধ মহারাজ। চোপা কুড়াইয়া খাও ইথে নাহি লাজ।।
আর দেখ নরবর দেব মহেশ্বর। জ্ঞান সাধিবারে ভিক্ষা মাগে ঘরে ঘর।। ২৪৫
প্রাণ রক্ষিবারে সভে সব ভক্ষ ভক্ষে। খাও কুড়াইয়া চোপা কে তোমারে দেখে।।

শ্রীবৎস নৃপতি চিন্তাদেবী তার রানি। দৈবদোষে কাঠ বেচি খাইল অবনী।।
কথো দিনে নিজ রাজ্য পায় পুনর্বার। পরান বাঁচিলে তেনো হইব তোমার।।
নল-দয়মন্তী আর পাণ্ডব যতেক। এই মতে দুঃখ সভে পাইল কতেক।।
বুঝাইলা মনসা চাঁদোর বরাবরি। দ্বিজ বিপ্রদাস বলে কর-জোড় করি।। ২৫০

১৫
ভৈরবী

বধূর বচন শুনি দৈবদোষে দুঃখ মানি
ধীরে ধীরে যায় নৃপমুনি।
চিন্তি গুণি সবিশেষ সহিতে না পারি ক্লেশ
অপমানে চক্ষে পড়ে পানি।।
বিধি এতো দুঃখ লিখিল কপালে।
জীবনে নাহিক কাজ সংসার ভরিয়া লাজ
এই মোর ছিল কর্মফলে।।
জনমে জনমে কতো পাপ কৈনু অবিরত
এত দুঃখ তথির কারণে।
সুরেশ্বরী পূর্বতটে ভ্রমে রাজা ঘাটে ঘাটে
কলা-চোপা কুড়ায় যতনে।।
মনের বিলাপ দূর চোপা পাইয়া বহুতর
পাখালিয়া [১]স্তুভ[১] কৈল কূলে।
চাঁদোরে বিষম বিধি হরিল সকল বুদ্ধি
স্নান হেতু ওলে গিয়া জলে।।
আমি চাঁদো মহারাজা হরে কৈনু নানা পূজা
এখন হইল সর্বনাশ।
গোটা কত চোপা দিয়া পূজি হরে ভক্তি হইয়া
বিরচিল দ্বিজ বিপ্রদাস।। ২৫৫

১ স্তূপ (?)

১৬
পয়ার

পদ্মা বৈল কুবুদ্ধি পাইল নৃপবরে। চোপা খাইবেন আজি বাপু মহেশ্বরে।।
চোরা গাই ছিল কাছে দিল হাঁকারিয়া। আসিয়া সকল চোপা খাইল কুপিয়া।।
জলে থাকি হাঁহাঁ চাঁদো বলে দুষ্ট বাণী। মায়া পাতি মোর চোপা খাইলেক কানি।।
ক্ষুধায় আকুল চাঁদো চঞ্চল শরীরে। কান্দিতে কান্দিতে যায় গঙ্গা তীরে তীরে।।
ব্যাধগণ পক্ষ ফাঁদ যথা পাতিছিলো। সেইখানে গিয়া চাঁদো উপনীত হইল।। ২৬০
নিকটে দাঁড়ায়্যা তবে কান্দে উচ্চ রায়। পড়্যাছিল ফাঁদে পক্ষ উড়িয়া পালায়।।
কোপে যত ব্যাধ মেলি ধরিয়া চাঁদোরে। লাথি চড় প্রহার করয়ে অবিচারে।।

আর্তনাদ ডাক ছাড়ে কান্দে নৃপমুনি। কোন দোষ কৈনু তব বেড়ি মারো কেনি॥
ব্যাধ সব বলে বুড়া হেন বলি নড়। ঝাক সহ আসি হেথা অবিলম্বে পড়॥
কুবুদ্ধি দিলেন পদ্মা চাঁদো বরাবর। ঝাক সহ পড় চাঁদো ডাকে নিরান্তর॥ ২৬৫
দৈস্য সব ডাকা দিয়া যায় হেন কালে। চাঁদোর কুবুদ্ধি-ভাষা শুনি সভে জ্বলে॥
মুষ্টিঘাত চড় [১]লাথি[১] প্রহার করিয়া। কাটিবারে লইয়া যায় চিকুরে ধরিয়া॥
কাতরোক্তি বলে চাঁদো না মারিহ প্রাণে। কি করিব কি বলিব বল সম্বিধানে॥
দৈস্য বলে হেন বোল বলো নিরন্তর। ইহা এড়ি আর নিয়া আনহ সত্বর॥
হেনো কালে এক সাধু পুত্র লইয়া পোড়ে। ইহা এড়ি আর আন চাঁদো ডাক ছাড়ে॥ ২৭০
সর্বজনে মহাকোপে অমঙ্গল শুনি। [২]লাথি[২] চড় মারে তারে কেশে ধরি টানি॥
এমন না হয় এ জলন্ত সর্বকাল। শুন রে অবুধ হেন বলো অবিশাল॥
কুবুদ্ধি কারণে রাজা উহা না বলিয়া। এমন জলন্ত হউক বলে ডাক দিয়া॥
হেন কালে নগরে লোকের ঘর পোড়ে। এমন জলন্ত হউক চাঁদো ডাক ছাড়ে॥
[৩]লাথি[৩] কিল চড় তারা মারে বিপরীত। পড়িল ধরণীতলে হইয়া মূর্ছিত॥ ২৭৫
কেশ ধরি টানিয়া এড়িল কত দূরে। পদ্মার মায়ায় চাঁদো প্রহারে না মরে॥
বিমর্ষ হইয়া রাজা আছে ক্ষিতিতলে। দ্বিজ মূর্তি ধরি পদ্মা আসি হেনকালে॥
সদয় হৃদয় তারে বলেন ব্রাহ্মণ। রাজমত দেখি তব দুঃখ কি কারণ॥
মাথা তুলি দেখে রাজা সম্মুখে ব্রাহ্মণ। প্রণাম হইয়া কহে আপন কারণ॥
শুনিয়া বলয়ে দ্বিজ শুন সম্বিধান। ব্রাহ্মণের বাটী থাক হইয়া কৃষাণ॥ ২৮০
দিন কথো সন্তাপিয়া যাইয নিজ রাজ্য। চাঁদো বলে দ্বিজ মোরে কৈলা ভালো কার্য॥
চাঁদোর দুর্গতি কথা শুন সর্বজন। দুহে আগমন কৈলা বিপ্রদাস গান॥

১ নাথি (সু সেন) ২ নাথি (ঐ) ৩ নাথি (ঐ)

১৭
শ্রীরাগ

আগেতে চলিল দ্বিজ পাছে যার চাঁদো-রাজ
উপনীত ব্রাহ্মণের পুরী।
দেখাইয়া দ্বিজবর পদ্মা কৈলা রথে ভর
বলে চাঁদো কর-জোড় করি॥
আমি ত কৃষাণ বড় ক্ষেত্রকর্মে অতি দড়
থাকিবো তোমার গৃহবাসে।
ত্রিসন্ধ্যা ভোজন করি চারিখানি বস্ত্র পরি
এক তঙ্কা লই এক মাসে॥
ব্রাহ্মণ বেথিত হইয়া ঝাটো স্নান করাইয়া
শুক্ল বস্ত্র পরায় তখন।
প্রচুর ব্যঞ্জন অন্ন দিল তারে সুপ্রসন্ন
সুখে চাঁদো করিল ভোজন॥ ২৮৫

কাঁচি টোকা হাতে দিয়া   বুহিতা বাকুড়ি লইয়া
    নিড়াইতে দিল যত্ন করি।
চাঁদো রহে কুতূহলে   পথেতে পথিক বলে
    ভালো ধান্যকড়া বিষহরি॥
মনসার নাম শুনি   কোপে [1]জ্বলে[1] নৃপমুনি
    এথা কানি মোর বিদ্যমান।
বিবর্ণ বদন হইয়া   দুই আঁখি পাকালিয়া
    তৃণ এড়ি কাটে সব ধান॥
দ্বিজ আসি ক্রোধমুখে   ধান্যের দুর্গতি দেখে
    [2]লাথি[2] চড় প্রহার করিয়া।
গালি পাড়ে অনিবার   দুইখানি বস্ত্র তার
    কাঁচি টোকা লইল কাড়িয়া॥
কান্দে চাঁদো লোটাইয়া   দ্বিজ দেখি দাঁড়াইয়া
    দয়া করি আনে পুনর্বার।
একখানি বস্ত্র লইয়া   তিন সন্ধে অন্ন খাইয়া
    থাক বুড়া বাটীতে আমার॥
বলে দ্বিজ নিরান্তর   গোধন রাখহ মোর
    শুনি চাঁদো হরষিত-মন।
হস্তেত পাচন লইয়া   চলে গরু চালাইয়া
    প্রান্তর মাঝেতে দরশন॥ ২৯০
গরু রাখে নৃপবর   দিন দুই অপসর
    কুবুদ্ধি দিলেন পদ্মাবতী।
চাঁদো হইল হতজ্ঞানে   গরু এড়ি দিলা থানে
    হাথে বাড়ি নাচে নরপতি॥
সর্ব গরু ধান্য খায়   গৃহস্থ দেখিতে পায়
    কাড়িয়া লইল তার বাড়ি।
বাড়ি দশ বিশ মারে   শোণিত পোড়য়ে ধারে
    ভূমি পড়ি যায় গড়াগড়ি॥
বসন কাড়িয়া লয়   কান্দি চাঁদো রাজা যায়
    পদ্মা মায়া পাতে হেন কালে।
পঞ্চনাগ মায়াবেশে   অভিনব দরবেশে
    চাঁদোরে রহায় তরুতলে॥
যেন সুরাপানে মত্ত   প্রথম উন্মত্ত চিত্ত
    বেড়িল চাঁদোর চারিভিতে।
দেখি পঞ্চ দরবেশ   ত্রাসে চাঁদো বাড়ে ক্লেশ
    দ্বিজ বিপ্রদাস বিরচিতে॥

১ জলে (সু. সেন) নাথি (ঐ)

১৮
পয়ার

দরবেশ মেলি চাঁদো ধরিল সত্বর। ভালা হইল আইল হিন্দু আমার নগর।। ২৯৫
মাথায় তইকা দিয়া আয় মোর সনে। ছয় ভাই মাগিয়া বেড়াব ছয়জনে।।
কেহ দুষ্ট ভাত লইয়া যাচায় বাজায়। কেহ মুখে ঝুটা পানি দিতে চাহে গায়।।
আর দরবেশ মাতোয়ালা হইয়া যায়। চামড়ার বাড়ি মারে চাঁদোর মাথায়।।
আর দরবেশ তৈকা মাথে দেয় তুলি। উসাবিযা যায় রাজা শিব শিব বলি।।
শুনিযা ভূতের নাম কুপিল সত্বর। ছাড়িয়া ভূতের নাম বল পেগম্বর।। ৩০০
প্রমাদ দেখিয়া চাঁদো কান্দে দুঃখ মানি। দুই হাথে মুছে রাজা লোচনের পানি।।
ঘুচিল পদ্মার মায়া গেলো [১]দরবেশ[১]। রড়ারড়ি চাঁদো রাজা পলাইয়া আইসে।।
কালিদহে ডুবিল চাঁদোর মধুকর। আসিয়া বারুইপুর উঠে নৃপবর।।
তথা কুমারের ঘরে বেচে কাষ্ঠ-বোঝা। চৌতলেতে চোপা কুড়াইল চাঁদো রাজা।।
পক্ষ ব্যাধ সঙ্গে দেখা সেই নদীতটে। দৈস্য সনে দরশন হইল কালীঘাটে।। ৩০৫
মাহেশে দেখিল চাঁদো পুত্রের দাহন। দিগঙ্গে দেখিল রাজা নগর-পোড়ন।।
হুগুলি রাখিল গরু ব্রাহ্মণ-আশ্রমে। ত্রিবেণী দেখিল দরবেশ পঞ্চজনে।।
নাহি জানে দিবানিশি চাঁদো রাজা যায়। চন্দ্রকেতু-রাজ্যে গিয়া পরবেশ হয়।।
পথে দাঁড়াইয়া রাজা ভাবে মনে মনে। নৃপতি মিতার রাজ্য আছে এইখানে।।
আমি নরপতি চাঁদো বিখ্যাত সংসারে। অনেক গৌরব মিতা করিব আমারে।। ৩১০
এতো ভাবি মিতের দুয়ারে উপনীত। দ্বারি প্রতি বলিল জানাও মোর মিত।।
আমি চাঁদো রাজা ঘর চম্পকনগরে। মোর এই দুঃখ দশা জানাও তুমি তারে।।
সর্বকথা কহে দ্বারি রাজার গোচর। দুঃখী হেন দেখি বলে চাঁদো নৃপবর।।
শুনিয়া ঈষত হাসি বলে দণ্ডধরে। হেন রূপে মিতা কেন আসিব এথারে।।
এক বোল আছে মিতার আপদলক্ষণ। মনসাকুমারী নিন্দা করে সর্বক্ষণ।। ৩১৫
কেমত প্রকারে দুঃখ দিলা বিষহরি। তেঞিও বা নাটায়্যা মিতা আইল মোর পুরী।।
আপনি চলিল রাজা হইয়া সদয়। দুই মিতে সম্ভাষ হইল পরিচয়।।
কোলে করি চাঁদোরে লইল অভ্যন্তরে। উর্দ্বতন করি স্নান করায় মিতারে।।
দিব্য বস্ত্র পরাইল বসায় আসনে। মধুর সুরস [২]দিব্য[২] করায় ভোজনে।।
জিজ্ঞাসিলা রাজা দুঃখদশা কি কারণ। মনসা-চরণে বিপ্রদাস বিরচন।। ৩২০

১ দরবেষ (সু. সেন) ২ (ঐ) দির্ব

১৯
কেদার

চাঁদো বলে কহি মিত সাজিয়া বুহিত সাত
বাহিয়া গেলেম কালিদয়।
তথা আইল নাগ-দল দেখিয়া আমার বল
পলাইল সভে প্রাণভয়।।

অহে মিত কি আর বলিব দুঃখবাণী।
বুহিত্র জীবন ধন ছয় পুত্র সুভাজন
সর্বসুখ মজাইল কানি॥
ভাঙ্গিয়া কানির ঘর ভরা দিনু মধুকর
বাহি গেনু অনুপাম পাটন।
নৃপতিরে মিতা কৈনু যতো [১]দ্রব্য[১] বদলিনু
সপ্ত ডিঙ্গা করিনু সাজন॥
বহুদিন সেই রাজ্য ডিঙ্গা মেলি আসি রাজ্য
প্রবেশিনু [২]কালিদহ[২] জলে।
কানি পাতে অবতার ঝড় বিষ্টি অন্ধকার
সপ্ত ডিঙ্গা লইল পাতালে॥
অবিরত জলে ভাসি নাহি জানি দিবানিশি
ভাগ্যপুণ্যে রহিল জীবন।
যতেক পাইনু দুখ কহিতে বিদরে বুক
দ্বিজ বিপ্রদাস সুবচন॥ ৩২৫

১ দির্ব (সু. সেন) ২ কালীদহ (ঐ)

২০
জমক ছন্দ
শুনিয়া মিতার দুঃখ নৃপতিনন্দনে। নানা উপহারে মিতে করাইলা ভোজনে॥
দেবতা প্রসাদ শুনি খাইল সত্বরে। মনসার বারা চাঁদো দেখে সেই ঘরে॥
কোপে কাঁপে চাঁদো রাজা হইল বাহির। আনিল কলার মাজী হইয়া অস্থির॥
গলে তাহা দিয়া অন্ন উলিল সকল। তখনি দেশেরে যায় চাঁদো ভূমণ্ডল॥
আস্তে ব্যস্তে চন্দ্রকেতু ধরিয়া রহয়ে। মহাক্রুদ্ধ হইয়া বলয়ে চাঁদো-রায়॥ ৩৩০
ঘরের ভিতরে তব কানি পাপ বারি। না থাকিব তোর বাড়ি যাব নিজ পুরী॥
যত্ন করি নরপতি মিতারে রহায়। কল্য নিশি-প্রভাতে যাইও নিজালয়॥
এই সভা সমেতে মনসা পুরো আশ। আজি রহিল গীত বলে বিপ্রদাস॥ ৩৩৩

দশম পালা সাঙ্গ

একাদশ পালা

১
বরাড়ি রাগ
রজনি বঞ্চিয়া সুখে চাঁদো নৃপ রায়। প্রভাতে মিতার তবে করিল বিদায়॥
দিব্য চতুর্দোল হস্তী ঘোড়া সেনাদল। [১]অনুব্রজি[১] কতো দূর রাখে ভূমণ্ডল।
চতুর্দোল চড়িয়া ভাবয়ে নরপতি। কি করিতে পারে আর কানির শকতি॥
চাঁদো রাজা মন্দ বলে জানি মনসায়। সত্বরে কুবুদ্ধি দিয়া চাঁদোরে রহায়॥

আমি চাঁদো রাজা হই বিদিত সংসারে। পরের বিভূতি লইয়া না যাব দেশেরে।। ৫
সভেরে বলিল যাও মিতার গোচর। একেশ্বর যাবো রাজ্য চম্পকনগর।।
খসাইয়া দিল সব সুবর্ণ অভরণ। উন্মত্ত পাগল বেশে করিল গমন।।
সেই মৃত-বাস সেই বেল-নড়ি করে। প্রবেশিলা নিজ রাজ্য চম্পকনগরে।।
[২]দিনমনি[২] অস্ত গেলা রজনি প্রবেশে। হেন কালে সর্বলোক গরু লইয়া আসে।।
বেনা ঝাড় ঝোপ আছে গোপথের কাছে। লাজ ভয় চাঁদো রাজা [৩]লুকাইয়া[৩] আছে।। ১০
বিকৃতি আকার চাঁদো গরু পানে চায়। উচ্চ পুচ্ছ করি গরু চৌদিগে পলায়।।
গায় খড়ি উড়ে তার পাকা দাড়ি-চুল। অভিনব শোভা করে বৃক্ষে যেন ভুল।।
দেখিয়া রাখাল সব ত্রাসে অঙ্গ চালে। অমনি পাইলে ধরি খাইবেক ভুলে।।
ভুল ভুল গণ্ডগোল হইল নগরে। সম্ভ্রমে কহিল গিয়া লখাই গোচরে।।
দেখিনু বিরূপ ভুল নগর নিকটে। বাঁচিয়া আইনু সভে বড়ই সঙ্কটে।। ১৫
লখাই চেঙ্গড়া দিল সকল নগরে। গ্রামে ভুল আসিয়াছে থাকিবা সত্বরে।।
লাজে মৃত্যাবত রাজা কান্দে নিজ দুঃখে। অঝর লোচনে রাজা রহে হেট মুখে।।
মনে মনে চাঁদো রাজা করে অনুমানে। কাজলা মালিনী ঘর আছে এই খানে।।
পরিচয় দিয়া তারে লইব শরণ। ইহা ভাবি ধীরে ধীরে করিল গমন।।
কান্দিতে কান্দিতে চাঁদো গেল দ্বার মাঝে। বিপ্রদাস বলে পদ্মা-চরণ সরোজে।। ২০

১ অনুবর্জি (সু. সেন) ২ দিনমুনি (ঐ) ৩ নুকাইযা (ঐ)

২

বসন্ত রাগ

আমি চাঁদো রাজা হেদে শুন লো কাজলা। বিপত্ত-কালেতে মোরে না করিহ হেলা।।
শুনলো কাজলা রামা আমি চাঁদো রায়। পাইনু অনেক দুঃখ নিবেদি তোমায়।।
ভুলের আকৃতি হই দুখের কারণ। লাজের কারণে পুরে না করি গমন।।
কানির বিবাদে মোর মজিল সকল। ধন পুত্র হারাইনু হইনু বিকল।।
কান্দিয়া নৃপতি বলে সকরুণ ভাষে। অধিক কাজলা ত্রাসে বলে বিপ্রদাসে।। ২৫

৩

পয়ার

ত্রাস ভয় কাজলা ভাবয়ে মনে মন। মায়াছলে মোরে আজি বধিব জীবন।।
চাঁদোর করম দোষে কাজলা সত্বরে। অগ্নি জ্বালি ফেলি দিল চাঁদোর শরীরে।।
অধিক কান্দয়ে রাজা পুড়ি হুতাশনে। প্রবেশ করিল গিয়া রাম কলাবনে।।
হেনকালে ঝাউয়া দাসী অস্ত্র লইয়া করে। পত্র হেতু যায় কলাবনের ভিতরে।।
তারে দেখি চাঁদো কলা-ঝাড়েতে লুকায়। ঝাউয়া দাসী পত্র হাত বাড়ায়্যা না পায়।। ৩০
চাঁদোর মস্তকে ঝাউয়া রাখিয়া চরণ। পত্র কাটে নিজ সুখে নাহি করে মন।।
মাথায় বেদনা পায়্যা চাঁদো নাড়ে গা। ভুল ভুল করি ঝাউয়া ডাকে উচ্চ রা।।
ত্রাসে ঝাউয়া কহে গিয়া সনকা নিকটে। পড়িয়া ভুলের হাতে আইনু সঙ্কটে।।
শুনিয়া ভুলের নাম ত্রাস সর্বজন। সব ঠাট লইয়া বেড়ে রাম কলাবন।।

মৃতাবত হইয়া চাঁদো কান্দে মন-দুঃখে। হেন অপমান মোর হইল লোকমুখে।। ৩৫
বিনি পাপ ক্ষেমে মোরে গঠিল গোসাঞি। ছয় পুত্র মৈল কেন মোর মৃত্যু নাই।।
দেখি কি বলিব মোরে যত পুরী জন। হেট মুণ্ড করি রাজা ভাবিল তখন।।
আর কেহ না চিনিব আমি চাঁদো রাজা। ভুল বলি মোরে বধ করিবেক প্রজা।।
সনকা চিনিব সবে আমি চাঁদো রায়। ইহা বিনা আর কিছু নাহিক উপায়।।
এতেক ভাবিয়া তবে দৃঢ় করি মন। সনকা নিকটে গিয়া কহে সকরুণ।। ৪০
ভুল নহি আমি হই চাঁদো দণ্ডধর। সুবর্ণ বাঁধান দন্ত দরশন কর।।
অস্থি চর্ম সার মাত্র গায় উড়ে খড়ি। মৃত-কানি পরি কটি পাকা গোপ দাড়ি।।
বিকৃতি আকার চক্ষু সামায় কোঠরে। ওষ্ঠ মেলি ছয় দন্ত দেখায় সত্বরে।।
পুনঃ পুনঃ বলে আমি চাঁদো ভূমণ্ডল। কানির বিবাদে মোর মজিল সকল।।
সনকা ঘরের মধ্যে নৃপতি বাহিরে। প্রদীপ ধরিয়া দেখে সভয় অন্তরে।। ৪৫
মহামন্ত্রি সনকা জানিল সুনিশ্চয়। প্রভুর দুর্গতি দেখি বেথিত-হৃদয়।।
করে ধরি গুপ্তবেশে লইয়া গেল ঘরে। তোলা জলে স্নান করাইল নৃপবরে।।
নানা উপহারে রানি করিল রন্ধন। নানা সুখে চাঁদো রাজা করিল ভোজন।।
বিচিত্র পালঙ্কে রাজা শয়ন করিল। হেন কালে লখিন্দর দরশন দিল।।
বাপের চরণ বন্দে সর্বাঙ্গ লোটায়্যা। জিজ্ঞাসেন নরপতি লখাই দেখিয়া।। ৫০
কাহার কুমার এই কহত সুন্দরী। দ্বিজ বিপ্রদাস বন্দে দেবী বিষহরি।।

৪

পটমঞ্জরী

সনকা বলয়ে বাণী শুন প্রভু গুণমণি
পুত্র-পত্র লহ নিদর্শনে।
পঞ্চ মাস গর্ভ আমি পাটনেতে গেলে তুমি
চিরদিন হইল পাটনে।।
প্রসবিনু পুত্রবর নাম থুইনু লখিন্দর
পড়াইয়া করিনু ভাজন।
সভার সম্মতি লয়্যা শুভক্ষণ কাল পায়্যা
দণ্ডপাট কৈল সমাপন।।
শুনি সনকার মুখে নৃপতি পরমসুখে
আনন্দে লখাই লইল কোলে।
পুত্র জায়া লইয়া তথা কহেন দুঃখের কথা
পরম দ্রবিদ ভূমণ্ডলে।।
শুভদিন লগ্ন করি সপ্ত ডিঙ্গা ধনে ভরি
বাহিয়া গেলেন বহু দেশ।
নানা স্থানে চাপাইয়া তীর্থকার্য সমাপিয়া
কালিদহে হইনু প্রবেশ।। ৫৫
কানি তথা মহাদন্ত যেন দেখি মেঘারম্ভ
নাগগণ বেড়ে চারিভিত।

দেখিয়া আমার দর্প ত্রাসে পলাইল সর্প
তবে কানি পলায় তুরিত ॥
ভাঙ্গিয়া মণ্ডব-ঘর তাহে ধন বহুতর
সপ্ত ডিঙ্গা তরিনু তথাই।
দিবা-নিশি নাই জ্ঞান এড়াইনু নানা স্থান
অনুপামে উপনীত হই ॥
সে রাজ্যের নরপতি মৈত্রতা করিনু তথি
বদলিয়া যতো রত্নধন।
মৈত্র-ভোলে সেই দেশে রহিলাম অনায়াসে
নিজ রাজ্যে হইনু বিসরন ॥
একে এক লক্ষ গুণ বেপার পাইনু ধন
কুতূহলে নিবসে তথাই।
স্বপ্নে তোমা দেখি নিশি বুহিত্র মেলিয়া আসি
কালিদহে উপনীত হই ॥
কানি আসি আকস্মাত ঝড় বিষ্টি বজ্রাঘাত
সপ্ত ডিঙ্গা পাতালে লইল।
ভাসিয়া পাইনু [১]কূল[১] অনেক দুর্গতি গেল
ভাগ্যপুণ্যে পরাণ রহিল ॥ ৬০
শুনিয়া রাজার কথা সনকার প্রাণে ব্যথা
রজনি বঞ্চিল ঐমনে।
প্রভাতে ভাবিয়া মনে সব জ্ঞাতি ডাকি আনে
বিনয় নিগদে সর্বজনে ॥
পুত্র মোর লখিন্দর রূপে গুণে বিদ্যাধর
অবিবাহ আছে মোর ঘরে।
কাহার দুহিতা আছে কহ ত আমার কাছে
বিবাহ করাব লখিন্দরে ॥
পুটপানি কহে সবে বিদায় করহ এবে
অনুমান করি নিজ বাসে।
নৃপতি বিদায় দিল সভে নিজ পুরি গেলো
বিরচিল দ্বিজ বিপ্রদাসে ॥

১ কুল (সু. সেন)

৫

জমক ছন্দ

বসিয়া বণিককুল আপনার পুরি। পুত্র জায়া লইয়া সভে অনুমান করি ॥
বিবা রাত্রে লখাই মরিব সর্পাঘাতে। দেখিয়া দুহিতা রাখি করিব কেমতে ॥ ৬৫
অবস্থিতা কুমারী আছিল যার ঘরে। পরিজন লইয়া পলায় দেশান্তরে ॥

শুনিল নৃপতি তাহা লোকের বদনে। চিন্তাযুক্ত হইয়া রাজা ভাবে মনে মনে।।
ওথায় মনসাদেবী জানিল ধেয়ানে। মর্ত্যপুরে প্রবেশ করিলা ততক্ষণে।।
সনকার মাসি রূপে আসি ধীরে ধীরে। হেনকালে স্নান হেতু সনকা সত্বরে।।
মায়ায় জিজ্ঞাসে দেবী রানির অগ্রেতে। চাঁদো রাজনের বাটি যাব কোন পথে।। ৭০
সনকা বলেন শুন বৃদ্ধ মহাজনি। কোথা হইতে আইস রাজপুরে যাবে কেনি।।
মায়াপাতি বলে দেবী পরিচয় দি। সনকা তাহার রানি মোর বহিন-ঝি।।
হরিষে সনকা তার বন্দিল চরণ। ঘরে আসি জিজ্ঞাসিলা কেন আগমন।।
মনসা বলেন মাগো শুন কার্যকথা। লখাই-সম্বন্ধ হেতু আসিয়াছি হেতা।।
উজানি সাহের ঘরে আছে তার কন্যা। বেহুলা তাহার নাম রূপে-গুণে ধন্যা।। ৭৫
সেই কন্যা সম্বন্ধ করহ লখিন্দরে। সনকা চাঁদোর স্থানে কহিল সত্বরে।।
শুনিয়া নৃপতি অতি পরম সানন্দে। আপনি চলিল রাজা পুত্রের সম্বন্ধে।।
পাত্র পুরোহিত নড়ে লইয়া আয়োজন। চারু চতুর্দোলে রাজা করি আরোহণ।।
যাত্রা করি গোলাট নগরে উপনীত। সরোবর তীরে রাজা বসি হরষিত।।
হেনকালে বেহুলা বিদায় করি মায়। মুকুতা-সহরে রঙ্গে স্নান হেতু যায়।। ৮০
নানা অলঙ্কার পরি অতি অনুপাম। কবরি বেড়িয়া মাল্য সুগন্ধি কুসুম।।
ললাটে সিন্দুর-বিন্দু জিনিয়া অরুণ। কি কহিব তার রূপ মোহে জগজন।।
চারিভিতে সখীগণ চলে ধীরে ধীরে। দ্বিজ বিপ্রদাস বলে উলে সরোবরে।।

৬

সুহাই

সকল সখী মেলি পুষ্কর্নি জলে উলি
দাড়ায়্যা নেহালে হরিষে।
সলিল নিরমল গভীর সুশীতল
সঘন পাতাল পরশে।।
বিচিত্র শতদল কমল সুকোমল
কুমুদ অতি বিকশিত।
মধুপ মধুপানে সঘন সুগায়নে
গুঞ্জরে অতি সুললিত।। ৮৫
প্রবল রাজহংস সরল সবিশেষ
কুরল মহা কোলাহল।
চকয়া অবিশাল ডাহুকা সামুখাল
কামী কোড়া গাঁড়াপোল।।
সারস বক কঙ্ক সরালি মৎস্যরঙ্গ
সঘনে চিল উড়ি ফিরে।
তিথির মউর বিহগ বহুতর
চরন্তি সরোবর নীরে।।
সকলে বান্ধি চুড়া করন্তি জলক্রীড়া
চিকুর বাস নাস ঘরে।

জলেতে করতালি আকুল জল তুলি
কয়া কয়া রোল করে।।
অন্তরে কেহ গিয়া মৃণাল তুলিয়া
ভাঙ্গি দেই সুবদনে।
হাসিয়া আর সখী কৌতুকে তাহা দেখি
কাড়িয়া লয় রস মনে।।
তুলিয়া পদ্মদণ্ডি ছিঁড়িয়া খণ্ডি খণ্ডি
চুম্বুক দিয়া জল তোলে।
অন্যাতে অন্যা মেলি আকাশে দেয় কেলি
করন্তি বড় কুতূহলে।। ৯০
কমল ফুল তুলি আকাশে দেয় ফেলি
লুফিয়া ধরে কেহ রঙ্গে।
প্রচুর ফুল ছিঁড়ি করয়ে হুড়াহুড়ি
ফেলিয়া মারে কারো অঙ্গে।।
কেহ সুগন্ধি ফুল তুলিয়া কুতূহল
সঘন পরয়ে হরিষে।
এমন কালে তায় আইল চাঁদো রায়
বদন্তি দ্বিজ বিপ্রদাসে।।

৭

নাট রাগ

হেনকলে তথা মায়া পাতে পদ্মাবতী। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণীর বেশে আইসে শীঘ্রগতি।।
প্রচুর ধবল কেশ বাঁধিতে না পারে। আকাশে চাহিতে পড়ে ঘাড়ের উপরে।।
মায়ার ছলনে দেবী সায়ের দুহিতা। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণীর রূপে হইল উপস্থিতা।। ৯৫
খণ্ড খণ্ড বসন বদনে দন্ত বোড়া। খঞ্জ গমনী দেবী দুই পদ খোড়া।।
সঘন নিমগ্ন আখি মন্দ দৃষ্টি চায়। গভীর আকার শির শোভে সর্ব গায়।।
মহাপদ্ম উরগে ধরিয়া করে নড়ি। খোম ধুতি পরি কাঁকে তাতিয়া চুপড়ি।।
ধীরে ধীরে উপনীত সরোবর ঘাটে। বসিলা বেহুলা জলক্রীড়ার নিকটে।।
অবগতি না করে বেহুলা ক্রীড়া রঙ্গে। চরণের জল লাগে ব্রাহ্মণ অঙ্গে।। ১০০
কুপিল ব্রাহ্মণী অতি যেন কালানল। দ্বিজ বিপ্রদাস বলে পদ্মা পদতল।।

৮

ভাটীয়ারি

অবধান নাহি করো দেখিয়া ব্রাহ্মণী। কোন গর্বে মোর অঙ্গে দিলা তো গোড়ানি।।
জানিবি পশ্চাতে চূর্ণ হবে অহঙ্কার। [১]শাপ[১] দিনু বিবা-রাত্রে খাইবা ভাতার।।
বেহুলা পাইয়া [২]শাপ[২] মনে অতি দুঃখী। জলক্রীড়া তেজি উঠে রক্তবর্ণ আখি।।
ব্রাহ্মণীর পদ ধরি বসে পরিহার। ভালো গালি [৩]দিলা[৩] অই আশীর্বাদ মোর।। ১০৫
তব [৪]শাপে[৪] কি হয় সহায় বিষহরি। তাহার প্রসাদে পূর্ব জাতি না পাসরি।।

বাণ সুতা উষা আমি [৫]অনিরুদ্ধ[৫] পতি। পূজা প্রচারিতে পদ্মা [৬]জন্মাইল[৬] খিতি।।
হইব চাদোর বহু স্বামী ত লখাই। চাঁদোরে সিজায়্যা দিব লোহার কলাই।।
বিবাদ করিয়া দুহে গেলো গঙ্গাজলে। গঙ্গার গোচরে গিয়া করয়ে কোন্দলে।।
নিবারণ নহে দুহে গঙ্গা করি সাক্ষী। ডুব দিল সলিলে মুদিয়া দুই আখি।। ১১০
মনে বুঝি গঙ্গাদেবী বেহুলা তুষিয়া। দিলেন সিন্দুর-শঙ্খ ব্রাহ্মণী গঞ্জিয়া।।
পুনরপি আসি দুহে সেই সরোবরে। ব্রাহ্মণী বিদায় করি গেলা নিজ পুরে।।
বেহুলা দেখিয়া চাঁদো হৃদয়-আনন্দ। এই কন্যা লখিন্দরে করাব সম্বন্ধ।।
সেবকে ডাকিয়া আজ্ঞা দিলেক তথাই। তুরিতে গড়ায়্যা আনে লোহার কলাই।।
স্নান করি বেহুলা চলিল নিজ ঘরে। পাত্র পুরোহিত যায় কন্যা অনুসারে।। ১১৫
উজানি নগরে যায় সায় বিদ্যমান। কহেন সকল কথা বিপ্রদাস গান।।

১ সাঁপ (সু. সেন) ২ সাঁপ (ঐ) ৩ (সু. সেনের কাল্পনিক পাঠ) ৪ সাঁপ (সু. সেন) ৫ অনিরুদ্র (ঐ) ৬ জর্মাইল (ঐ)

৯

বরাড়ি

শুনি সায় সবিশেষ চম্পকনগর দেশ
কি আর কহিব সন্বিধান।
মহারাজ চন্দ্রপতি প্রজা সহ বৈসে তথি
শান্ত দান্ত কি কব বিধান।।
ধনে জনে কুলে শীলে বিক্রম প্রতাপ দলে
অসংখ্য গগনে সৈন্যদল।
হস্তী ঘোড়া উট খর লেখা-জোখা নাহি তার
খিতি ভরি যশ অবিশাল।।
হরিষে সোমাই দ্বিজ প্রবেশিল সাহের রাজ্য
বিবা কার্য করে অনুবন্ধ।
নৃপতি-তনয়বর নাম তার লখিন্দর
তব সুতা করহ সম্বন্ধ।।
সেই রাজ্য মোর ঘর হই আমি দ্বিজবর
নাম মোর সোমাই পণ্ডিত।
সর্ব শাস্ত্রে হই রত নিজ কর্মধর্মান্বিত।
নৃপতির হই পুরোহিত।। ১২০
নৃপতি-তনয়বর সর্বগুণে বিদ্যাধর
অবিবাহ আছে তার ঘরে।
অবস্থিতা কন্যা ঘরে করো যদি অঙ্গীকারে
সম্বন্ধ করিব সারে দ্বারে।।
আপনি নৃপতি আসি মুকুতা-সহরে বসি
জানাইতে পাঠাইল আমা।

নগরে জিজ্ঞাসা কবি আইলাম তব পুরি
রাজ-আজ্ঞা জানাইল তোমা॥
ভূমি সাহে মহাজনে বিশেষ ভাবিয়া মনে
যে হয় করহ অঙ্গীকার।
শুনিয়া তোমার বাণী জানাইব নৃপমুনি
তবে সে আসিব দণ্ডধর॥
দ্বিজের বচন শুনি সাহে নিজ মনে গুণি
ছয় পুত্র ডাকে আপনার।
মুকুতা-সহরে রয় চাঁদো রাজা মহাশয়
[1]অনুব্রজি[1] আনহ সত্বর॥
চলে হরষিত হয়্যা সমাহারে সঙ্গে লয়্যা
নৃপতি গোচরে উপনীত।
দেখি চাঁদো ক্ষিতিপালে প্রণাম হইয়া বলে
দ্বিজ বিপ্রদাস বিরচিত॥ ১২৫

১ অনুবর্জ্জি (সু সেন)

১০
পয়ার
প্রণাম করিয়া বলে সায়ের [1]নন্দন[1]। আইসহ আমার পুরী করি নিবেদন॥
হরিষে নৃপতি তবে চলিলা তুরিত। সাহেব মন্দিরে গিয়া হইল উপনীত॥
পরিপাটী করি রাজা বসাইলা আসনে। প্রণাম করিল সায়ে যতো নিজ-গণে॥
কার্য হেতু জিজ্ঞাসিলা চাঁদো অধিকারী। সাহে বলে অনুমান করি নিজ-পুরী॥
রাজারে কহিয়া ঘরে গেলা সদাগরে। স্ত্রী-পুত্র লইয়া সাহে অনুমান করে॥ ১৩০
চম্পকনগরে রাজা চাঁদো নৃপবরে। বেহুলার সহ আর বর লখিন্দরে॥
সুমিত্রা বলেন বিবা না দিব তথাই। বিবা-রাত্রে সর্পাঘাতে মরিবে লখাই॥
ইহা শুনি সায়ে বলে বিষাদিত-মনে। আপনি নৃপতি আইল ভাণ্ডিব কেমনে॥
হেন কালে বেহুলা তথাই উপসন। তোমা সভে দেখি কেন বিরসবদন॥
শুনি সাহে বেহুলারে কহে সর্ব কাজ। তোমার সম্বন্ধ হেতু আইল চাঁদো রাজ॥ ১৩৫
বিবা-রাত্রে সর্পাঘাত হব লখিন্দরে। তোর মাতা খণ্ডে কার্য কি বলিব তারে॥
শুনিয়া বেহুলা বলে মাথা হেট করি। বাপ ভাই জননী সভার বরাবরি॥
শুন শুন পিত্য ভ্রাতি আমার বচন। ললাটলিখন কভু না যায় খণ্ডন॥
যার যেই ভবিতব্য এড়ায় ভুঞ্জিয়া। হয় নয় সভে চিন্তে দেখ বিচারিয়া॥
শুনি পিত্য ভ্রাত মাতা হরষিত হইলা। পাঠাও নৃপতি কার্যে নিবন্ধ [2]করিলা[2]॥ ১৪০
তবে সাহে সভাকার অনুমতি লৈয়া। নৃপতি গোচরে বলে জোড়হাত হইয়া॥
বেহুলা লখাই যদি হয়ত সদৃশ। করিব সম্বন্ধ এই সভার হরিষ॥
মনসা চরণ ভজ শুন নৃপবরে। তবে লখাইর রক্ষা কহিনু তোমারে॥
চাঁদো বলে শুন সাহে আমার বচন। প্রাণ গেলে না পূজিব কানির চরণ।

হরগৌরী বরে পুত্রে নাহি কোন ভয়। সম্বন্ধ করাও তুমি আনন্দ হৃদয়॥ ১৪৫
ইহা শুনি সাহে বান্যা বিষাদিত মন। এই সে কন্যার ছিলো ললাটে লিখন॥
বৈবাহিক বলিয়া সম্ভাষে চাঁদো রাজ। সম্বন্ধ নির্ণয় হইল করো নিজ কাজ॥
দৈবজ্ঞ আসিয়াছিলে রাজার সংহতি। করে পাঁজি লইয়া লগ্ন কৈল শীঘ্র গতি॥
সাহে বলে সম্বন্ধ করিনু সুনিশ্চয়। ভোজন করিতে এথা কিবা আজ্ঞা হয়॥
চাঁদো বলে পাটনে গেলেম দৈবদোষে। লবণ-উদগ মোর শরীরে প্রবেশে॥ ১৫০
নিত্য সিজাইয়া খাই লোহার কলাই। সাহে জানাইল গিয়া সুমিত্রার ঠাঞি॥
ওথায় সেবকে গঠি আনিল কলাই। সুমিত্রা নিকটে লৈয়া দিলেক তথাই॥
দেখিয়া সুমিত্রা রাণী বলয়ে বচন। এমন অদ্ভুত কর্ম না শুনি কখন॥
লোহা সিজাইতে কোথা পারে কার প্রাণে। বসিয়া সুমিত্রা মনে করে অনুমানে॥
লোহার কলাই দিল হাঁড়ির ভিতরে। বুঝিয়া দিলেক জল তাহার উপরে॥ ১৫৫
নিরবধি কাষ্ঠ দিয়া তথি দেই জ্বাল। আছুক সিদ্ধের কাজ না লয় উথাল॥
চিন্তিয়া গণিয়া রামা আকুল পরাণে। বিষাদ ভাবিয়া কান্দে বিপ্রদাস গানে॥

১ (সু. সেন-এর কাল্পনিক পাঠ) ২ করিয়া (সু. সেন)

১১

মহারাটী

ভাবি দুঃখ অপমান শরীর বিদরে। কমল শুখায় যেন চন্দ্রের শিশিরে॥
নিরবধি অশ্রু ঝরে লোচন ঝাপিয়া। হৃদয় বহতি নদী বদন ভরিয়া॥
কান্দে কান্দে সুবদনী সুমিত্রা রমণী। ভাবিতে আকুল দুঃখ অরুণ নয়ানী॥ ১৬০
হেন অসম্ভব বা সম্ভবে কোন ঠাঞি। মানবে সিজাইতে পারে লোহার কলাই॥
আপনা খাইয়া কোনো না গুণিনু মনে। হেন অপমান মোর ঘুষিব ভুবনে॥
রন্ধন তেজিয়া [১]কান্দে[১] দুঃখের আনলে। বেহুলা রমণী তথা গেলো হেন কালে।
মায়ের ক্রন্দন দেখি বেহুলা জিজ্ঞাসে। মনসামঙ্গল রচে দ্বিজ বিপ্রদাসে॥

১ সু. সেনের কাল্পনিক পাঠ 'পোড়ে'

১২

পয়ার

সুমিত্রা কহেন কথা বেহুলার ঠাঞি। সিজাইতে নারি আমি লোহার কলাই॥ ১৬৫
ঈষত হাসিয়া বলে বেহুলা সত্বরে। অবুধ জননী জ্ঞান নাহিক তোমারে॥
হেন অসম্ভব কথা সম্ভবে কোথায়। মানবের প্রাণে লোহা সিজাইতে চায়॥
না কর ক্রন্দন মাতা সুখে থাক তুমি। এখনি লোহার কলাই সিজাইব আমি॥
মনসা চরণ বন্দী স্থির মন হয়্যা। খড় [১]কেনা[১] আড়াই হালা আনিল কাটিয়া॥
কাঁচা হাড়ি সরা কাঁচা পাতিল উনান। সাত নান্দী কলাই সিজায় ততক্ষণ॥ ১৭০
মনসা চিন্তিয়া মাত্র তথি দেই জ্বাল। ফেনা বান্দী বান্দী শীঘ্র ধরিল উথাল॥
হাতে করি তুলি দেখে গোটা পাচ সাত। তুলিয়া দেখিল যেন হইয়াছে [২]ভাত[২]॥

দেখিয়া সকল লোক সানন্দিত মন। [৩]পাক[৩] করি মিষ্টান্ন করিল জলপান॥
করিয়া বিচিত্র স্থান ভোজনের কাজে। সাহে ডাকিয়া বসাইল চাঁদো রাজে॥
সুমিত্রা সাদরে দিল অন্ন বেঞ্জন। লোহার কলাই আনি দিল ততক্ষণ॥ ১৭৫
সুখে খায়্যা সম্বরিল লোহার কলাই। কি হইল দেখাইতে সনকার ঠাঞি॥
যার যেন মতে সভে করিল ভোজন। যার যেই যোগ্য শয্যা করিল শয়ন॥
শীতল পবন বহে প্রভাত যামিনী। [৪]প্রতিক্রীড়া[৪] কুতূহলে করে নৃপমনি॥
দেশেরে যাইতে চাঁদো করে অনুমান। নানা রত্নে কৈল সাহে গৌরব সম্মান॥
বিদায় হইয়া যায় চাঁদো নরবরে। [৫]অনুব্রজি[৫] রাখে সাহে মুকুতা-সহরে॥ ১৮০
প্রবেশ করিল চাঁদো আপনার পুরী। সর্বকথা কহিল সনকা বরাবরি॥
নর হইয়া সিদ্ধ করে লোহার কলাই। তাহা হইতে তরিবেক কুমার লখাই॥
শুনি সনকা বলে চাঁদোর গোচর। বিবা-রাত্রে পুত্রের নাগের আছে ডর॥
না দিব পুত্রের বিবা থাকুক ঐমনে। চাঁদো রাজা উপায় সৃজিল মনে মনে॥
চিন্তা না করিহ কহি তোমার অগ্রেতে। বান্ধিব লোহার ঘর সাতালি পর্বতে॥ ১৮৫
পুত্রবধূ থোব লৈয়া তাহার ভিতরে। তবে ত কানির নাগ কি করিতে পারে॥
চাঁদো রাজা কৌতুকে আছয়ে হেন মতে। বিবার উদযোগ রাজা করয়ে প্রভাতে॥
বৈকালে গাইব বিবা শুন সর্বজন। দ্বিজ বিপ্রদাস বলে মনসা-চরণ॥ ১৮৮

---

১ বেলা (সু সেন—অনর্থক) ২ তাত (সু সেনেব কাল্পনিক পাঠ) ৩ পূজা (?) ৪ প্রাতক্রিয়া (খুব সম্ভব সঠিক, প্রাতঃক্রীড়া সু. সেন-এর পাঠ) ৫ অনুবর্জ্জি (সু সেন)

একাদশ পালা সাঙ্গ

দ্বাদশ পালা

জাগরণ আরম্ভ

১

ত্রিপদী

রাত্র হইল প্রভাত উরিলা যে দিননাথ
চারিদিগে করিল প্রকাশ।
সচেতন চাঁদো রায় শয্যা তেজি ঝাট যায়
[১]প্রাতক্রিয়া[১] করিল বিশেষ॥
প্রভাতে অখণ্ড চণ্ড শিরে ধরে নবদণ্ড
বসিলা যে রাজসিংহাসনে।
পাত্রমিত্র প্রজাগণ সভে হইল অধিষ্ঠান।
চৌদিগে বেষ্টিত সেনাগণে॥
আদেশিলা দণ্ডধর আনিবারে শিল্পকর
লোহার মন্দির গঠিবারে।

প্রচুর সেবক ধায় যথা শিল্পকার পায়
আনিল নৃপতি বরাবরে॥
শুভক্ষণে অর্ঘ্য দান পর্বতশিখরে স্থান
সূত্রপাতে শুভযোগ কালে।
হয় নানা অলক্ষণ সূত্র-ছেদ পুনঃ পুন
রক্তবৃষ্টি হয় সেই স্থলে॥
না ভাবিয়া এই কথা পাতিল লোহার পোতা
তোলে লহু বিচিত্র দেয়াল।
পাতিল বিচিত্র চাল সাড়ক ছিটনি তাল
অপূর্ব লোহার চারি চাল॥ ৫
সাড়ক ছিটানি মাঝে মণময় রত্ন সাজে
প্রবাল পাথর থরে থর।
সর্ব লহময় ঘর সাজে মুনি-মনহর
মেঘে যেন পড়িছে চিকুর॥
মুকুতার ঝারা সাজে রূপসী ঝুমুকি মাঝে
তমহত প্রকাশিত অতি।
চারু চিত্র অবিশালে কনককলস চালে
বিচিত্র পতকা উড়ে তথি॥
লহু-স্তম্ভ সারি সারি তুলিল বিচিত্র পাড়ি
আড়কাটা তথির উপরে।
তিলাটে বসায়্যা তির বাওনা রাখিল শির
তথি পর ঘর শোভা করে॥
কাঁতে কাঁতে পেলা দিল চৌকাঠ কপাট খিল
রজতে লোহার দীপ্ত শোভা।
মণিময় মরকত ঝলমল করে কত
মহামেঘে যেন রবি-আভা॥
প্রাসাদ বিচিত্র দেখি মনসা চিন্তিতমুখি
রথে ভরে আইলা হেন কালে।
অন্তরীক্ষে পদ্মা বালি সকোপ কঠোর বাণী
শিল্পকার প্রতি পদ্মা বলে॥ ১০
আমি পদ্মাবতী হই পরিচয় তোরে কই
লখাই দংশিব বিবা-রাতি।
উপদেশ কহি তোরে যদি ভালো চাহ ঘরে
সূত্র-পথ রাখ শীঘ্রগতি॥
কামিলা তরাস পায় লোমাঞ্চিল সব গায়
. অষ্টাঙ্গ লোটায়্যা পরণতি।
কম্পিত পদ্মার ভয় সূত্রগতি পথ তায়
রাখিল পদ্মার অনুমতি॥

প্রাসাদ নির্মাণ করি নৃপতির বরাবরি
কামিলা হইল উপনীত।
স্বর্ণময় অভরণে পাট ভোট বসনে
শিল্পকার করিল ভূষিত।।
প্রাসাদ নির্মাণ দেখি নৃপতি পরম সুখী
বিভা হেতু আনন্দ প্রকাশ।
পরম ভকতি স্মৃতি মনসা-চরণ গতি
বিরচিল দ্বিজ বিপ্রদাস।। ১৪

১ প্রাতঃক্রীড়া (সু. সেন)

২

পয়ার

আমাত্য বান্ধবগণ ডাকি যুক্তি করি। প্রচুর গুবাক দিল হেম বাটি ভরি।। ১৫
আমার পুত্রের বিভা জানহ বিশেষ। যত্ন করি জ্ঞাতিগণ আন দেশে দেশে।।
রাজ-অঙ্গীকারো সভে গেলা দিগে দিগে। যাবে চাঁদো ঘরে তার পুত্র-বিভা যোগে।।
চতুর-আশ্রমে জ্ঞাতি শুনি হরষিত। জানায়ে চলিল তারা অতি উল্লসিত।।
চলে জ্ঞাতি যার যেই করিয়া সাজন। চম্পকনগরে গিয়া দিল দরশন।।
হস্তি-কান্ধে চড়িয়া অঙ্কুশ লইয়া হাথে। গ্রামিক বণিকগণ চলিল অগ্রেতে।।২০
হয় বর্ব প্রখর সাজিয়া নানা মতে। সঙ্ক-আশ্রমে বান্যা চলে শতে শতে।।
চারু চতুর্দোলে নানা প্রকারে সাজিয়া। ছত্রিশ আশ্রমে নড়ে আরোহিয়া।।
আউট আশ্রমে তবে নড়িল বিশেষে। কুমঃ কুম কস্তুরি নানা অলঙ্কার বেশে।।
দেখিয়া নৃপতি অতি গৌরব করিয়া। সম্ভ্রমে সম্ভাষ করি আসনে বসায়্যা।।
অধিবাসের [১]দ্রব্য[১] করি বিবিধ প্রকার। সুন্দর পাটের শাড়ি নানা অলঙ্কার ।। ২৫
বিচিত্র নির্মাণ শঙ্খ কনক চিরনি। সুবর্ণ-সাপুড়া পুরি নানা রত্নমণি।।
দিলেক অনেক [২]দ্রব্য[২] বিবিধ প্রকারে। দধি খদি কদলি লইল বহুতরে।।
প্রচুর আমাত্য ধীর দ্বিজবর সঙ্গে। চলিল সাহের পুরি নানা বাদ্য-রঙ্গে।।
প্রবেশ উজানি রাজ্য সাহে বিদ্যমান। অধিবাসের [৩]দ্রব্য[৩] লইল যতেক বিধান।।
দ্বিজ বিপ্রদাস বলে আনন্দ প্রকাশ। শুভক্ষণ দিন পায়্যা কৈল অধিবাস।। ৩০

১ দির্ব (সু. সেন) ২ দির্ব (ঐ) ৩ দির্ব (ঐ)

৩

কামোদ রাগ

আসনে বসায়্যা করে দূর্বা দিয়া
গণপতি আরোপণ।
সব দেবগণ পূজিল বিধান
বেদ পড়ে দ্বিজগণ।।

মহী গন্ধশিলা ধান্য দূর্বা কলা
দুগ্ধ দধি গোরোচনা।
[১]সর্পিষ[১] প্রচুর স্বস্তিক সিন্দুর
কজ্জল শঙ্খ শোভনা॥
বিবিধ সাজন বাজয়ে বাজন
আনন্দ উজানি রাজ্যে।
আইয়গণ মেলি দেহি হুলাহুলি
বেহুলারো বিভা কার্যে॥
সব আইয় মেলি তইল পিঠালি
দিল বেহুলার গায়।
সূত্রেতে বেষ্টিত দূর্বার সহিত
বদ্ধ কৈল বাম বায়॥
জল সহিবারে সুমিত্রা সত্বরে
আগে পাছে আইয়-গণ।
হাথে কাখে বারা মাথে ফুল ঝারা
বাজাইয়া সু-বাজন॥ ৩৫
উজানির রাজ্যে নানাবাদ্য বাজে
মঙ্গল গায় আইয় গণ।
লইয়া সখী সঙ্গে আগে যায় রঙ্গে
দ্বিজ পুরে দরশন॥
পুগ পূর্ণ দিয়া তথা জল লইয়া
হরষিতে [২]সভে[২] যায়।
উজানিনগরে ভ্রমি ঘরে ঘরে
বিপ্রদাস রস গায়॥ ৩৭

১ সর্ষপ (?) ২ সবে (সু. সেনের কাল্পনিক পাঠ)

৪

ধানসি রাগ

আইয় জানাইতে সনকা তুরিতে
বলে ঝাউয়া দাসী প্রতি।
ঝাউয়া অনুসারী নগর ওয়ারি
বড় আনন্দিত মতি॥
কমলা বিমলা চন্দ্রকলা শীলা
অমলা তিলা শীলবতী।
সুশীলা মঙ্গলা প্রবলা চঞ্চলা
সুমঙ্গলা মালাবতী॥

যশোদা প্রবোধা বরদা প্রমদা
সারদা মিতানুমতী।
সুমতি শ্রীমতী ভাগীরথী সতী
ইন্দ্রবতী জাম্ববতী।। ৪৩
অভয়া বিজয়া সদয়া নিদয়া
সর্বজয়া ছায়াবতী।
শুভা স্বর্ণরেখা উষা চিত্রলেখা
সনকা মেনকা সতী।।
শিবানী ভবানী রুদ্রাণী ইন্দ্রাণী
ব্রহ্মাণী মালিনী রমা।
অপছরী কিন্নরী সারী বিদ্যাধরী
মনোরমা তিলোত্তমা।।
সব আইয় মেলি হইয়া কুতূহলী
নানা অভরণ বেশ।
সখীগণ সঙ্গে চলে বহু রঙ্গে
চাঁদো-পুরি পরবেশ।।
সনকা শশিমুখী পরমকৌতুকী
পুত্র কৈল অধিবাস।
পদ্মা পদাম্বুজে নিরন্তর ভুজে
বিরচিল বিপ্রদাস।। ৪৪

৫
পয়ার
নৃত্যগীত আনন্দিত প্রভাত রজনি। আনন্দে মঙ্গলধ্বনি কৈল নৃপমণি।। ৪৫
ওথা সাহে সদাগর [১]আয়োজন[১] লইয়া। সুরম্য ছাঁদলা বান্ধে বিচিত্র করিয়া।।
রম্য আলিপনা অতি দেখিতে সুন্দর। হেমঘট আরোপিল তথির উপর।।
স্নান দান করি সাহে বসিলা আসনে। প্রথমে গণেশ পূজে দ্বিজ সন্নিধানে।।
ষোড়শ মাতৃকা পূজে হরষিত হইয়া। গৌরী পদ্মা শচী মেধা সাবিত্রী বিজয়া।।
বসুধারা দ্বার-মাঝে দিলেক হরিষে। নান্দীমুখ বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করিল বিশেষে।। ৫০
নৃপতির পুত্র সব লোক ধন্য ঘোষে। মনসা-চরণে বলে দ্বিজ বিপ্রদাসে।।

১ আও-জন (সু. সেন)

৬
যথারাগ
পড়া আঁখিবারে যায় সনকা সুন্দরী। ধান্য দূর্বা কদলি কুলায় পূর্ণ করি।।
আইয়-গণ সঙ্গে লইয়া মঙ্গল বিধানে। যথাবিধি পড়া আঁখে আনন্দিত মনে।।
হরিদ্রা শোভিত বাস আচ্ছাদন করি। বাম করে পূর্ণ ঝারি বারিপূর্ণ করি।।

সুনাদ মঙ্গল বাদ্য শুনি জয়ধ্বনি। পুত্রের মঙ্গল রচে সনকা বান্যানি।। ৫৫
দিব্যঙ্গনা-বেষ্টিত সনকা রামা-মাঝে। তারায় বেষ্টিত যেন পূর্ণচন্দ্র সাজে।।
পট্টচির ভূষণ মঞ্জীর বাজে পায়। রাজহংসী আগমনে লীলারঙ্গে যায়।।
ধান্য দূর্বা সিন্দুরিয়া সুগন্ধী চন্দনে। রাখিলেন পড়া রামা লৌকিক বিধানে।।
সপ্তধার বেষ্টিত সকল আইও মেলি। জলধারা বেড়ি দিয়া দেই হুলাহুলি।।
আইও সুইও লইয়া রামা মঙ্গল বিধানে। উদ্বর্তন স্নান সূত্র করিল বন্ধনে।। ৬০
দ্বিজ বিপ্রদাস বলে মনসা চরণ। ভকত জনেরে মাতা হইও সুপ্রসন্ন।। ৬১

৭

ভৈরবী রাগ

জয়জয় হুলাহুলি দেয় নারীগণ মেলি
তণ্ডুল-মঙ্গল মহানন্দে।
চারি নারী চারি পাশে মধ্যে লখিন্দর বৈসে
নক্ষত্র বেড়িল যেন চাঁদে।।
তণ্ডুল-কড়িতে পরি বিচিত্র সুবর্ণ হাঁড়ি
চারি সূত্র চারি নারী বাঁধে।
নানামত জয়ধ্বনি করিল সনকা রাণী
রামাগণ পরম আহ্লাদে।।
কেহ নাচে গায় গীত শুনি অতি সুললিত
মঙ্গল উচ্চারে ঘনে ঘন।
শঙ্খধ্বনি অবিরত জয়ধ্বনি নানামত
অনিবার দেয় সর্বক্ষণ।।
উল্লসিত নিরবধি বাদ্য বাজে নানাবিধি
মৃদঙ্গ বিষাণ ভেরি সানি।
বরুগো দগড় কাড়া রবাব পাখজ পড়া
অনিবার হয় বাদ্যধ্বনি।। ৬৫
কপিলাস করতাল ঘুসরি মুহরি ভাল
বাজয়ে খোমক জোড়া দামা।
দড়মসা-মহানাদে বোল নাহি শুনি শব্দে
এক ছন্দে বাজে নাহি ক্ষেমা।।
তণ্ডুল মঙ্গল সাঙ্গে সূত্র বাঁধিল রঙ্গে
লুখাইর দক্ষিণ করে।
নাপিতে খেউর কৈল ঘৃতদীপ প্রজ্বালিল
দ্বিজ বিপ্রদাস গানে সারে।।

৮

জমক ছন্দ

তবে ত সনকা রামা ছয় বধূ লইয়া। বিবিধ রন্ধন করে নানা [১]দ্রব্য[১] দিয়া।।
পায়েস পিষ্টক কৈল প্রচুর রন্ধন। স্থান করি দিল জ্ঞাতি করিতে ভোজন।।
ভোজনে বসিল সুখে যত জ্ঞাতিগণ। গৌরব করিয়া দিল অন্ন ব্যঞ্জন।। ৭০
পায়েস পিষ্টক দুগ্ধ শর্করা বিশেষে। আচমন করি সুখে বসিলা সন্তোষে।।
কর্পূর-তাম্বুল সুখে পূরিয়া বদনে। যাত্রার উদ্যোগ ডাক পড়ে ঘনে ঘনে।।
সাজ সাজ করি সভে করিল সাজন। প্রথমে লখাই সাজে বরের সাজন।।
সহজে সুন্দর বালা রাজার নন্দন। রাজ-অভরণ পরে অমূল্য বসন।।
কুসুম-টোপর শিরে শোভে দিব্যজ্যোতি। হেমগিরি-শৃঙ্গে যেন বিজুলি দিপতি।। ৭৫
দেখিয়া প্রশংসা করে লোক কুতূহলী। যতনে সৃজিল বিধি সোনার পুথলি।।
ললাটেতে মৃগমদ নয়ানে কজ্জল। মধু লোভে ভৃঙ্গ যেন কনক কমল।।
প্রতিক্ষণে ঝলমল কনক কুণ্ডল। মণিময় কত যেন জ্বলন্ত আনল।।
কনক-কেজুর দুই ভুজে দীপ্ত করি। করশাখা জ্যোতির্ময় রতন অঙ্গুরী।।
হৃদয় লম্বিত শ্বেত কুসুমের হার। হেমগিরি-শৃঙ্গ বেড়ি সুরেশ্বরী-ধার।। ৮০
সুশীতল চন্দন লেপিত কলেবরে। সুগন্ধি আমোদ তার দশদিগে পুরে।।
অভিন্ন কামের রূপ করিছে প্রকাশ। পদ্মা-পদাম্বুজে বলে দ্বিজ বিপ্রদাস।। ৮২

১. দির্ব (সু. সেন)

৯

শ্রীরাগ

সনকা শশিমুখী আনন্দে পুত্র দেখি
দ্রবিদ ভেড়ি দিল কোল।
নিরখি পুত্র প্রতি আনন্দ হৃদে অতি
চুম্বন বদন মণ্ডল।।
আমারো তোমা বহি দেখিতে আর নাহি
এই ত ভারত-ভুবনে।
তোমারো সবিচ্ছেদে তিলেক অপ্রমাদে
না জীব ক্ষেণেক বিহনে।।
বিহগো চকোরে না ছাড়ে সোদরে
[১]প্রজুষ[১] বর্ষে এক মতি।
জীবনে প্রাণ ধনে তেমন তোমা বিনে.
নাহিক মোর অন্য গতি।। ৮৫
তনয় ছয় ছিল সুরূপ গুণশীল
দংশিল মনসার নাগে।
তা সভা সন্তাপ ঘুচিল সব তাপ
তোমার প্রেম অনুরাগে।।

বিবাহ করি ঘরে আসিহ সত্বরে
সর্বত্র করিবা বিজয়।
লখাই ভক্তি হইয়া সর্বাঙ্গ লোটাইয়া
প্রণতি জননীর পায়॥
সনকা সাদরে লখাই ধরি করে
তুলিল পরম হরিষে।
আশীর্বাদ করি থাকিল সুন্দরী
পয়ান করিল হরিষে॥
বিচিত্র চতুর্দোল চৌদিগে ঝলমল
গজ মুকুতার ঝারা।
চামর গঙ্গাজল লম্বিত সুকোমল
কনক মণ্ডিত সুসারা॥
খদির দিব্য কূড়া ঠেকে [২]ছেআঁকড়া[২]
পূরিল কনকের খুরা।
রজত কাঞ্চন বিচিত্র নিরমান
মানিক-মণিতে সুসারা॥ ৯০
তথিতে আরোহণ নৃপতি নন্দন
বিবিধ বাজনা বাজে।
সুকবি দিব্য ভাষে রচিল বিপ্রদাসে
পদ্মার চরণ সরোজে॥

১ (মেঘ?) ২ (অর্থ ভেদ করা কঠিন)

১০

ত্রিপদী

চলিল নৃপমণি চৌদিকে জয়ধ্বনি
সেনাপতি প্রতি সব যোগে।
প্রধান সর্বাধিকে বিক্রমে প্রতাপ দাপে
সাজিয়া নড়িল দশদিগে॥
মিরবর কুবিরক অশ্ব দন্তী সাজে ধক
ছত্র আদি সাজিলেন যত।
সাজ সাজ ডাক পড়ে সকল [১]দেয়া(ন) নড়ে[১]
পাত্র মিত্র পুরোহিত যত॥
চলিল বিবাহ রঙ্গে সর্ব জ্ঞাতিবর্গ সঙ্গে
পরম আনন্দে চাঁদো রাজে।
শিশু বৃদ্ধ যুবা-গণ নড়িল প্রমোদ বন
সানন্দে মঙ্গল বাদ্য বাজে॥

[২]যূথে যূথে[২] বলবন্ত হানয়ে দুরন্ত দণ্ড
গণ্ড-মুণ্ড সিন্দুরে মণ্ডিত।
নানা অলঙ্কার অঙ্গে মাহুত সোয়ার সঙ্গে
চামর [৩]মুর্ছন[৩] সুশোভিত॥ ৯৫
প্রখর পাখর বর সাজিল যে বহুতর
চড়িল সোয়ারি বহু তায়।
নানা রঙ্গে অঙ্গে ভঙ্গে তৈনাত হইল সঙ্গে
খুখুন্দি খুখুন্দি খুন্দী ধায়॥
স্বর্ণ রূপা মণি রত্নে নির্মিত বিশেষ যত্নে
চৌদোলে বসিলা নৃপবরে।
পাত্র মিত্র পুরোহিত বেষ্টিত আমাত্য যত
অভিনব যেন পুরন্দরে॥
নানা ছিদ্র ছত্র শিরে শোভে নানা অলঙ্কারে
চতুর্বর্গ দল চারিভিতে।
প্রণতি ভকতি ভাবি ভজিয়া মনসা দেবী
দ্বিজ বিপ্রদাস বিরচিতে॥

১ পুথিতে 'দেয়া নড়ে' শ্রুতিলিখনের জন্য 'দেয়ান নড়ে'-র 'ন' বাদ গেছে। এ হল anagramatism-এর উদাহরণ। ২ জুতে জুতে (সু. সেন) ৩ মুর্ছল (ঐ)

১১

পয়ার

বাজি ভরি প্রচুর নড়িল বাজিকর। হাউই মন্দিরে বাজি দীপক প্রচুর॥
ভুঁইচাপা তুবড়ি চরখি অগণন। চাদর লইল কুমুরিকা অসংখ্যন॥ ১০০
গাহুল বম্বুল বানা দেখিতে সুন্দর। পুষ্পমাল্য মালাকার লইয়া সত্বর॥
প্রচুর দীয়টি চলে সংখ্যা নাহি হয়। দশদিগ দীপ্ত যেন চাঁদের উদয়॥
নৃত্যকার সাজিয়া চলিল নানা বেশে। সুরঙ্গ রসাল গীত গায় নানা রসে॥
চৌদিগে বাজনা বাজে যায় নৃপবর। এড়াইল নিজ রাজ্য চম্পকনগর॥
বাঁকের বাজারে রাজা দিল দরশন। পরম সন্তোষে যার নগর কাঞ্চন॥ ১০৫
চৌহাটা বাজারে রাজা দিল দরশন। প্রতি বাটি কুসুম কদলি আরোপণ॥
লক্ষ-বাজারে গিয়া করিল প্রবেশ। বিধিমতে দেবপূজা করিল বিশেষ॥
ফুলোটা নগরে গেল চাঁদো দণ্ডধর। লক্ষ লক্ষ দেখে তথা পুষ্পের পসার॥
পাড়া গিয়া রাজা হইল উপনীত। সাজিয়া সকল মালা চলিল ত্বরিত॥
বিশপাড়া দিয়া যায় চাঁদো নৃপবর। সম্মুখে দেখিল রাজ্য ধাছলি নগর॥ ১১০
হস্তী ঘোড়া ঠাট আদি বিবিধ বাজন। দেখিয়া সকল প্রজা হইল ত্রাস-মন॥
ধন পুত্র গোধনাদি সকল তেজিয়া। বিভায় সকল লোক স্ত্রী-পুত্র লইয়া॥
দূরে গিয়া সর্বজন নেহালিয়া চায়। বিভার বৈরাত্তি হেন দেখিবারে পায়॥

কনিষ্ঠ ডিঙ্গর ছিলো খুদিয়া টেঙ্গর। বিবাহ বৈরাতি যায় কোন কার্যে ডর।।
আগু যায় সর্ব লোক একত্র হইয়া। এখনি বাকড়া গুয়া লইব রহায়্যা।। ১১৫
সঘনে সকল লোক নড়িল সাজিয়া। কৌতুকে চলিল সভে হরষিত হইয়া।।
পথে আসি রহাইল চাঁদো নৃপবরে। হুড়াহুড়ি গণ্ডগোল হইল সত্বরে।।
ঠেলাঠিলি ফেলাফেলি নিবায় দীয়টি। বোল নাহি শুনে কেহ করে কাটাকাটি।।
চাঁদো বলে হুড়াহুড়ি কর কি কারণে। দেও বাকড়ার গুয়া বলে সর্বজনে।।
চাঁদো বলে আঠারো [১]বাকড়া[১] নাম বলো। তবে গুয়া পান দিব না কর কোন্দল।। ১২০
তবে আসি বলে বেটা খুদিয়া টেঙ্গর। অবধান করো হেরো চাঁদ নৃপবর।।
প্রথমে বাকড়া লও প্রভু ভগবান। গোকুলে বাকড়া লও বলভদ্র কান।।
অযোধ্যায় বাকড়া লও শ্রীরাম লক্ষ্মণ। চন্দ্র সূর্য লহ আর বীর হনুমান।।
যমরাজ লহ পাণ্ডবের পঞ্চজন। নৃসিংহ বরাহ দুই লহ ত বামন।।
কহিল বাকড়া নাম এ তিন ভুবন। অবধানে গুয়া পান দেহ ত রাজন।। ১২৫
চাঁদো বলে খুদিয়া ঠেকিলি মোর ঠাঞি। সতেরো বাকড়া হইল আর এক কই।।
অবধান করহে শুনহ নৃপবর। আমি তো হই বটে খুদিয়া টেঙ্গর।।
তবে রাজা গুয়া পান দিলেক হাসিয়া। বিবাহ দেখিতে চলো হরষিত হইয়া।।
নির্জন প্রান্তর মধ্যে গেলো নৃপবর। ভাবিয়া মনসা তথা আইল সত্বর।।
চাঁদোরে ছলিতে পাতিলেন অবতার। দ্বিজ বিপ্রদাস বলে পদ্মা-পদ সার।। ১৩০

১ বাঁকড়া (সু. সেন)

১২
ত্রিপদী

সাজিয়া নাগের দল মনসা করিল ছল
মায়া পাতি যায় নাগেশ্বরী।
ত্রিভুবনে যতো ছিলো পদ্মার ইঙ্গিতে আইলো
চলিলো চাঁদোর বরাবরি।।
প্রবীণ সঘন ঘোর বিক্রমে প্রখরতর
শ্বাসে ঝড় বহে ত প্রবল।
যেন মেঘ পাটোয়ার দশদিগ অন্ধকার
ফণায় ঢাকিল ভূমণ্ডল।।
অতি উচ্চ কলেবর দেখি যেন মহীধর
দশদিগ জুড়িয়া প্রমাণ।
মনসা বিচিত্র রথে নাগদল চারিভিতে
উপনীত চাঁদো বিদ্যমান।।
বিষম নাগের ধ্বনি সর্বলোক ত্রাস গুনি
ঝড় বিষ্টি প্রলয় আকার।
ডাক ডাকি সর্বলোকে কেহ কাহো নাহি দেখে
মহাভয় জীবন অসার।।

নাগগণ হাই ছাড়ে যেন বজ্রাঘাত পড়ে
বিজলী প্রকাশে দিগচয়।
কেহ বলে বিসম্বাদ ঝড় বিষ্টি পরমাদ
কেহ বলে অকাল প্রলয়॥ ১৩৫
নির্জন প্রান্তর মধ্যে তরিব কেমন [১]বুদ্ধে[১]
বিশ্রাম করিতে নাহি স্থান।
নাগের নিশ্বাস বয় দীয়টি নির্বাণ হয়
অধিক কম্পিত সেনাগণ॥
কান্ধে হইতে দোলা ফেলি পলাইল চৌদুলী
বিশেষ গর্জন নাগগণ।
রাহুত মাহুত যত হস্তি-ঘোড়া-পিঠে যত
অস্ত্র ফেলি ধায় সর্বজন॥
মায়া পাতি বিষহরি ধর ধর ডাক ছাড়ি
চাঁদো রাজা ধায় উর্ধ্বমুখে।
ফেলি হেঁতালের বাড়ি রাজা যায় গড়াগড়ি
ভেঙ্গুরুল চাকে গিয়া ঠেকে॥
ভেঙ্গুরুলে বেড়ি খায় চাঁদো রাজনের গায়
পড়ি রাজা গড়াগড়ি খায়।
চাঁদো বলে কি হইল সভে পলাইয়া গেল
দেখিয়া হাসেন মনসায়॥
দেখিয়া বিষম কাজ ভাবে চাঁদো মহারাজ
কোথা পুত্র থাকিল লখাই।
হস্তী ঘোড়া সেনাপতি বিথান হইল অতি
আপন পড়িলে কেহ নাই॥ ১৪০
এথা লখিন্দর পথে নিরবধি অশ্রুপাতে
কাঁদন্তি দেখিয়া পরমাদ।
সর্বঠাট গেল কোথা এইখানে ছিলো পিতা
কেন হইল হেন বিসম্বাদ॥
ভাবে চাঁদো অধিকারী সঙ্কটে কেমনে তরি
এতেক প্রমাদ হইল কোনি।
দশদিগে পরমাদ আশ্চর্যিতে বিসম্বাদ
প্রমাদ করিল আসি কানি॥
চাঁদোর বচন শুনি মনসা হৃদয় গনি
এখনি মজাই চাঁদো রাজা।
লখাই বেহুলা তবে কেমতে প্রচার হবে.
মর্ত্যে না রহিল মোর পূজা॥
আপনা আপনি দেব হয়ে প্রবোধ ভাবি
সর্ব ক্রোধ করিল নির্বাণ।...

লইয়া তো নাগগণ পদ্মা হইল অন্তর্ধান
দশদিগে হইল প্রসন্ন॥
চাঁদো আইসে উর্ধ্বমুখে পুত্র পুত্র করি ডাকে
কোথা গেল সোমাই পণ্ডিত।
সেনাপতি আদি যত সভে হইল অনুগত
দ্বিজ বিপ্রদাস [২]বিরচিত[২]॥ ১৪৫

১ বুদ্ধ্যে (সু সেন) ২ বিবজিত (সু সেন— ভুল পাঠ)

১৩

পয়ার

সম্বিত পাইল তবে যত বাক দল। যাব যেই অস্ত্র ধরি উঠিল সকল॥
গাহুল বম্বুল উঠে চোঙ্গে [১]চোঙ্গে[১] বানা। মেঘনাদে নানা শব্দে হইল বাজনা॥
নৃত্যগীত আনন্দিত যায় নৃপবরে। উপনীত হইল গিয়া মুকুতা সহরে॥
বাদ্যশব্দ শুনি সাহে হরষিত মন। আপনার ছয় পুত্র ডাকে ততক্ষণ॥
মুকুতা সহরে চাঁদো বর লখিন্দরে। [২]অনুব্রজি[২] আনো গিয়া সত্বরে সাদরে॥ ১৫০
বাপের আজ্ঞায় তারা চলিল সত্বরে। শতমন [৩]লোহ[৩] ঘণ্টা বাঁধিল দুয়ারে॥
শতেক মনুষ্য তাহা নাড়িতে না পারে। লোহার গাড়র এক এড়ে কথো দূরে॥
লখিন্দর [৪]অনুব্রজি[৪] আনিল তুরিতে। সমুখে দেখিল রাজা ঘণ্টা বিপরীতে॥
জিজ্ঞাসয়ে নৃপমুনি ঘণ্টা কি কারণ। ভাঙ্গিতে লখাই ঘণ্টা বলে সর্বজন॥
কুঞ্জরে থাকিয়া রাজা ডাকে মহাশূর। ভাঙ্গিলু সাহের ঘণ্টা করিমু যে চুর॥ ১৫৫
ধীরে ধীরে তুলে রাজা চাঁদো ভুমণ্ডল। বৃদ্ধকালে আজি সে করিব বাহুবল॥
দুই হাতে ঘণ্টা টানে না পারে নাড়িতে। ঘণ্টায় ঠেকিয়া চাঁদো পড়িল ভূমিতে॥
দেখিয়া হাসিল শিশু দেয় টিটকারি। বাপ-অপমানে লখিন্দর ক্রোধকারী॥
অতি কোপে লখিন্দর ভূমে উলে তূর্ণ। মহাদম্ভে দুই চক্ষু হইল রক্তবর্ণ॥
রুষ্ট হইয়া লখিন্দর ঘণ্টা পানে চায়। বাম কর দিয়া ঘণ্টা ঠেলিয়া ফেলায়॥ ১৬০
দুই করে ধরি ঘণ্টা শূন্যতে তুলিয়া। পাষাণ উপরে জোরে ফেলে আপসায়্যা॥
ভাঙ্গিল দুর্জয় ঘণ্টা দারুণ প্রহারে। ঘণ্টা ভাঙ্গি লখিন্দর ক্রোধিত অন্তরে॥
কোপে লাথি-ঘায় ভাঙ্গে দোসরি কপাট। ক্রুদ্ধ হইয়া লখিন্দর মারে মালসাট॥
সম্মুখে দেখিল বালা লোহার গাড়র। দক্ষিণে ধরিল মুণ্ড কর্ণে বাম কর॥
মৈড়া ধরি লখিন্দর মারে একটান। ছিঁড়িয়া গাড়র-মুণ্ড করে খান খান॥ ১৬৫
শালাগণ পলায় লখাই-রোষ দেখি। শুনিয়া আইল সাহে হইয়া উর্ধ্বমুখি॥
সাহে বেনে দেখি চাঁদো উপজিল হাস। দুইজনে কোলাকুলি বড়ই উল্লাস॥
জামাতা গোচরে সাহে নিজগণে বেড়ে। শুভকার্য সময়েতে দ্বন্দ্ব কেবা করে॥
জামাতার করে ধরি লইল আপনে। প্রবেশিলা নিজ পুরী হরষিত-মনে॥
প্রচুর দিলে [ক] সাহে সলিল আসন। যারে যেই যোগ্য স্থানে বৈসে সর্বজন॥ ১৭০
লখিন্দর-দোলায় বেহুলা আরোহিয়া। শ্রী তুলিবারে যায় হরষিত হইয়া॥

ভ্রমিল কৌতুকে সব উজানি নগরে। বিধানে তুলিল ছিরি কুম্ভকার ঘরে।।
ভ্রমে গ্রাম আদ্যোপান্ত মনসা-প্রসাদে। নানা উপহারে পদ্মা পূজিল প্রমোদে।।
নানা মতে স্তুতি করে বেহুলা সুন্দরী। কৃপায় উরিল আসি দেবী বিষহরি।।
বলন্তি বেহুলা রামা করিয়া প্রণতি। তব পাদপদ্ম ছাড়ি অন্য নাহি গতি।। ১৭৫
তব প্রেম দাসী তিন জন্ম সেবা করি। তোমার প্রসাদে পূর্ব জাতি না পাসরি।।
আমার বিবাহ আজি তোমার বিনন্দে। জানাইতে আইনু তোমা পরম সানন্দে।।
যদি প্রিয়দাসী প্রতি থাকে অনুগ্রহ। বিভা-বেশ বিচিত্র কাঁচুলি মোরে দেহ।।
শুনিয়া হইল দয়া বেহুলার প্রতি। বিশ্বকর্মা আনি আজ্ঞা দিলা শীঘ্রগতি।।
যত্ন করি মনসা বলিলা মুখ তুলি। নির্মাইয়া দেহো শীঘ্র বিচিত্র কাঁচুলি।। ১৮০
নীল পীত শ্বেত লিখে বিচিত্র অম্বর। কাঁচুলি লিখিতে বিশাই হরিষ অন্তর।।
পদ্মাবতী-চরণ-সরোজ-মধু লোভে। দ্বিজ বিপ্রদাস তথি ভৃঙ্গরূপে শোভে।।

১ (সু. সেনেব প্রস্তাবিত পাঠ) ২ অনুবর্জ্জি (সু. সেন) ৩ লহ (ঐ) ৪ অনুবর্জ্জি (ঐ)

১৪

পয়ার

দক্ষিণ পাশেতে তবে [১]লিখিল[১] বিস্তরে। গাণ্ডার শার্দুল সিংহ লিখে কপিবরে।।
মহিষ কুঞ্জর আর লিখিল ভল্লুক। কৃষ্ণশার লিখে তথি বরাহ [২]জম্বুক[২]।।
সুরঙ্গ কুরঙ্গ লিখে লিখে সাড়ুয়াল। নেগরু ভাম লিখে ইন্দুর বিড়াল।। ১৮৫
দদ্ধক (?) গুধিকা লেখে কাঁকলাস ভেক। ধেনু-পাল বৎস সহ লিখিল অনেক।।
বাম পাশে পক্ষ লিখে চকবা সারস। চকোর হিবির জই পায়রা বায়স।।
কুরালী তিথির লিখে গাঁড়াপোল কামি। সামুখাল বক গুড়গুড়্যা শীঘ্রগামী।।
ধনুস্করি (?) গিধিনি শকুনি সয়চান। শালিক বটুকা লিখে মউর খঞ্জন।।
নোটন পায়েরা শুয়া লিখিল ভারুই। লিখিল টুণ্টটীয়া চড়ুই রাগুই।। ১৯০
লিখিল দয়েল পেচা ঘুঘু মৎস্যরাজা। ছাতারে বানিয়াবধূ লিখি তালচাকা।।
বেহুলারে কাঁচুলি দিলেন বিষহরি। কাঁচুলি পরিয়া হইল ত্রৈলোক্যসুন্দরী।।
মনসার প্রতি তবে বলে সুবদনী। বিবাহ দেখিতে মাতা আসিবে আপনি।।
পদ্মাবতী বলেন বেহুলা বিদ্যমান। আমি গেলে তোর কার্য হইব বিধান।।
যত্ন করি বলয়ে পদ্মার ধরি পায়। তোমার প্রসাদে মাতা কারে মোর ভয়।। ১৯৫
বেহুলার যত্নে নড়িল বিষহরি। বেহুলা চলিয়া গেলো আপনার পুরি।।
ওথায় বরণ করে সাহে সদাগর। পাদ্য অর্ঘ আদি দিলো হরিষ-অন্তর।।
বস্ত্র অলঙ্কার দিয়া করিল বরণ। স্ত্রী-আচার করিবারে বলয়ে তখন।।
অন্তঃপুরে লইয়া গেলো অতি উল্লসিত। বিবিধ বাজনা বাজে গায় সুললিত।।
রামাগণ স্ত্রী-আচার করয়ে তখন। চারিদিগে [৩]বেষ্টিত[৩] হরিষে আইয়গণ।। ২০০
নিজ ধর্ম স্ত্রী-আচার করে কুতূহলে। লখিন্দর দেখিয়া সকল আইয় তোলে।।
অনঙ্গে মোহিত হইয়া বলে আইয়গণ। দ্বিজ বিপ্রদাস বলে মনসা-চরণ।। ২০২

---

১ নিখিল (সু. সেন) ২ জম্বক (ঐ) ৩ বেষ্টিত (ঐ)

১৫
ত্রিপদী

আইয়গণ মনে ভায় লখিন্দর পানে চায়
সালাগ্য ইহার মাতাপিতা।
জন্ম হইল শুভক্ষণে তুল্য নাহি রূপে গুণে
অতি যত্নে সৃজিল বিধাতা॥
স্বর্ণজ্যোতি কলেবর রূপ জিনি বিদ্যাধর
বেহুলা পাইল পুণ্যফলে।
পূর্ব জন্মে কৈল কত হরগৌরী আরাধিত
তেই হেন-রূপ বর মিলে॥
মনে বিমরিষ আইয়গণ।
বেহুলা সুন্দরী যেন বর লখিন্দর তেন
যত্নে বিধি করিল সৃজন॥ ২০৫
এক আইয় ভাবে মনে চাহিয়া লখাই পানে
হেন বর না মিলিল মোরে।
সাগরে কামনা করি আরাধিব হরগৌরী
জন্মান্তরে পাই এই বরে॥
আর আইয় ভাবে দুঃখ চাহিয়া লখাইমুখ
শিশুকালে বিভা হইল কেনি।
আমি হেন-রূপ হই বিবাহে কুরূপ পাই
চক্ষু খাইল জনক জননী॥
আর আইয় মহাসতী পতিব্রতা ধর্মে মতি
গুণবতী ভাবেন হৃদয়।
ললাটে লিখন ছিল সেই সব স্মর হইল
ভাবিলে চিন্তিলে কিবা হয়॥
যার যার পতি নাঞি সেহ ভাবে গোসাঞি
ধরিতে না পারে প্রাণেশ্বর।
বেহুলার প্রেম হই পাছু গোড়াইয়া কই
সর্বক্ষণ দেখি লখিন্দর॥
বৃদ্ধ ভাবিনী যত লখাই দেখিয়া হত
মৃতাবত যৌবনের শোকে।
যখন যৌবন ছিল হেন বর না মিলিল
সর্বক্ষণ বঞ্চিতু কৌতুকে॥ ২১০
যত বালা অবস্থিতা সেহ ভাবে মনকথা
যৌবন প্রকাশ মাত্র তায়।
লখাইর গুণে সেহ হত কামবাণে
দ্বিজ বিপ্রদাস রস গায়॥

১৬
কামদ রাগ

চাঁচর চিকুর কবরি সুন্দর
তাহে মালতীর মালা।
নীল গিরিবরে [১]বিচ্ছেদ[১] করে
যেন শশী ষোল কলা।।
উজ্জ্বলিত ভালে সিন্দুর মণ্ডলে
তাথে চন্দনের ভাতি।
এক ঠামে বসি যেন রবি শশী
দেখি মনোহর অতি।।
জয় জয় ধ্বনি বাদ্য শঙ্খধ্বনি
আনন্দে মঙ্গল [২]তাল[২]।
মেলি আইয় গণে বেহুলা সাজনে
নানা রত্নে শোভে ভাল।।
কামধনু জিনি ভুরুযুগ ধনি
কজ্জলে উজ্জ্বল আঁখি।
বদন কমল মধুপ প্রবল
প্রেমে পড়ি তথি দেখি।। ২১৫
নাসা তিলফুল [৩]নাম্বে[৩] মুতি-ফল
কুন্তল শ্রুতি প্রবন্ধে।
অধরে সুভাষ্য মন্দ মন্দ হাস্য
পীযূষ বরিষে চান্দে।।
[৪]কম্বু[৪] সম গ্রীবা মণিময় শোভা
কাঁঠি গলে রত্নময়।
হার হৃদে দোলে সঘন বিলোলে
মুনি-মন মোহ হয়।।
মৃণাল আখণ্ড জিনি ভুজদণ্ড
কঙ্কন কেয়ুর তায়।
বিচিত্র বাহুটী অঙ্গুলে আঙ্গুটী
মণিময় শোভা পায়।।
ক্ষীণ কটি মাঝে পট্ট বস্ত্র সাজে
মঞ্জীর পাশুলি পদে।
স্বর্ণ পিড়ি পাতি বসাইলা তথি
ধরিল পরমানন্দে।।
ত্রৈলোক্য সুন্দরী পর্ণ করে ধরি
তুলিল সভে আনন্দে।
বর লখিন্দরে নর [৫]কান্ধে[৫] চড়ে
অন্তপটে অনুবন্ধে।। ২২০

বাদ্য নৃত্য গীত সভে সানন্দিত
ফুল-ছিটী চারি ভিতে।
শূন্যে বিষহরী রথে ভর করি
বিবাহ দেখে হরষিতে॥
বিভা-দৃষ্টি রঙ্গে চৌদিগে ভুজঙ্গে
লখাই দেখি তরাস।
মোহে সর্ব-অঙ্গে ঢলিল আতঙ্কে
বিরচিল বিপ্রদাস॥

১ জৈর্ছ্বেদ (?) (সু. সেনের সন্দিগ্ধ পাঠ) ২ তান (সু. সেন) ৩ লাম্বে (সু. সেন), লম্বে (?) ৪ কম্ব (সু. সেন) ৫ কান্দে (ঐ)

১৭

পয়ার

লখাই বিরূপ অতি দেখিয়া প্রমাদ। হাহাকার শব্দে সভে করয়ে বিষাদ॥
কোলে করি চাঁদমুখ নিরক্ষিয়া চায়। নিশ্বাস চেতন কিছু না পাইল তায়॥
সভা হইতে চাঁদো রাজা শুনিবারে পায়। হাহাকার শব্দ করি উঠিয়া দাণ্ডায়॥ ২২৫
ধাইল নৃপ শোকে হইয়া বিভোলে। বদন্তি প্রমাদ গণি পুত্র লইয়া কোলে॥
তখনি সনকা মোরে করিল নিরোধ। বিবাহ না দিব পুত্রে শুনহ প্রবোধ॥
তাহা না শুনিয়া হেন কর্ম কৈনু কেনি। কেমতে জিবেক শুনি সনকা বান্যানি॥
কি লইয়া যাবো দেশে কি হইল প্রমাদ। হেন মহোৎসবে কানি করে বিসম্বাদ॥
সর্বনাশ কৈল মোর কানি পাপমতি। তর্পণ করিতে মোর না থুইল সন্ততি॥ ২৩০
কতেক পুত্রের শোক সহিবারে পারি। আর না যাইব দেশে হইব দেশান্তরি॥
পুত্র কোলে করি রাজা কান্দিয়া বিকল। মৃতাবত কাদন্তি সকল নৃপদল॥
লখাই-বিপদ দেখি হৃদয় দ্রবিত। কাদন্তি সোমাই দ্বিজ রাজপুরোহিত॥
হাথের ফেলিয়া অস্ত্র কান্দে সর্বাধিক। সর্বসৈন্য কান্দে আর কান্দে কুরিবক॥
কান্দয়ে সুমিত্রা সাহে তার যত পুরী। সর্ব আইয়গণ কান্দে আপনা বিসরি॥ ২৩৫
তবে ত বেহুলা বালা হৃদয় ভাবিয়া। জনক সাহেরে কিছু বলিল কান্দিয়া॥
এইমনে থাকো সভে মন-স্থির হইয়া। যাবত না আসি আমি মনসা পূজিয়া॥
করে করি লইল রামা [১]তীক্ষ্ণ[১] কাটারী। সহচরী সঙ্গে শীঘ্র চলিল সুন্দরী॥
বাহির প্রসাদ যথা মনসা উদ্যান। পুনরপি বেহুলা গেলেন সেই স্থান॥
পূজিয়া করিল স্তুতি বিবিধ প্রকারে। মৃতাবত হইয়া রামা কান্দে উচ্চস্বরে॥ ২৪০
দ্বিজ বিপ্রদাস বলে মনসা-চরণ। নিজ ভক্তগণে মাতা হইয় সুপ্রসন্ন॥

১. তিক্ষ'ণ (সু. সেন ; অহেতুক পাঠ)

১৮

আহীরী রাগ

উচ্চস্বরে কান্দে রায় আখি-জল ঝুরে। কালিয়া কমল যেন কনকশিখরে॥
বেহুলা যুবতি সতী পড়িয়া ত খিতি। করুণা-রোদনে বালা বলে পদ্মা প্রতি॥
কি হলো কি হলো মোরে সকল বিথান। ত্রিজগত লোকমুখে থুইনু অপমান॥
জনমে জনমে তোমা ভক্তি ভাবে সেবি। তোমা বিনে অন্য দেব কভু নাহি ভাবি॥ ২৪৫
কিবা সেবা ভক্তিহীন কৈনু না বুঝিয়া। এতেক নিষ্ঠুর মা গো হইলা আমা পায়্যা॥
পতিপত্নী তিন জন্ম পূজি বিষহরি। তোমার প্রসাদে পূর্ব জাতি না পাসরি॥
ইন্দ্রপুর হৈতে আমা আনিলে হরিয়া। কত দুঃখ দেও মোরে খিতি জন্মাইয়া॥
নিজ দাসী পেয়ে এত নিদারুণ কেনি। জীয়াইয়া দেও প্রভু করুক ছায়নি॥
নহে গলে তুলি দিবো রসান কাটারি। জীবন তেজিব আজি তোমা বরাবরি॥ ২৫০
দ্বিজ বিপ্রদাস বলে ভাবিয়া কমলা। সেবকে করিয় দয়া না করিহ হেলা॥

১৯

ভৈরবী রাগ

হইয়া উগ্রমতি গলায় দিতে কাতি
বেথিত দেবী পদ্মাবতী।
ধরিয়া তাঁর হাথে কহিলা মধুর বাতে
জীয়াইয়া দিব তোর পতি॥
মনসা কুতূহলে মন্ত্র পুষ্পজলে
দিলেন বেহুলার হাথে।
আকাশে রথভরে বিবাহ দেখিবারে
যাইব তোমার পশ্চাতে॥
নিশ্চয় আজি তোর নাহিক বিঘ্ন আর
ছায়নি করহ দম্পতী।
করেতে হেম-ঝারি চলিল সুন্দরী
মন্দিরে আইল শীঘ্রগতি॥
ডাকিয়া নিজ তাত কহিল সব বাত
শুনিয়া সাহে হরষিত।
জঞ্জাল নিবারিল মুকুতা পথ কৈল
বেহুলা নিলেন তুরিত॥ ২৫৫
বসন কাণ্ডারে প্রবেশ অভ্যন্তরে
নেহালে প্রাণনাথ-মুখ।
সর্বাঙ্গ কেশপাশ বিথান বিশেষ
দেখিয়া মনে বড় দুঃখ॥
গগনের পথে বিবাহ দেখিতে
মনসা তথা উপনীত।
বেহুলা পুষ্পজলে লখাই-অঙ্গে দিলে
সর্বাঙ্গে হইল লোমাঞ্চিত॥

পুনঃ পুন নীর দিলেক সত্বর
চৈতন্য বিঘ্ন বিনাশন।
বসিলা লখিন্দরে বেহুলা গেল ঘরে
বিপ্রদাস বিরচন ॥

২০
পয়ার

পুত্র দেখি চাঁদ রাজা তুলি লৈল কোলে। লক্ষ লক্ষ চুম্ব দিল বদন-মণ্ডলে ॥
সর্ব লোক জয়ধ্বনি পরম-আনন্দ। বিবিধ বাজনা বাজে অনেক প্রবন্ধ ॥ ২৬০
[১]নৃত্যকেতে[১] নৃত্য করে [২]গায়ত[২] গায়নে। রমণী পুরুষ লোক সানন্দিত মনে ॥
চৌদিকে মঙ্গলময় বিবিধ প্রকারে। রমণী পুরুষ নাচে অনেক প্রকারে ॥
চাঁদ রাজা নাচে কান্ধে হেতালের বাড়ি। ঝলমল করে মুখে পাকা গোঁপ দাড়ি ॥
সাহে সদাগর নাচে বাল্য [৩]বৃদ্ধ[৩] বহু। সোমাই পণ্ডিত নাচে উর্ধ্ব করি বাহু ॥
রাজা বেড়ি পাত্রমিত্র নাচন্তি কৌতুকে। হাতে-অস্ত্রে সেনাগণ নাচে সর্বাধিকে ॥ ২৬৫
লক্ষ লক্ষ দিয়টি চৌদিকে জ্যোতির্ময়। নাশে ত তিমির যেন সূর্যের উদয় ॥
চাঁদ বলে বধূ মোর সর্ব গুণবতী। কি করিতে পারে আর কানির শকতি ॥
সর্ব লোক বলে শুন চাঁদ নৃপবর। তব বুদ্ধিহত দোষে দুঃখিত আপার ॥
পদ্মা নিন্দি সর্বনাশ হইল তোমার। তব বুদ্ধে লখাইর নাহিক নিস্তার ॥
পুত্রের কুশল চিন্ত রাজ্যের মমতি। না করো মনসা নিন্দা অবুধ নৃপতি ॥ ২৭০
তবে চাঁদ নৃপতি বলেন সাহে প্রতি। শুভক্ষণে ছায়নি করাও শীঘ্রগতি ॥
শুনিয়া সাহের পুরি আনন্দিত হইয়া। পুনরপি বেহুলারে আনিল সাজিয়া ॥
দ্বিজ বিপ্রদাস বলে মনসা চরণে। শুভক্ষণে ছায়নি করিলা দুই জনে ॥

১ নৃত্ত কেতে (সু. সেন) ২ গাএত (ঐ) ৩ বের্দ্ধ (সু. সেন)

২১
কামোদ রাগ

সুনাদ মঙ্গল রস গায় আইয়গণে। মঙ্গল গুঞ্জরে অতি তম্বুরা গায়নে ॥
[১]নৃত্যকে[১] নাচয়ে তথি বিবিধ প্রকারে। প্রচুর দিয়টি দশ দিগ আলো করে ॥ ২৭৫
নানা শব্দে বাদ্য বাজে প্রচুর আনন্দে। বেহুলা-লখাই বিভা পূর্বের নির্বন্ধে ॥
বিচিত্র কাঞ্চন পাটে বেহুলা বসায়্যা। চৌদিগে ঘৃতের দীপ প্রচুর জ্বালিয়া ॥
সহজে সুন্দরী [২]গোরি[২] পট্ট চীর পরি। প্রভাতের সূর্য যেন ঢাকে হেমগিরি ॥
মানবের কান্ধে লখাইর আরোহণ। দম্পত্য সম্মুখে রতি-মদন মিলন ॥
বিচিত্র কুসুমে রচি মদন মঞ্জরী। হরষিতে লখিন্দর করে লৈল ধরি ॥ ২৮০
হুলাহুলি আনন্দ মঙ্গল জয়ধ্বনি। লখাই-বেহুলা শুভ পুষ্পের ছায়নি ॥
ছায়নি করিয়া ক্ষিতি উলি দুইজন। দ্বিজ বিপ্রদাস চিন্তে মনসা-চরণ ॥

---

১ নৃত্তকে (সু. সেন) ২ গুরি (ঐ)

২২
মঙ্গল রাগ

সাহে হরষিত মন সুখে করে কন্যাদান
নিজ পুরোহিত মন্ত্রগানে।
জল তিল কুশা করে যথাবিধি লোকাচারে
কন্যাদান করে শুভক্ষণে।।
লখিন্দর অনুপামে বেহুলা বসিল বামে
দশদিগ আনন্দ প্রকাশে।
রূপেতে জগত জিনি সর্বলোক ধনি ধনি
যেন রতি মদনের পাশে।।
যৌতুক দিলেন আনি আসন বসন জানি
ধেনু আদি রতন কাঞ্চন।
অঙ্গদ [১]কেয়ুর[১] হার অঙ্গুরি মঞ্জরি আর
মণি আদি বহুমূল্য ধন।। ২৮৫
বাটি খুরি বাটা ঝারি খালে ডাবর ভরি
খাট আর বিচিত্র অম্বর।
[২]দিব্য[২] চারু চতুর্দোল হস্তি ঘোড়া সৈন্যদল
দাস দাসী দিলেন বিস্তর।।
দোহে হরষিত মন অগ্নি কৈল প্রদক্ষিণ
অরুন্ধতী দেখিল অবশেষে।
পদ্মা-পাদপদ্ম ভাবি দ্বিজ বিপ্রদাস কবি
শুভক্ষণে মন্দিরে প্রবেশে।।

১ কেজুর (সু. সেন) ২ দির্ব্ব্য (ঐ)

২৩
পয়ার

নানা দ্রব্য লইয়া তবে সুমিত্রা সুন্দরী। জামাতা-ভোজন হেতু রান্ধে ত্বরাত্বরি।।
পায়েস পিষ্টক রান্ধি অন্ন বেঞ্জন। জামাতা বসিলা সুখে করিতে ভোজন।।
পায়েস পিষ্টক দিল পুরি হেম-থালে। সুবাসিত শাল্য অন্ন দিল কুতূহলে।। ২৯০
যথাবিধি ভোজন করিল পরিতোষে। অবশেষে আচমন করিল বিশেষে।।
প্রচুর তাম্বুল পুগ-পূর্ণ করি মুখে। বিচিত্র খট্টায় বৈসে পরম কৌতুকে।।
ওথায় মন্ত্রণা করে বেহুলা রূপসী। স্বর্ণ যন্ত্র লইলেক হড়পি সাঁড়াসি।।
দিব্য শয্যে কুসুমে রচিল আইয়গণ। বিচিত্র খট্টায় তুলি পাটের বসন।।
কণ্ঠু ধার চন্দ্ররূপি উপরে মসারি। তথিতে চামর গজমুক্তা সারি সারি।। ২৯৫
শয়ন করিল দুহে তথির উপর। দাসদাসীগণ সভে হইল অন্তর।।
ওথায় মনসা নেতো ভাবিয়া অন্তরে। এক নাগ পাঠায় দংশিতে লখিন্দরে।।
যেইমাত্র বেহুলা নাগের শব্দ পায়। শয্যায় বসিয়া রামা চারিদিকে চায়।।
সম্ভ্রমে দেখিয়া নাগ উঠিল সুন্দরী। গৌরব করিয়া দুগ্ধ দিল বাটি ভরি।।

ভালো হইল আইলে ভাই আমার উদ্দিশে। দুগ্ধ পান করি যাও পরম হরিষে॥ ৩০০
হেটমুণ্ড করি নাগ দুগ্ধ পান করে। সুবর্ণ সাঁড়াসি দিয়া মুণ্ড চাপি ধরে॥
বন্দী করি এড়ে নাগ হড়পিতে ভরে। নাগের বিলম্বে পদ্মা চিন্তিত অন্তরে॥
পুনরপি যুক্তি করি মনসা ত্বরিতে। আর নাগ পাঠাইলা লখাই দংশিতে॥
যেইমাত্র বেহুলা নাগের শব্দ পাইল। গৌরব করিয়া দুগ্ধ বাটি ভরি দিল॥
ভালো হইল আইলা ভাই আমার উভালে। দুগ্ধ পান করি যাও বড় কুতূহলে॥ ৩০৫
হেটমুণ্ড হইয়া নাগ দুগ্ধ পান করে। বন্দী করি এড়িলেক হড়পি ভিতরে॥
আর নাগ পাঠাইলা লখাই দংশিতে। তাহা তো বেহুলা বন্দী করি সেই মতো॥
চারি গোটা নাগ বন্দী করে চারি পরে। আপনি চলিলা পদ্মা উজানি নগরে॥
নানা রম্য দেখে পথে বেহুলা চাতুরি। প্রতি ঘরে ঘরে দেখি মনসার বারি॥
গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ নৈবিদ্য রসাল। আর কত দূরে দেখে কড়িয়া জাঙ্গাল॥ ৩১০
দেখিতে বিশ্রাম হইল নিশি অবশেষ। বেহুলার বাসরে আইলা গুপ্তবেশ॥
বেহুলার প্রতি যে আকাশবাণী বলে। চারি নাগ পাঠাইনু তোমার উভালে॥
আপনি আইলাম নাগ-বিলম্ব কারণ। শুনিয়া বেহুলা নাগ কৈলা বিমোচন॥
ভক্তি করি বেহুলা পাঠায় কুতূহলে। নিদ্রাভঙ্গ লখিন্দর বিপ্রদাস বলে॥

২৪
ত্রিপদী

গা তোল রমণী ধনি কোকিলের রব শুনি
যামিনী প্রভাতে হেন দেখি।
এখনি বিদায় করি যাইব আপন পুরী
মোর সঙ্গে চলো শশিমুখী॥ ৩১৫
হরি হরি চিন্তাযুক্ত বেহুলা সত্বর।
ব্যাল্লিশ বাজনা ধ্বনি অতি সুললিত শুনি
যাব রাজ্য চম্পকনগর॥
আমি মহারাজ-সুত সরূপ যৌবনযুত
অতি সুচরিতা রূপগুণে।
বিধির নির্বন্ধ হইতে বিভা হইল তব [১]সাথে[১]
দরশন হইল শুভক্ষণে॥
জনক জননী তোর ইষ্ট মিত্র সহোদর
রহিবারে করিব যতন।
না করিহ কারো মায়া আমি তো বুঝাই জায়া
মোর সঙ্গে করহ গমন॥
বেহুলা রমণী ধনি প্রকাশে মধুর বাণী
বিদায় করিব বাপ মায়।
প্রভুরে বিদায় করি গেলো বামা নিজ পুরী
দ্বিজ বিপ্রদাস রস গায়॥ ৩১৯

১ সথে—পুথিতে ; 'সাথে' সু. সেনের পাঠ

২৫

পয়ার

প্রবেশে বেহুলা বালি জননী সমুখে। কোলে ঝি করিয়া চুম্ব দিল শশিমুখে।। ৩২০
পরম সানন্দে চাঁদো যতো সেনাগণ। পুত্র কোলে লইয়া রাজা চুম্ব আলিঙ্গন।।
বসায়্যা দম্পত্যে দুহে বিচিত্র আসনে। আশীর্বাদ যৌতুক দিলেক সর্বজনে।।
নড়ো-নড়ো করি ডাকে সোমাই পণ্ডিত। যাত্রার উৎযোগে বাদ্য মঙ্গল বিহিত।।
তবে সাহে মহাশয় আসিয়া সম্ভ্রমে। পরিতোষে কৈল জ্ঞাতি চতুর-আশ্রমে।।
নানা রত্নে চতুর্দোলে বিচিত্র সাজন। লখাই বেহুলা তথি করি আরোহণ।। ৩২৫
নানা বাদ্য জয়ধ্বনি করিল গমন। সুমিত্রা মনের দুঃখে করেন ক্রন্দন।।
বন্ধু সহোদর যত প্রাণ নাহি ধরে। ছয় বধূ কান্দে আর ছয় সহোদরে।।
সাহে মহাশয় কান্দে যত পুরীজন। মুকুতা সহরে চাঁদো দিলো দরশন।।
ফুলোটা নগর দিয়া যায় নৃপবরে। প্রবেশ করিল গিয়া চম্পক নগরে।।
ওথা রামা সনকা মঙ্গল বাদ্য শুনি। অন্তঃপুর বাহিরে দেখিতে আইল রানি।। ৩৩০
পুত্রবধূ-মুখ দেখি পরম সন্তোষ। মঙ্গল বিধানে কৈল মন্দিরে প্রবেশ।।
বধূ-পরিচয় রামা কৈল কুলাচারে। শয়নে চলিল লহ-মন্দির ভিতরে।।
নানা রত্নে শয্যা তথি নানা আয়োজন। দম্পত্য সুখদ শয্যা করিল শয়ন।।
বেহুলা বলেন কিছু শুনহ নিশ্চয়। আজিকার নিশি তোমা আছে সর্প-ভয়।।
নিদ্রা না যাইহ প্রভু থাকিহ সত্বরে। না জানি দেবীর নাগ আইসে রথ ভরে।। ৩৩৫
বেহুলা লখাই দুহে কহেন কথন। দ্বিজ বিপ্রদাস বলে মনসা-চরণ।।

২৬

ত্রিপদী

বিধাতার লিখিত কেবা করে খণ্ডিত
বিভুক্ষিত রাজার নন্দন।
বেহুলা ধরিয়া করে বলে বালা লখিন্দরে
শুন রামা করহ রন্ধন।।
প্রভুর বচন শুনি বেহুলা রমণী ধনি
প্রত্যুত্তর দিলা হরষিতে।
দেখ এই লহ ঘর অনুচরী নাহি মোর
রন্ধন করিব কোন মতে।।
কোথা পাবো কাষ্ঠ জল হাঁড়ি চালু আনল
তিহড়ি কাটিতে নাহি স্থান।
নিশি ঘোর অতিশয় উপসন্ন কেহ নয়
কোনমতে করিব রন্ধন।।
শুনিয়া প্রিয়ার বোল বলে বালা লখিন্দর
মঙ্গলিয়া আছে হেমহাঁড়ি।
পুরাতন বস্ত্র চিরি ঘৃতসমযোগ করি
নারিকেল করহ তিহড়ি।। ৩৪০

নারিকেল জল দিয়া মঙ্গলিয়া হাঁড়ি লইয়া
করো রামা অন্নের সূচনা।
পরিচারক এই আমি প্রদীপের বর্ত্তি আনি
রান্ধ এই করিয়া মন্ত্রণা।।
প্রভুর যতন দেখি ভাবিয়া তো শশিমুখী
রন্ধন করিল সেই যোগে।
সকল মন্দিরে ছিল সত্বরে রন্ধন হইল
স্নান কৈল পরম কৌতুকে।।
স্বর্ণ থালে অন্ন ঢালে লখিন্দর হেন কালে
ভোজনে বসিলা কুতূহলে।
সন্তোষে ভোজন কৈল শেষ অন্ন থালে থুইল
খাইতে বেহুলায় যত্ন করে।।
শুন সুবদনি লও এই অন্ন তুমি খাও
বিশেষে আমার যত্ন তোরে।
বলে কিছু সম্বিধান আছে কিছু অনুমান
আজি যত্ন না করিয় মোরে।।
শুনিয়া প্রিয়ার মুখে আচমন কৈল সুখে
শয়ন করিল পরিতোষে।
বেহুলা সুন্দরী [১]গোরি[১] উচ্ছিষ্ট মার্জনা করি
বসিলা প্রভুর বাম পাশে।। ৩৪৫
বেহুলা সরূপ-যুত লখাই মদনে হত
রমণীর স্থানে কিছু বলে।
দ্বিজ বিপ্রদাস কবি জনমে জনমে সেবি
মনসার চরণ কমলে।।

১ গুরি (সু. সেন)

২৭
শ্রীরাগ

অমল কমল দল তুয়া মুখমণ্ডল
[১]সুবাসিত[১] অমিয়া রসাল।
হানিল কামের বাণ দেহ সুধা করি পান
অন্তরেতে হইনু বিকল।।
শুন প্রাণেশ্বরি [২]গোরি[২] কেন আমা পরিহরি
যত্ন করি নিবেদি তোমারে।
দেখি তোর অনুরাগ মোর জ্ঞান হইল ত্যাগ
পার কর মদন-সাগরে।।

সুরঙ্গ অধর তব ৩অম্বু৩ পড়িত ৪সব৪
ঈষত হাসিতে রস খসে।
অই পূর্ণ সুধাসিন্ধু শরত পূর্ণিমা ইন্দু
নিরবধি অমিয়া বরিষে।।
অনুমতি দেহ যদি সুধা পিও নিরবধি
শশী যেন না ছাড়ে চকোরে।
বদন্তি হৃদয়ে ভাবি দ্বিজ বিপ্রদাস কবি
পদ্মা নেত অস্তিকের বরে।। ৩৫০

১ সুভাষিত (সু সেন— এই পাঠের অর্থভেদে কষ্ট কল্পনার আশ্রয় নিতে হবে।) ২ শুবি (ঐ) ৩ অশ্রু (?) ৪ (সন্দিগ্ধ পাঠ সু. সেন)

২৮

পয়ার

পটু চাটু বেহুলা নিগদে সবিনয়। না করিহ যত্ন প্রভু আজি যুক্ত নয়।।
আছে ত বিশেষ কিছু ১কালিনিশা খিনি১। ২জন্মে জন্মে২ পতি তুমি আমি ত রমণী।।
প্রবোধ না মানে বালা অধিক কাতর। করে ধরি বেহুলারে বলে প্রত্যুত্তর।।
না করো চাতুরি প্রিয়ে কপট প্রকার। দম্পত্য পিরিতি রতি ভুঞ্জিল শৃঙ্গার।।
পুনরপি বেহুলা নিগদে সম্বিধান। পূর্ব কথা কহি কিছু কর অবধান।। ৩৫৫
মদন তনয় ৩অনিরুদ্ধ৩ বালা তুমি। বাণ রাজা ৪সুতা৪ নাম উষা বালি আমি।।
মুক্ষ কাজে সেবি দুহে মনসা-কুমারী। সতী পতিব্রতা পূর্ব জাতি না পাসরি।।
এই ৪জন্মে৪ মুক্ষ বর পাইল নিশ্চয়। না কর পাষণ্ড প্রভু বিঘ্ন পাছে হয়।।
বেহুলারে ক্রোধ করে রাজার নন্দন। রতিরে নৈরাশ করি করিল শয়ন।।
হেথা চাঁদো নৃপবর হৃদয় ভরিয়া। যত সেনাপতি সব আনে ডাক দিয়া।। ৩৬০
চারিদিকে বসিলেক চারি চোঙ্গদার। অজিকার রাতি পুত্র রাখিবা আমার।।
স্বস্তিমাত্র নাহি মনে চাঁদো নরপতি। ডাক দিয়া আনে আর চারি সেনাপতি।।
পাছে নিদ্রা যার এই চারি চোঙ্গদার। তবে ভদ্রাভদ্র দায় সকলি তোমার।।
আজিকার রাতি পুত্র রাখ যত্ন করি। সত্বরে থাকিহ সভে দুয়ারি প্রহরী।।
৬তবু৬ স্বস্তি নাহি মনে চাঁদো অধিকারী। লক্ষ লক্ষ আনিলেক ওঝা ধন্বন্তরি।। ৩৬৫
বহু সেনাগণ থুইল মন্দিরে প্রহরী। যত্ন করি ডাকিয়া আনিল ৭নিশীশ্বরি৭।।
আজিকার নিশি পুত্র রাখিবা যতনে। নানা রত্নে প্রভাতে তুষিব সর্বজনে।।
সুবর্ণভূষিত হাথে হেতালের বাড়ি। আপনি ভ্রমণ কর লহ-ঘর বেড়ি।।
ওথায় মনসা নেতো অনুমান করি। কালিনাগিনী ডাকি আনি যত্ন করি।।
প্রাণের নাগিনী রে বিশেষ তোরে কহি। লখিন্দর দংশিলে চাঁদোর পূজা পাই।। ৩৭০
বুঝাই তোমারে কথা বড়ই প্রমাদ। পর্বত উপরি স্থান লোহার প্রাসাদ।।
লক্ষ লক্ষ আছে তথা ওঝা ধন্বন্তরি। লক্ষ লক্ষ সেনাপতি দুয়ারে প্রহরী।।
সুতার সঞ্চারে পথ আছে মাত্র তথি। তোমা বিনে অন্য নাগ আর নাহি গতি।।
তোমার সংহতি আমি যাব রথভরে। মোর কার্য সাধো তুমি দংশি লখিন্দরে।।
তবে ত নাগিনী বলে পদ্মা-পদ ধরি। সাধিব তোমার কার্য যেই রূপে পারি।। ৩৭৫

নিদালি ঘুমালি কালী পদ্মার সংহতি। আপনি চলিলা পদ্মা উত্তরিল তথি॥
রথভরে পদ্মাবতী মন্দির উপরে। প্রবেশ করিল নাগ প্রাসাদ ভিতরে॥
স্বর্ণ-খাটে নিদ্রা বালা যায় কুতূহলে। শিয়রে বসিয়া নাগ বদন নেহালে॥
দেখিয়া কুমার-রূপ বেথিত বদন। বিপ্রদাস বলে নাগ করয়ে ক্রন্দন॥

১ কালিনি সাখিনি (সু সেনের ভুল পাঠ) ২ জর্মে জর্মে (সু সেন) ৩ অনিরুদ্র (ঐ) ৪ সুত (পুথির পাঠ; সু. সেন প্রস্তাবিত পাঠ 'সুতা') ৫ জর্মে (সু. সেন) ৬ তমু (ঐ) ৭ নিশীশ্বর, (ঐ, মিলের অনুবোধে 'নিশীশ্বরি')

২৯
ত্রিপদী

দেখিয়া লখাই-মুখ হৃদয়ে পরম দুখ
কান্দে লখাইর মুখ নিরক্ষিয়া।
বধিতে চাঁদোর সুত নির্দয় হইল বুক
কেনো আইনু আপনা খাইয়া॥ ৩৮০
লখাই বেহুলা শোভে যেন রতি কামদেবে
অঙ্গে অঙ্গে নানা অলঙ্কার।
নানা রত্ন মণিময় যেন স্বর্ণ গিরিচয়
জুতি যেন বিজুলি ঝঙ্কার॥
লখাই শিয়রে বসি যেন পূর্ণিমার শশী
হৃদয়ে দ্রবিদ মায়ামোহ।
দয়ায় আকুলি কালী চাঁদো নৃপে দেয় গালি
অঝরো নয়ানে পড়ে লোহ॥
কুমতি নৃপতি অতি হৃদয় না ভাবে যুক্তি
অহঙ্কারে নিন্দে পদ্মা বালি।
মজিল তোমার দোষে ক্ষিতি না রহিল বংশে
না থাকিল দিতে জলাঞ্জলি॥
বিষ অন্ন খাইয়ে ঘরে তোমার ছয় পুত্র মরে
এখনে দংশিব লখিন্দরে।
হেন অহঙ্কারে রাজ সাধিলেক কোন কাজ
বিফল হইল নৃপবরে॥
হেন রূপ দিব্য গুণ হইয়া অতি নিদারুণ
কেমনে হানিব দন্ত-ঘা।
এহেন পুত্রের শোকে বিষম কঠিন দুঃখে
না জীবে ইহার বাপ মা॥ ৩৮৫
নাগিনী মমতা দেখি বিষহরি ক্রোধমুখি
নিগদন্তি আকাশবচনে।
চাঁদো রাজা নিন্দে মোরে তার পুত্র দংশিবারে
তোমার মমতা কি কারণে॥

মনসা দুঃখিত দেখি তিনলোক করে সাক্ষী
দংশিতে চলিলা তার পাশে।
বাম পদাঙ্গুলি মূলে দংশিলেক হেনকালে
ব্যথা পাইয়া উঠিল তরাসে।।
উঠিল বেহুলা বালি সুবর্ণ কাটারি তুলি
নাগ স্তম্ভ বহিয়া পলায়।
দেখিয়া সম্ভ্রমে উঠে নাগিনীর পুচ্ছ কাটে
দ্বিজ বিপ্রদাস রস গায়।।

৩০
ত্রিপদী

দংশিয়া তো লখিন্দর পবনে করিয়া ভর
নাগিনী করিল আগমনে।
হৃদয় যন্ত্রণা পায়্যা বসিলা কাতর হয়্যা
কান্দে বালা অকান্দ ক্রন্দনে।।
হরি হরি বেহুলা সম্বোধ দেহ মোরে।
মনসা সাধিল বাদ হের হইল পরমাদ
সহিতে না পারি বিষজ্বালে।। ৩৯০
জনমিয়া এই ক্ষিতি না করিনু কার ক্ষতি
তবে বিধি বিড়ম্বিল কেনি।
থর থর অঙ্গ কাঁপে লোচনে কুহুড়ি চাপে
কহ্যো মোর জনক-জননী।।
বিধির নির্বন্ধ ছিল সেই মাত্র সার হইল
দৈব যোগে হারানু পরাণ।
উঠি করে সম্বোধন আর নাহি দরশন
পরলোকে আমার পয়ান।।
প্রভুর ক্রন্দনে অতি বেহুলা দ্রবিত ক্ষিতি

দ্বিজ বিপ্রদাস কহে শুনিয়া পরাণ দহে
বলে কিছু বেহুলা দুখিনী।।

৩১
কৌরাগ

লখাই করিয়া কোলে সুন্দরী বেহুলা বলে
কান্দিয়া নিগদে উচ্চস্বরে।
কিসেরে প্রহরী জাগে প্রভুরে দংশিলা নাগে
কহ্যো মোর শ্বশুর গোচরে।।

বেহুলা কান্দয়ে বলে[১] লখাই করিয়া[২] কোলে
বড় নিদারুণ বিষহরি।
লখাই বলেন বাণী দংশিলেক কাল ফণী
বিষ ভ্রমে সকল শরীরে।[৩]
কাতর বিষের জ্বালে এই ছিলো কর্মফলে
দেখিতে না [৪]পানু[৪] জননীরে॥ ৩৯৫
লখাই কাতর দেখি বেহুলা হৃদয় দুঃখী
হইল প্রমাদ দৈবগতি।
লোহাগারে কোন বুদ্ধে কোথা পাবে ঔষধে
কেমনে হইব অব্যাহতি॥
না ভুঞ্জিনু রতিসুখ না দেখিনু পুত্রমুখ
কিসেরে [৫]জন্মাহ[৫] মর্ত্যপুরী।
পূর্ব জন্মে পাপ যত নরক করিনু কত
তেঞিঃ হেলা কৈলা বিষহরি॥
বেহুলা বলেন কথা আমি ত বাণের সুতা
তুমি কামদেবের নন্দন।
হৃদয় থাকিল দুঃখ উপহাস্য লোকমুখ
অবশ্য হইব দরশন॥
বিষ ভ্রমে সর্বগা বদনে নাহিক রা
দুই চক্ষু মেলিতে না পারে।
কেশাগ্র জিনিল বিষে বলে দ্বিজ বিপ্রদাসে
ঢলিয়া পড়িল লখিন্দরে॥

১ (আমাদের প্রস্তাবিত পাঠ) ২ (ঐ) ৩ একটি ত্রিপদী-র অর্ধ পাওয়া যায়নি আমরা সেটিকে গণনায় রেখেছি ৪ পাইনু (সু. সেন) ৫ জর্মাহ (ঐ)

৩২

পয়ার

কোলে করি ধরি প্রভু নেহালে বদন। নাড়িয়া চাড়িয়া দেখে নাহিক চেতন॥ ৪০০
নিশ্চয় মরিল প্রভু হইনু অনাথিনী। প্রভু প্রভু বলি ডাকে লোটায়ে ধরণী॥
কান্দয়ে বেহুলা কর হানিয়া কপালে। এত দুঃখ বিধি মোর দেয় কর্মফলে॥
জনমে জনমে কতো খণ্ডব্রত কৈনু। আখণ্ড শ্রীফল পত্রে হর না পূজিনু॥
খণ্ডব্রত কৈনু কিবা শুনি খণ্ড কথা। হাথোপরে চন্দ্র দিয়া হরিল বিধাতা॥
হেন উপহাস্য মোর হইল জগতে। [১]কর্মদোষে[১] বিভারাতে মৈল প্রাণনাথে॥ ৪০৫
লোকে কবে বিভারাত্রে খাইল ভাতার। হেন অপমানে প্রাণ কেনে আছে আর॥
কে হরিয়া লইল মোর প্রভু কলানিধি। ললাট চিরিয়া দেখি কি লিখিলা বিধি॥
বিকল বেহুলা কান্দে হইয়া নৈরাশ। মনসামঙ্গল গান দ্বিজ বিপ্রদাস॥

১ কর্মশেষে (সু. সেন)

৩৩
পয়ার
কান্দে কান্দে বেহুলা শোকে উচ্চস্বরি। নিজগণ লইয়া চলিলা বিষহরি।।
মুনি আদি মরণেতে যায় ত্বিষাম্পতি। সর্প-উপষ্টম্ভে মইল বেহুলার পতি।। ৪১০
সর্প-যোনি পায়্যা থাকে মনসা-সদনে। কহিলাম আদ্য এই শাস্ত্রের বিধানে।।
বেহুলা-ক্রন্দনে সব প্রহরী সভয়। লখিন্দর মৈল সভে জানিল নিশ্চয়।।
পুত্রশোকে কোপে রাজা হইবে আনল। যতেক প্রহরী ধরি বধিব সকল।।
মনে মহাত্রাস ভাবি গেলো পলাইয়া। কাদন্তি বেহুলা প্রভু কোলেতে করিয়া।।
কোথায় আছয়ে সৈন্য দুয়ারি প্রহরী। তুরিতে জানাও মোরে শ্বশুরাধিকারী।। ৪১৫
সনকা শুনিল তবে বেহুলা-ক্রন্দন। ত্রাসে কম্পবান অঙ্গ চমকিত মন।।
নিশ্চয় লখাই লইয়া হইল প্রমাদ। মনসাকুমারী [১]কোপে[১] গেলো বিসম্বাদ।।
সনকা বলেন শুন দাসী ঝাউয়াবতি। কেনো বধূ কান্দে জানি আইস শীঘ্রগতি।।
সত্বরে প্রবেশ ঝাউয়া মন্দির ভিতর। বেহুলার কোলে মৃত দেখে লখিন্দর।।
কেমনে কহিব গিয়া সনকা সমুখে। [২]আত্মঘাত[২] করিয়া মরিব পুত্রশোকে।। ৪২০
আপনার দৈবদোষে মৈল লখিন্দর। অপযশ হইল অতি সংসার ভিতর।।
কান্দিয়া [৩]জানায়[৩] ঝাউয়া সনকা গোচরে। সর্পাঘাতে নিশ্চয় মরিল লখিন্দরে।।
হাহাকার কান্দে রামা ভুমেতে লুটিয়া। চাঁদো রাজা শুনিয়া সম্ভ্রমে গেল ধায়্যা।।
সনকা ধরিয়া হাথে যায় ধীরে ধীরে। প্রবেশ করিল গিয়া লোহার মন্দিরে।।
কান্দে চাঁদো নৃপবর দেখিয়া প্রমাদ। দ্বিজ বিপ্রদাস বলে মনসা-প্রসাদ।। ৪২৫

১ সন্দিগ্ধ পাঠ সু. সেন ২ আত্ম্যঘাত (সু. সেন-এর পাঠ— অহেতুক) ৩ জাশএ (নেই)

৩৪
গান্ধার
হাহাকার সনকা লখাই করি কোলে। বদনে বদন দিয়া সঘন নেহালে।।
নাসিকার অগ্রে তার নাহি পায় শ্বাস। নিশ্চয় প্রমাদ জানি হইল হতাশ।।
চিয় রে প্রাণের পুত্র দেও সম্বোধন। পড়িল ধরণীতলে হরিয়া চেতন।।
উঠ উঠ লখিন্দর সোনার পুথলি। পূর্ণিমার চন্দ্র [১]পুন[১] কারে দিনু ডালি।।
শরীর অবশ তোর বদনমণ্ডল। [২]নিরহতো কূলে[২] যেন ঘুমায় কমল।। ৪৩০
কে মোরে ফেলিল বাঁধি এ শোকসাগরে। কতেক পুত্রের শোক সহিব শরীরে।।
উঠ লখিন্দর কত নিদ্রা যাও। তোমার জননী ডাকে উত্তর না দেও।।
পূর্ণ শশধর সুধা বদন তোমার। দুঃখিনীরে মা বলিয়া ডাকো একবার।।
হত অভাগিনী অমি এ মহীমণ্ডলে। মরিতে না পারি-প্রাণ ঝাঁপ দিব জলে।।
অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশিব তোমারে লাগিয়া। তোমা পুত্র পাবো আমি যমপুরে গিয়া।। ৪৩৫
নিশ্চয় মরিব আমি গলে দিয়া কাতি। গরল ভক্ষিয়া প্রাণ তেয়াগিব ক্ষিতি।।
কান্দিতে কান্দিতে রানী হইল মূৰ্ছিত। মনসামঙ্গল বিপ্রদাস বিরচিত।।

---

১ পুনি (সু. সেন ; সন্দিগ্ধ) ২ অর্থাৎ— জলহীন কূলে ঠেকা পদ্মের মতো, সু. সেন লিখেছেন নিরহতো কূলে (?)— এই জিজ্ঞাসা চিহ্ন দরকার ছিল না

৩৫
পয়ার
কান্দিয়া করুণা ভাষে চাঁদো নরপতি। পুত্র বলিয়া সম্ভ্রমে পড়ে ক্ষিতি।।
যত পাপ কৈনু মুঞি [১]জন্মিয়া[১] ভূতলে। কত দুঃখ বিধি মোর লিখিল কপালে।।
দেবপদ ছিলো মোর মহাজ্ঞান পায়্যা। মায়া পাতি কানি তাহা লইল হরিয়া।। ৪৪০
ভূমেতে পড়িয়া চাঁদো কান্দেন বিষাদে। সর্বনাশ হইল মোর কানির বিবাদে।।
ছয় পুত্র মৈল মোর বিষ-অন্ন খায়্যা। সর্ব দুঃখ বিসরিনু লখাই দেখিয়া।।
হেন রূপ-গুণ পুত্র লইল হরিয়া। কেমনে বঞ্চিব আর কার মুখ চায়্যা।।
[২]হইবে[২] মরিব আমি লখিন্দর শোকে। ইহার পাতকে কানি থাকিব নরকে।।
মুছিয়া লোচন চাঁদো লখাই নেহালে। ভণে বিপ্রদাস পদ্মা-চরণকমলে।। ৪৪৫

১ জর্মিয়া (সু. সেন) ২ (অর্থ পরিষ্কার নয়)

৩৬
পয়ার
চাহিয়া পুত্রের মুখ অঝর লোচন। কতো দুঃখে সে না পুত্র তেজিল জীবন।।
কিসেরে লোহার ঘর করিনু যতনে। ধন্বন্তরি প্রহরী কোথায় সেনাগণে।।
এতেক প্রকার কৈনু লখাই রক্ষিতে। পাপিষ্ঠ কানির নাগ আইল কেনমতে।।
যার ভয় ছিলো কানি তাহা লৈয়া গেল। এতেক দিবসে কানি পরিতোষ হইল।।
না কান্দ সনকা গো কান্দিলে কিবা হয়। এতদিনে ঘুচিলো কানিরে নাহি ভয়।। ৪৫০
কুপিল সনকা রামা চাঁদোর বচনে। অধোগতি হবে রাজা কুবুদ্ধি কারণে।।
যদি তুমি পূজা করো মনসা-কুমারী। কেন পুত্র মরিবেক রূপের মুরারি।।
তবে চাঁদো নৃপতি প্রবোধ করে তায়। যার যেই ভবিতব্য ভুঞ্জিলে সে যায়।।
তবে ত বেহুলা কিছু বলে পরিহরি। জানিনু সকল তোমা মহিমা চাতুরি।।
নৃপতি হইয়া তুমি এমত অজ্ঞান। মানবে দেবতা পূজে বড় অপমান।। ৪৫৫
নর হইয়া দেবতার সঙ্গে বাদ করো। সর্বনাশ হইল তব কি করিতে পারো।।
মনসা নিন্দিয়া তুমি সুখে ভুঞ্জ রাজ্য। আমার প্রভুর তরে করো কিছু কার্য।।
মাজষ ভাসায়ে আমা দেও ভাসাইয়া। মনসা গোচরে যাবো মৃত পতি লইয়া।।
ভজিলে মনসা যদি করে প্রতিকার। জীয়াইয়া প্রভুরে আসিব পুনর্বার।।
তোমার কুবুদ্ধে যদি কোপে পদ্মাবতী। তথায় পূজিব পদ্মা করিয়া ভকতি।। ৪৬০
তরিবা সমুরা যুক্তি যদি ধর্ম লোকে। মনসার নিন্দা আর না করিহ মুখে।।
যদি বা মনসা-পদ ভজহে রাজন। পুনর্বার পুত্রাদি পাইবে ধন জন।।
যদি বা মনসাপদ নিন্দ নরপতি। এই লোকে'দুঃখ শোক মৈলে অধোগতি।।
শুনিয়া দ্রবিদ রাজা হইল অন্তরে। মালাকার আনি আজ্ঞা দিলেক তাহারে।।
শুনিয়া মালাকার কার্য নাহি করে হেলা। প্রচুর করিয়া কাটি আনে রাম কলা।। ৪৬৫
বিচিত্র মাজষ তবে করিল গঠন। পাট নেতো দিয়া তাহা কৈল আচ্ছাদন।।
গঠিয়া মাজষ তবে লইল জল মাঝে। প্রবাল মুকুতা ঝারা চারিদিগে সাজে।।
মাজষ উপরে সাজে কনক কলস। ভাবিয়া মনসাদেবী বলে বিপ্রদাস।।

৩৭
করুণা

মাজষ নির্মাণ হৈল মালাকার চলি গেলো
বেহুলা সনকা প্রতি ভাষে।
হেরো মোর নিদর্শন সম্বরিল যত্নে মন
হেলা না করিহ অবিশেষে॥
কড়াকের তৈল বালি এড়িল প্রদীপ জ্বালি
করজোড়ে [১]সভা প্রতি বলে[১]।
যদি মোর এই তৈলে ছয় মাস দীপ জ্বলে
প্রভু লইয়া অসিব কুশলে॥ ৪৭০
সিজান [২]হুরিদ্র[২] ধান আনিলেক বিদ্যমান
[৩]আভ্জিলেক[৩] সভা বিদ্যমানে।
যদি প্রাণনাথ জিবে তোরা ফল ফুল হবে
নিদর্শন লোক পরমাণে॥
পুট পানি করি ক্ষিতি প্রণতি ভকতি সতি
সভাকারে মাগিল বিদায়।
দেখি চাঁদ নরপতি হৃদয় দ্রবিত অতি
সবিনয় বেহুলা বুঝায়॥
ছয় বধূ আছে পুরি তাহার প্রধান করি
প্রাণ সম পালিব তোমায়।
জলে ভাসি যাবে তুমি জিয়াইতে মৃত স্বামী
হেন কেবা দেখেছে কোথায়॥
বেহুলা চাঁদোর বোলে হৃদয় ভাবিয়া বলে
শুন রাজা কহি বিদ্যমান।
সত্যবতী নামে কন্যা সতী পতিব্রতা ধন্যা
তার কথা কর অবধান॥
স্বামী তার দেবানন্দ সভে সখা সতানন্দ
পাঠু লাগি গেল [৩]দূর দেশে[৩]।
কোটাল কুবুদ্ধি পায় কহিলেক রাজায়
দুইজনে [৫]বাধিল[৫] বিশেষে॥ ৪৭৫
স্ত্রী হইয়া মৃতপতি জীয়াইল সত্যবতী
আর দেখো রাজা চন্দ্রকেতু।
রাক্ষসী হরিল দ্বিজে ব্রহ্মবধ হইল রাজে
সে দণ্ডে হইল সেই হেতু॥
জীয়াইয়া মৃত দ্বিজে রাজা গেলো সেই রাজ্যে
শুন রাজা বুঝাই তোমারে।
আমার প্রতিজ্ঞা এই যদি আমি সতী হই
প্রভু লইয়া আসিব দেশেরে॥

নৃপতি ব্যথিত হইয়া অনুগত লোক লইয়া
আনিল সুন্দর লখিন্দরে।
স্নান করাইয়া নীরে শোভে নানা অলঙ্কারে
শোয়াইল মাজষ ভিতরে॥
অপরূপ রূপ ছাঁদে যেন পূর্ণিমার চাঁদে
অস্ত যায় গুহারো ভিতরে।
দেখি শোক দুঃখ ভাবি দ্বিজ বিপ্রদাস কবি
পদ্মা নেত অস্তিকের বরে॥

---

১ বলে সভা প্রতি (সু. সেনের পাঠ ; পরের ত্রিপদীর সঙ্গে মিল হয় না) ২ হরিদ্রা (সু. সেনের সন্দিগ্ধ পাঠ ; আ-কার যুক্ত) ৩ আজ্বিলেক (সু. সেন) ৪ দূরদেশ (সু. সেন) ৫ বাঁধিল (ঐ)

৩৮

পয়ার

ছল ছল যুগল নয়নে নীর ঝরে। অমিয়া গলিত যেন পূর্ণ শশধরে॥ ৪৮০
সনকারে প্রণমন্তি অঙ্গ লোটাইয়া। প্রেম ভাবে কোলে করি তুলিল ধরিয়া॥
নিগদে সগদ বাণী বেহুলা রমণী। যাইব প্রভুর সঙ্গে দেহত মেলানি॥
পূর্বে নিন্দা কৈনু গুরু দেবদ্বিজগণে। না করিনু হরপূজা দম্ভের কারণে॥
কার স্থাপ্য হরিনু কে দিল ব্রহ্মশাপ। তেঞি বিভা-রাত্রে পতি মৃত পরিতাপ॥
একান্ত ভাবেতে মোর করিহ কল্যাণ। অবিঘ্নেতে যাই যেন পদ্মা বিদ্যমান॥ ৪৮৫
জীয়াইয়া আনি যেন যত পুরীজন। তবে পুনরপি তব দেখিব চরণ॥
চলিল মমতা ছাড়ি প্রবোধ করিয়া। মায়া-মোহে যায় সভে পশ্চাত গোড়ায়্যা॥
মাজষে প্রবেশ কৈল পতি কোলে করি। দ্বিজ বিপ্রদাস বলে বন্দি বিষহরি॥

৩৯

পয়ার

মাজষ ভাসায়্যা যায় গুঙ্গড়ির জলে। আপস্তায়্যা সর্বাঙ্গ সনকা পড়ে কূলে॥
পুত্র পুত্র ডাক ছাড়ে উচ্চস্বর দিয়া। অভাগি সনকা ডাকে পাছু যাও লয়্যা॥ ৪৯০
কাহারে ডাকিব আর কে দিবে সম্মতি। কার মুখ চাহিয়া বঞ্চিব দিবা রাতি॥
নিষ্ঠুর পদ্মার নাগ পুত্র মোর দংশে। তর্পণ করিতে মোর না থুইল বংশে॥
কিসেরে যাইব [১]ঘরে[১] কি দেখিব গিয়া। ভ্রমিব যোগিনী বেশে দেশান্তরি হইয়া॥
সর্বাঙ্গের অলঙ্কার ফেলিব কাড়িয়া। গহন কানন মধ্যে প্রবেশিব গিয়া॥
দুকূলে দাঁড়াইয়া লোক আকুল বিশেষে। প্রাণ নাহি ধরে লোক রমণী-পুরুষে॥ ৪৯৫
তেজি সব গৃহকর্ম দাঁড়াইয়া চায় পরম দ্রবিদ লোক কান্দে উশ্চরায়॥
চলিল ত বেহুলা মাজষে ভাসি জলে। আকুল দুকূলে লোক কান্দিয়া বিকলে॥
হাহাকার করে সভে ছাড়ন্তি নিশ্বাস। মায়ামোহে কান্দে সভে মুখে দিয়া বাস॥
কেহ গড়াগড়ি দিয়া করয়ে হাহ্যাষ। মনসাবিজই গীত গায় বিপ্রদাস॥

১ বরে (সু. সেন)

৪০

ত্রিপদী

মাজষে ভাসিয়া যায় মায়া পাতি মনসায়
কাক-রূপে বসিলা মাজষে।
প্রচুর কাকের ধ্বনি অতি সুললিত শুনি
কর-জোড়ে করিয়া সুভাষে॥ ৫০০
কাক কাক উশ্চরায় ডাকি বলে বেহুলায়
একাকী মাজষে ভাসো কেনি।
বেহুলা কাকেরে কয় সষুরা যে চাঁদো রায়
প্রভু মৈল বিবাহ যামিনী॥
উজানি নগর ঘর পিতা সাহে সদাগর
সুবদনী সুমিত্রা জননী।
জানাবে এসব কথা মনসা উদ্দেশে যথা
ভাসিয়া চলিলাম একাকিনী॥
কাক বলে উতরলি ডিম্ব ফুটাইয়েছি কালি
ক্ষুধা অতি হয়েছে বিকল।
লোচন মেলিতে নারি বাসা [১]আছে[১] একেশ্বরী
চার হেতু আইনু কেবল॥
ত্রস্ত হইয়া সুন্দরী কাকেরে বিনয় করি
নানা রত্নে ভূষিব তোমায়।
অনাথ বেহুলা পাইয়া তিলেক নাহিক দয়া
দ্বিজ বিপ্রদাস রস গায়॥

১ য়াছে (সু. সেন)

৪১

পয়ার

কাক বলে শুন বলি বেহুলা রমণী। কিমতে জানাবা তোর জনক-জননী॥ ৫০০
তবে ত বেহুলা দিল রতন-অঙ্গুরী। নিদর্শন লইয়া কাক যায় উধা করি॥
হরিষে যে সুমিত্রা সাহে বসিয়াছে যথা। অঙ্গুরি দিলেক কাক কহে সর্ব কথা॥
বেহুলার কথা শুনি সাহে পুরীজন। মৃতাবত মহাশোকে করয়ে ক্রন্দন॥
তবে ত সুমিত্রা রামা হৃদয় ভাবিয়া। আপনার ছয় পুত্র আনিল ডাকিয়া॥
কি আর বিলম্বে ফল চলহ তৎকাল। বেহুলার কিবা গতি করহ উভাল॥ ৫১০
প্রমাদ পড়িল সত্য লখিন্দর লইয়া। তেঞিঃ কাকমুখে দিল অঙ্গুরি পাঠায়্যা॥
জননীর যত্ন দেখি নড়িল তুরিত। গুঙ্গড়ি গঙ্গার জলে হইল উপনীত॥
দেখিল মাজষ আইসে ভাসিয়া সলিলে। বেহুলা বেহুলা বলি ডাক দিয়া বলে॥
শুনিয়া বেহুলা ভাসি আইল নিকটে। আপনার ছয় ভাই দেখে নদীতটে॥
ভাই-ভগিনী মাত্র হইল দরশন। কান্দিয়া বেহুলা করে দুঃখ নিবেদন॥ ৫১৫
দ্বিজ বিপ্রদাস বলে ভাবি পদ্মাদেবী। জনমে জনমে যেন তব পদ সেবি॥

৪২

ত্রিপদী

কি আর কহিব বাণী [১]জন্মে জন্মে[১] অভাগিনী
এত দুঃখ করিল গোসাঞিও।
বিধির লিখন ছিলো সেই মাত্র সার হৈল
ইহা বহি দরশন নাঞিও॥
হেরো করো পরিহার এসব দুর্গতি মোর
জানাইহ বাপ-মা চরণ।
পাপ ক্ষেণে বিভা হইল পুনরপি না দেখিল
এই ছিল ললাটে লিখন॥
হেন মোর ধর্মগতি বিভারাত্রে মৈল পতি
পূর্ব [২]জন্মে[২] করেছিনু পাপ।
লোকমুখে হইল লাজ পূর্বের নিবন্ধ কাজ
এই সে হৃদয়ে পরিতাপ॥
মৃত পতি লইয়া যাবো যথায় মনসা পাবো
প্রাণনাথ জিয়াইবো বিশেষে।
নাই পাই বিষহরি প্রভু জিয়াইতে নারি
প্রাণ দিব মনসা উদ্দিশে॥ ৫২০
প্রণতি করিয়া যায় উলটিয়া নাহি চায়
ধনা পুলা বাঁকে উপনীত।
মাজষ রহায়্যা রোষে বলে দ্বিজ বিপ্রদাসে
বেহুলা প্রবোধ বিরচিত॥

১ জর্মে জর্মে (সু. সেন) ২ জর্মে (ঐ)

৪৩

ত্রিপদী

উজানি নগর ঘর সাহে মহা সদাগর
সুমিত্রা ত তাহার রমণী।
লক্ষকের বুহিতাল ধনবান কুলশীল
সেই মোর জনক-জননী॥
ছয় ভাই আছে মোর রূপে গুণে বিদ্যাধর
সর্বগুণে বটে অবস্থিত।
রত্নময় দিব্যপুরী দাস দাসী বিদ্যাধরি
প্রতি বধূগণ উল্লাসিত॥
জুড়িয়া যুগল পাণি নিগদন্তি সুবদনী
নিজ দুঃখ নিবেদি তোমারে।

মৃত পতি কোলে করি ভাসিয়া মাজষে তরি
তুমি কেনো রহাও আমারে ॥
চম্পক নগর ঘর চাঁদ নামে নৃপবর
লখিন্দর তাহার কুমার।
বিধির করম-ফলে সেই স্বামী মোরে মিলে
অবুদ্ধিয়া চাঁদ নৃপবর ॥ ৫২৫
বুদ্ধি নাহি চাঁদ রায় নাহি পূজে মনসায়
বিড়ম্বিত অস্তিক জননী।
লখাই বিবাহ নিশি লোহার মন্দিরে বসি
দংশিলেক কালিনাগিনী ॥
নৃপতির পুরি যত লোকে দেখি মৃতাবত
সবিশেষ আমারে দেখিয়া।
শুনি মোর অনুমতি ভাবি চাঁদ নরপতি
মাজষে দিলেক ভাসাইয়া ॥
মৃত প্রভু কোলে লৈয়া মাজষে ভাসিনু নিয়া
সলিলে বুলিয়ে একেশ্বরী।
হেরো বাঞ্ছা মনে করি লৈয়া যাবো দেবপুরি
যথায় আছেন বিষহরি ॥
পূর্ব-জাতিস্মরা নারী আছিলাম দেবপুরি
[১]অনিরুদ্ধ[১] হন মোর পতি।
আমি হই উষা বালি সর্বগুণ রূপশালী
তালভঙ্গ হইল দৈবগতি ॥
স্বর্গ হইতে বিষহরি [২]জন্মাইয়া[২] মর্ত্যপুরি
প্রভু মোর করিলা নিরাশ।
প্রভু জিবার অনুসারে যাব সেই দেবপুরে
সুকবি গাইল বিপ্রদাস ॥ ৫৩০

১ অনিরুদ্র (সু. সেন) ২ জর্মাইলা (ঐ)

৪৪

পয়ার

তবে ধনা পুলা বলে কর জোড় করি। জল কূলে এথা আমি সব অধিকারী ॥
(যাহা) জিজ্ঞাসা কৈনু না করিহ ক্রোধ। (যাহ) নিজকার্যে আমি হইনু প্রবোধ ॥
মনসা স্মরিয়া তথা চলিল [১]নিসকঙ্কে[১]। মাজষ ঠেকিল গোদা বড়স্বর বঙ্কে ॥
জনার্দন নাম তার দুই পায় [২]স্থূল[২]। সম্বন্ধে চাঁদর শালা লখাই মাতুল ॥
মাজষ দেখিয়া জিজ্ঞাসয়ে সম্বোধন। অবিচারে যাও কেন জানিব কারণ ॥ ৫৩৫
তবে ত বেহুলা বলে জুড়ি যুগ পাণি। উজানি জনক সাহে সুমিত্রা জননী ॥

চাঁদ রাজনের বধূ লখিন্দর পতি। মনসার বাদে প্রভু মৈল রাতারাতি॥
মাজষে ভাসিয়া আমি যাই জলমাঝে। একেশ্বরী নারী আমি রহাও কি কাজে॥
তবে পরিচয় দিল বেহুলার ঠাই। তুমি ত জান না আমার ভাগিনে লখাই॥
একেশ্বরী স্বর্গপথে করহ গমন। আইসহ আমার পুরি করিব পালন॥ ৫৪০
তবে ত বেহুলা বলে পূর্ব্বকথা কই। সত্য করি মনসা আনিল ইন্দ্র ঠাই॥
বধিয়াছে প্রভু জিয়াইব পুনর্ব্বার। তবে ত তাহার পূজা করিব প্রচার॥
প্রবোধিয়া গোদা বালি চলিল তুরিত। বেহুলা জুয়ার-বঙ্কে হইল উপনীত॥
অনিষ্ট-পাপিষ্ঠ দুষ্ট জুয়ার প্রবল। জুয়া খেলাইতে তার মজিল সকল॥
স্ত্রী-পুত্র হারিয়া সে [৩]বেড়ায়[৩] নদীতীরে। দেখিলেক মাজষ ভাসিয়া আইসে নীরে॥ ৫৪৫
নানা রত্ন দেখি বড় হৃদয় সন্তোষে। এই ধন লইয়া আজি বঞ্চিব হরিষে॥
মাজষ ভাসিয়া আইসে বলে অহঙ্কারে। মাজষ ভিতরে কেৰা প্রবোধ আমারে॥
তবে ত প্রবোধ বলে বেহুলা সুন্দরী। মৃত পতি লইয়া যাই আমি একেশ্বরী॥
কেন বা রহাও আমা তোমা কিবা দায়। অহঙ্কার করি কোপে মাজষ রহায়॥
যত রত্ন ধন আনি করো সমর্পণ। আইসহ আমার ঘরে করিব পালন॥ ৫৫০
বেহুলা বলেন শুন অবুধ [৪]গোয়ার[৪]। তুমি ত জান না কিছু মহিমা আমার॥
সাবিত্রী যেমন সতী ব্রহ্মার বনিতা। তাহার অধিক আমি সতী পতিব্রতা॥
[৫]শাপ[৫] দিতে মাত্র ভস্ম হইবে এখন। কিসেরে আমার তরে করহ যতন॥
কিছু ধন দয়া করি দিল [৬]তোর[৬] দুঃখে। উদ্ধরিয়া স্ত্রী-পুত্র বঞ্চহ গিয়া সুখে॥
সন্তোষ জুয়ার অতি চলিল হরিষে। বড়িসিয়ার বঙ্কে গিয়া মাজষ প্রবেশে॥ ৫৫৫
করপদহীন পাপ বঞ্চে একেশ্বর। দেখিল মাজষ আইসে সলিল উপর॥
বড়ষি ফেলিয়া দম্ভে মাজষ রহায়। দেখিয়া বেহুলা বালি [৫]শাপ[৫] দিল তায়॥
পায় চুপড়িয়া গোদ আর পায় ফুলা। চক্ষে ঢেলা অপরূপ এক হাত নুলা॥
পূড়ার প্রমাণ তার পৃষ্ঠে মহা কুঁজ। খোস পাঁচড়া গায়ে সদা পড়ে পুঁজ॥
বাঁকা মুখ খোতা কথা গলে গলগণ্ড। উপমা দিবার নাহি প্রবীণ [৭]কোরণ্ড[৭]॥ ৫৬০
সর্পের আকৃতি তার মাথে নড়ে ঝুট। তাল-গোড়া ওলোনা কাঁকলি-খানি ছোট॥
ঝাঁটা যেন দুই গোপ [৮]ঘোড়া-লেজ[৮] দাড়ি। কাঁকড়া সমান গোদে হয়েছে বেজুড়ি॥
বড়সি ফেলিয়ে দম্ভে মাজষ রহায়। নুলা হাত ছানি দিয়া বলে আয় আয়॥
যত ধন বিত্তি মোরে কর সমর্পণ। মোর ঘরে আয় তোর করিব পালন॥
আমি তো ধরিব মাছ বেচ লইয়া তুমি। বঞ্চিতে তোমার সঙ্গে ইচ্ছা করি আমি॥ ৫৬৫
আছয়ে তেইশ মাগু রূপে অনুপমা। তা সবার রূপ মনে নাই লয় আমা॥
দেখিয়া তোমার রূপ ডুবি গেল মন। তোমা আমা দেখা হৈল দৈবের ঘটন॥
তব যোগ্য স্বামী আমি মোর যোগ্য তুমি। আপনার গুণকথা কি কহিব আমি॥
আমা হেন গুণবন্ত [৯]ব্যা[৯] পাইবা কোথা। কত বিদ্যা জানি আমি কি কহিব কথা॥
যদি তোর তরে বিড়ম্বিত হয় বিধি। আমা ছাড়ি না পাইবা অনুপম নিধি॥ ৫৭০
প্রধান করিয়া ঘরে এড়িব তোমারে। শুনিয়া বেহুলা সতী শাপ দিল তারে॥
মাজষ বড়ষি দিয়া টানি আনি কূলে। বেহুলার শাপে গোদা নাবালেতে ওলে॥
নাড়িয়া চাড়িয়া গোদ ওলি বারে বারে। আঁকু বাঁকু করিয়া কান্দএ উচ্চ স্বরে॥
ছোট মোট গোদ নহে চুপড়ি প্রমাণ। বেজুড়ি হয়্যাছে তাহে কাঁকড়া সমান॥

[সেসব] লইয়া গোদা কান্দে উশ্চরায়। ফাফর হইয়া ঢোকে ঢোকে জল খায়।। ৫৭৫
প্রণতি বেহুলা প্রতি করয়ে স্তবন। দারা বেহুলা শাপ কইল বিমোচন।।
গোদ আদি যত রোগ সব হৈল দূর। কূলে উঠি বেহুলারে স্তবন প্রচুর।।
গিধিনী শকুনি পক্ষ আছে আর বঙ্কে। বেহুলার মাজষ তথায় গিয়া ঠেকে।।
মৃত নর গন্ধ মাত্র দুই পক্ষ পায়। পাখে আচ্ছাদিয়া তারা মাজষ রহায় ।।
মৃত নর গন্ধ পাইয়া বলে অহ্কহার। ক্ষুধায় পীড়িত যার করিতে সংহার।। ৫৮০
বেহুলা বিনয় করে জুড়ি দুই পাণি। না করে প্রমাদ না বলহ হেন বাণী।।
যতনে ভূষিব তোমা যাইবার কালে। পক্ষ বলে আমারে ভাণ্ডহ বাক্য ছলে।।
এমত অবুধ আর না পাও সংসারে। অধিক বেহুলা স্তব করেন তাহারে।।
বেহুলা যতেক কহে দুঃখিত অন্তরে। প্রবোধ না মানে পক্ষ যায় খাইবারে।।
শিরে কর হানে রামা হাহাকার করি। করে করি লইল তীক্ষ্ণ রসান কাটারি।। ৫৮৫
ছাড়িতে না পার যদি মৃত প্রভু আশ। কাটারি হানিয়া মৈলে খাইও মোর মাস।।
মনসা চিন্তিয়া রামা গলে দিতে কাতি। রথভরে অন্তরীক্ষে আইলা পদ্মাবতী।।
পাখেতে ধরিয়া পদ্মা দুই পক্ষ ফেলে। ভয় নাই আকাশবচনে পদ্মা বলে।।
শুনিয়া বেহুলা রামা চলিলা [১০]নিসকঙ্কে[১০]। মাজস ঠেকিল গিয়া শার্দূলের বঙ্কে।।
পদ্মাবতী-চরণ সরোজমধু লোভে। দ্বিজ বিপ্রদাস তথি ভৃঙ্গরূপে শোভে।। ৫৯০

---

১ নিঃসঙ্কে (?) ২ স্থল (সু. সেন) ৩ ব্যাড়ায় (ঐ) ৪ জোয়ার (ঐ) ৫ সাঁপ (ঐ) ৬ তার (ঐ—ভুল পাঠ) ৭ কোরও (সু. সেন—ভুল পাঠ) ৮ ঘোড়া-নেজ (সু. সেন) ৯ না (ঐ) ১০ নিঃসঙ্কে (?), সু. সেনের পাঠ 'নিশকঙ্খে'।

৪৫

পয়ার

অহঙ্কার করিয়া ব্যাঘ্র বিপরীত ডাকে। বিক্রম করিয়া পুচ্ছ ঠেকায় মস্তকে।।
দুই কর্ণ তুলিয়া আনল-দৃষ্টি চায়। পাষাণ ভঙ্গিতে পারে দশনের ঘায়।।
কান্দে ত বেহুলা রামা ভাবিয়া গোসাঞি। আজি ব্যাঘ্র হাতে মোর প্রাণরক্ষা নাঞি।।
শুনিয়া ব্যাঘের ডাক প্রাণ চমকিত। মড়া কোলে করে সতী হইল মূর্ছিত।।
মনসা কুমারী মনে করিয়া সঘন। এই তো সঙ্কটে মাতা করহ রক্ষণ।। ৫৯৫
ত্রাসিত বেহুলা মৃত পতি লইয়া কোলে। ব্যাঘ্র মুক্তি করি পদ্মা রথে কুতূহলে।।
আজি জানি বেহুলা হারায় প্রাণেশ্বর। আমার স্ত্রীবধ পদ্মা তোমার উপর।।
কান্দিয়া বেহুলা রামা মনসা সোঙরে। অন্তরীক্ষে পদ্মাবতী আইলা তথারে।।
ধরিয়া ব্যাঘ্রের পুচ্ছ ফেলিল আকাশে। দেবী কৈলা ভয় নাঞি রচে বিপ্রদাসে।।

৪৬

ত্রিপদী

অন্তরীক্ষে বোইলা বাণী ভয় নাঞি সুবদনী
প্রভু লইয়া যাও নিজ কাজে।

বেহুলা সম্বিত পায়্যা ব্যাঘ্র-বাঁক এড়াইয়া
মাজষ মেলিলা গঙ্গা মাঝে।। ৬০০
নিশিদিশি উপবাসী রূপসী মাজষে ভাসি
চানকের গঙ্গে [১]পরবেশে[১]।
যত বুড়নিয়া তথি নিবসন্তি দুষ্ট মতি
ভ্রমন্তি কপট মায়াবেশে।।
ললাটে উজ্জ্বল ফোঁটা কান্ধ শোভা যোগ পাটা
পদ্মবীজে জপমালা করে।
মিছা মন্ত্র জপ করে গলায় রুদ্রাক্ষ ধরে
নিশি হইলে দুষ্টু-বিত্তি করে।।
কুমন্ত্রণা শিক্ষা জানে হিংসিয়া লোকে প্রাণে
সর্বধন হরে মহা লোভে।
হেনকালে দৈবযোগে মাজষ ভাসিয়া লাগে
গগনেতে রবি যেন শোভে।।
যত বুড়নিয়া-গণে বিশেষ গনিয়া জানে
বহুধন পাব একু ঠাঞি।
অনুমান করি সভে নৌকা আরোহিযা তবে
বেহুলার মাজষ রহাই।।
নানা-আভরণ কন্যা রূপে গুণবতী ধন্যা
দেখিয়া আনন্দ লাগে মন।
অহঙ্কারে বলে তথা ধন লইয়া যাও কোথা
আইস কন্যা আমার ভুবন।। ৬০৫
বেহুলা সম্ভ্রম চিত্ত সর্ব অঙ্গ রোমাঞ্চিত
কম্পবান সকল নয়ন।
কি করিব কি বলিব সভয় হরিল সব
পদ্মা পদ করেন স্মরণ।।
বুড়নে নিষ্ঠুর দেখি ঈষত মেলিয়া আঁখি
অতি করে রোদন-বদনে।
আমি কুলবতী হই মৃতস্বামী লইয়া যাই
দেখিয়া রহাও কি কারণে।।
বেহুলা যতেক কহে প্রবোধ না মানে তাহে
অধিক হইল ক্রোধবন্ত।
কেহ দন্ত করি যায় কেহ পরশিতে চায়
বুড়নিয়া বিষম দুরন্ত।।
মৃতপতি কোলে করি সোঙরিয়া বিষহরি
নির্জ্জিতা মূর্ছিতা পড়ি তথি।
বেহুলা দুর্গতি অতি জানিলা তো পদ্মাবতী
রথে ভরে আইল শীঘ্রগতি।।

মনসার মায়া-ধন্ধ বুড়নিয়া হইল অন্ধ
মাজষ ঠেকিল পদাঙ্গুলে।
পদ্মা রথে ভর কৈল বেহুলা চেতন পাইল
নিশি দিশি যায় কুতূহলে।। ৬১০
এড়াইলা নানা দুঃখে প্রবেশিলা চৌমুখে
বিশ্রাম করিয়া ভাবে মনে।
চারিদিগে জল সবো কোন পথ দিয়া যাবো
পদ্মা পদ করেন [২]স্মরণে[২]।।
জানিয়া মনসা দেবী মনে অনুমান ভাবি
নেতোরে বলিলা সংবিধান।
চৌমুখে বেহুলা রয়্যা কান্দে পথ না পাইয়া
ঝাটো আনো মোর বিদ্যমান।।
চলিল ধোবানি বেশে যথায় বেহুলা ভাসে
পুত্র বধি এড়ি ভূমিতলে।
বেহুলার মন ছলে বস্ত্র কাচে কুতূহলে
পুত্র জিয়াইয়া ঘরে চলে।।
দেখি শীঘ্র বেহুলায় ধরিল নেতোর পায়
কহে দুঃখ আপন কারণ।
আমি জাতিস্মরা নারী পদ্মা পদ সেবা করি
দম্পত্য-নিবিষ্ট এক মন।।
আছিলাম দেবপুরি জানিলেন বিষহরি
প্রভুরে দংশিল বিভারাতি।
পূর্বে সত্য কৈলা মোরে জিয়াইব প্রাণেশ্বরে
তার পূজা প্রচারিব ক্ষিতি।। ৬১৫
মৃতপতি লইয়া ভাসি মনসা উদ্দিশে আসি
এই তো চৌমুখে পরবেশ।
কোন পথ দিয়া যাব কোথায় মনসা পাব
তুমি মোরে বলহ উদ্দিশ।।
নেতো বলে প্রতিকার নাহি তোর চিন্তা আর
আইস ঝাটো মোর অনুসারে।
চলিল হরিষ-ভাবে হাথে যেন স্বর্গলাভে
অন্ধ যেন নয়ন প্রসারে।।
সফল জীবন চিত্তে নেতো-অনুগত পথে
দেবপুরে হৈল উপনীত।
জনমে জনমে সেবি ভাবিয়া মনসাদেবী
দ্বিজ বিপ্রদাস বিরচিত।।

১ পরবেশ (সু. সেন) ২ স্মরণ (ঐ)

৪৭
পয়ার

অচল-সিজুয়া-গিরি অতি রম্য ধাম। ব্রহ্মা আদি করি তথা দেবের বিশ্রাম।।
ভৃগু পরাশর আদি ঋষি সন্নিধানে। আছেন তপস্যা করি পরম ধেয়ানে।। ৬২০
কোথাও পরম যোগী সিদ্ধি [১]সাধ্যে[১] বর। খড়্গ ভেদিয়াছে তথা অব্যক্ত কন্দর।।
কোথাও তম্বুরা গান মধুর সুস্বরে। গায়ন্তি সুধীর গীত শুনি মনোহরে।।
বিদ্যাধর অপস্বর আছয়ে কুতূহলে। গায়ন্তি নৃত্যন্তি তথা সুচ্ছন্দ সুতালে।।
স্থানে স্থানে কল্পতরু তথাই নিবাসে। জরা মৃত্যু দুঃখ শোক হরে তপরসে।।
কোথাও অমরগণ আছে নিরবধি। পিয়ন্তি অমৃত-ঝারা ঝরে কলানিধি।। ৬২৫
মহৌষধি তরু তথা আছে কোন স্থানে। শোক মৃত্যু কভু নহে তাহা পরশনে।।
নানা পক্ষ কলরব সুললিত শুনি। পবন আহার করি আছে কত ফণী।।
নানা বর্ণে পশু বৈসে মৃগ নানা জাতি। স্বর্গগঙ্গা-জল খাইয়া পরম পিরীতি।।
শিখরের শৃঙ্গে ধাম বিচিত্র নির্মাণ। তথায় নিবসে উমা দেব পঞ্চানন।।
দেবগণ সঙ্গে রঙ্গে ত্রিদশের রায়। হেনকালে বেহুলা যে মিলিলা তথায়।। ৬৩০
নানা রত্ন অলঙ্কার মাজযে আছিল। ঘাগর [২]নূপুর[২] পরি নৃত্যকি কাছিল।।
দেব-কন্যা মধ্যে গেল বেহুলা রমণী। রূপ-বেশে মোহিত অমর সুর মুনি।।
পূর্ব জন্মকৃত ছিল সামান্য বিশেষ। সর্ব উপসন্ন হৈল অমরের দেশ।।
আপনি মৃদঙ্গ বাহে গীত গাহে রঙ্গে। সুতাল সুচ্ছন্দে নৃত্য করে অঙ্গ ভঙ্গে।।
ক্ষেণেক রহিয়া রামা করয়ে বিশ্রাম। পুনঃ ছন্দ-বিছন্দে নাচয়ে অনুপাম।। ৬৩৫
দ্বিজ বিপ্রদাস বলে বন্দি বিষহরি। কামেতে পীড়িত হইয়া বলে ত্রিপুরারি।।

১ সাদ্ধে (সু. সেন) ২ নপুর (ঐ)

৪৮
পাহিড়া

বেহুলা যুবতী সতী নৃত্যন্তি গায়ন্তি তথি
দেখি পশুপতি মন ভোলে।
কামদেব আসি মনে হানিলেক পঞ্চাননে
লজ্জা ছাড়ি তারে কিছু বলে।।
শুন নৃত্যবতী কন্যা পরম যুবতী ধন্যা
পতি লোভে সতী লো যুবতী।
কিবা তোর অভিমতি বলহ আমার প্রতি
বর দিব আমি পশুপতি।।
মদনে কাতর হর বেহুলারে সত্বর
শুন লো যুবতী গুণবতী।
জিনি পূর্ণ শশধর সুধা চারু মুখ তোর
ঈষত হাসিতে রস-গতি।।
আমি হেন মনে লখি হইয়া চকোর পাখী
সুধাপান করি নানা রসে।

কহো লো যুবতী সতী জিয়াবো তোমার পতি
কমণ্ডল জলের পরশে।। ৬৪০
দেখিয়া যৌবন তোর কাম-সাগরেতে মোর
ডুবি মন হইল বিকল।
পশুপতি তোরে বলে নহে প্রাণ কামানলে
কৃপা করি হও অনুকূল।।
কটাক্ষে মদনশর ভেদিলেক অন্তর
অস্থির হইল মোর মন।
মহা ঔষধের বড়ি দেহ মোর অঙ্গে পড়ি
ঝাটো করি রাখো ত্রিলোচন।।
ভুজ অতি অনুপাম আলিঙ্গনে পুরে কাম
করহ-নিন্দিত সুবন্ধন।
বুকে কুচগিরি চাপ সঘন-নিতম্ব দাপ
অবিরত করো রতিদান।।
শুনিয়া হরের বাণী বেহুলা রমণী ধনি
কোপে অতি হৃদয় জ্বলিত।
পদ্মা পদপঙ্কজে পুট চাটু করি ভুজে
দ্বিজ বিপ্রদাস বিরচিত।।

৪৯

মালসি

ভৈরব বেতাল সঙ্গে প্রেত-আদি মেলা। বিভূতি ভূষণ তব গলে হাড়-মালা।। ৬৪৫
তেজি লজ্জা ভয় বুড়া জুড়ি দুই হাথে। সহজে পাগল তুমি ত্রিদশের নাথে।।
অতিসে বেলিক হর কি তোর মহিমা। হেন সন্তাপিত প্রতি রতিরে তাড়িয়া।।
দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করো মহিমা টুটায়্যা। অন্য জায়া ভজ তুমি দেবরাজ হইয়া।।
জটায় বেষ্টিত ফণী ভ্রমসি সংসারে। ভক্ষণ গরল বঞ্চ কুচনির ঘরে।।
দুঃখের উপরে দুঃখ কেন দেহ আমা। জানিনু বিশেষ দয়া নাহিমাত্র তোমা।। ৬৫০
যত কিছু বলো হর মনের সন্তাপ। তোমারে নিন্দিয়া প্রভু ঘোর কৈল পাপ।।
ক্ষেম অপরাধ মোরে করো পুটপাণি। মনসার বরদাসী তোমারো নাতিনী।।
হাসিয়া বিমুখ হইলা দেব [১]কৃত্তিবাস[১]। পদ্মা পদ ভাবি বলে দ্বিজ বিপ্রদাস।।

১ কীর্ত্তিবাস (সু. সেন)

৫০

ত্রিপদী

ছিনু সুরপুরী [১]ইন্দ্র বরাবরি
[১]অনিরুদ্ধ[১] মোর পতি।

তথা সত্য করি লৈলা বিষহরি
দুহা [২]জন্মাইলা[২] খিতি।।
নাগে বিভারাতি দংশিলেক পতি
তেজিয়া [৩]সর্ববান্ধবেরে[৩]।
মৃত পতি লইয়া মাজষে ভাসিয়া
আকুল অতি অন্তরে।। ৬৫৫
বহু দুঃখে তরি আইনু দেবপুরি
নিবেদি তোমা [৪]অগ্রেতি[৪]।
কৈনু তব পায় কর‍্যা মনসায়
জিয়াইয়া দেহ পতি।।
নারদ মুনিরে ডাকি মহেশ্বরে
কহিলা সকল কথা।
গিয়া মুনিবরে মনসা গোচবে
ডাকিয়া আনিল তথা।।
মনসা আইলা মহেশ কহিলা
হেরো দেখো বিদ্যমান।
বিভারাতি মৈল লখাই দংশিল
বেহুলারো প্রাণধন।।
বৈলা পদ্মা কথা লখাইর কথা
আমি কিছু নাহি জানি।
কথো স্তব আরো করসি আমারো
এতেক গঞ্জিলা কেনি।। ৬৬০
বেহুলা বলে কথা না কহ এ কথা
কপট মিছা বচন।
দংশিয়া যাইতে কাটিল পুছেতে
হের লহ নিদর্শন।।
দুঃখ সিন্ধুজল ভাসিয়া বিকল
তিল দয়া নাহি তোমা।
তোমা ছাড়ি গতি অন্য নাহি মতি
কত দুঃখ দেহ আমা।।
বেহুলা সন্তাপে নিগদে আলাপে
দুঃখ কহে মনসায়।
বিপ্রদাস কবি পদ্মা-পদ সেবি
বারোমাস্য কথা কয়।।

১ অনিরুদ্র (সু. সেন) ২ জর্মাইলা (ঐ) ৩ সর্ব বান্ধবে (ঐ ; পরের ত্রিপদী-অর্ধের সঙ্গে মিল নেই)
৪ অগ্রেতে (সু. সেন)

৫১

কৌ রাগ

নর হৈয়া মন্দ বলে চাঁদো দুষ্ট পাপ। শুন লো বেহুলা তোরে কহি দুঃখতাপ॥
বৈশাখে আমারে পূজে সনকা বান্যানি। লঙ্ঘিয়া আমার ঘট বলে মন্দ বাণী॥ ৬৬৫
জ্যৈষ্ঠে আমারে লোক করে অভিষেক। সর্বক্ষণ মন্দ বলে সহিব কতেক॥
নীরস সকল রামা মঞ্জরিত শাখী। চ্যুত পূগ পনস সুত সম্ভ্রমে লোক সুখী॥
শালি-রূপ হইয়া গেনু চাঁদো বিদ্যমান। নাখরা কাটিয়া হরি লৈনু মহাজ্ঞান॥
নিরমল দশদিগ তড়িত আকার। ধন্বন্তরি নামে দুষ্ট বলে দুরাচার॥
গোয়ালিনী সহি রূপে ধন্বন্তরি বধি। আষাঢ়ের যতো দুঃখ কহিনু অবধি॥ ৬৭০
হেরো বলি বেহুলা গো অবধান কর। ধনা-মনা নামে দুই মালির কুমার॥
বধিয়া আনিনু দুষ্ট অরিষ্ট প্রবল। শ্রাবণের দুঃখ তোরে কহিল সকল॥
অনুক্ষণ চাঁদো নিন্দা করে ভাদ্র মাসে। তার পুরী নাগ মোর না যায় তরাসে॥
ছয় পুত্র বধে তার কালি নাগিনি। [১]তবু[১] মন্দ বলে চাঁদো দুরাচার বাণী॥
আশ্বিনে চণ্ডিকা-পূজা করে সর্ব লোক। হতো-দুঃখী জন আদি আনন্দ কৌতুক॥ ৬৭৫
বিমুখ হইয়া নাহি দেয় ফুল-পানি। ইন্দ্রের সভায় তোমা হর‍্যা গিয়া আনি॥
কার্তিকে হিমন্ত রিতু উত্তর পবন। শিয়রে বসিযা তারে কহিনু সপন॥
সপনে কহিয়া চাঁদো পাঠানু পাটনে। কালিদহে দেখাইনু মহানাগগণে॥
অগ্রহায়ণ মাসে চাঁদো পাটনে প্রবেশে। মায়ামোহে বন্দী করি থুইনু সেই দেশে॥
মিত্র-ভোলে মোর নিন্দা পাসরে তথাই। দ্বাদশ বৎসর অপমান নাহি পাই॥ ৬৮০
শীতেতে কম্পিত লোকে পৌষে নিবসে। চাঁদোর শিয়রে বসি কহি উপদেশে॥
কালীদহে ডুবাইনু সপ্ত মধুকরে। নানা দুঃখ দিয়া চাঁদো আনিনু দেশেরে॥
মাঘ মাসে মাসি রূপে কৈনু অনুবন্ধ। চাঁদোরে বুঝায়ে তোমা করিনু সম্বন্ধ॥
চলিল তোমারে আমি মুকুতা-সহরে। লোহার কলাই সিজাইয়া দিলা তোরে॥
প্রথম বসন্ত রিতু প্রবেশে ফাল্গুন। সদাই চাঁদোর কত সহিব নিন্দন॥ ৬৮৫
মোরে অহঙ্কার করি বাঁধে লহু-ঘর। হেন মন করে চাঁদো বধি প্রাণেশ্বর॥
চৈত্র মাসে হর-পূজা করে সর্ব লোকে। মোর নাম যেই লয় তারে নাহি দেখে॥
প্রথম বৈশাখে তোমা বিভা করাইল। লোহার বাসরে কালি লখাই দংশিল॥
বেহুলা জুড়িয়া কর বলে সবিনয়। প্রভু জিয়াইয়া দেবী পাঠাও আমায়॥
সসুরা বুঝায়্যা পূজা করাইব তোমা। সকল সম্পূর্ণ করি পাঠাও ত আমা॥ ৬৯০
কান্দে ত বেহুলা ধরি মনসার পায়। প্রভু জিয়াইয়া দেশে পাঠাও আমায়॥
দুঃখের উপর দুঃখ নৃপতি দুঃখিত। মৃত পুত্র পায়্যা রাজা হইব দ্রবিত॥
সানন্দে নৃপতি চাঁদো পূজিবেক তোমা। সংসার ভরিয়া তব রহিব মহিমা॥
সত্য করি বেহুলা মনসা বিদ্যমান। যদি তোমা নিন্দে চাঁদো মোর বিদ্যমান॥
গঞ্জিয়া নৃপতি যে আসিব তব স্থান। সত্য কৈল বেহুলা পদ্মার বিদ্যমান॥ ৬৯৫
হর আদি দেবতা বুঝিয়া পদ্মাবতী। জিয়াইয়া দেহ মা গো বেহুলার পতি॥
মনসা প্রসন্নমন হাসি মন্দভাবে। জিবেক লখাই তোর বলে বিপ্রদাসে॥

---

১ তম্মু (সু. সেন)

৫২

পয়ার

হাসিয়া দিলেন আজ্ঞা মনসাকুমারী। আন লো তোমার প্রভু মোর বরাবরি॥
হরিষে বেহুলা প্রভু ধরিল তুলিয়া। খসিয়া পড়িল অঙ্গ খণ্ড খণ্ড হৈয়া॥
মাংস চর্ম তেজি অস্থি আনে পাখালিয়া। শির পদ আদি অস্থি দেহ জোড়াইয়া॥ ৭০০
তবে ত বেহুলা বালি সার-পাত্র লয়্যা। পাখালিল অস্থি মাংস চর্ম ঘুচাইয়া॥
রঘু বোদালি খাইল লখাইর আঁটু-চাকি। ঘুরে পদ্মার স্থানে আইল শশিমুখী॥
রঘু বোদালিকে দেবি আনিল ধরিয়া। লইল আঁটুর চাকি উদর চিরিয়া॥
শির পদ আদি অঙ্গ করিল জোড়ন। লখাই জীয়াইতে পদ্মা স্থির কৈল মন॥
বসিলেক খড়্‌া ভেদি পবনের সন্ধি। পবনের পাশে অস্থি চিত্ত কৈল বন্দী॥ ৭০৫
মুষ্টি মুষ্টি নিবিষ্টী জপিল মূল মন্ত্র। গরুড় আসনে বসি নিরক্ষর তন্ত্র॥
ত্রিপুর দাহনে হরো অগ্নি উঠে মুখে। দৈত্য পুড়িয়া অগ্নি পৃথিবীতে থাকে॥
পৃথু রাজা পৃথিবী দুহিলা যেই কালে। দুহিয়া নাগেরে বিষ দিলেন পাতালে॥
সেই বিষ বাসুকি দিলেন মোর ঠাঞি। শুন শুন বিষ তোর [১]জন্মকথা[১] কই॥
হরো হরো গরল লখাই-অঙ্গে হরো। বিষহরির আজ্ঞায় বিষ ঘা-মুখে মর॥ ৭১০
খিরোদ মথনেতে [২]জন্মিল[২] কার বিষ। গণ্ডূষ করিয়া তাহা পিয়ে জগদীশ॥
সমুদ্রে [৩]জন্মিল[৩] বিষ কপিলার খিরে। দেবগণ মেলি তাহা দিল বাসুকিরে॥
রক্তের পরশে বিষ জীব [৪]জন্ম[৪] কায়। তন্ত্রে মন্ত্রে মর বিষ ধর্মের আজ্ঞায়॥
বাপে ঝিএ কহি তোর [৫]জন্মের[৫] কাহিনী। ঈশ্বরের আজ্ঞায় বিষ ঝাটো হও পানি॥
বিনতা জিনিল কদ্রু বিষের কারণে। [৬]জন্মিয়া[৬] গরুড় কৈল নাগের গঞ্জনে॥ ৭১৫
সেই ত গরুড় তোর ঝঙ্কারে উপর। গরুড়-আজ্ঞায় বিষ ঘা-মুখে মর॥
মধ্যসমুদ্র বটে কুরলের স্থান। কুরলের নামে বিষ হও কম্পবান॥
আদ্যনাথ নামে ব্রহ্মা [৭]কথিল[৭] গোসাঞিও। তাহার নামেতে বিষ ঘা-মুখে নাই॥
উধা করি ফিরে কঙ্ক আকাশ উপরে। কঙ্ক-পাখসাটে বিষ কাঁপে থরহরে॥
তাহার পরশে ভস্ম হয়ে ত গরল। কাঁকের আজ্ঞায় বিষ যায় রসাতল॥ ৭২০
জপিল পুরক [৮]মুলি[৮] মহামন্ত্র-সারে। অস্থির উপরে মাংস চর্মেতে সঞ্চরে॥
মুনি আদি মরণেতে যায় ত্বিষাপতি। সর্পধ্যানে মরেছিলো বেহুলার পতি॥
নাগবাচা বিদ্যা দেবি পড়িল আপনি। ঝাটো আসিলেন বিষ কালী নাগিনী॥
মন্ত্র পড়ি চাপড় মারিল তার পিঠে। ত্রস্ত হইয়া লখিন্দর আস্তে বেস্তে উঠে॥
উঠিয়া বসিল বালা দশদিগ দিষ্টি। দেবগণ জয়জয় হইল পুষ্পবিষ্টি॥ ৭২৫
যেইরূপে জিয়াইল মৃত লখিন্দর। সেইরূপে জিয়াইব ছয় ত কুমার॥
এত দূরে জাগরণ হইল সমাধান। হরি বলি সর্বলোক চলো নিজ স্থান॥
দ্বিজ বিপ্রদাস বলে মনসা-চরণ। জনমে জনমে মাতা হইব সুপ্রসন্ন॥ ৭২৮

১ জর্মকথা (সু. সেন) ২ জর্মিল (ঐ) ৩ জর্মিল (ঐ) ৪ জর্ম (ঐ) ৫ জর্মের (ঐ) ৬ জর্মিয়া (ঐ) ৭ (সু. সেন সন্দেহ করেছেন এই পাঠে, তবে এর অর্থ ভেদ কঠিন নয়) ৮ মুলি (মূল অর্থে?)

দ্বাদশ পালা সাঙ্গ

ত্রয়োদশ পালা

১

আহিরী রাগ

বেহুলা প্রভুরে দেখি লাজে হইল লম্বমুখী
বলিছে লখাই কিছু বাণী।
সবে তুমি একেশ্বরী উপনীত এই পুরী
লোকে পাছে ঘোষে কু-কাহিনী।।
বেহুলা প্রভুর বোলে প্রণাম হইয়া বলে
শুন প্রভু বুঝাই তোমারে।
তব পিতা চাঁদো রাজা না করে পদ্মার পূজা
কোপে পদ্মা কাঁপে থরহরে।।
লোহার মন্দিরে সাপে তোমারে দংশিলা কোপে
চাঁদো রাজা দিলা ভাসাইয়া।
কলার মাজষে ভাসি তোমা প্রভু লইয়া আসি
সে [ই পথে] নানা দুঃখ পায়্যা।।
নৃত্য কবি দেবপুরী তুষ্ট করি বিষহরি
তোমা জীয়াইল বিদ্যমান।
মৃদঙ্গ বাজাও তুমি নৃত্যরঙ্গ করি আমি
ছ ভাসুর মাগি লব দান।।
লখাই মৃদঙ্গ বায় নৃত্য করে বেহুলায়
মোহিত সকল দেবগণ।
বিষহরি যত্ন-মনে ছ কুমার বিদ্যমানে
জীয়াইয়া দিলা তত [ক্ষণ]।। ৫
সকল দেবতা তুষ্টি হইলা কুসুম-বিষ্টি
[১]দুন্দুভি[১] বাজায় জয়ধ্বনি।
লখাই বেহুলা দেখি দেবগণ মহা সুখী
পুনরপি মাগিল মেলানি।।
স্তুতি করি দেবপুরে বেহুলা বিদায় করে
মনসা মাজষে কৈলা ভর।
জয় জয় ধ্বনি দিয়া যার শুভক্ষণ পায়্যা
কালিদহে প্রবেশে সত্বর।।
বেহুলা বলয়ে মা সসুরের সপ্ত না
গাঁথর চাকর শতে শতে।
এহ কালিদহ জলে তুলি দেহ কুতূহলে
লৈয়া যাই সসুরা অগ্রেতে।।
বেহুলার যত্ন দেখি মনসা পরম সুখী
তুলি দিলা সপ্ত মধুকর।
ধন জন ডিঙ্গা পায়্যা জয় জয় ধ্বনি দিয়া
প্রবেশিলা চানকে সত্বর।।

বুড়নিয়া যত কথা কহিলা লখাই তথা
শুনিয়া হইল ক্রোধমুখি।
শীঘ্রগতি কূলে উঠে বুড়নিয়া-যত কাটে
শূলে দিলা করি ঠেকাঠেকি।। ১০
[২]প্রবেশি[২] ব্যাঘ্রের বাঁকে শার্দূল বধিয়া কোপে
বাগডেঙ্গা পাতিল নগর।
গিধিনি শকুনি বাঁকে মারি সেই দুই পক্ষে
শকুনি-নগর মনহর।।
বড় সেয়ালের বাঁকে বাহিয়া এড়ায় [৩]তাকে[৩]
নানা বাদ্য করি আনন্দিত।
লখাই-মাতুল সেই বাঁক এড়াইয়া যাই
ধনা-পুলা বাঁকে উপনীত।।
নিগদে প্রভুর ঠাঞি অতি শুদ্ধ দুই ভাই
শুনি বালা হরিষ প্রবল।
[৪]বহু[৪] ধন দিয়া তথি চৌহাটা নগর পাতি
ধনা-পুলা করিল মণ্ডল।।
সমুখে আপন দেশ করিলেক পরবেশ
বেহুলা প্রভুরে কিছু ভাষে।
পদ্মা-পদপদাম্বুজে পুট চাটু করি ভুজে
বিরচিল দ্বিজ বিপ্রদাসে।।

১ দুন্দুবি (সু. সেন), ২ সু. সেনের কাল্পনিক পাঠ ৩ ডাকে (সু. সেন) ৪ নানা (?)

২
নাট রাগ
প্রসন্ন রূপেতে যদি দেহ ত মেলানি। ছলিব ডুমুনি-রূপে তোমার জননী।। ১৫
বেহুলা প্রভুর পদে করয়ে বিনয়। সনকা ছলিতে মোরে দেহ ত বিদায়।।
বিমরিষ লখাই নিগদে বারে বার। লোকমুখে লজ্জা পাছে হয় তো আমার।।
ভাবিয়া লখাই বলে মধুর সুভাষে। দিলাম বিদায় করো যেই মনে আইসে।।
বেহুলা বলয়ে রাজা দেখিব ছলিয়া। চুপড়ি বিয়নি মোরে দেহ নির্মাইয়া।।
বেহুলার বাক্যে বালা হরিষ অন্তর। চুপড়ি বিয়নি গঠি দিলেক সত্বর।। ২০
চলিলা বেহুলা রামা রাজ-অন্তঃপুরী। দ্বিজ বিপ্রদাস বলে কর-জোড় করি।।

৩
শ্রীরাগ
ছলিতে চম্পক দেশ বেহুলা বিচিত্র বেশ
পরিধান বিচিত্র বসন।
চাঁচর প্রচুর কেশ চামরি জিনিয়া বেশ
নানা পুষ্প কবরীভূষণ।।

মকরন্দগন্ধ লোভে ভৃঙ্গকুল তথি শোভে
অর্ধ ইন্দু ললাটে সিন্দুর।
তিলক উজ্জ্বল ভালে শ্রবণে কুণ্ডল দোলে
রুনুঝুনু চরণে নূপুর।।
বেহুলা মায়া রূপে হইল ডুমুনি।
মধুর সুস্বর ধ্বনি অতি সুললিত শুনি
কে লইবে চুপড়ি বিয়নি।।
মউর-পেখম গতি শিরে লইয়া টোকা ছাতি
ঝাঁপি ক্ষেমি চুপড়ি বিয়নি।
কর্পূর তাম্বুল কথো পুরি লৈল বাম হাথ
রাজহংস জিনিয়া গামিনী।। ২৫
নগরে প্রবেশ করি দাণ্ডাইল সুন্দরী
দেখিয়া মোহিত প্রজাগণে।
প্রবেশিয়া রাজপুরে ডাকিল মধুর স্বরে
দাসী ঝাউয়াবতি তাহা শুনে।।
ধায় ঝাউয়া উর্ধ্বমুখি বেহুলার রূপ দেখি
নিরক্ষিয়া করিল গমন।
আঁখি ছল ছল জলে দ্রবিদ হইয়া বলে
সনকারে কহে বিবরণ।।
বাহিরে ডুমুনি এক বেহুলা যেমন দেখো
হয়ে নহে চিনিহ আপনি।
দেখিয়া আইনু তারে বাহির চৌতারা দ্বারে
দাঁড়াইয়া আছে সুবদনী।।
বেহুলার নাম শুনি সত্বরে ধাইল রানি
বাহির [১]দোয়ারে[১] উপনীত।
নেহালিয়া ঘন চায় সকল লক্ষণ পায়
হৃদয় হইল সুব্যথিত।।
দেখিয়া ডুমুনির মুখ পুত্রের যতেক শোক
সকল হইল সোঙরণ।
আঁখি অশ্রুধারা বহে প্রেমে কোল দিতে চাহে
দ্বিজ বিপ্রদাস সুরচন।। ৩০

১ দ্বোয়ারে (সু. সেন)

৪

করুণা

অনিমিখ দুই আঁখি ডুমুনি নেহালি। লিখিয়াছে পটে যেন চিত্রের পুথলি।।
হা হা পুত্রবধূ বহি অন্যে নাহি মনে। চিন্তিতে গণিতে অস্থি বিঁধিলেক ঘুণে।

কহ ল ডুমুনি মোরে করিয়া নিশ্চয়। বেহুলার হেন দেখি [১]দেহ[১] পরিচয়।।
প্রাণ স্থির নহে মোর তোমারে দেখিয়া। কোন বাঁকে পুত্র মোর দিলে ভাসাইয়া।।
কতো সব পরাণে পুত্রের দুঃখ-শোক। শরীর জর্জর হইল দেখো পরতেক।। ৩৫
অহর্নিশ পুত্র শোকে কান্দিয়া গোয়াই। দারুণ সন্তাপে অন্ন পানি নাই খাই।।
দশদিক শূন্যাকার দেখি সবিশেষ। মৃতাবত সদাই শরীর হইল শেষ।।
কিছুমাত্র পুত্রশোক ছিনু পাসরিয়া। সকলি স্মরণ হইল তোমারে দেখিয়া।।
সনকা ক্রন্দনে বেহুলা সুব্যথিত। দ্বিজ বিপ্রদাস বলে মনসাচরিত।।

১ কেহ (সু. সেন)

৫

সিন্ধুড়া

বেহুলা বলয়ে বাণী শুন হেরো বাজরানি
ক্ষুধায় জ্বলিছে মোর প্রাণ।
সনকা বধূকে বলে ঘৃত-অন্ন পুরি থালে
ঝাটো মোর আনো বিদ্যমান।। ৪০
বদন্তি বেহুলা গুরি আসি আমি স্নান করি
চলিল হইয়া নমস্কার।
সনকার যতো কথা লখাইরে কহে কথা
শুনি বালা দ্রবিদ আপার।।
নানা বাদ্য কোলাহলে বুহিত্র বাহিয়া চলে
রামেশ্বর ঘাটে উপনীত।
সভে মেলি অনুমানি দুর্লভ কাণ্ডার আনি
সত্য করি মনসা অগ্রেত।।
যদি অই চাঁদো রাজা করয়ে পদ্মার পূজা
তবে সর্ব দিব তো রাজারে।
যদি চাঁদো অধিকারী এমু নিন্দে বিষহরি
নেউটিয়া যাবো তথাকারে।।
আমার সম্বাদ এই জানাবো রাজার ঠাঞি
বিশেষ বুঝাই সন্নিধানে।
রত্নময় চতুর্দোলে আরোহণ কুতূহলে
সুললিত করে নৃত্য গানে।।
অশ্ব-দন্তি-সেনাগণ বেড়ি চলে সর্বজন
পদ্মার নিশান আগে যায়।
মহাদম্ভরম্ভ করি সভে চলি সারি সারি
যেনো রবি করিছে উদয়।। ৪৫
দেখি লোক চমৎকার জানাইল দণ্ডধর
শুনি রাজা ভয়ে চমকিত।

পাত্র-মিত্র বরাবরি যুক্তি করি অধিকারী
পাঠাইল সোমাই পণ্ডিত।।
ললাটে উজ্জ্বল ফোটা কান্ধে শোভে শুক্ল পাটা
দণ্ডে গেলা কাণ্ডার নিলয়।
দ্বিজ তেজময় দেখি কাণ্ডার পরম সুখী
প্রণমিয়া দিলা পরিচয়।।
বিপরীত দেখি কর্ম পণ্ডিত সোঙরে ধর্ম
মৃত জিল দেখিতে তরাস।
পদ্মা-পদপঙ্কজে পুটচাটু করি ভুজে
বিরচল দ্বিজ বিপ্রদাস।।

১ পুথিতে 'গো গুরি'। লিপিকর এখানে 'গোরি' লিখতে গিয়ে গুরি লিখেছেন, আগে গো শব্দটি অখন লেখা হয়ে যায়।

৬

পয়ার

দুর্লভ কাণ্ডার বলে দ্বিজ বিদ্যমান। কহিব সকল কথা করো অবধান।।
বেহুলা যুবতী সতী মহিমা আপার। দেবতা সমাঝে পায় বড় পুরস্কার।। ৫০
নৃত্য করি [বেহুলা] তুষিলা দেবপুরী। জিয়াইলা প্রভু ছ ভাসুর যত্ন করি।।
কালিদহে তুলি দিলা সপ্ত মধুকর। সৈন্যদল অশ্ব দন্তী গাঁথর চাকর।।
সত্য কইলা বেহুলা মনসা বিদ্যমান। বিশেষ বুঝাবো গিয়া চাঁদো সন্বিধান।।
যদি ভয়ভক্তি রাজা পূজে মনসায়। ধনজন ডিঙ্গা আদি মহাজ্ঞান পায়।।
যদি না পূজে রাজা মনসা-চরণ। নেউটিয়া যাবো সভে পদ্মার সদন।। ৫৫
কর্ণধার হাথে ধরি লইল পণ্ডিত। নৃপতি গোচরে গিয়া হইল উপনীত।।
সম্ভ্রমে উঠিল রাজা দেখিল কাণ্ডার। বিপরীত কর্ম দেখি লাগে চমৎকার।।
কহ কহ কহ বলি জিজ্ঞাসে রাজন। কাণ্ডার কহিল সর্ব বেহুলা-কথন।।
শুনিয়া আনন্দে সভে অঙ্গ-পুলকিত। সত্বরে দেখিতে ধায় পাত্র-পুরোহিত।।
চমৎকার শুনি [১]রাজা[১] আনন্দিত-মন। বেহুলা জিয়াইয়ে আইল মৃত পুরিজন।। ৬০
সনকাদি ছয় বধূ অতি মহা স্তেহ ভাবে। হাথ বাড়াইয়া স্বর্গ পায় যেন এবে।।
আজন্ম অন্ধের হইল নয়ন নির্মল। বদ্ধ সরোবরে যেন পূর্ণ হইল জল।।
যেমন শুখান কাষ্ঠে হইল মুঞ্জরি। ময়ূরের শিখি যেন পুছে নৃত্য করি।।
সর্বরাজ্য লইয়া চলে আনন্দিত-মন। রামেশ্বর ঘাটে গেলা সঙ্গে পুরীজন।।
লখাই-বেহুলা দেখে দেব-অধিষ্ঠান। মৃত ছয় পুত্র দেখে চন্দ্রের সমান।। ৬৫
সপ্ত ডিঙ্গা রত্নময় গাঁথর চাকর। এসব দেখিয়া রাজা পুলকে অধর।।
সম্ভ্রমে বেহুলা রামা লোটাইয়া ক্ষিতি। সবুর সাবুড়ি পদে করিল প্রণতি।।
বেহুলার যতো কর্ম চাঁদো রাজা দেখি। বিশ্বের ভকতি-স্তুতি পূর্ণ-অশ্রু আখি।।
দ্বিজ বিপ্রদাস বলে মনসা-চরণ। বেহুলা দেখিয়া স্তুতি করে সর্বজন।।

১. রাজ্য (সু. সেন)

৭

পয়ার

শতেক যোজন সিন্ধু আড়ে পরিসব। পাতাল ভেদিয়া জল সঘনে সত্বর।। ৭০
বিষম উথাল হয় ঈষত বাতাসে। পর্বতপ্রমাণ ঢেউ উঠে ত আকাশে।।
ত্রিভুবনে কেবা পারে বলিতে মহিমা। প্রতিজ্ঞা করিলা ধন্য বেহুলা উত্তমা।।
হাঁকর কুম্ভীর আদি যতো জলচর। প্রবীণ [1]শরীর[1] সর্প মহাভয়ঙ্কর।।
মহাভয়ঙ্কর পক্ষ উড়য়ে উপরে। থাকুক মাজষের কাজ বুহিত্র সংহারে।।
অনাহারে [2]দিবে[2] নিশি ভাসিয়া মাজষে। দেবের নগরে গেল কেমন সাহসে।। ৭৫
কোথায় সম্ভবে হেন অসম্ভব নরে। লক্ষ লক্ষ মৃত জীব জিয়াইতে পারে।।
বিধবা পাইল স্বামী তোমার প্রসাদে। তব কর্ম ঘুষিতে রহিল অবিবাদে।।
তব গুণে ঝুরিয়া মরিব সর্বজন। দ্বিজ বিপ্রদাস বলে মনসা-চরণ।।

১ শ্বরীব (সু. সেন) ২ দেবে (সু. সেন)

৮

পয়ার

বেহুলা পড়িয়া খিতি পাটের আঁচলে। চাঁদোরে প্রণতি করি ধীবে কিছু বলে।।
তিন [1]জন্ম[1] দম্পত্য পদ্মার সেবা করি। সতী পতিব্রতা পূর্বজাতি না পাসরি।। ৮০
পূর্বে বাণসুতা নাম উষা তো আমার। প্রভু [2]অনিরুদ্ধ[2] কামদেবের কুমার।।
ইন্দ্রপুরি হইতে পদ্মা [3]জন্মাইল[3] ক্ষিতি। তোমার বিবাদে প্রভু মৈল বিভারাতি।।
মাজষে ভাসিয়া গেনু পদ্মা বরাবরি। নৃত্য করি পরিতোষ কৈনু দেবপুরি।।
অসাধ্য সাধিনু মুই দেবতা সহায়। তব পুরি জিয়াইয়া দিলা মনসায়।।
সত্য করাইলা পদ্মা দেবতা সদনে। যদি তুমি পূজা কর দিব পুরিজনে।। ৮৫
যদি পুন নিন্দা করো মনসা কুমারী। পুনর্বার যাবে সবে দেবতার পুরি।।
দেবতার সঙ্গে বাদ সম্ভবে কোথায়। মানব হইয়া তুমি নিন্দ মনসায়।।
ব্রহ্মা বিষ্ণু ইন্দ্র চন্দ্র আদি মহেশ্বর। মনসারে স্তুতি করে সভয় অন্তর।।
ধর্ম রূপি পদ্মাবতী না জান মহিমা। তাহারে ভজিলে স্বর্গে লইবেন তোমা।।
ধন পুত্র বুহিত্রাদি লও বিদ্যমান। কোটীকল্প জিবে আর পাবে মহাজ্ঞান।। ৯০
যদি বা মনসা-পদ না পূজ নৃপতি। ইহ লোকে শোক দুঃখ মৈলে অধোগতি।।
বুঝায় নৃপতি-চিত্ত উচিত বিধানে। সভে বলে পদ্মা-পূজা করহ রাজনে।।
মনেতে বুঝিয়া রাজা বলে কুতূহলে। হৃদয়ে পদ্মার ভক্তি মুখে কিছু বলে।।
না বুঝিয়া সর্বলোক বলে [4]অনুচিত[4]। দক্ষিণার লোভে বলে সোমাই পণ্ডিত।।
পুত্রশোকে সনকা বলয়ে অনুরোধে। নেড়া ঝাউয়া দাসী বলে সনকার বুদ্ধে।। ৯৫
ছয় বধূ বলে ছয় স্বামীর হাব্যাষে। গাঁথর চাকর বলে সেই অভিলাষে।।
বেহুলা বলয়ে সত্য হউক মহারাজ। তার অনুরূপ আমি সিদ্ধি করি কাজ।।
তবে চাঁদো বেহুলারে বলে পুনর্বার। তুমি সতী পতিব্রতা মহিমা আপার।।
তব অঙ্গীকার না করিব অলঙ্ঘন। প্রত্যক্ষ দেখিয়া পূজি মনসা চরণ।।
স্থলে যদি চলি ডিঙ্গা যায় মোর দ্বারে। তবে সে মহিমা জানি পূজিব তাঁহারে।। ১০০

তবে ত বেহুলা গেল হৃদয়ে আনন্দে। নানা উপহারে পদ্মা পূজিল প্রমোদে॥
অবিলম্বে বিষহরি হইল সাক্ষাত। নিগদে বেহুলা বাশি জুড়ি দুই হাত॥
সাত ডিঙ্গা লহ যদি চাঁদোর [৫]দোয়ারে[৫]। তবে সে পূজিব তোমা কহিল আমারে॥
বেহুলার বচন শুনিয়া বিষহরি। নেতোর সহিত দেবী অনুমান করি॥
শেষ নাগে আজ্ঞা মাতা দিলেন [৬]তুরিত[৬]। পিষ্টে করি দ্বারে লহ চাঁদের বুহিত॥ ১০৫
ইহা শুনি সুখী হইয়া চলে [৭]অবিলম্বে[৭]। আর সাত নাগ বলে করি মহাদম্ভ॥
কোন কাজে তুমি যাবে রহ ক্ষিতি ধরি। সাত জনে সাত ডিঙ্গা লব তার পুরি॥
অনন্ত তক্ষক চলে কদম্ব কুলির। শঙ্খ কর্কট আড়িয়াল মহাবীর॥
সাতডিঙ্গা পৃষ্ঠে করি নৈল সাত নাগ। এড়িল চাঁদের দ্বারে সাত ভাগে ভাগ॥
বেহুলা বলেন এবে শুন নৃপবর। আর কিবা থাকে মনে কহ ত সত্বর॥ ১১০
বেহুলার বাক্য শুনি বলিল রাজন। [৮]পূজিল[৮] পরম ভক্তি মনসা-চরণ॥
সর্বরাজ্য আনন্দিত জয় জয় ধ্বনি। রথ ভরে সুখে আইলা অস্তিক জননী॥
চাঁদো বলে আইস ঘরে সর্ব পরিবার। পূজিব মনসা-পদ বিবিধ প্রকার॥
সত্য দ্রড় কথা কহি [৯]এই[৯] দ্রড় রাণী। চলিল আনন্দে ঘরে বেহুলা রমণী॥
সাত বধূ সঙ্গে রঙ্গে সনকা বেড়িয়া। পুত্রবধূ বুহিত্রাদি লইল আঘিয়া॥ ১১৫
নাচিতে নাচিতে চাঁদো চলিল অগ্রেতে। সাত পুত্র বেড়িল রাজার চারি ভিতে॥
চলি যায় বেহুলা রাজার অন্তঃপুরী। আনন্দে পূজিব রাজা মনসা কুমারী॥
নানা বিধি বাদ্য বাজে মঙ্গল চৌভিতে। রঙ্গে খন্দি কুমঃকুম ছড়ায়ে রাজপথে॥
শিশু বৃদ্ধ যুবক দেখিতে আইল ধায়্যা। বসিলা সনকা রানি পুত্রবধূ লইয়া॥
মনসা পূজার স্থান করে অধিকারী। বিচিত্র গঠিয়া আনে মনসার বারি॥ ১২০
কদলি কর্কট ফুটি নারিকেল [১০]জাম্র[১০]। খাজুর পনস তাল [১১]পূগ[১১] পূর্ণ আম্র॥
নানা শব্দে বাদ্য বাজে বিষাণ আদি করি। দুন্দুভি মরুজ পড়া দোসরি মুহরি॥
মৃদঙ্গ মাদল বাজে কাংস্য করতাল। সানি বেনি কাঁসি সিঙ্গা ফুকরে কাহাল॥
জয় জয় শঙ্খধ্বনি দেয় রামাগণ। আনন্দে নাহিক অন্ত যত পুরিজন॥
ঘৃত দধি শর্করা নৈবিদ্য দশ ফল। নানা পুষ্প আনিল কমল শতদল॥ ১২৫
ছাগল মহিষ মেষ আনি শত শতে। স্নান তর্পণ রাজা কৈল বিধিমতে॥
ছবি চিত্র আলিম্পনা দেখিতে সুন্দর। সিজের পল্লব দিল ঘটের উপর॥
শুভক্ষণে দেব-দ্বিজে বন্দে সন্বিধানে। মন্ত্র পড়ি শিক্ষা বান্ধে বিপ্রদাস গানে॥

---

১ জর্ম (সু. সেন) ২ অনিরুদ্র (ঐ) ৩ জর্মাইল (ঐ) ৪ অশোচিত (ঐ) ৫ দ্বোয়ারে (ঐ) ৬ তুরিতে (ঐ—পরের পয়ারার্ধের সঙ্গে অন্ত্যমিল·থাকে না) ৭ অবিলম্বে (ঐ—ঐ) ৮ পূজিব (সু. সেন) ৯ (সন্দিগ্ধ পাঠ সু. সেন) ১০ আম্র (সু. সেন—পরের পংক্তিতেও 'আম্র') ১১ পূর্ণ (সু. সেন)

৯

বরাড়ি

স্নান করি নৃপবরে বিচিত্র বসন পরে
পদযুগ করে প্রক্ষালন।
কপালে চন্দন ফোটা হৃদে শোভে শুক্ল পাটা
মহারম্ভে বসিল রাজন॥

প্রথমে উচ্চরে স্বস্তি সংকল্প করিয়া তথি
পঞ্চদেব পূজিব বিধানে।
এক চিত্ত ধ্যান করি পূজিল সুবর্ণ বারি
পদ্মা-পদ পূজে এক মনে॥ ১৩০
জয় জয় মনসাকুমারী খিতিসার।
না বুঝিয়া কৈনু দোষ ক্ষেমহ সে সব রোষ
সেবকেরে করো প্রতিকার॥
শর্করাদি মধুপর্ক খণ্ড দধি কদলক
অজা মেষ মহিষ আপার।
পূজার স্থান করি পূর্ণ বস্ত্র অভরণ স্বর্ণ
নানা [১]দ্রব্য[১] কতেক প্রকার॥
নিজ মন পরিতোষে অঙ্গুরি যুগল বাসে
ব্রাহ্মণ বরিল নরপতি।
সম্ভ্রমেত সুবিধানে যজ্ঞ করে ব্রাহ্মণে
পদ্মা-পদে হুনিল আহুতি॥
ছাগল মহিষ মেষ বলিদান সবিশেষ
যজ্ঞস্থান রুধিরে তরঙ্গ।
চিত্ত মজাইয়া তথি স্তুতি করে নরপতি
পুলকে আকুল সর্ব অঙ্গ॥
তুমি জ্যোতির্ময়-স্রজা নিরঞ্জন-মহাতেজা
পরম [২]যোগিনী[২] আদি-মাতা।
দেব রিসি মহাজ্ঞানী সেবে তোমা তত্ত্ব জানি
রিদ্ধি সিদ্ধি নিধি বুদ্ধিদাতা॥ ১৩৫
অন্য অনুবন্ধ জুনি অন্যভাবে অন্য জানি
আত্ম ভাবি হরের নিলয়া।
পদ্মালয়া পদ্মভবা কালিদহে ব্যাপ্তি শোভা
জরৎকার [৩]মহা[৩] মুনি জায়া॥
অনাসে আপন কৃত বিশ্বম্ভর হর মৃত
জিয়াইয়া দিল বিষহরি।
করো মোরে পরিত্রাণ দ্বিজ বিপ্রদাস গান
ভক্তজনে রক্ষ নাগেশ্বরী॥

১ দির্ব (সু. সেন) ২ জুগিনি (ঐ) ৩ সু. সেনের সন্দিগ্ধ/প্রস্তাবিত পাঠ

১০

জমক ছন্দ

অনেক প্রকারে স্তুতি করে চাঁদো বাজা। নানা বিধি প্রকারে করয়ে পদ্মা-পূজা॥
পরম ভকতি পূজে মুনি জরৎকারা। পদ্মার তনয় পূজে অস্তিক-কুমার॥

অনন্ত তক্ষক বাসুকি মহারাজে। সঙ্ক পদ্ম কর্কট কদম্ব আদি পূজে॥ ১৪০
যতো নাগগণ পূজে সকল নাগিনী। নেতোর চরণে পূজে পদ্মার মন্ত্রিনী॥
নাগ পূজিবারে পুষ্প নাহি আটে শেষে। দাড়ি গোপ ছিঁড়িয়া পূজিলো অবশেষে॥
চাঁদোরে দেখিয়া তুষ্ট হইল বিষহরি। দেখা দিতে চাঁদোরে মোহনরূপ ধরি॥
নানা রত্ন অলঙ্কার পরি অঙ্গরাগে। কুমঃকুম কস্তুরি গন্ধ ধায় দশদিগে॥
বিচিত্র অম্বর পরি হৃদয় কাঁচুলি। কটাক্ষে মোহন-কাম মনসাকুমারী॥ ১৪৫
অজাগর সর্পে পদ্মা কৃতাসন করি। ফণী কাল বেকাল যুগল হস্তে ধরি॥
দুই ঘট শিরে দুই পদাঙ্গুলি দিয়া। নৃপতিরে দিল দেখা ঈষত হাসিয়া॥
দেখিয়া সম্ভ্রমে রাজা সম্মিল লোচন। সর্বাঙ্গ পুলকে অশ্রু পূরিলো লোচন॥
সদয়-হৃদয়ে দেবী বলে চাঁদো প্রতি। তোর অভীষ্ট [১]বর[১] মাগো নরপতি॥
[২]কর[২]-জোড়ে চাঁদো বান্যা বলে বিদ্যমানে। তন্ত্রমন্ত্র আদি যতো দেহ মহাজ্ঞানে॥ ১৫০
[৩]দারা[৩] পুত্র আমাত্য বান্ধব সহোদর। চির কাল করি রাজ্য চম্পক নগর॥
সদয়-হৃদয় দেবী কৈলা অঙ্গীকার। লখাই বেহুলা বিনে সকলি তোমার॥
তবে চাঁদো বলে কিছু জিজ্ঞাসিব বাণী। অযোনিসম্ভবা তুমি পাতালবাসিনী॥
ব্রহ্মাণী মনসা পদ্মাবতী নাগেশ্বরী। জরৎকার-পত্নী নাম পতি-মন্দদরী॥
বিষহরি জাগুলি বিখ্যাত ত্রিভুবন। মহাজ্ঞান দিলা যবে দেব ত্রিলোচন॥ ১৫৫
জনম পাতাল নাম পাতালকুমারী। নাগ-দান পাইয়া নাম হইল নাগেশ্বরী॥
যোগেশ্বরী পরমযোগিনী মন্দাকিনী। পর্বতে পার্বতী নাম পর্বতবাসিনী॥
তবে চাঁদো কর-জোড়ে করে নিবেদন। বহু নিন্দা কৈল মুঞিঙ এ পাপ বদন॥
মস্তক উপরে করো চরণপ্রহার। দোষ-নিন্দা এবে শাস্তি হউক আমার॥
দেখিয়া চাঁদোর স্তুতি তুষ্ট বিষহরি। মাগিল যতেক বর দিলা পূর্ণ করি॥ ১৬০
হাসি পদাঘাত কৈলা চাঁদোর মস্তকে। অন্তরীক্ষ হৈয়া দেবী রহিলে কৌতুকে॥
তবে রাজা যজ্ঞ পূর্ণা দিলেক বিধানে। যজ্ঞ সাঙ্গে দক্ষিণা দিলেক ব্রাহ্মণে॥
বর পায়্যা চাঁদো রাজা মনো-কুতূহলে। হাব্যাসে লইল চাঁদো লখিন্দর কোলে॥
হেনকালে বিষহরি বলেন বচন। দ্বিজ বিপ্রদাস বলে মনসা-চরণ॥

---

১ সু. সেন প্রস্তাবিত পাঠ ২ করো-(সু. সেন) ৩ আমাদের প্রস্তাবিত পাঠ

১১
ত্রিপদী

রথ-ভরে পদ্মাবতী কহেন বেহুলা প্রতি
শুন রামা পূর্বের বচন।
তিন [১]জন্ম[১] সেবো তুমি মুক্ষ বর দিবো আমি
তবে কেনে হও বিসরন॥ ১৬৫
তেজিয়া এসব মিছা মুক্ষ-পদ কর ইচ্ছা
সদাই অমর সঙ্গে মেলা।
সত্য আমি হই মুক্ত মায়াপাশে রুদ্ধযুক্ত
লোকে নিজ কায়া দিলা হেলা॥

দ্রবিদ এসব বোলে কাতরে বেহুলা বলে
ক্ষেণে অপসর করো তুমি।
প্রাণনাথ বিদ্যমানে বিশেষ বুঝায়্যা মনে
তোমারো সংহতি যাবো আমি॥
তবে ত বেহুলা সতী নিভৃতে ডাকিয়া পতি
বুঝাইলা সকল কারণ।
তিন [২]জন্ম[২] সেবা করি তুষ্ট কৈনু বিষহরি
মুক্ষপদ লভিব এখন॥
সদয় মনসা মাতা বিশেষ বুঝাই কথা
শুন প্রভু নিস্তার কারণ।
তেজি মিছে মোহ-মায়া বিশেষ মনসা দয়া
অবিলম্বে করহ গমন॥
লখিন্দরের সম্মতি বুঝিয়া বেহুলা সতী
বিদায় হইল পুরিজনে।
আপনার যত কথা সভেরে করিল তথা
ছাড়ি যাই সংসার বন্ধনে॥ ১৭০
মমতা ছাড়িয়া যায় উলটিয়া নাহি চায়
উপনীত পদ্মা বিদ্যমানে।
ধরিয়া দুহার হাথে মনসা তুলিলা রথে
আশ্চম্বিতে হইল অন্তর্ধানে॥
অন্তরীক্ষ রথে যায় বেহুলা নেহালি চায়
দেখিল বাপের অন্তঃপুরী।
করজোড়ে সুবদনী মনসা-চরণে ধরি
মায়া মোহ বলে সকাতরি॥
ক্ষেণেক বিলম্ব করো এই মোর বাপঘর
দেখি যদি দেহ গো মেলানি।
প্রভুর সংহতি যাব পরিচয় নাহি দিব
অবিলম্বে আসিব এখনি॥
বেথিত মনসা তথি রথ রহাইয়া ক্ষিতি
বিদায় দিলেন হরষিতে।
ছলিতে সাহের দেশ ধরিল [৩]যোগিনী[৩] বেশ
দ্বিজ বিপ্রদাস বিরচিতে॥

১. জর্ম (সু. সেন) ২ জর্ম (ঐ) ৩ জুগিনী (ঐ)

১২

ধানসি

সতী জাগো রে মাই। সাহের নগরে ভিক্ষা মাগে বেহুলা লখাই॥ ১৭৫
বেহুলা লখাই দোহে [১]যুগিনীর[১] বেশ। আচ্ছাদিলো শিরো পরে দীর্ঘ জটা কেশ॥

লাউয়া লাটী থাল ঝুলি দোয়াদশ করে। শ্রবণেতে কুণ্ডল বিভূতি কলেবরে।।
আগে চলে লখাই বেহুলা পাছে যায়। উজানি নগরে গিয়া পরবেশ হয়।।
কৌতুকে ভ্রমিয়া যায় প্রতি বাড়ি গলি। ভিক্ষা নাহি লয় কোথা যায় হাসি খেলি।।
প্রবেশে সাহের পুরি সানন্দিত মন। [১]সিংহনাদ[১] পুরিলেক ভিতর অঙ্গন।। ১৮০
অতি সুললিত বাণী সুমিত্রা শুনিয়া। হেম থালে ভিক্ষা লইয়া আইলো ধাইয়া।।
সুবর্ণের পঞ্চ কড়ি তথি পর লয়। দেখিয়া দুহার রূপ তথি মোহ যায়।।
লখাই বেহুলা দুহে [২]যুগিয়া যুগিনী[২]। হেথায় বঞ্চহ যদি কহি দ্রড় বাণী।।
সুবর্ণের থাল ভরি অন্ন দিব্য নিত্য। থাকহ হেথায় দুহে হইয়া হরষিত।।
ঝি জামাই ছিল মোর সর্পাঘাতে মৈল। তোমা দুহা দেখি সেই শোক উপজিল।। ১৮৫
মায়ের ক্রন্দন দেখি বেহুলা সুন্দরী। পরিচয় করিলা সুমিত্রা বরাবরি।।
বাপ ভাই বন্ধু যত বেড়ি চারিপাশে। ছুইয়া দিলেন কোল সুমিত্রা হাব্যাসে।।
বেহুলা বলেন মাতা বহু দুঃখ পাই। অমর ভুবনে গিয়া প্রভুরে জিয়াই।।
এই প্রভু লখাই বেহুলা আমি সেই। তিন [৪]জন্ম[৪] মুক্ষপদ মনসা সেবই।।
ইন্দ্রপুরি হইতে আমা দুহারে আনিল। পূজা হেতু [৫]জন্মাইল[৫] প্রভুরে দংশিল।। ১৯০
প্রভু লইয়া মনসা উদ্দিশে গেলেন ভাসি। নৃত্য কৈনু দেবপুরি সভে পরিতুষি।।
জিয়াইল প্রভু আর ছয় ত ভাসুরে। চাঁদোর বুহিত্র তুলি [৬]আনিলু[৬] দেশেরে।।
মৃতপুরী পাইয়া রাজা আনন্দ আপার। করিল পদ্মার পূজা বিবিধ প্রকার।।
মুক্ষপদ পাইয়া স্বর্গে যাই পুনর্বাব। বিদায় হইয়া দুহে সভার গোচর।।
চলিল মমতা ছাড়ি পরিচয় হইয়া। মায়া-মোহে যায় সভে পশ্চাতে গোড়াইয়া।। ১৯৫
উপনীত হইল গিয়া মনসা গোচর। হাতে ধরি তুলিলা দুঁহারে রথ-পর।।
রথ চালাইয়া দিল তুরিত-গমন। চক্ষের নিমিষে গেলা ইন্দ্রের ভুবন।।
[৭]অনিরুদ্ধ[৭] উষা দিলা ইন্দ্র বিদ্যমানে। মনসা পূজিল ইন্দ্র বিবিধ বিধানে।।
সুরপতি ডাকি আনে যতো বিদ্যাধর। মরতের পাপ যতো করিব বিচার।।
সত্বরে অমরপতি করিল পয়ান। [৮]অনিরুদ্ধ[৮] উষা লইল পরীক্ষার স্থান।। ২০০
পঞ্চহস্ত পথ রাজা কৈল খুর-ধার। সকল দেবতাগণ ধর্ম অবতার।।
[৯]অনিরুদ্ধ[৯] উষা প্রতি করিল আদেশে। অক্লেশে বহিয়া পথ এড়ায় হরিষে।।
প্রবীণ পাথর বান্ধি দুহার কাঁকালে। ফেলিল বাঁধিয়া দুহে অগাধ সলিলে।।
মনসা চিন্তিয়া দুহে ভাসি লাগে কূলে। জৌর মন্দির আর কৈল হেনকালে।।
দুহা বসাইয়া তাহে দিলা হুতাশন। তথিতে নিস্তার পাইল মনসা কারণ।। ২০৫
দেব [১০][তা সকল তবে][১০] প্রশংসে বিশেষে। [১১]দুন্দুভি[১১] বাজায় পুষ্প বরিষে আকাশে।।
পূর্বমত নিজ কার্যে রহে দুই জন। মনসার ব্রতকথা শুন সর্বজন।।
যেই জন শুনে ভনে পদ্মার মঙ্গল। ধন পুত্র [১২]পরমাই[১২] বাড়য়ে কুশল।।
সদাই ভকতি যেবা গায় বা গাওয়ায়। মনসা সহায় তারো নাহি সর্পভয়।।
ইন্দ্ররাজ বলে শুন দেবী বিষহরি। কেমনে তোমার পূজা হইল মর্ত্যপুরী।। ২১০
সব কথা কহে দেবী ইন্দ্র বিদ্যমান। পদ্মার মঙ্গল দ্বিজ বিপ্রদাস গান।।

১ জুগিনীর (সু. সেন) ২ 'শৃঙ্গপাদ' হলে ঠিক হত ৩ জুগিয়া জুগিনী (সু. সেন) ৪ জর্ম (ঐ) ৫ জর্মাইল (ঐ) ৬ আসিনু (ঐ) ৭ অনিরুদ্র (ঐ) ৮ অনিরুদ্ধ (ঐ) ৯ অনিরুদ্র (ঐ) ১০ 'তা সকল তবে' অংশটি সু. সেন প্রস্তাবিত ১১ দুন্দধবি (সু সেন) ১২ পরোমাই (ঐ)

১৩

অষ্টমঙ্গলা

জয় জয় বিষহরি জগত-ঈশ্বরী। যাহার স্মরণে মহা সঙ্কটেতে তরি॥
শুন রে অবুধ লোক হইয়া এক-মন। অষ্টমঙ্গলা কহে ইন্দ্র বিদ্যমান॥
চরাচর আদি যত আছয়ে ব্যাপিত। রচিতে না পারে মোর মহিমা চরিত॥
তপ করে মহেশ দেখিতে নিরঞ্জন। [১]জন্মিল[১] পাতালপুরী তাহার কারণ॥ ২১৫
রুদ্র বিষ্ণু পিতামহ ত্রিগুণ শরীর। সবে এক সত্য সেই নিরঞ্জন থির॥
পূর্বেতে গন্ধর্বসুতা ছিলো অবস্থিত। কুসুম কারণে রামা হইল উপনীত॥
তথা হরো অবিচারে কন্যারে ধরিয়া। শৃঙ্গার করিল সুখে আনন্দিত হইয়া॥
অনাচার ভাবি কন্যা [২]শাপ[২] দিল তারে। বিষ খাইয়া ঢলে শিব ক্ষীরোদের তীরে॥
ক্ষীরোদ-মথনে যতো অমৃত উঠিব। সর্ব দেবগণ তাহা হরিষে ভক্ষিব॥ ২২০
উঠিব বিষম বিষ দ্বিতীয় মথনে। তাহা খাইয়া অচেতন হবো ত্রিলোচনে॥
তথা নিরঞ্জন হবো হরের দুহিতা। তোমার জীবনে তেই করিব বঞ্চিতা॥
[৩]শাপ[৩] দিয়া সেই কন্যা গেলো নিজ স্থানে। দৈবের ঘটন কভু না যায় খণ্ডনে॥
তত্ত্ব জানি কালিদহে হর-বীর্য টলে। সেই মহাবীর্যে আনি [৪]জন্মিল[৪] পাতালে॥
পিতা মহেশ্বর সঙ্গে আইল তার পুরে। স্থান করি দিলা মোরে সিজুয়া শিখরে॥ ২২৫
[৫]ব্রহ্ম-শাপে[৫] গেলা লক্ষ্মী ক্ষীরোদ-ভুবনে। বিমোচন হইলা লক্ষ্মী সাগর-মথনে॥
গরল ভক্ষিয়া ঢলে দেব ত্রিলোচন। সত্বরে আসিয়া আমি করানু চেতন॥
পাণ্ডু বংশে পরীক্ষিত মৈল সর্পাঘাতে। মহাযজ্ঞ করে [৬]জন্মেজয়[৬] তার সুতে॥
তক্ষক সহিতে তোমা হুনিল আহুতি। অস্তিক কুমার শীঘ্র পাঠা[ই]নু তথি॥
পুটে মাঙ্গিয়া লইল হাথের আহুতি। সর্প সহ যজ্ঞনাশ পায় অব্যাহতি॥ ২৩০
জগতির পূজা প্রচারিনু মায়া-অবতারে। প্রথমে রাখালগণে পূজিল আমারে॥
হাসন-হুসেন রাজা পূজে তার পরে। তথা হইতে প্রচারিনু ঝালু-মালু ঘরে॥
স্বর্ণ বিষ্টি অনেক করিনু তার পুরী। তদুপরে লইনু চাঁদোর জ্ঞান হরি॥
সঙ্ক ধন্বন্তরি বধি ধনা-মনা শিষ্য। মারিলাম চাঁদোর পুত্র অন্নে দিয়া বিষ॥
তিন [৭]জন্ম অনিরুদ্ধ উষা[৭] সেবে মোরে। ইন্দ্রসভা হইতে [৮]জন্মাইনু[৮] মর্ত্যপুরে॥ ২৩৫
পাঁচ মাস গর্ভ হইল সনকা যখন। কপটে নৃপতি চাঁদো পাঠানু পাটন॥
মনো ভোলে চাঁদো রাজা রহিল তথায়। স্বপ্ন দেখাইয়া তারে আনি কালিদয়॥
ভাসাইয়া নৃপতি ডুবাই মধুকর। ছয় মাস ভাসে চাঁদো সলিল ভিতর॥
কূলে তুলি পুনরপি নানা ক্লেশ দিয়া। দেশে নৈল নরপতি হৃদয় ভাবিয়া॥
লখাই বেহুলা হৈল দুই জনে বিয়া। বেহুলা ছলিল মুই সরোবরে গিয়া॥ ২৪০
অহঙ্কারে চাঁদো বেন্যা লহ-ঘর কৈল। বিভারাত্রে লখিন্দর সর্পাঘাতে মৈল॥
বেহুলা মাজষে ভাসি মৃতপতি লৈয়া। আমার নিকটে স্বর্গে উত্তরিল গিয়া॥
নানা রঙ্গে বেহুলা মোহিনী নৃত্যগীতে। লখিন্দর জিয়াইয়া দিলাম ত্বরিতে॥
বেহুলার ছ ভাসুর দিলাম জিয়াইয়া। কালিদয়ে সপ্তডিঙ্গা দিলাম তুলিয়া॥
সাত ডিঙ্গা ধনে পূর্ণ মৃত-পুরি লইয়া। দেশেরে বেহুলা গেল হরষিত হইয়া॥ ২৪৫
মৃত-পুরি পাইয়া রাজা হরিষ-অন্তর। করিল আমার পূজা বিবিধ প্রকার॥
লখাই বেহুলা দুহে রথেতে তুলিয়া। তব স্থানে ইন্দ্র রাজা দিলাম আনিয়া॥

তিন জন্ম সেবিয়া করিব বিঘ্ন নাশ। উদ্ধারিয়া দুহারে আনিনু স্বর্গবাস॥
শুনিযা দেবের রাজা হরষিত মন। অশেষ প্রকারে কৈল পদ্মার পূজন॥
তুষ্ট হইয়া বিষহরি রথে কৈল ভর। উত্তরিলা নিজ স্থানে সিজুয়া শিখর॥ ২৫০
এ সব সম্পূর্ণ কথা শুনে যেই জন। ধন-জন বৃদ্ধি হয় বিঘ্ন বিনাশন॥
সর্প হইতে কভু তার না হয় বিনাশ। ইহকালে সুখে বঞ্চে মৈলে স্বর্গবাস॥
কদাচিত ইহাতে সন্দেহ কিছু নাই। তরিবে এ ভবসিন্ধু ভজ মহামাই॥
যে জন পদ্মার ব্রত গায়ে বা গাওয়ায়। সর্বক্ষণ বিষহরি তাহার সহায়॥
গায়েন বায়ান শেষে মাগিয়ে লয় বর। তব পদে ভক্তি যেন রহে নিরন্তর॥ ২৫৫
যাহার কল্যাণে গো তোমার ব্রত গাই। মনোনীত বাঞ্ছা পূর্ণ করিবে সদাই॥
এই ত আসর মধ্যে আছে যত জনা। আপনি করহ পূর্ণ সবের কামনা॥
এই তো গ্রামের মধ্যে বৈসে যত লোক। কদাচিত নহে যেন কোন দুঃখ শোক॥
হরি বল সর্বজন চল নিজ পুরে। মনসামঙ্গল গীত সাঙ্গ এত দূরে॥
দ্বিজ বিপ্রদাস বলে করিয়া প্রণতি। পরলোকে হয় যেন তব পদে গতি॥ ২৬০

---

১ জর্মিল (সু সেন) ২ সাঁপ (ঐ) ৩ সাঁপ ৪ জর্মিল (ঐ) ৫ ব্রহ্ম-সাঁপে (ঐ) ৬ জর্মেজয (ঐ) ৭ জর্ম অনিরুদ্র উষা (ঐ) ৮ জর্মহিনু (ঐ)

॥ ইতি মনসার অষ্টমঙ্গলা গীত সমাপ্ত ॥

অপ্রচলিত শব্দসূচী

(অর্থ ও প্রয়োজনবোধে উৎস নির্দেশ-সহ)

অ

অকান্দ ক্রন্দন : অসম্ভব কান্নাকাটি ১২. ৩০. ৩৮৯

অক্ষহিন : অক্ষৌহিণী, অসংখ্য ৪. ২০. ৪১৯

অক্ষেমা : বেদনার্ত হওয়া ১. ২২. ৩১৫

অজু : জল সিঞ্চন, মুখে, কানের পাশে, পবিত্র হবার জন্য ৪. ১৯. ৪১১

অতিদান্ত : অতিদানী ৫. ৯. ১৭৫

অতিসে : অতিশয় ২. ১৫. ২৫০

অনাস : অনায়াস ১৩. ৯. ১৩৭

অন্তরীক্ষ : নিরাকার ৬. ১২. ২২৮

অনুমতি : অনুরোধ ১২. ৪৩. ৫২৭

অনুমান : আভাস ৭. ৫. ৬৫

অনুসার : ১ বিধিবদ্ধ কাজ ৬. ৫. ১০৫
২ অনুদার (?) ৮. ২. ৪৩

অপছর : অপসরা ৮. ১১. ২১৪.২. ১০. ১৭২, ৫. ৮. ১১৪

অপছরা : অপসরা ২. ১৩. ২৩২

অপসর : অবসর ১৩. ১৩. ১৬৭

অপস্বর : অপসরা ১২. ৪৭. ৬২৩

অপরূব : অদ্ভুত ৭. ১০. ১৪১

অবতার : জন্মদান ৭. ৪. ৪৯

অবস্থিতা : অবিবাহিতা ১১. ৫. ৬৬

অবিশাল : অত্যন্ত বড় আকারের ২. ১৩. ২২৯, ১০. ১১. ১৬৫, ৪. ১৬. ৩৫৫

অরিষ্ট গাই : মন্দ, অকল্যাণকর গাভী ৪. ১৪. ৩০৫

অসচ্য : অনেক, জমা করা ১০. ১. ৮

অসোচ্য : যে গরু দোহা যায় না ৪. ১৪. ৩১২

আ

আইয় : এয়োতি, বিবাহিত মহিলা ৬. ১০. ১৮৭

আওয়ারি : ১। পাড়া, জমাটবদ্ধ বসতি, পল্লী ৫. ৮. ১২৪
২। পৃথক, স্বতন্ত্র, বাসযোগ্য ৪. ৭. ১২৯

আকান্দ ক্রন্দন : অসম্ভব কান্না ১. ২২. ৩১৩

আক্ষেমা : বেদনার্ত ২. ৪. ৬৫

আখণ্ড : অখণ্ড ১২. ৩২. ৪০১

আগুসার : অগ্রসর হওয়া ৮. ১. ২৫.৬. ৫. ১০৩

আঘিরা : ঘিরে ধরে, উঁচু করে তুলে ১৩. ৮. ১১৫

আচ্ছাদিলো : আচ্ছাদন দিলো ১৩. ১২. ১৭৩

√ আজ্জ, √আজ্জি, আজ্জিল, আজ্জিলেক : মাটিতে পুঁতে ফেলা, বপন করা, বপন করলেন ১২. ৩৭. ৪৭৪

আড়কাটা : আড়াআড়ি রাখা খুটি ১২. ১. ৯.

আড় কাঠা : আড়াআড়ি দেওয়া কাঠ ৫. ৮. ১১৯

√ আড়া, আড়াইল : এলোমেলো হওয়া, হল ৮. ৫. ১২৩

আতব : আতপ, রৌদ্র ১০.১২. ১৯৫

আতান্তর : দুর্ঘটনা ৮. ৮. ১৫২

আদ্য : প্রাচীন কথা, পুরাকথা ১২. ৩. ৪০৯

আন : অন্য কেউ ৮. ৮. ১৫৮

আনল : অগ্নি, অনল ২. ৫. ৯৭

আন্দোল : আন্দোলন ২. ১৩. ২২৯

√ আপস্যা, আপস্যায়া : এলেমেলো বিস্রস্ত হওয়া, হয়ে ৭. ১০. ১৪৮,

আছাড় দেওয়া ১২. ১৩. ১৬০

আপস্তায়্যা : হাহাকার করে ১২. ৩৮. ৪৯২

আপার : অপরিমিত ২. ৮. ১৪২

আরতি : আগ্রহ ৮. ২. ৪৭

আরাম্ভ : ১। ফণা তুলে সারি দিয়ে দাঁড়ানো ৯. ৬. ৭০,
২। ঘনঘটার সময় ৯. ৫. ৫৬

আসিকা : এক ধরনের পিঠে ১০. ১. ৬

আহিঙ্কা : গভীর আসক্তি, আকাঙ্ক্ষা ১০. ৯. ১২৩

আঁটু-চাকি : হাঁটুর গোলাকার হাড়/মজ্জা ১২. ৫২. ৭০৩

ই

ইজার : অন্তর্বাস, পাজামা ৪. ১৬. ৩৬১

উ

উধা : উর্ধ্বপথে যাওয়া ১২. ৪১. ৫০৪, ১২. ৫২. ৭১৯

উজ্জোগ : উদ্যোগ ৩. ১২. ১৬০

উথল : ১ উথলে ওঠা ১১. ১০. ১৫৬, ২ ঢেউ ওঠা ১৩. ৭. ৭১

উপসন : হাজির হওয়া ১১. ১০. ১৩৪

উভরড়ে : মাথা উঁচু করে পালায় ৩. ২. ২১

উভরায় : উপরের দিকে দৃষ্টি দিয়ে ৫. ৪. ৩৯

উভাল : খোঁজখবর করা ১২. ৪১. ৫০৮

উভালে : কাছে ১২. ২৩. ৩০৩

উর : উপস্থিত হও ৪. ১৩. ২৭০

√ উল, উলিল : উগরে ফেলা, বমন করা, বমন করে ফেলল ১০. ২০. ৩৪৫

উলি : বিশেষভাবে হাঁটা ১২. ১১. ২৮০

উড়িয়া বিহগ : উড়ন্ত পাখি, উড়িষ্যা দেশী (?) ৯. ৮. ১১০

উশ্চরায় : উচ্চস্বরে ১২. ৩৮. ৪৯৯

উসারিয়া : উর্ধ্বশ্বাসে পালানো ১০. ১৮. ৩১৫

এ

একু : এক ১২. ৪৬. ৬০২

একেশ্বরী : একাকিনী ২. ১৫. ২৬৫

এথা, এথারে : এখানে ১০. ১৮. ৩১৪

এনাম : পুরস্কার ৪. ১৮. ৩৯৭

এমু : এখনও ১০. ১১. ১৬২

√ এড়, এড়িল : পাশ কাটানো, পাশ কাটাল ১. ৪. ৯০

ও

ওক্ত : সময় ৯. ৩৩১

√ ওল, ১ ওলাইল : ভাসানো, ভাসানো হল ৭. ৩. ৪৪

২ লায়ে : ছড়িয়ে, সাজিয়ে ৬.৫.১০১

৩ ওলে : ডুবদের ১০. ১৫. ২৭০

ওলোনা : পেট ১২. ৪৪. ৫৫৯ সুকুমার সেন অর্থ প্রদান করেছেন— 'suspended weight or bulk.' সঙ্গতি রক্ষা করা কঠিন।

কঙ্ক : সামুদ্রিক পাখি বিশেষ ৭. ১১. ১৭০

√ কথ, কথে : বলে ৫. ১০. ১৯৪

কথুধার : বিছানার পাশ ১২. ২৩. ২৯৩

কপিনাস : (= কপিলাস) বাদ্যযন্ত্র বিশেষ ৩. ১৪. ১৮৩, ৪. ২০. ৪২৫

করনাল : বাদ্যযন্ত্র ৩. ১৪. ১৮২

করণ : জল, বিশ্বমূল সত্তা, কারণ ১. ৬. ৯৫

করা : পাত্র ৫. ৭. ৭৬, সু. সেন প্রদত্ত অর্থ— নারকেলের মালা 'coconut shell used as bowl by mendicants.'

কাক : কাঁখ, কোমর ৪. ১৪. ২৭৭

√ কাছ, কাছিল : বেশ ধারণ, বেশধারণ করল ১২. ৪৭. ৬৩৩

কাণ্ডার : মাঝি ৮. ১৯. ৩০৪

কাতি : কাটারি ১২. ১৯. ২৫০

কাথ : গৃহের পার্শ্বপ্রাচীর ২. ১. ৫

কান : কৃষ্ণ ১২. ১১. ১২২

কাপ : ভান, অভিনয়, ছলনা ৮. ৬. ১৩৯

কামান : ধনুক ২. ২. ১৯, ৫. ১৩. ২৭৫

কামিলা : অস্থায়ী কর্মী ১২. ১. ১৩

কাড়া : বাদ্যযন্ত্র বিশেষ ৪. ২০. ৪২৫

কালজা : হৃদপিণ্ড ৫. ১. ৫

কালিনিশা খিনি : সঙ্কীর্ণ কালরাত্রি, যে রাত্রে মিলন নিষিদ্ধ ১২. ২৮. ৩৫০

কাহাল : বড় মাপের ঢাক জাতীয় বাদ্যযন্ত্র ৫. ৯. ১৩৯

কাঁক : এক বিশেষ ধরনের সামুদ্রিক পাখি, যারা বিষ নামাতে পারে বলে মধ্যযুগে লোক-প্রসিদ্ধি ছিল। ১২. ৫২. ৭২১

কাঁকলাস : কৃকলাস, কাঁকড়া ৫. ২. ১৯

কাঁচি : কাস্তে ১০. ১৭. ৩০২

কুড়া : কুড়ো, ধানের বর্জ্য, অবশেষ, ১২. ৯. ৯১

কুড়ুমা : ধর্মীয় জমায়েত ৪. ১৮. ৩৭৯

√ কুপ, কুপি : ক্ষুব্ধ হওয়া, হয়ে ৪. ২৩. ৪২৫

কুবিরক : সাধারণ সৈন্য ১২. ১৭. ২৩২

কুরল : এক বিশেষ ধরনের সামুদ্রিক পাখি ৭. ১১. ১৬৯

√ কুরল, কুরলিলা : আঁচড়ানো, আঁচড়াল ৩. ১৫. ১৯৪
কুগুড়ি : কুয়াশাচ্ছন্নতা, অন্ধকার হয়ে আসা, দৃষ্টিবিভ্রম হওয়া ৭. ১০. ১৩৯
কোড়া : জলের পাখিবিশেষ ১১. ৬. ৮৬
কোরণ্ড : অণ্ডকোষ ১২. ৪৪. ৫৫৮

খণ্ডব্রত : বিধিমতো করতে না-পারা ব্রত, অসম্পূর্ণ নিষ্ফল ব্রত ১২. ৩২. ৪০১
খর : খচ্চর ৫. ১. ৭
খলিফা : প্রকৃত ধর্মবেত্তা ৪. ১৯. ৪১১
খাপর : থালা ৯. ৯. ১২৭
খাঁখার : নিন্দার্হ হওয়া, হল ৩. ১৬. ২১০
খিন : সরু, ক্ষীণ ৬. ৪. ৯৩
খিরদ : ক্ষীরোদ সাগর ২. ৩. ৪২
খিরপুলি : পিঠে বিশেষ ১০. ১. ৬
খুড়ি : কাকিমা ৬. ৮. ১৪৫
খুনি : ক্ষৌমবস্ত্র ৬. ৪. ৯৩
খুরা : ছোটপাত্র— মুখের দিক প্রশস্ত ১২. ৯. ৮৯
খেউর : ক্ষৌরকর্ম ৩. ১৩. ১৭১
√ খেদাড়, খেদাড়িয়া : তাড়ানো, তাড়িয়ে ৪. ১. ৪
খেয়ারি : খেয়া পারাপারকারিণী, কারী ; তার বৃত্তি ১. ১৩. ১৬৭
খোম : ক্ষৌমবস্ত্র ৯. ৯. ১২৬
খোসাল : খুশিয়াল ৪. ১৬. ৩৬০
√ গজ, গজি : প্রসাধন করা, করে ২. ২. ১৮
গঠি : গড়ে ১১. ১০. ১৫২
গাথর-চাকর : বিশ্বস্ত চাকর— সামগ্রী গোলাজাত করার জন্য নিযুক্ত বিশেষ দক্ষতাসম্পন্ন কর্মী ৯. ৯. ১৩৩
গাড়র : ১ ভেড়া ৭. ৪০. ৫০, ২ গণ্ডার ১২. ১৩. ১৬৩
√ গার, গারি : অস্বীকার করে, ধ্বংস করে, এড়িয়ে ৫. ১২. ২৫১
গারুড়ী : ওঝা ৬. ১. ৪৭
গাহুল : বাদ্যযন্ত্র ১২. ১১. ১০১, ৫. ১. ৮
গাহুল-বহুল : ধ্বজাবাহী সৈন্যবাহিনী ৪, ২৪, ৫৪৯
গুনা : পাপ ৫. ২. ২৫, ৪. ১৯. ৪১০
গুরি : কন্যা ৩. ১৩. ১৭৫
গোছল : স্নান ৫. ৭. ৬৩
√ গোড়া, √ গোড়, গোড়ায়্যা : দুঃখের সঙ্গে মাথা নিচু করা, করে যাওয়া ১২. ৩. ৪৯০
গোড়ানি : পায়ের জল মাড়িয়ে দেওয়া , ১১. ৮. ১০২,
√ গোয়া, গোয়াই : কাটানো, কাটাই ১৩. ৪. ৩৬
√ গোঁয়া, গোঁয়ায় : কাটানো, কাটায় ৯. ২. ২০
গোরি : কন্যা ১২. ১১. ২৭৬,

ধ
ধক : বিশেষ পদ্ধতিতে সাজানো ১২. ১০. ৯৪

ঘ
ঘা : আঘাত, ক্ষত ১. ২. ১৮
ঘাই : গর্ত খুঁড়ে ৮. ১. ২৮
ঘুমালি : নিদ্রাচ্ছন্ন করার মন্ত্র ৮. ৩. ৭০
ঘোটা দড়ি : মন্থন করার দড়ি ২. ১২. ২১৭

চ
চরখি : বাজি বিশেষ ১২. ১১. ১০০
√ চাক : পরিবেশণ করা ; ছালন চাকিবে ৫. ৩. ২৮
চাচর : সুবিন্যস্ত ১. ১৩. ১৫৭
চাচা : কাকা ৫. ৪. ৪০
চার : ছানা ১২. ৪০. ৫০১
√ চাহ, ১ চাহে : দৃষ্টিপাত করে ৭. ১০. ১৫৭
২ চাহে : খুঁজে ৬. ১৪. ২৭০
√ চিয়া, চিয়াইয়া : বিশেষ সস্নেহ সম্ভাষণ, করে ৩. ৪. ৪২
চিয়ায় : ডেকে তোলা, ডেকে তোলে ৬. ১৫. ২৭৩
চির : ছিন্ন, খণ্ড ১. ২০. ২৭৪
চুপড়ি বিয়নী : চুপড়ি ও পাখা, ডোমদের তৈরি বিক্রয়যোগ্য পসার ১৩. ২. ১৯
চুর : চূর্ণ ২. ৭. ১৩৩
চেরাগ : প্রদীপ ৪. ২১. ৪৩০
চেঙ্গড়া : চ্যাঙ্গারি, ঢ্যারা ৭. ৫. ৬১, ১১. ১. ১৬
চোঙ্গদার : শিঙ্গাবাদক, কামানবাহী সৈনিক (?) ৫. ১. ৮, ১২. ২৮. ৩৫৯

চোপা : কলাগাছের বাকল ১০. ১৩. ২৫৩

চোরা গাই : যে গাই অন্যের ফসল, শস্য, চুরি করে খায় ২. ২. ৬০

চৌতারা : চত্বর ১৩. ৩. ২৮

ছ

ছটী : ছোটী, ছোট বউ ৪. ১৭. ৩৬৯

ছড় : ক্ষত, ছড়ে যাওয়া ৩. ২. ১৬

ছড়ি : (বাঘ) ছাল ৩. ৪. ৪৬

ছয়ানি : ছাদনাতলার কাজ অর্থাৎ বিবাহ ১২. ১৮. ২৪৭

ছা : বৎস, শাবক ২. ৭. ১৩৫

ছাওনি : চালায় দেওয়া আচ্ছাদন ৫. ৮. ১২১

ছাদনা : বিবাহমঞ্চ ৩. ১২. ১৬৩

√ ছান্দ, ছান্দিয়ে : বেঁধে, দৃঢ়ভাবে বেঁধে ৪. ১৪. ৪০৯

ছালন চাকিবে : খাবর পরিবেশণ করবে ৫. ৩. ২৮

ছায়নি : ছাউনি ২. ১. ৬.

ছিটানি : গৃহের অংশ, ছটাকিনি ১২. ১. ৬. ঝুলিয়ে দেওয়া সামগ্রী ৫. ৮. ১১৭

√ ছুই, ছুইয়া : নির্মঞ্ছন করা, করে ১৩. ১২. ১৮৭

ছেই : ছই, ছাউনি ৪. ২৪. ৫৩৭

ছো-আঁকড়া : মাঙ্গলিক, নির্মঞ্ছন বস্তু ১২. ৯. ৮৯

ছোড়ান : ছাড়া পাওয়া ১. ২০. ২৬৮

জ

জবাব : নিষেধবাক্য, উপদেশ ৫. ১. ৫. দ্বন্দ্ব, ঝগড়া ৫. ৩. ২৮

জয় নেত : জয় চিহ্নযুক্ত কাপড়— আঁচল, পতাকা ৬. ২. ৭৬

জাগ : যজ্ঞ ১. ১৯. ২৫৯

জাঙ্গাল : কাড়িয়া জাঙ্গাল : বাঁধ, শক্ত উঁচু বাঁধ ১২. ২৩. ৩০৮

জাঠা জাঠি : একজোড়া লাঠি—একটি বড় অন্যটি ছোট, যখন যেটি প্রয়োজন—ব্যবহার্য, অস্ত্রবিশেষ, ৪. ২৩. ৪৯৬

জাদে : অনেক, অজস্র ৬. ৯. ১৫৮

√ জাবড়া, জাবড়ায়্যা : মিশ্রিত করা, মিশ্রিত করে ৪. ৮. ১৪২

জালে : জ্বালায় ৩. ২. ৩১

√ জী, জীয়ে : বাঁচা, বাঁচে ৫ ৭. ৮৭

√ জুক, জুখ, জুখিয়া : মেপে দেওয়া ৩. ১০. ১৩০

জুতি : জ্যোতি, আলো ১২. ২৯. ৩৭৮

জুঝার : যোদ্ধা ৫. ১. ৭

জুনি : জন্য ১৩. ৯. ১৩৬

জৌ : জতু, গালা ; জৌর মন্দির : জতুগৃহ ১৩. ১২. ২০৪

ঝ

ঝাট : শীঘ্র ৩. ৭. ৬৯, ৩. ৭. ২১৭, ৪. ১১. ২৩৪, ৫. ১১. ২৪৫

ঝাপান : মঞ্চ, সুকুমার সেন বলেছেন palanquin, নাগ-বিদ্যা প্রদর্শনের ঝাঁপান পাল্কি নয়। ৭. ৬. ৭৭

ঝি : কন্যা ১২. ২৫. ৩১৮

ঝুট, ঝুটে : শিরদেশ, শিরদেশের চুল, শিরদেশে ২. ৭. ১২৬, ১২. ৪৪. ৫৫৯

ঝুর : নষ্ট ১. ১৩. ১৭৯

√ ঝুর, ঝুরে : আবেগার্ত হওয়া, হয় ৫. ৮. ১২১

ঝুসি : নষ্ট ১. ১৩. ১৭৯

ঝুটা : এঁটো, নষ্ট ১০. ১৮. ৩১৩

ট

টানা দাড়ি : মন্থনের সময় টানার জন্য দড়ি ২. ১২. ২১৮

টোকা : তালপাতার ছাতা, টুপি, শিরস্ত্রাণ ১০. ১৭. ৩২

ঠ

ঠমক : বাদ্যযন্ত্র ৪. ২০. ৪২৫

ঠাট : দলবদ্ধ ৪. ৭. ১২৬

ঠাটপাট : বিলাস ব্যসন, দলবল, সৈন্যবাহিনী ১০. ১২. ১৯৫

ঠান, ঠানে : ভঙ্গি, ভঙ্গিতে ৬. ৪. ৯২
ঠাম : স্থান ১২. ১৬. ২২

ড
ডম্বুর : ব্যাঘ্রশাবক ২. ৫. ৭৯
ডাবর : পাত্র ১২. ১২. ২৮৪
ডিঙ্গর : বয়স্ক ১২. ১১. ১১৪
ডিডিম : বাদ্যযন্ত্র বিশেষ ৩. ১৪. ১৮২
ডুমুনি : ডোমনী, ডুমনী ১. ১৩. ১৮৪

ঢ
ঢ্যামনা-ভাতারি : নপুসংক স্বামী যার, কুৎসিত গালাগাল ৪. ২০. ৪২৪
ঢেকা : ধাক্কা ১০. ১৩. ২৩৮

ত
তইকা, তৈকা : মুসলমানী টুপি ১০. ১৮. ৩১২, ৩১৫, ৪. ২০. ৪২৯
তঙ্কা : টাকা ৯. ২. ১০
তছলিম : ১ নমাজ, প্রার্থনা ৯. ৩. ৩১ ২ প্রণিপাত ৪. ১৬. ৩৫২
তজবিজ : পরীক্ষা-নিরীক্ষা ৪. ১৯. ৪০৯
তবক : অলঙ্কার ২. ১৫. ২৪৯
তমু : তবু, তা সত্ত্বেও ১. ২০. ২৬৭, ৮. ১. ৩
√ তর্ছ, তর্ছিয়া : তর্জন, তর্জন করে ৭. ১৩. ১৯৫
তাতিয়া চুপড়ি : তাঁতিদের ব্যবহার্য ঝুড়ি ১১. ৭. ৯৮
তামাম : সমস্ত ৪. ১৮. ৩৮০
তাম্ব : তাম্র ২. ৯. ১৫৯
তাল : গৃহের অংশ ১২. ১. ৬
তাল চাকা : একরকম পাখি ১২. ১৪. ১৯০
তিত, তিতে : ভেজা, ভেজে ৪. ৫. ১০১, ৪. ৫. ১০৪
তিলাট : ছাউনির দুপাশের কোনাকার বিন্দু ১২. ১. ১০, ৫. ৮. ১২০
তিহড়ি : তিন ঝিকওয়ালা উনুন ১২. ২৬. ৫৩৭
ত্রিষাম্পতি : ইন্দ্র ১২. ৩৩. ৪০৭
তুড়ুক : তুর্ক ৪. ১৬. ৩৪১
তুবড়ি : বাজিবিশেষ ১২. ১১. ১০০
তুরিত : ত্বরিত, শীঘ্র ১৩. ৮. ১০৫,
তুরিতে : ত্বরিতে ১. ১১. ১৪১
তুয়া : তোমার ৮. ১৪. ২৪৬
তেনো : তেমনি ১০.১৪. ২৬৩
তেপতিয়া : পুরোন দিনের খেলা, শিশুদের ১০. ৫. ৭৬
তৈনাত : তয়নাত, জড়ো করা ১২. ১০. ৯৭
তোবা : ধিক্কার দান ৪. ২১. ৪৫৫

থ
থানা : অস্থল, আস্তানা ৪. ১৬. ৩৫১
থোতা : তোতলান ১২. ৪৪. ৫৫৮

দ
দগড় : বাদ্যযন্ত্র বিশেষ ৪. ৬. ১৮
দড়মসা : বাদ্যযন্ত্র বিশেষ ৪. ৬. ১৮
দণ্ডপাট : রাজাধিকার ১১. ৪. ৫৩
দরক্ত : গাছ ৪. ১৬. ৩৫১
দরবেশ : মুসলমান ধর্মনেতা ১০. ১৮. ৩১৪
দহশত : ভয় পাওয়া ৪. ১৮. ৩৮২
দাওন : প্রসব পূর্বে প্রসূতির নির্দিষ্ট আসন, বসার ভঙ্গি ১০. ২. ৩৩
দাপ : দর্প, অহঙ্কার, আস্ফালন ১২. ১০. ৯৩
দিদার : দেদার, প্রচুর ৪. ১৭. ৩৭৪
দীয়টি : দীপযুক্ত দণ্ড, দীপবর্তিকা ১২. ১১. ১০২
দুগ্ধচুষি : পিঠেবিশেষ ১০. ১. ৬/৭
দেখসি : দেখো ১. ২২. ৩০৬
দেহারা : দেবগৃহ, মন্দির ৯. ৬. ৭৬
দেয়ান : দেওয়ান, রাজপাত্র ১২. ১০. ৯৪
দৈস্য : দস্যু ১০. ১৬. ২৮১
দৈত্যসুই : দৈত্যসূয় (রাজসূয়-র স্বার্থে) ১. ৬. ১০১
দোয়াদশ : আশা বাড়ি, ফকিরদের ব্যবহৃত লাঠি ১৩. ১২. ১৭৭
দোহাড়ি : মাছ ধরার বাঁশের ফাঁদ ৮. ১. ২৮

ধ
ধামনি : পতিহন্তা স্ত্রী, পতিতার তুল্য স্ত্রী— ৪. ২০. ৪২৪

ধুসরি : বাদ্যযন্ত্র ৪. ২০. ৪২৫
ধূর্ম : ধোঁয়া ৬. ১৭. ৩২৮

ন

নছাব : প্রার্থনা ৪. ১৯. ৪১০
সুকুমার সেন প্রদত্ত অর্থ 'announcement of one's lineage' 'রুজু করি করয়ে নছাব'-এর নছাব ঈশ্বরের নাম ঘোষণা হওয়াই সম্ভব।
√ নড়, নড়িল : চলা, চলন ১২. ৪১. ৫১০
নত্তা : জাতকের নয় দিনের দিনের উৎসব, আচার, ১০. ৩. ৪২
নবাত : নতুন জ্বাল দেওয়া গুড় ১০. ১. ৪
নরসুন্দ : নাপিত ৩. ১৩. ১৭১
নস্কর : সৈন্য ৪. ২০. ৪১৬
নাকুড়ি : জ্বালানি ৫. ৭. ৬৪
নাখরা : সুরম্য বাগান ৫. ১২. ২৫৪
নাগচালা : মন্ত্র দিয়ে নাগদের আহ্বান ও পরিচালন করার বিদ্যা ৪. ১৪. ২৯২
√ নাটা, নাটান, নাটানি, নাটায্যা : দুর্দশাগ্রস্ত হওয়া, দুর্দশা, অসুবিধা ; দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে, বিপর্যস্ত হয়ে ১০. ১৮. ৩৩২, ১০. ১৩. ২৪৯
নান্দী : বড় হাড়ি ১১. ১২. ১৭০
নাবাল : নিচু জলাশয় ৪. ১৪. ২৯৭
√ নিকল, নিকলিল : বের হওয়া, বের হল ৪. ২৩. ৫২৮
√ নিগদ, নিগদে : (সাধারণত) দুঃখপূর্ণ সম্ভাষণ ৬. ২. ৭৮, ৮. ১. ৫
নিবাড় : গেঁথে তোলা ৫. ৮. ১১৬
নিরক্ষণ : পর্যবেক্ষণ ৪. ১২. ২৪৩
নির্ঘাত : অব্যর্থ কামড় ৪. ৪. ৬২
নির্বাস : নির্বাসন ১. ২২. ৩২১
নিশীশ্বরি : রাত্রি জেগে পাহারা দেয় যারা ১২. ২৮. ৩৬৪
নিসকঙ্ক : নিঃশঙ্ক ১২. ৪৪. ৫৩১
√ নেউট, নেউটিয়া : ঘুরে/ফিরে আসে, দ্রুততার সঙ্গে ফেরা ৮. ৫. ১২৬
নেকল, নেকলে : বাইরে বের হওয়া, হয় ৪.২০, ৪২০
নেহাল : তাকানো ১. ১৩. ১৬৪, ১১. ৬. ৮৪
নৈরি : নৈঋত কোণ ১. ২. ১৯

প

পড়া : পটাহ ৩. ১৩. ১৬৯
পড়া আঁখি : বিবাহ অনুষ্ঠানে স্ত্রী আচার ১২. ৬. ৫৩
পরতেক : বিশ্বাস, প্রত্যয় ৬. ১৭. ৩২৯
পরমাদ : প্রমাদ ১. ৪. ৮৫,
পরিহার : বিনয়, প্রত্যাহার (?) ১. ১৩. ১৬৭, ৭. ৬. ৮১
পরিত্রাই : পরিত্রাহি, প্রাণপণ চিৎকার ৪. ২৩. ৫০৬
পয়দল : পদাতিক ৪. ৬. ১১৯
পয়ান : যাত্রা, প্রয়াণ ২. ৮. ১৪৮, ৫. ২. ১৮, ১২. ৯. ৮৯
পসার : বিক্রয় সামগ্রী ৬. ৪. ৯৪
পহলওনি মর্দ : পালওয়ান পুরুষ ৪. ২০. ৪১৭
পহলান : পালোয়ান ৫. ১. ৯
প্রজুজ : মেঘ, বৃষ্টি ১২. ৯. ৮৬
পাইক : পদাতিক ৪. ২১. ৪৩৩
পাখর : পক্ষীরাজ ঘোড়া, আসলে বর্মযুক্ত ঘোড়া ১২. ১০. ৯৭
√ পাখড়, পাখড়িয়া : ধরা, ধরে ৪. ২১. ৪৫৭
পাখড়িয়া ঘোড়া : পাখাযুক্ত, বর্মযুক্ত ঘোড়া ৪. ২০. ৪২১
পাগ : পাগড়ি ৪. ১৪. ২৭৫
পাখাল, পাখালিল : ধোয়া, ধু'লো ৮. ৫. ১১৬
পাচন : ছোট লাঠি ১০. ১৭. ৩০৬
পাঁচটী : শিশুর জন্মের পঞ্চম দিনের অনুষ্ঠান ১০. ৪. ৬৯
পাজলা : ধুনুচি, ধুপ জ্বালানোর মৃৎপাত্র ৫. ৯. ১৩৪
পাটনেত : পট্টবস্ত্র ৭. ৩. ৪০
পাটা : বেদি ৯. ৫. ৫৪
পাটোয়ার : দল, গোষ্ঠী, শ্রমবাহিনী ৪. ২২. ৪৭৩
পাড়ি : ঘরের পাশ ১২. ১. ৯
পাঁড়ু-কুসণ্ডিকা : পাকা কুমড়ো ৪. ২৪. ৫৪১
পারণ : উপবাসের পর খাদ্যগ্রহণ ৪. ১৫. ২৮৪

পালগি : পালকি ৪. ২০. ৪২৭
পাষণ্ড : অন্যায় আচরণ, অধর্ম ১২. ২৮. ৩৫৬
পাষণ্ডি : বিধর্মী, অধর্মী ২. ১. ১০
পিছাড়ি বন্ধ : পিছন দিকের দরজা ৮. ১. ৪০
পূগপূর্ণ : পান-সুপুরি ৫. ৭. ৮৫ (আরও বহু জায়গায়)
পূড়া : বড় আকারের ফল, কুমড়ো (?) ১২. ৪৪. ৫৫৭
√ পেল, পেলায় : চেপে ফেলা, চেপে ফেলে ২. ৭. ১২৮
পেসাপ : প্রস্রাব ৪. ২১. ৪৩০
পোতা : গৃহের পত্তনি, ভিত্তি ২. ১.৫, ১২. ১.৬
পোয়াল : খড় ৫. ২. ১৯

ফ

ফএতা : কোরাণের অংশ পাঠ ৪. ১৯. ৪১২
ফয়তা : ধর্মচর্চা ৯. ৩. ৩২
ফাফর : কিংকর্তব্যবিমূঢ় ৪. ২১. ৪৫৪
ফাঁফর : বেসামাল ৫. ১. ১৪
ফুকর : উচ্চস্বরে ডাক ৪. ১৭. ৩৬৭
ফৌত : নাশপ্রাপ্ত ৫. ৩. ৩১

ব

বএদা : ডিম ৫. ৫. ৫৪
√ বজ, বজি : আঁচড়ে, প্রস্তুত করে ২. ২. ১৮
বড়স্ব : বঁড়সিতে মাছ ধরে যে ১২. ৪৪. ৫৩১
বম্বুল : বাদ্যযন্ত্র ১২. ১১. ১০১
বরগোল : বাদ্যযন্ত্র বিশেষ ৪. ২০. ৪২৫
বরাবরি : সামনে ১. ২০. ২৬৪
বর্ণি : প্রদীপের তেল (?), খুব সম্ভব রেড়ির তেল ১২. ২৬. ৩৩৯
√ বাউলা, বাউলায় : বাতাসে নাড়ানো, বাতাস দেওয়া, বাতাসে নাড়ায়, বাতাস দেয় ২. ৬. ১০৫
বাওনা : বাতাসে উড়তে পারে, ওড়ে এমন হালকা পাতের তৈরি ফুল বা পাখি ১২. ১. ১০
বাওলা : বাতাসে ঘোরে এমন ধাতব পাত ৫. ৮. ১২০
বাকড়া গুয়া : বীরের সম্মানসূচক সুপুরি ১২. ১১. ১১৯
বাকুড়ি : কৃষকের যন্ত্রপাতি ৪. ১৮. ৩৯৭
বাঘচালি : শিশুদের খেলা ১০ ৫. ৭৬
বাঙ্গালি : এক বিশেষ ধরনের রায় বেঁশে বা লাঠি খেলা ২. ৭. ১২৫
বাড়ি : লাঠি ২. ৩. ৬১, ৯. ৮. ১০৯
বাত : কথা ৪. ২০. ৪১৫
বাতালি : বেড়া ৯. ৬. ৭৪
বাদ : দ্বন্দ্ব, বিসম্বাদ ৮. ১৬. ২৬২
বাদখাড়ু : এক বিশেষ ধরনের অলঙ্কার ৪.২.২৪
বাদ্দি : বাদ্যযন্ত্র ৯. ৪. ৩০
বানা : ১ সেতু ৪. ২০. ৪২৩, ২ বাদ্যযন্ত্র ১২. ১১. ১০১
বাপু : পিতা ১. ২১. ৩০০
বাবুরে : পূজাপাত্র (?) ৫. ৭. ৭৬
বারা : পূজাপাত্র, ঘট বা কলস ৯. ৩. ২৯, ১০. ২০. ৩৪৩
বারি : পূজাঘট ৫. ১০. ২১১
বালি : বালিকা ৮. ১৩. ২৩৩
বাহুটী : বাউট, অলঙ্কার বিশেষ ১২. ১৬. ২১৭
√ বিচ, বিচিবারে : বিক্রি করা, বিক্রি করার জন্য ৬. ৫. ১০৫
বিচ : মধ্য (বিচে : মধ্যে) ৪. ১৬. ৩৫৯
বিত্তি : সম্পত্তি ১২. ৪৪. ৫৬২
বিথান : ১ বিছানা ৭. ১. ৯
২ ছড়িয়ে পড়া এলোমেলো হয়ে পড়া ১০. ১২. ১৯৪, ৩. ৫. ৫০, ১২. ১২. ১৪০, ১২. ১৪. ১৯৪
বিনন্দ : প্রয়োজন, আনন্দের কারণে ১২. ১৩. ১৭৬
(সুকুমার সেন প্রদত্ত অর্থ— দৃষ্টির সামনে 'in the sight of')
বিমরিষ : ১ বিচার বিতর্ক ৩. ৪. ৪৩
২ অন্যথা ৭. ৬. ৭৮
বিমুখ : বিরত ১২. ৪৬. ৬৫৫
√ বিসর, বিসরিলা : ১ বিস্মরণ হওয়া ৩. ৫. ৬৮, ভুলল ৮. ১৫. ২৫২
২ বিসর : বেদনার্ত ৩. ২. ২৬
বিসরণ : বিস্মরণ ১. ২০. ২৭৫
বিহন্দ : ঘরের চলের কোণ, বাড়ির এক-একটি ঘর, বন্দ ৩. ৮. ৮৩
বুইলা : বললেন ১২. ৪৬. ৫৯৮

বুজরগি : ইন্দ্রজাল শক্তি, ভোজবাজি ৪. ১. ৪৩২
√ বুড়, বুড়িয়া : ডোবা, ডুবে যাওয়া ১. ১৩. ৭৫
বুড়িল : ডুবল ৮. ৮. ১৫১
বুড়ন, বুড়নিয়া : ছলনা করে নৌকা ডুবিয়ে লুণ্ঠন করে যারা, জলদস্যু ১২. ৪৬. ৫৯৯
√ বুল, বুলে : ঘুরে বেড়ান, ঘুরে বেড়িয়ে ২. ২. ২৬
বুহিত : ১ নৌকা ৯. ২. ১৯,
২ নৌবহর ১৩. ৮. ১০৫
বুহিতা বাকুড়ি : কৃষকের যন্ত্রপাতি ৪. ১৬. ৩৪৫
বুহিতাল : নৌবহর ১২. ৪৩. ৫২০
বুহিতা বাকুড়ি : কৃষকের যন্ত্রপাতি ৪. ১৬. ৩৫৪, ১০. ১৭. ৩০২
বেজুড়ি : উকুন জাতীয় পোকা ১২. ৪৪. ৫৬০
বেদেন্ত : বিদিত ১. ১. ৯
বেভার : ব্যবহার, আচরণ ৬. ১০. ১৭৫
বেলনড়ি : বেল ডাল ১১. ১. ৮
বেলিক্ষ : বেল্লিক, দুষ্ট প্রকৃতির ১. ৪৯. ৬৪৯
বেয়াকুল : ব্যাকুল ৬. ১১. ১৯৮
বোল্লা : বোলতা, কালো ডেঁয়ো পিঁপড়ে ৩. ১০. ১৩৪

ভ

ভবানী : সৃজন কর্ত্রী, মনসা অর্থে প্রযুক্ত ৮. ১৩. ২৩৬
ভাজন : ভদ্র, উপযুক্ত ১১. ৪. ৫৩
√ ভাণ্ড, ভাণ্ডিব : মিথ্যা বলা, বলব ১১. ১০. ১৩৩
ভালা : ভাল ১০. ১৮. ৩১১
ভার : বিষ দেওয়া ৬. ১৩. ২৪৭
ভারত : দেশ, চরাচর ১২. ৯. ৮৫
ভায় : ভেবে দেখে ১২. ১৫. ২০২
√ ভুঞ্জ, ভুঞ্জহে : ভোগ করা, ভোগ করছ ১০. ১৩. ২০৬
ভুল : ১ ভূত ১১. ১. ১১
২ দিক ভুল করানো ভূত ১০. ১৩. ২১২
ভুঁই চাপা : বাজিবিশেষ ১২. ১১. ১০০
ভূতলিয়া : ভূতগ্রস্ত ১০. ১৩. ২৩৮
(সুকুমার সেন অর্থ প্রদান করেছেন— ভূতের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে এমন— 'One who has contact with evil spirit')
√ ভেজ, ভেজিল : পাঠান, পাঠাল ৪. ১৬. ৩৫৪
√ ভেট, ভেটিবার : উৎকোচ, সম্মান বা দস্তুরি প্রদান ৯. ৭. ১০০
√ ভেড়, ভেড়ি : জাপটে ধরা, সস্নেহে জড়িয়ে ধরে ১২. ৯. ৮৪
ভোক : ক্ষুধা ৫. ৭. ৬২

ম

মঙ্গল : কল্যাণদায়ক সঙ্গীত ৫. ১১. ২৪০
মঙ্গল-পাঠান : পুরোন দিনের খেলা, শিশুদের ১০. ৫. ৭৬
√ মজ, মজে : নষ্ট হয়, নষ্ট হয়ে ১০. ১৩. ২০৩
মণ্ডব : মণ্ডপ, মঞ্চ ৯. ৫. ৫১
মৎস্য-রঙ্গ : মাছরাঙ্গা ১১. ৬. ৮৭
মধুকর : বাণিজ্যের বিলাসী নৌকা, নৌবহর ১০. ১১. ১৫৯
মামতি : মমতা ১০. ৭. ১০৮
মসিদ : মসজিদ ৯. ৩. ৩২
মহরি : বাদ্যযন্ত্র ৪. ২০. ৪২৫
মাগু : স্ত্রী ১২. ৪৪. ৫৬৪
মাছুনি : মধ্যবর্তী দণ্ড ২. ১৩. ২২৭
মাজস : ভেলা ১. ৪. ৯১, ৭. ৩. ৪১
মাজী : ডাঁটা, কলাপাতার মাঝের অংশ ১০.২০. ৩৪৪
মাতোয়ালা : আধ্যাত্মিকতায় মশগুল হওয়া ১০. ১৮. ৩৪
মাথা, মাথায়্যা : মাতা, মাতামাতি করে ৮. ২. ৪৭
মালসাট : মল্লদের মতো বস্ত্র পরা ১২. ১৩. ১৬২
মালুম কাট : মাস্তুল ৮. ১৯. ৩০৮
মিরবর : নৌবহর প্রধান ১২. ১০. ৯৪
মির মজলিস : সেনাপতি ৪. ২১.
মুক্ষ : মোক্ষ ১২. ২৮. ৩৫৫
মুগ সামলি : পিঠে বিশেষ ১০. ১. ৬
মুৎছদ্দি : পদাধিকারী, হিসাবরক্ষক, করণিক ৪. ২০. ৪২৭

মুদগর : মুগুর ৮. ৮. ১৬৫
√ মুলা, মুলায়, মুলায়ত : মূল্য স্থির করে, দরদাম করে ১০. ১৩. ২৩৭, ৬. ৬. ১১৮
মুরিদ : শিষ্য ৪. ২১, ৪৩২
√ মেল, মেলি : ছড়িয়ে, খুলে রেখে ৮. ১. ৩৪
মেলানি : ১. শুভানুষ্ঠান সূচক মিষ্টদ্রব্য সহ সংবাদ প্রদান ১. ৪. ৯১
২. বিদায় ৭. ১২. ১৭৪, ১২. ৩৮. ৪৮৫

য
যুগ : দুই ৮. ১৩. ২৩৭
যোগ-পাটা : যোগীদের বসন, যোগপট্ট, যন্ত্র পট্ট, ১২. ৪৬. ৬০০

র
রঘু-বোদালি : রাঘব বোয়াল ১২. ৫২. ৭০৩
রড়ারড়ি : দ্রুত পালানোর ভাব ২. ২. ৬১
রভস : মিলনানন্দ ৪. ১৯. ৪০৬
রম্ভ : আড়ম্বরপূর্ণ কথা ৬. ১. ৬৩
রসান : সুধার ১২. ১৮. ২৪৮
রাণ্ডি : বিধবা ১১. ৫. ৬৫
রোজ : ভিক্ষা, সিধা ৬. ১৭. ৩১০

ল
লক্ষ : অভ্যান্তর ২. ১২. ১০১
লক্ষে : চক্ষের সীমায় ২. ১২. ২০০
লহ : ১ লোহা ১২. ২৫. ৩০
২ লোহা ১২. ১. ৬
লহু : রক্ত ৪. ২৩. ৫২৮
লাউয়া লাটী : লাউয়ের খোল ১৩. ১২. ১৭৭
লালগি : ভুলি ৪. ২০. ৪২৭
√ লুক, লুকিয়া : লুকে নেওয়া, লুফে নিয়ে ২. ২. ৩১
√ লুড়, লুড়িবার, লুড়িবারে : লুণ্ঠন করা, লুণ্ঠন করবার, লুণ্ঠন করতে ৬. ১০. ১৭৮
লেই : লেজ ১০. ১১. ১৫৬
লেজাহ : নিয়ে যাও ৪. ১৮. ৩৯২
লোহ : অশ্রু ২. ২৯. ৩৮০

শ
শরা : পাত্রের ঢাকনা ৮. ৫. ৮৭

স
সগদ : দুঃখপূর্ণ বাণী ১২. ৩৮. ৪৮৫
সঙ্গে : সম্বরণ করেছি এমন ৪. ৪. ৪৫
সঙ্কল : শঙ্কাতুর অবস্থা, সঙ্কট (?) ১. ১৩. ১৬৮
সংবরণ করা ১. ২২. ৩২১
সঙ্কল, সঙ্কলি : সংযত, নিবৃত্ত হওয়া— হয়ে ৪. ৪. ৬৯
সঙ্কলিয়া : নিবৃত্ত করে ১. ১৩. ১৯৯
সচ্ছল : সচ্ছন্দ ৫. ১৩. ২৮৯
সত্বর : সাবধান ৭. ৭. ৮৮, ১১. ১. ১৬
সন্বিধান : বিশেষভাবে নির্দেশ দান বা অনুরোধ ১. ২০. ২৮৩
সম্মতি : সম্বোধনের উত্তর ৩. ৫. ৪৯
সরু চাকলি : পিঠে বিশেষ ১০. ১. ৬
সর্বমই : সর্বময়ী ২. ১২. ২১০
সর্বাধিক : সর্বাধ্যক্ষ ১২. ১০. ৯৩
সহেলা : সই ৬. ৮. ১৪৪
সাজি : সাজিয়ে রাখার পাত্র ১. ৯. ১২৮
সাড়ক : গৃহের অংশ ১২. ১. ৬
সাঁড়াসি : বিশেষ যন্ত্র, রান্নাঘরে ব্যবহার্য ১২. ২৩. ২৯১
সাদিয়া গোলাম : যৌতুকপ্রাপ্ত গোলাম ৫. ৩. ৩২
সাপটে : হাত সানে ১০. ১১. ১৫০
সাবুড়া : পূজার উপকরণ বহন উপযোগী পাত্র ৯. ১. ১
সাঁভ, সাঁভায় : প্রবেশ, প্রবেশ করে ৪. ২৩. ৫০৩, ১০. ১৩. ২১৪
সাঁভায়া : প্রবেশ করে ৮. ২. ৪৫
√ সামাদ, সামাদি : সমাধা করে ২. ২. ৩২
সাম্মল : নিমীলিত হওয়া ১৩. ১০. ১৪৮
√ সার, সারিয়া : তৈরি হওয়া, তৈরি হয়ে উদ্যত ৪. ২২. ৪৭৯
সার, সারি, : উঁচু করে ২. ৫. ১০৭
সার পাত্র : ওষুধপত্র রাখার পাত্র ১২. ৫২. ৭০২
সারি : গান ৯. ৬. ৭৯

সালাগ্য : ভাগ্যবস্তু ১. ১৫. ২০২, ১৩. ১৫. ২০২
স্থাপ্য : পূজাবেদি ১২. ৩৮. ৪৮৭
সিজ, সিজাইয়া : সিদ্ধ করা, সিদ্ধ করে ৮. ১৫. ২৫২
সিবাল : কলা ২. ৭. ১২৩
সুকাস্তলা : সুন্দরভাবে সাজান চুল, বিনুনি ১. ৩. ৩৫
সুসার : সমস্ত ৪. ১১. ২৩৫
সোঙর, সোঙরিতে, সোঙরণ : স্মরণ করা, স্মরণ করতে, স্মরণ ১০. ৮. ১১৬, ১৩. ৩. ৩০
সোসর : সুরাহা করতে পারে এমন সমস্যা সমাধান করতে পারে যে ৬. ১৭. ২৯২

হ

হকিকত : সত্য সংবাদ ৪. ২০. ৪১৮
হুট : দ্বন্দ্ব ৪. ১. ১৪, ৭. ১০. ১৩৭
হড়পি : সাপ ধরার, ধরে রাখার ঝাঁপি ১২. ২৩. ২৯১
হাওয়াসা : শ্রদ্ধা ভাজনীয়া ৪. ২১. ৪৩৮
হাজত : মানত রাখা ৪. ১৯. ৪১৩
হাড়ি পাখই : কুমোরের সারিবদ্ধ করে রাখা হাড়ি ১০. ১৩. ২৩০
হাথে মাথে : তাড়াতাড়ি করে, আস্তে ব্যস্তে ৫. ১০. ২১৬
হালা : গোছা, আটি, ৪ সংখ্যক (?) ১১. ১২. ১৬৯
হালিয়া : হেলে সাপ (হাল চালানোর সময় পাওয়া যায় কিংবা হাল চলনের ভঙ্গিতে চলে বলে এই নাম হতে পারে) ১. ৩. ৪৪
হামাকুড়ি : হামাগুড়ি ১০. ১১. ১৮৯
হাব্যাষ/হাব্যাস : দুরাকাঙক্ষা, হাহাকার ২. ৪. ৬৮, ১২. ৩৯. ৫০২
হায়াত : বিশেষ ৫. ৩. ৩১
হাঁকর : হাঙ্গর ১৩. ৭. ৭৩
হাঁকর-মাকর : হাঙ্গর ও মকর (বা সমজাতীয় জলজন্তু) ১০. ১১. ১৭০
হিড়িম্বি : হিড়িম্বার তুল্য ৫. ১০. ১৯৮
হুন, হুনিল : উৎসর্গ করা, উৎসর্গ করলেন ১৩. ৯. ১৩৩
হেট : নিচু নিচু করা ৮. ১. ১৯
হেড়া : গোমাংসের ঝোল ৪. ২১. ৪৫৭

নির্দেশিকা (ভূমিকা অংশ)

গ্রন্থপঞ্জী

অপ্রকাশিত :

১. শ্রীকৈলাসচন্দ্র রায় বসাক : সংকলিত : *নারায়ণ দেবের মনসামঙ্গল* ; ব্যক্তিগত সংগ্রহ।
২. শ্রীফণীভূষণ পাল : *উত্তর বাংলার লোকসাহিত্য* ; অপ্রকাশিত গবেষণাপত্র ; নির্দেশক ; তরণীকান্ত ভট্টাচার্য ও হরিপদ চক্রবর্তী ; উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পি-এইচ ডি উপাধিপ্রাপ্ত।
৩. শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায় : *উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজের দেবদেবী ও পূজা-পার্বণ* ; উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পি-এইচ. ডি. উপাধিপ্রাপ্ত।

মূল গ্রন্থ ও সহায়ক গ্রন্থ

১. অক্ষয়কুমার কয়াল সম্পাদিত : *রূপরাম চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গল* ; ভারবি ; কলকাতা ; দ্বিতীয় সংস্করণ (পুনর্মুদ্রণ) ; ১৯৯২।
২. অনাথবন্ধু কাব্য ব্যাকরণতীর্থ : *দ্বিজ বংশী দাসের শ্রীশ্রীপদ্মা পুরাণ* ; বেণীমাধব শীলস লাইব্রেরি ; কলকাতা ; প্রকাশকাল দেওয়া নেই।
৩. অশোক মিত্র সম্পাদিত : *পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বণ ও মেলা* ; ভারত সরকারের জনগণনা দপ্তর। চার খণ্ড।
৪. আশুতোষ দাস সম্পাদিত : *জগজ্জীবন ঘোষালের মনসামঙ্গল* ; কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়; ১৯৮৪।
৫. আশুতোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত : *বঙ্গীয় লোকসঙ্গীত রত্নাকর* ; এ মুখার্জি অ্যান্ড কোং প্রা. লি.। কলকাতা, ১৯৭৭।
৬. ঈশানচন্দ্র ঘোষ অনূদিত : *জাতক* ; করুণা প্রকাশনী ; ফাল্গুন ১৩৮৯ ; ছয় খণ্ড; কলকাতা।
৭. কামিনীকুমার রায় : *লৌকিক শব্দকোষ* ; করুণা প্রকাশনী ; কলকাতা ; ১৯৭১।
৮. শ্রীকেতাকনন্দ দাস/শ্রীক্ষমানন্দ দাস : *মনসার ভাসান* ; অক্ষয় লাইব্রেরি ; কলকাতা; প্রকাশকাল দেওয়া নেই।
৯. চন্দ্রকান্ত চক্রবর্তী সংগৃহীত : *বাইশ কবি মনসা পুথি* ; পরিবেশক— স্ট্যান্ডার্ড পাবলিশার্স, কলকাতা— ৭ ; প্রকাশকাল দেওয়া নেই।
১০. চৈতন্য দাস বিরচিত : *মনসামঙ্গল* ; তারাচাঁদ দাস অ্যান্ড সন্স প্রকাশিত। প্রকাশ কাল দেওয়া নেই।
১১. জয়ন্তকুমার দাশগুপ্ত সম্পাদিত : *বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণ* ; কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।
১২. দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার : *ঠাকুরমার ঝুলি* ; একবিংশতি সংস্করণ ; মিত্র ও ঘোষ প্রা. লি. ; কলকাতা। ১৩৯০ বঙ্গাব্দ।
১৩. নন্দলাল শীল সম্পাদিত : *মনসামঙ্গল* ; যশোহর মল্লিকপুর নিবাসী বন্দ্যঘটীয় শ্রীকালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন প্রণীত ; কবির নামান্তর 'দ্বিজকালী' ; বেণীমাধব শীলস লাইব্রেরি ; কলকাতা। ১৩৯৮ বঙ্গাব্দ।
১৪. ড. নবীনচন্দ্র শর্মা সম্পাদিত *নারায়ণ দেব বিরচিত পদ্মাপুরাণ* (ভাটীয়ালী খণ্ড) ; বাণী প্রকাশ ; গুয়াহাটী ; 'অগ্নিসমীক্ষা' অংশ ; ১৯৯৩।
১৫. ড. পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত : *গোর্খ বিজয়* ; বিশ্বভারতী ; ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ।
১৬. ড. পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত : *রূপরামের ধর্মমঙ্গল* ; ভূমিকা : সুকুমার সেন ; বর্ধমান সাহিত্যসভা ; বর্ধমান।
১৭. প্যারীমোহন দাশগুপ্ত (সম্পাদিত) : *বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণ* ; বসন্তকুমার ভট্টাচার্য সংশোধিত ; বীণা নিকেতন ; বরিশাল ; ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ।
১৮. ড. বিষ্ণুপদ পাণ্ডা সম্পাদিত : *দ্বারিকা দাসের মনসামঙ্গল* ; কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়; ১৯৭৯।

১৯. ড. ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক : *অপরাধ জগতের ভাষা* ; নবভারত পাবলিশার্স ; কলকাতা ; আশ্বিন, ১৩৭৮ বঙ্গাব্দ।
২০. ভক্তিমাধব চট্টোপাধ্যায় : *রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণ* ; ফার্মা কে. এল. এম. প্রা. লি. ; কলকাতা ; ১৯৭৭।
২১. রমেশচন্দ্র দত্ত অনুবাদিত : *ঋগ্বেদ সংহিতা* ; হরফ প্রকাশনী ; কলকাতা ; ১৯৭৬। হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় : *ঋগ্বেদ পরিচয়* ; ঐ।
২২. সিগমুন্ড ফ্রয়েড : *টোটেম ও টাবু* ; ধনপতি বাগ অনুবাদিত ; সুবর্ণরেখা ; কলকাতা; ১৯৯৩।
২৩. সুকুমার সেন (সম্পাদিত) : *Manasa Vijaya* ; এশিয়াটিক সোসাইটি ; প্রকাশ কাল দেওয়া নেই।
২৪. সুধীরচন্দ্র সরকার সংকলিত : *পৌরাণিক অভিধান* ; এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রা. লি.; পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত চতুর্থ সংস্করণ ; ১৩৮৮ বঙ্গাব্দ।

আলোচনা গ্রন্থ

১. অচিন্ত্য বিশ্বাস : *অদ্বৈত মল্লবর্মণ ও তিতাস একটি নদীর নাম* : রত্নাবলী : কলকাতা; ১৯৯৮।
২. অচিন্ত্য বিশ্বাস : *বাংলা পুথির নানা কথা* ; জিজ্ঞাসা এজেন্সিজ প্রা. লি. ; কলকাতা; ১৯৯৬।
৩. অরবিন্দ পোদ্দার : *মানবধর্ম ও বাংলা কাব্যে মধ্যযুগ ; কলকাতা ; দ্বিতীয় সংস্করণ।*
৪. আশুতোষ ভট্টাচার্য : *বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস* ; এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং ; কলকাতা ; পরিবর্ধিত অষ্টম সংস্করণ ; ১৯৯৮।
৫. কানাই কুণ্ডু : *ছত্তিশগড়ের লোকজীবন ও সংস্কৃতি* ; মনীষা ; কলকাতা ; ১৯৮৬।
৬. ড. জয়া সেনগুপ্ত : *মনসামঙ্গল কাব্যে সামাজিক পটভূমিকা ও নারী* ; বড়াল প্রকাশনী ; ঢাকা ; ১৯৯০।
৭. জীবনানন্দ দাশ : *জীবনানন্দ দাশের কাব্য গ্রন্থ* ; বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রা. লি. ; কলকাতা; প্রথম খণ্ড ; তৃতীয় মুদ্রণ ; ১৩৭৯।
৮. দীনেন্দ্রকুমার রায় : *পল্লীচিত্র* ; আনন্দ প্রকাশনী ; কলকাতা ; ১৩৮৮ বঙ্গাব্দ।
৯. গোপাল হালদার : *বাংলা ও সাহিত্যের রূপ রেখা* ; প্রথম খণ্ড ; কলকাতা।
১০. গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু : *বাংলার লৌকিক দেবতা* ; দে'জ পাবলিশিং কলকাতা ; দ্বিতীয় সংস্করণ; ১৩৯৪ বঙ্গাব্দ।
১১. নগেন্দ্রনাথ রায় : *শিবায়ন ও ব্রাত্য জনগণের কবি রামেশ্বর* ; শহীদ প্রকাশন ; মেদিনীপুর; ২০০১।
১২. ড. প্রাণেশ্বর রাভা সম্পাদিত : *মায়াবতী বিষহরী* ; বিষহরী প্রকাশন ; কাচাদল ; দরং গিরি; গোয়ালপাড়া ; আসাম ; ১৯৮৭ খ্রী.।
১৩. ড. বরুণকুমার চক্রবর্তী : *লোকসংস্কৃতি নানা প্রসঙ্গ* ; বুক ট্রাস্ট ; কলকাতা ; ১৩৮৭ বঙ্গাব্দ।
১৪. বিমানবিহারী মজুমদার : *শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের উপাদান* ; কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ; কলকাতা ; দ্বিতীয় সংস্করণ।
১৫. বিনয় ঘোষ : *পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি* ; প্রথম খণ্ড ; প্রকাশ ভবন ; কলকাতা ; জুলাই ১৯৭৬।
১৬. ড. বিরিঞ্চিকুমার বরুয়া : *অসমর লোকসংস্কৃতি* ; লয়ার্স বুক স্টল : গৌহাটি : দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৬৭।
১৭. ভবনাথ সরকার : *নাথধর্ম : সমাজ ও সংস্কৃতি* ; ভবনাথ সরকার রিসাচ ফাণ্ড; নবব্যারাকপুর, উত্তর ২৪ পরগনা ; দ্বিতীয় সংস্করণ ; ১৯৯২।
১৮. ভবেশ দত্ত : *মেলায় মেলায় আমার দেশ* ; ভোলানাথ প্রকাশনী ; কলকাতা ; ১৯৮৪।

১৯. মানিকলাল সিংহ : *রাঢ়ের মন্ত্রযান* ; বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া ; ১৩৮৫ বঙ্গাব্দ।
২০. ড. মিহির চৌধুরী কামিল্যা : *আঞ্চলিক দেবতা : লোকসংস্কৃতি* ; বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়; বর্ধমান ; ১৯৯২।
২১. ড. মিহির চৌধুরী কামিল্যা : *রাঢ়ের গ্রাম দেবতা* ; বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় ; বর্ধমান ; ১৯৮৯।
২২. ড. মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া : *শ্রীরায়বিনোদ : কবি ও কাব্য* (হবে 'রামবিনোদ'); বাংলা একাডেমি ; ঢাকা ; ১৯৯১।
২৩. ড. রবীন্দ্রনাথ সামন্ত : *বাঁকুড়া সংস্কৃতি পরিক্রমা* ; পুস্তক বিপণি ; কলকাতা ; ১৯৮১।
২৪. রাজশেখর বসু (সারানুবাদ) *মহাভারত* ; এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রা. লি. ; কলকাতা; অষ্টম মুদ্রণ ; ১৩৮৬ বঙ্গাব্দ।
২৫. সুখময় মুখোপাধ্যায় : *বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর : স্বাধীন সুলতানদের আমল* ; ভারতী বুক স্টল ; কলকাতা ; চতুর্থ সংস্করণ ; ১৯৯৮।
২৬. সুরেশচন্দ্র নাথ মজুমদার : *রাজগুরু যোগিবংশ* ; মিলনপল্লী, শেওড়াফুলি, হুগলি ; ১৯৯১।
২৭. সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় : *শক্তিরঙ্গ বঙ্গভূমি* ; আনন্দ প্রকাশনী ; কলকাতা ; ডিসেম্বর ; ১৯৯১।
২৮. সোমনাথ চক্রবর্তী : *মল্লভূমি* ; বুকল্যান্ড প্রা. লি. ; ১৯৯৭।
২৯. সুজিৎ চৌধুরী : *প্রাচীন ভারতে মাতৃপ্রাধান্য ; কিংবদন্তীর পুনর্বিচার* ; প্যাপিরাস ; প্রথম সংস্করণ ; মে ১৯৯০।

প্রবন্ধ ও পত্র-পত্রিকার প্রতিবেদন

১. অচিন্ত্য বিশ্বাস : 'উত্তরবঙ্গের অনক্ষর কৃষকদের মৌখিক সাহিত্য'—"গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস"; বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা ; যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ; ২০০০-২০০১ সংখ্যা ; ২০০১ মার্চ।
২. অচিন্ত্য বিশ্বাস : 'নারী পৌরোহিত্য : বাংলার সমাজ ইতিহাসের একটি প্রাকসূত্রের সন্ধান'; ভাগীরথী ; মানকর ; বর্ধমান ; ১৯৮৮।
৩. অচিন্ত্য বিশ্বাস : 'মন্ত্রে মন্ত্রিত বাংলার কথাচিত্র' ; লোকশ্রুতি- ১৬ ; লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র ; পশ্চিমবঙ্গ সরকার ; জুন ২০০০।
৪. অচিন্ত্য বিশ্বাস : 'সখী ভাবের সাধনা : একটি সম্ভাব্য উৎস সন্ধান' ; অশনি ; শিলিগুড়ি; ১৯৯০।
৫. — আনন্দবাজার পত্রিকা ; ২৭ বৈশাখ ; ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ।
৬. ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় : 'ধর্মপূজাবিধি' ; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ; পঞ্চম মাসিক অধিবেশন ১৩২১ বঙ্গাব্দে পঠিত।
৭. পরিচয় : সুনীতিকুমার স্মরণ সংখ্যা ; আগস্ট-সেপ্টেম্বর ; ১৯৭৭।
৮. বিশ্বজিৎ রায় : 'ধর্মমঙ্গলের বিকল্প কিস্যা : শরণাগতের রক্ষা অথবা চাকরি বৃত্তান্ত' ; বরোমাস ; শারদীয় ; ১৪০৮।
৯. মাণিকলাল সিংহ : "ষষ্ঠী ও সিনি" ; সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ; ১৩৬০।
১০. সুকুমার সেন : 'মহাদেবী নিত্যা' ; পথিক বসু সম্পাদিত—'বিভাব' প্রবন্ধ সংকলন ; প্যাপিরাস ১৯৯৪ ; কলকাতা।

ইংরেজি ভাষায় রচিত প্রবন্ধ নিবন্ধ, গ্রন্থ ও সহায়ক পুস্তক

১. Aristotle : *On the Art of Poetry* ; Translation into English : Inagram Bywater; Oxford At the Clarendeom Press ; প্রথম সংস্করণ ১৯২০ ; আমরা দেখেছি ১২শ পুনর্মুদ্রণ ; ১৯৭৪।
২. Dr. Ambalike Hiryanna : *Studies in Karnataka Folklore* ; Prasaranga, Karnatak University, Darward, December 1999.
৩. Bikas Chandra Gohain : *Human Sacrifice and Head hunting in North Eastern India* ; Lawyer's Book Stall ; Gauhati, Assam , 1977.

৪ Cavendish Marshall (Ed) *Man, Myth and Magic*— The Illustrated *Encyclopedia of Mythology*, Religion and the Unknown' , New York , X Vols

৫ Dr Charuchandra Sanyal *The Rajbansis of North Bengal* (A Study of A Hindu Social Group) , The Asiatic Society . Kolkata , 1965

৬ E G Dimock *Manasa— Goddess of Snakes* , The University of Chicago, Committee on South East Asian Studies , Reprint Series, No 13, History of Religions,,Winter 1961

৭ Geoffray Parrinder *African Mythology* , The Standard Literature Co (P) Ltd , 1982

৮ Rev Henry White Head *The Village Gods of South India* , Asian Educational Services , New Delhi , 1988

৯ H H Risley *The Tribes and Castes of Bengal* , (Calcutta) Kolkata, 1891

১০ Sir James George Frazer *The Golden Bough*— A Study in Magic and Religion' , Abridged Edition, Macmillan & Co Ltd London 1954

১১ James R Willin *The Egyptian Varriant of the Geocentric Theory of the Universe* , South San Fransisco , 1979

১২. John Gray *Near Eastern Mythology* , The Standard Literature Co (P) Ltd , 1982

১৩. J Westwood *Aion A Guide to Legendary Britain* , London, 1985

১৪ J P Vogel *Indian Serpent Lore* , Delhi , 19972

১৫. Kavalam Narayana Panikkar *Falklore of Kerala* , National Book Trust, First Edition 1991 , First Reprint 1999, New Delhi

১৬ Lal Behari Day *Folktales of Bengal* , Book Society of India Ltd , Kolkata

১৭. Narendra Nath Bhattacharya *Ancient Indian Rituals— and their Social Contents* , Manoher Book Service, 1975, Delhi

১৮. N K Sanders *Epic of Gilgamesh* , Pelican , 1980

১৯. Dr P K Maity *Historical Studies in the Cult of the Goddess Manasa (A Cultutral Study*) , Firma K L M , Kolkata

২০. Robert Briffault *The Mothers*, Macmillan & Co Ltd , London, New York 1927 (2 Vols)

২১. Roslyn Poignant . *Oceamic and Australian Mythology* ; The Hamilyn Publishing Group Ltd , Middlesex, Rushden, England, 1985

২২. Sandra Billington ; Mirand Green (Ed) : *The Concept of the Goddess* ; Routledge ; London– New York , 1996.

২৩. Sukumar Sen *An Etymological Dictionary of Bengali* , C 1000 – 1800 ; II Vols ; Eastern Publishers ; Kolkata.

২৪. T. W. Clark . *Evolution of Hinduism in Medieval Bengali Literature* ; Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of London; 1955

২৫. Veronica Ions : *Egyptian Mythology*, The Standard Literature Co. (P) Ltd; 1968

২৬. Verrier Elwin : *Myths of the North East Frontier of India* ; NEFA, Shillong, 1958. 1st ed. Reprint 1968.

২৭. Walter G. Graffiths : *The Kols of Central India* ; The Royal Asiatic Society of Bengal, Kolkata, 1946.

২৮. William A. Haviland : *Anthropology* ; University Vermount, 1974.

২৯. W. J. Ong . Orality and Literary , Routledge ; London & New York ; 1st Edition 1982, we quote from 7th Reprint ; 1997.

৩০. W L. Smith : One Eyed Goddess, Upasala, Sweden, 1980.